শারদীয়া ১৪২৯
কিশোর ভারতী

আমাদের কথা

দুষ্প্রাপ্য রচনা

জাদু কবিতা

উপন্যাস ও উপন্যাসিকা

অন্যজগতের তারকা

গল্প

স্মৃতিকথা

বড় গল্প

গল্প

বিশ্বসাহিত্য

ভ্রমণ

কমিকস

রম্য রচনা

জানা থেকে অজানা

ছড়া-কবিতা

হরেক রকম

প্রচ্ছদ

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক
দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক
ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়
নির্বাহী-সম্পাদক
চুমকি চট্টোপাধ্যায়
কর্মাধ্যক্ষ **মানস চক্রবর্তী**
সম্পাদকীয় বিভাগ
শাশ্বত সেন ও অনিন্দিতা ঘোষ
সচিবালয়
অনিমেষ পাল শুভাশিস লাহিড়ী
বরুণ রায় এষা চ্যাটার্জি
সহযোগী
সন্দীপ নন্দী রাজকুমার মণ্ডল

পত্রভারতী
৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯
+91-33-22411175
info@patrabharati.com
www.patrabharati.com

SHARADIYA
KISHORE BHARATI
Vol. 55 | No. 01 | October 2022

On behalf of KISHORE BHARATI,
Tridib Kumar Chatterjee, Owner,
Printer & Publisher, Published from
1/1 Brindaban Mallick Lane,
Kolkata 700 009 and printed from
Hemaprabha Printing House,
1/1 Brindaban Mallick Lane,

পঞ্চান্নয় পদার্পণ

প্রিয় বন্ধু,

এখনও যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। পরপর দু-দুটো বছর ধরে অতিমারীর কবলে নিষ্পেষিত হতে হতে একসময় হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম, এই সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড়ানো বোধহয় আর হবে না। এই মনে হচ্ছে বেরিয়ে পড়েছি, আবার নতুন ঢেউ।

অণুজীব যে পুরোপুরি বিদায় নিয়েছে, তা অবশ্য বলা যাবে না। তবে অতিমারীর শেষে এসে গেছি, বলা চলে। সুস্থ মানুষকে উপড়ে ফেলতে সে বোধহয় আর পারবে না।

কোভিড পেরিয়ে কিশোর ভারতীও অবশেষে পদার্পণ করল ৫৫ বছরে। যখন পিছন দিকে তাকাই, বড় বিস্ময় জাগে। ১৯৯৫ সালে দীনেশচন্দ্র চলে যাওয়ার পরে যখন ছায়াহীন পৃথিবীতে অসহায় এক তরুণ দাঁড়িয়ে ছিল, সে কল্পনাও করতে পারেনি, বাবার মানসকন্যাকে সে হাত ধরে এতদূর নিয়ে আসতে পারবে।

সে যে কী ভয়ংকর কাল কেটেছে! তীব্র অর্থনৈতিক সংকট, কিছু মানুষের অসহযোগিতা, আবার সেই কঠিন সময়েই অধিকাংশ মানুষ পাশে এসে নিঃস্বার্থ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আর সবার উপরে ছিল কিশোর কিশোরী বন্ধুরা! একবুক ভালোবাসা নিয়ে তারা আঁকড়ে ধরেছিল কিশোর ভারতীকে।

তারপর কত সুখদুঃখের মুহূর্ত, কখনও আলো কখনও অন্ধকার। সেই সব অতিক্রম করে, নিজেকে যুগের সঙ্গে অবিরত বদলে ফেলতে ফেলতে অবশেষে কিশোর ভারতী পঞ্চান্ন। একটি কিশোর পত্রিকার জীবনে এ এক বিরাট ঘটনা। সবচেয়ে বড় কথা, কিশোর ভারতী আজও দীনেশচন্দ্রের নীতিতে অবিচল, সে লেখার বিচার করে, লেখকের নয়। আর এই কারণেই হয়তো কোভিডের ভয়ংকর সময়ে যখন পৃথিবী প্রায় স্তব্ধ, সেই ২০২০ সালেও শারদীয়া কিশোর ভারতী অনেক কষ্ট করে প্রকাশিত হয়, এবং তার বন্ধুদের ভালোবাসায় মাত্র ১ দিনে নিঃশেষিত হয়ে যায়।

গত এপ্রিল থেকে কমবেশি স্বাভাবিক জীবনে আমরা পৌঁছে গেছি। অমনি শুরু হয়েছে দৈনন্দিন জীবনের অত্যাবশ্যকীয় পণ্যে মূল্য বৃদ্ধি। অন্যতম প্রধান কারণ, চাল ডাল চিনি তেল...সবকিছুতেই সরকার জিএসটি বসিয়েছেন। সাধারণ মানুষ কী করে সীমিত সামর্থ্যে সংসার চালাবেন, সে নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকারই বা কী!

যেখানে চাল ডাল তেল চিনি বা পেট্রোল ডিজেল সবকিছুরই দাম হু-হু করে বাড়ছে, সেখানে কাগজের দাম যে গত ২ বছরে ৫০ শতাংশ বাড়বে, এ তো খুব স্বাভাবিক। গল্পের বই পত্রিকা, এসব কিনে পড়া সময় নষ্ট ছাড়া কিছু না! তার চেয়ে ঢের ভালো টিভি, কম্পিউটার, স্মার্ট ফোন... সারাদিন জুড়ে অঢেল আনন্দের উপকরণ।

আরেকটি ঘটনাও ঘটছে। তা হল, ষাটোর্ধ নাগরিকদের সুযোগ সুবিধা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন ব্যাঙ্কে সুদের হার নিয়মিত কমে যাচ্ছে। রেল পরিষেবায় যে ছাড় ছিল, কোভিডের পরে আর ফেরানো হয়নি। ফলে অবসরের পরে যাঁদের জীবন চলত মাসিক সুদের টাকায়, যাঁরা টাকা জমিয়ে একটু আধটু বেড়াতে যেতেন, সব বন্ধ।

প্রশ্ন হল, এই সব কুকর্মের প্রতিবাদ করবে কে! বিরোধী শক্তি দ্বিধাবিভক্ত। তাদের একটি অংশ আকণ্ঠ দুর্নীতিতে ডুবে আছে। খবর কাগজ খুললেই যত রাজ্যের কেলেংকারির খবর। কোথাও সরকার পড়ে যাওয়ার অবস্থা, কোথাও বস্তা বস্তা টাকা বেরোচ্ছে, কোথাও আবার নামে বেনামে সম্পত্তি কেনার কাগজপত্র।

আবার সেই বাবার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। কত বছর আগে তিনি লিখে গেছিলেন, 'মস্তকে দংশেছে ফণী, তাগা বাধবে কোথা!'

কোভিডের সুড়ঙ্গ পেরিয়ে এলেও এই দুর্নীতির সুড়ঙ্গ কি আর কখনও পেরোনো যাবে? কখনও কি আর গান্ধী নেতাজির মতো আদর্শবান, সৎ, নীতিনিষ্ঠ নেতাদের দেখতে পাব, যাঁরা সত্যি সত্যি স্বপ্ন দেখবেন বৈষম্যহীন সমাজের, জাগিয়ে তুলবেন নিদ্রিত ভারতের শ্রমজীবী মানুষকে! কখনও কি এমন দেশ দেখে যেতে পারব, যেখানে সব মানুষ দু'বেলা দুমুঠো খেতে পায়, ছেলেমেয়েকে পড়াতে পারে, চিকিৎসা পায়, মাথার উপর ছাদ পায়!

জানি না। তবে আশা ছাড়িনি। অন্ধকার কেটে সূর্যোদয় হবেই হবে।

ফের এবারের শারদীয়ার কথায় আসি। এবারের বিশেষত্ব কী? হ্যাঁ, এবারেও গল্প উপন্যাস ভ্রমণ নিবন্ধ কমিকস সংখ্যায় ও বৈচিত্র্যে সবচেয়ে বেশি। তবে প্রধান বিশেষত্ব হল, বিশিষ্টদের পাশাপাশি বেশ কিছু নবীন প্রতিভা রয়েছেন এই শারদীয়ায়। নিজেদের লেখার গুণেই তাঁরা স্থান পেয়েছেন। তোমাদের কাছে একান্ত অনুরোধ, যাঁদের গল্প কবিতা তোমাদের ভালো লেগেছে, তা যেমন জানাবে, তেমনই যে যে লেখা ভালো লাগেনি, সে কথাও নিঃসংকোচে জানাবে। ভবিষ্যতের জন্য আমরা কিশোর ভারতীতে নতুন রক্ত সঞ্চারিত করতে চাই।

আজ আর বেশি কথা নয়। আকাশে আবার তুলো মেঘেরা এসে গেছে, শিউলি পড়ছে বাগানে, কাশেরা হাওয়ায় দুলছে, শোনা যাচ্ছে ধামসা মাদল ঢাকের বাজনা। আবার স্বমহিমায় ফিরছে আমাদের প্রাণের উৎসব—ইউনেসকো-র দ্বারা সম্মানিত দুর্গাপুজো।

ভালো থেকো সকলে, ভালো রেখো অন্যদের। আমাদের প্রাণময় ভালোবাসা নিও। থাকছি তোমাদের নিরপেক্ষ মতামতের আশায়।

ছবিঃ ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

নফরগঞ্জের রাজবাড়ি

ওরে বাবা, এ যে দেখছি বেজায় পুরোনো বাড়ি! তার ওপর এমন পেল্লায়! তা মশাই, এ বাড়িতে ভূতটুত নেই তো?

পুরোনো বলতে পুরোনো! গাছপাথর নেই মশাই! এই বাড়ির বয়স আড়াইশো বছরের কাছাকাছি। কতবার মেরামতি হয়েছে তার হিসেব নেই। এখন দেখলে তেমন ভক্তিছেদ্দা হয় না বটে, কিন্তু এ বাড়ির একসময়ে চোখ ট্যারা করে দেওয়ার মতো কেতা ছিল। নবৎখানায় বেহানবেলায় পোঁ করে সানাই বাজত রোজ। দেড়শো গরু, সত্তরটা ঘোড়া, এগারোটা হাতি, শ খানেক হরিণ, দশটা শিকারি কুকুর, জুড়ি গাড়ি, মোটরগাড়ি, পালকি, দাসদাসী, নায়েব গোমস্তা, গোলাপজল, আতর, ঝাড়লণ্ঠন, দোলদুর্গোৎসব, দানধ্যান, যাত্রা থিয়েটার, লাঠিখেলা, সড়কিখেলা, ফুটবল, কুস্তি, জলসা, কী ছিল না বলুন! আর ভূতের কথা কী যেন বলছিলেন!

না, এই বলছিলাম, আমার তো বেজায় ভূতের ভয় কিনা। তা এই পুরোনো বাড়িতে আবার ভূতটুত আছে নাকি?

বলেন কি মশাই! যে পুরোনো বাড়িতে ভূত নেই সেই পুরোনো বাড়ির মহিমাই বা কি! পুরোনো বাড়ির অলঙ্কার কি জানেন? সোঁদাসোঁদা গন্ধ, গা-ছমছমে ঝিঁঝি ডাক, নিশির ডাকের মতো নিস্তব্ধতা, বাতাসের হু-হু, জানালা দরজার আলগা কপাটের শব্দ, দেয়ালঘড়ির আচমকা ঠং, আর ভূতভূত ভাব। সবই এখানে পাবেন।

এ বাড়িতে পা দিয়েই ভূতভূত ভাবটা বেশ টের পেয়েছি মশাই। তা ভূতভূত ভাবটা মন্দ নয়, কিন্তু আসল ভূত না থাকলেই হল।

বলেন কি মশাই, শুধু ভূতভূত ভাব থাকলেই কি চলে? আসল ভূত না থাকলে কি নফরগঞ্জের রাজবাড়িকে মানায়!

তবে কি এবাড়িতে সত্যিকারের ভূতও আছে নাকি মশাই?

নেই মানে? এ হল ভূতের হাট। গায়েগায়ে গাঁটেগাঁটে গিজগিজ করছে গাদ গাদা ভূত। গত বাহান্ন বছরে আমি তো গুনেগুনে শেষ করতে পারিনি মশাই। ভূতেভূতে ধুল পরিমাণ।

সর্বনাশ! এত ভূত! তাহলে তো বড্ড মুশকিল হল মশাই!

আরে না। মুশকিল কিসের? ভূত কম হলেই বরং মুশকিল, ভয় ভয় ভাবটা বেশি করে চেপে ধরে। কিন্তু অতি ভূতে আর ভয়ডর থাকবার কথা নয়। সমুদ্রে শয়ান যার শিশিরে কি ভয় তার?

হুঁ, কথাটা মন্দ বলেননি মশাই। অতিভূতে ব্যাপারটা মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে দাঁড়াচ্ছে!

এই তো, জলের মতো বুঝতে পেরেছেন। অতি সন্ন্যাসীতে যেমন গাজন নষ্ট, তেমনি অতি ভূতে ভয় গায়েব।

আজ্ঞে, শুনে বড় আশ্বস্ত হলাম। এখন আর ভয়টা তেমন হচ্ছে না কিন্তু।

তাই তো বলছি, ভয়টা কিসের! এই আপনার আমার মতোই তো দেখতে, দিব্যি ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছেন, খাচ্ছেন দাচ্ছেন, গল্পসল্প করছেন,

ঝগড়াঝাঁটিও লেগে যাচ্ছে, ভূত বলে মনেই হবে না।

বলেন কী মশাই! একেবারে আমাদের মতো? তাহলে যে গন্ডগোল লেগে যাবে! ভূতকে ভূত আর মানুষকে মানুষ বলে চেনা যাবে কী করে?

চেনাচিনির দরকারটা কি মশাই? আপনি আপনার মতো থাকবেন, ওঁরা ওঁদের মতো। যা হচ্ছে হোক। সবদিকে অত নজর দেওয়ার প্রয়োজন কি আপনার? ওই যে দেখুন না, ঠাকুর দালানে যে বিধবা মহিলা একগলা ঘোমটা টেনে উবু হয়ে বসে শিলনোড়ায় বাসকপাতা থেঁতো করছেন, বিশ্বাস করবেন না, উনি বাহান্ন বছর আগেই গত হয়েছেন। আবার স্বচক্ষেই দেখুন, ছাদের ওপর যে রাজাগজা চেহারার মানুষটি এই ভরদুপুরে ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন ওঁকে আপনার মানুষ বলেই মনে হবে বটে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়, উনি একশো সাতষট্টি বছর আগেই ফৌত হয়েছেন, নাম কিঙ্কর সিংহরায়। ওই ঘুড়ি ওড়াতে গিয়েই ছাদ থেকে পড়ে মারা যান।

ওরে বাবা! কিন্তু মশাই, এ তো বড় অনিয়ম হচ্ছে! এই দিনেদুপুরে তো ভূতেদের দেখা দেওয়ার কথা নয়! সব জিনিসেরই একটা নিয়ম থাকবে তো! শুনেছি অন্ধকার নাহলে তাঁদের ফলিত হওয়ার সুবিধে হয় না! তা এ তো ভারি বেআইনি কাজকারবার দেখছি!

আজ্ঞে, সে আর বলতে! এঁদের আস্পদ্দা গগনচুম্বী। আমাদের কামাখ্যা ঠাকুরমশাইও বলেন, শাস্ত্রের নিয়ম হল ভূতেরা দিনের বেলায় ঘুমোবে আর রাতে জেগে থেকে তাদের বিষয়কর্ম করবে। কিন্তু এনারা শাস্ত্রটাস্ত্র বিশেষ মানার পাত্রই নন। ঠাকুরমশাই তাই দুঃখ করে বলেন, কলিযুগে শাস্ত্রটাস্ত্র কেউ মানতে চায় না, মহাপ্রলয় তাই এল বলে।

কামাখ্যা ঠাকুরমশাই ঠিকই বলেছেন। তিনি দেখছি একজন বিজ্ঞ লোক! এবাড়ির ভূতেদের আমি মোটেই প্রশংসা করতে পারছি না। এরকম উল্টোপাল্টা চলন হলে যে ভারি বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে মশাই! এরকম চললে তো বলা যায় না, এখানে দিনে জ্যোৎস্না ফুটবে আর রাতে রোদ্দুর!

যথার্থই বলেছেন! তাই বলছিলাম, ওঁদের দিকে বেশি খেয়াল না করাই ভালো। এঁদের কাণ্ডকারখানা নিয়ে ভাবতে বসলে সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করা হবে। আমরা তো ওঁদের পারতপক্ষে ঘাঁটাই না।

কিন্তু মশাই, আমাকে যে এখানে চারদিকে নজর রাখার জন্যই পাঠানো হয়েছে! কালোবাবু পই পই করে বলে দিয়েছেন, নফরগঞ্জের রাজবাড়িতে অনেক ঘটনা ঘটছে বলে খবর পাচ্ছি, তুমি গিয়ে চারদিকে নজর রাখবে তো বাপু! কী হচ্ছে, কেন হচ্ছে, কী করে হচ্ছে, কার জন্য হচ্ছে এসবই তাঁকে আমার জানানোর কথা।

সর্বনাশ! আপনি কি গোয়েন্দা নাকি মশাই? নাকি আড়কাঠি? কিন্তু আপনি কালোবাবুর যে হাতচিঠিটা আমাকে দিলেন তাতে তো লেখা, আপনি এখানে কদিন হাওয়াবদল করতে এসেছেন!

আহা, ওসব লিখতে হয়। আমি যে গোয়েন্দা, তা জানাজানি হয়ে গেলে সবাই সাবধান হয়ে যাবে যে!

ওরে বাবা, আপনি যে এত সাংঘাতিক লোক তা তো বুঝতে পারিনি! আমি তো আপনাকে একজন ভদ্রলোক বলেই ধরে নিয়েছিলাম।

আহা, গোয়েন্দাদের ভদ্রলোক হতে বাধা কি?

বলছেন কী? ভদ্রলোক কখনও গোয়েন্দা হয় নাকি? কী জানি বাপু, আমরা তো গোয়েন্দা টোয়েন্দা বিশেষ দেখিনি কিনা! তারা কি ভালো লোক?

তা তারা বিশেষ মন্দ লোকও নয়।

তা যাই বলুন, আপনাকে দেখে কিন্তু গোয়েন্দা বলে মনেই হয় না। আড়ে-দিঘে আপনি বেশ কমা আছেন বলেই তো মনে হচ্ছে! তাগড়াই চেহারা নাহলে কি গোয়েন্দাকে মানায়! তার ওপর আপনার আবার ভূতের ভয়।

আহা, ওখানেই তো আসল প্যাঁচটা কিনা। গোয়েন্দাকে গোয়েন্দা বলে চেনা গেলে যে কেলেঙ্কারি! পাঁচজনের চোখে ধুলো দিতে গেলে দশাসই চেহারাটা কিন্তু মোটেই কোনও কাজের কথা নয়।

তা অবিশ্যি ঠিক। গোয়েন্দাকে গোয়েন্দা বলে চেনা গেলে সে আবার কেমন গোয়েন্দা! তা আপনি এখানে কাকে ধরতে এসেছেন বলুন তো? যষ্ঠীগুন্ডা নাকি সাতকড়ি ডাকাতকে? তাছাড়া গেনুচোর, পীতাম্বরখুনিয়া, হরিপদঠগী, রামভরোসাকালাবাজারী, সুপারিকিলার বদন মন্ডল, লেঠেল হাপিসমিয়া, চাক্কুচারু, কানাকালু, ঠ্যাঙারে গগন... এখানে সমাজবিরোধীর কোনও অভাব নেই।

বলেন কী! নফরগঞ্জে এত সমাজবিরোধী!

নফরগঞ্জের নামডাক কি আর এমনি এমনি মশাই? বাইরের মানুষ তো নফরগঞ্জের ত্রিসীমানাও মাড়ায় না! ধরুন গোবিন্দপুর থেকে তেঁতুলতলা যেতে এই নফরগঞ্জের ভিতর দিয়ে গেলে অন্তত বারো মাইল রাস্তা শর্টকাট হয়। তবু লোকে সেই আকন্দপুর-বেতলা হয়ে ঘুরপথে যায়, শুধু এই নফরগঞ্জের ছায়া মাড়াবে না বলে। হিসেব করলে বছর দুই বাদে আপনিই প্রথম বাইরের লোক যিনি নফরগঞ্জে সাহস করে এলেন। আপনার বুকের পাটা আছে বটে, স্বীকার না করে উপায় নেই।

বলেন কি মশাই! তাহলে কি আমি না জেনে শুনে সাপের লেজে পা দিয়ে ফেলেছি? তাহলে কি আমার ধুলোপায়েই নফরগঞ্জ থেকে পাততাড়ি গোটানো উচিত?

সেই প্রস্তাব মন্দ নয় বটে! কিন্তু এখানে আসা যত সহজ, বেরোনো বোধহয় তত সহজ নয়। এখানে কে আসে আর কে যায় সব নজর রাখা হয় কিনা। তার ওপর আপনি আবার গোয়েন্দা!

আহা, গোয়েন্দা আবার কিসের! গোয়েন্দা টোয়েন্দা নই মশাই, এই একটু খোঁজখবর করতে আসা আর কি! ধরে নিন, সকলের সঙ্গে একটু ভাবসাব করতেই আগমন!

আজ্ঞে সে তো ঠিক কথাই, তবে কিনা এদিককার লোকেরা বাইরের লোকেদের সঙ্গে ভাবসাব করতে মোটেই রাজি নয়। বাইরের লোকজন তারা বিশেষ পছন্দ করে না কিনা! তাছাড়া এই রাজবাড়ির ওপর তাদের কড়া নজর। প্রায় রোজই সমাজবিরোধীদের কেউ না কেউ এসে হানা দেয়। চারদিক ঘুরে দেখে যায়।

কেন বলুন তো? কোন মতলবে তারা এসে এখানে হানা দেয়?

আজ্ঞে মতলব আন্দাজ করা কঠিন। যা সব দামি অদামি জিনিসপত্র ছিল তা তো কবেই লুটপাট হয়ে গেছে। এখন রাজবাড়িতে লুটপাট করার মতো কিছু নেইও। তবু অভ্যাসের বশে তারা এখনও আসে, চারদিকে গুল্লুগুল্লু করে চেয়ে দেখে, কিছু অবশিষ্ট কোথাও পড়ে আছে কিনা! আমাদের ওপর নানা হুকুম করে। গা হাত পা টেপায়, পিঠ চুলকোতে বলে, তাদের জন্য গাছ থেকে ডাব পেড়ে দিতে হয়। আরও দুঃখের কথা শুনবেন— আমরা যে সামান্য বেতন পাই তা থেকেও তাদের ভাগ দিতে হয়।

না না, এ তো ভীষণ বেআইনি ব্যাপার! তোলাবাজি তো খুব খারাপ। এখানে থানাপুলিশ নেই?

তা থাকবে না কেন! থানা মাত্র তিন মাইল দূরে। দারোগাবাবুটিও ভারি ভালো, সকালবেলা তিন ঘণ্টা ধরে পুজোআচ্চা করেন। তাই সকালের জলখাবার খেতে খেতে বেলা বারোটা বেজে যায়, সেইজন্যই দুপুরের ভাত খেতে তাঁর তিনটে বাজবেই, গুরুভোজনের পর একটু গড়াগড়ি খেতে হবে না? একেবারে বিকেলের চা জলখাবার খেয়ে সান্ধ্যভ্রমণ সেরে থানায় হাজিরা দিতে দিতে সেই সন্ধে সাতটা সাড়ে সাতটা হয়েই যায়। তারপর সেপাইরা একে একে হাজিরা দিতে আসে। আর আপনি তো নিশ্চয়ই জানেন যে গাঁয়েগঞ্জে সাতটা সাড়ে সাতটা মানে প্রায় নিশুত রাত, কাজেই তেমন কাজকর্ম হওয়ার জো নেই! তবে মদন দারোগার কড়া হুকুম জারি করা আছে, কেউ যেন কোনও অপরাধমূলক কাজ না করে, সবাই যেন সৎপথে চলে, এলাকার শান্তি যেন বজায় থাকে।

তাতে কি কাজ হয় মশাই?

তা হবে না কেন? যারা নিরীহ মানুষ, সাতেপাঁচে থাকে না, গোবেচারা, তাদের ওপর ভারি ভালো কাজ হয়। আর চোরডাকাত, গুন্ডাবদমাশদেরও

বলে দেওয়া আছে, যে যা খুশি করলেই হবে না, তার জন্য সরকারের পাওনাগন্ডা মিটিয়ে দিতে হবে। আর এখানে সরকার বলতে দারোগাবাবু ছাড়া আর কে আছে বলুন! তাই সমাজবিরোধীরা দুষ্কর্ম করার আগে তাঁকেই পাওনাগন্ডা মিটিয়ে দিয়ে আসে।

এ তো দেখছি ভারি অব্যবস্থা!

তাই বলছিলাম, এখানে হাওয়াবদল করতে এসেছেন বটে। কিন্তু এখানকার হাওয়াবাতাস স্বাস্থ্যের পক্ষে তেমন সুবিধের নয়। তবে আপনি গোয়েন্দা মানুষ, আপনার কথা আলাদা। আপনি হয়তো নফরগঞ্জের হাওয়াবাতাস বদলেও দিতে পারেন।

আরে না না, হাওয়াবাতাস বদলে দেওয়ার আমি কে! ওসব আমার কাজ নয় মোটেই! এখানে আমার থাকবার কোনও ইচ্ছেই হচ্ছে না মশাই! কালই আমি বিদেয় হচ্ছি। সকালের বাসটা যেন কখন ছাড়ে?

আজ্ঞে, বাস ধরতে সেই মুকুন্দপুর যেতে হবে, মাইল তিনেকের পথ। রাত থাকতে থাকতে বেরিয়ে পড়লে সকাল সাড়ে ছটার বাসটা পেয়ে যাবেন মনে হয়। তার পরের বাস সেই বেলা পৌনে চারটেয়।

না না, ওই সকালের বাসটাই ভালো। অন্ধকার থাকতে থাকতে বেরিয়ে পড়তে পারলে বাঁচোয়া। কী বলেন?

আজ্ঞে, আমিও তাই বলি। এই যে, এই কাছারি ঘরটাতেই আপনার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে, কালিবাবু। ঘরটা বেশ বড়সড় আছে। মোট বারোখানা জানালা। দিব্যি হাওয়াবাতাস খেলা করে। ওই পিছনদিকটায় টিপকল আছে। যান, জামাকাপড় পাল্টে আরাম করে বসুন গিয়ে, আমি মনার মাকে দিয়ে আপনার জলখাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি। নারকোল কোরা দিয়ে মুড়ি। চলবে তো?

এখন গলা দিয়ে কিছু নামবে বলে তো মনে হয় না, লালুবাবু। একটু আগেই বেশ খিদে ছিল, কিন্তু খিদেটা হঠাৎ করে হাওয়া হয়ে গেছে দেখছি। বরং একঘটি জল গলায় ঢাললে হয়।

সেইটাই ভালো। এখন বেলা প্রায় এগারোটা বাজতে চলল, এই অবেলায় আর জলখাবারের দরকার নেই। বরং একেবারে দুপুরে ভাত খেয়ে নেবেন খন।

ভাতই কি আর মুখে রুচবে?

তাও বটে। তার ওপর আজ আবার আমাদের কচুর শাক আর ডাল ছাড়া কিছুই হয়নি কিনা। কোনও কোনও দিন একটু আধটু চুনোপুঁটি মাছ জোটে বটে, কিন্তু বেশিরভাগ দিনই আমাদের ওই কচুঘেঁচু খেয়েই থাকতে হয়।

তাহলে তো আপনারা বেশ কষ্টেই আছেন!

না, কষ্ট আর কিসের। ওসব আমাদের সয়ে গেছে। আপনি গোয়েন্দা মানুষ, আপনার হয়তো একটু কষ্ট হবে।

আহা, ওরকম উঁচু গলায় বারবার গোয়েন্দা গোয়েন্দা বলার দরকার কি! কথাটা চাউর হওয়া কি ভালো? গোয়েন্দাগিরি করার আর কোনও ইচ্ছেই হচ্ছে না আমার।

যে আজ্ঞে, এখানে গোয়েন্দা টোয়েন্দার বিশেষ আনাগোনা নেই কিনা। গাঁয়ে গোয়েন্দা এসেছে শুনলে কে আবার কী ভাববে! গোয়েন্দার নামে ভয়ও পেয়ে যেতে পারে। আর ভয় পেলে মানুষ উল্টোপাল্টা কাজও কি করে ফেলতে পারে না! ধরুন রাত্রিবেলা জানালা টপকে ঘরে একটা গোখরো সাপ ছেড়ে দিয়ে গেল, কিংবা একটা হাতবোমা টপকে দিল, নাহয় তো হাঁসুয়া দিয়ে—যাকগে, ওসব অলক্ষুণে কথার দরকার নেই। আপনাকে বড্ড কাহিল দেখাচ্ছে, অনেকটা পথ এসেছেন তো! মনার মাকে বরং বলে রাখি দুপুরে আপনার জন্য বলকারক কিছু রান্নাবান্না করতে। তাতে শরীরে খানিক জোর বল পাবেন।

কালিনাথ শুকনো গলায় বলে, জোর বল পাওয়াটাই এখন বড্ড দরকার মশাই।

ঘরে ঢুকে কালিনাথ দেখল, ঘরখানা বেশ বড়সড়। একখানা মস্ত নিচু চৌকি, তাতে শতরঞ্চি পাতা, গোটা চারেক তাকিয়াও রয়েছে। কাছারিঘর এরকমই হয়ে থাকে বটে। গোটা চারেক কাঠের পুরোনো চেয়ার আর একটা টেবিলও আছে। ব্যবস্থা মন্দ নয়। থাকতে পারলে ভালোই হত, কিন্তু প্রাণ জিনিসটা তো আর সস্তা নয়! একবার গেলে কি তা আর ফেরত পাওয়া যাবে! টেবিলে একটা পরিষ্কার ঝকঝকে পেতলের ঢাকা দেওয়া ঘটিতে ঠান্ডা জল পেয়ে ঢকঢক করে অনেকটা জল খেল সে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সন্তর্পণে চৌকিটায় বসল। বুকের ভিতরটায় বড্ড ধুকপুক করছে।

হঠাৎ তাকে চমকে দিয়ে ময়লা হেঁটো ধুতি আর ছেঁড়া গেঞ্জি পরা, গ্যালগ্যালে হাসি আর বিগলিত মুখ নিয়ে রোগামতো একটা লোক হাত কচলাতে কচলাতে ঘরে ঢুকে বলল, আজ্ঞে, গোয়েন্দাবাবু এয়েছেন শুনে চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করতে এলুম। গাঁয়ে যে একেবারে সোরগোল পড়ে গিয়েছে। গঞ্জ থেকে পিস্তল বন্দুক নিয়ে এক মস্ত গোয়েন্দা এয়েছেন শুনে সকলে তো থরহরি। তা বাবু, দিন তো পাজিগুলোকে টিট করে!

কালিনাথ আঁতকে উঠে বলে, কে বলেছে আমি গোয়েন্দা! আমি গোয়েন্দা টোয়েন্দা নই মশাই, আপনি ভুল শুনেছেন!

লোকটা আরও বিগলিত হয়ে বলে, তা বললে শুনব কেন? ও আমরা মানুষ দেখলেই চিনতে পারি। আপনার গা থেকে যে গোয়েন্দা গোয়েন্দা গন্ধ ছাড়ছে! কেন ছলনা করছেন বাবুমশাই? জগুর মা তো বলছিল, কী বাঘা চোখ, কী মশমশ করে হাঁটার কেতা, কী টাইট চেহারা! দেখলেই মনে হয় হোমরাচোমরা লোক! ও আপনি যতই লুকোনোর চেষ্টা করুন না কেন, বুঝে ফেলতে কারও বাকি নেই।

কালিনাথ কাঁদোকাঁদো হয়ে বলে, সবাই জেনে গেছে বুঝি?

তা জানবে না? কতকাল পরে নফরগঞ্জে একজন ডাকসাইটে লোক এল। তাই হাওয়াবাতাসে লহমায় খবর ছড়িয়ে পড়েছে কিনা!

কালিনাথের মুখ দিয়ে আপনা থেকেই একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল, ওরে বাবা!

লোকটা হঠাৎ মুখের হাসিটা গিলে ফেলে গম্ভীর মুখে বলে, এবার ধনেশ মন্ডল বুঝবে কত ধানে কত চাল! ধর্মের কল যে সত্যিই বাতাসে নড়ে তা এতদিনে বুঝলুম। কিছু না মশাই, চারটি পান্তাভাত খাব বলে গাছ থেকে একটা কাগজি লেবু ছিঁড়েছি, তার জন্য খেজুর গাছের সঙ্গে বেঁধে কি মারটাই না মারল আমাকে! আর ওই যে ম্যানেজার লালু বৈরাগী, ওটিও কম যন্তর নয়, এই বলে দিলুম। বাড়ি ঝাড়পোঁছ করতে গিয়ে মোটে একশো টাকার দুখানা ন্যাতানো নোট কুড়িয়ে পেয়েছিলুম। মাইরি বলছি, মা কালীর দিব্যি, চুরিটুরি নয়। কিন্তু শুনছে কে? লালু বৈরাগী চুরির দায়ে তিন দিনের জন্য আমার অন্নজল বন্ধ করে দিয়েছিল। তারপর মদন বৈষ্ণবের কথাই ধরুন, রামনবমীর দিন আমাকে ডেকে বেশ মিষ্টি করে বলল, ওরে গোবিন্দ, হনুমান সাজবি? ভারি মজা হবে তাহলে! তোকে মানাবেও ভালো। তা নতুন কিছু হবে ভেবে আমিও রাজি হয়েছি। ওর পেটে পেটে যে এত শয়তানি তা আমি ভালোমানুষের পো জানব কী করে বলুন! রংটং মাখিয়ে আমাকে তো হনুমান সাজানো হল, খড় দিয়ে লম্বা লেজ বানিয়ে কোঁচায় গুঁজেও দিল ভালো করে। কিন্তু আমি কী করে জানব বলুন যে লেজের মধ্যে ঠেসে কালিপটকা বেঁধে দিয়েছে! তারপর সে কি হুলুস্থুলুস কাণ্ড মশাই। দুমদাম করে কালিপটকা ফাটছে আর দাউদাউ করে আমার লেজ জ্বলছে। লেজের আগুনে আমার মরার দশা। শেষে পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণরক্ষে হয়। এসব অন্যায় আর অবিচারের একটা বিলিব্যবস্থা করে দেন তো গোয়েন্দাসাহেব।

কালিনাথ একটু দিশেহারা হয়ে বলে, কিন্তু এতে আমার কী করার আছে বলুন! এসব মীমাংসা করার আমি কে?

বলেন কি বাবু, আপনি হলেন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা! স্বয়ং কালোবাবুর লোক! আপনিই তো আমাদের আইন-আদালত! একটা হাঁকার মারলে সবাই কাঁপতে কাঁপতে এসে আপনার সামনে গড়াগড়ি যাবে যে! আমার নামটা দয়া করে মনে রাখবেন। আমি হলুম গে গোবিন্দ মাঝি। গত ত্রিশ বছর ধরে এ বাড়িতে ঝাড়পোঁছ করি। ওদিকে কাজের দেরি হয়ে যাচ্ছে, আসি তাহলে! দণ্ডবৎ হই।

গোবিন্দ বিদেয় হতে না হতে সাদা থান পরা একগলা ঘোমটা টানা এক মহিলা ঘরে ঢুকেই খড়খড়ে গলায় বলল, বলি বাছা, তুমি পুলিশ না মিলিটারি কোনটা বলো তো? গজানন বলছে তুমি নাকি পুলিশের চাঁই, আর গদাই বলল তুমি নাকি আসলে মিলিটারি! যুদ্ধ করতে গিয়ে অনেক মানুষ মেরে এয়েছ।

কালিনাথ কাহিল গলায় বলল, যা খুশি ধরে নিন। আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি। কী কুক্ষণে যে নফরগঞ্জের মতো অলক্ষুণে জায়গায় আসতে গেলাম!

কেন বাছা, এখানে কে তোমাকে খিমচেছে, আর কেই বা তোমাকে কামড়ে দিয়েছে বলো তো, যে, নফরগঞ্জের কুচ্ছো গাইছ! জন্মের পর থেকে এই বাষট্টি বছর এই নফরগঞ্জের মাটি কামড়ে পড়ে আছি। কাশী বৃন্দাবন কোত্থাও গেলুম না। নফরগঞ্জ খারাপ জায়গা হলে আমরা আছি কী করে! তোমার দেখি বড্ড দেমাক! পুলিশই হও আর মিলিটারিই হও, বলি নফরগঞ্জের তুমি জানোটা কি? নিমাই ভশ্চায্যির নাম শুনেছ? এমন কথকতা গাইত যে, লোকে কেঁদে হাপুস হত। পাষণ্ড দারোগা নবকৃষ্ণের চোখেও জল দেখেছে লোকে! কত রাজাগজার আসর থেকে তার ডাক আসত। সেই নিমাই ভশ্চায্যি হল এই নফরগঞ্জের মানুষ। তারপর জগাই পালের কথাই ধরো। তার কথা যাকে জিজ্ঞেস করবে, সেই কপালে হাত ঠেকাবে। এক আসনে বসে তিন সের খাসীর মাংস আর আশিখানা লুচি খেয়ে উঠত সে। লোকে ধন্যিধন্যি করত। সেও এই নফরগঞ্জের ভূমিপুত্তুর।

আরও শুনবে? রমেশ ঘোষের কথা তো বলাই হয়নি! তাকে দশটা গাঁয়ের লোক চিনত সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি বলে। কত মরা মানুষ বাঁচিয়েছে তার লেখাজোকা নেই। নগেন সাঁই বিয়াল্লিশ বছর বয়সে ধাঁ করে মারা যাওয়ায় তার কচি বৌটার কি আছাড়িপিছাড়ি কান্না। তাই দেখে শ্মশানযাত্রীদের পথ আটকে রমেশ ঘোষ মড়া নামাতে বলল। তারপর একটা পুরিয়া মুখে ঢেলে দিয়ে তিন ঘণ্টা নাড়ি ধরে বসে রইল। লোকে স্বচক্ষে দেখেছে, ভোর হওয়ার আগেই নগেন সাঁইয়ের মড়া ধড়মড় করে উঠে বসে রমেশ ঘোষের পায়ের ধুলো নিয়ে দুহাত তুলে নৃত্য করতে করতে বাড়ি ফিরেছে। শুধু কি তাই? নফরগঞ্জের হরিহর সাপুইয়ের মাচায় যে ছয় হাত লম্বা লাউ ফলেছিল তার ছবি খবরের কাগজে অবধি বেরোয়। আরও শুনবে? শ্রীপদ অধিকারী যে বগি থালার সাইজের অমৃতি ভেজে মেডেল পেয়েছিল, তা জানো? নফরগঞ্জের তুমি তো এখনও কিছুই জানো না দেখছি!

কালিনাথ আমতা আমতা করে বলল, আজ্ঞে, তাই বটে। সদ্য এসেছি তো! নফরগঞ্জ যে এত বিখ্যাত জায়গা সেটা জানা ছিল না।

আমাকে একটু চিনে রাখো বাপু। আমি হলুম গে এ বাড়ির মশলা পেষাইয়ের লোক। নাম তারাময়ী। বুঝলে?

যে আজ্ঞে। বলে কালিনাথ ঘাড় কাত করল।

কালিনাথের কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছিল, এই মহিলাকেই সে একটু আগে ঠাকুরদালানে বসে বাসকপাতা থেঁতো করতে দেখেছে। ইনি নাও হতে পারেন, আবার হতেও পারেন। লালু বৈরাগী জলজিয়ন্ত মানুষটাকেই ভূত বলে চালানোর চেষ্টা করেনি তো?

একটু বাদেই আর একজন লোক এসে হাজির। বেশ লম্বাচওড়া চেহারা, গায়ে একটা স্যান্ডো গেঞ্জি আর পরনে হাফ প্যান্ট। একটা লাল গামছা দিয়ে গলা আর ঘাড়ের ঘাম মুছতে মুছতে দরজা দিয়ে ঢুকেই বাজখাঁই গলায় বলল, কী মশাই, আপনি নাকি আমাদের ওপর নজর রাখার জন্য এসেছেন?

কালিনাথ জিভ কেটে, মাথা নাড়া দিয়ে বলে, আরে ছিঃ ছিঃ, ওই একটু ঠাট্টা করে কী বলতে কী বলে ফেলেছি, ওটা ধরবেন না। আমি আসলে সবে ন্যাবায় ভুগে উঠেছি তো, তাই শরীরটা সারাতে আসা।

লোকটা গম্ভীর গলায় বলে, কিন্তু এবাড়ির সবার ওপর নজর রাখাটাও যে দরকার। এবাড়িতে কিন্তু অনেক ঘটনাই ঘটছে! সবে এসেছেন, এখনই আপনাকে ওসব বলে চিন্তায় ফেলতে চাই না। থাকলেই বুঝতে পারবেন, নফরগঞ্জের রাজবাড়ি বড় সোজা জায়গা নয়! তলায় তলায় নানারকম সাঁট চলছে।

কালিনাথ তটস্থ হয়ে বলে, সাঁট চলছে! তাহলে কি এখানে কোনও বিপদের ভয় আছে নাকি মশাই?

তা আবার নেই? থাকলেই বুঝবেন। আপনার মতো একজন শক্তপোক্ত লোককেই এখন দরকার। চারদিকে চোখ রাখবেন মশাই, কেউ সন্দেহের বাইরে নয়! কাউকে বেশি বিশ্বাস করে ফেলবেন না যেন! এমন কি আমাকেও নয়।

শঙ্কিত কালিনাথ উদ্বেগের গলায় বলে উঠল, এখানে কী হচ্ছে বলুন তো? শুনে আমার যে বড্ড ভয় ভয় করছে!

হাসালেন মশাই। আপনার আবার ভয়ডর! কী যে বলেন! তবে হ্যাঁ, লোকদেখানো ভয় ভয় ভাবটা বজায় রাখা ভালো, তাতে কাজের সুবিধেই হবে। এখন যাই, চানটা করে আসি। এতক্ষণ ছাদে ঘুড়ি ওড়াচ্ছিলাম তো, শরীরটা বড্ড তেতে আছে। পরে কথা হবেখন।

তাহলে এই লোকটাই ছাদে ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল! লালু বৈরাগী কি একেই ভূত বলে চালানোর চেষ্টা করেছে?

লোকটা বিদেয় হলে কালিনাথ মনে মনে ঠিক করে ফেলল, এখানে আর কালবিলম্ব করাটা উচিত হবে না। বেলা মোটে সোয়া এগারোটা বাজে। এখনই রওনা দিলে আজই সে পৌনে চারটের বাসটা ধরে ফেলতে পারবে। এই ভেবে সে উঠে পড়ল। গোছগাছ করার দরকার নেই, সুটকেস গোছানোই আছে। রওনা হয়ে পড়লেই হয়।

উঠে দাঁড়িয়ে সুটকেসটা সবে বাগিয়ে ধরেছে, ঠিক এইসময়ে সাদা দাড়িওয়ালা একজন বুড়োমানুষ একটা গটিওয়ালা লাঠি ঠকঠক করে ঠুকতে ঠুকতে ঘরে ঢুকেই চেঁচামেচি জুড়ে দিলেন, ওরে কোথায় রে তোদের গোয়েন্দা? কোথায় সে? আমি তো ঘরে কাউকে দেখতে পাচ্ছি না! সে কি হাওয়া হল নাকি?

বাইরে থেকে কে যেন বলল, আরে না, হাওয়া হবে কী করে? আমরা নজর রাখছি না! চশমাটা চোখে এঁটে নিয়ে ঠাহর করে দেখুন, ঘরেই আছে।

বুড়োমানুষটি তাড়াতাড়ি তাঁর গেরুয়ারঙা ফতুয়ার ঝুলপকেট থেকে একটা আতসকাচের মতো মোটা কাচওয়ালা চশমা বের করে চোখে পরে নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, এই কি গোয়েন্দা নাকি?

কালিনাথ ফ্যাসফ্যাসে গলায় ভারি বিনয়ের সঙ্গে বলে, আজ্ঞে, আমি গোয়েন্দা টোয়েন্দা নই খুড়োমশাই।

বুড়ো তারস্বরে বলে ওঠেন, তা বললে হবে কেন? গোয়েন্দা আমি খুব চিনি। শার্লক হোমস, হারকুল পোয়রো, মিস মার্পল, কিরিটী, ব্যোমকেশ, ফেলুদা সব আমি গুলে খেয়েছি। আমি হলুম গে নফরগঞ্জের রাজবাড়ির লাইব্রেরিয়ান। দেখি বাপু, আমার কাছটিতে এসো তো, দেখি তুমি কেমন গোয়েন্দা।

এই বলে লোকটা আর একটা ঝুলপকেট থেকে একটা আতসকাচ বার করে ডানহাতে বাগিয়ে ধরে, বাঁহাতে কালিনাথের থুঁতনিটা ওপরে তুলে মুখখানা বেশ অনেকক্ষণ ধরে নিরীক্ষণ করে বললেন, হুঁ হুঁ বাবা, আমার কাছে চালাকি নয়! এ তো নির্যস গোয়েন্দা বলেই মনে হচ্ছে! গোয়েন্দা না হয়ে যায় না! সেই মুখ, সেই চোখ, সেই বুদ্ধি, সেই প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সেই ডিডাকশনের প্রতিভা! না, এই লোক হান্ড্রেড পারসেন্ট গোয়েন্দা না হলে আমার নাম শৈলেন প্রামাণিকই নয়। ওহে বাপু, আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া কি অতই সোজা? তুমি গোয়েন্দা নও বললেই হবে? তোমার ঘাড় গোয়েন্দা!

কালিনাথ ভারি বেকায়দায় পড়ে হাঁপসানো গলায় বলে, এ তো বড় মুশকিল হল দেখছি!

বুড়োমানুষটি খ্যাঁক করে উঠল, বলি, মুশকিলের এখনও কিছু দেখেছ কি? এখানে গাছেগাছে মুশকিল ঝুলে থাকে, হাওয়ায় বাতাসে মুশকিল ঘুরে বেড়ায়, যেখানেই যাবে পিছু নেবে মুশকিল। এ হল মুশকিলের অকূলপাথার। থাকো, টের পাবে। আর ওই মুশকিলের আসান করতেই তো তোমার এখানে আসা বাপু! মুশকিলকে ভয় পেলে তো চলবে না হে!

কালিনাথ বিনীতভাবেই বলে, যে আজ্ঞে।

বুড়োমানুষটি বিদেয় হলে কালিনাথ হতাশ হয়ে ফের তক্তপোশে ধপ করে বসে পড়ল। সটকানোর চেষ্টা করে লাভ নেই। বাইরে তাকে পাহারা দেওয়ার জন্য লোক মোতায়েন আছে, একটু আগে স্বকর্ণেই শুনেছে সে। বড্ড কেচিকলেই পড়া গেল তো!

দুপুরে তাকে ভাত দিতে এল মনার মা। রোগাটে আর রগচটা চেহারা। পরনে লালপেড়ে সাদা খোলের শাড়ি, সিঁথিতে ডগডগে সিঁদুর। মুখখানা আঁশটে। হাতের ঢাকা দেওয়া থালাখানা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে বলল, দেখে নাও বাপু, এ খাবার তোমার রুচবে কিনা। তুমি নাকি বেজায় মান্যিগন্যি লোক! পান থেকে চুন খসলেই নাকি আমার চাকরি যাবে! আজ চল্লিশ বছর হতে চলল এ বাড়িতে কাজে লেগেছি, কেউ কখনও কোনও দোষ ধরতে পারেনি। এখন তুমি কোথা থেকে উড়ে এসে আমাদের মাথার ওপর জুড়ে বসলে বলো তো!

কালিনাথ তটস্থ হয়ে বলে, আজ্ঞে আমি কেওকেটা কেউ নই। আপনার চাকরি খাওয়ার সাধ্যই আমার নেই, বিশ্বাস করুন।

তবু বাপু, দেখে নাও, এ খাবার তোমার চলবে কিনা।

ঢাকা সরাতেই দেখা গেল, সাদা ফুরফুরে ভাত, মুড়মুড়ে আলুভাজা, মোচার ঘন্ট, বাটিতে ঝোলের মধ্যে দুটো পোনা মাছের টুকরো, ছোলার ডাল, চাটনি আর টক দই। কিন্তু লালু বৈরাগী তো বলেছিল, ডাল আর কচুর শাক!

আয়োজন দেখে কালিনাথ হাঁ। বলে, এ তো বিরাট আয়োজন!

মনার মা আঁশটে মুখেই বলে, তবু তো মাংস পোলাও নয়। পুলিশের লোকেরা নাকি তাই রোজ খায়!

আপনাকে কে বলেছে যে, আমি পুলিশ? আমি পুলিশটুলিস নই, আমি ভালো লোক।

ভালো হলে তো ভালোই। কিন্তু সবাই যে বলাবলি করছে, তুমি নাকি মস্ত গোয়েন্দা, বিরাট ক্ষ্যামতা। হাতে মাথা কাটতে পারো!

কালিনাথ জিভ কেটে বলে, আরে ছিঃ ছিঃ! আমার কোনও ক্ষমতা টমতা নেই। ওসব কথায় বিশ্বাস করবেন না।

ক্ষ্যামতাই যদি না থেকে থাকে তাহলে তোমাকে খাতির করার হুকুম হয়েছে কেন বাপু? ছদ্মবেশী রাজপুত্তুর টুত্তুর নও তো! ছিরি দেখে তো রাজপুত্তুর বলে মনে হয় না!

কালিনাথ হাল ছেড়ে দিল। কাল ভোররাতেই সে বেরিয়ে গিয়ে বাড়ি ফেরার গাড়ি ধরবে। কিশোর ভারতী
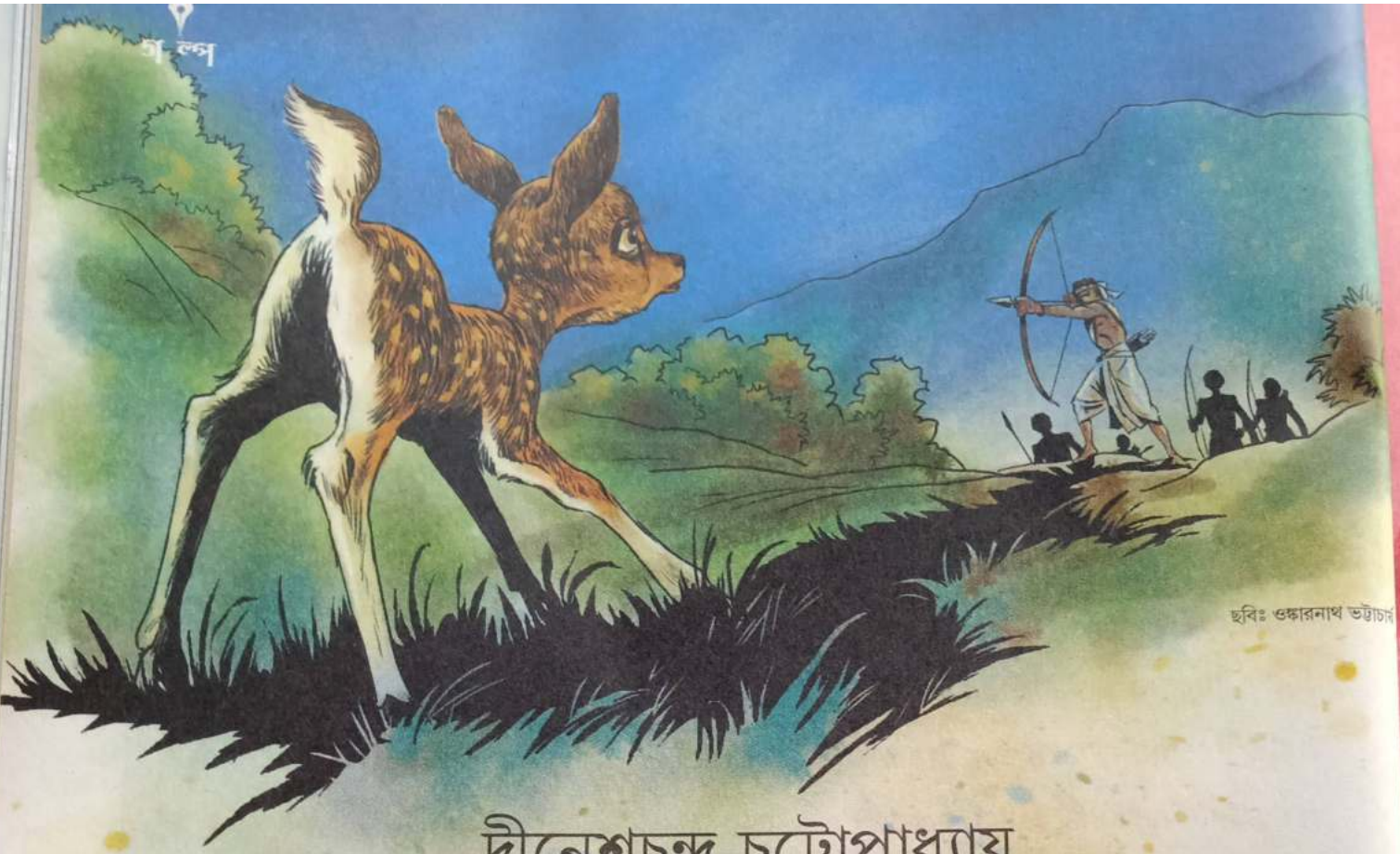
দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রথম কান্না

আজ সবাই কাঁদে। পৃথিবীতে আজ তাদের সংখ্যাই বোধ হয় বেশী, জীবনভোর যাদের কান্নাই সার।

কিন্তু এমন এক সময় ছিল—সে কোন আদ্যিকালে, কেউ বলতে পারে না—পৃথিবীতে যখন কান্না ছিল না। কেউ কাঁদতে জানতো না, কান্না কাকে বলে, তা-ও কেউ জানতো না। সবাই হাসতো, খেলতো সুখে দিন কাটাতো। পৃথিবীতে তখন ছিল শুধু আলো আর ফুল, হাসি আর আনন্দ।

তারপর হঠাৎ একদিন সবাই কেঁদে উঠলো—পশুপাখি কাঁদলো, মানুষও কাঁদলো। আর সেই দিন থেকে কান্না এল পৃথিবীতে, এল অশ্রুর বন্যা।

কেন? —বড় করুণ সে কাহিনী।

পাহাড়ে ঘেরা এক দেশ। চারিদিকে সবুজ পাহাড়ের সারি। পাহাড়ের কোলে বনের ছায়া, পাহাড়ের নীচে বনের মায়া। মাঝে মাঝে সবুজ মখমলের মতো নরম ঘাসে বিছানো মাঠ আর ঝরনার গান। সেখানে ফুল ফোটে। পাখি ডাকে। রামধনু-রঙের পাখা মেলে ফুলে ফুলে ওড়ে প্রজাপতি। সেথা দিনের বেলায় রেণুর মতো সোনালী আলো ছড়িয়ে পড়ে। আর রাতের বেলায় কে যেন তারার চাঁদোয়া টাঙায় উপরে। চাঁদনী জোছনায় আলোছায়া লুকোচুরি খেলে বনে আর মাঠে আর ঝরনার জলে।

মায়াময় সে এক স্বপনপুরী।

সেখানে বাস করে এক হরিণী—তার বাচ্চাটিকে নিয়ে। বড় সুখে সে থাকে। সাত রাজার ধন এক মানিক তার ওই ছেলেটি। কাঁচা হলুদের মতো তার গায়ের রং, মাঝে মাঝে গোল গোল সোনালী ডোরা আর কপালে সাতরঙা এক চক্রের মাঝে অপরূপ এক শুভ্র কমল। আলো যেন ঠিকরে পড়ে শিশুর গা থেকে। দেখলে চোখ ফিরানো যায় না। হরিণ-শিশু তো নয়—যেন এক হীরের টুকরো দেবশিশু।

ছেলেকে নিয়েই হরিণীর দিন কাটে। দিনের বেলায় সে ছেলের পাশে পাশে ঘোরে, একদণ্ড কাছছাড়া করে না। আর রাতের বেলায় তাকে কোলের মাঝে নিয়ে ঘুমায় পরম সুখে। ছেলে যখন মাঠের মাঝে লাফালাফি করে, নিজের ছায়া আর বনের হাওয়ার সঙ্গে মাতামাতি করে বেড়ায়, মা তখন ডাগর চোখে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। ছেলের গর্বে বুক তার ভরে ওঠে।

এমনিভাবে দিন যায়।

হঠাৎ একদিন হরিণী দেখলো, ছেলে যেন কেমন আনমনা—খেলাধূলো করে না, দৌড়ঝাঁপে মন নেই। মা জিজ্ঞেস করলে, 'কি হয়েছে রে?'

আনমনে ছেলে জবাব দিল, 'কিছু না।'

এক দিন গেল, দু দিন গেল, তিন দিনের দিন ছেলে হঠাৎ বললে, 'মা, আমি পাহাড়ের ওপারে যাব। ওখানে আছে বড় বড় মাঠ, কত ঘাস, কত মিষ্টি লতাপাতা।'

মা চমকে উঠলো, 'এ্যাঁ! কোথায়? কি বলছিস?'

ঘাড় ফিরিয়ে ছেলে বললে, 'কেন? ওই ওখানে!'

'ওখানে? হঠাৎ ওখানে তুই যাবি কেন?'

ছেলে বললে, 'ঐ তো বললাম—ওখানে আছে বড় বড় মাঠ, মাঠভরা মিষ্টি ঘাস, লতাপাতা আর ভারি মিষ্টি ফুলফল।'

মায়ের বুক কেঁপে উঠলো। বললে, 'কে বললে? কে বললে তোকে এই সব মিছে কথা?'

মায়ের কোল ঘেঁষে ছেলে বললে, 'অমন করছো কেন, মা? মিছে কথা কেন হবে? তুমি জানো না, তাই বলছো। সেই যে বনের টিয়া মাসি—সে-ই তো বলেছে ওই দেশের কথা। মাসি রোজ যায় সেখানে। আমিও যাব মা।'

মা বলে, 'না, না।'

ছেলে বলে, 'কেন না করছো, মা? একটি বার—শুধু একটি বার যাব। গিয়েই ফিরে আসবো তখখুনি।'

মায়ের মন হু-হু করে ওঠে, বলে, 'ওরে, না না, যাস নে—কখখনো যাস নে ওখানে। যা শুনেছিস, সব মিছে কথা।'

মা কত বুঝায়, কত নিষেধ করে। কিন্তু ছেলের সেই এক গোঁ—একটি বার গিয়েই সে ফিরে আসবে।

মায়ের বুকে সে মুখ ঘষে আর বারবার বলে, 'একবার যেতে দাও, মা—শুধু একটি বার। গিয়েই ফিরে আসবো। টিয়া মাসি বলছে, ভারি সুন্দর সে দেশ, সেখানকার সবই মিষ্টি।'

কি বলে ছেলেকে ভুলোবে, কি করে তাকে নিরস্ত করবে, হরিণ ভেবে পায় না। বনের দিকে অসহায় ডাগর দুই চোখ তুলে মনে মনে বলে, 'ওরে টিয়া সর্বনাশী! এ তুই কি করলি?'

দিন যায়।

ছেলে খায় না, দায় না। হাসে না, খেলে না। শরীর তার রোগা হয়, গায়ের রঙ মলিন হয়। অভিমানে মুখ শুকনো করে সে চুপ করে বসে থাকে।

হাজার হোক মায়ের মন তো—আর কত সহ্য হয়। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শেষে মা একদিন বললে, 'ওরে একগুঁয়ে, ছাড়বি না যখন, তখন যা। কিন্তু কথা দে—

গিয়েই চলে আসবি,

কোনো কিছুতেই মুখ দিবি নে,

এক নজর দেখেই ফিরে আসবি।—বল! কথা দে।'

ছেলে আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। মুহূর্তের তর সয় না। মায়ের কথায় সায় দিয়ে সে ছুটলো তখুনি। দেখতে দেখতে চোখের আড়ালে চলে গেল।

ছেলে অদৃশ্য হতেই হরিণীর বুক সেই প্রথম যেন কেমন করে উঠলো। আকুল কণ্ঠে সে ডেকে উঠলো, 'ওরে ফিরে আয়, ফিরে আয়।'

প্রতিধ্বনি ফিরে এল।

কিছুক্ষণ কেটে যায়। হরিণীর মনে হয়—যেন কতক্ষণ। কী এক অব্যক্ত অনুভূতিতে সে ছটফট করতে থাকে। বারে বারে কান খাড়া করে তাকায় পাহাড়ের দিকে—তার খোকা গেছে যেদিকে।

শেষে আর থাকতে না পেরে অধীর পায়ে সে এগোয় সেই দিকে।

হরিণ-শিশু তখন ছুটে চলেছে, ছুটছে যেন এক আলোর শিখা—কখনো পাহাড়ের উপর দিয়ে, কখনো পাহাড়ের কোল ঘেঁষে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বন রইল পিছনে পড়ে, পিছনে রইল পাহাড়ের সারি। এক লাফে সে পার হলো রূপালী ঝরনা।

মনের আনন্দে নাচতে নাচতে শিশু ছুটে চললো তীরের মতো।

তারপর হঠাৎ সে থমকে দাঁড়ালো এক সময় ঃ সমানে এক নতুন দেশ।

শিশুর চোখ জুড়িয়ে যায় ঃ আহা! কী সুন্দর! এমন দেশ তো সে আগে কখনো দেখে নি। আহা কী রূপ। মাঠে মাঠে নাম-না-জানা কতো বড় বড় ঘাস! সোনালী, হলুদ, সবুজ—কতই না তাদের রঙের বাহার!

মুগ্ধ শিশু এগিয়ে যায় ঃ আঃ! কী সুগন্ধ ওদের!

তার চোখে যেন পলক পড়ে না ঃ চারদিকে সুন্দর সব রসাল লতাপাতা! গাছে গাছে মন মাতানো কত ফুলফল। নিশ্চয়ই এই সেই দেশ, টিয়া মাসি বলেছে যে দেশের কথা।

শিশু আত্মহারা। মায়ের নিষেধ সে ভুলে গেল। এগিয়ে গেল পায়ে পায়ে। তারপর মাঠে গিয়ে নামলো।

তার জিভে জল, চোখ আনন্দে চঞ্চল।

হঠাৎ তার কানে এল এক খসখস শব্দ। ধনুকের মতো নরম ঘাড় তুলে সে তাকালো এদিক-ওদিক! তারপর—মুখ দিল ঘাসের মাথায়।

আবার সেই খসখস! এবার আরো কাছে। আর মাঠের পাশে ও গাছের তলায় কাদের যেন ফিসফাস।

শিশু এবার ঘাড় তুলে তাকালো ডাইনে। নিষ্পাপ দুই গভীর কালো চোখে ভয়ডর নেই, আছে বিস্ময় আর আনন্দ। দেখলো, কারা যেন এগিয়ে আসছে নিঃশব্দ চরণে। অদ্ভুত তাদের দেখতে—তারা দু পায়ে চলে, কি যেন ধরে আছে সামনের দু পায়ে।

শিশু তাকালো বাঁয়ে। তাকালো পিছনে।

ওরা সবখানে।

নির্বোধ শিশু জানে না,—ওরা মানুষ, হাতে ওদের তীর-ধনুক।

বড় বড় কৌতূহলী চোখে সে তাকিয়ে রইল অদ্ভুত সেই জানোয়ারগুলোর দিকে।

এমন সময় হঠাৎ এক টঙ্কার—আর শন্ শন্ শন্ ! বাতাস যেন কেঁপে উঠলো।

পরক্ষণে তুলোর মতো নরম শিশু আর্তনাদ করে লাফিয়ে উঠলো, পড়ে গেল মাটিতে। যন্ত্রণায় ছটফট করে একবার শুধু ডেকে উঠলো—মা! মা!

তারপর সব শেষ। নিষ্পাপ শিশুর রক্তে সেই বুঝি পৃথিবী প্রথম রাঙা হলো।

সেই মুহূর্তে হরিণীও এসে দাঁড়িয়েছিল পাহাড়ের চূড়ায়—নীল আকাশের গায়ে এক পটে—আঁকা ছবির মতো। তীরের ফলার মতো তার কানে এসে বিঁধলো ছেলের আর্তনাদ—মা! মা!

বিদ্যুৎবেগে হরিণী ঘুরে দাঁড়াতেই, সর্বাঙ্গ তার থরথর করে কেঁপে উঠলো। আকুল কণ্ঠে আর্তনাদ করে সে আছাড় খেয়ে পড়লো পাথরের উপর। কেঁদে উঠলো হাহাকার করে। তার বুকের রক্তে পাথর রাঙা হয়ে গেল। সেই প্রথম মায়ের চোখের জলে আর বুকের রক্তে সিক্ত হলো কঠিন পাষাণ।

পরক্ষণে হঠাৎ ক্রন্দনের ধ্বনি জেগে উঠলো আকাশে বাতাসে। গাছপালা কেঁদে উঠলো। পশুপাখি কেঁদে উঠলো। আর—সাঁঝের আঁধারে মানুষও কেঁদে উঠলো ঘরে ঘরে। কিশোর ভারতী

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

বড়মামার মজলিস

পরেশ পোদ্দার গাইঘাটা থেকে আমাদের এখানে এসেছিল বেশ কিছুকাল আগে। বালক। পরনে হাফ প্যান্ট, খাটো গেঞ্জি। এখানে তার এক কাকার মুদিখানা ছিল। লেখাপড়া, স্কুল-কলেজ, এ সব আজে-বাজে ব্যাপারে তার পরিবারের কেউ মাথা ঘামাতেন না। গরুর যেমন ঘাস-বিচিলি, মানুষের সেই রকম টাকা। দুনিয়ায় আর কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই। টাকায় সব হয়। কাকার মুদিখানায় পরেশ ঢুকে গেল। খায়দায়, বাটখারা, দাঁড়িপাল্লা। মাল তুলছে, মাল খালাস করছে। মাঝবয়সি বাতের রোগী কাকা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

ছবিঃ ওঙ্কারনাথ ভট্টাচ
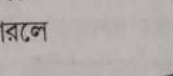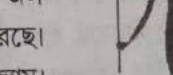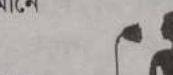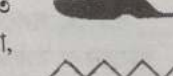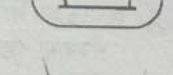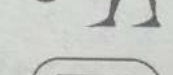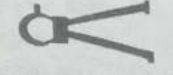
ছেলেটা জম্পেস। সবাই বলতে শুরু করল, পরেশের দোকান। মানুষের বয়স তো আটকানো যায় না। চুল বাড়ে, বয়েস বাড়ে। বুদ্ধিতে পাক ধরে। নরম, গরম কথা বলতে শেখে। পরেশের বিদ্যা-ভাগ্যটা ভালো না হলেও অর্থভাগ্যটা জবরদস্ত। তবে কথা হল, মাল তো সব কাকার ক্যাশবাক্সে। সেখানেও পরেশের ভাগ্য। কাকার 'নো ইস্যু'। কাকিমা ব্রত, পার্বণ, উপবাস, কিছুই বাকি রাখলেন না। এমন কোনো দেব-দেবী নেই, যাকে ধরলেন না! কোথায় কী? বছরের পর বছর চলে যায়। আঁ করে কেউ আর কেঁদে ওঠে না। চালা বাড়ি, কোঠা বাড়ি হল। পুরী হল, কাশী হল। পাশের বাড়ির সবিতার তিনটির পর আবার একটা হল। কাকিমার কোল খালি। আবার সবিতা বলে, তোমার আর কী? দিব্যি আছ ঝাড়া হাত-পা, আমি মরছি চারটেকে নিয়ে।

পরেশের কাকিমা শেষে পরেশকেই ছেলে ভেবে বুকে টেনে নিলেন। ছেলেটা তো মন্দ নয়। পরিশ্রমী, হাসি-খুশি আবার এই বয়সেই বেশ ব্যবসায়ী বুদ্ধি। বিনয়ী। লোকের সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার। ইচ্ছে করলেই অন্য রকম হয়ে যেতে পারত। হয়নি। আবার কী? গভীর রাতে, বইপত্তর খুলে লেখাপড়ার চেষ্টা করে। কাকা, কাকিমা যখন বলেন, 'সারাদিন খেটে মরিস, রাতে একটু ভালো করে ঘুমো না বাবা। পরেশ বলবে, 'খাটার বয়সে মানুষ খাটবে, ঘুমোবার বয়সে ঘুমোবে।'

তা, এসব কথা আমার কানে এল কী করে? বড়মামা। পরেশের কাকা, কাকিমা দুজনেই বড়মামার পেশেন্ট। আবার কাকিমার ধারণা, আমার মাসিমার হাতের সংখ্যা কম থাকলেও, মাসিমা মা দুর্গা। রাত্তিরে স্বপ্নে মাসিমাকে প্রায়ই মা দুর্গার মূর্তিতে দেখতে পান। অসুরের সঙ্গে ঝটাপটি যুদ্ধ হচ্ছে, কাকিমা ঠ্যাং ঠ্যাং কাঁসর বাজাচ্ছেন, আর স্বামী বাজাচ্ছে ঢাক। পরেশ টিং, টিং করে ঘণ্টা নাড়ছে। সিংহটা থেকে থেকে হাই তুলছে। মাঝে মাঝেই আমাদের বাড়িতে এসে মাসিমাকে প্রণাম করার চেষ্টা করেন। মাসিমা পা দুটো লুকিয়ে রাখেন। তখন, তিনবারের চেষ্টায় মেঝেতে বসে নানা রকমের গল্প শুরু করে দেন। খালি হাতে আসেন না। কোনোদিন খাঁটি গাওয়া ঘি, কোনোদিন দানাদার আখের গুড়। 'ছেলেবেলায় এই শরীরটা পেয়ারা গাছে উঠে পেয়ারা পেড়েছে, আজ অবস্থাটা দেখ। শরীরের মতো শত্রু মানুষের আর দুটি নেই।'

বড়মামা পাশ দিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'কারেক্ট, কারেক্ট! খাও, না খাও শরীর যেন ঠিক থাকে।'

পরেশ দেখতে-দেখতে মানুষের মন দখল করে নিল। বড়মামা বলতে লাগলেন, ছেলেটার মধ্যে একটা কিছু আছে, 'সামথিং, সামথিং'। পরেশ আবার বড়মামাকে 'ডাক্তারবাবু' না বলে, দাদা বলতে শুরু করল। পরেশের দোকানের একটু দূরেই অমূল্যবাবুর বাড়ির একতলায় বড়মামার চেম্বার। পরেশ রোজ এসে বড়মামাকে প্রণাম করে যায়। কত কী যে হয়, সব দেখি। আমার একজন প্রাণের বন্ধু আছে, শ্যামল। অসাধারণ। তার শুধু একটাই কথা, 'ধুর, ছাড়তো। নিজের কাজ করে যা।'

শ্যামল আমাকে সাইকেল আর সাঁতার শিখিয়েছে। শ্যামল পরেশের খুব প্রশংসা করে। বলে, ছেলেটার ভেতরটা খুব পরিষ্কার। আমাকে বলে, 'তোর বড়মামার কোনো তুলনা হয় না রে! হর হর মহাদেব। ভাগনেরা মামার মতো হয়। তুই তোর বড়মামার মতো হওয়ার চেষ্টা কর।' শ্যামল আবার হাত দেখা শিখেছে। আমার হাত দেখে বলেছে, 'তোকে তো একদিন মামার চেম্বারে বসতে হবে রে!' পরেশও মাঝে মাঝে হাত দেখায়। পরেশ না কি কোটিপতি হবে! এরা দুজনেই বড়মামার চেলা। আমার মাসিমার ভক্ত। আমাকে বলে, 'তোর মাসিমার ভেতর একটা কিছু আছে।'

থাক, এদের কথা এখন থাক। আজ সকালে বড়মামা বেশ বেসুরো। বারান্দার দক্ষিণ দিকের একেবারে শেষ মাথায়, যেখানে মাধবীলতার ফুলের উৎসব, সেইখানে চেয়ারটা টেনে নিয়ে গিয়ে টান-টান হয়ে বসে আছেন। আমরা জিগ্যেস করলুম, 'কী হয়েছে?' বললেন, 'খুব আশঙ্কাজনক অবস্থা।' ব্যস, আর কোনো কথা নয়। আমাদের প্রতিদিনের জমজমাট চায়ের আসরটা একেবারে ভেটকে গেল।

মেজোমামা বললেন, 'ডাক্তারকে ডাক্তার দেখাতে হবে।'

এইবারে মাসিমা নিজ মূর্তি ধারণ করলেন, 'কী হয়েছে খুলে বলবে তো?'

বড় মামা বললেন, 'আটকে গেছে।'

'কী আটকে গেছে, গলায় মাছের কাঁটা?'

বড়মামা বললেন, 'ঢেঁকুর।'

'ঢেঁকুর আটকে গেছে।'

'সে আবার কী?'

মেজমামা উঠে এসেছেন, কী আটকেছে?'

বড়মামা আঙুল তুলে মাসিমাকে ইশারা করলেন। মাসিমা বললেন, 'ঢেঁকুর আটকে গেছে।'

গেটের কাছে পিঁ পিঁ করে দুবার বাঁশি বাজল। 'ওই পরেশ আসছে।' পরেশ মানে আশার আলো, সব সমস্যার সমাধান। বড় মামারই ব্যবস্থা। পরেশ পোদ্দার মানে পি.পি। বাঁশিটা বড়মামার ছেলেবেলার কালেকসান। সেইটা পরেশকে দিয়ে বলেছেন, এইটা তোমার সিগন্যাল। দুবার পিঁ পিঁ মানে, পরেশ পোদ্দার। এ বাড়িতে এখন সকলে নামই সিগন্যাল, মাসিমা—মামা, মেজোমামা—মেমা, বড়মামা—বমা, নিরঞ্জনদা—নিদা, লক্ষ্মীদিদি—লদি।

পরেশদা একা নয়, সঙ্গে শ্যামলদা। হাতে একটা বেশ বড় ব্যাগ। মাসিমা খুব ঘটা করে কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা করেন। শ্যামলদার বাড়ির পেছন দিকে চার-পাঁচটা নারকোল গাছ আছে। মাসিমার পুজোর জন্যে নারকোল এনেছে। নাড়ু হবে।

বড়মামার এই অবস্থা দেখে পরেশদা জানতে চাইল, 'কী হয়েছে বড়দা?'

বড়মামা শুরু করলেন, 'মা আমাকে একটা বড় কাচের গেলাস দিয়ে বলেছিলেন, এটা তোর বাবার গেলাস। রোজ সকালে, খালি পেটে এই গেলাসে এক গেলাস জল খেতেন। কিছুক্ষণের মধ্যে ঢাউস করে একটা ঢেঁকুর উঠত। তখন খুব খুশি হয়ে বলতেন, সেন্ট পারসেন্ট ফিট। মুড়ির সঙ্গে ভুঁড়ি যুক্ত। ভুঁড়ি ঠিক থাকলে মুড়ি, মানে মাথা ঠিক থাকবে।'

পরেশদা বললে, 'সে বুঝলুম, তা ঢেঁকুরের সঙ্গে কী সম্পর্ক?'

বড়মামা বললেন, 'সে কী রে? বায়ুই তো জীবন। ঢেঁকুর মানে উদরে বায়ুর নৃত্য।

'পেট একটা হাঁড়ি, হাঁড়িটা বসনো আছে উনুনে, রান্না হচ্ছে, জল দেওয়া হল, জল ফুটছে স্টিম ছাড়ছে, প্রেশার কুকার সিটি মারছে। ভেতরে বাতাসটা যদি না খেলে, তাহলে কী হল—ট্রাফিক জ্যাম। এই যে বাঁশি বাজালে, বাতাস ছাড়া বাজত? কুকার সিটি না মারলে কুকার ফেটে যাবে। পেট তো ফাটবে না, হার্টে চাপ মারবে।'

বড়মামা হঠাৎ থমকে গেলেন, তারপর গুড় গুড় করে আকাশ-

পাতাল জোড়া বিশাল একটা ঢেঁকুর তুললেন। আমরা মহা উল্লাসে, উঠেছে উঠেছে, বলে চিৎকার করে উঠলাম। বড়মামা দুদিকে দু'হাত ছড়িয়ে বারান্দার দক্ষিণ থেকে উত্তর, উত্তর থেকে দক্ষিণ, বার কতক পায়চারি করে নিলেন। তারপর বললেন, 'এইবার আমরা চায়ের আসরে বসতে পারি।'

মেজমামা বললেন, 'প্রেশার কুকার সিটি মেরেছে।'

নিরঞ্জনদা উপরে ছুটে এসেছে। হাতে একটা কাটারি। বাগানে কলার কাঁদি নামাচ্ছিল।

'কে উঠেছে, কোথায় উঠেছে।'

কদিন ধরে ওপাশে মাঠের দিকের পাঁচিলে একটা ছেলে উঠছিল কিছু একটা মতলবে।

দুই

চায়ে চুমুক দিয়ে পরেশদা বললে, 'বড়দা, আপনি কাকাবাবুকে ছাগল অ্যাডভাইস করেছেন।'

বড়মামা বললেন, 'অব্যর্থ। হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট, সাঁই সাঁই, গলা ঘড়ঘড়, কন্ট্রোলে এসে যাবে। হেসে খেলে একশো বছর। বাপুজিকে মেরে ফেললে, তা না হলে একশো ক্রস করে যেতেন। লাঠির মতো খটখটে শরীর। হন হন করে হাঁটছেন। আমি স্টাডি না করে কিছু বলি না। ছাগলের গন্ধ, ছাগলের দুধ। আমরা মূর্খ, খেয়ে খেয়ে শেষ করে দিলুম। কী অসম্মান। গলায় নারকোল দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছি মায়ের কাছে বলি দিতে। মা মাংস খাবেন। মা কালী কিছু খান না, খাওয়ার উপায় নেই তো?'

শ্যামলদা জিগ্যেস করলে, 'কেন নেই?'

বড়মামা বললেন, 'কারো জিভ বেরিয়ে মুখের বাইরে ঝুলে থাকলে খেতে পারবেন! তুমি চেষ্টা করে দেখ না।'

পরেশদা বললে, 'খাওয়ার সময় মা জিভটা ভেতরে টেনে নেবেন।'

বড়মামা বললেন, 'জিভ ভেতরে ঢুকে গেলে মা তো আর মা কালী রইলেন না, সাধারণ একজন মহিলা। সেটি হবার উপায় নেই। একটা ধ্যানমন্ত্র আছে তো? লোল জিহ্বা, খট্টাঙ্গ ধারিণী। মা কালী অলওয়েজ কালী। ওইটাই মায়ের বরাত। আবার দেখো গাধার বরাত। মা শীতলার বাহন হয়ে জাতে উঠে গেল। শ্যামল শীতলা পূজা করে। ফুল দেয়, ওঁ গর্ধবায় নমঃ।

'কোনো দেব-দেবী ছাগলকে বাহন করলেন না। শয়তানের দোসর হয়ে রইল। কাবাব, কাবাব, টিকিয়া, টিকিয়া, মানুষের জিভ দিয়ে, চোখ দিয়ে নয়, টস টস করে জল ঝরতে লাগল। কাটলেটে কাঁটা মারছে, ছুরি দিয়ে কাটছে, মাস্টার্ড মাখিয়ে, স্যালাড দিয়ে মুখে ঠুসে দিচ্ছে। মরেও শান্তি নেই। ভগবানের ওপরতলাতেও পলিটিক্স। গাধার মাংস কেউ খায়, না খাবে? নিরীহ, বোকা পাঁঠাকে ভোগে লাগাবার কত ফাঁক-ফোকর।'

একজন বলছে, 'ডাক্তারবাবু আমি ঝোলা পাঁঠা টাচ করি না। ঝোলা পাঁঠা আবার কী? ওই যে পাঁঠার দোকানে ঝুলিয়ে রাখে। খদ্দের এসে বলে, আগলি রাং, পিছলি রাং, সিনা, গর্দান। আবার বললে, কিমা করে দাও। ছাগল যেন তার বাপের সম্পত্তি! ননসেন্স। আমি স্ট্রেট কালীঘাটে চলে যাই। যে সব ছাগল মায়ের চরণে নিজেদের প্রাণ হাসি মুখে, স্বেচ্ছায় আহুতি দিয়েছে, তারই একটুকরো কিনে আনি।'

আমি বললুম, 'এই যে মহাপ্রভু, আপনার রিপোর্ট সব দেখলুম, কোলেস্টেরালটাকে কোথায় তুলেছেন? সুগার তো দাঁড়িয়ে আছে ভারত-চীন সীমান্তে, হৃদয়মন্দিরের দুয়ার বন্ধ হল বলে।'

ইয়া ভুঁড়িদার মানুষটি অসহায়ের মতো তাকিয়ে রইলেন। কালো টাকার কিঙ্কর। বললুম 'খাটটা সাজিয়ে রাখুন। নিজেকে আহুতি দেবার জন্যে প্রস্তুত হোন। নো রেডমিট।' অসহায়ের মতো বললেন, 'প্রোটিন, প্রোটিন!' বললুম, 'ছাগল আপনাকে অনেক প্রোটিন খাইয়েছে, শরীরে টিন টিন ফ্যাট, দেহের ভেতরের সব নদী-নালা বুজে এসেছে। এখন ছাগল যে প্রোটিন খায়, সেই প্রোটিন খান—ঘাস। সুজলাং, সুফলাং।' ভদ্রলোক রেগে লাল। চেয়ারটা প্রায় উল্টে ফেলে দিয়ে, থার্ড ক্লাস, থার্ড ক্লাস বলতে বলতে চলে গেলেন। রাত একটার সময় তাঁর ছেলে এসেছে বাড়িতে। সেও আর এক মাতব্বর, ধান্দা পার্টির সদস্য। কী বার্তা? বাবা গো, ওয়েন্ট, গন। একটা ডেথ সার্টিফিকেট।'

শ্যামলদা বললে, 'বাবার মুখে শুনেছি, দেব-দেবীরা দৃষ্টি দিয়ে গ্রহণ করেন, প্রসাদ করে দেন। তাঁদের দাঁত নেই। প্যান্ডেলে মা দুর্গার দাঁত দেখিনি।'

পরেশদা বললে, 'আমি যেটা জানতে এসেছি, ধরুন, আমি একটা ছাগল জোগাড় করলুম। করলুম কেন, করবই। পরেশের অসাধ্য কিছু নেই, কাকাবাবু কি সেটাকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকবেন? দেশের বাড়িতে দেখেছি, ভীষণ ছটফটে। আর যা সামনে পাবে মুখে পুরে চিবোবে। ছেলেবেলায় আমার দুর্গাপুজোর নতুন জামার আধখানা খেয়ে ফেলেছিল। সেই শোক আজও ভুলতে পারিনি।'

বড়মামা বললেন, 'জড়িয়ে ধরে বসে থাকবেন কেন! সে মাঝেমধ্যে ঘুংরু, ঘুংরু বলে আদর করতে পারেন। ছাগল আদর পছন্দ করে কি না জানি না। এই ব্যাপারে আমার প্র্যাক্টিক্যাল নলেজ জিরো। একটা অভিজ্ঞতা আছে, একটা পাটনাই ছাগল আমাকে গুঁতিয়ে ডোবার জলে ফেলে দিয়েছিল। ছাগলটার মালিক সুখলাল হে হে করে হাসতে হাসতে বলেছিল, ছাগলটা আমাকে আর একটা ছাগল ভেবে, ওইসি কিয়া। তখন কি আব সে জানত, পরে আমি ডাক্তার হব, আর ওই বুড়ো সুখলালের চিকিৎসা করব।

'নাইনটি ইয়ার্স! বুড়ো খটখট করে সিপাইদের মতো হাঁটছে, পায়ে নাগরা। ওই ছাগল! ঘরে ছাগল, বাইরে ছাগল। ছাগলদের ভাষা বুঝতে পারত। তুমি দেখো, ব্যাকরণের প্রথম শব্দটাই ব্যা। কালোয়াতি গান, ব্যা ছাড়া কেমন যেন ফাঁকা-ফ্যাকাসে।'

আমি সুখলালকে বলেছিলুম, তুমি একটা ছাগলদের ভাষার অভিধান তৈরি কর, আমি ছাপব। ও বলল, ওরা তিনটে শব্দে কাজ চালায়, ব্যা, জা আর ম্যা। ওদের আবেগ, গিটকিরি, মুড়কি তান, এই সব। আমি চরক, সুশ্রুত, প্রাচীন সব আয়ুর্বেদ শাস্ত্র, ইউনানি, হেকিমি, টোটকা, সব ঘেঁটে ফেলেছি, এইবার ফিউসান। অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথির সঙ্গে মিলিয়ে অ্যায়সা একটা পদ্ধতি বের করব, মরতে না চাইলে কেউ মরবে না। ছেলে হাঁ করে বসে আছে, বাপ মরলে সম্পত্তি পাবে, বাপ আর মরছে না।'

'যদি সাপ কামড়ায়?'

'সাপ মরে যাবে, মানুষের ভয়ে সাপ পালাবে। একালের তরি-তরকারি, মাছ-মাংস খেয়ে আর কিছুদিন পরে মানুষ হয়ে উঠবে পৃথিবীর সবচেয়ে বিষাক্ত প্রাণী।'

'তাহলে ছাগলটা থাকবে কোথায়?'

'কাকাবাবুর শোয়ার ঘরে। সারা ঘরটা ছাগলের শব্দে ভরে যাবে। কাকাবাবু লম্বা-লম্বা শ্বাস নেবেন, শ্বাস ছাড়বেন। গ্যারান্টি-একশো বছর। কোনো দুর্ঘটনা না হলে, দেড়শো, দুশোতেও চলে যেতে পারে। তুমি যদি চাও, কাকাবাবুকে আমি 'মমি' করেও রাখতে পারি। সে বিদ্যাটাও আমি মিশর থেকে শিখে এসেছি।'

'মিশর, পিরামিড! বাপরে, টুটেনখামেন! আপনাকে একটা প্রণাম করি।'

'আজ নয়, ডিউ থাক। এখন শোনো, মমি কী ভাবে তৈরি করা হয়।'

'জানি মানে? আমি তালিম নিয়ে এসেছি রে! তোরা হলে ভয়ে মরে যেতিস।'

'কেন? কেন?'

'তা হলে শোন, তাড়া নেই তো?'

'কীসের তাড়া?'

শ্যামলদা বললে, 'আজ আমার একটা পুজো আছে। সে অনেক পরে।'

বড়মামা নিজের নাকের ওপর দিকটা দু'আঙুলে টিপে ধরে কী একটা ভাবলেন, তারপর বললেন, 'নাঃ, সাত সকালে, ক্যাটক্যাটে রোদের আলোয় মমির গল্প জমবে না। রাতের ছমছমে আলো-অন্ধকারে ব্যাপারটা জমবে ভালো। এখন আমরা ছাগলেই থাকি। এটা আমার একটা মস্ত বড় পরীক্ষা। যদি সফল হই সারা বিশ্বে হৈ চৈ পড়ে যাবে। রোগ নিরাময়ে পশু সঙ্গ।'

পরেশদা বললে, 'তা হলে রাতে সকলের খাবার দায়িত্ব আমার। স্নানযাত্রার দিন আমার নতুন রেস্তোরাঁর উদ্বোধন হয়েছে। এত করে বলে গেলুম, আপনারা গেলেন না।'

বড়মামা বললেন, 'আরে সেদিন কী যেন একটা হল, সব গণ্ডগোল হয়ে গেল। যাব যাব, আমরা সবাই মিলে একদিন যাব। এখন শোনো, বিরাট পাটনাই ছাগল, আমাদের রামছাগলে চলবে না। ম্যানেজ করতে পারবেন না। ওরা একটা ব্যাপারেই এক্সপার্ট, কারণে-অকারণে ঢুঁ মারা। পরেশ যথেষ্ট দেখে শুনে, টেস্ট করে কিনতে হবে। কালো, তেল চুকচুকে আর উগ্র গন্ধ। ওই গন্ধটাই হল মেডিসিন। কাকাবাবুর বেডরুমে তিন-চারদিন বেঁধে রাখতে হবে। ঘরটা গন্ধময় হয়ে যাবে। শ্বাসে-প্রশ্বাসে সেই গন্ধ খেলা করবে। ব্রংকাইটিস, অ্যাজমা বাপ বাপ বলে পালাবে। তুমি কোথা থেকে কিনবে?'

'রাজাবাজারের ছাগলমেলা থেকে।'

'ও তো সব খাবার ছাগল। ঘরোয়া পরিবেশে, স্নেহপালিত, প্রসন্ন ছাগল খোঁজ কর। সারাদিন কাঁঠাল পাতা চিবোবে, মাঝে মাঝে আদুরে গলায়, মৃদু মৃদু ডাকবে। গুঁতোয় না, লাফায় না। মাঝে মাঝে আদুরে গলায় ব্ল্যা ব্ল্যা, ব্যা ব্যা নয়। বি.এল.এ ব্ল্যা এই ডাক শুনলেই বুঝবে—গুড গোট। আরে, আমাদের পাড়ার সকলের প্রিয় টুনটুনি, টুনিমাসি, তার একটা ছাগল ছিল। ছাগলটার নাম ছিল, বুধি। সে এক জিনিস। মাসির হাত ভেঙে গেল। বাড়ির চালে লাউ গাছ। ছাগল তো কোনোদিন আগু-পিছু ভেবে কোনো কাজ করতে শেখেনি। এডুকেশানের অভাব। যেমন ঠাকুর্দা, সেইরকম বাবা, সেইরকম ছেলে-মেয়ে। সেই জন্যেই চিরকালের উপাধি বোকাপাঁঠা।

'টুনিমাসির ছাগল লাউগাছের কচি কচি পাতা খেতে খেতে চালে উঠে গেছে। আর তো নামতে পারছে না। মাসি মই বেয়ে চালে উঠে, ছাগল বগলে নামছে শেষে ব্যালেন্স হারিয়ে ধপাস। আমি তখন মেডিকেলে ফার্স্ট ইয়ার। মাসিকে দেখতে গেলুম। কোমরে চোট। মাসি ধনুকের মতো সামনের দিকে বেঁকে গেল চিরজীবনের মতো। হাতে লাঠি, ঠুক ঠুক। ছাগলটাকে কিচ্ছু বললেন না। সব দোষ ওই মুখপোড়া মইটার। কবিরাজিতে একটা ঘি আছে, 'ছাগলাদ্য ঘৃত', ছাগলের দুধ থেকে তৈরি, একশো বছরের পুরনো। বুকে মালিশ করলে দুশো বছরের পুরোনো কফ উঠে আসবে।'

'মানুষ কি দুশো বছর বাঁচে?'

'আরে ধুর, পূর্বজন্ম আছে না! জন্ম-জন্ম ধরে, মানুষ জন্মাচ্ছে, বায়ু-পিত্ত কফ, যাচ্ছে আর আসছে। মানুষ একটা প্যাকেট। প্যাকেটটা মরছে, প্যাকেটটাই জন্মাচ্ছে। স্কুলে পড়ার সময় আমার নিমোনিয়া হল। সাঁ-সাঁ শব্দ। অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ফেল করল। দিদিমা বের করলেন পুরোনো ঘি। সেরে ওঠার পর স্কুলে গেছি। হেড স্যার নাকে রুমাল চাপা দিয়ে বললেন, 'তুমি আরও সাতদিন ছুটিতে থাকো।' সে যে কী গন্ধ ধারণা করতে পারবে না।

'চিকিৎসায় ছাগলের ব্যবহার, আমি যে পেপারটা বিলেতে পাঠাব তার বিষয়। কেস স্টাডি। তোমার কাকাবাবু আমার সেই কেস। ছাগলের ইজ্জত সম্প্রতি বাড়িয়ে দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। ছাগলের দুধ দিয়ে সাবান তৈরি করেছে। দামি সাবান, গায়ে মাখলে চামড়া বা স্কিন হয়ে যাবে সিল্কের মতো। সাবানটার নাম রেখেছে 'গোট'। ছাগলের পক্ষে কত বড় গর্বের। ঘরে ঘরে 'গোট'। কী মেখেছ গায়ে? 'গোট'।'

'পরেশ গাদা গাদা কথা বলা, আমি একদম পছন্দ করি না। কম কথা, বেশি কাজ। তুমি নিরঞ্জনকে নিয়ে বনগাঁর ছাগল হাটে চলে যাও। একটা টেম্পো নিয়ে যাবে। ছ'টা ছাগল কিনবে দুটো তোমার, চারটে আমার।'

পরেশদা বললে, 'আপনি, আপনি ছাগল কী করবেন!'

মাসিমা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বড়মামার শেষ কথাটা শুনেছেন। বললেন, 'সকাল থেকে ছাগল, ছাগল! আজ রবিবার, ছুটির বার। রুগিদেরও ছুটি, ডাক্তারদেরও ছুটি। ইনি বসে-বসে ছাগলের শ্রাদ্ধ করছেন। নেই কাজ তো খই ভাজ।'

মেজোমামা বেশ কিছুটা দূরে খবরের কাগজের আড়ালে লুক্কায়িত রয়েছেন। গানের সুরে বলছেন, 'উঁ হুঁ, উঁহু, উঁহু, রতনে রতন চেনে, ভাল্লুকে চেনে শাঁকালু। মহিমা, মহিমা! লম্বকর্ণের কত মহিমা! প্রাণীটাকে খেয়ে খেয়ে শেষ করে দিলে—কোর্মা, কারি, মাটন চপ। এখন তিনি ছাগশ্রী, ছাগবিভূষণ। ক'টা ভালো ছেলের মস্তক চর্বন। হরি হে মাধব, কত কী যে দেখে যাব!'

বড়মামা আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী। ডায়াবিটিসের মতো, হিংসাও এক দুরারোগ্য ব্যাধি। অনেক অন্যরোগের জন্মদাতা। আমার এই ছাগলচর্চায় সমগ্র বিশ্ব সেই বহুকাঙ্ক্ষিত বস্তুটি পাবে—ব্যাধিমুক্ত, দীর্ঘ, দীর্ঘ, অতি দীর্ঘ জীবন। একশো বছরের তরুণ। ঘরে ঘরে পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধ প্রপিতামহ, অ্যান্ড সো অন।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেড়শো বছরের তরুণী কেশ চর্চা করছে। তাই না দেখে দুশো বছরের স্বামী কবিতা লিখছে—ষোড়শ বর্ষীয় পুত্র ঘরের মেঝেতে হামা দিচ্ছে। ওঃ হো। শ্মশানের চুল্লি কালে ভদ্রে জ্বলবে। সবই হবে দুর্ঘটনায় মৃত্যু। মেরে না ফেললে মানুষ সহজে মরবে না। এই ডাক্তার পৃথিবীর মৃত্যুকে জয় করবে, করবে, করবেই করবে।'

পরেশদা আর শ্যামলদা ভয়ে ভয়ে বললেন, 'আমরা কি এখন চলে যাব?'

উত্তর দিলেন মেজোমামা, 'ছাগলবাবার এখন ভাব এসেছে, নৃত্য-গীত হবে। এখন তোমাদের নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়াই ভালো।'

বড়মামা বললেন, 'আমার অনুমতি ছাড়া যাবে কোথায়? এই কথাটি মনে রেখো। পাগলে কি না বলে ছাগলে কিনা খায়! এই খাওয়াটা কী খাওয়া? মান, অপমান, বঞ্চনা, লাঞ্ছনা, উক্তি, কটূক্তি। সব হজম করতে হবে। তবেই তুমি অজ হবে। অজ মানে জন্মহীন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব। শুদ্ধ, শাস্ত্রীয় সেই অজ শব্দ চিহ্নটি ছাগলকেও দেওয়া হয়েছে।

অজ মানে ছাগল। ছাগল মানে জীবাত্মা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—
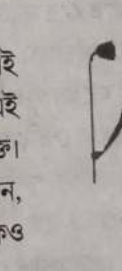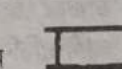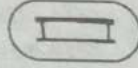
যার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। এই ব্যাখ্যা প্রকাশিত হলে, জগতে আমি ছাগলবাবা নামে অমর হব। অজবাবাও বলতে পার, তবে আমি নামের কাঙাল নই।

তোমাদের মতো গুটিকয়েক যুবককে তৈরি করে রেখে যাব। তারাপীঠে মহাসাধক বামদেবের কুকুর। গান্ধীর ছাগল। সেই ছাগল আবার তাদের গৌরব ফিরে পাবে। জগৎ মাঝারে কী পাবে? বাকিটা তোমরা বলবে। দেশের ভবিষ্যৎ তোমরা। আচ্ছা, আমি বলছি, পশু-সমাজে একটা আসন পাবে। ভাবতে পারো, অমুকের সন্তান হচ্ছে না, যাও মায়ের কাছে পাঁঠা মানত করো। ঘ্যাচাং ফু। মা বহত খুশ। একেবারে যমজসন্তান।

জঙ্গল থেকে বাঘ বেরিয়ে আসছে। খাঁচা পাতো। নিরীহ একটা ছাগল পেশ। সারা রাত ভয়ে কাঁপছে। বাঘ মামা খেতে আসবে! ছাগলদের ভাষা নেই, সংগঠন নেই, প্রতিবাদ নেই। কই, বাঘের সঙ্গে এইরকম ব্যবহার কর দেখি। ওদের হয়ে আমাদেরই নামতে হবে। হাজার ছাগল নিয়ে আমরা মিছিল করব, আমরাও ছাগল সাজব।'

পরেশদা বললে, 'বড়দা পারবেন না। আপনি দুটো ছাগল নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে দেখুন। আপনাকে ছেড়ে কোথায় না কোথায় চলে যাবে! হাজার হোক ছাগল! আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা হবে। আমাদের হাজতবাস। জেনে রাখুন, যারা নিজের ভালো চায় না, তাদের ভালো ভগবানও করতে পারবে না। আগে মানুষ হও, তারপর নেতা হও, তারপর আন্দোলন কর।'

'ছাগল কী করে মানুষ হবে পরেশ?'

'না, না, তৈরি ছাগল, বিচক্ষণ ছাগল, যেমন রাম ছাগল। রাম উপাধি পেলেও আরও বিশ্রী-বিদঘুটে হয়ে গেল। ওরকম নয়, ধরুন ওই রকম ছাগলের নাম হল ছাগলুস।'

'সেটা আমাদেরই করতে হবে, ট্রেনিং ক্যাম্প।'

'মেজো?'

'বলে ফেলো, শুনতে পাচ্ছি।'

'তুই তো কাগজমুড়ি দিয়ে একপাশে পড়ে আছিস।'

'সব শুনছি।'

'তুই একটা ট্রেনিং কোর্স তৈরি করে দে।'

'আমার দ্বারা হবে না। তুমি একজন সেকেলে পণ্ডিত জোগাড় কর, যারা গাধা পিটে মানুষ তৈরি করতেন। আমাদের কেরামতি তো দেখতে পাচ্ছ! রোজ কাগজ পড়ো?'

'সম্ভবত না।'

'বেঁচে গেছ ব্রাদার। প্রেসার, সুগার, দুটোই বেড়ে যেত।'

'আমার সময় কোথায়?'

'ডাক্তারি ছেড়ে দিলে?'

'আমি ছাড়িনি, আমাকেই ছেড়ে দিয়েছে। এখন নার্সিং হোম। একজন নয়, একদল, হে রে, রে রে করে ঝাঁপিয়ে পড়বে। চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত পরীক্ষা হবে। রুগিকে বলবে, চুপ, একদম চুপ, আপনার কাছে শুনতে চাই না, আপনার কী হয়েছে! আমরা স্ক্যান করে জেনে নেবো। টাকা? আপনাকে ভাবতে হবে না, ভাববে আপনার পরিবার। হয়েছে ইনফ্লুয়েঞ্জা, বলে দিলে হাইপোথার্মিয়া। সেটা কী? বাপরে! তিন লাখ। লাফাবেন না। শুয়ে পড়ুন। বাড়ি যাবো। অবশ্যই যাবেন। আগে তিন লাখ।

আমার স্টেথিসকোপ ঝুলছে, প্রেশার মাপার যন্ত্রে ধুলো। যা পড়েছি সব ভুলে গেছি। পদবিটাই শুধু আছে। কয়েকজন প্রবীণ গল্প করতে আসেন বিধাচন্দ্রচন্দ্র রায়, নীলরতন সরকার। অতীত, অতীত। যত বড় বড় বনেদী বাড়ি প্রোমোটাররা সব ফ্ল্যাট করে দিয়েছে। নবীন ডাক্তাররা প্রবীণ ডাক্তারদের করুণার চোখে দেখে। এখন শুধু ডেথ সার্টিফিকেট লিখি।'

মেজোমামা খবরের কাগজের আড়াল থেকে বেশ বড় একটা শ্বাস ফেললেন। কাগজের সেই জায়গাটা একটু ফুলে উঠল। মাঝে মাঝে একটা ভাবনা আসে, একটা আতঙ্ক—এই বাড়িটার কী হবে। ঘাড়ের ওপর বাঘের মতো নিঃশ্বাস ফেলছে প্রোমোটার। গাছপালা, আম, জাম, কাঁঠাল, শরৎ, শিউলি, বকুল, চাঁপা, কোকিল ডাকা বসন্ত, পুকুর পাড়ে মাছ রাঙার ধ্যান, পুকুরের জলে পানকৌড়ির ডিগবাজি, খেলার মাঠে গোল পোস্টের পেছনে শেয়ালদের সন্ধ্যার ডাক, হুঁশিয়ারি—এইবার বাড়ি গিয়ে পড়তে বোসো।

গা ছমছমে ঝমঝমে বেলগাছে আদৃশ্য ব্রহ্মদৈত্য! খবরের কাগজটা মেজোমামার বুকের ওপরে পড়ে গেছে। শ্বাস দীর্ঘ হয়েছে, কাশফুলের স্বপ্ন দেখছেন। বড়মামা হাসছেন আর নিজের মনে বলছেন, বুড়ো বাঘ, বুড়ো শিকারী, বুড়ো ডাক্তার, দিনের শেষে ঘুমের দেশে...। আমাদের চোখে জল, আমার বুকের কাছটা কেমন করছে। আমাদের বাংলা স্কুলে ছাত্রের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। নতুন আসছে—নতুন।

পরেশদা ও শ্যামলদা মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে বড়মামাকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। পরেশদা বললে, 'বড়দা আপনার পাশে আপনার পি পি আছে। দেখুন না কী হয়! অন্ধকারে জন্মেছি আলোর তপস্যা করব বলে।' শ্যামলদা বললে, 'আমি বাজাবো ঘণ্টা। আমার বাবা ভারি সুন্দর একটা কথা বলেছেন, মনে গেঁথে গেছে—বলেছেন—দিনের বেলা কর্ম, রাতের বেলা ধর্ম।'

তিন

রাত আটটা। পরেশদা খাবার দাবার নিয়ে এসে হাজির। সে এক বিশাল ব্যাপার। সঙ্গে আর একজন, বেশ সুন্দর দেখতে। পরেশদারই বয়সি, বা একটু বড়। পরেশদা তাকে কুমুদদা বলে ডাকছে। রান্নায় ওস্তাদ। কুমুদদার ঠাকুর্দা মিরাটে সাহেবদের ক্লাবে 'শেফ' ছিলেন। সেই ধারা চলে আসছে।

কুমুদদার মা রীতিমতো রান্না শিখিয়েছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে মহাপ্রভুকে যে সব পদে আপ্যায়িত করা হতো, তার বর্ণনা আছে—সেই সব পদ কুমুদদার মা রান্না করতে শিখিয়েছিলেন। কুমুদদা মায়ের কাছে রান্না শিখেছেন। রান্নাই তার হবি। পরেশদা তাকে টেনে এনেছে। পরেশদার রেস্তোরাঁয় কুমুদদা একেবারে ফাটাফাটি। রাতে রাস্তার লাইন পড়ে যায়।

বড়মামার আদেশে আমরা সব সাদা পোশাক পরেছি। সাদা শাড়িতে মাসিমাকে মনে হচ্ছে মা সরস্বতী। মেজোমামা ধুতি পরেছেন, হাফ হাতা সাদা পাঞ্জাবি। নিরঞ্জনদা ধুতি আর ধবধবে সাদা ফতুয়া, কাঁধে সাদা তোয়ালে। দেখার মতো হয়েছে বড়মামার পোশাক। সর্বাঙ্গে ব্যান্ডেজের মতো করে জড়ানো ধবধবে সাদা কাপড়, মাথায় সাদা ফেজ টুপি। যেন মিশরের এক পুরোহিত। মাসিমার সহকারী, মাসিমার ডান হাত চঞ্চলা। এমনিতেই সুন্দরী। আজ মনে হচ্ছে, চাঁদের দেশ থেকে উড়ে আসা এক পরী।

আমি ওর ধারে কাছে যেতে চাই না। আমি শুনেছি, আমি পড়েছি, ছাত্রজীবনে মেয়েরা ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে। লেখাপড়া মাথায় উঠতে পারে। কথাটা মোটেই মিথ্যা নয়। আমি যত ভাবি চঞ্চলার কথা ভাববো না। ফিজিক্স পড়ছি। গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ব, নম্বরটা আর একটু বাড়াতেই হবে। কিছুক্ষণ পরেই চমকে উঠলুম, এ কি! আমি তো অনেকক্ষণ ধরে চঞ্চলার কথাই ভাবছি। ওই বাগানের শেষ প্রান্তে গুলঞ্চ গাছের তলায় নিচু হয়ে ফুল তুলছে। ছোট্ট, ছোট্ট দুটো প্রজাপতি, ঝিরি ঝিরি করে উড়ছে। একটা আবার চুলের বিনুনি ধরে দুলছে। এ সব মেয়ে কবিদের জন্যে জন্মায়। নবদ্বীপের মেয়ে। কীর্তন জানে, নামগানে নাচতে নাচতে ভাব হয়। মাসিমা আবার বৃন্দাবনের গোপীদের মতো গোপীখোঁপা করে দেন। সরু কাজল-টানা

চোখে জোনাকির ঝিলিক।

আমি শুধু নিরঞ্জনদার পক্ষপাতিত্বটা দেখে যাচ্ছি। গাছ থেকে সব চেয়ে বড় পাকা পেয়ারাটা পেড়ে ওকেই দিচ্ছে। ও আসার আগে এই বাড়িটায় আমি দাপিয়ে বেড়াতুম। ও আসার পর আমি নিজেকে গুটিয়ে ফেলেছি। এবার আমি চলেই যাব, যেদিকে দু'চোখ যায়।

মেজোমামা খেতে ভালোবাসেন। ওসব ভুঁড়ি-টুঁড়ি নুন, চিনি গ্রাহ্য করেন না।

মেজোমামা বললেন, 'বড়দা, তোমার তুলনা তুমি। আজকের রাতটা তুমি একেবারে জমিয়ে দিলে, আর এই সব প্রেপারেসান! কেবল মনে হচ্ছে, পেটটা যদি গলার পরেই থাকত। বুকটা তো কেবল বেদনার স্থান, উদরের ওপর খানিকটা জায়গা জুড়ে বসে আছে। আমি কি আর একটা ফ্রিশফ্রাই আশা করতে পারি, লাস্ট ওয়ান।'

বড়মামা বললেন, 'আমি কিন্তু তোমার ইনটেকের দিকে নজর রেখেছি।'

মেজোমামা বললেন, 'রাখবেই তো, রাখবেই তো। তোমার হৃদয় যে মায়ের হৃদয়। কত স্নেহ, কত করুণা, মমতা, রসে টুসটুসে বিরাট একটা কমলাভোগের মতো।'

বড়মামা বললেন, 'দিস ইজ ইওর লাস্ট।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, লাস্ট। তবে শেষ কালে একটা-আধটার কাস্টমার যদি না থাকে, আমি আছি।'

কুমুদদা বললেন, 'মেজদা, আপনি চালিয়ে যান, আমার মাল বাঁধা আছে।'

কী অদ্ভুত মেয়ে চঞ্চলা। আমার মাথার ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে পরিবেশন করছে। তার শাড়ির আঁচলের এই যাওয়া আসায় আমার মাথার চুল উস্কোখুস্কো হয়ে যাচ্ছে। আঁচলটা একবার আমার নাকে জড়িয়ে গেল। একবার ইচ্ছে করে মাথায় কনুই মেরে গেল। মাথাটা কেটে ফেলে দিতে পারলে ভালো হয়!

মাসিমা একটু দূরে চেয়ারে বসে তদারকি করছেন। সাবেককালের বিরাট ওক কাঠের টেবিল। ভিক্টোরিয়ার আমলের। মুনশি জমিদাররা আমার দাদুকে উপহার দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন মুনশি হাউসের পারিবারিক চিকিৎসক। চঞ্চলার দুষ্টুমি মাসিমা দেখেও দেখছেন না। আমার সেইরকমই ধারণা।

তিন-চারদিন আগে একটা ঘটনা ঘটেছে। আমি কারোকে বলিনি। নিরঞ্জনদাকে সব কথা বলি, এই ঘটনাটা বলিনি। পাঁচ কান হয়ে যাবে। এই ঘটনাটা যেন খুব প্রাইভেট। দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর ছাদে গেছি। আলসে ধরে দাঁড়িয়ে আছি। একটু দূরে গঙ্গার ধারে, পশ্চিম দিকে রামুদের তিনতলা বাড়ি। ওরা এই সময়টায় পায়রা ওড়ায়। দামি, দামি পায়রা সিরাজু, লক্কা এই সব। ঝাঁক বেঁধে নীল আকাশে চক্কর মেরে উড়তে থাকে। মহানন্দে ডিগবাজি খায়। রোদের ডানাগুলো রুপোর মতো ঝলসে ওঠে। রামু মুখে দু আঙুল ঢুকিয়ে সিক, সিক করে সিটি বাজায়। বিভোর হয়ে দেখছি। হঠাৎ ঘাড়ের পেছন দিকটা সুড় সুড় করে উঠল। পিঁপড়ে-টিঁপড়ে হবে। না তাকিয়েই হাত দিয়ে ঝেড়ে দিলুম। আবার। ফিরে তাকাতেই চঞ্চলা, খিল খিল হাসি, হাতে একটা পায়রার পালক। বললে, লেখাপড়া নেই? আকাশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছিস!

পায়রা! সাদা-কালো। কত সুন্দর।

চঞ্চলা বলল, 'দেখ তো, আমার ঠোঁট দুটো লাল হয়েছে কি না? পান খাচ্ছি, মঘাই পান।'

পাতলা, পাতলা ঠোঁট দুটো টুকটুকে লাল। যখন চিবোচ্ছে চোখ দুটো বড় হচ্ছে, ছোট হচ্ছে। চোখের পাতাগুলো কি বড়, বড়! হঠাৎ মুখ থেকে খানিকটা চিবনো পান বের করে আমার মুখে ঢুকিয়ে দিলে। নে, নে, মা মঙ্গলচণ্ডীর প্রসাদ। প্রণামী দে। প্রণামী।'

ভোজ সভা শেষ হল। এইবার বড়মামা খুলবেন মিশরের খাতা। এ দেয়াল থেকে ও দেয়াল বড় মোটা কার্পেটটা পাতা হয়েছে। ঝাড় লণ্ঠনটা জ্বালা হয়েছে। সব জানলা খুলে দেওয়া হয়েছে। ফুরফুর করে বাতাস আসছে। সব জানলাতেই আকাশ লেগে আছে। রাত-জাগা তারাদের ছিটে। মাঝখানে বসেছেন বড়মামা। সামনে সাদা তোয়ালে দিয়ে ঢাকা জলচৌকি। কাগজ-পত্তর। একটা-ঘাড় হেঁট টেবিল আলো।

সবাই যে যার জায়গায় বসে পড়েছি। সব শেষে চঞ্চলা এল। কোথায় কী মহৎ কাজে ব্যস্ত ছিল কে জানে! চারপাশে কত জায়গা। আমাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে পাশে বসল। দু'হাত ভর্তি জল, আমার কাপড়ের কোঁচায় মোছা হল, মুখের কাছে হা করে বাতাস ছেড়ে বললে—বড় এলাচ। তারপর বললে, 'তোর গা দিয়ে ঘোড়া, ঘোড়া গন্ধ বেরোচ্ছে। আস্তাবলে ছিলিস বুঝি।'

নিরঞ্জনদা দরজার কাছে বসে আছে চৌকিদারের মতো। পরিষ্কার আকাশ। থালার মতো চাঁদ। বুদ্ধদেব বুঝি মাধুকরীতে বেরিয়েছেন।

দেয়ালে ঠেস দিয়ে বেশ জুতসই হয়ে বসেছি। পাশেই বড় জানলা। চাঁদ আলোর পিচকিরি মারছে। দেয়াল বেয়ে কিছুটা মেঝেতে এসে জমেছে। একা একা বসেছিলুম, এখন পাশে বসে গুঁতোচ্ছে অদ্ভুত সেই মেয়েটা—মাসিমার নয়নের মনি। সে আবার বলে কী, মাসিমা নাকি তাঁকে বলেছেন, ছেলেটাকে আদর দিয়ে বাঁদর করতে। শেষের শব্দ দুটো তার যোগ, 'আমি যোগ করেছি।' খুব শিগগিরি আমাকে নাকি গাছের ডালে বসে দাঁত খিঁচোতে দেখা যাবে।

আমার কানের কাছে বেশ বড়সড় একটা হাই তুলে বললে, 'আমি এখন সুখে নিদ্রা যাবো, বড়মামা যা বলবেন, কাল সকালে তুই আমাকে বলবি।'

'ঘুমোবে তো দয়া করে নিজের বিছানায় গিয়ে ঘুমোও না।'

'আমার অসুখ করেছে না কি? সবাই এখানে, আর আমি একা একটা ঘরে। চাঁদের আলোয় রাতে ভূত বেরোয়। আমাকে ভূতে ধরলে, আমি তোকে ধরব।'

চার

'আমি তখন লন্ডনে। ডাক্তার হব। মিশরের ছেলে ওমর আমার প্রাণের বন্ধু। একসঙ্গে হাসি, কাঁদি, নাচি, গাই। দুজনেই গরমের দেশের মানুষ। শীতে কষ্ট পাই। ওমরের সঙ্গে কায়রোতে ওদের বাড়ি গেলুম ছুটি কাটাতে। একেবারে অন্য রকমের একটা দেশ। শুকনো খটখটে। উঁচু পাঁচিলঘেরা অদ্ভুত নকশার একটা বাড়ি। খোলা উঠান। চতুর্দিকে খেজুর গাছ। পাকা পাকা খেজুরের কাঁদি ঝুলছে। উটের দল কাজে চলেছে।

প্রাচীন আর আধুনিক মিশিয়ে একটা শহর। সব সাদা। সাদা বাড়ি, সাদা পোশাক, সাদা-সাদা গাড়ি। আর সর্বত্র কেমন যেন একটা রহস্য, রহস্য ভাব। সূর্যদেবতা 'আমোন-রে'-র উপাসক। তিনজন ভারতীয় হিন্দু দেবতাও আছেন—মিত্র, বরুণ আর ইন্দ্র। ওদিকে নীল নদ, ধু-ধু বালি, উটের ক্যারাভ্যান, প্রবীণ রোদে-পোড়া মানুষদের ফাটা ফাটা
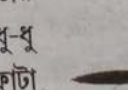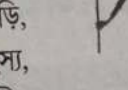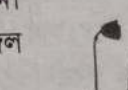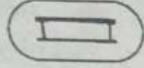
মুখ, ঝকঝকে হাসি। মেয়েরা মোটেই লাজুক নয়। মরু সুন্দরী। বালিতে সোনার রেণু। বাতাসে জীবন। ওরা মৃত্যুকে মানে না। আজ যে মৃত, সে দেহ ছেড়ে কিছুদিনের জন্যে বেড়াতে গেছে, আবার সে ফিরে আসবে। তার দেহটা সংরক্ষণ করে রাখো।

কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি মারা গেলে, সপরিবারের মহিলারা প্রথমে মাথা থেকে পা পর্যন্ত মাটি মাখবেন। পোশাকের ওপর দিয়ে কোমরটাকে ফিতে দিয়ে বাঁধবেন। তারপর মিছিল করে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে পল্লির পথে, পথে ঘুরবেন। পুরুষরা পৃথক মিছিল করবেন। মরদেহটি গৃহেই থাকবে। এরপর শোক মিছিল ফিরে আসবে। হবে কবরের ব্যবস্থা।

ওমর বলল, 'যদি ভয় না পাও, তাহলে তোমাকে মমি পাড়ায় নিয়ে যাব।'

'সে আবার কী?'

'সে এক অদ্ভুত জায়গা, লোকচক্ষুর বাইরে, পিরামিডের আড়ালে, গা ছমছমে একটি এলাকা। মমি তৈরির ওস্তাদরা সেখানে থাকেন।'

'ভয়! কীসের ভয়? আমরা মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে গিয়ে, ঘি মাখিয়ে, মন্ত্র পড়ে চিতায় চাপাই। কাঠের শয্যায় প্রিয়জনের নিথর দেহ। চির নিদ্রায়। তার ওপর আরও কাঠ। তারপর আগুন।'

'ওমরের সঙ্গে মমি তৈরির আখড়ায় গেলুম। যেন বিশাল একটা গুহা। কোথাও এতটুকু মাটি নেই। মেঝে, দেয়াল, ছাদ, সব পাথর। পর, পর কাঠের মৃতদেহ দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করান। সুন্দর সব অলংকরণ, লতা-পাতা, প্রকৃতি, পাখি, বিচিত্র সব প্রাণী, সোনার জলে, সোনার রেখায়, সোনার পাতে মোড়া। এ সব স্যাম্পল। আপনি কোনটা চান। দর-দস্তুর করে ঠিক করুন, আপনি কোন মডেল চান। ধনীরা চাইবেন একরকম, সাধারণ মানুষের সামর্থ অনুসারে সেই রকম। সব রকমের ব্যবস্থাই আছে। সব ঠিকঠাক হয়ে যাওয়ার পর দেহটি আনা হল। তারপর?

'এই কাজে যাঁরা বংশানুক্রমে অভিজ্ঞ, তাঁরা আসবেন। দেহটিকে পরিচ্ছন্ন করে, সারা দেহে প্রথমে একটা মলম মাখান হবে। নানা ভেষজ উপাদান ও মশলা দিয়ে তৈরি সেই সুগন্ধী মলম। ফর্মুলা ভেরি সিক্রেট। দেহটি কোনোদিন পচে যাবে না। এরপরের পদ্ধতি খুবই কঠিন। একটি মুখ বাঁকানো লোহার শিক দেহটির নাক দিয়ে সোজা পাঠিয়ে দেওয়া হবে মাথায়। টেনে টেনে বের করে আনা হবে ঘিলু। তারপর জলে নানা রকমের ওষুধ মিশিয়ে ওই নাকের পথেই খুব তোড়ে খুলিতে পাঠিয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে ফেলা হবে। নাক দিয়ে ঢুকে নাক দিয়েই বেরোতে থাকবে টুকরো-টুকরো নানা বস্তু। মাথা একেবারে সাফ। বেশ সময় সাপেক্ষ ধৈর্যের কাজ।'

'এইবার বেরোবে বিশেষ এক ধরনের ছুরি। ইথিওপিয়ার পাথরে তৈরি। সেই ছুরি দিয়ে লম্বালম্বি পেটের পাশ দুটো চিরে ফেলা হবে। তারপর হাত ঢুকিয়ে পেটের সব মালপত্র খালাস করা হবে। পেটটা তখন একটা খোল। একটা ব্যাগের মতো। পরিষ্কার করে ধুতে হবে। ধোয়ার জন্যে ব্যবহার করা হবে তালগাছের রস থেকে তৈরি তাড়ি বা মদ। সুগন্ধী চূর্ণ ব্যবহার করা হবে প্রচুর পরিমাণে। খালি পেটটাকে এইবার ভরা হবে। ব্যবহার করা হবে অদ্ভুত এক মিশ্রণ—ডালচিনির গুঁড়ো গঁদের আটা দিয়ে মেখে ভরে দেওয়া হবে, সঙ্গে অন্যান্য মশলাও থাকবে। গুগগুল বা ধুনোর স্পর্শ যেন না থাকে।'

'দেহটিকে এইবার সত্তর দিনের জন্যে একটি ঘরে ফেলে রাখা হবে কাপড় চাপা দিয়ে। সত্তর দিনের একদিনও বেশি নয়। দেহটিকে ভালো ভাবে স্নান করিয়ে শুকনো হবে। এইবার শেষ কাজ। গঁদ গাছের আঠা মাখানো মিহি, ব্যান্ডেজের মতো সাদা একটা কাপড় দিয়ে দেহটাকে মুড়ে ফেলা হবে। মমি প্রস্তুত।'

কাঠের শবাধার, মানুষের আকৃতিতে তৈরি। প্রায় ছ'ফুট লম্বা। কারুকার্য করা। মমিটিকে শবাধারে রাখা হবে। সমাধি ঘরের দেয়ালে ঠেসান দিয়ে কফিনটিকে খাড়া করে রাখা হবে। বৃহদাকার, বিচিত্র এক কাঠের মানুষ।

'এখনো কাজ শেষ হয়নি, পেট খালি করে যে-সব নাড়ি-ভুঁড়ি বের করা হল, ডাক্তারি ভাষায় আমরা যাকে 'ভিসেরা' বলি, তার কী ব্যবস্থা হবে! হৃদয়টা তো দেহের মধ্যেই রয়ে গেল। এই অন্ত্রকে চারটি ভাগে ভাগ করা হবে। এরা মিশরীয়দের বিশ্বাসে চারজন দেবতা, হোরাসের চারপুত্র 'ইমেস্টি', 'হ্যাপি', 'ডুয়া মুটেফ', 'কেবে-সেনুফ'। এই চারটি ভাগকে সুন্দর দুটি জারে রাখা হবে। চারজন দেবীর সুরক্ষায়। এই দেবীদের নাম 'ইসিস', 'নেফথিস', 'নিইথ' আর 'সেলকিট'। টুটেনখামেনের অন্ত্র রাখা হয়েছিল সুদৃশ্য চারটি সোনার কফিনে। প্রত্যেকটি কফিনের ঢাকনায় লেখা ছিল রক্ষাকারী দেবীদের অঙ্গীকার—আমি আমার দুই বাহুর আশ্রয়ে এই আধারটিকে রক্ষা করব।'

চঞ্চলা আমার কাঁধে মাথা রেখে নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমিয়ে পড়েছে। নরম তুলোর মতো গরম নিঃশ্বাস আমার ঘাড়ের খাঁজে ঘোরাফেরা করছে। কী ভেবেছে আমাকে কে জানে? এ কোন দেবী 'ইসিস', না 'নেফথিস'!

বড়মামা জিগ্যেস করলেন, 'বোরিং লাগছে?' সবাই একবাক্যে 'না, না, করে উঠলেন।'

'আমরা মিশরের রাজাদের বলি, ফারোয়া। ওরা বলে ফেয়্যারও। ওমর টুটেনখামেনের গল্প শুরু করল। চাঁদের আলোর গা ছমছমে রাত। মিশর প্রকৃতই একটা রহস্যময় জায়গা। ধু-ধু মরুভূমি। বিরাট পিরামিড। ছোট-বড় অনেক পিরামিড। আশ্চর্য কায়দায় তৈরি। ছায়া পড়ে না। ওমর কফি আনল। আকাশটাকে মনে হল শুকনো। চাঁদের আলোয় আমাদের আকাশটা কেমন যেন ভিজে, ভিজে লাগে। ওখানে তা নয়। ওদের দেবতা, দেবীদের চেহারা যেন কেমন, কেমন। মুখগুলো সরু, সরু। অজস্র রেখার আঁকিবুকি। ওরা সূর্যের রহস্য আমাদের চেয়ে ভালো বোঝে, আর বোঝে জ্যামিতি।

ওমর শুরু করল, কার্স অফ টুটেনখামেন। টুটেনখামেনের অভিশাপ। খ্রিস্টের জন্মের ১৩৪০ বছর আগের কথা। ফারোয়াদের অষ্টাদশতম রাজত্বকালের রাজা। প্রতাপশালী আখেনাটেমের জামাতা। মাত্র আঠারো বছর বেঁচেছিলেন। ফারোয়াদের হুঁশিয়ারি, সমাধিতে যখন আমরা নিদ্রিত, তখন আমাদের ওপর কোনোরকম উৎপাত আমরা সহ্য করব না, কিন্তু মানুষের লোভ। রাজাদের সমাধি মানেই সোনা-দানা, জহরত, মূল্যবান নানা সামগ্রী। একটা কবর খুঁজে পাওয়া মানেই রাজার ঐশ্বর্য লাভ।

'ওমর খুব সুন্দর করে গুছিয়ে বলতে পারত। আমার গল্পটা শুরু হবে ইজিপ্টে নয় ইংল্যান্ডের হ্যাম্পশায়ারের একটি বাড়িতে। বাড়িটি প্রত্নতত্ত্ববিদ লড কারনারভনের। বয়েস সাতান্ন বছর। তিনি বাড়িতে নেই, রয়েছেন কায়রোর হোটেল কন্টিনেন্টালে।'

'মধ্যরাত। হ্যাম্পশায়ারে বাড়ির পরিজনদের ঘুম ভেঙে গেল। পোষা কুকুরটি অদ্ভুত সুরে ডাকছে। কান্নার সুর। আর্তনাদ। কিছুতেই থামানো যাচ্ছে না, শান্ত করা যাচ্ছে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই কুকুরটি মারা গেল। আর কয়েক হাজার মাইল দূরে কায়রোর কন্টিনেন্টাল হোটেলে রহস্যজনকভাবে মারা গেলেন বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ লর্ড কারনারভন। ইজিপ্টোলজিস্ট। মিশরের যত পিরামিড, রাজবংশ, ধর্ম, দেব-দেবী, সমাজ জীবন, রাজবংশ সম্পর্কে তাঁর অসীম জ্ঞান। ভীষণ একগুঁয়ে। পিরামিডের অভিশাপ! ওসব যত ভয় পাওয়ানো বাজে কথা। বালকরাজা টুটেনখামেনের সমাধি আমি খুঁজে বের করবই। ঐশ্বর্যে ঠাসা। সব উদ্ধার করে এনে দেব ইংলন্ডেশ্বরীকে। সবচেয়ে বড় অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাঁর শয়নে-স্বপনে তখন টুটেনখামেন।'

'বিখ্যাত অতীন্দ্রিয়বাদী কাউন্ট হ্যামন এই অভিযানের খবর পেয়ে ছোট্ট একটি 'নোট' পাঠিয়ে সাবধান করেছিলেন, 'লর্ড কারনারভন, কবরে ঢুকো না। বিপদে পড়বে। এমন অসুস্থতা আরোগ্যের বাইরে। ওইখানেই মরে পড়ে থাকবে, সাবধান, সাবধান!' কারনারভন আরও দুজন জ্যোতিষীর সঙ্গে পরামর্শ করলেন! তাঁরাও ওই একই কথা বললেন, 'রহস্যজনক মৃত্যু, টুটেনের কবরে ঢুকবেন না।'

'কে শোনে কার কথা! কিংবদন্তী টুটেনের কবরে আছে রাজার ঐশ্বর্য। বিজ্ঞান কুসংস্কারে বিশ্বাসী নয়। আমি খুঁড়ব, মূল কবরে প্রবেশ করব। সব নিয়ে বেরিয়ে আসব। কার এমন ক্ষমতা, যে আমাকে আটকায়! এই অভিযানে তাঁর ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ও সাহায্যকারী আর্থার উইগল বলেছিলেন, 'কারনারভন পাগল হয়ে গেছে, ও যদি ওই কবরে ঢোকে কেউ তাকে বাঁচাতে পারবে বলে মনে হয় না।'

কারনারভন একটা দল গঠন করেছিলেন। সেই দলে কয়েকজন আমেরিকান ছিলেন। খোঁড়াখুঁড়ির কাজে নেওয়া হয়েছিল স্থানীয় শ্রমিকদের। সকলের মনেই বেশ ভয়ের ভাব। কারনারভন বলতে লাগলেন, 'আরে ধুর, ওসব আজগুবি কথা কেউ বিশ্বাস করে?'

'১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৩, খুঁড়তে-খুঁড়তে, ভাঙতে-ভাঙতে পৌঁছে গেলেন বালক রাজার মূল সমাধি কক্ষে। সে এক উত্তেজনা! সেই কোন কালে টুটেনখামেনকে সমাহিত করা হয়েছিল! কত কী ঘটে গেল জগতে। মাটির তলায় সেদিনের সেই রাজার দেহ সোনার কফিনে। থরে থরে রাখা সোনা, জহরত, সৌখিন কত কী! চতুর্দিকে চোখ ঝলসানো সোনা, মিশরীয় শিল্পীদের শিল্পকর্ম, যেন রূপকথার অতীত জগৎ।'

'মিশরের সেই সুদিন আর নেই। ফারোয়ারা সব পাথরের গভীরে, গুপ্ত কক্ষে, অতল নিদ্রায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষত থেকে আরোগ্যলাভ তখনো সম্ভব হয়নি। যে-কোনো দিন দ্বিতীয় সমরের তুরি ভেরি বেজে উঠবে। মানুষ, না ভগবান—কে অসহায়! বিদেশীরা তখন দুর্বল মিশরের সর্বনাশে মজেছে।'

বড়মামার কাহিনি বেশ জমে উঠেছে। চঞ্চলা আমাকে খাট ভেবেছে। নড়াচড়া করলেই বিড় বিড় করছে, খাটটা নাড়াচ্ছিস কেন? রাত কিছু কম হল না। গভীর রাতে আকাশ কীরকম একটা শব্দ করে।

বড়মামার 'মুড' এসে গেছে। বড়মামা বলছেন, 'যে জায়গাটার খনন কাজ হচ্ছে, সেই জায়গাটার নাম লুকসর। রাজাদের ঘুমোবার জায়গাটা কেমন যেন ভয়াবহ। কোথাও এতটুকু সবুজ নেই। বালি আর পাথর। অসমতল। কোথাও কোথাও পাথর ঠেলে উঠে টিলা তৈরি করে রেখেছে। যারা পিরামিড তৈরি করতে পারে, তাদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। এই রকম জমির গভীরে মৃত রাজাদের শয়নকক্ষ। প্রশস্ত, সুসজ্জিত, অলঙ্কৃত। সুন্দর গন্ধ। কবরে প্রবেশের মুখে মিশরীয় ভাষায় লেখা হুঁশিয়ারি। ইংরেজি অনুবাদ, 'Death will come to those who disturb the sleep of the Pharohs.'

'আমার কাছে একটা ছবি আছে। খোঁড়াখুঁড়ির জায়গায়—হ্যাট, কোট, প্যান্ট পরা ছ'জন সাহেব একটু উঁচুতে সারবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে। দুজনের হাতে ছড়ি। একধাপ নীচে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে পাথরের টুকরো। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তিন মেমসাহেব। যেন পিকনিক করতে এসেছেন। ছড়িধারীদের একজন, লর্ড কারনারভন, আর একজন হাওয়ার্ড কার্টার।'

'হ্যাম্পশায়ারের বাড়িতে মাঝরাতে কারনারভনের পোষ্যটি মারা গেল। আর কায়রোর কন্টিনেন্টাল হোটেলে কারনারভন বুকটা চেপে ধরে বলছেন, 'কী হল বুকে? মরে যাচ্ছি না কি?' পাশের ঘরে ছিলেন পুত্র। তিনি ছুটে এলেন। ততক্ষণে পিতা পরলোকের পথে। আর একটি আশ্চর্যের কথা, কায়রো শহরের সমস্ত আলো চলে গেল। বিদ্যুৎ বিভ্রাট। ছেলে লিখে গেছেন, 'আমরা একটা বাতির আলোয় শেষ প্রার্থনা করেছিলাম।'

'এইবার আরও আশ্চর্যের কথা, কারনারভনের মৃত্যুর প্রকৃত কারণটা কী? বাঁ গালে ছোট্ট একটা দাগ। কিছু একটা কামড়েছিল, বিষাক্ত মশা। সেই কামড়ের ফলে নিউমোনিয়া ও মৃত্যু। এইবার মহাশ্চর্য। টুটেনের শবাধার থেকে মমি বের করা হল। সাবধান বাণী, সতর্কীকরণ, সাহেবরা মানবে কেন! নানা পরীক্ষা, এক্স-রে। আর, আর যা কিছু সব। আরে এ কী? কারনারভনের

গালে, যেখানে মশার কামড়ের দাগ, টুটেনের গালের ঠিক সেই জায়গায় ওইরকম একটি দাগ। এত বছর পরেও স্পষ্ট, জ্বলজ্বলে।'

'টুটেনখামেনের অভিশাপ যেন ভয়ংকর আকার ধারণ করল, সব ক'টাকে আমি শেষ করব। কয়েকদিন পরেই হোটেল কন্টিনেন্টালে আচমকা আর একটি মৃত্যু। আমেরিকান প্রত্নতত্ত্ববিদ আর্থার মেস। এই অভিযানের অন্যতম প্রধান সদস্য। কয়েকদিন ধরেই বলছিলেন, দুর্বল, দুর্বল, হঠাৎ কোমায় চলে গেলেন। ডাক্তার আসার আগেই মৃত্যু। বোঝাই গেল না, কারণটা কী?'

'এইবার জর্জ গোল্ডের পালা। ঘনিষ্ঠ বন্ধু কারনারভনের মৃত্যু সংবাদ শুনে কায়রোতে ছুটে এসেছিলেন। বন্ধুর এত বড় আবিষ্কার। ভীষণ কৌতূহল। টুটেনের সমাধি দেখতে গেলেন। পরের দিনই ধুম জ্বর, বারো ঘন্টার মধ্যেই মৃত্যু।'

'রেডিওলজিস্ট আর্চিবল্ড রিড টুটেনের দেহ এক্স-রে করেছিলেন। ধুম করে পড়লেন, সব শেষ। কারনারভনের একান্ত সচিব, রিচার্ড বেথেল, ঘুমোতে গেলেন, আর উঠলেন না। ইংরেজ শিল্পপতি জোয়েল উল। সমাধিটি আবিষ্কারের পর তাঁকেই প্রথম আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, 'আসুন, দেখে যান এক বিস্ময়।'

'সমাধিটি দেখার কয়েকদিন পরেই তিনি এক অজানা জ্বরে মারা গেলেন। সমাধিটি আবিষ্কারের ছ'বছরের মধ্যে 'টিমের' বারোজন সদস্য মারা গেলেন। সাত বছরের মাথায় দেখা গেল খনন কার্যের সঙ্গে যুক্ত দুজন তখনো বেঁচে আছেন। ভাবতে পারো, খনন কার্যের সঙ্গে যুক্ত মোটে বাইশজন, পরপর, স্বল্প সময়ের ব্যবধানে মারা গেলেন। লর্ড কারনারভনের স্ত্রীও রেহাই পেলেন না। লর্ড, লেডি, দুজনেই খতম। পাগল হয়ে আত্মহত্যা করলেন কারনারভনের সৎভাই।'

'টুটেনখামেনের অভিশাপে একজন ছাড়া সকলেই পৃথিবী ছাড়লেন। দলের সহকারী নেতা হাওয়ার্ড কার্টারের স্বাভাবিক মৃত্যুই হল ১৯৩৯ সালে। টুটেন আবার জেগে উঠলেন ১৯৬৬ সালে। মিশরের পুরাতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টার একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করলেন প্যারিসে। টুটেনখামেনের সমস্ত সম্পদ প্রদর্শিত হবে। মহম্মদ ইব্রাহিমকে দায়িত্ব দেওয়া হল। তাঁর ঘোরতর আপত্তি। তিনি স্বপ্ন পেয়েছেন, ফারোয়ার সম্পদ মিশরের বাইরে গেলে তুমি রক্ষা পাবে না। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শেষ মিটিং। তাঁর আপত্তি কেউ শুনলেন না। মিটিং শেষে তিনি বেরিয়ে এলেন পথে। একটি গাড়ি তাঁকে পিষে দিয়ে চলে গেল।'

'শেষ জীবিত ব্যক্তি, রিচার্ড অ্যাডামসন। তিনি লর্ড কারনারভনের নিরাপত্তারক্ষী ছিলেন। তখন তাঁর বয়েস প্রায় সত্তর বছর। প্রথম টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে জোর গলায় বললেন, ওই অভিশাপ ইত্যাদি বাজে কথা, গালগপ্পো। সাক্ষাৎকারের শেষে রাস্তায় নেমে ট্যাক্সি ধরেছেন। ট্যাক্সি কিছু দূর গিয়ে মারল ধাক্কা। তিনি ছিটকে রাস্তায় পড়লেন। তাঁর মাথার ইঞ্চিখানেক দূর দিয়ে বেরিয়ে গেল একটা লড়ির চাকা। একটুর জন্যে মরতে মরতে বেঁচে গেলেন।'

'এই ভদ্রলোক এর আগেও দুবার টেলিভিশনে একই সুরে একটিই কথা বলতে চেয়েছেন, সব বাজে কথা। অভিশাপ বলে কিছু নেই। আমি ওই সব বুজরুকি বিশ্বাস করি না। প্রথম অনুষ্ঠানে এই কথা বলার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তাঁর স্ত্রী মারা গেলেন। দ্বিতীয় অনুষ্ঠানে একই কথা—বিমান দুর্ঘটনায় ছেলের কোমর ভেঙে গেল। শেষ অনুষ্ঠানের লরির চাকা থেকে মরতে মরতে বেঁচে উঠে বললেন, ''আর তেমন জোর গলায় বলতে পারছি না—অভিশাপ বলে কিছুই নেই।''

'ব্যাপারটা ক্রমশ থিতিয়ে এসেছিল, ১৯৭২ সালে আবার একবার প্রবল হল। লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বিশেষ একটি প্রদর্শনী হবে। টুটেনখামেনের মূল্যবান মুখোশটি প্রদর্শিত হবে। সোনার মুখোশ, বিস্ময়কর এক শিল্পকর্ম। কায়রোর যাদুঘর থেকে সেটি আসবে। সেখানে দায়িত্বে রয়েছেন, ডঃ গামাল মেহরেজ। মহম্মদ ইব্রাহিমের শোচনীয় মৃত্যুর পর গামাল সেই পদে এসেছেন 'ডিরেক্টার অফ অ্যান্টিকুইটিজ'। তিনি কার্স-টার্স বিশ্বাস করেন না, বেশ অহংকারের সঙ্গেই বলেন, 'আরে, আমি মিশরের রাজাদের মমি, জিনিসপত্তর অনেক দিন ঘাটাঘাটি করেছি, তেমন কিছু থাকলে এতদিনে আমারই একটা কিছু হয়ে যেত। ভালো কথা! সবাই শুনলেন।'

'জাহাজে যাবে প্রদর্শনীর জিনিসপত্র। জাহাজ কম্পানির লরিতে মাল তোলা হচ্ছে। সময়টা বিকেল। গামাল তদারকি করছেন। টুটেনের দুর্লভ, বহু মূল্যবান মুখোশটি বিশেষ একটি আধারে। সেটিও উঠে গেছে লরিতে। গামাল তখন মুক্ত, নিশ্চিন্ত। এইবার বাড়ি ফিরে বিশ্রাম। হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গেল। রাস্তাতেই পড়ে গেলেন। চলে গেলেন চির বিশ্রামে।'

বড়মামা একটু থামলেন, বললেন, 'রাত ভোর হয়ে গেল, তবে বাকি থেকে গেল অনেক কিছুই। শেষ অন্য একটি আঘাতের কথা বলি। ১৯১২ সাল। বিশাল জাহাজ অ্যাটলান্টিক পাড়ি দিচ্ছে। জাহাজে খুব মূল্যবান একটি বস্তু রয়েছে। রয়েছে একটি মমি। মমিটি এক ভাগ্যগণনাকারিণীর। টুটেনের শ্বশুরমশাই চতুর্থ আমেনহোটেপের কালে তিনি জীবিত ছিলেন। সেই সময় তাঁর বিপুল খ্যাতি। লোকে তাঁকে দেবী বলতেন। মমিটির সঙ্গে অলঙ্কারও রয়েছে। সেই অলঙ্কারে লেখা রয়েছে একটি মন্ত্র—তোমার নিদ্রার ঘোর কেটে যাক, ভেঙে যাক স্বপ্ন, জাগো, যারা তোমার বিরুদ্ধচারণকারী, এবার তারা ধ্বংস হবে।'

'মূল্যবান এই বস্তুটিকে জাহাজের হাল্ড-এ রাখা হয়নি, রাখা হয়েছে জাহাজের 'ব্রিজের' পেছনের একটি 'কেবিনে'। ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন জাহাজের ক্যাপ্টেন আরনেস্ট স্মিথ। জাহাজ এখন আটলান্টিকের সেই অঞ্চল পার হচ্ছে, সেখানে জলে নেমে এসেছে বড়-ছোট অনেক বরফের টুকরো, 'আইস বার্জ'। জলপথের এই অংশটি কাপ্তেনদের কাছে খুবই চিন্তার কারণ, তাঁদের দক্ষতার পরীক্ষা।'

'ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন স্মিথ, পেছনের কেবিনে রয়েছে মিশরের বহু-প্রাচীন সেই ধর্মমাতার মমি। অভিজ্ঞ স্মিথকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, বহু যাত্রী বোঝাই বিলাসবহুল ঝকঝকে নতুন জাহাজটি গতিপথ পরিবর্তন করবে না এগিয়ে যাবে! বিশেষ ভাবে তৈরি জাহাজটি হিমশৈল ভেঙে এগিয়ে যেতে পারবে, নির্মাতাদের এমনই দাবি। স্মিথ আদেশ দিলেন, 'সেল ফরোয়ার্ড'—এগিয়ে যাও।'

'ভুল সিদ্ধান্ত। বিশাল এক হিম শৈলে ধাক্কা মেরে জাহাজটি ডুবে গেল। প্রাণ হারালেন ১৫১৩ জন যাত্রী। মমিটির স্থান হল আটলান্টিকের জল তলে। আর জাহাজটি হল, ইতিহাস বিখ্যাত 'টাইটানিক'। টুটেনখামেনের অভিশাপ।'

বড়মামা বললেন, 'রাত ভোর, বাকিটা আর এক রাতে।'

মেজোমামা স্যাট করে বড়মামার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বললেন, 'দাদা! তুমি ডুবে ডুবে সিংকিং, সিংকিং, অ্যাঁ—এ এক অন্য বড়দা।

'ও মা, একি, একি, চঞ্চলা আমাকে পেটাতে শুরু করেছে।'

মাসিমা অবাক, 'মারছিস কেন?'

'মারব না! সারারাত আমার কানে ফুস, ফুস করে হাওয়া দিয়েছে।'

'তুই ওর কাঁধে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছিলিস কেন?'

'আর একটা কাঁধ পাবো কোথায়?'

নিরঞ্জনদা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, 'ঠিক, ঠিক, যে কাঁধে যার মাথা।'

[বিশেষ সংবাদ ঃ বেলা দশটার খবর। পরেশদার কাকা, কাকিমা, সংসার ত্যাগ করে আজই বৃন্দাবনে চলে যাচ্ছেন। অতএব, ছাগল কেনার আর দরকার নাই। ডক্টর মুখার্জি ফিলস স্যাড।] কিশোর ভারতী

প্রফুল্ল রায়

রেহানার কথা
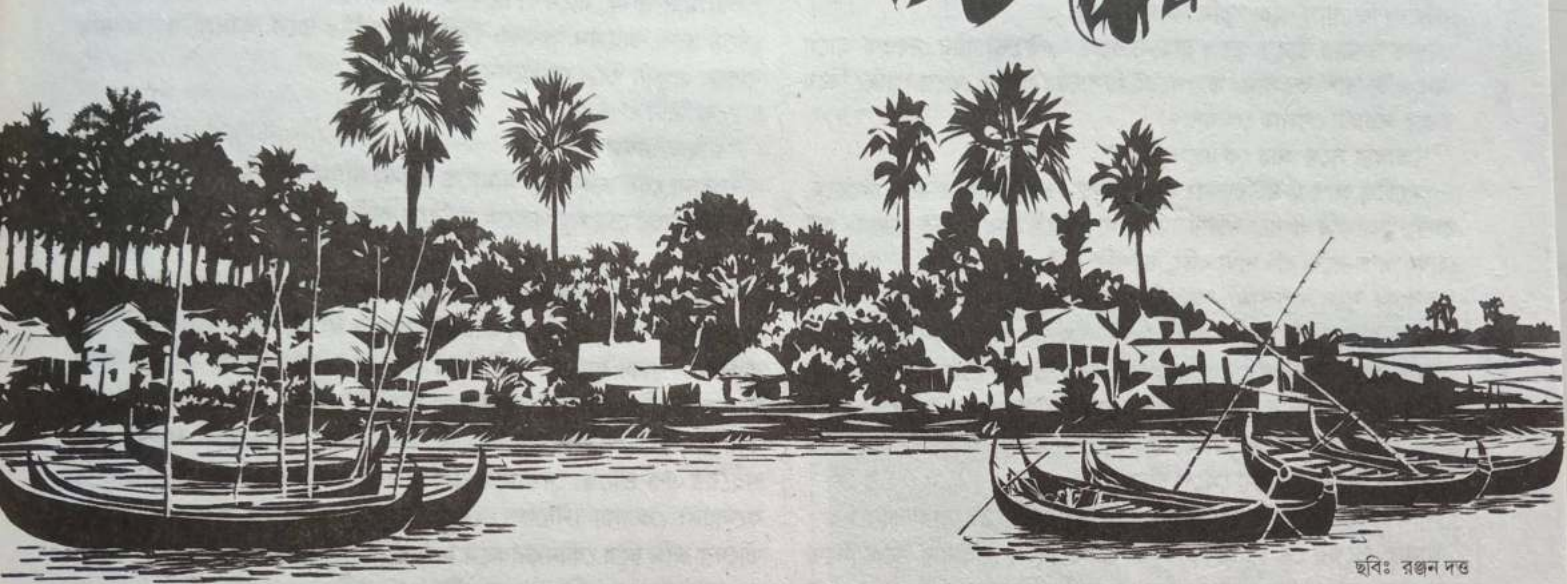
ছবিঃ রঞ্জন দত্ত

সকালবেলা, এখনও ন'টা বাজেনি, বাইরের ঘরে বসে চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ছিলাম।

আমাদের এই একতলা ছোট বাড়িটার পুব আর দক্ষিণ দিক খোলা। জানলা দিয়ে ঝিরঝিরে লঘু বাতাস ঘরে আসছিল। ভারি স্নিগ্ধ আর আরামদায়ক।

কাগজ পড়তে পড়তে মাঝে মাঝেই আমার চোখ বাইরে চলে যাচ্ছে! এখনও এই এলাকাটা বেশ শান্ত আর নির্ঝঞ্ঝাট। প্রকৃতির শেষ চিহ্নটুকুও ধ্বংস করে যখন তৈরি হচ্ছে দমবন্ধ-করা কংক্রিটের জঙ্গল, তখনও এখানে থেকে গেছে বেশ কিছু ফাঁকা জমি। আছে প্রচুর গাছপালা। নিম, পাকুড়, রেনট্রি, দু'চারটে কলকে ফুলের গাছও। আজকাল পরিবেশওয়ালাদের চেঁচামেচিতে বনসৃজনের একটা হিড়িক পড়ে গেছে। কিন্তু এই গাছগুলো কেউ লাগায়নি, নিজেরাই জন্মেছে এবং নিজেদের এনার্জির জোরেই টিকে আছে।

সব ক'টা গাছের মাথায় অজস্র পাখি উড়ছিল। চলত, অবিরল কিচিরমিচির। খাদ্যের খোঁজে ওরা দিকে দিকে পাড়ি দেবে, চলছে তারই তোড়জোড়। সারাদিন পর ওদের ফিরতে ফিরতে সেই সন্ধে।

মাসখানেক আগেও আকাশ ঘন মেঘে ছেয়ে থাকত। তখন সারাদিন জল ঝরছে। কখনও ঝরঝর, কখনও মিহি ইলসেগুঁড়ি। এখন আর চেনাই যায় না। দুটো মাস বর্ষার জলে ধুয়ে ধুয়ে আকাশ ঝকঝকে নীল, মেঘগুলো তার গায়ে ধবধবে তুলোর পাহাড়।

কারা যেন অদৃশ্য জাদুকলস উপুড় করে চারদিকে সোনা ঢেলে দিচ্ছে। রোদে এই সময় গলানো গিনির রং। শরৎকাল এই স্থবির, মলিন, হাজারটা দূষণে ভরা শহরে তার ম্যাজিক নিয়ে হাজির।

আমার বয়স সত্তর পেরিয়েছে। সাংবাদিকতা করতাম। পাশাপাশি নানা ধরনের লেখালেখিও; সেটাই আসল; রিটায়ারমেন্টের পর লেখার কাজ চলছেই।

আমার মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। তারা যে যার সংসারের খাঁচায়। আমাদের পরিবারটি ছোট হতে হতে এখন দু'জনে ঠেকেছে। আমি আর আমার স্ত্রী। দু'জনেরই কত রকমের যে অসুখ। হার্ট, কিডনি, চোখ— কিছুই ঠিকঠাক নেই। গণ্ডা গণ্ডা ট্যাবলেট আর ইঞ্জেকশনে সেগুলো চাঙা রাখার চেষ্টা চলছে। মূল ব্যাপারটা হল—বয়স। এইভাবে যে ক'টা দিন টিকে থাকা যায়।

হঠাৎ ডোরবেল বেজে ওঠে।

খবরের কাগজওলা ভোরে কাগজ দিয়ে যায়। একটা লোক ঠিক করা আছে, সেও সাতটার ভেতর দুধ দিয়ে গেছে।

এসময় তো কারও আসার কথা নেই। তা হলে? উঠে গিয়ে দরজা খুলতেই দেখা গেল, একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শ্যামলা রং হলেও ভারি সুশ্রী। এমন বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল চোখমুখ ক্বচিৎ চোখে পড়ে। পরনে চমৎকার কাজ-করা ঢাকাই শাড়ি। বাঁ-হাতে ঘড়ি, ডান হাতে রুলি আর গলায় লকেটওলা চেন। কাঁধ থেকে একটা বড় চামড়ার ব্যাগ ঝুলছে।

অবাক তাকিয়ে থাকি। আগে কখনও দেখেছি কিনা মনে পড়ল না। বললাম, তোমাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না। তুমি—'

মেয়েটি মিষ্টি করে হাসে। আমাকে প্রণাম করে বলে, 'চেনার কোনও কারণ নেই। আগে আমাদের সামনা-সামনি দেখা না হলেও খবরের

কাগজে, আপনার বইয়ের ব্যাক-কভারে, আপনার ছবি দেখেছি। কি, বাইরেই দাঁড় করিয়ে রাখবেন?'

বিব্রত হয়ে পড়ি। ব্যস্তভাবে বলি, 'এসো-এসো, ভেতরে এসো—'

মেয়েটিকে বসিয়ে একটু দূরে আমিও বসে পড়ি। সে এবার নিজের পরিচয় দেয়। 'আমার নাম রেহানা—রেহানা হক।'

একটি অচেনা মুসলিম মেয়ে হঠাৎ কী কারণে আমাদের বাড়িতে এল, আদৌ বোধগম্য হচ্ছে না।

রেহানা বলে চলেছে, 'আমাদের বাড়ি বাংলাদেশে। ক'দিন হল আমি একটা রিসার্চের ব্যাপারে কলকাতায় এসেছি। লেক গার্ডেনসে আমাদের চেনাজানা একটা ফ্যামিলিতে উঠেছি। আপাতত মাসচারেক এখানে থাকব। তেমন দরকার হলে ভিসার মেয়াদ এক্সটেন্ড করতে হবে।'

রেহানার কথা বলার ভঙ্গিতে ওপার বাংলার টান। আগে সেটা লক্ষ করিনি। জিগ্যেস করি, 'তুমি কি ম্যারেড?'

ভুরু সামান্য উঁচুতে তুলে রেহানা বলে, 'এই তো বছর দেড়েক আগে এম.এ'টা পাশ করলাম। তারপরেই রিসার্চের কাজে লেগে গেছি। বিয়ে করার সময়টা পেলাম কোথায়?'

'তোমার সঙ্গে আর কে এসেছেন?'

মেয়েটা আশ্চর্য থটরিডার। আমার মনোভাব লহমায় ধরে নিয়েছে, বলল, 'আপনি আমার দাদার (ঠাকুরদা) চেয়ে কিছু ছোটই হবেন। যাই হোক, আপনাকে যদি দাদা বলি, আপত্তি নেই তো?'

হালকা সুরে বললাম, 'আপত্তি কী বলছ! আমার নাতনির সংখ্যা বাড়বে, তাও একটি বাংলাদেশি নাতনি—এ তো আমার সৌভাগ্য।'

মাথা সামান্য ঝাঁকিয়ে, হেসে হেসে, তরল গলায় রেহানা বলে, 'কেউ আমার সঙ্গে আসে নি। একাই এসেছি। আপনার হয়ত ধারণা, বাংলাদেশের মেয়েরা হারেমে পড়ে আছে। আমাদের মতো অনেকেই এখন মুক্ত আকাশে ডানা মেলে দিয়েছে।'

আমি এবার জিগ্যেস করি, 'তুমি যাঁদের বাড়ি উঠেছ তারা কারা?'

আমার প্রশ্নের ভেতর একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ছিল। রেহানার বুঝে নিতে সময় লাগে না। মজার গলায় সে বলে, 'তাঁরা হিন্দু, মুখার্জি ব্রাহ্মণ। ওই ফ্যামিলির কর্তা ইকনমিকসের নাম-করা প্রফেসর। ঢাকায় একটা সেমিনারে গিয়েছিলেন। তখন আলাপ হয়েছিল। ওঁরা খুব উদার, সহৃদয় মানুষ। আমি ও বাড়িতে মেয়ের আদরে আছি।'

মেয়েটার মধ্যে জলপ্রপাতের মতো কিছু আছে। স্বচ্ছন্দ, অনায়াস, অনর্গল। আমি থতিয়ে যাই। কিছুক্ষণ পর জিগ্যেস করি, 'ঠিকানা টিকানা জোগাড় করে এই যে তুমি আমার কাছে এসেছ, কিছু দরকার আছে কি?'

'দরকার না থাকলে কেউ এত কষ্ট করে?'

'বল, তোমার কী প্রয়োজন—'

রেহানা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, আচমকা মনে পড়ে যায়, মেয়েটা সেই বাংলাদেশ থেকে এতদূরে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, অথচ তাকে এক কাপ চা-ও দেওয়া হয়নি। রেহানাকে বসিয়ে রেখে ভেতরে গিয়ে নমিতাকে রেহানার কথা বলে এলাম। নমিতা আমার স্ত্রী।

খানিক পরেই নমিতা চা মিষ্টি কাজুবাদাম নিয়ে এল। রেহানার মধ্যে একটা আপন-করা ব্যাপার আছে। সে হইচই বাধিয়ে কয়েক মিনিটের ভেতর নমিতাকে জাদু করে ফেলল। তবে কথাবার্তায় বা আচরণে বোঝাই যায় না, আজই প্রথম সে এ বাড়িতে এসেছে।

নমিতার সঙ্গে কিছুক্ষণ কল কল করে আমার দিকে তাকায় রেহানা। 'এবার কাজের ব্যাপারটা শুরু করা যাক। দরকারের কথা বলছিলাম না?'

আমি উৎসুক হলাম।

রেহানা বলতে লাগল, 'আমি যে সাবজেক্টটা নিয়ে রিসার্চ করছি তাতে আপনার সাহায্য না পেলেই নয়।

'কী সাহায্য—'

আমাকে শেষ করতে দিল না রেহানা। বলল, 'তার আগে ডিটেলে আমার পরিচয়টা শুনে নিন। বাজিতপুরের নামটা মনে আছে কি?'

জিগ্যেস করি, 'তুমি কি ঢাকা ডিস্ট্রিক্টের বিক্রমপুর এরিয়ার বাজিতপুর টাউনের কথা বলছ?'

'ঠিক তাই।'

'কী আশ্চর্য মনে থাকবে না? ওটাই আমার জন্মস্থান, আমার দেশ। সাত আট জেনারেশন আমরা ওখানে কাটিয়েছি। কিন্তু বাংলাদেশের এত জায়গা থাকতে হঠাৎ বাজিতপুরের কথা বললে যে?'

রেহানা বলল, 'ওটা আমারও জন্মভূমি। আমার ধারণা, যে বাড়িতে আপনার জন্ম হয়েছে, আমিও সেখানে জন্মেছি।'

পলকে আমার শিরদাঁড়া টান টান হয়ে যায়। হাড়ে মজ্জায় খেলে যায় চমক। উত্তেজনায় কাঁপছিলাম। রুদ্ধস্বরে জানতে চাই, 'তুমি কার মেয়ে?'

'আমার আব্বু, মানে বাবাকে আপনি চিনবেন না। আপনারা যখন দেশ ছেড়ে চলে আসেন তখনও তিনি জন্মাননি। তবে আমার দাদার নাম বললে এক্ষুনি চিনে ফেলবেন।'

'কে তিনি?'

'জামালউদ্দিন হক—'

রেহানা যেন একটানে আমাকে একটা টাইমমেশিনে তুলে দিল। দীর্ঘ পঞ্চান্নটা বছর চোখের পলকে পেরিয়ে আমি পৌঁছে গেলাম বাজিতপুরে।

তিন দিকে অফুরান ধানের খেত, একদিকে নদী, নদীর ধারে ছোট্ট লঞ্চ-ঘাট, অজস্র নৌকা, দু-চারটে খোয়ার রাস্তা, বাকি সব মেটে পথ, দু-চারটে পাকা দালান, বাকি সব টিনের চালের ক্যাঁচা বাঁশের বাড়ি, ইলেকট্রিসিটি তখন স্বপ্ন। জনসংখ্যা কত হবে? বড় জোর হাজার সাতেক। তার আধাআধি হিন্দু, আধাআধি মুসলমান। মুসলমান পাড়াটা ছিল শহরের এক প্রান্তে। দেখামাত্র টের পাওয়া যেত, ওটা হতদরিদ্র মানুষের কলোনি। কেরায়া নৌকো বেয়ে, হিন্দুদের বাড়িতে কামলা খেটে বা তাদের জমি চষে কোনওরকমে দিন কাটিয়ে দিত।

সে আমলের বাজিতপুরের জীবন ছিল ঢিমে তালের। কারও এতটুকু তাড়াহুড়ো নেই। সন্ধেবেলায় আঁধার নামলে খানিকক্ষণ ঘরে ঘরে হেরিকেন কি কুপি জ্বলত। তারপর রাতের খাওয়া চুকিয়ে, বাতি টাতি নিভিয়ে, বাজিতপুর গভীর ঘুমের আরকে ডুবে যেত।

এই শান্ত, বিঘ্নহীন শহরে একমাত্র ব্যতিক্রম জামালউদ্দিন। মেজাজ উগ্র, বেপরোয়া দুর্দান্ত স্বভাব। কথায় কথায় তার সড়কি চলে। দু-চারদিন পর পর একটা না একটা ফেসাদ বাধিয়ে বসত। ওর নামে ঝুড়ি ঝুড়ি নালিশ। বেশ কয়েকবার থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে বেদম পেটানো হয়েছে। কিন্তু শোধরানো যায়নি।

ওর বাপ জলিলউদ্দিন, সংক্ষেপে জলিল, আমাদের বাড়িতে কামলা খাটত। খুবই ভালোমানুষ। বিনয়ী। আক্ষেপ করে বলত, ছেলের জন্য কারও কাছে মুখ দেখাতে পারে না।

উনচল্লিশের শেষ দিকে মহাযুদ্ধ শুরু হল। তারপর থেকে ঝড়ের গতিতে পালটে যেতে লাগল সময়। ইউরোপ তখন জ্বলছে। দিনরাত নানা রণাঙ্গনে হাজার হাজার ট্যাঙ্কের অবিরাম ঘর্ঘর, মিলিটারি কনভয় চলছে স্রোতের মতো। দিনরাত ঝাঁকে ঝাঁকে বোমারু বিমানের হানা, অ্যান্টি এয়ারক্রাফ্ট কামান, গ্রেনেড, মেশিনগানের গর্জন। ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে কত যে জনপদ। লাখে লাখে মৃতদেহ পড়ে থাকছে রাস্তায় রাস্তায়।

দেখতে দেখতে আগুনের মতো যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ল এশিয়ায়। জাপবাহিনী ধেয়ে আসছে ভারতবর্ষের দিকে। মালয়, সিঙ্গাপুর, বার্মার পতন ঘটেছে। যে কোনও দিন তারা ইন্ডিয়ায় ঢুকে পড়বে। একবার যদি কলকাতায় চলে আসতে পারে, পুরো দেশটা দখল করে নিতে তাদের আর ক'দিনই বা লাগবে।

শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষের মাটিতে যুদ্ধটা আর হল না। দাঁতে দাঁত চেপে যুঝে মিত্রশক্তি, অর্থাৎ ইংল্যান্ড, আমেরিকা আর তাদের সহযোগী দেশগুলোর সম্মিলিত বাহিনী জাপানিদের রুখে দিল।

আমাদের দেশে লড়াই হয়নি কিন্তু তার যাবতীয় কুফল ছড়িয়ে পড়েছিল। ব্ল্যাক মার্কেটিং, হোর্ডিং—এই সব শব্দ তখন প্রথম শোনা গেল। ধান চাল এবং অন্যান্য খাদ্যশস্য বাজার থেকে রাতারাতি উধাও হল। যেটুকু পাওয়া যায় তার দাম আকাশছোঁয়া। গরিবগুরবোদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। শুরু হয়ে গেল বাংলা পঞ্চাশ সালের মন্বন্তর। ইংরেজীতে সেটা উনিশ শ' তেতাল্লিশ। তখনকার অখণ্ড বাংলায় অনাহারে পঞ্চাশ লাখ মানুষ মারা গেল, একেবারে মাছির মতো। আমাদের সেই বাজিতপুরও বাদ গেল না। সেখানেও পথে পথে ক্ষুধার্ত, প্রেতের মতো শীর্ণ কঙ্কালসার মানুষের অনন্ত মিছিল। অবশেষে মৃত্যু।

আরও দু'বছর বাদে পঁয়তাল্লিশে যুদ্ধ শেষ। ইংরেজরা জিতল ঠিকই, কিন্তু জার্মান বোমায় ব্রিটেনের অর্ধেক চুরমার, তাদের অর্থনীতির শিরদাঁড়া লড়াইয়ের খরচ জোগাতে জোগাতে বেঁকে দুমড়ে গেছে। নিজেদের দেশ নতুন করে গড়ে তুলবে, না হাজার হাজার মাইল দূরে ভারতবর্ষের কলোনি সামলাবে?—তাদের সামনে এখন এই দুই বিরাট প্রশ্ন। তারা সিদ্ধান্ত নিল, নিজের দেশের পুনর্গঠন আগে। ভারতীয় নেটিভদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে দুশো বছরের কলোনি ছেড়ে চলে যাবে।

'আমরা বিদায় নিচ্ছি। তোমরা মিলে মিশে গদিতে চেপে বসো।' ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়াটা এত সহজে সম্ভব হয়নি। মুসলিম লিগ আগে থেকেই ধুয়ো তুলেছিল, দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশটা দু টুকরো করে মুসলমানদের জন্য একটা আলাদা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র চাই। সমস্ত ভারত জুড়ে তখন তাদের একটাই শ্লোগান। পাকিস্তান কায়েম করতে হবে। 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান।'

যত দিন যাচ্ছে, উত্তেজনার পারদ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে লাগল।

তারপর ছেচল্লিশের দাঙ্গা। গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং। সেটা ছড়িয়ে পড়ল দশ দিগন্তে। বিহার, নোয়াখালি, লাহোর, পাঞ্জাব, করাচি— সর্বত্র হত্যা, ধর্ষণ, আগুন, অজস্র রক্তপাত। অন্ধকার বর্বর যুগ নেমে এসেছিল সারা ভারতবর্ষ জুড়ে।

বাজিতপুর তো দেশের বাইরে নয়। সারা ভারত যখন জ্বলছে তখন তার পক্ষে কি নির্বিকার থাকা সম্ভব? এই শান্ত, নগণ্য, ভূখণ্ডটিতেও আগুনের আঁচ এসে লাগল।

দাঙ্গার সময় জামালউদ্দিনের মতো বেপরোয়া হিংস্র যুবকদের খুবই কদর। সে নিজের থেকে মুসলিম লিগে নাম লেখাল, না মুসলিম লিগই তাকে কোলে তুলে নিল, এতকাল বাদে আর মনে পড়ে না।

বাজিতপুর এবং চারপাশে বিশ-পঁচিশটা গ্রামে যে দাঙ্গা শুরু হল তার ফিল্ড মার্শাল জামালউদ্দিন। সে তখন ওই অঞ্চলের বহু যুবকের রোল মডেল।

ছেচল্লিশের দাঙ্গাটা কিন্তু বাজিতপুরে তেমন বিশাল আকারে হয়নি। কয়েকটা খুনজখমের ঘটনা, কিছু লুটপাট আর অনেকগুলো বাড়িতে আগুন লাগানো—এর মধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছিল।

এক বছর পর আগুনে পুড়তে পুড়তে, রক্তে ভাসতে ভাসতে দেশ দু'ভাগ হয়ে গেল। পূর্ব বাংলা তখন পূর্ব পাকিস্তান।

দেশভাগও কিন্তু শান্তি ফেরাতে পারল না। যে আগুনটা জ্বলছিল সেটার তেজ বেড়ে গেল শতগুণ। তখন পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে শুধু ঘৃণা, বিদ্বেষ, অবিশ্বাস। আবহাওয়া বিষ বাষ্পে ভরা।

নতুন করে ফের দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল। এবার সেটা আরও ভয়াবহ, আরও ব্যাপক। হিন্দুদের সম্পত্তি, জমি জমা দখল কর। তাদের উচ্ছেদ করে পাঠিয়ে দাও সীমান্তের ওপারে।

বাজিতপুরে আমাদের ধান জমি ছিল সবার চেয়ে বেশি। প্রায় আশি কানির মতো। তা ছাড়া পাকা দালান, ফলের বাগান, দীঘির মতো মস্ত পুকুর, প্রথমেই আমাদের ওপর নজর এসে পড়ল। আমরা জামালউদ্দিনের টার্গেট হয়ে গেলাম।

যার নিরীহ বাপ আমাদের বাড়িতে কামলা খাটত তার ভয়ে আমরা তখন কাঁপছি। যে কোনও মুহূর্তে চরম সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে। এক জামাকাপড়ে একদিন দেশ ছাড়তে হল। রাতের অন্ধকারে পালিয়ে এলাম তারপাশা স্টিমার ঘাটে। সেখানে হাজার হাজার ছিন্নমূল মানুষ ভিটেমাটি খুইয়ে প্রাণটুকু বাঁচাবার জন্য জড়ো হয়েছে।

সাতদিন তারপাশায় পড়ে থাকার পর স্টিমারে ওঠার সুযোগ পাওয়া গেল। গাদাগাদি ভিড়ে একটা জায়গা করে পৌঁছে গেলাম গোয়ালন্দে। ওখান থেকে রোজ একটা করে ট্রেন, যার নাম ছিল 'রিফিউজি স্পেশাল', ছাড়ত। সেই ট্রেনে কলকাতায় চলে এলাম।

আমাদের পূর্ব পুরুষের বাড়িঘর, খেতখামার আর আমাদের রইল না। সব দখল করে নিল জামালউদ্দিন। পূর্ব পাকিস্তানে আমরা 'নেই' হয়ে গেলাম।...

যে অলৌকিক সময়যান আমাকে পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেটাই ফের একই পদ্ধতিতে দু হাজার চারের শরৎকালের সকালটিতে ফিরিয়ে নিয়ে এল।

অন্যমনস্কতা কেটে গিয়েছিল। লক্ষ করলাম রেহানা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। পলকহীন। হয়ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছিল।

চুলবুলে, প্রাণবন্ত মেয়েটাকে এখনে আর চেনাই যায় না। বিমর্ষ সুরে জিগ্যেস করল, 'যে লোকটা আপনাদের দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছে, জোর করে সমস্ত কিছু কেড়ে নিয়েছে, তার নাতনিকে খুব ঘেন্না হচ্ছে তো?'

বিশ-পঁচিশ বছর আগে হলেও কী করতাম, কী বলতাম, জানি না। সত্তর পেরুবার পর ক্ষোভ, ক্রোধ, বিদ্বেষের ধার অনেক কমে গেছে। বললাম, 'না না, তোমার ওপর রাগ হবে কেন? তোমার কী অপরাধ?'

নমিতাও আমার কথায় সায় দিল।

আমি বললাম, 'একটা ব্যাপারে খুব আশ্চর্য হচ্ছি রেহানা। তোমার দাদা ছিল একটা অশিক্ষিত, দাঙ্গাবাজ, বর্বর টাইপের লোক। কথাটা বললাম বলে কিছু মনে কোরো না।'

আস্তে মাথা নাড়ে রেহানা। 'যা সত্যি তাই বলেছেন। মনে করার কিছু নেই।'

বলতে লাগলাম, 'জামালউদ্দিনের নাতনি হয়ে এত নম্র, ভদ্র, এত শিক্ষিত—আমি তো ভাবতেই পারছি না।'

রেহানা জানায়, তার আব্বু অর্থাৎ বাবার জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে। বাবার নাম আফতাব হক। আফতাব লেখাপড়ার মহিমাটা কম বয়স থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন। জামালউদ্দিন চায়নি ছেলে পড়াশোনা করে দিগ্‌গজ হোক। বরং হিন্দুদের যে জমি টমি পাওয়া গেছে সে সব দেখাশোনা করুক। পায়ের ওপর পা তুলে আরামে জীবন কেটে যাবে। আফতাব শোনেননি। জেদ ধরে স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে ঢাকায় চলে গেছেন। সেখান থেকে আই. এ, বি.এ এবং এম.এ করে তিনি গভর্নমেন্ট অফিসার। নিজের মতো করে ছেলেমেয়েদের মানুষ করে তুলেছেন। রেহানারা দুই বোন, এক ভাই। ভাই ডাক্তার। তার বোন রোকেয়া অধ্যাপিকা। ঢাকায় আফতাব একটা ফ্ল্যাট কিনেছেন। রেহানারা সেখানেই থাকে। মাঝে মাঝে বাজিতপুরে যায়।

জিগ্যেস করি, 'জামালউদ্দিন কোথায় আছে? কী করছে এখন?'

'দশ বছর আগে দাদা মারা গেছেন।'

একটু নীরবতা।

তারপর বলি, 'এবার তোমার রিসার্চের বিষয়টা বল—'

রেহানা জানাল, বিক্রমপুর থেকে যে সব হিন্দু ভারতে চলে এসেছে তারা কে কোথায় আছে, নতুন দেশে কী ধরনের সংগ্রাম করে তাদের টিকে থাকতে হয়েছে, এই সব নিয়ে একটা প্রামাণ্য বই সে লিখতে চায়। বাজিতপুরের উৎখাত হিন্দুদের নিয়ে শুরুটা করবে। তারপর বিক্রমপুরের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষজন সম্পর্কে গবেষণা চালাবে। কলকাতায় তার আসার উদ্দেশ্য বাজিতপুরের যে সব মানুষ এখানে চলে এসেছে তাদের সঙ্গে দেখা করা তাদের জীবন যুদ্ধের অনুপুঙ্খ বিবরণ রেকর্ড করে নেওয়া। তা ছাড়া, এখানকার লাইব্রেরিতে গিয়ে বইপত্র দেখতে হবে। ঘাঁটাঘাঁটি করতে হবে পুরনো খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। রেহানাদের বংশ লতিকার কথা মনে করলে হতবাক হতে হয়। ওর বাবার ঠাকুরদা ছিল আমাদের কামলা, ঠাকুরদা লিগের দুর্ধর্ষ পাণ্ডা। সেই পরিবারের মেয়ে হয়ে সে কিনা রিসার্চ করতে কলকাতায় ছুটে এসেছে। তাও উদ্বাস্তুদের নিয়ে! ভাবা যায়! মেয়েটা যেন আমাকে দম ফেলতে দিচ্ছে না। এক বিস্ময় থেকে আরেক বিস্ময়ের দিকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে।

জিগ্যেস করি, 'তুমি এরকম বিষয় বেছে নিলে কেন?'

'বা রে, লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের জন্মভূমি ছেড়ে অন্য একটা দেশে চলে এল। পরবর্তী জেনারেশনের জন্যে তার একটা ডকুমেন্ট রেখে যেতে হবে না? আমি বাজিতপুরের উদ্বাস্তুদের একটা লিস্ট করে নিয়ে এসেছি। মনে হয় তার বাইরে আরও কেউ কেউ থাকতে পারে। আপনাদের লিস্টটার ফোটো কপি দিয়ে যাব। দেখবেন কারও নাম বাদ পড়েছে কিনা। পড়লে তাদের নাম এখনকার ঠিকানা অ্যাড করে দেবেন। পরে এসে ওটা নিয়ে যাব।'

'রেহানা, বিক্রমপুর তো বিরাট জায়গা। আমাদের বাজিতপুর থেকেই হাজার তিনেক মানুষ চলে এসেছে। তাদের কেউ গেছে আসামে, কেউ ত্রিপুরায়, কেউ আন্দামানে, কেউ দণ্ডকারণ্যে। এদের হদিস আমি দিতে পারব না। অবশ্য নাইনটি পারসেন্টই এসেছে কলকাতায়। তাদের অনেকেই মারা গেছে। যারা বেঁচে আছে তাদের কারও কারও সঙ্গে আমার যোগাযোগ রয়েছে। ওদের নাম ঠিকানা পেয়ে যাবে।'

'দেশভাগের যারা ডাইরেক্ট ভিকটিম তাদের কাছে সেই সময়ের ট্রু পিকচারটা পাওয়া যায়। সেই জন্যেই ওদের খুঁজছি।'

'ঠিক আছে।'

রেহানা এবার তার ব্যাগ থেকে টেপ-রেকর্ডার বার করে চালিয়ে দিতে দিতে বলল, 'এখন আপনার কথা বলুন। ইণ্ডিয়ায় আসার পর এতগুলো বছর কীভাবে কাটিয়েছেন, সব ডিটেলে শুনব। কিচ্ছু বাদ দেবেন না—'

আমি শুরু করি। পঞ্চান্ন বছর আগে শিয়ালদায় পৌঁছবার পর কয়েকটা দিন স্টেশনে অগুনতি উদ্বাস্তুর সঙ্গে কাটানো, তারপর কয়েকদিন রিলিফ ক্যাম্পে। সেখান থেকে বিহার। বিহার থেকে আবার কলকাতায়। এর মধ্যে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া। সেই সঙ্গে নানা উঞ্ছবৃত্তি করে কোনওরকমে টিকে থাকা। শেষ পর্যন্ত খবরের কাগজে চাকরি জোটানোর পর পায়ের তলায় জমি পাওয়া। ঠিকমতো স্থিত হয়ে বসতে একটা পুরো জীবন কেটে গেল।

বললাম, 'আমি তো মোটামুটি ভদ্র জীবন যাপন করতে পারছি। কিন্তু হাজার হাজার মানুষ পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। কত মেয়ে যে বাঁচার জন্য ব্রথেলের নরকে গিয়ে নাম লিখিয়েছে তার হিসেব নেই।'

ঘরের ভেতর অপার নৈঃশব্দ্য নেমে আসে।

একসময় টেপ-রেকর্ডার বন্ধ করে ব্যাগে পুরতে পুরতে রেহানা বলে, 'একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে—'

'কী, বল না—'

'দেশের কথা মনে পড়ে না?'

আমি চুপ করে থাকি।

রেহানা বলে, 'আপনাদের বাজিতপুরের বাড়িটা তো সারাবছর ফাঁকাই পড়ে থাকে। ক'দিন সেখানে কাটিয়ে আসুন না। যদি বলেন, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব?

চকিতে কিছু মনে পড়ে যায়। বলি, 'তোমাদের দেশ কিছুদিন আগেও ছিল সেকুলার রিপাবলিক। এখন আর তা নেই। ফাণ্ডামেন্টালিস্টরা সেখানে ভীষণ গণ্ডগোল করছে। যেতে সাহস হয় না।'

'ফাণ্ডামেন্টালিজমের সমস্যা তো সমস্ত পৃথিবী জুড়ে। কোথাও একটু বেশি, কোথাও কম। কিন্তু সেখানে আমার মতো অনেক ছেলেমেয়ে রয়েছে। অন্যায় দেখলে আমরা মিছিল করি। মিটিং ডেকে প্রতিবাদও জানাই। আপনাদের এখানকার কাগজে সে সব খবর বেরোয় না?'

স্বীকার করতেই হয়, 'বেরোয়। মাঝে মাঝে চোখে পড়ে।'

আন্তরিক সুরে রেহানা ফের বলে, 'চলুন একবার—'

আরও কিছুক্ষণ কাটিয়ে সে চলে যায়। নমিতাও ভেতরে চলে গেছে। আমি বাইরের ঘরে নীরবে বসে থাকি।

পঞ্চান্ন বছরে অনেক কিছুর মতোই বাজিতপুর আমার স্মৃতিতে ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। রেহানা নামের এক পরমাশ্চর্য মেয়ে আচমকা চলে এসে বুকের কোনও গোপন কুঠুরি খুলে সুপ্ত এক বাসনাকে টেনে বার করে এনেছে। মৃত্যুর আগে একবার হয়তো জন্মভূমিতে যেতে হবে। ■

দুষ্প্রাপ্য। পুনর্মুদ্রিত।

অন্যজগতের তারকা

নচিকেতা

একটা গানের জন্যে

প্রকাশকের কথা

আমি একজন প্রকাশক। আমার একটি পত্রিকা আছে। মাসিক। বিক্রিবাট্টা ভালোই হতো, কিন্তু দুবছর করোনা মহামারীর জন্য বিক্রির অবস্থা ভালো নয়। আজকাল মানুষ আর বই পড়তে চায় না। মোবাইলই এখন ঋকবেদ, গুগুলই এখন জ্ঞানবৃক্ষ।

মানুষ এখন মোবাইল আঁকড়ে দিনমান পাত করছে। মোবাইলই আরাধ্য দেবতা, যেন শালগ্রাম শিলা। যাক সে সব কথা। যা বলছিলাম, বইয়ের বাজারে মন্দা আসায় একটা নতুন আইডিয়া মাথায় এল। যদি অন্য জগতের নামী লোকদের দিয়ে লেখানো যায়, তো মানুষের চোখ শালগ্রাম শিলা থেকে বইয়ের দিকে আসতেও পারে।

এই ভেবেই আজ আমি বেলগাছিয়ার পথে। উদ্দেশ্য অনির্বাণের কাছ থেকে একটা লেখা বাগানো। অনির্বাণ গানের জগতের সেলিব্রিটি। সুপারস্টার বলা যেতে পারে। নিজেই লেখে, নিজেই সুর করে, নিজেই গায়। থ্রি ইন ওয়ান। গল্পের হাতও খারাপ নয়। এর আগে দু-চারটে গল্প দিয়েছিল, মন্দ হয়নি। এবার যদি আত্মজীবনী টাইপের লেখা ধারাবাহিক হিসেবে দেয়, তাহলে পত্রিকার পক্ষে বেশ ভালো হয়। তবে লিখবে কি না, সেটাই প্রশ্ন।

মালটা একটু ছিটেল। অনির্বাণের ফ্ল্যাটের দরজা খোলা ছিল, উঁকি দিয়ে ঢুকে পড়লাম। অনির্বাণ বাইরের ঘরেই একটা ইজিচেয়ারে হাঁটু মুড়ে বসে। গায়ে একটা চাদর, সারা ঘরে গাঁজার গন্ধ। একটু আগেই বোধহয় সেবন হয়েছে।

অনির্বাণ এমনিতেই রোগা, এখন আরও রোগা হয়ে গেছে। আমি অনির্বাণের দিকে তাকিয়ে একটু কাষ্ঠ হাসি হেসে বললাম, এই এলাম।
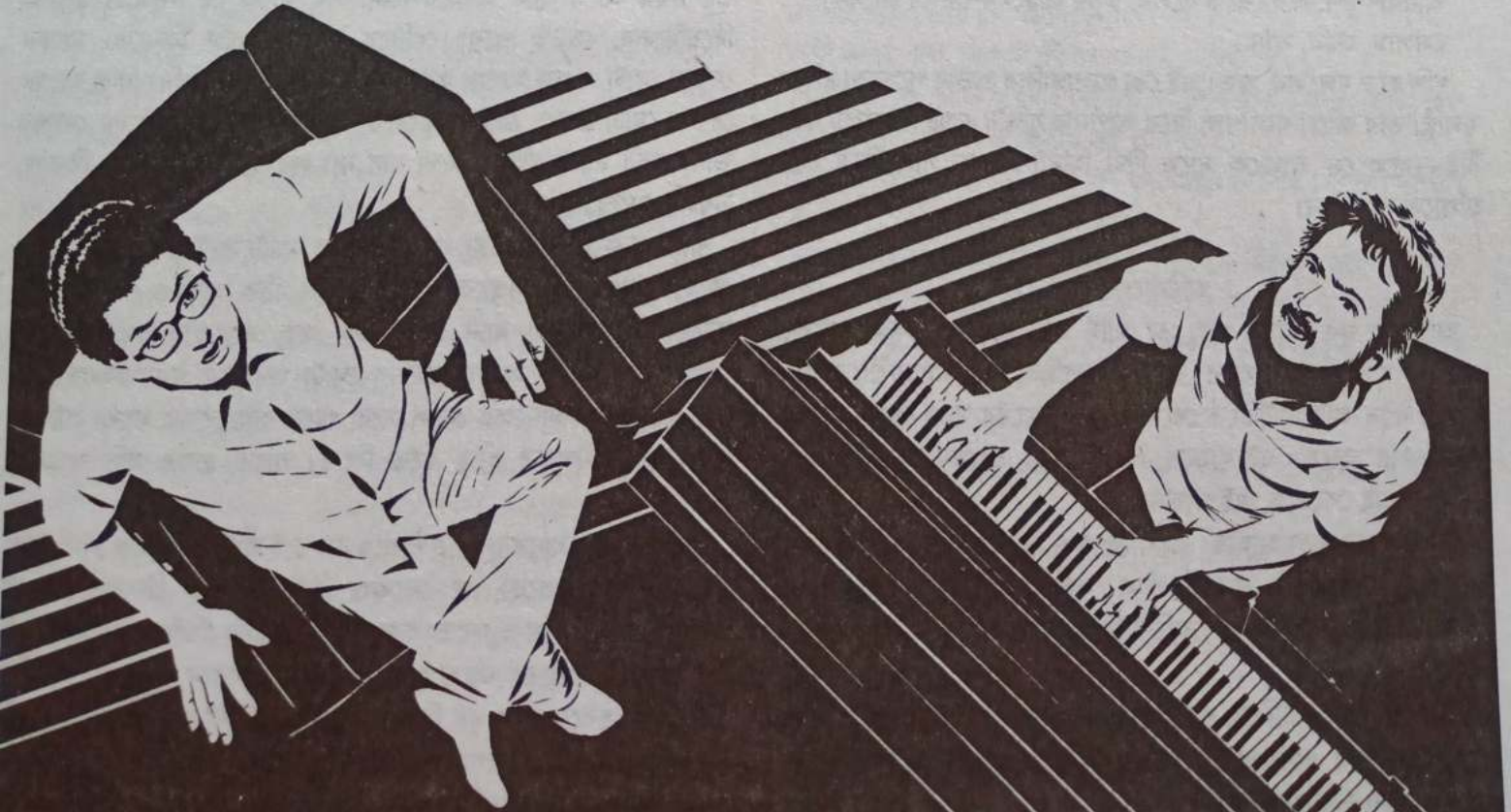
ও বলল, সে তো দেখতেই পেলাম।

আমি ইতস্তত: করে বললাম, এই মানে...।

ও সোফা দেখিয়ে বললেন, ওইখানে।

আমি বসলাম। অনির্বাণ হঠাৎ বললেন, মিষ্টি খাবেন? গাঁজা খেলে না ভীষণ মিষ্টি খেতে ইচ্ছে করে।

আমি বললাম, আমি তো আর গাঁজা খাইনি।

উনি বললেন, আমি খেয়েছি।

আমি বলি, না, আমার সুগার আছে। একটু কফি খেতে পারি।

অনির্বাণ বিরক্ত গলায় বললেন, নিজে বানিয়ে খান। তার পর ফ্রিজ থেকে মিষ্টি বার করে খেতে শুরু করলেন। ওর চোখমুখ দিয়ে যেন স্বর্গীয় আনন্দের বাষ্প বের হতে লাগল। একটা সময় সেই বাষ্পের হাত থেকে মুক্ত হয়ে আবার চেয়ারটাতে হাঁটু মুড়ে বসলেন। এমন একটা ভাব যেন, ঘরে আর কেউ নেই।

আমি গলা খাঁকরিয়ে বললাম, মানে, যদি একটা গল্প...

অনির্বাণ চোখ বড় বড় করে বললেন, কখনো হয়! গল্পের আগে একটা গান লেখা বড়ই জরুরি। ওদের জন্য।

আমি বললাম, কাদের জন্য? কোন প্রকাশনার জন্য?

অনির্বাণ বিরক্ত হয়ে মাথা নেড়ে বলেন, না, না। প্রকাশনা-টনার নয়, ওই দেশের জন্য।

আমি বলি, ও, নিশ্চয়ই বাংলাদেশ? শুনেছি ওই দেশেও আপনি বেশ পপুলার।

অনির্বাণ এবার খাপ্পা, আপনি একটা গাড়ল, গামবাট, গণ্ডমুর্খ। আপনি কি আদৌ বুঝবেন? যদি বলি, আমাদের জগতের সঙ্গে একটা সমান্তরাল জগৎ আছে, এবং সেটা চলছে আমাদের মতোই। কিন্তু অন্যভাবে, অন্য চেহারায়, সেখানে আপনি আছেন, আমি আছি। কিন্তু অন্য ভাবে—কিছু বুঝলেন?

আমি বললাম, বুঝেছি। গাঁজার পরিমাণটা বেশি হয়ে গেছে। গল্প দেবেন না সেটা বললেই পারতেন! খামোখা গাল দিচ্ছেন, ভার্স্টুম-ধুস্টুম গল্প ফাঁদছেন।

অনির্বাণ চুপ করে থেকে বলেন, চতুর্থ ডাইমেনশান কী জানেন?

বললাম, জানি, সময়।

খুশি হয়ে বললেন, গুড। এই তো গালাগালির প্রভাব পড়েছে। দাঁড়ান বলছি। তার আগে গালাগাল দিয়ে আপনার বুদ্ধিটা একটু স্টিমুলেট করে দিই—বলে সে আমাকে সাড়ে তিন মিনিট অকথ্য গাল দিয়ে বসে হাঁপাতে লাগলেন।

অনির্বাণের কথা

আমি যে খুব ভালো গাই, তা আমি মনে করি না। কিন্তু লোকের ভালো লাগে। কী করা যাবে! ভালোই চলছিল, কিন্তু মহামারীর কারণে দু'বছর বসে আছি। টিভিতে দেখে চলেছি সময়ের সঙ্গে করোনার টাগ অফ ওয়ার চলছে। এই বাড়ছে, এই কমছে। এ যেন বুড়ো মানুষের আমাশা। এই পেয়েছে, এই পায়নি।

বহু লোকের মৃত্যু হয়েছে। এমন লোকও মরেছে, যারা ঘাটের মড়া। নানা রোগে জর্জরিত, নানা অর্গ্যান ফেল করে গেছে। কিন্তু টেস্টে পজিটিভ বেরিয়েছে। মৃত্যুর ক্রেডিট নিয়ে গেল করোনা। বাকি রোগরা বিরক্ত।

টিভি দেখে মনে হচ্ছিল, বাকি সমস্ত রোগ পৃথিবী থেকে নির্মূল হয়ে গেছে। সব রোগ একাকার হয়ে গেছে, নীলাচলে মহাপ্রভুর মতো। পড়ে আছে সামনে শুধু করোনা সমুদ্র।

প্রতিবেশী অমলবাবু গাড়ি অ্যাকসিডেন্টে হাসপাতালে ঢুকলেন। ব্রেন হেমারেজ। কিন্তু টেস্টে বেরোল করোনা পজিটিভ। সুতরাং হেমারেজকে লেঙ্গি মেরে মৃত্যুর দায় জিতে নিল করোনা। এখন যে-কোনো মৃত্যুর নেপথ্যে করোনার ছায়া নেচে বেড়াচ্ছে। বলা যায় না, আগামী দিনে ইতিহাসে ক্ষুদিরামের মৃত্যুর কারণও করোনা বলা হতে পারে। ফাঁসির আগে টেস্টে হয়তো পজিটিভ বেরিয়েছিল।

এক ডাক্তার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ভাইরাসটাকে দেখতে কেমন?

সে বলল, জানি না, কেউ জানে না। মনে হয় বাঁদরের মতো।

কেন? বাঁদর কেন?

এই যে বলছে, লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। এত লাফ বাঁদর ছাড়া কে লাফাবে ভাই!

আর কত লাফাবে ভাই? টাকাপয়সা তো শেষ হতে হতে সরু তেজপাতার মতো হয়ে গেছে!

সবটুকু শেষ হোক, তারপর আর লাফাবে না।

কী করে?

পয়সা না থাকলে আর লাফিয়ে কী করবে? সে তো আর আগেকার আদর্শবাদী দেশপ্রেমিদের মতো নয় যে 'পয়সা নেই থলিতে,/ লাফ দিয়ে পড়ে গলিতে।' গোছের।

তার কথার মানে খুব একটা বুঝতে পারিনি। আবোল তাবোল কথা মাথায় ঢোকে না সময় সময়।

বাড়িতে আমি একা। কাজের লোকগুলোকে বিদায় করা হয়েছে, সোসাইটির চাপে। সুতরাং শুধু ম্যাগি খেয়ে দিন কাটছে। ঘর দুয়ার অপরিষ্কার, জানলা দরজা খোলা যাচ্ছে না। কখন যে বাঁদর ভাইরাস ঢুকে পড়ে সেই আশঙ্কায়।

তবে এই অতিমারীর মধ্যে একটা অভিজ্ঞতা হল। সে কথা পরে বলব। তার চেয়ে আরেকটা ঘটনার কথা বলি।

একদিন, মানে, দিন বিশেক আগে আমি মুখে মাস্ক, হাতে গ্লাভস, মাথায় পলিথিন, চোখে চশমা (কিন্তু আমার যেহেতু চশমা নেই তাই ৩৫ বছর আগে ছানি অপারেশনের পর মাকে যে চশমাটা ডাক্তার দিয়েছিলেন, সেটাই পরে) বেরিয়ে ছিলাম ম্যাগি কিনতে। মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নিতে বলেছিলেন কবি। কিন্তু মায়ের দেওয়া মোটা চশমা, চোখে তুলেও, আমার অবস্থা আমাদের দেশের ভবিষ্যতের মতো। কিছুই দেখা যায় না। সব ঝাপসা, সবটাই বিকাশ, সবটাই GST।

যাই হোক নীল আর্মস্ট্রং যেমন চাঁদের মাটিতে উদবিড়ালের মতো হেঁটে, ভেসে চলে গন্তব্যে পৌঁছেছিলেন, ঠিক আমিও পৌঁছেছিলাম অনিলের দোকানে। মনে হল, মঙ্গল গ্রহ এক্সপ্লোর করলাম। দীর্ঘ বন্দিত্বের পর অনিলের দোকানের গোটা পথটাকে আলোকবর্ষ মনে হল। দেখলাম, অনিলের ছেলে সারা গায়ে ব্যান্ডেজের মতো লাগিয়ে সবাইকে জিনিসপত্র ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে। হাতে হাতে যদি সংক্রমণ ছড়ায়!

অনেক বুড়ো মানুষ লুফতে পারছে না। তাই পাড়ার বিলুকে ১০০ টাকা রোজে রাখা হয়েছে। সে সেকেন্ড ডিভিশন এক ক্রিকেট ক্লাবের উইকেটকিপার। সে লুফতে অপারগ মানুষদের জিনিস লুফে দিচ্ছে এবং স্যানিটাইজারের জলে ডুবিয়ে দিচ্ছে। একজন লুজ নুন কিনতে এসেছিল। দ্রবণে ডুবে নুন ভিজে গেছে। সেই নিয়ে ব্যাপক চেঁচামেচি চলছিল। এমন সময় নেপালদার সঙ্গে দেখা।

উনি একজন রাজনৈতিক মানুষ। রাজনীতিবিদদের মতো গোঁড়া ও

গম্ভীর নয়। আমায় বললেন, কী ভায়া, গানটান চলছে?

আমি বললাম, পকেটে যা টান, হয় কী করে গান?

নেপালদা হেসে ফেললেন।

না, না, এই ঘটনার কথা তেমন ইন্টারেস্টিং নয়। এ ঘটনার কথা আর বলছি না। দাঁড়ান একটু ভেবে নিই, কোনটা বলব।

ইয়েস! ঘটনাটা ঘটল তিন দিন আগে। বাড়িতে বসে কী যেন করছিলাম, মনে নেই। এমন সময় ডোর বেলটা বেজে উঠল। গিয়ে দরজা খুলে দেখি একজন সুপুরুষ চেহারার মানুষ দাঁড়িয়ে। মাথা ভর্তি কালো চুল, দামি একটা টি-শার্ট। চোখে একটা দামি চশমা। বললেন, কথা আছে। একটু ভেতরে আসতে পারি?

কী আর করি, বললাম, আসুন।

লোকটা এসে সোফায় বসলেন। বললেন, একটা গানের জন্য এসেছি।

বললাম, গায়কের কাছে গানের জন্যই তো সবাই আসে।

লোকটা বলল, আমি এমন একটা গানের জন্য এসেছি, সে গান এখনো আপনি তৈরি করেননি।

আমি বললাম, এ আর কী এমন কঠিন কাজ। লিখে সুর করে গেয়ে দিচ্ছি।

লোকটা বলল, না, যে সে গান নয়। যে গানে আমাদের পৃথিবীটা আমূল বদলে যাবে।

আমি বললাম, গান গেয়ে হাততালি পাওয়া যায়, পৃথিবী বদলানো যায় বলে আমার জানা নেই।

লোকটা একটু হেসে বলল, আমাদের পৃথিবীতে যায়।

আমি একটু অবাক হয়ে বলি, আপনার পৃথিবী আর আমাদের পৃথিবী কি আলাদা?

লোকটা একটু লজ্জিতভাবে বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমি একটু বিরক্ত হয়েই বললাম, কী বলতে চাইছেন, একটু খোলসা করে বলুন না মাইরি!

লোকটা একটু ইতস্তত করে বলল, যা বলব, তা আপনার বিশ্বাস করতে একটু কষ্ট হবে।

আমি বললাম, এমনিই দুপুরবেলা এসে যথেষ্ট কষ্ট দিচ্ছেন, ভাত, ইয়ে ম্যাগিঘুমটা পুরো মাটি করেছেন।

লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর একটা বড় নিশ্বাস নিয়ে শুরু করলেন, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, তিনটে ডাইমেনশন ছাড়াও আরেকটা ডাইমেনশন আছে।

আমি বললাম, জানি, টাইম বা সময়।

লোকটা বলল, তার মানে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেদ—যা আপনি দেখতে পাচ্ছেন, সেটাই সময় বদলে গেলে অন্যরকম দৃশ্য দেখবেন, তাই তো! বা দেখতে পাচ্ছেন না বলেই যে সেই দৃশ্যটা নেই, তা কিন্তু নয়। ঠিক সেই রকমই একটা সমান্তরাল পৃথিবী আছে। যা আপনাদের পৃথিবী দেখতে পাচ্ছে না, সেটাই আমাদের পৃথিবী।

আমি এতক্ষণ শুনছিলাম। বললাম, এ সব তো সায়েন্স ফিকশনের গল্পে পড়েছি। বুজরুকি করার জায়গা পাননি? বেরোন বাড়ি থেকে।

লোকটা বলল, আচ্ছা দাঁড়ান। আপনার গোপন ইচ্ছেগুলোর কথা বলি, যা আপনি কাউকে জানাননি। বলে লোকটা অনেক কথা বলল। যেমন, আমার স্বাস্থ্যবান হওয়ার ইচ্ছে, সর্বোপরি বাইক চালানোর ইচ্ছে, যা এ জীবনে আর হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু সেসব এ ব্যাটা জানল কী করে?

এবার আমি ঘাবড়ে গিয়ে জানতে চাইলাম, এ সব আপনি জানলেন কী করে?

লোকটা বলল, এই পৃথিবীতে আপনার যা যা চাহিদা পূর্ণ হয়নি, আমাদের পৃথিবীতে সেই সব চাহিদাই পূর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ, আমাদের পৃথিবীতে আপনি একজন স্বাস্থ্যবান লোক। এবং আপনি বাইক চালাতে পারেন।

এবার আমার হাঁ আর বন্ধ হচ্ছে না!

মানে, আপনাদের পৃথিবীতে আরেকটা আমি একজিস্ট করি?

লোকটা হেসে বলে, বিলক্ষণ। এই পৃথিবীতে আপনি যা যা উইশ করেন, যা যা চান বা স্বপ্ন দেখেন, ওই পৃথিবীতে আপনি তাই পেয়েছেন বা পাবেন।

আমি বলি, মানে সব পেয়েছির দেশ?

লোকটা বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ। এখানে চাইবেন, ওখানে পাবেন। যেমন ইরাকের যুদ্ধ দেখে আপনি গান লিখলেন, 'পৃথিবী আবার শান্ত হবে।' তখনই আমাদের এখানে শান্তির পরিবেশ হয়ে গেল। আমাদের পৃথিবীতে এখন অখণ্ড শান্তি।

আপনি লিখলেন, সংকীর্ণ মনের মানুষ যারা, তারাই তো ভালোবাসে একবার/ যার মন বড় যত দেখে ভালো অবিরত, তারাই তো ভালোবাসে বার বার/ তখনই আমাদের পৃথিবীতে বহু প্রেম বৈধ হয়ে গেল।

আমি আমার ধন্ধ কাটিয়ে প্রশ্ন করি, আর আপনি? আপনারও কি এই পৃথিবীতে অস্তিত্ব আছে? মানে, আপনাদের পৃথিবী ছাড়াও?

লোকটা বলে, অবশ্যই আছে। এই পৃথিবীতে আমার নাম রামবিলাস পাণ্ডে। এখানে আমি মোটা, কালো, টেকো একটা লোক। নিবাস বড়বাজার, ব্যবসা লোহার। রামবিলাস নামটা আমার পছন্দ ছিল না, বা এখনো নেই। আমি যেমন দেখতে হতে চেয়েছিলাম—আমাকে দেখুন, ওখানে আমি তেমনই দেখতে। যেমনটা আপনি দেখছেন।

আমি অবাক ভাবে প্রশ্ন করি, আচ্ছা, ওখানে আমি কী করি?

লোকটা বলল, কিছুই করেন না। শুধু সকাল-বিকাল গলা সাধেন, নানা রাগের আরোহণ আর অবরোহণ করেন।

আমি বলি, আমি লিখি না, সুরও করি না?

লোকটা বলল, দূর পাগল! ওই কাজটা তো আপনি এখানেই করেন! ওইখানে বাস করে আপনার সুখ আর এখানে সুখ অর্জনের জন্য দুঃখ।

আমি বললাম, তার মানে এখানে যে লোকটা বাঁচে, সে আমার স্বপ্ন দেখার প্রগাঢ়তায় বাঁচে?

লোকটা বলে, প্রায় ঠিক বলেছেন।

আমি এবার বলি, আপনি কী করেন ওই পৃথিবীতে?

লোকটা বলল, আমি ওখানে সিক্রেট সার্ভিসে চাকরি করি। ছোটবেলা থেকে জেমস বন্ডের ভক্ত ছিলাম এই পৃথিবীতে।

আমি বললাম, ওহ্, মাই গড। সব পেয়েছির দেশেও সিক্রেট সার্ভিস মানে, FBI, CIA, KGB—এসব আছে?

লোকটা বলল, আরে আমাদের বসের বস ছিলেন হুভার। একটা পৃথিবী চলবে আর কোনো পরিচালক থাকবে না? আপনার কাছে তো তারাই আমায় পাঠিয়েছে। প্রতি সত্তর বছর অন্তর অন্তর সেই সুযোগ পাই।

আমি বললাম, আমার কাছে কেন?

লোকটা বলল, আপনি এমন একটা গান লিখবেন, যা আমাদের পৃথিবী আমূল বদলে দেবে।

আমি বললাম, আপনাদের পৃথিবী তো একটা সুন্দর পৃথিবী। তার আবার কী বদল দরকার?

লোকটা বলল, এটাই তো সমস্যা। একটা পৃথিবী শতাব্দীর পর শতাব্দী ভালো। সে পৃথিবীর মানুষগুলো এই পৃথিবীর পরজীবী হয়ে বেঁচে আছে। নতুন কিছু হচ্ছে না। আমাদের রিসার্চ বলছে, আপনি এবার যে গানটা লিখতে চলেছেন, সেটা আমাদের পৃথিবীর খোলনলচেটা বদলে দিতে চলেছে।

আমি বললাম, আমার মধ্যে আর কোনো পজিটিভ ভাবনা নেই। পৃথিবীর প্রতি আমার ঘৃণা ধরে গেছে। মানুষের প্রতি আমার কোনো শ্রদ্ধা নেই।

লোকটার চোখ চকচক করে উঠল, একজ্যাক্টলি। আমাদের রাষ্ট্রপ্রধানরা দীর্ঘদিন নির্জীব বসে থেকে থেকে এবার আপনার গানের অপেক্ষায় আছেন। আপনার এই ঘৃণাভরা গানের দমে তারা আমাদের পৃথিবীটাকে আপনাদের পৃথিবীর শেপ দিতে পারবে। জানেন তো, আসলে রাষ্ট্রপ্রধানরা তো রাষ্ট্রপ্রধান। তাদের স্বপ্ন সবজায়গায় একই থাকে। এই পৃথিবীতেও, ওই পৃথিবীতেও। ওই পৃথিবীতে নিজেদের মহিমা দেখাতে পারে না। কারণ, জনগণের মধ্যে কোনো স্বপ্ন নেই। কারণ, স্বপ্ন নিয়ন্ত্রণ হয় এই পৃথিবী থেকে। একবার আপনার ঘৃণা ভরা গান যদি ওই পৃথিবীতে বলবৎ হয়ে যায়, তাহলে ওই পৃথিবী দীর্ঘদিনের জড়তা, কৃশতা, একঘেয়েমি ছেড়ে আপনাদের পৃথিবীর মতো জীবন্ত হয়ে উঠতে আর কত সময় লাগবে! তাই আমায় এখানে পাঠানো হয়েছে, যাতে আমি আপনাকে সেই গানটা লিখতে উৎসাহিত করি।

আমি বললাম, তা হঠাৎ আমায় বাছলেন কেন?

লোকটা বলল, বাছলাম কি আমি? বাছল আমাদের কম্পিউটার। দীর্ঘ রিসার্চ করে দেখা গেছে, আপনার স্বপ্ন আমাদের পৃথিবীর জন্য খুব অ্যাট্রাকটিভ। সব থেকে অ্যাট্রাকটিভ হল আপনার গান। আপনার গানের মধ্যে বোনা স্বপ্ন। এর কারণ আমরা এখনও আবিষ্কার করে উঠতে পারিনি। তবে হ্যাঁ, আপনি আমাদের পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। যে গানের জন্য আপনার কাছে এসেছি, সেটা আপনি লিখতে চলেছেন। সে গানটা একটা বিধ্বংসী প্রলয়ের কথা বলবে। একটা ডিজাস্টার। মানুষে মানুষে হবে অশান্তি। সেখান থেকেই আমাদের রাষ্ট্রপ্রধানরা নিজেদের এজেন্ডা ফুলফিল করবে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, এটা আপনার পৃথিবীর মানুষ জানে?

লোকটা হাসে। বলে, আপনি কি পাগল হয়েছেন? এটা আমাদের রাষ্ট্রপ্রধানের সিক্রেট প্ল্যান।

তারপর লোকটা ঘড়ি দেখে বলল, আজ আমি আসছি। আমাদের ক্যালকুলেশন বলছে, আপনি তিন দিনের মধ্যেই গানটা লিখে ফেলবেন। কারণ এটাই আপনার টাইম। আপনার ভেতরে এই মুহূর্তে গিজগিজ করছে বিতৃষ্ণা, ঘৃণা, রাগ। আপনার স্ত্রী আপনাকে ছেড়ে গেছে, দু-বছর কোনো রোজগার নেই। এটাই আইডিয়াল টাইম। কিপ ইট আপ, বেস্ট অব লাক। কাল আবার আসব। এই গানটার জন্য আপনার পারিশ্রমিক কত বলুন তো? এক লক্ষ ঘণ্টার স্বপ্ন। নিশ্ছিদ্র ঘুম। আর আপনার ঘুমের ওষুধ প্রয়োজন হবে না। আপনি যেমনি ঘুম চাইবেন, ঘুমিয়ে পড়বেন। চলি।

লোকটা চলে গেল। একটা গাঁজা বানানোই ছিল। ধরিয়ে ফেললাম। কতক্ষণ বসেছিলাম, জানি না। গাঁজার জন্যেই বোধ হয় মাথাটা ফাঁকা হয়ে গেল। দেখলাম, দরজা খুলে প্রকাশক ঢুকলেন।

প্রকাশকের কথা

এতক্ষণ অনির্বাণ একটা গল্প শোনাল। গুলগল্প বলাই ভালো। অন্য পৃথিবী থেকে একজন এসে নাকি একটা গান চাইছে, তাই সে গল্প লিখবে না। গান লিখবে।

গাঁজার ধোঁয়ায় আমারও বোধহয় নেশা হয়ে গেছিল। তাই আমি বললাম, আচ্ছা বেশ, ধরে নিলাম, আপনি সেই গানটা লিখলেন। আর ওদের পৃথিবী, যা স্বপ্নের পৃথিবী, দুঃখহীন পৃথিবী, সেটা আমাদের পৃথিবীর মতো হয়ে গেল। সেটা আপনি চাইবেন? অস্থির, কদর্য, আরেকটা পৃথিবী?

অনির্বাণ বলে, আরে আমি তো আর ওই পৃথিবীতে থাকতে যাচ্ছি না।

আমি বলি, এই পৃথিবীটাতে তো থাকেন। যখন জানেন, আপনার স্বপ্নের একটা পৃথিবী আছে। সেখানে সব ভালো, সব সুন্দর। সেটা নষ্ট করবেন কেন?

অনির্বাণ হঠাৎ খেপে গেল, আমি এই পৃথিবীরও ভালো চাই না, ওই পৃথিবীরও ভালো চাই না। দুটোই নিপাত যাক।

আমি বলি, একটু মাথা ঠান্ডা করুন, একটু ভাবুন। আজকে আসি। কাল এই সময় আসব। লোকটা তো এই সময়েই এসেছিল।

অনির্বাণ অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ে, হ্যাঁ, দেখুন যদি আসতে পারেন।

পরের দিন সকালে অনির্বাণের ঘরে ঢুকে দেখি সে পিয়ানো বাজাচ্ছে। বললাম, কী ভায়া, লিখে ফেলেছ নাকি? সেই রাক্ষুসে ভয়ঙ্কর গান?

অনির্বাণ উদাস চোখে জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে, ওখানেই কোথাও, যা হয়তো দেখতে পাচ্ছি না, আর একটা আমি আছি। সে সুখী, মুক্ত।

তারপর পিয়ানোর ওপর একটা চাপড় মেরে বলল, আমার স্ত্রী আমায় এতদিন জানায়নি যে আমার মেয়ের ক্যানসার হয়েছে। লাস্ট স্টেজ। ও আর বাঁচবে না। ওরা তো এখন কানাডা থাকে। কাল রাতে আমায় একটা টেক্সট করেছে, বাবা এ জীবনে তো হল না, পরের জীবনে আমরা একসঙ্গে থাকব। তুমি মায়ের সঙ্গে আর ঝগড়া কোরো না।

আমি একটু ধাক্কা খেলাম।

অনির্বাণ একটা শুকনো হাসি হেসে বলল, শুনবেন গানটা?

আমি তাড়াহুড়ো করে বলি, গানটা কি লিখে ফেলেছেন?

অনির্বাণ বলে, হ্যাঁ। তবে সুরটা এখনো হয়নি। সেটাই করছি।

ওর কথা শেষ হতে না হতেই একটা লোক ঢুকল। অনির্বাণ আমায় বলল, এই সেই রামবিলাস।

লোকটা প্রতিবাদ করে বলে, নো—নো, রেমো। তারপর অনির্বাণকে বলে, আমার কাছে অ্যালার্ম এসেছে। আপনি গানটা লিখেছেন। এবার সুরটা দিন। দশ মিনিটের মধ্যে আপনি পেয়ে যাবেন ১ লক্ষ ঘণ্টা ঘুমের প্যাকেজ।

আমি হাঁ করে দুজনের কথা শুনছি।

অনির্বাণ বলে, বেশ গাইছি। প্রথমে যে সুরটা গাইব, সেটাই গান হয়ে যাবে। লোকটা কী একটা যন্ত্র মুখের কাছে গিয়ে অন করে দিল। অনির্বাণ গেয়ে উঠল,

এক পৃথিবীর স্বপ্ন দেখি আমি
যে পৃথিবীর শুরু ও নেই শেষ।
যে পৃথিবীর সীমান্ত নেই কোনো
যে পৃথিবীর একটা মাত্র দেশ।....

লোকটার চোখ কপালে উঠে যাচ্ছে। সে চিৎকার করে উঠল, একী, একী! এ গান নয়। এ গান বন্ধ করুন। এমন কথা তো ছিল না! আপনার তো অন্য গান লেখার কথা ছিল।

যন্ত্রটা বিপ বিপ করে বাজতে শুরু করল। অনির্বাণ হাসছে। এবার দেখি লোকটা আস্তে আস্তে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। অনির্বাণ বিভোর হয়ে গেয়ে চলল,

যদি তুমি সে পৃথিবী চাও
একটু তবে নিজেকে বদলাও,
সেই পৃথিবীর তারাই নাগরিক
ভালোবাসাই যাদের অভ্যেস।

লোকটা বাতাসে মিলিয়ে গেল। কিশোর ভারতী

পরিকল্পনায় যখন রবীন্দ্রনাথ

বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ আরামকেদারায় বসেই ঘুমিয়ে পড়েছেন ভেবে ক্ষিতিমোহন সেন উঠে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ কবিগুরুর দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে তিনি ওঁকে বসার ইশারা করছেন। ক্ষিতিমোহন চেয়ার টেনে বসতেই কবিগুরু বলে উঠলেন, রাজা দিবোদাসের গল্পটা যেন কী ছিল?

ক্ষিতিমোহন অবাক হয়ে তাকালেন রবীন্দ্রনাথের দিকে। তারপর বলতে শুরু করলেন, দিবোদাস বলে এক ব্যক্তি আর সব দেবতার পাশাপাশি মহাদেবকেও কাশীছাড়া করেছিলেন। নির্বাসিত শিব মন্দার পর্বতে আশ্রয় নিয়ে চৌষট্টি যোগিনীকে বারাণসীতে পাঠিয়েছিলেন। বিশ্বনাথের বিহনে কাশী কেমন আছে সেটা জানাই সম্ভবত শিবের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সেই যোগিনীরা এখানে এসে বারাণসীর রূপে এমন মুগ্ধ হয়ে গেলেন যে শহর ছেড়ে আর খবর দিতে ফিরতে পারলেন না।

—নিজেদের যোগবল হারিয়ে একেবারে আটপৌরে জীবনে মিশে গেলেন তারা বেনারসে। বিধুশেখর শাস্ত্রী আসতে আসতে বললেন।

—শাস্ত্রীমশাই যে? দিবানিদ্রার অভ্যেস ত্যাগ করেছেন নাকি?

—আজ্ঞে, গ্রীষ্মকালে যেমন গায়ে শাল জড়ানো যায় না, আপনি শান্তিনিকেতনে থাকলেও তেমন দিবানিদ্রার কোনও সুযোগ নেই। তবে

শুনতে পাই, ইদানিং আপনিই লুকিয়ে-চুরিয়ে ঘুমিয়ে নিচ্ছেন একটু-আধটু।

—একটু আগে আমারও তেমন মনে হচ্ছিল। ক্ষিতিমোহন সেন বললেন।

—আপনি কি মেনে নিচ্ছেন যে কথাটা সত্যি? বিধুশেখর বললেন।

—সত্য কি এরকম পথেঘাটে পড়ে থাকে শাস্ত্রীমশাই? সত্য আবিষ্কার করতে হয়। আমার ক্ষেত্রে যাকে আপনারা নিদ্রা বলে চালাতে চাইছেন, আসলে তা কাব্য।

—মানে?

—মানে আর কিছুই নয়, কবিতার পঙক্তি কিংবা গানের কলি খোলা চোখে তত ধরা দেয় না, তাই চোখ বন্ধ করে বাগ্‌দেবীর আরাধনা করতে হয়। এক-একদিন তিনি আসেন...

—আর বাংলাভাষার ভাণ্ডার উপচে পড়ে। ক্ষিতিমোহন বললেন।

—মাটির ভয়ে রাজ্য হবে মাটি, দিবসরাতি রহিলে আমি বন্ধ...এমন পংক্তি আমিই রচনা করেছি। কিন্তু যা দেখতে পাচ্ছি কোনও প্রতিষ্ঠান মাটি করার জন্য রাজা-বাদশাহর দরকার পড়ে না, প্রবীণ আশ্রমিকদের ঔদাসীন্যেও তা ঘটে যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের গলায় আচমকা একটু গাম্ভীর্য।

—গুরুদেব কি আমাদের উপরে কোনও কারণে রুষ্ট? ক্ষিতিমোহন জানতে চাইলেন।

—সে মানুষমাত্রেই হয়। কিন্তু আপনাদের বোধের বিস্তারে কোনও ত্রুটি আছে, এই কথা মানতে পারব না।

—কিন্তু এরকম কথা উঠবেই বা কেন গুরুদেব? বিধুশেখরের গলায় ক্ষোভ।

রবীন্দ্রনাথ সামান্য সময় চুপ করে থেকে বললেন, নবাগত শিক্ষক প্রদ্যুম্ন গুপ্তকে ঠিক কী কারণে চলে যেতে হল আশ্রম ছেড়ে, আপনারা আমায় জানাবেন কি?

—আমার মনে হয় সেটা একটু কথা বোঝা-না-বোঝার বিষয়। প্রদ্যুম্ন আসলে বাংলার ছেলে নয় বলেই ও হয়তো এখানকার কচিকাঁচাদের অনন্ত আবেগ সম্পর্কে ধারণা করতে পারেনি। বিধুশেখর বললেন।

—বাংলার ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ না করলেই বাঙালির আবেগ সম্পর্কে সঠিক ধারণ করা যাবে না বিরাট সব বাঙালি পণ্ডিতের চারজনের তিনজনই তো থাকেন বারাণসীতে। প্রতিষ্ঠিত বাঙালি এলাহাবাদেই মিলবে বেশি।

—যেমন, গীতাঞ্জলির প্রকাশক চিন্তামণি ঘোষ। ক্ষিতিমোহন বললেন।

—শুধু চিন্তামণি বা সম্পাদক রামানন্দই নয়, স্টেশনে স্টেশনে যে হুইলারের বইয়ের দোকান তার কর্ণধারও তো এলাহাবাদের বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার। তা হলে এলাহাবাদের ছেলে প্রদ্যুম্নর বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ নেই, এমন ধারণা এল কী করে?

—কিন্তু সেক্ষেত্রে ওঁরই বাবার সম্মানে আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্ররা যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করছিল তাতে ও আসতে রাজি হল না কেন? বিধুশেখর বললেন।

—ও রাজি না হবার ফলেই তো ছাত্রদের একটা বড় অংশ ধরে নেয় যে ও ব্রিটিশ শাসকের ধামাধরা। এরপর ছাত্ররা যদি ক্ষোভে ফেটে পড়ে, তাদের দোষ দেওয়া চলে কি? ক্ষিতিমোহন বললেন।

—কিন্তু তাদের সামনে বসিয়ে বোঝানোই যায়।

—মাপ করবেন গুরুদেব, ছাত্ররা যেরকম ক্ষুব্ধ হয়েছিল, তাতে ওদের বোঝাতে গেলে আমাদের গায়েও ব্রিটিশের ভৃত্যের ছাপ লেগে যেত।

—হুম। এই প্রবণতা আগামীতে আরও বাড়বে বই কমবে না।

—প্রদ্যুম্নর ক্ষেত্রে প্রকৃত সত্য ঠিক কী গুরুদেব? বিধুশেখর জানতে চাইলেন।

রবীন্দ্রনাথ হাসলেন, প্রদ্যুম্নর ঠাকুরদা গুরুচরণ কবিরাজ বর্ধমানের কালনার কাছাকাছি কোনও গ্রাম থেকে আয়ুর্বেদ শিখতে বারাণসী গিয়েছিলেন। প্রথমদিকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু ক্রমে তিনি হয়ে ওঠেন তাঁর গুরুর প্রিয় ছাত্র।

—আশ্চর্য! প্রদ্যুম্নর ঠাকুরদার বিষয়ে আপনি এত জানলেন কী করে? বিধুশেখর অবাক।

—জানি, কারণ মেজো বউঠান জ্ঞানদানন্দিনী দেবী একবার লন্ডনে বরফ পড়ার দৃশ্য দেখে মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন। ছুটে গিয়ে বরফ কুড়োতে শুরু করে দেন তিনি। হাত ফুলে গিয়ে ভিতরে ঘা হয়ে গিয়েছিল। লিস্টার সাহেব অবধি সারাতে পারেননি।

—লিস্টার মানে?

—অ্যান্টিসেপটিক যিনি আবিষ্কার করেছিলেন সেই লর্ড লিস্টার। কিন্তু সেই লিস্টারের চেষ্টা এক্ষেত্রে কাজে দেয়নি, শেষে গুরুচরণের ভেষজ তেলে অনেকখানি ঠিক হয়ে যায়।

—কিন্তু গুরুচরণ তো কাশীর বাসিন্দা ছিলেন? বিধুশেখর জানতে চাইলেন।

—বারাণসীই তো আমাদের অক্সফোর্ড-কেমব্রিজ শাস্ত্রীমশাই।

—প্রদ্যুম্নর বাবা হরিচরণ...

ক্ষিতিমোহনকে থামিয়ে দিয়ে কবিগুরু বলে উঠলেন, হরিচরণও বাবার পথেই যাত্রা শুরু করেন এবং রামনগরের রেসিডেন্ট ব্রিটিশ অফিসারের ছেলের দীর্ঘদিনের হাঁপানির অসুখ ভালো করে সেই সাহেবের নেকনজরে পড়ে যান।

—পরে কি এই সাহেবই মারা পড়েন হরিচরণের হাতে? বিধুশেখর জানতে চাইলেন।

কবিগুরু হাসলেন, ওটা জনশ্রুতি। আসলে যা হয়েছিল তা হল হরিচরণের সঙ্গে ওঁর এক দূরসম্পর্কের আত্মীয় একদিন হাওয়ার্ডের বাংলোয় গিয়ে হাজির হন।

—প্রদ্যুম্নর কাছ থেকে এই ব্যাপারটা আমিও শুনেছি গুরুদেব। ক্ষিতিমোহন সেন বললেন, সাহেব খুব বিশ্বাস করতেন হরিচরণকে। তার ফলে ওই বাংলোয় ঢুকতে চেকিং হতো না। হরিচরণের সঙ্গে ঢোকা কৃষ্ণপদও সেই সুবিধে পেয়ে যান। কৃষ্ণপদ যে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত জানলেও, সে যে একেবারে হাওয়ার্ডকে গুলি করে মারবার জন্য পিস্তল নিয়ে ঢুকে পড়বে হরিচরণ ভাবতেও পারেননি। হাওয়ার্ড নিজে অবশ্য জানত যে সে চৌরিচৌরার ঘটনার পর কী বিপুল অত্যাচার করেছিল।

—এইসব কথা আমাকে তো বলেননি? বিধুশেখর বিস্মিত।

—প্রদ্যুম্ন চলে যাওয়ার একদিন আগে আমায় সংক্ষেপে জানিয়ে যায়। ও আমাকে জানায় যে সেইসময় ওর বাবার সাহেবের বাড়িতে চিকিৎসা করতে যাওয়া নিয়ে কাশীতে অনেক কথাবার্তা হত। কিন্তু ওর বাবার পরিষ্কার বক্তব্য ছিল এই যে, তিনি একটি বাচ্চাকে দেখতে যাচ্ছেন তাঁকে ডাকা হয়েছে বলেই।

—তারপর কী হয়? বিধুশেখর জানতে চান।

—হাওয়ার্ডের ঘরের ভিতর ঢুকে কৃষ্ণপদ পিস্তল বের করতেই হরিচরণ দু'হাত দিয়ে সেই পিস্তল কেড়ে নিতে যান কৃষ্ণপদর হাত থেকে। ওঁর টানাটানির জেরেই পিস্তল থেকে গুলি বেরিয়ে গিয়ে হাওয়ার্ডের গলা আর বুকে লাগে। ছ'টি গুলির মধ্যে থেকে অন্তত তিনটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

—তারপরেও হাওয়ার্ড এই পৃথিবীতে ছিলেন বেশ কয়েকঘণ্টা; তিনি মৃত্যুকালীন জবানবন্দিতে হরিচরণকে সব দায় থেকে মুক্ত করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ বললেন।

ক্ষিতিমোহন বললেন, কিন্তু ছাড়া পাওয়ার পর এক অদ্ভুত দ্বন্দ্বের সামনে দাঁড়িয়েছিল প্রদ্যুম্নদের পরিবার। সায়ানাইডের অ্যাম্পুল মুখে ফেলে দেন কৃষ্ণপদ। কৃষ্ণপদ মরে যাওয়ায়, হরিচরণকেই মহল্লার লোক নিত্য সম্বর্ধনা দিতে চেয়েছে। এদিকে রোগীকে বাঁচাতে না পারার কষ্ট তাকে কুরে খেয়েছে । মাঝেমাঝে ওঁর মনে হতো যে জেলের ভিতরে যদি থাকতেন, বাইরে বেরিয়ে না আসতেন তবে হয়তো এই অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পেতেন।

—এ যে বেশ গুরুতর দেখছি। বিধুশেখর নস্যি নিলেন নাকে।

—আরও গুরুতর দিকে গেল ব্যাপারটা যখন জৌনপুরের সভায় হরিচরণ বলে দিলেন যে একজন সাহেব, প্রশাসক হিসেবে চরম অত্যাচারী হতেই পারেন কিন্তু তবুও তাঁকে চিকিৎসা করার জন্য যে ডাক্তার তাঁর বাড়ি গেছে, সাহেবকে চিকিৎসা করে সুস্থ করে তোলার কথাই তাঁকে ভাবতে হবে। কথাটা শুনেই জনতার একাংশ ক্ষেপে উঠল। তারা বলতে শুরু করল যে এইভাবে হরিচরণ স্বাধীনতা সংগ্রামের অপমান করেছেন।

—ওই ঘটনার পর হরিচরণ আর বারাণসীতে থাকতে পারেননি। ডাক্তারি বন্ধ করে দিয়ে কলকাতায় চলে আসেন সপরিবার। রবীন্দ্রনাথ মুখ খুললেন।

—কিন্তু কৃষ্ণপদ যখন গুলি চালাতে গেছেন তখন তো উনি বাধা দিয়েছিলেন। বিধুশেখর বললেন।

—বাধা দিলেও আটকাতে তো পারেননি। আর সেই আটকাতে না পারা যে ওঁর জীবনকেও তছনছ করে দিল। ক্ষিতিমোহন বললেন।

—তছনছ!

—কেন নয়? বারাণসীতেই বেড়ে ওঠা এবং চিকিৎসাবিদ্যায় হাতেখড়ি। আয়ুর্বেদের নানান জটিল জিনিস ওখান থেকেই আয়ত্ত করা। সর্বোপরি ওখানকার জলবায়ু এবং পরিবেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ার পর কলকাতার ধুলো-ধোঁয়া হরিচরণ আর বেশিদিন সহ্য করতে পারেননি।

—এইসব কারণেই কি প্রদ্যুম্নকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হতে দেননি? পালটা প্রশ্ন করলেন বিধুশেখর শাস্ত্রী।

—ঠিক তাই। প্রদ্যুম্ন পাঠভবনে পড়াতে এসে দু-একজন বন্ধুকে বোধ করি বলে ফেলেছিল নিজের পারিবারিক ইতিহাস। ও কল্পনা করেনি যে প্রয়াত হরিচরণ গুপ্তের স্মৃতিতে কেউ কোনও সভার আয়োজন করে ফেলবে। বাবার নামে ফলক তৈরি করে ওর হাতে তুলে দেওয়া হবে শোনার পর আর চুপ করে থাকতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ বললেন।

—এই কথাগুলো আমাদের একটু বলে যেতেন যদি গুরুদেব, তবে আর এই ঝঞ্ঝাট হতো না। এখন তো শুনছি ব্রিটিশ পুলিশের তিন-চারজন দেশি কর্তা আসবেন শান্তিনিকেতনে। বিধুশেখরের গলায় চিন্তা।

—কথাটা যে আমার কানেও আসেনি তা নয় শাস্ত্রীমশাই। তাদের যথাযোগ্য আপ্যায়নের পর জানিয়ে দিতে হবে যে কোনও-কোনও ছাত্র অতি-উৎসাহের বশে এরকম একটি পরিকল্পনা করেছিল বটে কিন্তু প্রদ্যুম্ন গুপ্ত ব্রিটিশ রাজশক্তির একনিষ্ঠ ভক্ত। তাই সে বিশ্বভারতী ছেড়েও চলে গেছে। রবীন্দ্রনাথ থামলেন।

—এই কথা বলা হবে? প্রদ্যুম্নকে খলনায়ক সাজিয়ে? ক্ষিতিমোহন একটু অবাক।

—খলনায়ক কোথায়? পুলিশের কর্তাদের চোখে নায়ক হয়ে যাবে ছেলেটা। ওর ভবিষ্যতের কাজেকর্মে অনেক সুবিধা হবে। এই রাজভক্তির সার্টিফিকেট ওর জন্য অনেক জটিলতা সহজ করে দেবে।

—কিন্তু গুরুদেব...

—কোনও কিন্তু নয় শাস্ত্রীমশাই। আমি যা বললাম, সেভাবেই এগোন, দেখবেন এতে কেবল আমাদের প্রতিষ্ঠানই হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে না, প্রদ্যুম্ন নিজেও স্বস্তি পাবে। রবীন্দ্রনাথ স্মিত হাসলেন।

ক্ষিতিমোহন সেন এবং বিধুশেখর দু'জনই যে খানিকটা বিস্মিত এবং ব্যথিত হয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ তা সম্যক জানতেন। কিন্তু রাতে একটি নতুন গানের কলি যখন প্লাবনের মতো আসছে তখন তা থামিয়ে রেখে মনে মনে ওঁদের কাছে একটু দুঃখপ্রকাশ করে নিলেন রবীন্দ্রনাথ। কীভাবে উনি বলতেন, প্রদ্যুম্ন তাঁর বাবার পথে যায়নি, সে ভারতের মুক্তিসংগ্রামের এক সর্বস্ব-পণ করা যোদ্ধা। এই নাটকটা প্রদ্যুম্নর সঙ্গে কথা বলেই রচনা করেছিলেন উনি আর সেটা সুন্দরভাবে রূপায়ণের জন্য পাঠভবনের কয়েকটি ছেলের সামনে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর রবীন্দ্রনাথকে আর কিছু করতে হয়নি! উনি যখন বিদেশে তখনই ছেলেদের যা ঘটার ঘটে গিয়েছিল।

দরকার ছিল প্রদ্যুম্নর জন্যই। ও যে পণ করে আছে দেশ থেকে জাপানে গিয়ে রাসবিহারী বসুর সঙ্গে দেখা করে জাপান থেকে নতুন শক্তি সঞ্চারিত করবে ভারতের স্বাধীনতার লড়াইতে। পুলিশের চোখে ওর পরিচয় যদি একজন রাজভক্তের হয় তবে দেশ ছেড়ে জাপান যাওয়া অনেক সুবিধা। রবীন্দ্রনাথের মনে পড়ে গেল রাসবিহারী কীভাবে জাপানের মানুষের কাছে তাঁর সাহায্যের কথা উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ জাপানে গিয়ে সেই কথা শুনে ঘোর আপত্তি করেছিলেন। সাহায্য কেন হতে যাবে? ভারতের স্বাধীনতার লড়াই রবীন্দ্রনাথের লড়াই নয়?

প্রায় সারারাত পায়চারি করেই কেটে গেল রবীন্দ্রনাথের। ঘুমের বদলে একটা চিন্তা ফিরে ফিরে এল, আগামী মাসেই যদি প্রদ্যুম্ন জাপানে চলে যেতে পারে, ওর সঙ্গে দেখা হবে রাসবিহারীর। তারপর? সূর্যোদয়ের দেশ থেকে ভারতের মুক্তিসূর্য নতুন আভায় উদিত হবে কী?

বাইরের আকাশ ফর্সা হয়ে এসেছিল প্রায়। ভারতবর্ষের ভাগ্যাকাশ কবে অন্ধকার মুক্ত হবে ভাবতে ভাবতে কয়েক বিন্দু অশ্রু গড়িয়ে পড়ল রবীন্দ্রনাথের চোখ দিয়ে। কিশোর ভারতী

চুমকি চট্টোপাধ্যায়

রত্নেশ্বরের স্বপ্নপূরণ

রত্নেশ্বরের খবর অনেকদিন দেওয়া হয়নি তোমাদের। ভুলে যাওনি তো রত্নেশ্বরকে? সেই যে ওর মায়ের ব্লাড ক্যানসার হয়েছিল, রত্নেশ্বর শাক পাতা গেঁড়ি গুগলি খাইয়ে মাকে সুস্থ করে তুলেছিল, মনে নেই? তারপর ডাক্তারবাবুরা আর বিজ্ঞানীরা মিলে রত্নেশ্বর আর ওর মা কমলাকে কলকাতায় নিয়ে চলে এসেছিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে বলে। সেসব চলতে-চলতেই কেটে গেছে বেশ কিছু বছর। রত্নেশ্বর এখন কত বড় হয়েছে, কী করছে, সেসব খবর দেব তোমাদের।

রত্নেশ্বর অনেক বড় হয়ে গেছে। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সঙ্গে জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের পরীক্ষা দিয়েছিল রত্নেশ্বর। যে ডাক্তারবাবু ওদের কলকাতায় এনে রেখেছেন, তার খুব ইচ্ছে ছিল রত্নেশ্বর ডাক্তারি পড়ুক। কিন্তু ওর মোটেই সেদিকে ঝোঁক নেই। ওর ইচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার তাও একটা বিশেষ বিষয় নিয়ে। সেটা হল কাচ সংক্রান্ত অর্থাৎ সেরামিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং।

খুব খেটে পড়াশোনা করে জয়েন্টে চান্স পেয়ে গেছিল রত্নেশ্বর। সকলের আশীর্বাদে আর নিজের পরিশ্রমের ফলে গভর্নমেন্ট কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সেরামিক টেকনোলজিতে সুযোগ পেয়ে গেছিল। এখন ফাইনাল ইয়ার।

রত্নেশ্বরের মা কমলা এখন ভালো আছে। মাঝেমঝেই ডাক্তারবাবু এসে নিয়ে যান কমলাকে, বিভিন্ন পরীক্ষা হয়। রিপোর্ট সব ভালো আসে। রতন অনেকটা নিশ্চিন্ত। মায়ের যখন অসুখ হয়েছিল, তখন রতন এই অসুখটা সম্পর্কে কিছুই জানত না, বুঝত না।

ছবিঃ সুমন্তক চট্টোপাধ্যায়

কিন্তু এখন বোঝে। ও জানে বিজ্ঞানীরা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন এই অসুখের ওষুধ বের করতে।

মাঝেমধ্যেই ডাক্তারকাকুকে জিগ্যেস করে রতন, 'রিসার্চে কিছু বেরল কাকু?'

'অনেক চেষ্টাই চলছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগিয়ে, ডিএনএ সিকোয়েন্সিং করে, টার্গেটেড ট্রিটমেন্ট মানে, যে কোষগুলো আক্রান্ত, সেগুলোকেই শুধুমাত্র ধ্বংস করবে এমন ওষুধ আবিষ্কারের কাজ এগোচ্ছে। ন্যানো পার্টিকল ইঞ্জেক্ট করে খাবারের মাধ্যমে সুস্থ করে তোলার কাজও চলছে, যেভাবে তুমি সারিয়ে তুলেছ তোমার মাকে।

কমলা মোটে থাকতে চায় না এই গাছহীন, ইট-লোহার খাঁচা আর অতিরিক্ত শব্দ সমৃদ্ধ কলকাতায়। কেবল বলে, 'ও রতন, আমাকে বাড়ি রেখে আয় না বাবা। এখানে ভালো লাগছে না যে। আমাদের ঘরখানা আছে কি না, কে জানে। এর মধ্যে কত ঝড়-জল গেল। ওই নড়বড়ে ঘরখানা কি আর আছে বাবা!'

রতন বোঝে, গাছগাছালি ঘেরা সবুজ প্রকৃতির মাঝে, পাখির ডাকে ঘুম ভাঙা সকাল, ফুলে ফুলে প্রজাপতির ওড়াউড়ি ছেড়ে এই দূষণে ভরা শহর ভালো লাগার কথাও নয়। রতনেরও প্রিয় জায়গা ওর গ্রাম, ওর ভাঙা বাড়ি।

বৃষ্টি হলে ওদের ঘরে জল পড়ত। আবার চাঁদ উঠলে সেটারও খানিক দেখা যেত, চালে ফুটো ছিল বলে। এখানে সেসব কিছুই নেই। ঘরে জলও পড়ে না, চাঁদও দেখা যায় না ঘর থেকে। বাইরে বেরিয়ে দেখলেও, শহরের কৃত্রিম আলোয় চাঁদের আলো ম্লান লাগে।

রতন মাকে বোঝায়, 'আমার পড়াটা শেষ হয়ে যাক মা। তারপর যদি তোমার আশীর্বাদে একটা ভালো চাকরি পেয়ে যাই তাহলে আমাদের বাড়িটা সারিয়ে নিয়ে মায়ে-পোয়ে থাকব। তুমি আর ক'টাদিন সবুর করো মা।' মায়ের কোলে মাথা দিয়ে শোয় রতন। ওর মা রতনের চুলে বিলি কেটে দিতে দিতে বলে, 'ঘরখানার খোঁজ নেওয়া যায় না?'

'নিয়েছি তো মা। সামন্তজেঠিকে ফোন করেছিলাম দুবার। জেঠি লোক পাঠিয়ে দেখেছে। বলল, 'আয়লা ঝড়ে মাথার চালটার খুব খারাপ অবস্থা হয়ে আছে। গাছপালা সব গেছে। গ্রামের অনেক বাড়ি ঘরই ভেঙে গেছে মা।'

'তাহলে কী হবে রে রতন। সারাতে তো অনেক খরচা হবে।'

'সে তুমি ভেবো না মা। আমি সব ব্যবস্থা করব। তুমি শুধু ভালো থাকো।' নীচু হয়ে রতনের কপালে একটা হামি দেয় কমলা। অনেক স্বপ্ন জমে আছে রতনের চোখের পাতায়, মাকে খুশি রাখার স্বপ্ন।

কলকাতায় এত বছর থেকে কমলার কথাবার্তায় অনেক পরিবর্তন এসেছে। গ্রাম্য ভাবটা কেটে গেছে। কিন্তু কিছু ব্যাপার এখনো ঠিক আয়ত্ত করতে পারেনি। যেমন মোবাইল ফোন ব্যবহার করা কোনোভাবেই শিখতে পারেনি কমলা। রতন জানে, মা পড়তে লিখতে জানে না তাই নম্বর বা নাম পড়া সম্ভব নয় মায়ের পক্ষে। আর এই কারণেই মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর সব কাণ্ড ঘটায় কমলা।

সেদিন দুপুর থেকে তুমুল বৃষ্টি নেমেছে। রতন তখন কলেজে। ছুটির পরে বেরিয়ে দেখে রাস্তায় কোমর জল। সব্বোনাশ, ফিরব কী করে! বিড়বিড় করে রতন। ওর এক বন্ধু শুভজিত রতনের দিকেই থাকে। সে পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলে, 'বাসের আশায় অপেক্ষা করে লাভ নেই বুঝলি। চল হন্টন লাগাই।'

হাঁটাকে ভয় পায় না রত্নেশ্বর। গ্রামের এ-মাথা থেকে ও-মাথা চষে বেড়ানো ছেলে সে। ওর ভয় লাগতে লাগল রাস্তায় কোথায় গর্ত, কোথায় ড্রেনের মুখ খোলা আছে, সেসব নিয়ে। শুভজিত ওকে ভরসা দিল। 'তুই আমার পেছন পেছন আয়, ভয় নেই।'

এ তো গেল রত্নেশ্বরের দিক। এদিকে কমলা তো চিন্তায় অস্থির! অন্ধকার নামার আগেই ফিরে আসে রতন। আজ কী হল! এত বৃষ্টি হয়েছে, কোনো বিপদ হল না কি! শুধু ভগবানের নাম জপে যাচ্ছে কমলা।

কমলাকে ঘড়ি দেখা শিখিয়ে দিয়েছিল রতন। অনেক কষ্ট করে শিখেছে কমলা। ছবির মতো করে মনে রাখে। কিছুটা সময় লাগে বুঝতে তবে আন্দাজ করে নিতে পারে।

খানিক্ষণ দেওয়াল ঘড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে কমলা বুঝল সাড়ে ছ'টা বাজে। অন্যদিন এই সময়ে আলো মরে এলেও এত অন্ধকার হয় না। আজ আকাশভরা মেঘ তাই বাইরেটা অন্ধকার। রতন কখন ফিরবে!

আরো পঁয়তাল্লিশ মিনিট পার হয়ে গেল, রতন তখনও ফেরেনি দেখে মাথাটা কেমন করে উঠল কমলার। চটি গলিয়ে নীচে নেমে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াল। ওদের বাড়ির সামনের রাস্তায় পায়ের পাতা ডোবা জল।

রতনের মুখে শুনেছিল ওর কলেজ যাদবপুরে। একটা বাস আসছে দেখে হাত দিয়ে থামায় কমলা। জিগ্যেস করে, 'এই বাস কি যাদবপুর যাবে?'

কনডাক্টর হেসে বলে, 'ও ফুটে গিয়ে দাঁড়ান মাসিমা, এটা উলটোদিকে যাবে।'

রাস্তা আর পার হয়ে উঠতে পারে না কমলা। একে তো কলকাতায় একা কখনো বেরোয় না, যখনই যায় ট্যাক্সি করে যায়। ডাক্তারবাবু টাকা দিয়ে দেন, তার ওপর সাঁ সাঁ করে গাড়ি ছুটছে। আবার পায়ের নীচে জল। সব মিলিয়ে দিশেহারা হয়ে যায় কমলা। কান্না পেয়ে যায়। 'রতন, কোথায় গেলি বাবা, আমার কাছে আয়।' কমলার অন্তরাত্মা আর্তনাদ করে ওঠে।

একজন ট্রাফিক পুলিশ এগিয়ে আসে কমলাকে দেখে। 'রাস্তা পার হবেন?'

'হ্যাঁ বাবা।' পুলিশ দেখে জোর পায় কমলা।

'আসুন আমার সঙ্গে। কোথায় যাবেন?'

'দেখো না বাবা, ছেলেটার ফেরার সময় অনেক্ষণ পার হয়ে গেছে, এখনো ফেরেনি বাড়ি। আমি তাই ওর কলেজে যাব। এত দেরি তো করে না।'

কোন কলেজ ইত্যাদি সব জেনে নিয়ে ট্রাফিক সার্জেন্ট বলে, 'আপনি যে কলেজের কথা বলছেন, সেখানে রাস্তায় কোমর জল জমেছে। গাড়ি বন্ধ। তাই দেরি হচ্ছে। ফোন নম্বর আছে আপনার কাছে?'

কাঁধের কাপড়ের ঝোলা থেকে একটা পকেট ডায়রি বের করে দেয় কমলা। 'এর ভেতর নম্বর লেখা আছে বাবা। আমি তো লেখাপড়া জানি না তাই ফোন করতে পারি না।'

ডায়রির প্রথম পাতাতেই বড় করে লেখা রত্নেশ্বর দাস। ৯৮৩০১...। নিজের মোবাইল বের করে ফোন করে ভদ্রলোক। বেশ কিছুক্ষণ রিং হবার পর ওপাশ থেকে 'হ্যালো' শোনা যায়।

'রত্নেশ্বর দাস বলছেন?'

'হ্যাঁ বলছি।'

'আমি ট্রাফিক সার্জেন্ট মৃন্ময় ভদ্র বলছি। নিন আপনার মায়ের সঙ্গে কথা বলুন।' ফোনটা কমলার হাতে দেয় মৃন্ময়।

'রতন, মা বলছি। এত দেরি করছিস কেন বাবা? আমি যাব বলে রাস্তায় নেমে দিশে পাচ্ছিলাম না। তখন এই ভদ্রলোক এগিয়ে এসে আমার কত উপকার করল। তুই কখন আসবি?'

'মা, আমি হেঁটে ফিরছি। এখানে খুব জল। তুমি বাড়ি যাও, চিন্তা কোরো না। আমার সঙ্গে শুভজিত আছে। আমার আরও ঘণ্টা খানেক কি তার একটু বেশি লাগবে।'

'আচ্ছা বাবা। সাবধানে আয়।' মৃন্ময়ের হাতে ফোনটা ফেরত দিতেই মৃন্ময় ফোন কানে দিয়ে হ্যালো বলল। রত্নেশ্বর ফোনটা ছাড়েনি তখনও।

'রত্নেশ্বর, বলছি যে মাকে একটা ফোন কিনে দিন। বেসিক ফোন। উনি ফোন করতে না পারলেও, কোনো প্রয়োজনে আপনি তো ফোন করতে পারবেন। আজ একটা বিপদ ঘটে যেত যেভাবে রাস্তা পার হবার চেষ্টা করছিলেন উনি।'

'হ্যাঁ স্যার, আমি ব্যবস্থা করব। আপনাকে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা নেই আমার। প্রণাম নেবেন স্যার।'

রত্নেশ্বরের ব্যবহারে খুশি হল মৃন্ময়। বলল, 'আমার নম্বরটা সেভ করে রাখো। দরকারে ফোন কোরো। অনেক ছোট তাই তুমিই বললাম। ফোন কেটে কমলার দিকে ফিরে বলল,'আপনি কোথায় থাকেন দিদি?'

পেছনের দোতলা বাড়িটা দেখিয়ে কমলা বলে, 'ওই তো, ওই বাড়িটায় থাকি।'

'চলুন, আপনাকে দরজা অবধি পৌঁছে দিয়ে আসি। এরকম হুটপাট করে বেরোবেন না যেন।'

'অনেক আশীর্বাদ করলাম তোমাকে বাবা। খুব ভালো হবে তোমার। ঘরে যাবে না? এক গেলাস জল খেয়ে যেতে।'

'না দিদি, আমি এখন ডিউটিতে আছি। পরে আসব একদিন। ছেলেকে বলেছি, আপনার কাছে একটা ফোন রেখে দিতে, যাতে ও ফোন করতে পারে।'

'দেখো বাবা, আমাদের পুরো খরচটাই দেয় ডাক্তারবাবুরা মিলে। রতনকে ওরা একটা ফোন দিয়েছে, কিন্তু আমার জন্যে চাইতে লজ্জা পেয়েছে রতন। তাছাড়া, আমি তো কিছুই পারি না বাবা। ফোন খারাপ করে বসব শেষে।'

'আচ্ছা, চলি আমি। ছেলে চলে আসবে, চিন্তা নেই।'

আরও প্রায় এক ঘণ্টা দশ মিনিট বাদে ঘরে ঢুকল রত্নেশ্বর। বুক অবধি ভিজে গেছে। কমলা হইহই করে উঠল ছেলেকে দেখে।

'ওরে মারে, ও রতন, তুই তো পুরো ভিজে গেছিস বাবা! যা যা শিগগির ভেজা কাপড়চোপড় ছাড়। তুই কলে যা, আমি কাপড়জামা দিচ্ছি। ঠান্ডা না লেগে যায়, ঠাকুর ঠাকুর।'

রত্নেশ্বর স্নান সেরে বেরোলে এক গ্লাস উষ্ণ দুধ আর দুটো বিস্কুট এনে কমলা বলে, 'দুধটুকু খেয়ে নে রতন। বাব্বা, আজ আমি খুব চিন্তায় পড়ে গেছিলাম রে! তুই আসছিস না, ভয় বুক শুকিয়ে গেছিল। শেষে আর সামলাতে না পেরে তোর কলেজে যাব বলে রাস্তায় নেমেছিলাম।'

'রাস্তায় নেমেছিলে, খুব ভালো কথা। তারপর? তুমি কিছু চেনো মা? যদি এদিক ওদিক চলে যেতে কোথায় খুঁজতাম তোমাকে বলো তো? এরকম করে? ভাগ্যিস ওই মৃন্ময়দাদা ছিল, নাহলে যে কী হত! ভদ্রলোক ঠিকই বলেছেন, তোমাকে একটা ফোন দিতে হবে।'

'আমি ওসব পারব না বাবা। আর কোনোদিন এমন ধারা করব না। ঠাকুর আছেন, তিনিই রক্ষে করবেন। তাছাড়া ফোনের অনেক দাম, ওসবে কাজ নেই।'

'আমি টিফিনের টাকা থেকে অল্প অল্প জমিয়েছি মা। কত জমেছে দেখি, যদি ফোনের দাম হয়ে যায় তো আর কথাই নেই! তোমাকে ফোন কিনে দেব।' মাকে জড়িয়ে ধরে বলে রতন।

টাকা গুনে রত্নেশ্বর দেখে এগারোশো টাকা মতো হয়েছে। কলেজ থেকে ফেরার পথে বোতাম দেওয়া ফোনের দাম জেনে আসবে ঠিক করে নেয়।

পরের দিন দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে দরজা খোলে কমলা। দেখে মৃন্ময় দাঁড়িয়ে আছে। আজ আর পুলিশের পোশাকে নয়। খুশি হয় কমলা।

'এসো বাবা এসো। আজ পোশাক পরোনি?'

'না দিদি, আজ আমার ডিউটি নেই, ছুটি।'

'বাহ, বেশ। বলো কী খাবে, চা করি একটু।'

'কিচ্ছু খাব না দিদি। একটু আগেই ভাত খেয়েছি। এক গ্লাস জল দিন শুধু।'

প্লেটে দুটো নারকোল নাড়ু আর এক গ্লাস জল এনে কমলা বলে, 'আমার বাড়িতে প্রথম এলে, এটু কিছু মুখে না দিলে শান্তি পাব না বাবা। তুমি সেদিন আমার কত উপকার করেছ তা ভোলার নয়। ছেলে বাড়ি ফিরে খুব রাগ করেছে। আমি বলেছি, ভগবান মৃন্ময়ের রূপ ধরে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।'

'আরে না না, এ তো আমাদের ডিউটি দিদি। আচ্ছা, এইটা আমি আপনার জন্যে এনেছি। রাখুন।' একটা ছোট বাক্স কমলার দিকে এগিয়ে দেয় মৃন্ময়। 'রত্নেশ্বর এলে দেখাবেন। ও সব বুঝিয়ে দেবে। আমি আজ আসি। ছেলের কাছে আমার নম্বর আছে। দরকারে ফোন করবেন।'

কলেজ থেকে ফিরতেই রত্নেশ্বরকে মৃন্ময়ের দেওয়া উপহার দেখায় কমলা। 'ও বাবা, এ তো মোবাইল গো মা। উনি কেন দিলেন! আচ্ছা, আমি ফোন করে কথা বলে দেখি।' 'হ্যালো স্যার, আমি রত্নেশ্বর বলছি। স্যার, আপনি ফোন দিয়ে গেছেন, আমার খুব লজ্জা করছে। মানে স্যার এটা...।'

'শোনো রতন। ফোনটা একেবারেই বেসিক ফোন। খুব দামি নয়। আমার দিদি ছিল, এখন নেই। ক্যান্সারে ভুগে চলে গেছে। তোমার মাকে আমি দিদি ডেকেছি। এটা ভাইয়ের তরফ থেকে সামান্য উপহার। ফেরত দিও না, দুঃখ পাব।'

'তাহলে কথা দিন মামা, একদিন এসে আমাদের সঙ্গে ডাল-ভাত খাবেন। সেদিন আমি আমার মায়ের গল্প আপনাকে বলব।'

'বেশ, কথা দিলাম। মামা বলে ডেকেছ কিন্তু আপনি বলছ। সেটা ঠিক হচ্ছে কি?'

'আচ্ছা মামা, তাই হবে। কবে আসবে জানিও। ছুটির দিন হলে ভালো হয়।'

'তাই আসব।'

'কত ভালো মানুষ বলো মা। এক দিনের আলাপেই তোমাকে ওনার দিদির জায়গায় বসিয়েছেন। ওনার দিদি মারা গেছেন। তাই কিছু বলতে পারলাম না। কিন্তু আমার মনটা খুঁতখুঁত করছে। প্রতিদান কিছু দেওয়া উচিত। তাই না মা?'

'হ্যাঁ বাবা, সে তো উচিতই। আমাদের ওপর ঠাকুরের অসীম দয়া! না-হলে এত ভালো ভালো মানুষের দেখা মেলে।'

এক রবিবার মৃন্ময় আসে ওদের বাড়িতে। ওদের সঙ্গে বসে বিউলির ডাল, পলতা পাতার বড়া আর আলু পটল দেওয়া রুই মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খায়। রত্নেশ্বর ওর মায়ের ঘটনা সব খুলে বলে। কলকাতায় থাকার কারণও বলে সবিস্তারে।

অবাক হয়ে শোনে মৃন্ময়। বলে, 'তুমি তো কামাল করে দিয়েছ রতন! শাবাশ! আমাকেও একটু উদ্ধার করে দাও ভাগনে। আমার ছেলে শুদ্ধশীল ক্লাস ফাইভে পড়ে। অঙ্কে খুব কাঁচা। তুমি যদি একটু গাইড করে দাও তো খুবই ভালো হয়।'

সানন্দে রাজি হয়ে যায় রত্নেশ্বর। সপ্তাহে দুদিন করে সন্ধের সময় টাইম ঠিক হয়। 'আচ্ছা ভাগনে, মাসে পাঁচশো টাকা করে দেব তোকে, কেমন?'

'তাহলে আমি পড়াব না। অন্য মাস্টার খুঁজে নাও।'গম্ভীর হয়ে বলে রত্নেশ্বর।

হেসে ফেলে মৃন্ময়। 'শোন, গুরুদক্ষিণা না দিলে সে শিক্ষা সফল হয় না রে। তাই বলছিলাম আর কি।'

'সে তো তুমি দিয়েই দিয়েছ মামা। দক্ষিণা নিলে আমার পাপ হবে।'

'তুই বড় ভালো ছেলে। আজকের দিনে এমন ছেলে বিরল। দিদি তোমার অনেক ভাগ্য তুমি ওর মতো ছেলে পেয়েছ।' 'মা অনেক কষ্ট করেছে মামা। বাবা চলে যাবার পর তো আরও বেড়েছিল কষ্টের পরিমাণ। মাকে ভালো রাখার অনেক স্বপ্ন আমার। কবে যে পূরণ করতে পারব।'

'সব স্বপ্ন পূরণ হবে তোর। দেখে নিস। যা চাইবি তাই হবে। মামার এই কথাটা মনে রাখিস।'

এরপর কেটে গেছে আরও পাঁচ বছর। রত্নেশ্বর পাশ করে ভালো চাকরি পেয়ে গেছে। ভালো টাকা মাইনে পায়। ইদানীং কমলা আরও বেশি করে গ্রামের কথা বলে।

'ও রতন, তোর পড়াশোনার পাট চুকেছে, আমিও ভালো আছি। তাহলে এবার আমাকে গ্রামে রেখে আয় না বাবা। আমার দম যে বন্ধ হয়ে আসে এইখেনে। ওই বাড়ির জন্যে মনটা আকুলিবিকুলি করে। সেই যে এসেছি, আর তো গেলামই না! ঘরখানা আছে কি নেই, কে

জানে। সামন্তগিন্নিকে ফোন করেছিলি নাকি?'

'অনেকদিন ফোন করা হয় না মা। এবার যাব তো গ্রামে। আমি আগে গিয়ে দেখে আসব, তারপর তোমাকে নিয়ে যাব। সারাতে হবে তো। মামাকে বলব তোমার খেয়াল রাখতে।'

দুদিনের ছুটি নিয়ে গ্রামে গেল রত্নেশ্বর। কমলাকে ফোন ধরতে শিখিয়ে দিয়েছে তাই কমলা আর দুশ্চিন্তা করে না। সময়ে সময়ে খবর দেয় রতন।

দুদিন বাদে ফিরে এসে রত্নেশ্বর জানাল, 'বাড়ির হাল খুব খারাপ মা। অনেক মেরামতি করতে হবে। ছ'মাস লাগবে।'

'তা হ্যাঁ রে, সারিয়ে আবার এরকম বাড়ি করে দিবি না তো? গাছপালা কেটে, চারদিকে ইট কাঠ দিয়ে জেলখানা বানিয়ে দিস না যেন।'

'না মা, যেমন ছোট্ট বাড়ি ছিল আমাদের তেমনই থাকবে। তুমি ঘর থেকে বৃষ্টিও দেখতে পাবে, চাঁদও দেখতে পাবে।'

'দূর পাগল! চাল দিবি না নাকি? বলে কি দেখো ছেলে।' হেসে ফেলে কমলা। মায়ের কোলে শুয়ে পড়ে রতন।

মাঝে-মাঝেই গ্রামে যাচ্ছে রতন। শনিবার অফিস করে চলে যায়, সোমবার এসে অফিস করে। এইভাবে সাত মাস চলার পর একদিন কমলাকে বলে, 'বাড়ি সারাই হয়ে গেছে মা। বিশ্বকর্মা পুজোর দিন চলো ওই বাড়িতে যাই। আমি সামন্তজেঠির সঙ্গে দেখা করে কথা বলে এসেছি। ওনাদের পুরুতমশাই পুজো করে দেবেন ওই দিন।

'সামন্তজেঠির পায়ে বাতের খুব ব্যথা। আমাকে কত আদর করল। বলল, কতদিন কমলাকে দেখি না। ও কি আগের মতো গয়না বড়ি দিতে পারে এখনো? কমলা চলে যাবার পর গয়না বড়ি খাওয়া উঠে গেছে আমাদের।'

'বড় ভালো মহিলা সামন্তগিন্নি। ওখানে গিয়ে আমি গয়না বড়ি করে দিয়ে আসবখন।'

বিশ্বকর্মা পুজোর দিন ভোরবেলা কমলাকে নিয়ে রওনা দিল রত্নেশ্বর। মৃন্ময়কেও বলেছিল যেতে। ওর ডিউটি থাকায় যেতে পারেনি। কমলার শরীরে যেন অন্য প্রাণ! আনন্দে, উত্তেজনায় কথা বলেই যাচ্ছে।

বাড়ির সামনে এসে কেঁদে ফেলে কমলা। সেই ছোট্ট বাড়িই আছে, কিন্তু পাকাপোক্ত হয়ে গেছে। ইটের দেওয়াল, মাথায় পাকা ছাদ, বাঁধানো উঠোন। গাছপালা সব ঝড়ে নষ্ট হয়ে গেছিল। নতুন করে অনেক গাছ লাগানো হয়েছে।

রত্নেশ্বর মাটি মাটি রঙ করিয়েছে বাইরেটা যাতে মাটির বাড়ির গন্ধটা থাকে। রান্নাঘর পাকা হয়েছে আর স্নানের জায়গাটা, যেটার মাথা আগে খোলা ছিল, সেটাও পাকা করে দরজা লাগিয়ে দিয়েছে।

'কই রে রতন, তুই যে বললি, যেমন বাড়ি ছিল তেমনি থাকবে, তা তো নেই! এ তো শহরের মতো না হলেও ইটের বাড়িই হয়েছে। রঙটা অবিশ্যি ভালো দিয়েছিস দুষ্টু ছেলে। কিন্তু আমি বৃষ্টি আর চাঁদ দেখব কী করে শুনি?'

'ভেতরে এসো মা। আমি আর তুমি যে ঘরটায় থাকতাম, এখন আবার থাকব, সেটা দেখবে চলো।'

সেই ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে যায় কমলা। পাকা ছাদের মাঝখানে গোল করে বসানো পুরু কাচ, সেখান দিয়ে দেখা যাচ্ছে আকাশের অংশ। নীল আকাশে সাদা পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ। চৌকিটা ঘরের বাঁদিক ঘেঁষে রাখা। তার ওপরে ফ্যান লাগানো।

'এই চৌকিতে শুয়ে দেখো মা। তুমি চাঁদ উঠলেও দেখতে পাবে, বৃষ্টি পড়লেও দেখতে পাবে।'

মুখের ভাষা হারিয়ে ফেলে কমলা। এ কী কাণ্ড করেছে রতন! তারপরেই ভয় পেয়ে বলে ওঠেন, 'ও রতন, যদি শীলা বৃষ্টি হয় তখন? কাচ তো ফেটে চৌচির হবে বাবা!'

'না মা, না। কিচ্ছু হবে না। আমি তো কাচের কাণ্ডকারখানা নিয়েই পড়াশোনা করেছি, তুমি জানো তো। এই কাচ পাথর ছুড়লেও ফাটবে না। বন্দুকের গুলিও এই কাচে লেগে ঠিকরে যাবে, বুঝেছ? হাই কোয়ালিটি বুলেট প্রুফ কাচ এটা। তুমি নিশ্চিন্তে থাকো মা গো।'

ছেলের কথায় আশ্বস্ত হয় কমলা। পরমুহূর্তেই আবারো গলা শুকিয়ে যায় তার। রতন! রতন কী করে থাকবে এখানে, ওর তো চাকরি আছে। মায়ের শুকনো মুখ দেখে কিছু একটা গোলমাল আন্দাজ করে নেয় রত্নেশ্বর।

'কী ভাবছ মা?'

'তুই কোথায় থাকবি রতন? তোর তো চাকরি আছে?'

'সব ব্যবস্থা আমি করে ফেলেছি মা। আমি শনিবার করে আসব আবার সোমবার সকালে চলে যাব। তোমার কাছে বাসন্তীদি থাকবে। সামন্তবাড়িতে কাজ করত বাসন্তীদির মা মঙ্গলাপিসি, মনে আছে তোমার? সেই মঙ্গলাপিসির মেয়ে বাসন্তীদি।'

মনে করার চেষ্টা করে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কমলার মুখ। 'ও মনে পড়েছে। বাসন্তীর তখন ষোলো-সতেরো বছর বয়েস ছিল। বিয়ে হয়ে যায়নি ওর?'

'হয়েছিল মা। সে অনেক গন্ডগোল বিয়েতে। মোট কথা বাসন্তীদি এখন মঙ্গলাপিসির কাছেই থাকে। চার বছরের মেয়ে আছে, ফুলটুসি। আমি বলেছি, মেয়ে নিয়ে আমাদের বাড়িতে থাকতে। ফুলটুসির সব দায়িত্ব আমার।'

পুজো আসছে। শহরে তো বটেই, গ্রামেও সাজো সাজো রব পড়ে গেছে। প্যান্ডেলে বাঁশের কাঠামো বাঁধা হয়ে গেছে । এদিকে আবার বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে। তাই আকাশ কালো।

শুক্রবার রাতেই বাড়ি এল রত্নেশ্বর। পরের দিন শনিবার গান্ধীজির জন্মদিন, ছুটি। কমলার আনন্দের সীমা নেই। শনিবার বিকেল থেকে গড় গড়িয়ে মেঘ ডাকা শুরু হল। অন্ধকার নামতেই শন শন হাওয়া ছুটল। রাত নামতেই মুষলধারে শুরু হল বৃষ্টি।

রাতের খাওয়া সেরে মায়ে-পোয়ে বিছানায় শুয়ে কাচের ভেতর দিয়ে দেখছিল। তোড়ে নেমে আসছে বৃষ্টির ফোঁটা! অদ্ভুত লাগছিল কমলার। এই মনে হচ্ছে সব ভিজে যাবে কিন্তু ছেলের কেরামতিতে তা হচ্ছে না।

বাসন্তী আর ফুলটুসিও এখানে থাকতে পেরে মহা খুশি। কমলার সব কাজ বাসন্তী করে দেয়। কমলা ফুলটুসিকে নিয়ে মেতে থাকে।

সেদিন পূর্ণিমা। রতন মাকে বলল, 'চাঁদটা দেখো মা, আমাদের দেখা দিতেই যেন কাচের ওপরটায় এসেছে। কী সুন্দর লাগছে!' কমলা বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে আছে চাঁদের দিকে।

'তোর বাবা থাকলে কত্ত আনন্দ পেত বল দেখি। এত সুখ পৃথিবীর কোনো ছেলে তার মাকে দিতে পারেনি।' চোখ ভিজে ওঠে কমলার।

'বাবা ওপর থেকে আমাদের রক্ষা করছে মা। সব দেখছে বাবা।' ভিজে ওঠে রত্নেশ্বরের চোখও।

ইতিমধ্যে রত্নেশ্বরের অফিসের দুই সহকর্মী এসে এই বাড়িতে ঘুরে গেছে। অবাক হয়েছে রত্নেশ্বরের আইডিয়া দেখে। অফিসে গিয়ে গল্প করেছে।

লন্ডন থেকে সাহেব বস এসেছেন কলকাতার অফিসে। রত্নেশ্বরের কথা তিনি শুনেছিলেন। ওর গ্রামের বাড়ি দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করাতে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে রতন।

'ওয়াও! ওয়ান্ডারফুল!! ইউ আর সো ইন্টেলিজেন্ট রাটন! আই অ্যাম ইম্প্রেসড। আই অ্যাম ইনভাইটিং ইউ টু লন্ডন। প্লিজ কাম। কম্পানি উইল বেয়ার অল দ্য এক্সপেন্সেস।'

রত্নেশ্বর দোটানায়। জানে না কী করবে। অতিরিক্ত উচ্চাশা ওর নেই। মাকে খুশি রাখাই ওর জীবনের ব্রত। কিন্তু এমন সুযোগ তো জীবনে বারবার আসে না।

অনেক রাত হয়েছে। কমলা ঘুমোচ্ছে। ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল রত্নেশ্বর। তারা ভরা ঝলমলে আকাশ। উজ্জ্বল এক তারাকেই বেশি করে চোখে পড়ল ওর, মনে হল বাবা দেখছে। দু'হাত জড়ো করে রত্নেশ্বর বলল, 'আমাকে পথ দেখাও বাবা।' কিশোর ভারতী

অন্যজগতের তারকা

সুরজিত চট্টোপাধ্যায়

লাল মাটি, সবুজ ঘাস

জন্ম আমার রামপুরহাটে ঠিকই, কিন্তু আমার জন্মের পরেই বাবা ট্রান্সফার হয়ে যান চন্দনপুর। আমার থেকে দু-বছরের বড় আমার দিদি, আমি তখন আমার মায়ের কোলে।

চন্দনপুরের কোনো স্মৃতিই আমার নেই। আর থাকবেই বা কী করে? তখন তো আমি একেবারেই কোলের শিশু।

দিদি হয়তো একটু একটু হাঁটতে শিখছে। চন্দনপুরের কথা মা'র কাছেই শুনেছি। সামনে বিস্তীর্ণ রেল ইয়ার্ড, বাড়ির পেছনে জঙ্গল আর মাঝখানে সারি দেওয়া কিছু রেল কোয়ার্টার। শুধু সেই বাড়িগুলোতেই আলো জ্বলত। তাছাড়া ঘুটঘুটে অন্ধকার। চারিদিকে শেয়াল ডাকত। রাতের বেলা আলো চলে গেলে শুধু ঝিঁঝি পোকা আর শেয়ালের ডাক। পুলিশের চাকরি, তাই বাবার কাজের সময়ের কোনো ঠিকঠিকানা নেই। মা বলত,—তোদের বাবার কোনো কারণে বাড়ি ফিরতে দেরি হলে, আমি সারারাত তোদের দুজনকে কোলে নিয়ে জেগে বসে থাকতাম। শেয়ালের ডাকে ভয়ে ঘুমাতে পারতাম না।
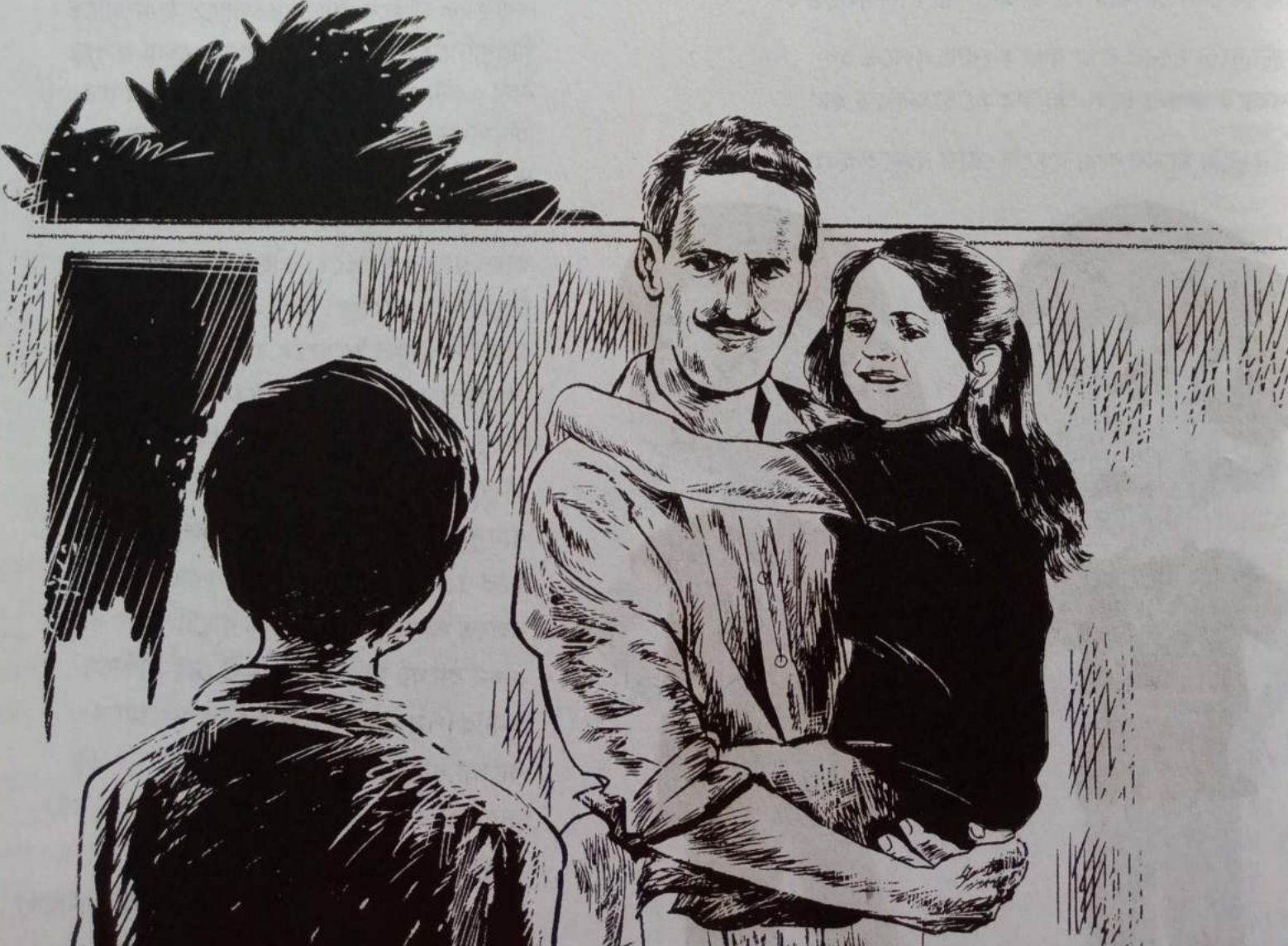
আমার ছোটমামা মাঝেমধ্যেই মা'র কাছে এসে থাকত। সেই ক'টাদিন মা একটু নিশ্চিন্তে থাকত।

এরই মধ্যে আরেকটা ঘটনা ঘটল, বাবার ট্রেনিং-এর ডাক পড়ল। লখনৌতে। এক বছরের জন্য বাবাকে ট্রেনিং-এ যেতে হবে। আমাদের দুজনকে নিয়ে একা চন্দনপুরে থাকা মা'র পক্ষে সম্ভব ছিল না। বাবা ট্রেনিং-এ গেল।

আমাদের রেখে গেল ভবানীপুর টার্ফ রোডে তাদের যৌথ পরিবারের বাড়িতে।

ভবানীপুর টার্ফ রোডের বাড়িটা পুরোনো কলকাতার বাড়ি যেমন হয়, ঠিক তেমন। বাইরের দেওয়াল লাল, সবুজ খড়খড়ি জানলা। বাড়ির ভেতরের দেওয়াল হলুদ চুনকাম করা। সব ঘরে ঘটর ঘটর আওয়াজ করা ডিসি ফ্যান। দোতলা বাড়ি। একতলায় দুটো ঘর নিয়ে থাকত অমিয় মণ্ডল আর মনীষা মণ্ডল (আমরা বলতাম কাকু আর কাকি), আমাদের বাড়িওয়ালা। একতলায় আরও দুটো ঘর ছিল। আমাদের রান্না আর খাবার ঘর, চৌবাচ্চাসহ একটা চান করার জায়গা। এছাড়াও ছিল দোতলা, যেখানে আরও তিনটে ঘর আর একটা বাথরুম। পুরোটাই আমাদের। মনে হচ্ছে খুব বড়, তাই না? তাহলে বলি, পরিবারে কতজন ছিল! চার ভাই, তিন বোন আর আমার ঠাকুমা। দুই পিসির বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, তারা যাতায়াত করত, বাকিরা ভবানীপুর টার্ফ রোডের বাড়িতেই জায়গা ম্যানেজ করে থাকত।

এতজনের মধ্যে এবার আমরাও এসে পড়লাম। মা, দিদি আর আমি। কারণ বাবা তো লখনৌতে। কাকা, পিসি আর ঠাকুমার কোলেপিঠে বড় হতে শুরু করলাম আমরা। মা'র কাছে শুনেছি, সারা বাড়ি খুবই আনন্দে ছিল আমাদের দুই শিশুকে নিয়ে। আমার অবশ্য এসবের কোনো স্মৃতি নেই। সব মা'র থেকে শোনা। আস্তে আস্তে যখন আমি চারপাশ দেখতে বুঝতে শুরু করলাম, দেখলাম কাকারা, পিসিরা, ঠাকুমা, মা, দিদি, আমি, অমিয়কাকু, কাকি সবাই আছে, শুধু বাবা নেই।

মাঝে মাঝে বাবার চিঠি আসত, মা পড়ে ঠাকুমাকে শোনাত। সেই সব চিঠি পরিবারের সবাইকে উদ্দেশ্য করে। বাবা কি মাকে আলাদা করে চিঠি লিখত? মনে হয় না, কারণ আমি কোনোদিন মাকে আলাদা করে কোনো চিঠি পড়তে দেখিনি।

এরই মধ্যে কলকাতার জুলিয়েন ডে স্কুলে আমাদের ভর্তি করা হল, আমি নার্সারি আর দিদি কেজি ওয়ান। স্কুলে রিকশা করে দিয়ে আসত মা, আর স্কুল শেষে কখনো মা কখনো ছোট পিসি নিয়ে আসত।

শুনেছি তারকেশ্বরে আমার চুল মানত করেছিল ঠাকুমা, তাই আমার চুল সর্দারজিদের মতো বড় হল। মনীষা কাকি রুমাল দিয়ে আমার মাথায় সর্দারজিঝুঁটি বেঁধে দিত। আমার একটা ট্রাইসাইকেল ছিল, যেটায় চেপে আমি বাড়ির সামনের রাস্তায় ঘুরতাম। ভবানীপুর অঞ্চলে যেহেতু অনেক শিখ সম্প্রদায়ের মানুষজন থাকেন, তাই আমাকেও অনেকে কোনো সর্দারজির পুত্র ভাবত। সবাই মিলে বড় করছিল আমাদের, সবাই ছিল চারপাশে।

একদিন বাবার চিঠি এল, ট্রেনিং শেষ, বাবা ফিরছে। বাবা আজ আসবে। সেজো কাকা জগুবাজার থেকে ইলিশ মাছ নিয়ে এসেছে।

—বউদি একটু ডিম দেখেই আনলাম। ডিমের টক বানিয়ে দাও, বড়দা ভালোবাসে।

মা সারাদিন ঘর গুছিয়েছে, এখন রান্না করছে। ঠাকুমা টবের গাছগুলোতে জল দিয়ে, চান সেরে ধবধবে সাদা একটা শাড়ি পরেছে। কী সুন্দর লাগছে ঠাকুমাকে। বিকেলে মেজো পিসি আর পিসেমশাই আসবে শুনলাম। বাবা আসবে, বাবা আসবে..., বাবা কীরকম? আমার তো বাবার সেরম কোনো স্মৃতি নেই। বাবাকে আমি প্রথম দেখব।

ভবানীপুর টার্ফ রোডের বাড়িতে কড়া নাড়ার শব্দ।

ঠাকুমা বলল,—দ্যাখ তো, পরিমল আইল নাকি?

আমি আর দিদি হুড়মুড় করে সিঁড়ি দিয়ে নামলাম, মা খিল নামিয়ে দরজা খুলল, দিদি এক ছুটে ঝাঁপিয়ে গিয়ে একটা লোকের কোলে উঠে পড়ল, যার কোলে উঠল সেই আমার বাবা।

মনে হচ্ছে আমার বাবাকে আমি প্রথম দেখছি। প্যান্টের ওপর দিয়ে শার্ট পরা। সম্পূর্ণ মেদহীন পেটানো শরীর। বেশ লম্বা, বিরাট পাকানো গোঁফ। দেখে ইউপি বা বিহারের মানুষ বলেই মনে হচ্ছে।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইলাম। বাবা আমায় নিয়ে কী করে দেখার জন্য। বাবা কি দিদিকে বেশি ভালোবাসে? ভাবতে ভাবতেই বাবা আমার কাছে এসে বলল,—এই তো, আমার ব্যাটা।

দিদিকে কোলে নিয়ে আর আমার হাত ধরে এবার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার পালা।

ছোট কাকা সিঁড়ির নীচ থেকে বলল,—দাদা, তুমি তো পুরো বিহারিই হয়ে গেলে।

বাবা বলে উঠল,—কাইসান হো সব, ঘর উর ঠিক বা? বিহারি সমঝে বানু?

সবাই হো-হো করে হেসে উঠল।

ঠাকুমা বলল,—পরিমল, গোঁফ আজই কাইট্যা ফ্যাল। কী ডাকাইতের মতন গোঁফ রাখসস।

ঠাকুমাকে প্রণাম করে দিদিকে কোল থেকে নামিয়ে বাবা মা'র খোঁজ করে। মা'র নাম রিনা, বাবা ডাকত রানা।

বাবা আবার জোরে ডাকে,—রানা।

মা এসে দরজায় দাঁড়াল। বাবা কোমর থেকে বেল্টসুদ্ধ বন্দুক খুলে মা'র হাতে দিয়ে বলে, আলমারির লকারে তুলে দিতে।

ছোটকাকা বাবাকে জিগ্যেস করে,—বড়দা, তোমার আগে ছয় গুলির রিভলভার ছিল না? আর এটা?

—পিস্তল, টুয়েলভ রাউন্ড। আমার তো প্রমোশন হল, ট্রেনিং-এর পর। এখন ইনস্পেকটর। তাই এই পিস্তল।

বাবা বন্দুক কতরকম হয় বোঝাতে শুরু করল কাকাদের। মা লকারে বন্দুক রাখতে গেছে। দিদি আবার বাবার কোলে উঠে বসেছে। আমি যেন স্বপ্ন দেখছি আমার বাবা ইনস্পেকটর! পুলিশ ইনস্পেকটর!

বাবা যখন প্রথমবার রামপুরহাটে বদলি হয়, তখন একজন ওয়াগন ব্রেকারের উত্থান শুরু হয়েছিল। তার নাম আমি পরে শুনেছিলাম বাবার কাছে। কিন্তু আপাতত গোপন করছি। ধরা যাক নিশার সিং। সেইবার বাবা নিশার সিংকে অ্যারেস্ট করে। কিছুটা ঠান্ডা হয় রেল ইয়ার্ড। তারপর বাবার চন্দনপুর ট্রান্সফার।

লখনৌ ট্রেনিং ইত্যাদির মধ্যে নিশার সিং-এর জামিন হয়ে যায়। ইয়ার্ডে তার দৌরাত্ম্য আবার বাড়তে শুরু করে। নিশার সিংকে কন্ট্রোল করার জন্য বাবাকে আবার রামপুরহাটে পোস্টিং দেওয়া হয়। ঠিক হয়, দিদি ঠাকুমার কাছে থেকে কলকাতার স্কুলেই পড়বে। আমি যাব বাবা—মা'র সঙ্গে রামপুরহাট।

আমার তখন বোধ হয় পাঁচ বছর বয়স। শুরু হল আমার স্বপ্নের সময়। লাল লাল সারি সারি রেল কোয়ার্টার, সবার বাড়ির সামনে ফুলের বাগান, বাড়ির পেছনে উঠোন, উঠোনে আমগাছ। নিমেষে বন্ধু হল পাশের বাড়ির বুরন। বুরনের মা হয়ে গেল আমার মায়ের বেস্ট ফ্রেন্ড।

বাড়ির পেছনে মাঠ, বাঁদিকে মাঠ। এক এক দিন এক একটা মাঠে ফুটবল খেলা হয়। পাশেই একটা ছোট্ট স্কুল ছিল। আদর্শ বিদ্যামন্দির। আমাকে সেখানে ভর্তি করে দেওয়া হল। আরও বন্ধু হল আমার। মা'রও অনেক বন্ধু হল। সাহা কাকিমা, দোলা কাকিমা, সাথী কাকিমা—আরও আরও অনেকে।

খুব আড্ডা হতো মা আর মা'র বন্ধুদের। কখনো সবাই মিলে সিনেমা যেত, কখনো শীতের দুপুরে উঠোনের রোদে বসে সবাই লুডো খেলত। মা খুব আনন্দে ছিল। আমার তখন মাকে দেখতে খুব ভালো লাগত।

মা খুব ভালো ভূতের গল্প বলতে পারত। একবার তো লোডশেডিং-এর এক সন্ধেবেলায় মা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিল বারান্দায়। সবাই ভূতের গল্প বলছিল। মা একটা ভূতের গল্প এমনভাবে বলেছিল যে দোলা কাকিমা প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেছিল। দোলা কাকিমার মুখেচোখে জল দিয়ে আবার সব ঠিক করতে হয়েছিল।

দিদি যখন শীত আর গরমের ছুটিতে রামপুরহাট আসত, তখন আমাদের গল্প বলত। যদি লোডশেডিং হয়, তাহলে মা ভূতের গল্প বলবেই। আমরা বলতাম, না মা, ভূতের গল্প না। কিন্তু মা সেই বলবেই। আমি মায়ের হাতের চুড়ি জোরে চেপে ধরে শুনতাম। দিদি ভয়ে বলত,—শুনব না মা।

মা বলেই যেত, কিছুতেই থামত না। মনে হতো, মাকেও যেন ভর করেছে কিছু!

—আমি কিন্তু ভূত হয়ে যাচ্ছি এবার।

দুজনেই কোনোরকমে বলতাম,—না মা, আর না।

হঠাৎ করে মা ঠিক হয়ে যেত। তারপর দুজনকেই জড়িয়ে ধরে হাসতে হাসতে বলত,—দূর পাগল, গল্প তো। ভূত আবার হয় নাকি? ভূত বলে কিছু নেই।

মা'র এই ভূত-ভূত খেলা আমার একদম ভালো লাগত না।

নিশার সিং-এর দল আরও বড় হয়ে গেছে। শোনা যাচ্ছে যে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন নিয়ে ওয়াগন ভাঙছে, রেলের তার কাটছে, ফিসপ্লেট চুরি করছে।

নিশার সিংকে আবার অ্যারেস্ট করল বাবা। রামপুরহাটে দারুণ কাজ করছে বাবা। সবাই খুব প্রশংসা করে আমার বাবার। চারিদিকে শুনি, —সত্যি, রামপুরহাট একদম ঠান্ডা করে দিল গো চ্যাটার্জিদা এসে।

কিন্তু অ্যারেস্ট করলে কী হবে, নিশার সিং-এর আবার জামিন হল। এবার রামপুরহাট কোর্টে বাবাও ছিল। কোর্টে সবার সামনে বাবাকে থ্রেট করেছিল নিশার সিং। বীরভূমের টানে বলেছিল,—থুতু সাবধানে ফিলবেন চাটার্জিবাবু। বেশি উপরে হয়ে গেলে, নিজের গায়ে পড়ে যাবে।

এর মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেল। নিশারের লোকজন রেলের দুজন সিপাইকে কুপিয়ে হত্যা করে ইয়ার্ডে ফেলে রেখে গেল। নিশার সিংকে আর কন্ট্রোল করা যাচ্ছিল না। বাবা কলকাতায় স্পেশাল মিটিং করে এল।

সেদিন আমাদের বাড়ি থমথমে। মা ফুপিয়ে ফুপিয়ে কেঁদে যাচ্ছে। কাঁদতে কাঁদতে বাবাকে বলেই যাচ্ছে,—তুমি এ কাজ করবে না।

—করতেই হবে রানা। সেন্ট্রাল থেকে অর্ডার এসেছে।

মা কাঁদতে কাঁদতে চেঁচিয়ে ওঠে,—মানুষ মারবে না তুমি। তোমার ছেলেমেয়ের দিব্যি।

—ওটা মানুষ?

—সে যাই হোক, তুমি করবে না।

—কী বোকার মতন কথা বলছ? চাকরি ছেড়ে দেব নাকি?

নিশার সিং-এর সঙ্গে এনকাউন্টার হয়। তবে বাবা গুলি চালায়নি, শুধু ট্র্যাপ সাজিয়ে ছিল। নিশার ফাঁদে পা দেয়। আর সেটাই ছিল নিশারের দৌরাত্ম্যের শেষ মুহূর্ত। বাবা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে মেডেল পায়। রামপুরহাট রেল ইয়ার্ডের ক্রাইম রাতারাতি শান্ত হয়ে যায়।

ও, জরুরি কথা বলা হয়নি। বাবা ইয়া বড় পাকানো গোঁফ অনেকদিন আগেই ছেঁটে ফেলেছে।

মাসে একবার বাবা আমাদের নিয়ে তারাপীঠ যেতই। আমি আর মা বাড়ি থেকে স্টেশনের রিকশা স্ট্যান্ডে পৌঁছতাম। বাবাও চলে আসত রিকশা স্ট্যান্ডে।

রিকশায় বাবা-মা আর কোলে আমি, এই ছিল অ্যারেঞ্জমেন্ট। দিদি এলে অন্য। বাবা-মা একটা রিকশায়, আমি আর দিদি আরেকটায়। আমি আর দিদি দুজনে তারস্বরে গান গাইতে গাইতে যেতাম। বেশিরভাগ সময় দিদি গান গাইত আর আমি মুখে মিউজিক। রেডিয়োতে যা গান শুনতাম, গানের সঙ্গে মিউজিকও মুখস্থ হয়ে যেত। দিদি এলে আমি আমার সেই বিরল প্রতিভা সবার সামনে তুলে ধরার সুযোগ পেতাম। উদাহরণস্বরূপ—

আমি—ট্যাং ট্যাং ট্যারাং ট্যাং টা ট্যাং ট্যাং

দিদি—চুরা লিয়া হ্যায় তুমনে জো দিলকো

আমি—ঠাক ঠাক ধ্যাধক ধ্যাক...এইরকম। কিশোর ভারতী

তেমুজিন থেকে চেঙ্গিস

নির্বেদ রায়

রূপকথার চেয়েও আশ্চর্য ইতিহাস। মানবসভ্যতার ইতিহাস।

খ্রিস্টপূর্ব ২৭ সাল। রোম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হল। তারপর একটানা রোমের দিগ্বিজয় আর দিগ্বিজয়ীদের কাহিনি ইতিহাস জুড়ে।

তার কিছু আগে মঙ্গোলিয়ার মাটিতে গড়ে উঠেছে হুন সাম্রাজ্য, হুন মানে ইয়োরোপ বোঝে অ্যাটিলা। হুন সম্রাট অ্যাটিলা। অ্যাটিলা মানে 'ভগবানের চাবুক', ভয়াবহ আক্রমণ আর নৃশংসতার নাম—অ্যাটিলা। দু-দু বার কনস্টান্টিনোপল আক্রমণ করার জন্য ড্যানিয়ুব নদী পার হয়ে আসেন অ্যাটিলা। কনস্টান্টিনোপল জয় করা তার হয়ে ওঠেনি বটে, কিন্তু পথে কোনো শত্রুর চিহ্ন তিনি রাখেননি। তাঁর তরবারি আর তীরের মুখে,

তুহিন মতো উড়ে গেছে শত্রুর দল। সময়কাল প্রায় কুড়ি বছর—৪৪৪ থেকে ৪২৩ খ্রিস্টাব্দ।

আমরা যখন এই ইতিবৃত্তের কথা শুনছি, ততক্ষণে প্রত্নতাত্ত্বিক আর খননের বিজ্ঞানী মঙ্গোলিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল খুঁজে অনেক খবর সংগ্রহ করেছেন। প্রত্নতাত্ত্বিক খুঁজে দেখছেন মাটির কথা...পুরোনো আমলের মানুষ যে চিহ্ন রেখে গেছে তাদের ব্যবহার করা জিনিসপত্রের মধ্যে তার থেকে পাঠোদ্ধার করেছেন সেই সময়ের জীবনযাত্রার রীতিনীতি, তাদের চলাফেরা, তাদের বিলাস, তাদের আঁকা বিভিন্ন জীবজন্তুর ছবি। কখনো কবরের দেওয়ালে, কখনো আবার লম্বা পাথরের ফলকে আকাশের দিকে উড়ন্ত বল্গা হরিণের ছবি—'ডিয়ার স্টোন'।

এখন প্রশ্ন হল যে এই ডিয়ার স্টোনের বয়স কত? পণ্ডিত বলছেন, অন্তত সাড়ে তিন হাজার বছরের কাছাকাছি—নিদেনপক্ষে খ্রিস্টপূর্ব এক হাজার সাল নাগাদ মাটিতে পোঁতা হয়েছে ওই বল্গা হরিণের ছবি আঁকা পাথর। খুব সম্ভবত কোনো বিশেষ মানুষের কবরের উপর—দলের সর্দার বা পুরোহিতের সমাধির উপর।

দীর্ঘ সময় ধরে মঙ্গোলিয়রা এক বিচিত্র ধর্মে বিশ্বাস করে। না, এ ধর্ম খ্রিস্টধর্ম, ইসলাম, ইহুদিধর্ম বা বৌদ্ধ ধর্ম নয়, মন্ত্র, তন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, ক্রিয়াকৌশলে মেশানো এই ধর্ম। এই ধর্মে কোনো ঈশ্বরের পার্থিব অস্তিত্ব নেই, আছে প্রকৃতি আর মহাকাশ। এই ধর্মকে বলে শামান-ধর্ম, শামানিজম্। অনেক পরে চীনের সম্রাট যখন কুবলাই খান, তখন তেরো শতকের শেষ ভাগ—বৌদ্ধধর্ম প্রভাব বিস্তার করে চীনে। তার আগে গোটা মঙ্গোলিয়া জুড়ে শামান ধর্ম প্রচলিত ছিল।

আটশো বছর বাদে, বারো শতকে তেমুজিন নামে এক শিশু জন্মগ্রহণ করে ছোটো এক দলের সর্দারের ঘরে। বাবার নাম ইয়েসুগেই, মা হোয়েলুন। একদিকে পাহাড়, অন্যদিকে নদী, আধুনিক মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উলানবাতরের গা ঘেঁষে। জন্মমুহূর্তে কেউ তার মুখে মধু দিয়েছিলেন কিনা জানা নেই, কিন্তু লোকজন খেয়াল করেছিল যে নবজাতকের মুঠোয় ধরা আছে একটি রক্তের ডেলা। গুণিনেরা দেখে বললেন,—এই শিশু বড় হয়ে বড় দলের বড় সর্দার হবে।

কারো মতে ১১৬২ সালের চতুর্থ চান্দ্রমাসের ষষ্ঠদশ বা ষোলোতম দিনে তেমুজিনের জন্ম, আবার প্রায় সমসাময়িক ইহুদি গণনাকারী পারস্যের লোক রসিদ অল-দিন বলছেন ১১৫৫ সালে, স্থানীয় ক্যালেন্ডার মতে বরাহমাসে, 'দি ইয়ার অব দি পিগ।' কিন্তু জন্মের বছর নিয়ে ভিন্ন মত থাকলেও তেমুজিনের মৃত্যু নিয়ে কোনো অন্য মত কেউ পোষণ করেন না—১২২৭, সেটাও বরাহমাস।

মোঙ্গোল শব্দটা ১২০৬ সাল পর্যন্ত উপজাতিদের বোঝাতে ব্যবহার করা হতো, তেমুজিন এই শব্দটিকে জাতি পর্যায়ে উন্নীত করেন।

মোঙ্গোলদের সমাজ বেড়ে উঠেছে তিনটে পর্যায়ে। একটি হল শিকারী জীবন, তাদের বন্য শিকারীর জীবন, যখন সে একজন বুদ্ধিমান ভালো শিকারী হয়ে উঠেছে—মোঙ্গোল সমাজে সে তখন 'মারগান'। বনের জীবন কাটিয়ে যখন সে ফিরছে, তখন সে বীরপুরুষ, মোঙ্গোল ভাষায় 'আতুর'। আট শতকের ধারে কাছে এসে আরও দুটো উপাধি জন্ম নিল—একটা হল 'নোয়ান' আর অন্যটা 'খান'।

এই সবকিছু লিখিত আছে মোঙ্গোল ইতিহাসের সবথেকে উল্লেখযোগ্য 'মোঙ্গোলদের গোপন ইতিহাস' পুঁথিতে।

এই 'গোপন ইতিহাস' লেখা হয়েছে ১২২৮ থেকে ১৩২৩ সালের মধ্যে কোনো এক সময়ে। খুবই বিতর্কিত কিন্তু অনবদ্য লেখা। কে বইটি লিখেছেন, তা জানা নেই। কখন লেখা হয়েছে বা কোথায় লেখা হয়েছে তাও অজানা। কিন্তু অনুবাদ হয়েছে নয় নয় করে পৃথিবীর অন্তত আটটা ভাষায়। তেমুজিনের জীবনকাহিনি।

পৃথিবীর একটানা ভূ-ভাগ জুড়ে সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যের যিনি নায়ক, সেই চেঙ্গিস খানের জীবনীও বটে। কারণ শিশু তেমুজিন, কুকুর দেখে ও ভয় পেয়ে পালিয়ে যেত সেই তেমুজিন, ধীরে ধীরে চৌত্রিশ বছর ধরে সমস্ত মঙ্গোলিয়াকে সেই তেমুজিনই সংগঠিত করে, একের পর এক যুদ্ধ জিতে সমগ্র মঙ্গোলিয়ার অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

১২০৬ সালে পুরোহিত কোকোচু তাঁকে সম্বোধন করেন চেঙ্গিস খান বলে। পৃথিবীর ইতিহাস থেকে হারিয়ে যেতে শুরু করে 'কামার' বা 'লোহার কলা' তেমুজিন, আর জন্ম নেয় 'দিগ্বিজয়ী' চেঙ্গিস। তেমুজিনের জীবন পরিবর্তিত হয় বিশ্বত্রাস চেঙ্গিস খানের জীবনীতে। শামান ধর্মে বিশ্বাসী এক ভয়ানক যোদ্ধা। যিনি নিজে তাঁকে অভিহিত করেছেন 'ভগবানের চাবুক' বা 'স্কাউজ অব গড' বলে। কারণ পাপের জন্য তারাকাশ ঈশ্বর শত্রুদের শাস্তির ব্যবস্থা করতেই চেঙ্গিসকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন—এটা ছিল তাঁর নিজের বিশ্বাস।

চেঙ্গিসের সাম্রাজ্য কম নয়। ইউরোপ আর এশিয়া জুড়ে এতদূর বিস্তৃত যে দ্রুতগামী ঘোড়ার পিঠে তার একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে পৌঁছতে লাগত এক বছর। সম্পূর্ণ নিরক্ষর চেঙ্গিস পৃথিবীর বুকে প্রথম ডাক-ব্যবস্থা চালু করেন। এই ডাক-ব্যবস্থা অশিক্ষিত, বর্বর জাতির রাজার পক্ষে এককথায় মেনে নেওয়া যায় না।

পাশ্চাত্যের ইতিহাস বহুদিন পর্যন্ত চেঙ্গিস খান বলতে নরঘাতক দানবকে বোঝাত। তার সঙ্গে একমত পোষণ করেছে ইসলামের ইতিহাস। কারণ, খ্রিস্টান ও ইসলাম সাম্রাজ্যের উপর চেঙ্গিসের প্রশ্নাতীত জয়। কিন্তু আলেকজান্ডার, নেপোলিয়ন, জুলিয়াস সিজার, রোম সাম্রাজ্যের দিকে প্রয়োজনীয় আঙুল তোলা হয়েছে কি? হয়নি। তার সমালোচনা না করলেও, উল্টোদিকে চেঙ্গিসের সৈন্য পরিচালনার পদ্ধতি, তাঁর প্রচলিত ডাক ব্যবস্থা, শিক্ষার প্রচলন, গণতান্ত্রিকভাবে গড়ে তোলা তাঁর শাসনব্যবস্থা ও সচিবের দল, আইন ও তার নিয়ম 'গ্রেট ইয়েসা' বলে তার প্রচলন ছিল। উদার ধর্মীয় নীতি, অসামরিক কাজকর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধাকেই তিনি গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন, কোন অঞ্চলের বা কোন ধর্মের তথা জাতের মানুষ, সে নিয়ে কখনো মাথা ঘামাননি। আর চালু করেছেন দেশ থেকে দেশান্তরে যাবার কাগজ বা পাসপোর্ট, যার জন্য কূটনীতি বা বাণিজ্য এই দুটো ক্ষেত্রেই যাতায়াত হয়েছে অনেক সাবলীল ও উন্নত মানের।

ইয়ার্ট হল তাঁবু। তবে মঙ্গোলিয় তাঁবু। প্রয়োজন মতো সঙ্গে নিয়ে ঘোরাঘুরি করা যায়। যদিও শব্দটা এসেছে তুর্কিদের কাছ থেকে। মঙ্গোলিয় শব্দ হল 'গের', কিন্তু মোঙ্গোলরা ওই ইয়ার্ট শব্দটা পছন্দ করে। ইয়ার্টের বাইরে ঘুরে বেড়ায় তাদের গরু-ভেড়ার দল। সারা মোঙ্গোলিয়া জুড়ে যে দিগন্তজোড়া গোচারণভূমি সেখানেই তাদের বিচরণস্থল। তাদের পাহারা দেয়, দেখভাল করে ঘোড়ায় চড়া মোঙ্গোল মানুষরা। বিস্তীর্ণ তৃণভূমি থেকে সংগ্রহ করে খাদ্য, ওই ঘাস খেয়ে, তৃণ আর গুল্ম থেকে খাবার জোগাড় করে তাদের গরু, ভেড়া আর ঘোড়া। আর আছে উট।

মোঙ্গোলরা যাযাবর মানুষ, তাদের ইয়ার্ট বা বাসগৃহও তাদের মতোই যাযাবার—ইয়ার্ট তাঁবু তৈরি হয় ধর্মীয় বা প্রতীকধর্মী অলঙ্করণের মধ্যে দিয়ে। বড় তাঁবু, গোল চামড়া দিয়ে ঘেরা 'পাঁচিল', 'পাঁচিলের সেই চেহারা দাঁড়িয়ে থাকে যে শক্ত গঠনের উপর সেটা তৈরি হয় কাঠ অথবা বাঁশ দিয়ে আর ইয়ার্টের মাথায় থাকে একটা গোল কাঠের চাকতি। এই বাসস্থান প্রয়োজনমতো খুলে নিয়ে অন্যত্র নিয়ে আবার স্থাপন করে তারা।

আগেই আমরা জেনেছি যে মঙ্গোলিয়ার বিভিন্ন অংশের মানুষ এক হয়ে প্রথমে মহাসম্মেলনে মিলিত হয়েছিল। তারা তাদের নেতা হিসাবে তেমুজিনকেই বেছে নেয়, আর গুণিন শ্রেষ্ঠ কোকোচু তার নামকরণ করে চেঙ্গিস। খান শব্দ যুক্ত হয় রাজা বা সম্রাট অর্থে। মঙ্গোলিয়ার জীবন কাটিয়ে বিশ্বজয়ের পথে এগোন চেঙ্গিস।

এবার তেমুজিন থেকে চেঙ্গিস হয়ে ওঠার সময়টুকু নিয়ে আলোচনা করা দরকার।

১১৮৪ থেকে ১২০৬, চীনদেশের উত্তরে যে বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে আমরা মধ্য-এশিয়া বলে জানি, সেটা অনেকগুলো ভাগে বিভক্ত ছোট ছোট রাজ্য ছিল। জনসংখ্যার দিক থেকে ছোট হলেও সীমা নেহাত কম নয়—নইমান, মারকিট, তাতার বা মোঙ্গোলদের উপদল। উপজাতিরা তৈরি করেছিল এই সমস্ত ছোটখাটো রাজ্যগুলো। যুদ্ধবিগ্রহ সারাক্ষণ লেগে থাকত তাদের মধ্যে।

এর মধ্যেই তেমুজিন বিয়ে করেছেন 'বোর্তে'-কে। মাত্র নয় বছর বয়সে পাকা দেখা, আর তিন বছর পরে কন্যাদান। তেমুজিনের বয়স তখন বারো।

তেমুজিনের বাবা আতারদের সঙ্গে যুদ্ধে গিয়ে গুপ্তহত্যার শিকার হন। তার খাবারের মধ্যে বিষ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

এরপর তেমুজিন এক অভিশপ্ত জীবন যাপন করেন। প্রবল দারিদ্র্য—বুনো ফল, এমনকী ইঁদুর শিকার করে তাই খেয়ে জীবন চালাতে হয়েছে তাঁকে। তারই মধ্যে বড় ভাই বেগটার-এর সঙ্গে যুদ্ধ, তাকে মারার পর তেমুজিন আক্রান্ত হলেন একসময় যারা তাঁর বাবার সঙ্গী ছিলেন তাদের দ্বারা। শুধু আক্রান্ত নয়, তাদের হাতে বন্দিও হলেন তেমুজিন। দাসত্বের জীবন! একদিন সমস্ত প্রহরার চোখ এড়িয়ে পালিয়ে যান তিনি। অবশ্যই এক প্রহরী তাঁকে সাহায্য করেছিল পালাতে, যার কথা জীবনে কখনো ভোলেননি। উপযুক্ত পুরস্কার দিয়েছিলেন প্রহরীর বংশধরদের।

মা হওলুন-এর বুদ্ধি আর নিয়ম মেনে তেমুজিন শুরু করেন নতুন জীবন। ক্ষমতায় আসার জন্য বন্ধুত্ব করতে হবে সমস্ত মোঙ্গোলিয়া জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দলগুলোর মধ্যে—অন্তত বেশিরভাগ দলের মধ্যে তো বটেই। তাহলেই অন্যদলের সঙ্গে যুদ্ধে জিতে দখল করা যাবে তাদের অঞ্চলগুলো। তার জন্য জানতে হবে যুদ্ধের কৌশল, সম্পর্ক তৈরি করতে হবে পারস্পরিক আত্মীয়তার মধ্যে দিয়ে। বিয়ে করে সন্তান লালন-পালন করা এই সম্পর্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অর্থাৎ যার আগামী দিনে শত্রু হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে, তার সন্তানকে বিয়ের মধ্যে দিয়ে নিজের পরিবারের সদস্য করে নাও। ফলে যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকে না, আর তার সঙ্গে নিজের দলের সঙ্গে অন্য দলটির সখ্যতা তৈরি হয়, যুদ্ধে সৈন্যসংখ্যা বাড়ে।

কিন্তু বোর্তে অপহৃত হলেন। অপহরণ করল মারকিট গোষ্ঠি।

স্ত্রী-কে উদ্ধার করতে তেমুজিন হাত মেলালেন তার ছোটবেলার বন্ধু জামুখার সঙ্গে।

কিন্তু এই বন্ধুত্ব টিকল না। জামুখা মঙ্গোলিয় খানদানে বিশ্বাস করে, তেমুজিনের আস্থা শ্রেষ্ঠ বীরদের উপর। মারকিটদের পরাস্ত করে বোর্তে-কে ফিরিয়ে আনার পর তেমুজিনের লক্ষ্য এবার রাজ্যবিস্তার!

আর একটা বড় বাধা এল! তিরিশ হাজার সৈন্য নিয়ে জামুখা আক্রমণ করে বসল তেমুজিনকে। কারণ ১১৮৬-তে তেমুজিন উপাধি পেয়ে গেছেন 'খান'। এই উন্নতি জামুখাকে ঈর্ষান্বিত করেছে। ১১৮৭ সালে তিরিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আক্রমণ। জামুখা জিতল। দালান বালজুতের যুদ্ধ।

তারপর দশ বছর তেমুজিনের জীবন সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা যায় না। 'সিক্রেট হিস্টরি অব দি মোঙ্গোলস' এই সময় ধরে নীরব।

মোঙ্গোলদের ইতিহাস ভেসে উঠল আবার ১১৯৭ সালে। যখন জিন-রা ঝাঁপিয়ে পড়ল তাতার-দের উপর। দুই দলই ভালো যুদ্ধ করে, জিন সাহায্য নিল মোঙ্গোল আর কারাইটদের।

১২০০ সালে মোঙ্গোলরা চার দিকে শত্রুবেষ্টিত। এই মোঙ্গোল অর্থে পৃথিবীজোড়া সাম্রাজ্যের মালিক যে মোঙ্গোল তারা নয়, এরা উপজাতির থেকে কিছুটা সংগঠিত মোঙ্গোলদের প্রাচীন রূপ বা জনজাতি। উত্তরে মারকিট, দক্ষিণে টানগুট, পশ্চিমে নাইমান আর পূর্বদিকে জিন ঘিরে রেখেছে মোঙ্গোলদের।

তেমুজিন এই অবস্থায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিলেন। মোঙ্গোল আর তুর্কীদের 'ইয়াসা' বা নিয়মতন্ত্র আর শৃঙ্খলা মেনে তেমুজিন বংশপরম্পরায় ক্ষমতার বিস্তার বন্ধ করলেন, চালু করলেন যুদ্ধে যারা বীরত্ব দেখিয়েছে তাদের গুরুত্ব আর ক্ষমতা দেওয়ার রীতি। আর একটা নিয়মও চালু করলেন যেটা খুবই উল্লেখযোগ্য। শত্রুসেনাদের পরাস্ত করে অথবা সাধারণ মানুষদের জয় করে তিনি তাদের তাড়িয়ে না দিয়ে সুরক্ষা দিতেন। পরাজয়ের পর এই ব্যবহার পরাজিত মানুষ আর সেনাদের তেমুজিন সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা আর আনুগত্য তৈরি করে। প্রতিটি যুদ্ধজয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই আনুগত্য বাড়তে থাকে, বাড়তে থাকে সৈন্যসংখ্যা আর বাড়তে থাকে রাজ্যের লোকসংখ্যা।

এ সব ঘটনা ঘটছে তেমুজিনের আমলে, তখনও চেঙ্গিস জন্ম নেয়নি। অর্থাৎ এই লড়াই মূলত মঙ্গোলিয়ার মধ্যেই চলছে। চেঙ্গিসের দিগ্বিজয় তখনও শুরু হয়নি। প্রস্তুতিপর্ব শুরু হচ্ছে বললে বোধহয় ভুল হচ্ছে না।

তোঘরুল আর তার ছেলে সেনেগ্রাম, দুজনেই কোনো না কোনো ভাবে চেঙ্গিসের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন, কিন্তু চেঙ্গিসের সেনানায়ক সুবুতাই, মারকিট আর নাইমানদের পরাস্ত করে গোটা মঙ্গোলিয়ার অধিকার এনে দিল তেমুজিনের কাছে।

'গোপন ইতিহাস' বলছে চেঙ্গিস তাঁর বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করেন জামুখা-র প্রতি, জামুখার শত্রুদেরও তিনি হত্যা করেন। কিন্তু জামুখা চেঙ্গিসের এই বন্ধুত্বের আহ্বানে সাড়া দেননি। তিনি চেয়েছিলেন মৃত্যু, বীরের মৃত্যু। মোঙ্গোল রীতিতে এই মৃত্যু বড় অদ্ভুত, রক্তপাত হীন। সেই

মৌ রায়চৌধুরী

স্বাধীনতা

স্বাধীনতা মানে, এক আকাশ মুক্তি
মাঝসমুদ্রে ভেসে ভেসে যাওয়া,
স্বাধীনতা মানে গুমোট কষ্ট শেষে
একঝলক বৃষ্টি ধোওয়া হাওয়া।

স্বাধীন হয়েছে কবেই তো এ দেশ
বুঝছি কি স্বাধীনতার মানে?
দেশকে ভালোবেসে শহিদ হওয়া
সেই তো স্বাধীনতা, কজন তা জানে!

আমার কাছে স্বাধীনতা বেপরোয়া
হুল্লোড়, নাচ-গান-খেলা,
আজও চির উজ্জ্বল ক্ষুদিরাম
ফাঁসিকাঠে, যায় না তাকে ভোলা।

শহিদ হল কত শত জন
চলে গেল সহস্র তাজা প্রাণ,
এটাই যদি হয় স্বাধীনতার মানে
তবে বৃথা তাদের বলিদান!

স্বাধীনতায় কেঁদে কেঁদে ফেরে
শত স্বজনহারা,
...রর স্বাধীনতা আজ
...য় উৎসব ছাড়া।
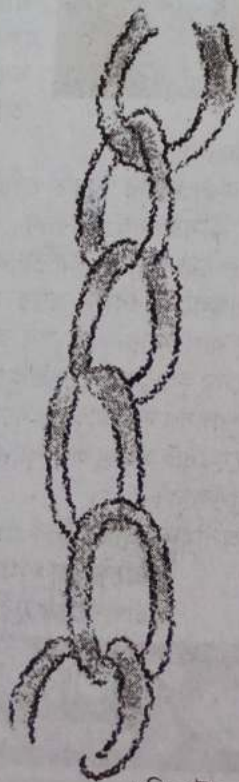
ছবিঃ সৌজন্য চক্রবর্তী

পদ্ধতিতেই তাঁর মৃত্যু হয়, পিঠ ভেঙে দিয়ে।

১২০৬ সালে তেমুজিন মোঙ্গোল জনজাতির প্রধান সম্রাট হিসাবে 'ভুবনবিদিত শাসক' বা বিশ্বজনীন শাসনকর্তা চেঙ্গিস খান নামে অবহিত হন। পরের অংশ বিশ্বজয়ী চেঙ্গিসের।

খোয়ারাজমিয় সাম্রাজ্য! তুর্কি আর পারসিকদের রাজত্ব, সুন্নী মুসলমানদের শাসন এখানে চলে। রেশম সরনির পথে পণ্য নিয়ে যেতে হলে এপথে যেতে হয়। পূর্ব এশিয়া থেকে পশ্চিমের ইউরোপ।

চেঙ্গিস প্রথমে সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে তাদের কাছে লোকে পাঠালেন। সঙ্গে পাঁচশো লোকের কনভয়, সোনা-রুপো-মহার্ঘ জিনিস কী নেই তাতে। সেই বহর পাহারা দেওয়ার জন্য প্রথামতো লোকজন দেওয়া হল সঙ্গে। ওত্রার শহরের প্রশাসক ইনালচুক লুঠ করে নিলেন সমস্ত ক্যারাভান। অভিযোগ, ক্যারাভান বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল মশলার সম্ভার। সেই মালপত্রের একপয়সা ক্ষতিপূরণও দিতে রাজি হল না ইনালচুক। উপরন্তু তিনজন দূতের দুজনের গোঁফ দাড়ি কেটে ফেরত পাঠানো হল, আর মুসলমান দূতটিকে হত্যা করে তার কাটা মুণ্ডু পাঠানো হল চেঙ্গিসের কাছে। শুধু লুঠ নয়, গোটা রাজত্বের চূড়ান্ত অপমান।

চেঙ্গিস তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিলেন। এক লক্ষ দুর্ধর্ষ সেনা আর সবচেয়ে উন্নত যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে চেঙ্গিস এগোলেন খোয়ারাজমিয়র দিকে।

খোয়ারাজমিয় তখন সবচেয়ে বড় মুসলমান সাম্রাজ্য! আফগানিস্তান আর ইরান নিয়ে তার বিস্তার।

এই সংঘর্ষের আগে চীনের জিয়া সাম্রাজ্য আর শক্তিশালী জিন সাম্রাজ্য দখল করে খোয়ারাজমিয় সীমান্তের ধারে কাছে পৌঁছে গেছে মোঙ্গোল সেনা।

১২২৯ সালে খোয়ারাসেম শাহ-এর সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়। মোঙ্গোলদের হাতে আসতে শুরু করে খোয়ারাসেম শাহের বিখ্যাত শহরগুলো—সমরখন্দ, বুখারা, উরগেঞ্চ আর মার্ভ।

এই সময়ে জন্ম নিয়েছে অনেক বীরগাথা।

খোয়ারাসেম শাহের ছেলে জালালুদ্দিন। চেঙ্গিস তাকে তাড়া করতে করতে নিয়ে এসেছেন সিন্ধুনদের তীরে। পালাবার পথ নেই। জালালুদ্দিন উঁচু টিলার উপর থেকে ঘোড়া নিয়ে ঝাঁপ দিলেন নদীতে...তারপর নদী পার হয়ে পৌঁছে গেলেন হিন্দুস্তানে। চেঙ্গিস এই সাহসী মানুষটিকে মনে মনে প্রশংসা করেছিলেন, তাঁকে তাড়া করে ধরার আর চেষ্টা করেননি। সেখান থেকে চেঙ্গিস ফিরলেন, মঙ্গোলিয়ার পথে। আজ পর্যন্ত ঐতিহাসিকরা খুঁজে চলেছেন প্রকৃত কারণ—পৃথিবীর সবথেকে সম্পদশালী দেশ দখল করতে কেন এলেন না চেঙ্গিস? ভারতের সিংহাসনে তখন ইলতুৎমিস। চেঙ্গিসের সুবর্ণ বাহিনীর আক্রমণের মুখে ইলতুৎমিসের প্রতিরোধ উড়ে যেত।

দুটি দলে বিভক্ত হয়ে আফগানিস্তান ধরে মঙ্গোলিয়ার দিকে এগোলেন চেঙ্গিস স্বয়ং, আর সেনাপতি জেবে আর সাবুতাই-এর নেতৃত্বে অন্য দল গেল ককেশাস হয়ে রাশিয়ার দিকে। তখন ১২২০ সাল।

আরও কয়েকটি যুদ্ধ জিতে ১২২৭ সালের আগস্ট মাসে প্রয়াত হন চেঙ্গিস। ততদিনে তিনি পশ্চিম জিয়ার রাজধানী ইনচুয়েন-এর দখল নিয়েছেন।

মার্কো পোলোর মতে তিরবিদ্ধ হয়ে বিষক্রিয়ায় তাঁর মৃত্যু হয়। ইতিহাসের আলোচনা করতে গিয়ে জওহরলাল নেহরু চেঙ্গিসের জীবনকাহিনি ও বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে বলেন, 'চেঙ্গিস, সন্দেহাতীভাবে ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সেনাধ্যক্ষ আর নেতা, এমনকী আলেকজান্ডার বা সিজারকে তাঁর তুলনায় নেহাতই নগণ্য বোধ হয়।'

চেঙ্গিসকে সমাধিস্থ করা হয় এক অজানা জায়গায়, তার সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ লুপ্ত করে দেওয়া হয় ওই ১২২৭ সালের আগস্ট মাসে। এটা ছিল তাঁর শেষ ইচ্ছা। কিশোর ভারতী

সমরেশ মজুমদার

ট্রেন চলে গেলে
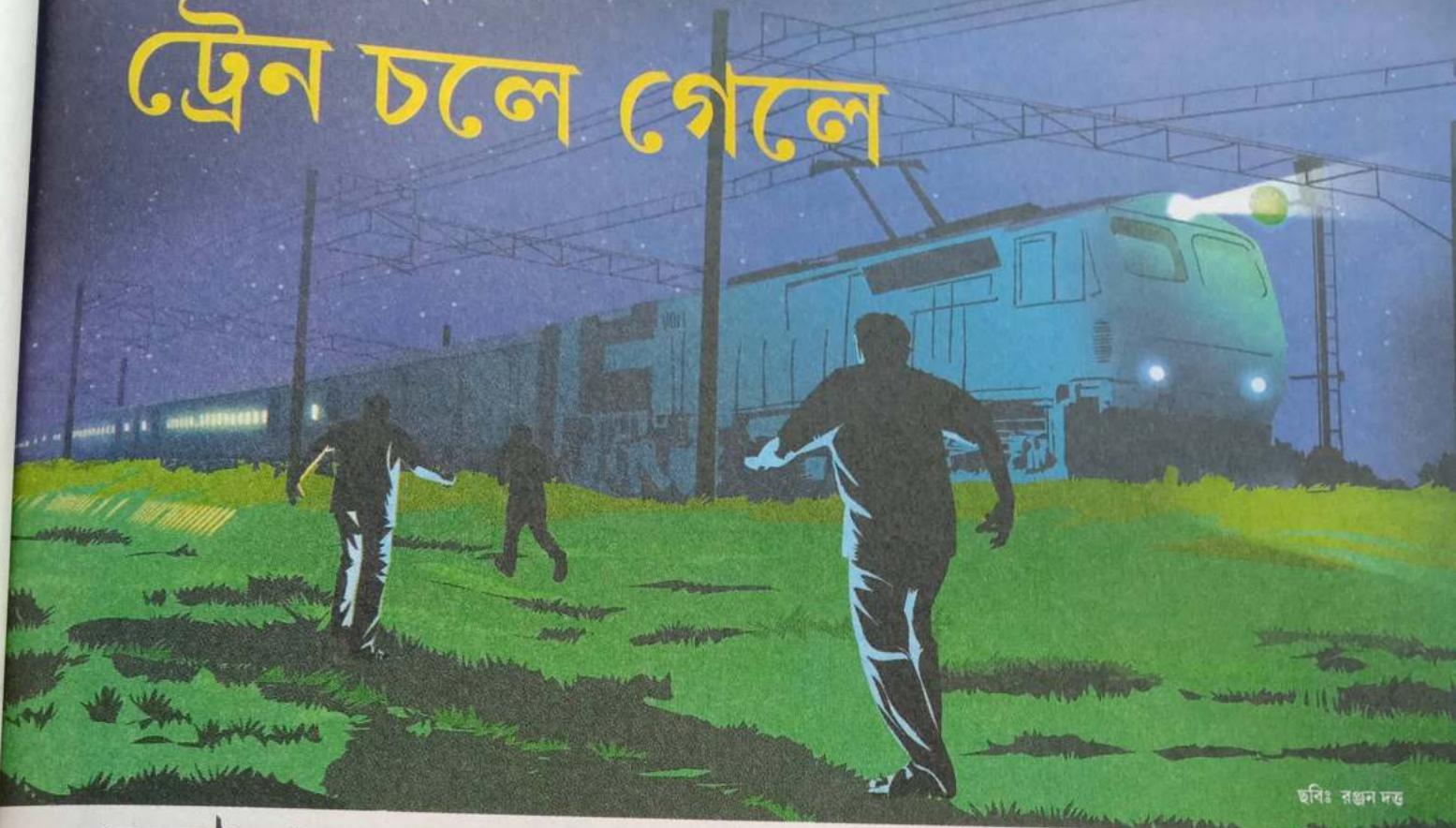
ছবিঃ রঞ্জন দত্ত

রোজ ঠিক রাত পৌনে চারটের সময় ঘুম ভেঙে যায় সলিলের। সে যে বাড়িতে থাকে তার পঞ্চাশ গজ দূরে ট্রেন লাইন। দিনরাত ওই লাইন দিয়ে ট্রেন যাচ্ছে। কিন্তু তাদের ড্রাইভাররা এই বাড়ির কাছাকাছি এসে এত জোরে হুইসল বাজায় না, তাদের চাকার শব্দ কানে আসে, ইঞ্জিন নিঃশব্দে চলে যায়। কিন্তু এই রাত পৌনে চারটের ট্রেন থেকে তীব্র শব্দ উগরে দেয় ইঞ্জিন। ট্রেনটা মরা সাপের মতো পড়ে থাকে এক মিনিট। তারপর নিঃশব্দে চলে যায় দুই মাইল দূরের স্টেশনের দিকে।

ঘুম তার একার ভাঙে না। প্রতিবেশীদের কথা সে জানে না, কিন্তু সলিল পাখিদের চিৎকার শুনতে পায়। সূর্য ওঠার আগে তাদের ঘুম ভাঙানোর প্রতিবাদ করে যায় অনেকক্ষণ। তারপর আলো দেখার অপেক্ষায় বসে থাকে গাছে গাছে।

দিন পনেরো হল এই অবস্থা চলছে। ঠিক রাত পৌনে চারটের সময় ট্রেনটা আসতে আসতে দাঁড়িয়ে গিয়ে ঘুম ভাঙানো শব্দ করে। কেন করে ভেবে পায় না সলিল।

আজও সলিলের কানে ইঞ্জিনের তীব্র হুইসেলের আওয়াজ ঢোকামাত্র উঠে বসল সলিল। শব্দটা এত ধারালো যে শুয়ে থাকা যায় না। ইঞ্জিন থেকে ওই শব্দ বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেন দাঁড়িয়ে যায়। সলিল দ্রুত জানলায় চলে এল। এই জানলায় দাঁড়ালে রেললাইন স্পষ্ট দেখা যায়। এখন সেই লাইনের ওপর একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। ইঞ্জিনের পেছনে যে কামরাগুলো দাঁড়িয়ে আছে তাদের সংখ্যা গুনল সে। নয়টা। নয়টা মালগাড়ি টেনে নিয়ে যে ইঞ্জিন যাচ্ছিল, সেটা এখন স্থির হয়ে রয়েছে। এখানে কোনো স্টেশন নেই, লোকজনও নেই অথচ ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে দিব্যি।

একমিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর ট্রেনটা নিঃশব্দে চলতে শুরু করলে সলিল লক্ষ করল ইঞ্জিনের পরের কামরাগুলোর দরজা নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। আস্ত ট্রেন চলে গেল চোখের আড়ালে।

এখন পৃথিবীটা শব্দহীন, জানলায় দাঁড়িয়ে থাকারও কোনো কারণ নেই। সলিল বিছানায় ফিরে এল। কিন্তু তার ঘুম আসছিল না। ভোরের আলো ফোটা পর্যন্ত এপাশ-ওপাশ করল। কেন ট্রেনটা রোজ এখানে এসে এক মিনিট দাঁড়ায়, তা তার মাথায় ঢুকছিল না।

এই পাড়ায় সলিল এসেছে মাস দেড়েক আগে। এক সহকর্মী তাকে ওই ঘরটিকে ভাড়ায় পেতে সাহায্য করেছিল। সে সকালে পাড়ার দোকানে চা টোস্ট খায়, স্নান করে অফিসে গিয়ে দুপুরের ভাত খেয়ে নেয়। রাতের খাবার সে দোকান থেকে কিনে নিয়ে আসে। নিজে রান্না করার ঝামেলা সে এড়াতে চায়।

আজ সকালে ঘরে তালা দিয়ে যখন সে চায়ের দোকানে এল, তখন দোকানি সবে চা বানাতে শুরু করেছে। লোকটার সঙ্গে এই কদিনে ভালোই পরিচয় হয়েছে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'রোজ শেষ রাতে এখানে কেন ট্রেন দাঁড়ায় বলুন তো? ঘুমোনো যায় না।'

'কানে তুলে গুঁজে ঘুমোবেন।' দোকানি নির্লিপ্ত মুখে বলল।

'কিন্তু আমার মনে হয় পেছনে কোনও রহস্য আছে।' সলিল বলল।

'আমি বলি কী, নাক বেশি লম্বা না করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।' দোকানি নির্লিপ্ত কথাগুলো বলতেই দুজন লোক দোকানে ঢুকে উল্টোদিকের টেবিলে বসে বলল, 'দুটো চা, সঙ্গে টোস্ট তাড়াতাড়ি।'

দোকানি তার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সলিল দেখল লোকদুটো নীচু গলায় কথা বলছে। ভঙ্গিটা স্বাভাবিক নয়। একটু পরেই দোকানি দু'কাপ চা আর এক প্লেট টোস্ট ওদের সামনে রেখে চলে গেলে একটা লোক

পাশ থেকে চামড়ার ব্যাগ টেবিলের ওপরে তুলে জিজ্ঞাসা করল, 'এখন খুলি?'

দ্বিতীয় লোকটি কথা না বলে মাথা নেড়ে অনুমতি দিলে প্রথমজন ব্যাগের মুখ খুলে একটা বড় খাম বের করে এদিক ওদিক দেখল।

প্রথমজন বলল, 'বাইরে বের করার দরকার নেই। ব্যাগের ভেতরেই ঠিকঠাক গুনে অর্ধেকটা আমাকে দিয়ে দে।'

সলিল দেখল লোকটি দক্ষতার সঙ্গে হাত ব্যাগের ভেতরে ঢুকিয়ে গম্ভীরমুখে কাজটা করে যাচ্ছে। তারপর বলল, 'গুনেছি।'

'ব্যাগের ভেতরেই অর্ধেকটা কাগজে মুড়ে বাইরে বের করে আমাকে দে। দেখে যেন মনে হয় বিস্কুট দিচ্ছিস।' প্রথমজন বলল।

সলিল দেখল লোকটির একটি হাত ব্যাগের মধ্যে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তারপর একটা কাগজে মোড়া প্যাকেট বের করে টেবিলের ওপর রাখতেই প্রথমজন সেটা তুলে পকেটে ঢুকিয়ে নিল।

'ঠিকঠাক গুনেছিস তো?'

'গুনেছি। তবে না দেখে গোনা তো, বাড়ি গিয়ে গুনে যদি দেখি কম দিয়েছি তাহলে বাকিটা দিয়ে দেব।'

'গুড। চা খেয়ে নে। খেয়ে এখান থেকে বাঁ-দিকের রাস্তায় গিয়ে বাম ধরে চলে যাবি। বিকেলে আমার সঙ্গে আড্ডায় দেখা করবি।'

'ঠিক আছে।'

সলিল বুঝতে পারছিল লোকদুটো স্বাভাবিক নয়। অন্যায়ভাবে কাজ করে যে টাকা পেয়েছে তা ব্যাগের বাইরে বের করে গুনতে সাহস পায়নি। কিন্তু এই সাতসকালে ওরা কি অন্যায় কাজ করেছে? এই অর্থপ্রাপ্তির সঙ্গে শেষ রাতে ট্রেনটির দাঁড়িয়ে যাওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই তো?'

সে চা শেষ করে দেখল দুজনের একজন চুমুক দিয়ে চা খেয়ে ব্যাগ নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে চলে গেল। প্রথমজন খুব অলসভাবে একটা সিগারেট ধরালে, দোকানি বলল, 'ও দাদাভাই।'

লোকটা মুখ ফেরাল, 'কী ব্যাপার।'

'দোকানে সিগারেট খাবেন না। নোটিস বোর্ডে লেখা আছে।'

'অ।' লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে কত হয়েছে জিজ্ঞাসা করে দাম মিটিয়ে দোকান থেকে ধীরে-সুস্থে বেরিয়ে গেল।

দোকানি চাপা গলায় বলল, 'দোকানটাকে যেন নিজেদের আস্তানা ভেবে নিয়েছে।'

কথাগুলো কানে যেতেই সলিল জিজ্ঞাসা করল, 'কারা এরা?'

'এরা কে জেনে আপনার কী লাভ! চা খেয়ে দাম মিটিয়ে বাড়ি চলে যান। জেনে আপনার কী লাভ হবে?' দোকানি খিচিয়ে উঠল।

'না, মানে, মনে হল ব্যাগের ভেতরে হাত গলিয়ে টাকা গুনল। ওইভাবে টাকা গুনতে এর আগে আমি কাউকে দেখিনি তো!' সলিল নীচু গলায় বলল।

এই সময় আর একজন খদ্দের ভেতরে ঢুকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'পেপার আসেনি?'

দোকানি বলল, 'আজ থেকে হিন্দি কাগজ দিয়ে যাবে!'

'সেকী! লোকটি চেঁচিয়ে উঠল, 'এ তো অন্যায় কথা। বাংলা কাগজ পড়ে আমি অভ্যস্ত, হিন্দি পড়তে তো জানি না।'

'যেখানে বাংলা কাগজ পড়তে পাওয়া যাবে সেখানে যান। খদ্দেররা দোকানে এসে হিন্দি কাগজ পড়তে চায়। বেশি যার চাহিদা তাকেই তো রাখা হবে।' দোকানি মুখ ঘুরিয়ে কাজ আরম্ভ করল।

'যাচ্চলে! তাহলে আর চা খেয়ে কী হবে।' লোকটি বেরিয়ে গেল।

সলিলের ইচ্ছে হচ্ছিল আর এক কাপ চা খেতে। কিন্তু মাথা নেড়ে দাম মিটিয়ে সে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল, সেই লোকটি দাঁড়িয়ে এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছে।

'চললেন?' লোকটি জিজ্ঞাসা করল।

কী জবাব দেবে বুঝতে না পেরে মাথা নাড়াল সলিল।

লোকটি বলল, 'দেখলেন তো। দশ বছরের অভ্যেস। রোজ ভোরে ওর দোকানে এসে হাফ কাপ চা খাই আর কাগজ পড়ি। আজ সেই কাগজটাও বন্ধ করে দিল? কেন দিল জানেন? এখন তো অবাঙালি খদ্দের বেড়ে গেছে। আগে দুপুরে-বিকেলে ওরা দোকানে আসত, এখন তো সকালেই এসে আর উঠতে চায় না। আমি এখন কী করি বলুন তো! এ পাড়ায় তো আর কোনও চায়ের দোকান নেই যে বসে শান্তিতে পেপার পড়ব। আপনি পেপার পড়েন না?'

'অফিসে গিয়ে পড়ি।'

'অ। এই পাড়ায় থাকেন তো?'

'হ্যাঁ।'

'সাবধানে থাকবেন। মাসখানেক হল, পাড়ার উটকো লোকের আসা-যাওয়া খুব বেড়ে গেছে! নীচু স্বরে বলল লোকটি।

'কী করে তারা?'

'মনে হয় অসামাজিক কাজ। কথা নেই বার্তা নেই রোজ শেষ রাতে মালগাড়ির ট্রেন দাঁড়িয়ে যাচ্ছে এই পাড়ার পাশে। কেন? কেউ খবর নিচ্ছে না। চোরা-চালানকারীদের কাজ কিনা কে জানে! ওদের খপ্পরে যদি চায়ের দোকানটা চলে যায় তাহলে আর দেখতে হবে না। এলাম।' লোকটি চলে গেল।

স্নান সেরে তৈরি হয়ে বাসে চেপে অফিসে এল সলিল। তার পাশের টেবিলে বসে কমল রায়। ফুটবল খেলার সুবাদে চাকরি পেয়েছে কমল। কথা শুনে মনে হয়, কলকাতার সব ভিআইপিকে ভালো ভাবে চেনে। অফিসে আসে একঘণ্টা দেরিতে, তিনটে নাগাদ খেলার মাঠে যায়। সলিলের সঙ্গে সম্পর্কটা ভালো।'

কমল অফিসে এসে দশমিনিট ধরে খবরের কাগজ পড়ে। তারপর মুখ বেঁকিয়ে বলে, 'ম্যানেজ করেছে, বুঝলে! খেললাম আমি আর রিপোর্টারকে দিয়ে নিজের নামে প্রশংসা লিখিয়েছে কাগজে।'

'খুব অন্যায় কথা।' সলিল বলল, 'প্রতিবাদ করা উচিত।'

'থ্যাঙ্কু। বলো, আর কী খবর?'

'একটাই খবর। আমাদের পাড়ার চায়ের দোকানে বাঙালি খদ্দেরদের জন্যে চা না বানিয়ে অবাঙালিদের জন্যে বানাচ্ছে!'

'যাচ্চলে! চায়ের আবার বাঙালি অবাঙালিদের আলাদা স্বাদ হয় নাকি!'

'তা জানি না। কিন্তু উনি নাকি বাঙালিদের জন্যে চা তৈরি করা বন্ধ করে দিয়েছেন। সকালে তো মাত্র এক কাপ চা খাই। তাও যদি—!'

'আগে ওই অবাঙালিরা কোথায় চা খেতে যেত?'

'তা জানি না। আমাদের পাড়ার পাশ দিয়ে যে রেল লাইন চলে গেছে সেখান দিয়ে প্রচুর ট্রেন যাতায়াত করে। শেষরাতে যে ট্রেনটা আসে সেটা ঠিক এক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ, তারপর স্টেশনের দিকে চলে যায়। ওই এক মিনিটে বোধহয় অনেক অবৈধ কাজকর্ম ওখানে করা হয়। আর এই লোকগুলোও নিশ্চয়ই ওই কাজের সঙ্গে জড়িত।' মাথা নেড়ে বলল সলিল।

'কিন্তু ভোররাতে যারা অবৈধ কাজ করতে রেল লাইনে যায়, তারা পরের বিকেল পর্যন্ত কোথায় থাকে? কী করে?'

'তা তো জানি না।'

'অ। শুনুন। আপনার এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও দরকার নেই। আপনি আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবরে আপনার কী দরকার! তবে—!' কমল একটু ভাবল। ভেবে বলল, 'আমার কাছে একটা ক্যামেরা আছে। অল্প আলোয় বা আধা অন্ধকারেও স্পষ্ট ছবি তোলা

যায়। ওই ক্যামেরা আমি একদিনের জন্যে যদি আপনাকে দিই তাহলে তা দিয়ে ছবি তুলতে পারবেন?'

'কিন্তু ছবি তুলব কী করে? আমি তো তখন ঘরে থাকি।'

'ঘর থেকেই তুলবেন। জানলা দিয়ে। সাবধানে তুলবেন যাতে কেউ দেখতে না পায়। সাদা চোখে যা দেখতে পাচ্ছেন না তা ছবিতে হয়তো দেখতে পাবেন। আপনি তিনটের সময় আমার সঙ্গে চলুন।'

কমলের সঙ্গে বের হলে কোনও সমস্যা নেই।

ক্যামেরা নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এল সলিল। তখন সন্ধে হয়ে এসেছে। কয়েকবার ক্যামেরা নিয়ে জানলার কাছে গিয়ে রিহার্সাল দিল। কমল বলেছে, ক্যামেরায় যে ফিল্ম আছে তাতে আটটা ছবি তোলা যায়। ক্যামেরা ঠিক বলছে কিনা তা দেখার জন্যে শাটার টিপে ফিল্ম নষ্ট করার কোনও যুক্তি নেই।

রাতের ঘুম পাতলা হয়ে গেল। বারবার ঘুম ভাঙছে আর সলিল ঘড়িতে সময় দেখে হতাশ হচ্ছে। কখনও রাত এগোরাটা, কখনও একটা পনেরো। দেখল ঘড়ির কাঁটা দুটো কুড়িতে তখন তড়াক করে খাট থেকে নেমে জানলার পাশে চলে এল সলিল। অন্ধকার পাতলা হতে অনেক দেরি। কেউ কোথাও জেগে আছে বলে মনে হচ্ছে না। যেখান দিয়ে রেল লাইন গিয়েছে সেখানে কোনও আলো নেই। ওই লাইন দিয়েই শেষ রাতের ট্রেন আসবে। সলিল ক্যামেরা রেডি করে রাখল। বাইরে পাতলা অন্ধকার তবু ক্যামেরায় চোখ রেখে মনে হল ঝাপসা কিছু দেখা যাচ্ছে।

মনে মনে খুব উত্তেজনা অনুভব করল সলিল। এই জীবনে এমন কাজ এর আগে সে কখনও করেনি। সাদা চোখে যা দেখা যায় না তা ক্যামেরার চোখে অনেক সময় ধরা পড়ে যায়। আজ এই ক্যামেরায় কী ধরা পড়বে কে জানে! যদি এমন কিছু ধরা পড়ে যা পুলিশকে জানানো কর্তব্য, তাহলে সে কী করবে? তার তো পুলিশের সঙ্গে কোনও চেনাজানা নেই। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল কমলের কথা। খেলোয়াড় হিসেবে ওর অনেক চেনাশোনা। পুলিশকে কমল যা বলবে তাতেই কাজ হবে। স্বস্তির শ্বাস ফেলল সলিল।

এক মিনিট এক মিনিট করে সময় এগোতে লাগল। শেষ পর্যন্ত দূরে ট্রেনের ইঞ্জিনের হুইসেলের আওয়াজ হতেই সলিলের হাত কেঁপে উঠল। শক্ত করে ক্যামেরাটা উঠিয়ে চোখ রাখল সে। একটু একটু করে ট্রেনের শব্দ, ইঞ্জিনের আলো এগিয়ে আসছে। একেবারে তার জানলার সামনের খানিকটা দূরে এসে ট্রেন দাঁড়িয়ে গেল।

দাঁড়িয়ে রইল একেবারে মরে যাওয়া অজগরের মতো। বহুকাল আগে কোন পত্রিকায় মরে যাওয়া অজগরের যে ছবি সে দেখেছিল তার সঙ্গে মিল আছে।

শাটার টিপল সে। শব্দ হল। পরম আনন্দে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ট্রেনটাকে ক্যামেরা বন্দি করতে করতে একসময় বুঝতে পারল ফিল্ম শেষ হয়ে গেছে। বেশ হতাশ হয়ে চোখ বড় করে দেখার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। অস্পষ্ট কিছু মানুষকে ছুটোছুটি করতে দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু তাদের চেহারা অন্ধকারে মোড়া। একমিনিট যেতে না যেতেই ট্রেনটা নড়ে উঠল, তারপর ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে জায়গাটাকে ফাঁকা করে ট্রেন চলে গেল।

আলো ফোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করল সলিল। তারপর ক্যামেরা থেকে ফিল্মটা বের করে পকেটে রাখতে গিয়েও মন পালটে ওটাকে সে আলমারিতে রেখে তালা দিয়ে বেরিয়ে এল।

আলোর আভা ছড়িয়েছে, রোদ উঠতে এখনও ঢের দেরি। সলিল রাস্তায় নেমে দেখল চারধার শুনশান। চায়ের দোকানে এসে দেখল ভোর হতে না হতেই ভিড় হয়ে গেছে। এক কোণে বসল সে। দোকানি তাকে দেখে গলা তুলে বলল, 'চা দিতে দেরি হবে।'

'সেকী! কেন?' সলিল চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

'দেখছেন না, অনেক খদ্দের আগে থেকে বসে আছে।'

গম্ভীর মুখে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। সে দেখল নতুন খদ্দেররা চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। তারপর একজন দোকানে ঢুকে প্রত্যেককে একটা খাম ধরিয়ে দিলে সবার মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল। কেউ খাম খুলে দেখল না ভেতরে কী আছে। চা বিস্কুট খেয়ে দোকান ছেড়ে চলে গেল সবাই।

চা খেয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। কয়েক পা হাঁটতেই একটা দোকান থেকে পয়সা দিলে ফোন করা যায়। সেখানে গিয়ে কমলকে ফোন করল সে। ঘুম জড়ানো গলায় কমল প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার?'

দ্রুত ছবি তোলার ঘটনা এবং সকালে অজানা লোকেরা চা খেতে এসেছিল এবং সে সন্দেহ করছে তাদের খামে করে টাকা দেওয়া হয়েছে। কথাগুলো শুনে কমল বলল, 'তুমি সাবধানে ফিল্মের রোলটা নিয়ে অফিসে চলে এসো।'

স্নান সেরে ফিল্মের রোল নিয়ে অফিসে চলে এল সলিল। উত্তেজনায় সে স্থির হতে পারছিল না। রোজ দেরিতে অফিসে আসে কমল। আজ যেন আরও দেরিতে এল। সলিল বেশ উত্তেজিত হয়ে আগে বলে ফেলা কথাগুলো আবার বলতে লাগল। কিন্তু হাত তুলে তাকে থামাল কমল, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও।'

'মানে?' হকচকিয়ে গেল সলিল।

'তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, ছবি তোলার সময় পরপর দুবার শাটার টিপতে হয়। একবার টিপলে ছবি নাও উঠতে পারে।'

'সেকি?' চিৎকার করে উঠল সলিল।

'যান্ত্রিক ত্রুটি। তুমি ক্যামেরাটা রেখে দাও, আমি নতুন রোল দিচ্ছি। কাল ভোরে আর একবার ট্রাই করে দ্যাখো।'

খুব হতাশ হলেও আর একটা দিন আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করল সলিল। প্রায় মাঝরাত থেকে জেগে থাকার পর যখন হুইসল বাজিয়ে ট্রেনটা চলে এল তখন সে ক্যামেরা উঁচিয়ে শাটারে আঙুল দিল। কিন্তু কী আশ্চর্য, রোজ যে ট্রেন এখানে এক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকে, আজ সেটা গতি না কমিয়ে চলে গেল স্টেশনের দিকে। একের পর এক কামরাগুলো চলে যাওয়ার পর ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল সলিল। কিশোর ভারতী

যুদ্ধ থামালেন গজানন
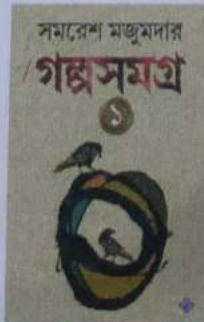
লেখা সপ্তর্ষি চ্যাটার্জী রেখা স্যমন্তক চট্টোপাধ্যায়

পাশাপাশি থাকে যারা তাদেরই তো দেখা যায়
অভিযোগে দিশেহারা, শান্তিতে থাকা দায়!

কারও চাই ক্ষমতা তো কারও চাই অর্থ
ঝগড়াটা সহজাত, কারও বা অব্যর্থ
যুদ্ধতে কার লাভ বোঝা ভারি কষ্ট,
টাকাকড়ি লোকজন সবই হয় নষ্ট।

কোভিডের ঘোর কেটে বুদ্ধি বিনাশিয়া
ইউক্রেন জিতে নিতে খেপে ওঠে রাশিয়া।
পুতিনের পোষা সেনা, লালমুখো মুশকো,
কিয়েভের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলে মস্কো।

নিশানায় তেড়েফুঁড়ে মিসাইল হুশহাশ
ছুটে যায়; মাটি খুঁড়ে তেল চায় বদমাশ!

জেলেনস্কিও তাতে ভয়ানক ক্রুদ্ধ,
দিন যায়, মাস যায়, থামে নাকো যুদ্ধ!
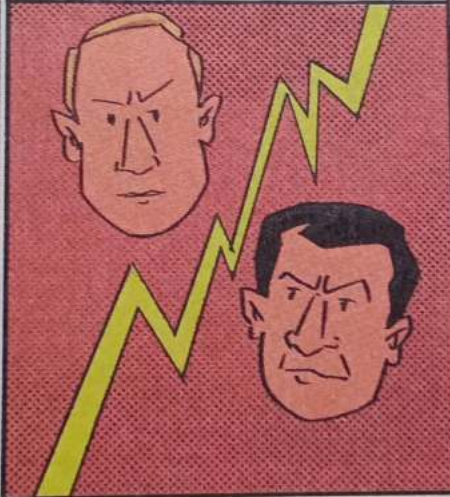
কত শিশু, মা-বোন, বৃদ্ধ বা ছাত্র,
ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যান অন্যত্র।

মানবের ত্রাতা যিনি, গণপতি নাম যাঁর
এতসব দেখেশুনে থাকে মন ভালো তাঁর?

দিব্য চক্ষে দেখে উঠলেন ত্রাসিয়া
ভীষণ এক বোম ওই বানিয়েছে রাশিয়া!
গোপন কারখানাতে তারা দিবারাত্র
খেটে বোম তৈরি করেছে এই মাত্র!

প্রহরীরা তটস্থ, সদা জেগে নির্ঘুম,
ছোট-ছোট দলে তারা ঢোকে কন্ট্রোল রুম।
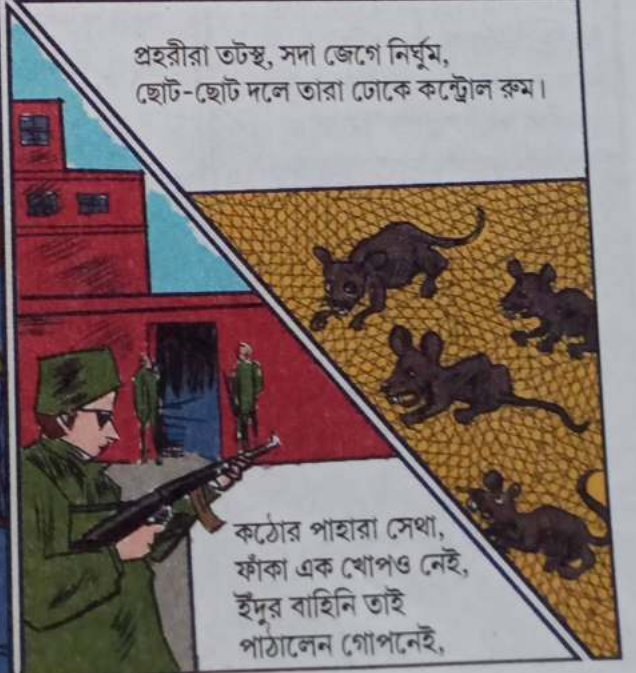
দাঁত দিয়ে কেটে দেয় যন্ত্রের যত তার
আলো নিভে ভজঘট, ভয়ে ত্রাহি চিৎকার!

সে সময়ে গণপতি সেইখানে ছুটলেন,
প্রকাণ্ড রূপে তিনি আলো হয়ে ফুটলেন।

বললেন,

শোনো বাপু, বলে দিই স্পষ্ট,
লোভে আর হিংসাতে হলে পথভ্রষ্ট,
অন্যের ঘাড়ে চেপে যদি করো নৃত্য
দুর্বল ভেবে যদি তারে করো ভৃত্য;

জেনে রেখো, একই ভুল করেছিল গোলিয়াথ,
ডেভিডের সাথে তার ছিল শুধু এ তফাত,

সৎসাহসের থাকে নির্ভীক গৌরব,
পাণ্ডবরাও জয় করেছিল কৌরব!

যুদ্ধ বিগ্রহের নেই কোনও অন্ত,
আসলে তো তোমাদের চাহিদা অনন্ত!
নিজের নিজের মনে থাকো
না হে চুপটি,
ধরব না তাহলেই এ
রুদ্র রূপটি।’

পরশুর ডগা দিয়ে এঁকে দেন গণ্ডি
সীমান্ত পেরনোর যত অভিসন্ধি ---
নিমেষে করল ত্যাগ জাহাঁবাজ সেনারা
যুদ্ধনদীর পারে শান্তির কিনারা।

আর যত নিরস্ত্র নাগরিক, অভুক্ত,
লাড্ডু বিলিয়ে দেন, বন্দিরা মুক্ত।
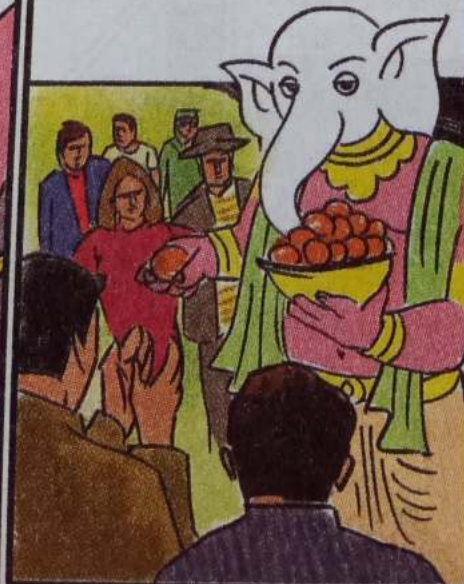
সহর্ষে সকলেই বলে,

মহানায়ক,
এবারেও ত্রাতা তুমি সিদ্ধি বিনায়ক!

সৈকত মুখোপাধ্যায়

বন্দরের অন্ধকার

বুখোদা ড্রাইভ করছিল। আমি পাশে বসেছিলাম। একটু জড়সড় হয়েই বসেছিলাম। ডায়মন্ড-হারবার রোড থেকে ডানদিকে টার্ন নিয়ে আমরা এখন ঢুকে পড়েছি কাঁটাপুকুর মর্গের রাস্তায়, যেটার পোশাকি নাম রিমাউন্ট রোড। রাস্তার একদিকে ভারতীয় সেনার বোমা-বারুদ রাখার গুদাম আর অন্যদিকে ক্যালকাটা পোর্ট-ট্রাস্টের অফিসারদের কোয়ার্টারস।
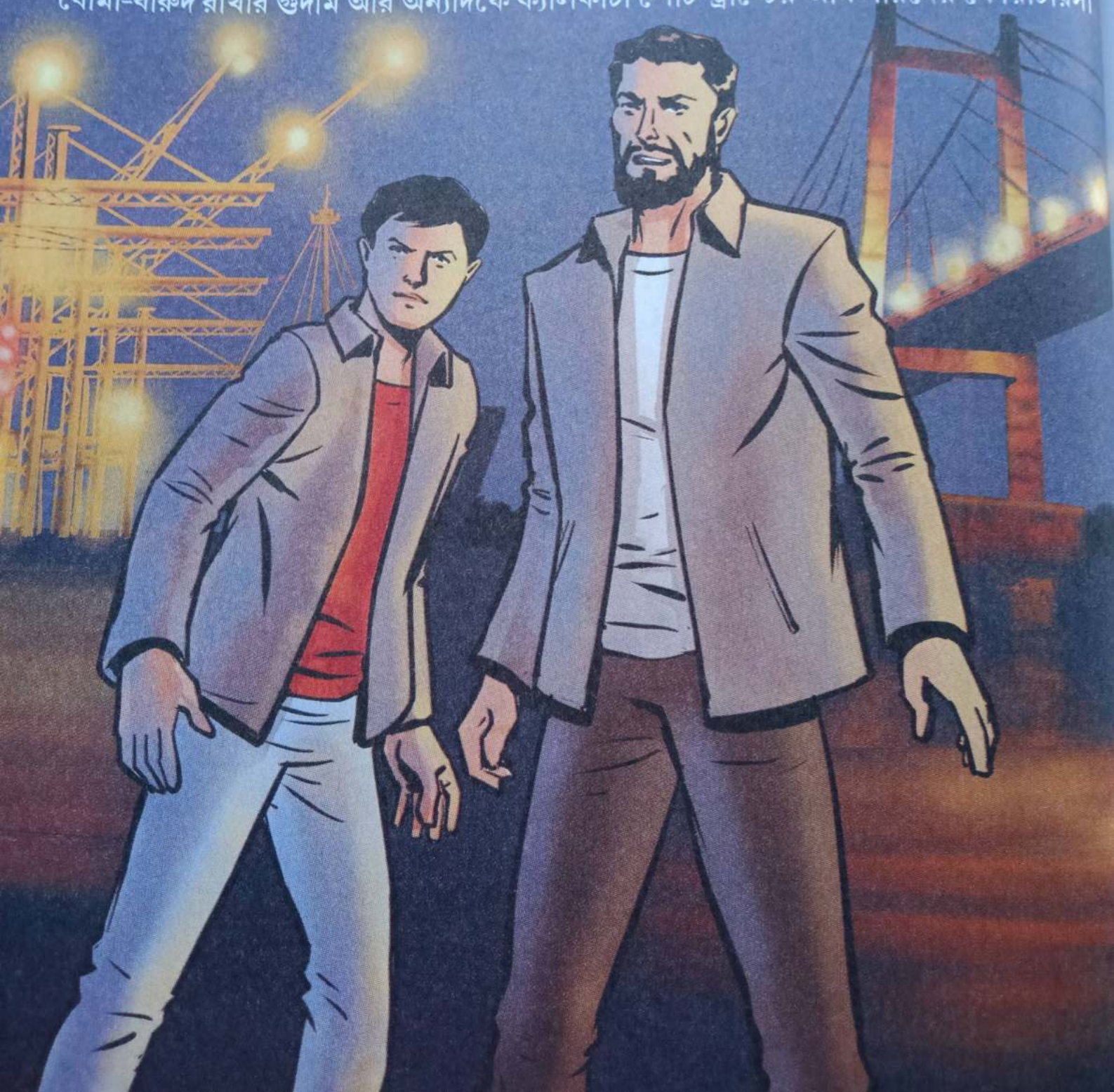
রিমাউন্ট-রোড ধরে আমরা যেদিকে যাচ্ছি, সেদিকেই ক্যালকাটা পোর্টের কন্টেনার-ইয়ার্ড। এখন রাত ন'টা। ইয়ার্ডের দিক থেকে একটার পর একটা বিশাল ট্রাক কন্টেনারগুলো নিয়ে হু-হু করে ছুটে আসছে। রাতের কলকাতার রাস্তায় ওরাই রাজা।

দানবিক ট্রাকগুলো যখন পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে তখন মনে হচ্ছে যেন আমরা গাড়ি-সমেত উড়ে গিয়ে পাঁচিলে ধাক্কা খাব। বুধোদাকে মাঝেমাঝেই রাস্তা ছেড়ে পাশের জমিতে নেমে যেতে হচ্ছে।

একবার আড়চোখে বুধোদার দিকে তাকালাম। যথারীতি উদ্বেগবিহীন মুখ। মাঝেমাঝে সন্দেহ হয় লোকটার ব্রেনের জায়গায় একতাল বরফ বসানো নেই তো! মিনিট-দশেক টেনশন সহ্য করার পরে আর থাকতে না পেরে বলেই ফেললাম, 'এত রাত করে এলে কেন বুধোদা? আমরা দিনের বেলায় আসতে পারতাম তো।'

বুধোদা বলল, 'তোর অসুবিধে হচ্ছে? রাত আড়াইটে অবধি তো মোবাইল নিয়ে খুটুর-খাটুর করিস।'

মেজাজ খারাপ হয়ে গেল, 'ট্রাকের চাকার নীচে পাঁপড় হয়ে গেলে আর মোবাইল নিয়ে খেলতে পারব না তো।'

বুধোদা হেসে ফেলল। রাস্তার দিক থেকে চোখ না সরিয়েই বলল, 'ব্যাপারটা কী জানিস, রুবিক। যে ছেলেটার সঙ্গে আজ দেখা করতে যাচ্ছি, সে এক অন্ধকারের জীব। দিনের সব-সময়, সব জায়গায় সে স্বাধীনভাবে ঘুরতে পারে না। কাজেই তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে তার সুবিধেমতন জায়গায়, তার পছন্দমতন সময়েই আমাদের যেতে হবে।'

বলতে-বলতেই বুধোদা জি.পি.এস দেখে খুব দ্রুত দু-চারটে বাঁক নিল। মুহূর্তের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেল অত চওড়া রিমাউন্ট-রোড। আমরা একটা ঘিঞ্জি বস্তির মধ্যে ঢুকে পড়লাম। দু-চারটে নেড়িকুকুর গাড়ির পেছনে ঘেউ-ঘেউ করে তাড়া লাগাল। রাস্তার ধারে শুয়ে-বসে থাকা কিছু লোক মুখ তুলে আমাদের দেখেই যে-যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

একটু বাদে বস্তিটাও পেরিয়ে গেলাম। দেখলাম সরু রাস্তাটার ওখানেই শেষ। আমাদের সামনে গঙ্গা নদী। আমাদের এগোবার উপায় নেই।

বুধোদা গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে নেমে পড়ল। বলল, 'কী মুশকিল! সেন্ট মাইকেলস চার্চ বলতে তো এই-জায়গাটাকেই দেখাচ্ছে। কিন্তু চার্চ-টার্চ তো দেখতে পাচ্ছি না কোথাও।' আমিও বুধোদার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

ভারি অদ্ভুত জায়গা। আমাদের বাঁ-দিকে, কিছুটা দূরেই, আলোয় আলো হয়ে আছে কলকাতা-বন্দর। শয়ে-শয়ে ক্রেন আর জাহাজের মাস্তুল ওদিকের আকাশটাকে ঢেকে রেখেছে—যেন ইস্পাত দিয়ে তৈরি একটা পাইন-বন। আর আমাদের ডানদিকে বিদ্যাসাগর সেতু। সেও সমান ম্যাজেস্টিক। কিন্তু এই দুই আলোর ছটার মধ্যিখানে আর যা কিছু সবই গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা।

অন্ধকার নদী, অন্ধকার এদিকের নদীতীর। এমনকি নদীর ওপারেও কোনো আলো দেখতে পাচ্ছি না। সেই অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঢেউয়ের ছলাৎছল শব্দ শুনতে-শুনতে বুধোদাকে জিগ্যেস করলাম, 'এখন তাহলে সেই লোকটাকে একবার ফোন করবে নাকি?'...

বুধোদা বলল, 'করলাম তো। ধরল না।'

'তাহলে?'

'তাহলে আবার কী? ওর জন্যে ওয়েট করতে হবে। চল গাড়িতে উঠেই বসি। বড্ড মশা কামড়াচ্ছে।'

গাড়িতে বসে বুধোদাকে বললাম, 'তুমি কী যেন চেপে যাচ্ছ, বুধোদা। এটা ঠিক নয়। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় বলে এলে একজন এজেন্টের সঙ্গে দেখা করেই ফিরে আসবে। ফেরার পথে খিদিরপুরের কোন বিখ্যাত রেস্তোরাঁয় যেন বিরিয়ানিও খাওয়াবে বললে। আমি লোভে পড়ে চলে এলাম। আর এখন তুমি বলছ, লোকটা নাকি অন্ধকারের জীব। যে-লোকেশন দিয়েছিল সেটাও খুঁজে পাচ্ছ না!'

আমার কথাগুলোর মধ্যে একটুও মিথ্যে ছিল না। সত্যিই এইটুকু বলে বুধোদা আমাকে পড়ার টেবিলের সামনে থেকে তুলে নিয়ে এসেছিল।

বুধোদা মানে বোধিসত্ত্ব মজুমদার—আমার পাড়াতুতো দাদা। উত্তরপাড়ায় জি.টি. রোডের ওপরে, গঙ্গার ধারে ওদের দেড়শো বছরের পুরনো প্যালেসের মতন বাড়ি, যার নাম হেমকুঞ্জ। উলটোদিকে ব্যানার্জীপাড়ায় আমাদের বাড়ি। ছোটবেলা থেকেই হেমকুঞ্জের মাঠের মতন বড় ছাদটায় আমরা ফুটবল-ক্রিকেট খেলেছি। ওই বাড়ির উঠোনে নাটক করেছি। বুধোদার মাকে আমি জ্যাঠাইমা বলে ডাকি। এককথায় হেমকুঞ্জ আমার দ্বিতীয় বাড়ির মতন।

বুধোদা ছোটবেলা থেকেই ভয়ঙ্কর পড়ুয়া। সারাক্ষণই হয় বইয়ের পাতা আর না-হলে ল্যাপটপের স্ক্রিন থেকে কিছু না কিছু পড়ে যাচ্ছে। ওর সঙ্গে দুটো কথা বললেই বুঝতে পারতাম, পৃথিবীর বিচিত্র বিষয়ে ওর ইন্টারেস্ট। তার মধ্যে ইতিহাস এবং ভূগোল আছে, চিত্র এবং ভাস্কর্য আছে, সাহিত্য তো আছেই।

আশ্চর্য ব্যাপার, বোধিসত্ত্ব মজুমদার কিন্তু আবার চরম অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয়। মাত্র কুড়ি-বছর বয়স থেকেই বুধোদা পাহাড় আর জঙ্গলে ঘুরতে শুরু করেছে; তাও আবার একা। জিগ্যেস করলে বলত, 'সঙ্গে লোক থাকলে প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় না।' বলত, 'একা যদি কখনো কোনো রাতে পাহাড়ি-তৃণভূমির মাঝখানে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকিস রুবিক, তাহলে দেখবি, একটু বাদে তারাগুলো তোর হাতের নাগালে নেমে এসেছে। মহাশূন্যের মাঝখান দিয়ে ওদের ছন্দে বাঁধা যাতায়াতের ফলে একটা সিমফনি তৈরি হয়। তুই পরিষ্কার সেই ঈশ্বরীয় সিমফনি শুনতে পাবি।'

এই জ্ঞানপিপাসা আর অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয়তাকে মেলানোর জন্যেই বুধোদা মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে একটা ব্যবসা শুরু করল—অ্যান্টিকের ব্যবসা। নাম দিল মহারাজা কালেকশনস। ও অবশ্য নিজেকে ব্যবসায়ী বলে না। বলে অ্যান্টিক-হান্টার।

অ্যান্টিক-হান্টার বোধিসত্ত্ব মজুমদার।

সহজলভ্য অ্যান্টিকে বুধোদার বিশেষ ইন্টারেস্ট নেই। প্রাচীন মুদ্রা আর তিব্বতী থাঙ্কা জোগাড় করার জন্যে ওর কর্মচারীরাই রয়েছে। ও ঘুরে বেড়ায় আরও দুর্লভ, আরও অভাবনীয় কিছুর পেছনে। কখনো সফল হয়, কখনো হয় না। কিন্তু ওর নিজের কথাতেই, প্রতিবারই ওর ঝুলিতে একটা জিনিস জমা হয়, যার নাম অভিজ্ঞতা।

শেষ কয়েকবছর ধরে এরকম অ্যান্টিক-শিকারের অভিযানে বুধোদা আমাকে ওর সঙ্গী করে নিয়েছে।

আমার ডাকনাম যে রুবিক, সেটা তো ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি। ভালো নাম মাল্যবান মিত্র। পড়ি উত্তরপাড়া গভর্নমেন্ট স্কুলে, ক্লাস ইলেভেনে। স্কুলের ক্রিকেট-টিমের ক্যাপ্টেন। পর্বতারোহণের অ্যাডভান্স কোর্স করেছি। ডানপিটে বলে সুনাম আছে।

অন্ধকার নদীর দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। পাশ থেকে বুধোদা হঠাৎ বলল, 'এই দরিয়া নামে ছেলেটাকে আমি কিন্তু অনেকদিন ধরেই জানি।'

আমি বললাম, 'দরিয়া? মানে যে তোমাকে আজ এখানে আসতে বলেছে?'

'হ্যাঁ। নামটা বেশ আনকমন না?

'হ্যাঁ, আনকমন এবং সুন্দর।'

'এমন সুন্দর নামের মালিকটি কিন্তু বন্দর এলাকার মাফিয়া।'

'দরিয়া! একজন মাফিয়া? তুমি তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ? কেন বুধোদা?'

বুধোদা বলল, 'একজন মানুষের তো একটাই পরিচয় থাকে না। দরিয়ার সঙ্গে আলাপ হলে দেখবি, ওর চরিত্রের মধ্যেও অনেকগুলো ভাগ আছে। শুধুই কালো নয়। ধূসর থেকে শুরু করে সাদা অবধি অনেকগুলো শেডস।

'ওর যখন মাত্র আঠারো-বছর বয়স, তখন ওর বাবা মুম্বইয়ের কিছু ক্রিমিনালের হাতে খুন হন। অথচ তিনি ছিলেন সাধারণ খেটে-খাওয়া একজন মানুষ।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'তাহলে খুন হলেন কেন?'

'সেটা আজ ওর সঙ্গে দেখা হলেই জানতে পারবি। এখন শুধু এইটুকু বলে রাখি যে, সেই কালো-দিনগুলো দরিয়া কোনোদিন ভুলতে পারেনি। একটা কমবয়সি ছেলে আর তার মা অসহায়ের মতন পার্টির অফিস থেকে পুলিশের

থানায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু সুবিচার পাচ্ছে না। উপরন্তু যারা ওর বাবাকে খুন করেছিল তারাই দিন-দুপুরে ঘরে ঢুকে আসছে, ওকে আর ওর মাকে খুনের হুমকি দিচ্ছে। তাছাড়া তখন ওদের স্থায়ী কোনো রোজগারও ছিল না। সবদিন ভাত জুটছিল না।

'এই অবস্থায় বেঁচে থাকার একমাত্র যে-রাস্তা, সেটাই নিতে বাধ্য হল দরিয়া। পোর্ট-এরিয়ায় ক্রিমিনালের অভাব নেই। সেরকমই এক লিডারের খাতায় নাম লেখাল। প্রোটেকশনও পেল, পয়সাও পেল। তারপরে আরও সাতটা বছর কেটে গেছে। এখন দরিয়ার বয়স পঁচিশ। ও এখন কাঁটাপুকুর কন্টেনার-ইয়ার্ডের মাফিয়া-লিডার।'

হঠাৎ বুধোদার ফোনটা ভাইব্রেট করে উঠল। ফোনটা কানে নিয়ে কিছুক্ষণ হুঁ হাঁ করে বুধোদা আমাকে বলল, 'দরিয়া আসছে। আর পাঁচ-মিনিট লাগবে বলল।'

আমি বললাম, 'তুমি ততক্ষণে ওর সম্বন্ধে আর যা-যা বলার বলে দাও।'

বুধোদা ওর সেই মার্কামারা ফিঁচেল-হাসিটা হেসে বলল, 'ও অবশ্য তোর সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানে। এমনকী সপ্তদ্বীপার ব্যাপারে তোর যে একটু ক্রাশ আছে, সেটাও।'

বললাম, 'কেউ যদি একটা গ্রহ নিয়ে পড়াশোনা করে তাহলে সেই গ্রহের স্যাটেলাইট-গুলোর কথাও জেনে যায়। সেইভাবেই দরিয়া নিশ্চয় আমার কথা জেনেছে। তোমার স্যাটেলাইট হিসেবে। আর সপ্তদ্বীপা আঁতেল মেয়ে। ওর সম্বন্ধে আমার ক্রাশ নেই। তুমি বরং দরিয়ার কথাটাই শেষ করো।'

'বেশ। তাই করি। আমার সঙ্গে দরিয়ার আলাপ তিন-বছর আগে। মেটিয়াবুরুজে নবাব ওয়াজিদ আলি শাহের এক বংশধরের বাড়িতে নবাব সাহেবের নিজের হাতে লেখা শায়েরির খাতার একটা পাতা ছিল। বুঝতেই পারছিস, জিনিসটা দুর্মূল্য অ্যান্টিক। খবর পেয়ে সেটা কিনতে এসেছিলাম। দরিয়ার কাছে ডিল-টার খবর পৌঁছে গেছিল। ও এসে ওর শেয়ার দাবি করল। সেই থেকেই আলাপ।

'শেয়ার শেষ অবধি দিতে হয়নি অবশ্য। ও নিজেও ছিল খুব ভালো স্টুডেন্ট। বিশেষত ইতিহাস ছিল ওর প্রিয় সাবজেক্ট। আমার কাছে শুনে-টুনে আর মাঝখানে একবার হায়দ্রাবাদের সালার-জং মিউজিয়ামে ঘুরে এসে অ্যান্টিকের ব্যাপারটায় এমনই ইন্টারেস্ট পেয়ে গেল যে তারপর থেকে ও নিজেই কাজের ফাঁকে-ফাঁকে অ্যান্টিক খুঁজে বার করতে শুরু করল।

'ওর কিছু সুবিধেও ছিল। প্রথমত, এই খিদিরপুর মেটিয়াবুরুজ তো আজকের পাড়া নয়। ইতিহাস এখানকার আকাশে-বাতাসে। তার ওপরে দরিয়া জায়গাটাকে হাতের তালুর মতন চেনে। ওর নেট-ওয়ার্কও ছড়িয়ে আছে। কাজেই আশ্চর্য-আশ্চর্য সব জিনিস ও গত তিনবছর ধরে আমার হাতে তুলে দিচ্ছে। তবে অ্যান্টিকের কাজটা ও করে হবি হিসেবে।

'এই তিন-বছরে আমি বেশ কয়েকবার ওর সঙ্গে মুখোমুখি বসে কথা বলেছি। ফোনে তো প্রায়ই কথা হয়। এইসব থেকে আমার মনে হয়েছে, দরিয়া ঠিক সাধারণ ক্রিমিনাল নয়। ওর মধ্যে একটা রবিন-হুড টাইপের ব্যাপার রয়েছে। এটা ঠিক যে বন্দর-এলাকার এদিকটায় যত কালা-ধান্দা আছে, দরিয়াকে লাভের হিস্যা না দিয়ে কেউই সেই ব্যবসা চালাতে পারে না। আবার উল্টোদিকে এটাও ঠিক যে, এখানে যত গরিব-দুঃখী আছে, তারাও কোনো-না-কোনো ভাবে ওর কাছে উপকৃত। শিশুদের ওপরে, মেয়েদের ওপরে অত্যাচারের কথা শুনলে ও নিজের দলের লোকেদেরও ক্ষমা করে না। বোঝাই যায়, নিজের যন্ত্রণাময় কৈশোরের কথাটা ও ভুলতে পারেনি।

'তবে এটা কোনোদিন ভাবিনি যে, একদিন ব্যক্তিগত কারণে ওকে বোধিসত্ত্ব মজুমদারের শরণাপন্ন হতে হবে। কিন্তু সেটাই হল। পুরো গল্পটা আমিও জানি না। চল, কোথায় নিয়ে যাবে বলছে, সেখানে গেলেই সব জানতে পারব।'

কী বলব বুঝতে পারছিলাম না। চুপ করে বসেছিলাম। দেখছিলাম একদিকে বন্দর আর আরেকদিকে দ্বিতীয় হুগলি সেতুর আলোর সমুদ্রের মাঝখানে জমে-থাকা বিশাল অন্ধকার। মনে হচ্ছিল, কলকাতার মতন যে-কোনো নগরীর ইতিহাসও তো এই।

হঠাৎই বুধোদার দিকের বন্ধ দরজার ওপরে কয়েকটা টোকা। তাকিয়ে দেখি, বন্ধ কার-উইন্ডোর ওপাশে একজন দাঁড়িয়ে। আমরা গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম।

এই তাহলে দরিয়া? কাঁটাপুকুরের ত্রাস! অবাক হয়ে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

আমার অবাক হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। বলিউড, টলিউড এমনকী দক্ষিণী সিনেমা-টিনেমাতেও গ্যাংস্টারদের যেমন চেহারা দেখে আমি অভ্যস্ত, তার সঙ্গে এই দরিয়া নামে ছেলেটির বিন্দুমাত্র মিল ছিল না। এর গায়ে সাদা সাফারি-স্যুট নেই, গলায় মোটা সোনার চেন নেই, চোখে শেডস নেই। এর চুলে অন্তত দু-মাস নাপিতের হাত পড়েনি। গালেও খোঁচাখোঁচা দাড়ি। ছোটখাটো চেহারা। হাইট কিছুতেই পাঁচফুট সাতইঞ্চির বেশি হবে না। গায়ের রঙ ফর্সা এবং মুখে এমন একটা শান্তভাব যে অনায়াসে রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষক হিসেবে চালিয়ে দেওয়া যায়।

পোশাক-আশাকও অতি সাধারণ। একটা হাওয়াই শার্ট এবং ট্রাউজার। ওই আবছা অন্ধকারে কোনোটারই রঙ বুঝতে পারলাম না। কিন্তু খেয়াল করে দেখলাম পায়ের জুতোদুটো আপার রেঞ্জের ব্র্যান্ডেড স্পোর্টস-সু। স্বাভাবিক। চিতাবাঘ তার চারটে থাবার যত্নই সবচেয়ে বেশি করে নেয়।

পা দেখে নয়। চিতাবাঘের কথাটা মাথায় এসেছিল দরিয়ার চোখদুটো দেখে। একজন গ্যাংস্টারের যাবতীয় লক্ষণ ফুটে উঠেছিল শুধু ওর দুটো চোখে। চিতার মতনই সতর্ক চঞ্চল দুটো চোখ। আমাদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকলেও, চারপাশটা যে ওর দৃষ্টিসীমার মধ্যেই ছিল সেটা বেশ বুঝতে পারছিলাম। বাকি ছিল ওর পেছনদিকটা, যেদিকে দেখা কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। তবে সেদিকটা আগলাবার জন্যে একজন ছিল।

বস্তির একটা ভাঙা বাড়ির দেয়ালে একটা পায়ের ভর রেখে খুব ক্যাজুয়াল-ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিল একটি নর-রাক্ষস। সাড়ে ছ-ফিটের ওপরে হাইট। পরনে কার্গো-প্যান্ট আর টাইট টি-শার্ট। দুটোরই রঙ মনে হল কালো। লোকটা দু-হাতের মধ্যে একটা লম্বাটে ব্যাগ এমনভাবে ধরে রেখেছিল যেভাবে কেউ ব্যাগ ধরে না, বন্দুক ধরে। বোঝা যাচ্ছিল, অত্যন্ত বিপজ্জনক কোনো আগ্নেয়াস্ত্রই রয়েছে ব্যাগটার মধ্যে।

দরিয়া বুধোদার বাড়িয়ে দেওয়া হাতটা নিজের দুই-হাতের মুঠোয় চেপে ধরে বলল, 'স্যরি স্যার। দেরি হয়ে গেল। আসলে গত কয়েকদিন ধরে সারাক্ষণ পেছনে ফেউ লেগে আছে। সেগুলোর চোখ ফাঁকি দিয়ে আসতে গিয়েই দেরি হয়ে গেল।'

বুধোদা জিজ্ঞেস করল, 'পুলিশ?'

দরিয়া হেসে ফেলল। বলল, 'না, স্যার। আমাদের কম্পিটিটর বলতে পারেন।'

'ওরা সারাক্ষণই তোমাকে ফলো করে?'

দরিয়া বলল, 'না স্যার। এখনই করছে। সব বলছি। তবে একজায়গায় বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকাটা সেফ নয়। চলুন হাঁটতে শুরু করি'।

বুধোদা এগোতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল। গাড়িটার দিকে তাকাতেই দরিয়া বলল, 'গাড়ির জন্যে ভাববেন না। নজর রাখার লোক আছে'।

'কোথায় আছে?'

দরিয়া হাঁটতে-হাঁটতেই উত্তর দিল, 'বস্তির পেছনদিকের ঘরগুলো দেখেছেন? অন্ধকার জানলাগুলো দেখতে পাচ্ছেন? চলুন, আমি তো বলছি চিন্তা করবেন না।'

দরিয়াকে মাঝখানে রেখে আমি আর বুধোদা নদীর দিকেই হাঁটতে শুরু করলাম। পেছন-পেছন সেই নর-রাক্ষস ছায়ার মতন ফলো করছিল। আমি মনে-মনে যতরকমের অভিশাপের কথা মনে পড়ছিল তার সবকটাই বুধোদার ওপরে অ্যাপ্লাই করছিলাম। কী দরকার ছিল আজ এরকম একটা জায়গায় আসবার? প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারব তো?

হঠাৎই দরিয়ার কথায় চিন্তাটা অন্যদিকে ঘুরে গেল। ও আমাকেই কিছু বলছে।

'কী বললেন?' জিগ্যেস করলাম।

'আমাকে আপনি-আজ্ঞে করতে হবে না। তুমি করেই বোলো। ছোটবেলায় গুপ্তধনের গল্প তো পড়েছ নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ, অনেক পড়েছি'।

'মনে হয়নি, যদি ওরকম একটা গুপ্তধন নিজে খুঁজে পাই, তাহলে বেশ হয়।'

'হতো।'

দরিয়া আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। অন্ধকারের মধ্যেও ওর সুন্দর দু-পাটি দাঁত ঝলমল করে উঠল। বলল, 'তাহলে আমাকে একটা থ্যাঙ্কস দাও। আমি আজ তোমাকে একটা গুপ্তধনের গল্প শোনাব। খুঁজে বার করতে পারবে কি পারবে না, সেটা তোমার ক্ষমতার ওপরে নির্ভর করছে। তবে আমার ধারণা, পারবে। স্যারের মুখে তোমার অনেক গুণের কথা শুনেছি।'

বুধোদা বলল, 'দরিয়া আজ স্পেশালি রিকোয়েস্ট করেছিল যেন তোকে সঙ্গে নিয়ে আসি।'

আমি জোর করে একটু হাসবার চেষ্টা করলাম। মনে মনে বুধোদাকে বললাম, 'তুমি এবং তোমার দরিয়া দুজনেই নিপাত যাও। গুপ্তধন কিংবা পিঠে গুলি কোনোটাই আমার চাই না।'

দরিয়া বলল, 'স্যারের মুখে শুনেছ কিনা জানি না, আমার বাবা আজ থেকে সাত-বছর আগে এখানেই খুন হয়েছিলেন। তখন আমার বয়স ছিল আঠারো-বছর। তার মাত্র এক-বছর আগে বাবা মুম্বই থেকে কলকাতায় ফিরেছিলেন। উনি মুম্বইয়ে ফিশিং-ট্রলারে কাজ করতেন, মানে মাছ ধরার ছোট জাহাজে।'

'আমি নিশ্চিত, মুম্বই থেকেই বাবার খুনিরা ওঁকে ফলো করে এসেছিল। ওরা বাবার কাছ থেকে কিছু একটা বার করার চেষ্টা করছিল। সেটা কী আমরা জানতাম না। ইন-ফ্যাক্ট এখনো জানি না। তবে জিনিসটা নিশ্চয় অসামান্য দামি কিছু হবে। নাহলে সাত-বছর ধরে ওরা মনে রাখত না। সাত-বছর বাদে আবার ফাদার রেনল্ডের পেছন-পেছন এখানে ফিরে আসত না।'

'ফাদার রেনল্ড কে?'

'তিনিই একমাত্র মানুষ যিনি মুম্বইয়ে কী হয়েছিল সেটা দেখেছিলেন। এখন তাঁর কাছেই যাচ্ছি। বাকিটা ওঁর কাছে শুনবেন।'

আর মিনিট-তিনেক হাঁটার পরে হঠাৎ দরিয়া রাস্তা ছেড়ে ডানদিকে, মানে নদীর দিকে টার্ন নিল। বলল, 'আসুন স্যার, পৌঁছে গেছি।'

খেয়াল করিনি, ওখানে অনেকখানি জংলা জমির মাঝখানে একটা অদ্ভুত শেপের বাড়ি। বাড়িটা একতলা, কিন্তু এখনকার যেকোনো দোতলা বাড়ির সমান উঁচু। কোনো এককালে দেয়ালে সাদা চুনকাম করা ছিল। কিন্তু এখন কালচে শ্যাওলার ছোপে সেই সাদা রঙ ঢাকা পড়ে গেছে। সেইজন্যেই অন্ধকারে মিশে গেছে।

বাড়িটার দিকে তাকিয়ে ওটার বয়স আন্দাজ করার চেষ্টা করছিলাম। একশো? উঁহু। বেশি। যেখানে-যেখানে প্লাস্টার খসে গেছে, সেখানে-সেখানে পুরোনো-আমলের পাতলা ইঁট দেখতে পাচ্ছিলাম। তাছাড়া ওই উচ্চতার ফ্রেঞ্চ-উইন্ডো, প্রতিটি জানলা আর দরজায় অমন কাঠের কপাট, খিলান, পঙ্খের কাজ আর রট-আয়রনের রেলিং—ওসব দেখা যায় কলকাতার প্রথম যুগের প্রাসাদগুলোয়।

বুধোদা মন দিয়ে বাড়িটাকে মাপছিল। একটু বাদে বলল, 'এই তাহলে সেন্ট মাইকেলস চার্চ?'

দরিয়া উত্তর দিল, 'হ্যাঁ স্যার।'

'একটা চুড়ো থাকার কথা তো। পিনাকল। সেটা কোথায় গেল?'

'চুড়োটা আমরাও দেখিনি। শুনেছি, উনিশশো-আশি সালে ভেঙে পড়েছিল। তারপর আর সারানো হয়নি। বাকি গির্জাটার হালও খুব খারাপ। যেকোনো দিন ভেঙে পড়ে যাবে। আসুন স্যার আমার পেছনে-পেছনে। সাবধানে আসবেন। জমিটা পেছল আছে।'

সামনের বিশাল দরজাটা এমনভাবে বন্ধ করা ছিল যে, দেখেই বোঝা যাচ্ছিল বহুবছর ওটা খোলা হয়নি। আমার হাতের চেয়েও বড় লোহার কব্জাগুলো মরচে ধরে জ্যাম হয়ে গিয়েছিল। জায়গায় জায়গায় কাঠের টুকরো ভেঙে পড়েছে। এই বর্ষাকালে অজস্র বুনো লতা লতিয়ে উঠেছিল দরজাটার গায়ে।

আমরা ঢুকলাম বাড়িটাকে বেড় দিয়ে পাশের একটা ছোট দরজা দিয়ে। দরজাটা ভেজানো ছিল; একটু ঠেলতেই খুলে গেল।

বুধোদা বলল, 'তুমি বলছ, এখানে একটা অত্যন্ত দামি জিনিস আছে। সেটার জন্যে মুম্বই-গ্যাং আবার এখানে হাজির হয়েছে। তাহলে দরজা এভাবে খোলা রয়েছে কেন?'

দরিয়া বলল, 'ওরা একদফা তল্লাশি সেরে গেছে তো। তাই...।'

'ওরা মানে?'

'ওই যে, মুম্বই-গ্যাং। বাবাকে যারা খুন করেছিল।'

'ও! পায়নি কিছু?'

'না স্যার। সেইজন্যেই এখানে ওরা আর ফিরবে না বলেই মনে হয়।'

'তাহলে আমরাই বা এখানে কেন এলাম?'

'তার কারণ, ফাদার রেনল্ডের দৃঢ় বিশ্বাস, বাবা যদি মুম্বই থেকে কোনো দামি জিনিস নিয়ে এসে থাকেন, তাহলে সেটা তিনি এই চার্চের মধ্যেই প্রথমে রেখেছিলেন। সূত্র কিছু থাকলে এখানেই থাকবে।'

'কথাটা ভুল নয়। আট-বছর আগে সেই দিনটায় ফাদার রেনল্ড আর আমার বাবা হাওড়া স্টেশন থেকে সোজা এই চার্চেই এসে উঠেছিলেন। যদিও মাত্র দশ-মিনিটের দূরত্বে আমি আর মা রয়েছি, তবু আমরাও বাবার আসার খবর পাইনি পুরো এক-সপ্তাহ। এক-সপ্তাহ বাদে বাবা এই চার্চ থেকে বাড়ি ফিরেছিলেন। এসব কথা এতদিন জানতাম না। এখন ফাদার রেনল্ডের মুখে শুনে মনে হচ্ছে, ঠিকই। বাবা জিনিসগুলোকে লুকিয়ে রাখার জন্যে এক সপ্তাহ সময় নিয়েছিলেন।'

বুধোদা বলল, 'যদি তা না হয়? যদি ওই এক-সপ্তাহের মধ্যে তিনি সেটা বিক্রি করে দিয়ে থাকেন?'

দরিয়া ম্লান হেসে বলল, 'তাহলে কি আর মানুষটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কাপড় কাটার চাকরি করত, না আমরাই ওই ভাঙা বাড়িতে পড়ে থাকতাম? তাছাড়া তারপরেও যখন খুনিরা বাবাকে ক্রমাগত অ্যাটাক করে গেছে, তার মানে ওরাও জানত জিনিসটা বাবার কাছেই রয়েছে। বাবা হদিশ দেননি বলেই খুন হয়েছিলেন।'

বুধোদা বলল, 'তোমার যুক্তিতে কোনো ভুল পাচ্ছি না। তবু এখানে ঢোকার আগে তোমাকে একটা কথা পরিষ্কার বলে রাখি। বোধিসত্ত্ব মজুমদার আজ অবধি চোরাই মালের সন্ধান পেয়ে পুলিশকে জানায়নি এরকম হয়নি। এক্ষেত্রেও যদি দেখি জিনিসটার আসল মালিক তোমার বাবা নন, অন্য কেউ, তাহলে কিন্তু আমি তাকেই ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করব।'

দরিয়া মাথা নীচু করে আস্তে-আস্তে বলল, 'আমাকে দেখে আমার বাবার সম্বন্ধে কোনো ধারণা করবেন না, স্যার। তিনি ছিলেন সৎ, ধর্মভীরু একজন মানুষ। নিজের পরিশ্রমের অন্ন ছাড়া আর কিছু কোনোদিন মুখে তোলেননি।' বলতে-বলতে দরিয়ার গলা ধরে এল।

বুধোদা সঙ্গে সঙ্গে ওকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমি ওঁকে অসৎ বলতে চাইনি, দরিয়া। আমাকে ভুল বুঝো না। অনেক মূল্যবান জিনিসের উৎস সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। আমি সেই কথাই বলছিলাম।'

হঠাৎ গির্জার ভেতরে একটা আলো জ্বলে উঠল। দেখলাম আমাদের গলার আওয়াজ পেয়েই সম্ভবত এক বৃদ্ধ ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তিনিই সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়েছেন।

ঘরটা সাধারণ ঘরের থেকে উচ্চতায় কিছু বেশি, কিন্তু দৈর্ঘে-প্রস্থে ত্রিশ ফুটের বেশি হবে না। ইতস্তত খান-দশেক ভাঙা আধভাঙা কাঠের চেয়ার পড়েছিল। দেয়ালে কিছু ফ্রেমে বাঁধানো ছবি টাঙানো ছিল। তার মধ্যে অনেকগুলোই পেরেক খুলে ঝুলছে।

এটাই বোধহয় প্রার্থনা-কক্ষ।

যেমন সাধারণ গির্জা, তেমনই সাদামাটা তার প্রার্থনাকক্ষ। সারা দেয়ালে নোনার দাগ। কাচের শার্সির অর্ধেক ভাঙা। আর পুলপিট—যেখানে যিশু কিংবা মা-মেরীর ছবি, মূর্তি ইত্যাদি থাকে—সেটার হালও খুব করুণ। কয়েকটা মেটালের মোমদান, জলপাত্র আর বাইবেল রাখার র‍্যাক ছাড়া আর কিছুই নেই।

দেখে মনে হল আজ পরিত্যক্ত হয়েছে বলে নয়, এই গির্জাটার কোনোকালেই তেমন কোনো কৌলীন্য ছিল না। হয়তো কলকাতা বন্দরে যে ভিনদেশি নাবিকেরা নামত, তাদের প্রার্থনার জন্যে একদিন এই গির্জা বানানো হয়েছিল। মাঝিমাল্লাদের উপাসনালয়, সে আর অসাধারণ হবে কেমন করে?

যিনি আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন তিনিই নিশ্চয়ই ফাদার রেনল্ড। শ্বেতাঙ্গ বৃদ্ধ। ছ-ফুটের ওপরে হাইট। মাথা জোড়া টাক। বয়স সত্তর-পঁচাত্তর। নীল চোখের তারা, বয়সের ভারে একটু ঘোলাটে হয়ে গেছে। গায়ে একটা রংচটা স্লিপিং-গাউন। পায়ে রাবারের চটি।

দরিয়াকে দেখে তাঁর মুখে অকৃত্রিম আনন্দের হাসি ফুটে উঠল। পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'কীরে বেটা, এত দেরি হল যে আসতে? বোধিসত্ত্ববাবু আর রুবিককে তো আবার উত্তরপাড়া অবধি ফিরতে হবে, নাকি?'

দরিয়া মুচকি হেসে বলল, 'ফিরতেই হবে তার তো মানে নেই। সেরকম হলে দু-পা দূরেই তো তাজবেঙ্গল। সেখানেই রাতটা থেকে যাবেন।'

'আর তুই কোথায় থাকবি? তাজের উল্টোদিকে?'

ফাদারের রসিকতায় আমরা সকলেই হেসে উঠলাম। তাজ-বেঙ্গলের উল্টোদিকে যে চিড়িয়াখানা সেটা সবাই জানে। এটাও বুঝলাম, দরিয়ার সঙ্গে ফাদারের সম্পর্কটা প্রায় দাদু-নাতির মতোই।

দরিয়াও হাসতে-হাসতে ফাদারের হাতে একটা ওষুধের শিশি ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'কদিন থেকে আপনার কাশিটা আবার বেড়েছে। এই কাফসিরাপটা নিয়ে এলাম। খাবেন।'

উনি দরিয়ার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'ঈশ্বর তোর মঙ্গল করুন। তুই আমাকে ওষুধ খাওয়ার হাত থেকে রেহাই দিচ্ছিস না। যাই হোক, তুই চেয়ারগুলো ঝেড়েঝুড়ে ভদ্রলোকদের বসা। নিজেও বোস। তারপর আমি যা বলার বলছি।'

আমরা সবাই বসার পরে দরিয়া আলাপ করিয়ে দিল, 'ইনি ফাদার রেনল্ড। ওঁর আসল কাজের জায়গা মুম্বইয়ে। তবে আমার জন্যেই এখন কিছুদিন এখানে এসে উঠেছেন। কত কষ্ট করে আছেন বুঝতেই পারছেন। জায়গাটা তো জঙ্গল হয়ে পড়েছিল। সাপখোপ, বিছে...'

দরিয়ার কথায় বাধা দিয়ে ফাদার বললেন, 'ওর কথায় কান দেবেন না। আমি আসছি শুনে একদিনের মধ্যে দরিয়া সব জঞ্জাল সাফ করিয়ে দিয়েছে। এমনকী ভেতরের ঘরে গেলে দেখবেন, এই সন্ন্যাসীর জন্যে একটা নরম ফোমের বিছানা অবধি সেট করে দিয়েছে। কী আর বলব! ওর বাপের মতনই দিলদার হয়েছে।'

এই বলে ফাদার রেনল্ড কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে বসে রইলেন। তারপর হঠাৎ মুখ তুলে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দরিয়া আমাকে একটা দায়িত্ব দিয়েছে। সেটা আর কিছুই না, আপনাদের আজ কেন এখানে ডেকে এনেছি, সেটা ব্যাখ্যা করে বলা।'

বুধোদা বলল, 'আপনি ডেকেছেন? ফাদার, আমি এতক্ষণ ভাবছিলাম দরিয়া নিজেই...।'

উনি বললেন, 'না, আমিই ওর মুখে আপনার কথা শুনে ওকে বলেছিলাম, ওহে গর্দভ। বোধিসত্ত্ববাবু তোমাকে ভালোবাসেন বলছ। অথচ তোমার বাবা তোমার জন্যে যে মূল্যবান বস্তুটি লুকিয়ে রেখে গেছেন, তার খোঁজটা ওঁকে দিয়ে করাবার বুদ্ধি তোমার মাথায় আসছে না?

'তো, তাতে এই গাধাটা বলে কী, ফাদার আমার খুব সঙ্কোচ হয়। জানেন বোধিসত্ত্ব, আমি লোকের মুখে শুনেছি এই দরিয়া নাকি ভালো ছেলে নয়। ও ভায়োলেন্সের সঙ্গে জড়িত। মানুষ ওকে ভয় পায়। এই সবই হয়তো সত্যি। কিন্তু এটাও সত্যি যে, দরিয়ার ভেতরে আরেকটা দরিয়া রয়েছে, যে অন্যরকম মানুষ।

'ওই যে পেছনের বস্তিটা পেরিয়ে এলেন, ওই বস্তির প্রায় প্রত্যেকটা বাড়িতে দরিয়া ভগবান। যতরকম ভাবে পারে ও ওদের সাহায্য করে।

'আপনি শুনেছেন নিশ্চয়ই, দরিয়ার বাবা দীনেশ মুম্বইয়ের এক মাছধরা ট্রলারে চাকরি করত। একেবারেই গতর খাটানোর কাজ। রোদ, বৃষ্টি, হিম-কুয়াশা কিংবা ঝড় সবকিছুর মধ্যে খোলা ডেকে দাঁড়িয়ে মেশিন-চালিত ফিশ-নেট অপারেট করত দীনেশ। গভীর সমুদ্র থেকে প্রথমে সেই বিশাল জাল টন-টন মাছ টেনে নিয়ে ট্রলারের গায়ে এসে লাগত। তারপর ক্রেনে করে সেই মাছভর্তি জাল তুলে নেওয়া হতো ট্রলারের ডেকে। অল্প বাছাইয়ের পরে ডেকের নীচের কোল্ড-স্টোরেজে সেই মাছ খালি করে আবার জাল ফেলা হতো সমুদ্রে। সেই কাজটাই করত দীনেশ।

'আমি যখন ধর্মপ্রচারের জন্যে ভারতে এসেছিলাম, তখনই দীনেশের সঙ্গে আমার আলাপ। ও সময়-সুযোগ পেলেই আমাদের চার্চে প্রার্থনা জানাতে আসত। তখন আমার বয়স পঞ্চাশ আর ওর বয়স বোধহয় চল্লিশ।

'আমি নিজেও ওর আমন্ত্রণে ট্রলারে করে পনেরো-দিন কিংবা একমাসের জন্যে সমুদ্রযাত্রা করেছি। বুঝতেই পারছেন, নিজের চোখে ওকে কাজ করতে দেখেছিলাম বলেই এত ডিটেলে আপনাকে বলতে পারছি।

'তখনই একটা কথা বুঝেছিলাম। বুঝেছিলাম কাজ করতে-করতে দীনেশ যেভাবে সমুদ্রকে চিনে নিয়েছে, সেটা অনেক বুড়ো মাছুয়াড়ার কাছেও স্বপ্ন। এত বড় সমুদ্র। তার কোথায় কখন মাছের ঝাঁক জলের ওপরতলায় ভেসে উঠছে সেটা বুঝতে না পারলে সারাদিন জাল টানলেও মিলবে লবডঙ্কা। ঋতু অনুযায়ী, হাওয়ার গতিপথ অনুযায়ী, জলের টেম্পারেচার অনুযায়ী মাছেদের গতিপথ বদলে যায়। আর ওই মাছের ঝাঁকের মতিগতি বোঝার কোনো যন্ত্র নেই। ওটার জন্যে জেলেদের বংশানুক্রমে অর্জিত গোপন হিসেব-নিকেশ আছে।

'দীনেশ ছিল এ-ব্যাপারে মাস্টার। এক বৃদ্ধ মেট তখন ওকে ছেলের মতন ভালোবেসে এসব শেখাতেন। তিনি নাকি আবার বহুদিন জাপানের তিমি শিকার করার জাহাজে কাজ করেছিলেন। মোদ্দা কথা হচ্ছে, দীনেশকে নিয়ে তখন বোম্বের বিভিন্ন ট্রলারের মালিকদের মধ্যে টানাটানি চলত। দীনেশ ট্রলারে থাকা মানেই মাছের আমদানি দ্বিগুণ হয়ে যাওয়া। তাতে যে দীনেশ বড়লোক হয়ে গেল তা কিন্তু ভাববেন না। বড়লোক হতো মালিকরা। ও হয়তো বাঁধা-মাইনের ওপরে আর দু-একশো টাকা বেশি পেত। তাতেই ও খুশি ছিল। ও বলত, ফাদার, যদি দেওয়ার হয় ভগবান আমাকে ঠিক দেবেন।

'তারপরে টানা পনেরো বছর দীনেশের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল আমাদের মধ্যে। জানতাম কলকাতায় ওর বউ আর বাচ্চা ছেলে আছে। বছরে দু-বার এখান থেকে ঘুরে যেত আর আমার কাছে গল্প করত দরিয়া কত বড় হল, দরিয়া পড়াশোনায় কত ভালো হয়েছে, স্ট্যান্ড করেছে, এইসব। বলত, যদি নিজের একটা ট্রলার কেনার মতন টাকা থাকত ফাদার, আর একটা ছোট বাড়ি, তাহলে বউ আর ছেলেকে এখানে নিয়ে চলে আসতাম।

'জানতাম এটা ওর অসম্ভব স্বপ্ন। মুম্বইয়ের মতন কস্টলি জায়গায় একটা ট্রলার আর একটা বাড়ি কিনতে গেলে ওর মতন মাছমারাকে লটারির ফার্স্ট-প্রাইজ পেতে হবে। তাছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

'হঠাৎ একদিন ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হয়ে ও দৌড়তে-দৌড়তে আমাদের গির্জায় এসে ঢুকল। আগের পনেরোদিন আসেনি। সমুদ্রে যাচ্ছে বলেই গিয়েছিল। সেদিন এল সন্ধেবেলায়। সেদিন দীনেশের গা থেকে ঘাম আর সমুদ্রের আঁশটে জলের গন্ধ ছাড়ছিল। ও সোজা আমার থাকার ঘরে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল। তারপর দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ পাল্লার ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকিয়ে কী যেন দেখল।

'আমি বললাম, কী হয়েছে দীনেশ?

'ও বলল, ফাদার। আপনাকে বলেছিলাম না, আমি যদি ভালোমানুষ হই, আমি যদি জীবনে কারুর অমঙ্গল না চেয়ে থাকি, তাহলে ঈশ্বর আমার যা প্রয়োজন তা আমাকে দেবেন। দিয়েছেন ফাদার, ঈশ্বর আমাকে দিয়েছেন! কিন্তু ওরা সেটা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চাইছে। আমি বললাম, শান্ত হয়ে বসো। বলো কী পেয়েছ। ও বলল, না। আপনাকে বলব না। বললে আপনারই বিপদ বাড়বে। আমি আর আপনার কাছে আসব না। আমি পালাই ফাদার, পালাই।

'এই বলে যেমন এসেছিল, তেমনই পাগলের মতন বেরিয়ে গেল।

'তিনদিন বাদে খবর পেলাম, ও খাঁড়ির ওপর থেকে পড়ে গিয়ে পাথরে লেগে মাথা ফাটিয়েছে। সরকারি এক হাসপাতালে ভর্তি আছে, আমাকে

খবর দিতে বলেছে।

'দৌড়ে গেলাম। মাথায় মস্ত এক ব্যান্ডেজ নিয়ে শুয়েছিল। আমি বেডের পাশে বসে হালকা মুডেই বললাম, তুমি তো নেশাভাং করো না। খাঁড়ির ওপর থেকে পা পিছলাল কেমন করে?

'ও বলল, পা পিছলায়নি তো, ওরা মেরে মাথা ভেঙে দিয়েছে। বলেছে, হাসপাতাল থেকে বেরোলে খুন করবে, যদি জিনিসটা ওদের হাতে তুলে না দিই।'

বুধোদা চেয়ারে সিধে হয়ে বসল। আমিও। একবার দরিয়ার দিকে তাকালাম। দেখলাম ও মাথা নীচু করে নখ খুঁটছে। অর্থাৎ, এই সবই ওর জানা। সম্ভবত ফাদার রেনল্ডের কাছ থেকেই শুনেছে।

বুধোদা বলল, 'কিন্তু জিনিসটা কী, সেটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন, সেসব কিছুই দীনেশবাবু আপনাকে বললেন না!'

ফাদার বললেন, 'আমি জিগ্যেস করেছিলাম। ওর সেই এক-কথা। আপনি জানা মানেই আপনার বিপদ। আপনাকে বলব না।'

'তারপর?'

'সব শোনার পর আমিই ওকে পালাবার প্ল্যান দিলাম। আমাদের চার্চের একটা প্রোগ্রাম ছিল, শহরের কিছু সরকারি হাসপাতালে গরিব পেশেন্টদের জন্যে ফল, মিষ্টি এইসব পৌঁছে দিতাম। দীনেশ যে-হাসপাতালটায় ছিল, সেই হাসপাতালেও প্রতিদিন সকালে খাবার সাপ্লাই করার ঢাকা-ভ্যানটা আসত। আমি ডাক্তারবাবুকে বলে-কয়ে একদিন আগে ওর ছুটি করিয়ে নিলাম। তারপর সকালেই ওকে ভ্যানে চাপিয়ে সোজা বোম্বে ভিটি। সেখান থেকে কলকাতা। কোনো সমস্যা হয়নি।

'হাওড়া স্টেশনে নেমে দীনেশ বলল, আমি এখন বাড়ি যাব না। কিছুদিন আমাকে শেল্টার দিন।

'আমি বললাম, ঠিক আছে। চলো, তোমার বাড়ির কাছেই তো যাচ্ছি। আমাদের সেন্ট মাইকেলস চার্চ আছে ওখানে। যদিও অ্যাবানডনড, তবু তোমার কাছাকাছি থাকব বলে আমি ওখানকার চাবি নিয়ে এসেছি। সমস্যা একটাই, তুমি যতদিন থাকবে আমাকেও ততদিনই থাকতে হবে। চার্চের চাবি আমাকে ফেরত নিয়ে যেতে হবে কিনা।

'ও একটু চিন্তা করে বলল, এক-সপ্তাহের বেশি থাকব না ফাদার। এক-সপ্তাহের মধ্যে মাথার ব্যান্ডেজটা খুলে ফেলতে পারব। তাহলে বাড়ির লোকেরা আমাকে দেখে চমকাবে না।

'আমি শুনে একটু হেসেছিলাম শুধু। আপনি তো নিশ্চয় জানেন বোধিসত্ত্ব, আমাদের মতন পাদ্রিদের দেখতে বোকাসোকা হলেও, আমাদের বুদ্ধির অভাব হয় না। ফাদার ব্রাউনের গল্পগুলো পড়লেই সেটা বুঝতে পারবেন।'

ফাদারের কথা শুনে আবার আমরা তিনজনেই হেসে ফেললাম। বুধোদা বলল, 'ফাদার রেনল্ড, আপনাকে দেখতেও অত্যন্ত শার্প। মোটেও বোকাসোকা নন। কিন্তু এ-প্রসঙ্গ আনলেন কেন?'

ফাদার বললেন, 'আনছি এই-কারণে যে, দীনেশ ভেবেছিল আমি বিশ্বাস করে নেব মাথার ব্যান্ডেজ আছে বলেই ও বাড়ি ফিরছে না। ও যে ওর সেই দামি-জিনিসটি লুকোনোর জন্যে কলকাতার এখানে-ওখানে নিজের কাঁধব্যাগটা নিয়ে সারাদিন ঘুরে বেড়াচ্ছে সেটা কি আমি বুঝব না?'

'তারপর কী হল?' ধৈর্য ধরতে পারছিলাম না।

ফাদার বললেন, 'ঠিক এক-সপ্তাহের মাথায় দীনেশ ব্যান্ডেজ খুলে, চুলটুল কেটে, দাড়ি কামিয়ে হাজির। সকালে বেরিয়ে গিয়েছিল। ফিরল দুপুরে। ভক্তিভরে ওই পুলপিটের মোমদানিতে মোমবাতি জ্বালাল। হাঁটু মুড়ে বসে প্রার্থনা করল। তারপর আমাকে বলল, চলুন ফাদার। আজ দুপুরের খাবারটা আমার বাড়িতেই খাবেন।

'শুনে আমি লাফিয়ে উঠলাম। বললাম, তুমি বাড়ি যাচ্ছ? তাহলে আমিও দুপুরের ট্রেনটা ধরে নিই দীনেশ। কিছু মনে কোরো না। মুম্বাই থেকে জরুরি কল এসেছিল, তোমাকে বলিনি। ইথিওপিয়ায় মড়ক লেগেছে। আমায় একটা টিম নিয়ে সেখানে যেতে হবে। তবে কথা দিচ্ছি, ভারতে ফিরেই আমি

তোমার বাড়ি আসব। তোমার বউ-বাচ্চার সঙ্গে দেখা করে যাব।

'দীনেশ তাই শুনে কেঁদে ফেলল। আমার সম্বন্ধে অনেক ভালো-ভালো কথা বলল। যারা নিজেরা ভালো, তারা অন্যদেরও ওইরকম ভালোই দেখে।

'যাই হোক, ইথিওপিয়ায় চলে যাওয়ার পর দীনেশের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। মুম্বইয়ে ফিরেছি গতমাসে। ফেরার পর থেকেই মনে হচ্ছিল দীনেশের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি। ভেবেছিলাম, এসে দেখব ও ওর সেই ঈশ্বরের দানে নিজের অবস্থা ফিরিয়ে নিয়েছে। স্বপ্নেও ভাবিনি যে এমন দুঃসংবাদ অপেক্ষা করছে আমার জন্যে।'

ফাদার রেনল্ড মুখটা নামিয়ে নিলেন, সম্ভবত চোখের জল আড়াল করার জন্যে। আমরাও আর কী বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না।

কিছুক্ষণ বাদে বুধোদা বলল, 'ফাদার, কয়েকটা কথা জিগ্যেস করি। আপনার কথা থেকে মনে হচ্ছে, অন্তত কয়েকটা দিন দীনেশবাবুর সেই গুপ্তধন এই চার্চের মধ্যেই ছিল। আপনিও ছিলেন এখানে। আপনার কোনো আইডিয়া নেই, জিনিসটা কী?'

ফাদার রেনল্ড খুব পরিষ্কার গলায় বললেন, 'না। কারণ, আমার সামনে দীনেশ একবারও ওর সেই কালো কাঁধব্যাগ খোলেনি। আর ও নিজে থেকে না দেখালে আমি চুরি করে ওর ব্যাগ খুলে দেখব, এ তো হয় না।'

'ঠিকই। তবু কোনো আইডিয়া?'

ফাদার রেনল্ড যা উত্তর দিলেন তাতে আমাদের কারুরই বুঝতে অসুবিধে হল না যে, ভদ্রলোক ইচ্ছে করলে ফাদার ব্রাউনের মতন ডিটেকটিভ হয়ে উঠতে পারতেন। অসামান্য পর্যবেক্ষণ-শক্তি এবং স্মৃতিশক্তি ।

বললেন, 'বাইরে থেকে ব্যাগটা দেখে যা-যা মনে হয়েছিল, বলি। প্রথমত ভেতরের জিনিসটা ভঙ্গুর ছিল না। যদি তাই হতো, তাহলে দীনেশ ওটাকে কাঁধ থেকে মেঝেতে নামানোর সময় সাবধানতা নিত।'

'দুই, জিনিসটার আয়তন ছিল ধরুন তিনটে একপাউন্ড পাঁউরুটির ওপরে আরও তিনটে একপাউন্ড রুটি যদি সাজিয়ে রাখেন, তাহলে যতটা আয়তন হবে, ততটাই। ওর কাঁধব্যাগটায় বড়জোর অতটুকু মালই ধরত।'

'তিন, জিনিসটার ওজন ছিল যথেষ্ট। ব্যাগটা ওঠানো নামানোর ধরন দেখেই বোঝা যেত।'

'আর চার, এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যেদিন দীনেশ এখান থেকে চলে গেল, সেদিন ও ফিরেছিল ফাঁকা ব্যাগ নিয়ে। তার মানে সেই গুপ্তধন ও এখানেও রাখেনি, নিজের বাড়িতেও রাখেনি। বাড়িতে তো পা দেয়নি তখনো। তাহলে রাখল কোথায়?'

বুধোদা দাড়ির মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে বলল, 'আপনি যা যা বললেন, তা নোটের বান্ডিলের সঙ্গে খুব সুন্দর মেলে। তবু ধরে নিচ্ছি নোটের বান্ডিল ছিল না, কারণ তাহলে ওই ব্যাগ কাঁধে নিয়ে দীনেশবাবু ট্রামে বাসে চেপে ঘোরার সাহস পেতেন না। তাহলে কী ছিল এবং সেটা উনি কোথায় রাখলেন?'

ফাদার রেনল্ড একটু হতাশ গলায় বললেন, 'সোনার বাট ছিল না বলছেন?'

বুধোদা অবাক হয়ে বলল, 'আমার তো তাই মনে হচ্ছে। কেন মনে হচ্ছে বলছি। রুবিক তোর কি মনে আছে সোনার মাস-ডেনসিটি কত।'

আমি বললাম, 'নাইনটিন-পয়েন্ট-থ্রি গ্রাম পার কিউবিক সেন্টিমিটার।'

'আর সীসে মানে লেডের?'

আমি বললাম, 'এগজ্যাক্টলি মনে পড়ছে না। তবে বারোর আশেপাশে হবে।'

বুধোদা ফাদারের দিকে ফিরে বলল, 'তাহলে বুঝতে পারছেন, যে সীসেকে আমরা ভীষণ ভারী ধাতু বলে জানি, সেই সীসের থেকেও অনেক ভারী হচ্ছে সোনা। ছ'টা ফুল-পাউন্ড পাঁউরুটির মাপের সোনার বাট একজন মানুষের পক্ষে কাঁধে নিয়ে ক্যাজুয়ালি ঘুরে বেড়ানো অসম্ভব। কিন্তু আপনাকে এত হতাশ দেখাচ্ছে কেন ফাদার?'

উত্তরে ফাদার রেনল্ড যা বললেন, তাতে আমরা তিনজন আরেকবার টান হয়ে বসলাম। বললেন, 'আসলে সেই-সময়টার কথা ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ গতকালই একটা কথা স্মৃতিতে ফিরে এল। মনে পড়ল, সেদিন দুপুরবেলায় বাইরে থেকে ফিরেই দীনেশ খুব খুশি-খুশি মুখে একটা কথা বলেছিল। বলেছিল, যাক। দরিয়ার সোনা যাতে দরিয়ার হাতেই পৌঁছয় তার ব্যবস্থা করে ফেললাম। মাঝের সময়টা ঈশ্বর সেই সোনার পাহারায় রইলেন।'

বুধোদার চোয়ালদুটো শক্ত হয়ে উঠল। বলল, 'আরেকবার বলুন তো ফাদার। আরেকবার বলুন। দয়া করে যেমনটি উনি বলেছিলেন ঠিক সেইভাবেই বলবেন। কিছু বাদ দেবেন না, কিছু যোগও করবেন না।'

ফাদার রেনল্ড দুই হাতের বুড়ো-আঙুলে দুটো রগ টিপে ধরে, চোখ বন্ধ করলেন। তারপর বললেন, 'না। কোনো ভুল নেই। একটু আগে ঠিক যা বললাম, তাই। ও বলেছিল—যাক। দরিয়ার সোনা যাতে দরিয়ার হাতেই পৌঁছয় তার ব্যবস্থা করে ফেললাম। মাঝের সময়টা ঈশ্বর সেই সোনার পাহারায় রইলেন। সেইজন্যেই বলছিলাম বোধিসত্ত্ব, আপনি কি নিশ্চিত যে জিনিসটা সোনা ছিল না?'

বুধোদা কথাগুলো মোবাইলে রেকর্ড করছিল। ফাদার থামতেই মুখ তুলে বলল, 'আপনি যা বললেন, তাতে তো এরকম একটা সম্ভাবনা ফের মাথায় উঁকি মারছে। হতে পারে সোনার বাট নয়, অন্য কিছুর ওপরে সোনার আস্তরণ দেওয়া ছিল। তাছাড়া ওই কথাগুলো, ঈশ্বর পাহারায় রইলেন। কোথাকার ঈশ্বর? এই চার্চেরই নয় তো? আপনার অলক্ষে উনি কখনও এই চার্চেই রেখে যাননি তো সেই গুপ্তধন? ফাদার। আপনি অনুমতি দিন, আমি একবার এই পুরো বাড়িটা ঘুরে দেখি।'

ফাদার রেনল্ড বললেন, 'সিওর। আমি তো চাই তুমি দেখো। খুঁজে বার করো। বাড়ি বলতে তো এই দুটো ঘর আর ওয়াশরুম। তবে...'

'তবে কী ফাদার?'

'আমার চোখের সামনেই বোম্বে-গ্যাং যেভাবে তিনটে ঘরই তন্নতন্ন করে দেখে গেল, তোমরা কি তার থেকে বেশি কিছু করতে পারবে?'

'তবু একবার দেখি। দরিয়া, রুবিক তোমরাও নিজেদের মতন করে দেখো। শুধু চোখ দিয়ে নয়, দিমাগ দিয়ে দেখো।'

তিনটে ঘরে সার্চিং-এর কাজটা সারতে আমাদের প্রায় পঁয়তাল্লিশ-মিনিট সময় লাগল।

প্রেয়ার-হল এবং তার লাগোয়া ফাদারের থাকার ঘর—এই দুটো ঘরের প্রতিটি জিনিসই খুব মন দিয়ে দেখলাম। বুধোদার ভাষায়, দিমাগ দিয়ে। কিন্তু দামি তো দূরের কথা, একটা জিনিসও খুঁজে পেলাম না যেটা কোনো ভাঙা টিন-লোহার ফেরিওলা কিনতে রাজি হবে।

প্রেয়ার-হলে কী কী ছিল আগেই বলেছি। লোহা আর পেতলের তৈরি ছ'টা মোমদান। কোনটা লোহা আর কোনটা পেতল তফাত করা মুশকিল। কারণ পেতলের ওপর বহু-বছরের কলঙ্ক পড়ে তাদের ঔজ্জ্বল্য বলতে কিছু অবশিষ্ট ছিল না। ভেতরের মোমবাতিগুলোরও একই দশা। সাদা মোমের ওপরে বহু বছরের ধুলো জমে ক্যান্ডেলগুলোর রঙ কালো হয়ে গিয়েছিল। তবু বুধোদা সেই মোমদানগুলোই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে, দরিয়াকে বলল, 'এগুলো কি সোনা বা প্ল্যাটিনাম হতে পারে?'

দরিয়া বলল, 'না স্যার। আমি চেনা জুয়েলারকে দিয়ে টেস্ট করিয়ে নিয়েছি।'

বুধোদা এদিক-ওদিক পায়চারি করতে-করতে আপনমনে বলছিল, 'ফার্নিচারগুলো পুরনো ঠিকই, কিন্তু লোকাল ছুতোরের বানানো। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এদের দাম কমেই যায়, বাড়ে না।'

'দেয়ালের ছবিগুলোও তাই বুধোদা। ক্যালেন্ডার কেটে সস্তার ফ্রেমে বাঁধানো। যিশুর মূর্তি প্লাস্টার অফ প্যারিসের।'

বুধোদা এবার পুলপিটের বাঁদিকে বইয়ের র‍্যাকটার সামনে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল। বই বলতে দুটো ইংরিজি বাইবেল আর চারটে বাংলা প্রার্থনা-সঙ্গীতের সংগ্রহ। সবই ত্রিশ-চল্লিশ বছরের পুরোনো এডিশন, কলেজস্ট্রিটে ছাপা। কোনোমতেই অ্যান্টিক নয়। তবু বুধোদা দশ-মিনিট ধরে প্রতিটি বইয়ের প্রত্যেকটা পাতাই শুধু নয়, মলাটের ভেতরে কী আছে তাও চেক করে দেখল। ছাপা অক্ষর ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

আর ছিল একটা চামড়ায় বাঁধানো বিশাল খাতা। সেই কুকড়াঝোরার

নেকড়ে-মানুষের ঘটনার পর থেকেই আমি জানি, প্রতিটি চার্চে এরকম একটা খাতা থাকে। যতটা অঞ্চলের ওপরে একটা চার্চের এক্তিয়ার, সেই অঞ্চলের মধ্যে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী সমস্ত পরিবারের প্রতিটি জন্ম-মৃত্যুর রেকর্ড ওই খাতায় লেখা থাকে। বুধোদা খাতাটার শেষ পাতার এন্ট্রিটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল। দশ-বছর আগের একটা তারিখ। জনৈক স্যামুয়েল অশোক মণ্ডল, বোঝাই যাচ্ছে ভদ্রলোক ছিলেন এদেশিয় খ্রিস্টান, ওইদিনে মারা গিয়েছিলেন।

বুধোদা বলল, 'সম্ভবত তারপর থেকে এখানে আর খ্রিস্টান নেই। তাই চার্চও অ্যাবানডনড হয়ে গেছে।'

ফাদার রেনল্ড বললেন, 'আপনার অনুমান একদম ঠিক।'

খাতাটার মধ্যে আরও কিছু তথ্য ছিল। যেমন চার্চকে যদি কেউ টাকা-পয়সা, জামাকাপড় কিংবা কোনো প্রার্থনার সামগ্রী দিয়ে থাকেন, তাহলে দাতার নাম-সমেত তার একটা তালিকা। আমরা সেই তালিকাটাও দেখলাম। মনে হল দান হিসেবে যা-যা এসেছিল, ওই কাঠের ফার্নিচার, নানারকমের মোমদানি আর জলপাত্র কিংবা চেয়ার-টেবিল, সবই এই দুটো ঘরেই আছে। কিছুই হারায়নি।

ফাদারের থাকার ঘর আর ওয়াশ-রুমে কিছুই ছিল না। একেবারে ন্যাড়াবোঁচা দুটো ঘর।

সেইজন্যেই বুধোদা কনফিডেন্টলি বলল, 'না দরিয়া। এই চার্চের মধ্যে দামি কিছু নেই। মনে হয় দীনেশবাবু বাইরে কোথাও জিনিসটা রেখে এসেছিলেন। সেরকম জায়গার কথা কি তোমার জানা আছে দরিয়া, যেখানে উনি ওই সাত-দিনের মধ্যে গিয়ে থাকতে পারতেন?'

দরিয়া বলল, 'আমি স্যার মাকে জিগ্যেস করে আপনাকে বলব। এমনিতে বহুদিন মুম্বইয়ে থাকার কারণে বাবার এখানকার বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বলেই জানি। আর আত্মীয় তো আমাদের কেউ নেই। তবু মাকে জিগ্যেস করব।'

আমার মাথায় একটা সম্ভাবনার কথা ঘুরছিল। বললাম, 'বুধোদা, প্রথমে দীনেশবাবু ওটা যেখানেই রেখে থাকুন, এখনো সেখানেই থাকবে তার তো মানে নেই। দু-দিন পরে উনি সেটাকে বিক্রি করে দিয়ে থাকতে পারেন, তাই না?'

উত্তরটা দিল দরিয়া। বলল, 'না রুবিক। তাহলে আমাদের অবস্থা বদলে যেত। বাবার সমস্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিল মায়ের সঙ্গে। সেই সব অ্যাকাউন্টে একটাও বাড়তি পয়সা জমা পড়েনি। আমাদের দু-কামরার বাড়ি; তুমি দেখলেই বুঝতে পারবে সেখানে টাকা বা জিনিস কিছুই লুকিয়ে রাখার মতন জায়গা নেই। আর সবচেয়ে বড় কথা, বাবা যদি জিনিসটা ডিসপোজ করেই দিতে পারত, তাহলে তার প্রায় এক বছর বাদে আবার নতুন করে ওরা বাবার ওপরে হামলা করতে আসত না।'

আমি আর বুধোদা দুজনেই মেনে নিলাম দরিয়ার যুক্তি।

সেদিন আর বিশেষ কিছু হয়নি। না, ভুল বললাম। হয়েছিল।

বুধোদার গাড়িতে চেপে যখন আমি, দরিয়া আর ওর সেই বডিগার্ড আবার রিমাউন্ট-রোডের মোড়ে এসে পৌঁছলাম, তখন ঘড়িতে বাজে রাত এগারোটা সাতাশ। পেটে যদিও ছুঁচোয় ডন মারছিল, তবু বুঝতে পারছিলাম বিরিয়ানি খাওয়ার আশায় আজ চিটেগুড়।

ও মা! রিমাউন্ট-রোডের মুখে পৌঁছতেই একটা বিদেশি এস ইউ ভি আমাদের ওভারটেক করে সামনে দাঁড়াল। দরিয়া খুব বিনীতভাবে বলল, 'চলুন স্যার। আমার গাড়িটায় চলুন। আপনার গাড়িটা নাটা চালিয়ে নিয়ে আসছে।'

ওই সাড়ে ছ-ফিটের দৈত্যের নাম যে নাটা এটা শুনে নিশ্চয়ই হেসেই ফেলতাম, যদি না ও ঠিক আমার পাশেই বসে থাকত আর ওর কোলের ওপরে রাখা আগ্নেয়াস্ত্রের নলটা আমার পাঁজরে খোঁচা না মারত।

বুধোদাও সম্ভবত হাসি চাপবার জন্যেই অতিরিক্ত কর্কশ গলায় বলল, 'কেন দরিয়া? আবার গাড়ি বদলানোর কী দরকার? অনেক রাত হয়ে গেছে। এবার বাড়ি ফিরব।'

দরিয়া বলল, 'সেকি! খিদিরপুরে এসেছেন, এখানকার বিখ্যাত বিরিয়ানি না খেয়ে চলে যাবেন? শুনুন স্যার, আমি এখন আপনাদের যার হাভেলিতে নিয়ে যাচ্ছি, তিনি দিনে গোনাগুনতি পঁচিশজনের মতন বিরিয়ানি বানান কাঠের আঁচে আর এক-সপ্তাহ আগে থেকে বলে না রাখলে বাড়িতে ঢুকতেও দেন না। এঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন নবাব ওয়াজেদ আলি শার খাস বাবুর্চি। নবাবী রসুইঘরের সেই গোপন রেসিপিতে আজও ওখানে বিরিয়ানি আর কাবাব তৈরি হয়। সেই-অর্থে এই বিরিয়ানিও একরকমের অ্যান্টিক আর আপনি তো অ্যান্টিক হান্টার। কাজেই...'

কাজেই অসামান্য এক অ্যান্টিক-হান্টিং-এর মধ্যে দিয়ে আমাদের সেদিনের অভিযান শেষ হয়।

পরের দিনটা ছিল রবিবার। সকালে বইখাতা নিয়ে পড়তে বসেছিলাম, কিন্তু পড়া হচ্ছিল না। বুধোদা কাল খিদিরপুর থেকে উত্তরপাড়ায় ফেরার পথেই ফাদার রেনল্ডের ভয়েস রেকর্ডের অংশটুকু আমার ফোনে পাঠিয়ে দিয়েছিল। কাল রাত থেকে বার-দশেক সেটা শুনে মুখস্থ করে ফেলেছি।

'যাক। দরিয়ার সোনা যাতে দরিয়ার হাতেই পৌঁছয় তার ব্যবস্থা করে ফেললাম। মাঝের সময়টা ঈশ্বর সেই সোনার পাহারায় রইলেন।'

বুঝতেই পারছি, এটা ছিল দীনেশবাবুর তাৎক্ষণিক আনন্দের প্রকাশ। এটা গুপ্তধনের সঙ্কেত নয়। সেইজন্যেই তেমন জটিলতাও নেই কথাগুলোর মধ্যে। দরিয়া ওঁর একমাত্র সন্তান। সেইজন্যেই ওঁর জীবনের যা-কিছু অর্জন, তা সবই আসলে দরিয়ার। ওঁর সোনা মানে দরিয়ার সোনা।

আর ভেবেছিলেন, ওঁর নিজের মাথার ওপরে যদিও মৃত্যুর খাঁড়া ঝুলছে, তবু সেই সোনা ঠিকই দরিয়ার হাতে পৌঁছে যাবে। ওঁর অকালমৃত্যু ঘটলেও দরিয়ার সোনা দরিয়ার হাতেই পৌঁছবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে সোনাটা আসলে কী? 'সোনার কেল্লা' উপন্যাসে ফেলুদা তোপসেকে যে-কথাগুলো বলেছিল, সেগুলোই মনে পড়ে গেল। সোনা মানে তো চকচকে ধাতু নাও হতে পারে। সোনার মতন দামি অন্য কিছু হয় যদি!

ঈশ্বর সেই সোনার পাহারায় রইলেন। এই কথাগুলোও কি আক্ষরিক অর্থে নেওয়া উচিত? আমাদের কোনো আত্মীয় যখন বাড়ি ছেড়ে দূরদেশে যাত্রা করে তখন আমরা বলি, 'ঈশ্বর তোমার সঙ্গে থাকুন'। বলবার সময় কি ভাবি, সত্যিই ঈশ্বর তার পাশেপাশে সারাটা পথ হাঁটবেন? তা তো নয়। ভাবি অদৃশ্য এক ঈশ্বরীয় ক্ষমতা তাকে যাত্রাপথে আগলে রাখবে। এখানেও হয়তো দীনেশবাবু সেইভাবেই কথাগুলো বলেছিলেন। তাঁর গুপ্তধন যেখানেই থাকুক, অদৃশ্য এক মঙ্গল প্রভাব যেন সেই গুপ্তধনকে দুষ্কৃতিদের হাত থেকে রক্ষা করে, এইটুকুই হয়তো চেয়েছিলেন তিনি।

তাহলে আমাদের হাতে সেলফোন ছাড়া আর রইল কী? কিচ্ছু না।

এই কথা যখন ভাবছি তখনই আমার ফোনটা বেজে উঠল। বুধোদা। বলে উঠল, 'একবার আয়। জরুরি কথা আছে।' ফোনটা কেটে দিল।

টি-শার্টটা গায়ে গলিয়ে হেমকুঞ্জে হাজির হলাম। বুধোদা যথারীতি ওদের সেই মেহগনি পালঙ্কের ওপরে বালিশে হেলান দিয়ে বসেছিল। চারিদিকে রাশিকৃত বই, ক্যাটালগ আর ছবির প্রিন্ট। ওসব পেরিয়ে নিজের জায়গাটাতে কেমন করে পৌঁছয় সেটাই রহস্য। বুধোদা আমাকে দেখে বলল, 'শোন। দরিয়া একটু আগে ফোন করেছিল। এক ভদ্রলোকের নাম-ঠিকানা দিয়েছে, যিনি ছিলেন কলকাতায় ওর বাবার একমাত্র বন্ধু। মানে ওর মা ওকে তাই বলেছেন। তোকে ঠিকানাটা পাঠাচ্ছি।'

মেসেজটা সেন্ড করে বুধোদা মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল। বলল, 'আমাকে একটু বাদেই যেতে হবে এশিয়াটিক সোসাইটি। ওখানে একটা কনফারেন্স আছে। রাত আটটার আগে ফিরতে পারব না। এদিকে ঠিকানাটা তো দেখতেই পাচ্ছিস, দমদমের। তোকেই একবার যেতে হবে রুবিক। তুই একবার ভদ্রলোকের সঙ্গে মিট করে আয়। দেখ, কতটা কী ইনফর্মেশন উদ্ধার করতে পারিস।'

বললাম, 'ওকে। তুমি চিন্তা কোরো না। আমি এক-ঘন্টার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া করে বেরিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু বুধোদা...'

'কী?'

'এটা কেমন ঠিকানা? তরুণ সরখেল, রেডিও গলি, নাগের বাজার।'

বুধোদা বলল, 'দরিয়ার মায়ের যেটুকু মনে ছিল সেটুকুই বলেছেন। তার বেশি উনিই বা কী বলবেন? আমি তো ভদ্রলোকের ফোন-নাম্বারও চেয়েছিলাম। সেটাও দিতে পারেননি। তুই আজ একবার চেষ্টা করে দেখ। নাহলে আমি পরে একবার দেখব।'

চটপট বাড়ি ফিরে স্নান-খাওয়া সেরে রেডি হয়ে নিলাম। তবে আগেই সপ্তদ্বীপাকে ফোন করে জিগ্যেস করলাম, ও আমার সঙ্গে যেতে পারবে কিনা। বুধোদার সামনে যাই বলি, নিবেদিতা গার্লস স্কুলের এই ক্লাস নাইনে পড়া মেয়েটার ওপর সত্যিই ভরসা করা যায়। খুনি ম্যাজিক কিংবা অ্যান্টিক আতঙ্ক তার সাক্ষী। তাছাড়া পার্টিকুলারলি আজকে ও সঙ্গে থাকলে আমার যেটা সুবিধে হবে, সেটা হল নাগেরবাজারের ঘন বসতির মধ্যে একটা অ্যাড্রেস খুঁজে বার করার কাজটা একটু সহজ হবে।

সপ্তদ্বীপার বাড়ি বাগবাজারে। শুধু তাই নয়, ইদানিং ও একটা গ্রুপের সঙ্গে সারা উত্তর-কলকাতা জুড়ে পথ-নাটিকা করে বেড়াচ্ছে। তাই দমদমের রাস্তাঘাট ওর চেনা থাকাই উচিত।

যেরকম এক্সপেক্ট করেছিলাম, আমার প্রস্তাব শুনে প্রথমে একটু ভাও নিলেও, গুপ্তধনের কথা শুনেই ভয়ঙ্কর উৎসাহী হয়ে পড়ল। এতটাই উৎসাহী যে, জিগ্যেস করল সঙ্গে লঙ্কাগুড়োর স্প্রেটা নিতে হবে নাকি। আমিই বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিরস্ত করলাম। পরে অবশ্য মনে হয়েছিল, না করলেই হতো।

বিকেল সাড়ে-চারটের সময় আমরা দুজনে দমদম মেট্রো স্টেশনে মিট করলাম। সেখান থেকে অটোয় নাগেরবাজার পৌঁছনোটাও কঠিন হল না। কিন্তু তারপর রেডিও গলি খুঁজে বার করতে আমাদের ঘাম ছুটে গেল। গুগল-ম্যাপেও হদিশ নেই এমন একটা জায়গা। যাই হোক, শেষ অবধি সাড়ে-পাঁচটা নাগাদ দুজনে সেই গলির মুখে পৌঁছলাম। এর পরের স্টেপ তরুণ সরখেল মশাইয়ের বাড়ি খুঁজে বের করা।

যাকেই জিগ্যেস করি, সেই চোখ উলটে দেয়। এ তো ভারি সমস্যা। অবশ্য লোকজনকেই বা দোষ দিই কেমন করে? তারা জিগ্যেস করে, ভদ্রলোক কী করেন? বলতে পারি না। তারা জিগ্যেস করে, ভদ্রলোককে দেখতে কেমন? বলতে পারি না। তাহলে কোন সূত্র ধরে তারাই বা বলবে?

শেষ অবধি রেডিও গলির ভেতর থেকে বেরিয়ে যাওয়া এক তস্য-গলির ভেতরে এক ছাপাখানার বৃদ্ধ মালিক আমাদের বললেন, 'তোমরা কি পুতুল-কারখানার মালিক তরুবাবুর কথা বলছ? বছর পাঁচেক আগেও ওনার জন্যে পুতুলের প্যাকেট ছেপেছি। উনি থাকতেন নন্দীদের মাঠের পাশে। দেখবে, একটা টালির চালের ঘর আছে। পেছনের উঠোনে ওনার প্লাস্টিকের পুতুল বানানোর কারখানা ছিল।'

'থ্যাঙ্কিউ থ্যাঙ্কিউ দাদু।' বলে আমি আর দীপা দৌড়লাম নন্দীদের মাঠের দিকে। সেই মাঠ ঘিরে এখন যেভাবে চার-পাঁচতলা ফ্ল্যাটবাড়ি উঠেছে তাতে ভয় হচ্ছিল সেই টালির চালের ঘর কি আর থাকবে? কিন্তু আমাদের কপাল ভালো— ছিল। দামি ফ্ল্যাটবাড়িগুলোর মধ্যেই মুখ লুকিয়ে বসেছিল একটা জরাজীর্ণ টালির চালের ঘর।

ঘুণধরা দরজাটায় ধাক্কা দিতেও ভয় করছিল, যদি খুলে পড়ে যায়। তবে দু-চারবার নক করতেই ভেতর থেকে এক ভদ্রমহিলা দরজাটা অল্প ফাঁক করে বললেন, 'কে?'

দীপা আমার হাতে একটা টান মেরে সরিয়ে দিয়ে নিজে সেই ফাঁকটুকুর মধ্যে দিয়ে মুখ গলিয়ে বলল, 'আমি মাসিমা। সপ্তদ্বীপা রায়।'

দীপার একটা সুবিধে আছে, ওর মুখটা এতই ভালোমানুষের মতন যে, সেই মুখের দিকে একবার তাকালেই নাইন্টি-নাইন পার্সেন্ট মানুষ গলে যায়। এক্ষেত্রেও তাই হল। ভদ্রমহিলা দরজা পুরোটাই খুলে দিয়ে বললেন, 'ব্যাঙ্ক থেকে আসনি তো?'

দীপা ভারি অবাক হয়ে বলল, 'না তো। ব্যাঙ্ক থেকে আসব কেন?'

উনি বললেন, 'আর কেন মা? আমারই কপাল। তিনি তো হঠাৎ করে চোখ বুজলেন। আমার ঘাড়ে চাপিয়ে রেখে গেলেন তিন-লাখ টাকার ঋণের বোঝা। এখন দু-বেলা ব্যাঙ্কের লোকেরা তাগাদা দিয়ে আমার জীবন ওষ্ঠাগত করে দিচ্ছে।'

দীপা আমার দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। বুঝলাম ও-ও আমারই মতো ভাবছে, এখানে আর জানার কিছু নেই। তবু আমি বললাম, 'মাসিমা, তরুণমেসো কি...'

'চলে গেছেন। ঠিক তিন-বছর হল। তোমরা কোত্থেকে এসেছ বললে না তো?'

বললাম, 'খিদিরপুরে ওঁর এক বন্ধু ছিলেন, দীনেশবাবু। তাঁর ছেলের নাম দরিয়া। তিনিই আমাদের পাঠিয়েছিলেন একটা ব্যাপারে খোঁজ নেওয়ার জন্যে।'

'বলো কী ব্যাপার। আমার জানা থাকলে নিশ্চয় বলব।'

'ইয়ে মানে...' আমি যতক্ষণ মাথা চুলকোচ্ছি তারমধ্যেই সপ্তদ্বীপা বেশ গুছিয়ে প্রশ্ন করল, 'আটবছর আগে দীনেশবাবু কি আপনাদের বাড়িতে আসতেন?'

ভদ্রমহিলার চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, 'আটবছর হয়ে গেল নাকি? হ্যাঁ মা, আসতেন বইকি। তিনি তখন সবে বম্বে থেকে ফিরেছিলেন। ওই কারখানার উঠোনে মোড়া পেতে বসে দুই বন্ধু কত গল্প করতেন, আমাকে ঘড়ি-ঘড়ি চা বানিয়ে দিতে হতো। মনে হচ্ছে যেন এই সেদিনের কথা।'

দীপা বলল, 'মাসিমা, দীনেশবাবু ওনাকে দিয়ে, মানে আপনার হাসব্যান্ডকে দিয়ে কোনো কাজ করিয়েছিলেন?'

মাসিমার উত্তর দিতে দেরি হল না। বললেন, 'হ্যাঁ, করিয়েছিলেন। তবে কী কাজ বলতে পারব না। দীনেশ-ঠাকুরপো একটা কালো কাঁধব্যাগ নিয়ে আসতেন। সেটা নিয়েই দুজনে কারখানা ঘরে ঢুকে যেতেন। আমি ওদিকে কোনোদিনই পা বাড়াতাম না, তাই জানি না কী করতেন ওনারা।'

আমরা দুজনে প্রায় একসঙ্গেই বলে উঠলাম, 'আমরা একবার কারখানা-ঘরটা দেখে আসব?'

এমনিতে এরকম আবদারে কেউ কর্ণপাত করতেন কিনা জানি না, তবে সম্ভবত দীপার বড়-বড় চোখের ম্যাজিকে আর দীনেশবাবুর স্মৃতিতে উনি রাজি হয়ে গেলেন। ঘরের ভেতর থেকে একটা ছোট্ট চাবি নিয়ে এসে বললেন, 'ভেতরে কিন্তু বিছে সাপ এইসব থাকতে পারে। তিনবছর ঘরটা খোলা হয়নি। তোমাদের ফোনে টর্চ আছে তো? জ্বালিয়ে ঢুকবে।'

বললাম, 'আলো নেই?'

মাসিমা বললেন, 'না। ইলেকট্রিসিটি অফিস থেকে কারখানার লাইন কেটে দিয়ে গেছে। আগে তো ওখানে ইলেকট্রিকেই প্লাস্টিক গলানোর মেশিন চলত, ব্লোয়ার চলত। স্প্রে-পেন্টিং হতো। সেসব মেশিনে এখন ধুলো জমছে। বেচতেও পারব না। ব্যাঙ্কের থেকে লোন নিয়ে কেনা তো।'

মোবাইলের ফ্ল্যাশলাইট অন করে আমরা কারখানাটায় ঢুকলাম। ঢোকামাত্রই মুখে একগাদা মাকড়শার জাল জড়িয়ে গেল। তবু নাকে রুমাল জড়িয়ে আমরা পুরো ঘরটা তন্নতন্ন করে খুঁজলাম। কিন্তু মাসিমা যে অকেজো মেশিনগুলোর কথা বলেছিলেন সেগুলো বাদে আর কিছুই দেখতে পেলাম না। ও হ্যাঁ, কিছু রঙ না করা সাদা প্লাস্টিকের পুতুল ডাঁই করে রাখা ছিল একটা তাকের ওপরে। একবার খোলা দরজাটার দিকে তাকিয়ে তারই একটা টপ করে আমার ব্যাকপ্যাকে পুরে নিলাম। কী জানি, যদি এটাই কোনো মহামূল্যবান পদার্থ দিয়ে বানানো হয়।

তারপর আমরা মাসিমাকে অনেক ধন্যবাদ-টন্যবাদ দিয়ে আবার রেডিও গলিতে ফিরে গেলাম। ইতিমধ্যে অন্ধকার নেমে এসেছিল। যখন এসেছিলাম তখন খেয়াল করার প্রশ্ন ছিল না, কারণ তখন আকাশে শেষ-বিকেলের আলো ছিল। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, গলিটার ভেতরে হয় স্ট্রিট-লাইট নেই কিংবা থাকলেও সেগুলো কাজ করছে না। এদিকে পরপর দুটো ভুল টার্ন নেওয়ার পরে দেখলাম গলিটা অবিকল আমাজন নদীর মতন শাখা-প্রশাখায় ভাগ হয়ে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই।

দীপাও দেখলাম ডিরেকশন গুলিয়ে ফেলেছে। সবে পকেট থেকে অগতির গতি মোবাইলটা বার করে জি.পি.এস দেখতে যাচ্ছি, তখনই পেছনে কয়েকটা ভারী পায়ের আওয়াজ পেলাম। ঘাড় ফিরিয়ে দেখবার আগেই দুটো লোক আমার আর সপ্তদ্বীপার গলাদুটো মুঠোর মধ্যে চেপে

ধরে একটা বাড়ির দেয়ালে ঠেসে ধরল। এক-পলক দেখলাম, তৃতীয় আরেকটা লোক এগিয়ে আসছে।

'কেয়া মিলা?' আমার গলাটা টিপে ধরেছিল যে-লোকটা সে রুক্ষ গলায় প্রশ্ন করল। লোকটা জাত-গুন্ডা। অ্যামেচার হলে আমার নাগালের মধ্যে ওকে পেতাম এবং অন্তত একবার চেষ্টা করতাম হাঁটু ভাজ করে পেটে একটা জ্যাব বসাতে। কিন্তু এ পুরো হাতটা স্ট্রেচ করে শরীরটাকে যতটা সম্ভব দূরে রেখেছে।

আমি ওই অবস্থাতেই মাথাটা দু-পাশে নেড়ে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, কিছুই পাইনি। ইতিমধ্যে আমার চোখের সামনে কমলা আলোর ফুলকি ছোটাছুটি করতে শুরু করেছিল, যা আসলে চোখের শিরায় উঠে আসা রক্তের স্রোত। বুঝতে পারছিলাম না, এরা আমাদের মেরে ফেলতে চাইছে কিনা। কোনোরকমে হাত দিয়ে আমার ব্যাকপ্যাকটার দিকে ইঙ্গিত করলাম। অর্থাৎ তোমরা যা-খুঁজছ, তা ওর মধ্যেই আছে।

লোকটা গলার চাপটা একটু আলগা করল। তারপর মারাঠি ডায়ালেক্টে তৃতীয় লোকটাকে একটা কিছু বলতেই সে এগিয়ে এসে আমার পিঠ থেকে ব্যাকপ্যাকটা খুলবার চেষ্টা করল।

তারপরেই যে কী ঘটে গেল আমি এখনো ভালো করে মনে করতে পারি না। সপ্তদ্বীপাকে প্রশ্ন করে দেখেছি, ও-ও পারে না। শুধু এইটুকু মনে পড়ে, গলির বাঁক থেকে ঝড়ের বেগে এগিয়ে এল বিশাল-চেহারার একটা লোক। যে তিনজন আমাদের অ্যাটাক করেছিল তারা জাস্ট তিনদিকে উড়ে গেল।

নাটা। দরিয়ার বডিগার্ড। ওই চেহারা ভুল হবার নয়। আমার ব্যাকপ্যাকটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে নাটা চাপা গলায় বলল, 'মুভ মুভ মুভ। ফলো মি, ফলো মি।'

আমি ওর কথা শুনে দেয়ালের গা থেকে নিজেকে তুলে এগিয়ে যেতে গিয়ে একটু টলে গেলাম। দেখলাম সপ্তদ্বীপার অবস্থা আরও খারাপ। ও বসে পড়েছে মাটিতে। আর তখনই দ্বিতীয়বার দেখলাম নাটার শক্তির নমুনা। ও জাস্ট আমাদের দুজনকে দু-কাঁধে তুলে নিয়ে দৌড় লাগাল এবং আশ্চর্যজনকভাবে ঠিক আধ-মিনিটের মধ্যে বড়রাস্তায় পৌঁছে আমাদের প্রায় ঠেলেই তুলে দিল একটা দাঁড়িয়ে থাকা বাকেট-কারের মধ্যে। তারপর নিজেই ড্রাইভারের সিটে বসে স্পিড তুলল।

এবার দেখলাম নাটার ড্রাইভিং-স্কিল। ঠিক কোন গলিঘুঁজি ধরে যে ও মিনিট পাঁচেকের মধ্যে পাইকপাড়ায় এসে উঠল বুঝতেই পারলাম না। অবশ্য খুব একটা বোঝার মতন অবস্থাতেও ছিলাম না। গাড়ি চালাতে-চালাতেই নাটা বোধহয় রিয়ার ভিউ মিররে আমাদের অবস্থা দেখেছিল। একবার গাড়িটা দাঁড় করিয়ে জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দুটো চিলড কোল্ড-ড্রিঙ্কসের বোতল কিনে আমার আর দীপার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'গলায় আস্তে করে ঠান্ডা বোতলটা বুলিয়ে যান। থামবেন না। কোল্ড-কমপ্রেস দিলে ব্যথাও কমবে আর কালশিটের দাগটাও ফুটে উঠবে না।'

ঠিক তখনই আমার মোবাইলে একটা কল এল। আননোন নাম্বার। কলটা রিসিভ করতেই ওদিক থেকে চেনা-গলার স্বর ভেসে এল—'স্যরি ভাই রুবিক। নাটা জাস্ট দু-চার মিনিটের জন্য তোমাদের ট্র্যাক হারিয়ে ফেলেছিল। তারমধ্যেই এত কিছু ঘটে গেল। আবার বলছি, স্যরি।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'তুমি এতকিছু জানলে কেমন করে, দরিয়াদা? নাটাদা তো এরমধ্যে কাউকে ফোন করেনি।'

দরিয়াদা বলল, 'পেছনে দেখো, আমারই আরেকটা গাড়ি তোমাদের ফলো করছে। এরা মুম্বই-গ্যাং রুবিক। তাই আমি ভাগ্যের হাতে কিছুই ছাড়ছি না।'

বললাম, 'আমাদের কখন থেকে শ্যাডো করছ?'

'কাল রাতে যখন খিদিরপুর থেকে বেরোলে, তখন থেকে। এখনও এশিয়াটিক সোসাইটির সামনে আমার দুটো টিম দাঁড়িয়ে আছে। সেমিনার-হলে বোধি-স্যারের ঠিক পেছনে দুজন বসে আছে। বোধি-স্যার অবশ্য সে-কথা জানেন না। তুমি কিছু বোলো না, ওকে?'

'ওকে।'

'তোমার ফ্রেন্ডকেও এত কিছু বলতে যেও না। নাটা আগে ওকে বাগবাজারের বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে তারপর তোমাকে উত্তরপাড়ায় পৌঁছে দিয়ে আসবে, ঠিক আছে?'

আমি আড়চোখে একবার দীপার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বললাম, 'ওকে।ওকে।'

দরিয়া বলল, 'গুডনাইট।'

ফোনটা রেখে দিতে যাচ্ছিল। আমি তাড়াহুড়ো করে বললাম, 'কিন্তু দরিয়াদা, এভাবে কতদিন সবাইকে বাঁচিয়ে রাখবে? ফাদার রেনল্ড, তোমার মা এঁরা সকলেই তো একলা থাকেন।'

দরিয়াদা বলল, 'আরে, ও নিয়ে ভেব না। আমি ওদের সঙ্গে আজ রাতেই মিটমাট করে নিচ্ছি। ওদের বলে দিয়েছি, আজ রাত দুটোয় কন্টেনার-ইয়ার্ডে এসে দাঁড়াতে। বাবা মুম্বই থেকে যা নিয়ে এসেছিলেন, তার ফিফটি পারসেন্ট ওখানেই ওদের হাতে তুলে দেব।'

এত অবাক হলাম যে মুখ দিয়ে কিছুক্ষণ কথাই বেরোল না। তারপর বললাম, 'তুমি জিনিসটা পেয়ে গেছ?'

'পাগল নাকি? বলতে হয় বলে বললাম। যাই হোক, ওদিকটা আমার ওপরে ছেড়ে দাও। আর আরেকবার তোমাদের থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি। আমার জন্যে তোমাদের সাফার করতে হল।'

আচমকা ফোনের মধ্যেই দরিয়াদার গলাটা বদলে গেল। অদ্ভুত ঠান্ডা গলায় বলল, 'এর দাম ওদের চোকাতে হবে, রুবিক। ওরা দরিয়ার আপনজনের গায়ে হাত দিয়েছে। এর দাম ওদের চোকাতে হবে।'

বলেই ফোনটা কেটে দিল।

তার ঠিক পরেই বুধোদার ফোন। বলল, 'আমিও এখন বাড়ি ফিরছি রে। দরিয়া মেসেজ করেছিল। তোদের ঝামেলার কথা শুনলাম। শোন, এখন আর একদম কথা বলিস না। গলাটাকে রেস্ট দে। কাল সকালে তো তোর স্কুল। আমি বিকেলে যাব। আর সপ্তদ্বীপাকে বলিস আমি খুব শিগগিরই একদিন ওর বাড়ি গিয়ে ওকে দেখে আসব।'

বুধোদাও ফোন ছেড়ে দিল।

সারাদিনের অসহ্য টেনশন আর পরিশ্রমের ফলেই বোধহয় রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তাই ঘুমটা ভেঙেও গেল বেশ সকালে। ব্যালকনিতে বেরিয়ে দেখলাম, খবরের কাগজটা পড়ে আছে। ওটা হাতে তুলে নিয়ে চোখ বোলাতে গিয়ে একটা খবরে চোখ আটকে গেল।

গতকাল রাত দুটো নাগাদ রিমাউন্ট-রোডে এক ভয়ঙ্কর পথ-দুর্ঘটনায় এক কন্টেনার-ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কায় পিষে গেছে একটা ছোট গাড়ি। গাড়িটায় মোট ছ-জন যাত্রী ছিল। ঘটনাস্থলেই প্রত্যেকের মৃত্যু ঘটেছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশ অনুমান করছে, আরোহীরা মুম্বইয়ের অন্ধকার জগতের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কারণ গাড়িটির রেজিস্ট্রেশন মুম্বইয়ের এবং সেটির ভেতরে চারটি আগ্নেয়াস্ত্র এবং প্রচুর বুলেট পাওয়া গেছে।

কথামতন সেদিন সন্ধেবেলায় বুধোদা এল আমার বাড়িতে। দেখেই বুঝলাম ক্যামাক স্ট্রিটে ওর মহারাজা কালেকশনসের শো-রুম থেকে স্ট্রেট চলে এসেছে। খাটের ওপরে বাবু হয়ে গুছিয়ে বসে মাকে বলল, 'কাকিমা! ছ'টা লুচি আর বেগুনভাজা হলেই চলবে। ছানার পোলাওটা অপশনাল। থাকলে দিও, না থাকলে দিও না।'

'আছে'। মা বলল, 'তুই আসছিস শুনে সকালেই শীতলা মিষ্টান্ন ভান্ডার থেকে আনিয়ে রেখেছি। কিন্তু হ্যাঁরে, তোদের কাজগুলো দিন-কে-দিন এমন বিপজ্জনক হয়ে উঠছে কেন বল তো। ভাবিস আমি কিছুই খবর রাখি না?'

বুধোদা করুণ স্বরে বলল, 'আমিও ঠিক সেই কথাই ভাবি কাকিমা। আমি তো ডিটেকটিভ নই। অ্যাডভেঞ্চারিস্টও নই। তবু চেনা-রাস্তার বাইরে বেরিয়ে একটা অ্যান্টিক সংগ্রহ করতে গেলেই কিছু-না-কিছু বিপদে জড়িয়ে পড়ছি। তবে এবারের ব্যাপারটা আন্ডার কন্ট্রোল। এটা নিয়ে ভেব না।'

'ভাবতে না হলেই ভালো।' বলে মা চলে গেল রান্নাঘরের দিকে। বুধোদাও সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'তরুণবাবুর বাড়িতে কী দেখলি বল।'

বললাম, 'তরুণ সরখেল তিন-বছর আগে মারা গেছেন। ওঁর স্ত্রী বললেন, আটবছর আগে কিছুদিন দীনেশবাবুর ওই বাড়িতে যাতায়াত ছিল। তিনি

কারখানায় কিছু একটা বানিয়েওছিলেন। কিন্তু কী বানিয়েছিলেন বলতে পারলেন না। দীনেশবাবুর মারা যাওয়ার খবরও ওঁরা কেউই জানতেন না।'

বুধোদা বলল, 'কারখানা! কীসের কারখানা?'

আমি ব্যাকপ্যাক থেকে সেই রঙ না করা প্লাস্টিকের পুতুলটা বার করে বুধোদার হাতে দিয়ে বললাম, 'এইরকম সব পুতুল তৈরি হতো।'

বুধোদা পুতুলটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল। নাকের কাছে নিয়ে গিয়ে গন্ধও শুঁকল। তারপর একপাশে নামিয়ে রেখে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল।

একটু বাদে মুখ তুলে বলল, 'বুঝলি রুবিক। আমরা কিন্তু কিছুতেই দীনেশবাবুর ওই শেষ কথাগুলোকে ইগনোর করতে পারব না। উচিত হবে না। আচ্ছা আরেকবার ভাব তো, দরিয়ার সোনা মানে কী?'

মা ঠিক তখনই আমাদের জলখাবার নিয়ে ঘরে ঢুকছিল। বুধোদার শেষ কথাগুলো কানে গিয়েছিল। বলল, 'শব্দছক করছিস নাকি? দরিয়ার সোনা মানে সমুদ্রের সোনা। দরিয়া মানে সমুদ্র জানিস তো?'

বুধোদা কয়েক সেকেন্ড হাঁ করে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'কাকিমা! ইউ আর গ্রেট। তোমার জবাব নেই। সমুদ্রের সোনা। আমরা এতক্ষণ দরিয়া বলতেই ভাবছি একটা পঁচিশ বছরের ছেলের কথা। অথচ দরিয়ার আসল মানেটা...। না, কাকিমা, আর কেউ আমাদের আটকাতে পারবে না।'

মা অবাক হয়ে বলল, 'কী যে সব বকিস, কিছুই বুঝি না। যাই হোক, লুচিগুলো ওভাবে গিলিস না, গলায় আটকাবে।'

বুধোদা আর আমি কেউই মায়ের কথায় কান দিলাম না। লুচিগুলো গিলেই খেলাম। তারপর যে-যার জিনসের পেছনে হাত মুছে নিয়ে কাগজ-কলম নিয়ে বসলাম। বুধোদা বলল, 'এবার বল। সমুদ্রের মূল্যবান জিনিস বলতে কী মনে পড়ে?'

আমি উত্তর দিলাম, 'ডুবে যাওয়া জাহাজের সম্পদ।'

'ওঃ। সহজ করে ভাব, সহজ করে ভাব। দীনেশবাবু ছিলেন একজন ট্রলারের জাল ফেলার লেবার। তিনি ডুবো-জাহাজে পৌঁছবেন কেমন করে? তিনি বড়জোর পেতে পারেন যা সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছে। মাছের সঙ্গে যা জালে উঠে আসতে পারে। যেমন অ্যাম্বার...'

কথার মাঝখানেই থেমে গিয়ে বুধোদা নিজের কপালে মুঠি পাকিয়ে দুটো ঘুষি মেরে বলল, 'ওঃ কী স্টুপিড, কী স্টুপিড আমি! সব মিলে যাচ্ছে তো রুবিক।'

আমি বললাম, 'কী মিলে যাচ্ছে? একটু বলো আমাকে।'

'আচ্ছা, প্রথম থেকে বলছি। দরিয়ার সোনা। কাকিমা বলে দিলেন, সমুদ্রের সোনা। এখন, সমুদ্রে তো আর সত্যিকারেই সোনা ভেসে যায় না। তাহলে সোনার মতনই দামি কোনো জিনিসের কথা বলেছিলেন দীনেশবাবু। অ্যাকচুয়ালি, জিনিসটা সোনার চেয়েও অনেকগুণ বেশি দামি। এক কিলোগ্রামের দাম কোয়ালিটির বিচারে এক-কোটি থেকে দু-কোটি টাকা হতে পারে। জিনিসটার নাম অ্যাম্বারগ্রিস।

অ্যাম্বারগ্রিস তৈরি হয় তিমিমাছের পেটে। সব তিমির নয়, শুধু স্পার্ম-হোয়েলের পেটে। আবার সব স্পার্ম-হোয়েলের পেটেই যে অ্যাম্বারগ্রিস থাকবে তা নয়। হয়তো একশোটার মধ্যে একটা স্পার্ম-হোয়েলের পেটে অ্যাম্বারগ্রিস তৈরি হয়।

'কীভাবে হয়? কখন হয়? বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন, তিমিমাছ খাবারের সঙ্গে যে স্কুইডের কাঁটার মতন ধারালো জিনিসগুলো গিলে ফেলে সেগুলো যাতে তার অন্ত্রকে জখম না করতে পারে তার জন্যে একধরনের সিক্রিশন দিয়ে সেগুলোকে ঢেকে দেয়। তারপর ওরকম অপাচ্য জিনিস অনেকটা পেটের মধ্যে জমা হলে সেটাকে উগরে দেয় সমুদ্রের জলে। জিনিসটা যেহেতু জলের চেয়ে হালকা, তাই ভাসতে থাকে। ভাসতে-ভাসতে বহুদূরে চলে যায় আর তার চেহারা আর চরিত্র বদলাতে থাকে। প্রথমে যেটার রঙ থাকে সাদা, সেটা আস্তে-আস্তে বাদামি হয়ে যায়। প্রথমে যাতে থাকে দুর্গন্ধ, সেটাই ক্রমশ পরিণত হয় এক আশ্চর্য সুগন্ধী পদার্থে।

'বুঝলি রুবিক, সেইজন্যেই পুরাকাল থেকে মানুষের কাছে অ্যাম্বারগ্রিসের এত কদর। আগে শুধু রাজকরাজড়ারা তাদের খাবারে, পানীয়ে আর প্রসাধনীতে এর ব্যবহার করতে পারতেন। আর এখন পৃথিবীর সবচেয়ে দামি কিছু সুগন্ধীতে আসল অ্যাম্বারগ্রিসের ছিটেফোঁটা মেশানো থাকে। তাতেই তাদের দাম হয়ে যায় আকাশছোঁয়া।

'এত বড় সমুদ্র। তার মধ্যে কোথায় একটা ছোট্ট বাদামি ডেলা ভেসে চলেছে, সেটা মানুষের চোখে পড়ল কিনা, চোখে পড়লেও সে জিনিসটাকে চিনতে পারল কিনা, এতগুলো সম্ভাবনা পেরিয়ে তবে দশ, বিশ, পঞ্চাশ কেজি অ্যাম্বারগ্রিস মানুষের হাতে এসে পৌঁছয়। সেইজন্যেই তার দাম ওই যা বললাম, এক থেকে দু-কোটি পার কেজি।

'আমি নিশ্চিত, দীনেশবাবু ট্রলারের ডেকে দাঁড়িয়ে একদিন ওরকম অ্যাম্বারগ্রিস ভেসে যেতে দেখে চিনতে পেরেছিলেন এবং সেটাকে তুলে এনেছিলেন।'

আমি বললাম, 'কিন্তু বুধোদা, আমাদের এদিকের সমুদ্রে তো স্পার্ম-হোয়েল নেই।'

বুধোদা বলল, 'তা নাই বা থাকল। সমুদ্রের স্রোত এমনভাবে উত্তর সমুদ্র থেকে আমাদের আরবসাগরের দিকে বয়ে আসে যে, এখানেও মাঝেমাঝে অ্যাম্বারগ্রিস মিলে যায়।'

'তারপর?'

'ওঁর অ্যাম্বারগ্রিস পাওয়ার ঘটনাটা কিছু বদ লোকের চোখে পড়ে গেল। শুরু হল দীনেশবাবুর পালিয়ে বেড়ানো। সেই পর্বটা তুই জানিস। দীনেশবাবু ফাদার রেনল্ডের সঙ্গে সেন্ট মাইকেলস চার্চে এসে উঠলেন এবং ঠিক করলেন, এই চার্চেই তিনি লুকিয়ে রাখবেন সেই সাত রাজার ধন। সেই সমুদ্রের সোনা।

'অদ্ভুত ইনটেলিজেন্ট এক প্ল্যান বার করলেন তিনি। এমন এক বুদ্ধি বার করলেন যাতে সকলের চোখের সামনে থাকলেও কেউ সেটাকে অ্যাম্বারগ্রিস বলে চিনতে না পারে। চিনতে পারেওনি সত্যি কেউ। ফাদার রেনল্ড পারেননি। দশদিন আগে মুম্বই থেকে যে-গুন্ডারা এসে চার্চে ভাঙচুর চালিয়েছিল তারা পারেনি। গত পরশু তুই আর আমিও পারিনি।'

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'যাঃ। হতেই পারে না। আমরা অ্যাম্বারগ্রিস দেখেছিলাম?'

বুধোদা বলল, 'আলবাত দেখেছিলাম। আবার তোকে দেখিয়ে আনছি, চল।'

তারপর গলা তুলে চেঁচাল, 'কাকিমা! কাকিমা! আমি আর রুবিক একটু বেরোচ্ছি। দেরি হলে চিন্তা কোরো না।'

আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'চট করে ড্রেস চেঞ্জ করে নেমে আয়। আমি গাড়িটা বার করছি।'

ড্রেস চেঞ্জ করার পর লিফটে নয়, আমি সিঁড়ি বেয়ে দুড়দাড় করে নীচে নামলাম। এইরকম মুহূর্তগুলোর জন্যেই তো অপেক্ষা করে থাকি।

বুধোদা এরপর যে-স্পিডে গাড়িটাকে ওড়াল সেটাকে ইংরিজিতে বলে 'ব্রেক-নেক স্পিড'। ধাক্কা লেগে ঘাড় মটকানোর পক্ষে আইডিয়াল। এবং তার মধ্যেও পকেট থেকে ফোন করে দরিয়াকে একগাদা ইনস্ট্রাকশন দিল, যেটা ও পারতপক্ষে করে না। তবে তার ফলে যেটা হল, আমরা সেই বস্তিটা পেরিয়েই দেখতে পেলাম রিসেপসন-পার্টি আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। দরিয়া এবং তার অনুচররা আমাদের ঘিরে ধরে নিয়ে গেল চার্চের দিকে।

বাকিরা দরিয়ার ইশারায় চার্চের বাইরেই রইল। ভেতরে রইলাম খালি আমি, বুধোদা, দরিয়া আর ফাদার রেনল্ড।

বুধোদা ভয়ঙ্কর আত্মবিশ্বাস নিয়ে পুলপিটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ছ'টা মোমদানের মধ্যে থেকে একটাকে দু-হাতে তুলে নিয়ে মেঝের ওপরে রাখল। দু-হাত লাগাতেই হত। কারণ, এই মোমদান কিংবা মোমবাতি কোনোটাই ঘরোয়া জিনিস নয়। এগুলো টিপিকাল গির্জার মোমবাতি একেকটা মোমবাতি ক্রিকেটের উইকেটের মতন লম্বা এবং সেইরকম মোটা। উপরন্তু গায়ে পেঁচানো পেঁচানো ডিজাইন।

বুধোদা ফাদার রেনল্ডের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ফাদার, একটু চিন্তা ক

বলুন তো, এই মোমবাতিগুলো কি আগে থেকেই এই চার্চে ছিল, না দীনেশবাবু চার্চ ছেড়ে যাবার দিনে নিয়ে এসেছিলেন?'

ফাদার রেনল্ড বললেন, 'এটা আমার আগেই বলা উচিত ছিল। দীনেশই নিয়ে এসেছিল। ও বলেছিল, প্রভু যিশুকে আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেলাম। এতদিন তিনি আমাকে তাঁর আশ্রয়ে থাকতে দিলেন, এই সামান্য ছ'টা মোমবাতি তাঁর আরাধনার জন্যে দিলাম।'

'সেবারে তো আপনি তাড়াহুড়ো করে মুম্বইয়ের ট্রেন ধরতে ছুটেছিলেন। এবারে এখানে এসে এগুলো জ্বালিয়েছিলেন?'

'না না'। ফাদার নাক সিঁটকোলেন, 'এগুলো বড্ড নোংরা হয়ে গেছে। কিন্তু বোধিসত্ত্ব, তুমি হঠাৎ মোমবাতি নিয়ে এত ইন্টারেস্টেড হয়ে পড়লে কেন বলো তো।'

'ইন্টারেস্টেড হলাম ফাদার, কারণ, এগুলো মোমবাতি নয়। অ্যাম্বারগ্রিসের ব্লক। একেকটার ওজন অন্তত দেড়-কেজি। মানে মোট ন-কেজি, যার বাজার দর আঠারো-কোটি টাকার আশেপাশে একটা কিছু।'

বুধোদা মোমবাতিটার গা থেকে কিছুটা মোম খুঁটে নিয়ে আমাদের তিনজনের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। বললেন 'শুঁকে দেখুন আপনারা। এই সৌভাগ্য পৃথিবীতে খুব মানুষের হয়।'

আমি নাকের কাছে হাতটা নিয়ে জোরে শ্বাস নিলাম এবং কী বলব, মনে হল, এক আশ্চর্য ম্যাজিকে আমি পৌঁছে গেলাম সমুদ্রের ধারে এক ফুলের বাগানে। ওই একরত্তি অ্যাম্বারগ্রিসের মধ্যে একইসঙ্গে মিশে ছিল সমুদ্রের গন্ধ, ফুলের গন্ধ এবং আরও অনেকগুলো অচেনা সুগন্ধ।

দরিয়া এতক্ষণ অবাক হয়ে বুধোদার কথা শুনছিল। এবার বলল, 'স্যার, তার মানে বাবা তরুণকাকুকে বলেছিলেন, অ্যাম্বারগ্রিসের লাম্পগুলোকে ছাঁচে ফেলে গির্জার মোমবাতির মতন শেপ দিয়ে দিতে আর তরুণকাকু সেটাই করে দিয়েছিলেন?'

'এগজ্যাক্টলি। কাজটা এমন কিছু কঠিনও নয়। কারণ সাধারণ মোম আর অ্যাম্বারগ্রিসের ভৌত ধর্ম প্রায় এক। অ্যাম্বারগ্রিসও মোমের মতোই অল্প আঁচে নরম হয়ে যায়। আবার তাপ সরিয়ে নিলে জমেও যায়। আমার মনে হয় তাঁর বন্ধু যে তাকে সাধারণ মোম দেননি সেটা তরুণবাবু বুঝতেই পারেননি, যদি না গন্ধ থেকে কিছু সন্দেহ হয়। তবে সেক্ষেত্রেও বোঝানো যেতেই পারে, মোমের সঙ্গে সুগন্ধি মেশানো হয়েছে।'

বুধোদা ঘড়ি দেখল। তারপর বলল, 'চল রুবিক। এ যাত্রাতেও আমরা কোনো অ্যান্টিক পেলাম না, তবে আশ্চর্য এক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হল। কী বলিস?'

দরিয়া হা হা করে উঠল। বলল, 'তার মানে কী স্যার? আপনি আমার এত বড় একটা উপকার করলেন, তার চেয়েও বড় কথা, আমার দুঃখী বাবার শেষ ইচ্ছেটা পূরণ করলেন, দরিয়ার সোনা ঈশ্বরের হেপাজত থেকে ফিরিয়ে দিলেন আরেক দরিয়ার হাতে, আপনারা এভাবে চলে যাবেন তাই হয় নাকি? আপনি কী নেবেন বলুন! আপনার সম্মান দক্ষিণা।'

বুধোদা দরিয়ার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম দরিয়া, কোনো বেআইনি কারবারের মধ্যে আমি থাকব না। ভারতের মাটিতে অ্যাম্বারগ্রিস বেচা, কেনা এমনকী কাছে রাখাও বেআইনি। তবে দীনেশবাবু সেটা জানতেন না নিশ্চয়ই। আর তাঁর শেষ ইচ্ছেটাকে সম্মান দেওয়ার জন্যেই আমিও কাউকে এই কথা জানাচ্ছি না। এরপর তুমি এই সম্পদ নিয়ে কী করবে, সেটা তোমার বিবেচনা।'

তারপর আর একটাও কথা না বলে, একবারও পেছনদিকে না তাকিয়ে, বুধোদা নদীর তীর ধরে হেঁটে গিয়ে ওর গাড়ির ড্রাইভারের সিটে বসল। আমি বসা মাত্রই স্টার্ট দিল গাড়িতে।

ঠিক একবছর বাদে দরিয়াদা আমাকে একদিন হঠাৎ ফোন করল। জানি, এর মধ্যে ওর সঙ্গে বুধোদার নিয়মিত যোগাযোগ হয়েছে, যেমন আগেও হতো। অ্যান্টিকের কেনা-বেচাও হয়েছে। জানতাম, ও এখনো মাকে নিয়ে খিদিরপুরের সেই পুরনো বাড়িটাতেই আছে। জীবনযাত্রার কোনোই পরিবর্তন হয়নি।

তাহলে হঠাৎ আমাকে ফোন করছে কেন?

ফোনটা রিসিভ করলাম। দরিয়াদা বলল, 'রুবিক। স্যারকে এসব বলতে ভয় লাগে। তোমাকেই বলছি। তুমি ওঁর মুড বুঝে একটু যদি ওকে জানাও।'

আমি বললাম, 'কী জানাব, দরিয়াদা?'

'তোমাকে কিছু ফটো হোয়াটস অ্যাপ করছি। ডেসক্রিপসন সঙ্গেই থাকবে। সেই ফটোগুলো ওঁকে দেখিও।'

দরিয়াদা ফোন ছাড়ার পরে ফটোগুলো দেখলাম।

দেখলাম, পুরোনো চার্চের জায়গায় মাথা তুলেছে খিদিরপুরের পথশিশুদের জন্যে একটা তিনতলা বিশাল বোর্ডিং-স্কুল। সেন্ট মাইকেলস স্কুল। একটা ছবিতে স্কুলের প্রিন্সিপালের চেয়ারে ফাদার রেনল্ডকে বসে থাকতে দেখলাম।

পাশে নন্দীদের মাঠটা না থাকলে ছিমছাম দোতলা বাড়িটা যে কার বুঝতে পারতাম না। তবে এখানেও একটা ছবিতে দোতলার বারান্দায় হাসি-হাসি মুখে দাঁড়িয়েছিলেন আমাদের সেদিনের সেই দুঃখিনী মাসিমা। আর বাড়িটার দরজার ওপরে লেখা ছিল 'তরুণ স্মৃতি'।

তৃতীয় ছবির গুচ্ছে দেখেছিলাম, ডায়মন্ড হারবারের ফিশিং-হারবারের লাগোয়া একটা হাসপাতাল আর বৃদ্ধাবাস। দরিয়াদা লিখেছিল, এটাও একটা ট্রাস্টের হাতে দেওয়া হয়েছে। শুধু বয়সের ভারে অকর্মণ্য হয়ে যাওয়া নিঃসঙ্গ ধীবররাই ওখানে থাকতে পায়।

শেষকালে দরিয়াদা লিখেছিল, 'আরও কিছু টাকা এখনো রয়ে গেছে। আরও কিছু এরকম কাজের কথাও মাথায় রয়েছে। সেগুলো সমাধা হয়ে গেলেই আমি কলকাতা ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যাব।

আমি মেসেজ করলাম, 'কোথায় যেতে চাও? পাহাড়ে?'

ও উত্তর দিল, 'দরিয়া কি পাহাড়ে যায়? দরিয়া মানে সমুদ্র। আমি সমুদ্রে যাব, রুবিকবাবু! সমুদ্রের ধারে কোনো নির্জন জেলেদের গ্রামে একটা কুঁড়ে বানিয়ে মা-বেটায় থাকব, এই আমার স্বপ্ন।' **অলংকরণ: উর্মিলা**

বিমল কর

ভজু ভাদুড়ির গল্প

এখন আমাদের এখানে ম্যালেরিয়া মরসুম চলছে। হাই টাইপ ম্যালেরিয়া। মানে জ্বর চড়ল তো একশ চার-পাঁচ; কাঁপুনি শুরু হলে তিন প্রস্থ কাঁথা-কম্বল চাপাতে হয়। ম্যালেরিয়ার সঙ্গে আবার হংকং ফ্লু থাকে মিলিয়ে-মিশিয়ে। ডাক্তারবাবুরা বলেন ডেঙ্গু। তা এই ম্যালেরিয়াকে ম্যালাডেঙ্গুও বলা যায়।

দিন দশেক আগে একদিন বৃষ্টিতে ভিজেছিলাম। সকালের দিকে। বিকেলে গলা খুসখুস, চোখ ছলছল; সন্ধ্যেবেলায় মাথা ভারি। রাত্রে একশ তিন, এক লাফে। তারপর বেহুঁশ।

সাতটা দিন ম্যালাডেঙ্গু আমায় ভাজা ভাজা করে ছাড়ল। একবার এ-পিঠ একবার ও-পিঠ। আমার বউদির তাতেই আনন্দ। বলত, নাও এবার বোঝ, আমার বেলায় তো হেসে মরতে; এবার বাবুর দশাটি কেমন হল? ভাজা চিংড়ি।

রোগা সোগা মানুষ আমি, সাতদিনের বেদম জ্বরে-জ্বালায় ভাজা চিংড়ি হব—এ আর এমন কি নতুন কথা!

জ্বর ছাড়ল আটদিনের মাথায়। জ্বর ছাড়লেও আমি আর আমাতে থাকলাম না। মাথাটাকে নিজের বলে মনে হচ্ছিল না, আদপেই ওটা মাথা না মস্তক বুঝতেও পারছিলাম না। গা, হাত-পা যেন আলগা হয়ে গেছে শরীর থেকে। জিবে স্বাদ নেই, নাকে গন্ধ পাই না। হরেক

রকম ওষুধ পেটে পড়ায় মাঝে মাঝে ঘুমও হয় না ঠিক মতন।

তবু সেদিন একটু সুস্থ বোধ করছিলাম। সন্ধ্যের দিকে বৃষ্টি নামল। শ্রাবণের বৃষ্টি। সন্ধ্যেরাতেই যেন কত রাত বলে মনে হচ্ছিল। নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে একটা পত্রিকা পড়ার চেষ্টা করছিলাম। হালকা পত্রিকা।

এমন সময় এক ভদ্রলোক এসে হাজির। এক হাতে ছাতা, অন্য হাতে হালকা ওয়াটার প্রুফ।

ভদ্রলোককে আমি কোনদিন দেখিনি আগে। সরাসরি তিনি কেমন করে আমার শোবার ঘরে চলে এলেন তাও বুঝতে পারলাম না। বোধ হয় বাচ্চুই তাকে নিয়ে এসেছে। বাচ্চু ছেলেটা আমাদের বাড়িতে ফাই-ফরমাস খাটার কাজ করে। বউদির খুব পেয়ারের।

ভদ্রলোক ছাতা আর ওয়াটার প্রুফ রাখতে রাখতে বললেন, 'নমস্কার। শুনলাম জ্বর হয়েছিল। ভাল আছেন?'

ভদ্রলোককে আমি দেখছিলাম।

গোলগাল চেহারা, মাথার দশ আনায় চুল না থাকার মতনই, বাকি ছ'আনায় সাদা কালো মেশানো। চোখে গোল গোল কাচের চশমা। নাকের তলায় মোটা গোঁফ। পরনে ধুতি পাঞ্জাবি।

'আমার নাম ভজু ভাদুড়ি। আপনি তো মণি ঘোষাল?'

অবাক হয়ে বললাম, 'মণি তো নয়, ননী। ননী ঘোষাল।'

'ননী? দাঁড়ান দাঁড়ান—' বলে ভদ্রলোক পকেট হাত ডুবিয়ে একটা নোট খাতা বার করলেন। পাতা ওল্টাতে লাগলেন পর পর। তারপর বললেন, 'এই তো! পেয়েছি। ননী!...সরি, ননীই তো! আমি মিসটেক করে ফেলেছি। বাড়ির ঠিকানা ঠিক আছে তো! দশের সাত বাই দুই গৌরীবেড়ে। ঠিক?'

'তা ঠিক।'

'ফোন নম্বর হল—' বলে তিনি নোটবই দেখে নম্বরটা বললেন।

'ফোন নম্বর ঠিক আছে। কিন্তু আপনি—' 'দাঁড়ান আগে বসি।...কী বৃষ্টিই হচ্ছে, মশাই! যেখানে যাই বৃষ্টি। একেবারে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। দুপুরে গিয়েছিলাম বাঁশবেড়ে। সেখানে একেবারে ঝমাঝম বৃষ্টি। এলাম এখানে—বাঁশবেড়ে থেকে গৌরীবেড়ে—নো স্টপিং অফ রেইন। ইয়ে বাড়িতে একটু বলে দিন। চা আর একটা ওমলেট যদি হয়—।'

ভদ্রলোকের কথা শুনে আমি হাঁ। অদ্ভুত মানুষ তো! অপরিচিত লোকের বাড়িতে ঢুকে নিজেই চা ওমলেটের কথা বলছে!

বললাম, 'বলতে হবে না এসেছেন যখন—চা আসবে।'

'ওমলেট?'

'বলতে পারছি না।'

'তা হলে একটু হাঁক মেরে দিন। বৃষ্টিতে নেতিয়ে গিয়েছি।'

'দেখি। কিন্তু মশাই, আপনি কে? মানে আপনার পরিচয়?'

আমি ভজু ভাদুড়ি। আমার ভাগ্নে বিষ্টু একটা পত্রিকা বার করে। এখন দশ বছর চলছে। দশম বর্ষ। পুজোর পর একাদশ শুরু হবে। কাগজটার খুব কাটতি মশাই। নামটা নিশ্চয় জানেন। 'আতঙ্ক'। মাসে মাসে বেরয়। এক একটা গল্প পড়বেন—আর ইয়ে আপনার গায়ের লোম খাড়া হয়ে যাবে। আপনি তো গ্রাহক আমাদের।'

'আতঙ্ক'। মনে পড়ল। আমি ঠিক গ্রাহক নই, গ্রাহক আমার বউদি। আমার নামে টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক হয়েছে। বউদির প্রথম প্রেফারেন্স সিনেমার কাগজ। দ্বিতীয় হল রোমাঞ্চ। বউদির খানিকটা টান আছে রহস্যের ব্যাপারে। ভূতটুত ভালবাসে। ভদ্রেশ্বরের মেয়ে। ওদের তিন পুরুষের বাড়িতে নাকি গণ্ডাখানেক ভূত ছিল। একটা ভূত গিয়েছে উত্তরপাড়ায়, একটা এসেছে গৌরীবেড়েতে।

বললাম, 'আমার, বউদিই আপনাদের 'আতঙ্ক'-র ভক্ত পাঠিকা। আমি কাগজটা দেখেছি। পাতাও উল্টেছি মাঝে মাঝে।'

'তা হোক। অফিসিয়ালি আপনিই গ্রাহক।'

'তা বলতে পারেন।'

'স্যার, আমার ওমলেট।'

না হেসে পারলাম না। বিছানা ছেড়ে উঠতেই হল। বাইরে গিয়ে বাচ্চুকে ডাকলাম।

ঘরে এসে দেখি ভজু ভাদুড়ি একটা আধপোড়া চুরুট ধরিয়ে টানছে। বিশ্রী গন্ধ ছড়াচ্ছে ঘরময়।

'ভজুবাবু, তা আপনি আমার কাছে কেন? চাঁদা বাকি পড়েছে?'

'না মশাই না। চাঁদা একেবারে আপ-টু-ডেট।'

'তবে?'

ভজু ভাদুড়ি মুচকি হাসলেন। চুরুট টানলেন বার কয়েক। বললেন, 'তাহলে সত্যি কথাটা বলি ঘোষাল বাবু। আমার বাপ-মা-মরা ভাগ্নেটাকে আমরাই মানুষ করেছি। মানুষ না করলে ছাগল হয়ে যেত। তা বেটার শখ হল পত্রিকা করার। আমার নানা রকম ব্যবসা। একটা ছাপাখানাও আছে, বউবাজারে। বেটাকে সেখানে বসিয়ে দিলাম। ছাপাখানার কাজ দেখে, আর ওই 'আতঙ্ক' করে। ও হল সম্পাদক—এডিটর। আমি হলাম অ্যাডভাইসার।'

'বাঃ! বেশ!'

'তা ইয়ে—এবার আমাদের দশ বছরের পুজোসংখ্যা। সংখ্যাটাকে আমরা 'ভৌতিক সংখ্যা করছি। বাজারে পোস্টার ছাড়ব শিগগির। 'ভূত সংখ্যা আতঙ্ক।' তিনশ পাতার কাগজ হবে। বিগ সাইজ। অজস্র ছবি। একশ পাতা বাই কালার ছাপা, বাকি দুশ পাতা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট।... তিনশ পাতার কাগজে মিনিমাম তিরিশ-পঁয়ত্রিশটা লেখা । লেখাগুলো সব কোয়ালিটি রাইটিং। আর গল্পও সেই রকম, পুরনো কলকাতার ভূত থেকে একেবারে এখনকার ভূত—সব পাবেন। এ-রকম ভ্যারাইটি অফ ভূত আপনি আগে কখনও দেখেননি।'

আমি যেন মন্ত্রমুগ্ধ! ভজুর কথা শুনব না তাঁকে দেখব। বললাম, আপনি কি অ্যাডভান্স টাকা নিতে এসেছেন পুজো সংখ্যার? বউদিকে ডাকব?

'না স্যার, অ্যাডভান্স টাকা নিতে আসিনি। বরং বলেন তো আমিই আপনাকে দু একশ টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে যেতে পারি।'

'আমাকে অ্যাডভান্স?' অবাক হয়ে ভজুবাবুকে দেখতে লাগলাম। 'আমাকে কেন?'

ভজু বিনয় সহকারে হেসে বললেন, 'একটা লেখা, স্যার।'

কানে কি ভুল শুনলাম? কী বললেন ভজু! 'কী বললেন আপনি?'

'বললাম, একটা লেখা চাই স্যার। আপনার লেখা।...ইয়ে আমার ওমলেট, চা?'

'লেখা। আমার লেখা!'

'হ্যাঁ স্যার।'

'আপনি মশাই পাগল নাকি! আমি লিখব! আমি কি লেখক নাকি? না কোনদিন লিখেছি। কে আপনাকে এখানে পাঠাল? ভজু বললেন, 'কেউ পাঠায়নি। আমি নিজেই এসেছি।...তা হলে ব্যাপারটা আপনাকে খুলে বলি। আমাদের যাঁরা স্টক রাইটার তাঁরা তো আছেনই । ওঁদের মধ্যে কেউ কেউ ফাইভ স্টার রাইটার, কেউ ফোর স্টার, কেউ থ্রি স্টার। তাঁদের কথা আলাদা। আবার অর্ডিনারি রাইটারও আছেন। আমাদের বন্ধু। বরাবর

লেখেন। সাপোর্ট করেন। এ-ছাড়া প্রতি বছর আমরা গ্রাহকদের নাম থেকে লটারি করি। তিনবার লটারি হয়। তিনবার হিট। পঁচিশ, দশ, ফাইনালে তিন। তিনজনের নাম ফাইন্যাল লটারিতে ওঠার পর—আমরা তাঁদের কাছে যাই, কিংবা চিঠি লিখি, অনুরোধ জানাই একটা গল্প লেখার জন্যে। এবারে লটারিতে যে তিনজনের নাম উঠেছে, তার মধ্যে আছেন, বাঁশবেড়ের অমল চাটুজ্যে, গৌরীবেড়ের আপনি, আর যাদবপুরের শেফালি দত্ত।

বাচ্চু চা আর ওমলেট নিয়ে এল। ভজু ভাদুড়ি ওমলেটের ডিশটা উঠিয়ে নিলেন। গোলমরিচ দিয়েছ? বাঃ। কাঁচা লঙ্কা! বাঃ! এ তো একেবারে ডবল ডিমের ওমলেট। সত্যি মশাই, এ না হলে আর আপনি ঘোষাল। ভাদুড়ি, ঘোষাল, লাহিড়ি—এসব হল জাত ভাই।

বাচ্চু আমার জন্যেও চা এনেছিল।

ভজু ভাদুড়ি লোকটাকে আমার তেমন অপছন্দ হচ্ছিল না। মজার লোক। এমন লোক হাজারে একটা চোখে পড়ে কিনা সন্দেহ।

রীতি মতন কৌতুক অনুভব করছিলাম। চা খেতে খেতে বললাম, 'তা হলে ভাদুড়ি মশাই, আপনি বলেছেন লটারিতে আমার নাম উঠেছে বলে আমার গল্প লিখতে হবে?

'হ্যাঁ, স্যার! গত পাঁচ বছর আমরা এই সিস্টেম ফলো করছি। এতে একটা পাঠক-লেখক সম্পর্ক হয়।...ডিমটা ফাইন—পোলট্রি না চাষী?'

'পোলট্রি হবে হয়ত।'

'কোন পোলট্রি! আলমবাজার? আমার এক শালা আলমবাজারে পোলট্রি খুলছে। দারুণ চলে।'

'এটা বোধ হয় ইমামবাজারের পোলট্রি।'

আমি ঠাট্টা করে বললাম।

ভজুবাবু মনের সুখে ওমলেট খেতে খেতে বললেন, 'তা হলে লেখাটা?'

'লেখা!...আমার বউদি লিখলে হবে না? তিনিই তো আসল গ্রাহক।'

'না স্যার। নাম উঠেছে আপনার, লিখবেন আপনার বউদি—তা হয় না। আমরা ছোট হলেও একটা কোড ফলো করি।'

'কিন্তু আমি তো লেখক নই।'

'তাতে কী?'

'তাতে কী মানে! মশাই আমি লেখার 'ল' জানি না। গরিব মাস্টার। কলেজে কেমিস্ট্রি পড়াই। লেকচারার। গল্প লেখার আমি কী জানি!'

'জানতে হবে না। আপনি লিখুন। ইউ রাইট...'

'বাঃ! লিখুন!'

'লিখবেন বই কি! আপনার নাম উঠেছে।'

'ধ্যাত মশাই, লটারিতে নাম উঠলে কেউ লেখক হয়। লটারি-রাইটার!'

'হয় হয়', ভজু মাথা নেড়ে নেড়ে বললেন। ওমলেট শেষ। এবার চায়ের কাপ উঠিয়ে নিলেন। 'লটারিতেই সব হয়। ভাগ্য থাকলে কে কী হয়ে যায়—আপনি জানেন না! একেবারে ফালতু লোক মশাই, কিস্যুটি জানে না, ভাগ্যের জোরে বেশ করে খাচ্ছে। এমন কি মিনিস্টার পর্যন্ত হয়ে যাচ্ছে। আবার যার ভাগ্য নেই সে-বেচারি রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা করছে।'

'কিন্তু লেখার ব্যাপারটা তো ক্ষমতার ব্যাপার! প্রতিভার!'

'গুলি মারুন প্রতিভায়। আমায় প্রতিভা দেখাবেন না।...তা ছাড়া, ঘোষাল মশাই, আপনি নো ফাইভ স্টার, নো ফোর স্টার, নট ইভন থ্রি স্টার রাইটার। আপনি নতুন লেখক। নবীন লেখক। আপনার অত প্রতিভার কিসের দরকার। কাগজ কলম নিয়ে বসে পড়ুন হয়ে যাবে।'

'এরকম হয়?'

'কত হয়! দেদার!...এই ধরুন গত বছর আমরা লটারিতে একজনকে পেলাম। রতনকুমার দত্ত। গত বছর ছিল আমাদের গোয়েন্দা সংখ্যা। মানে, সব গল্পেই গোয়েন্দা থাকতে হবে। তা রতন দত্ত বলে ভদ্রলোক লিখলেন, 'তিন খুনীর গল্প।' কী লেখাই লিখলেন রতন দত্ত। একটা মার্ডার। অনলি ওয়ান। তিনজনেই একটা মার্ডার করেছে, কেউ কাউকে জানে না। এমনকী, কেউ জানে না কে রিয়েল মার্ডারার হল শেষ পর্যন্ত। একেবারে সুপারহিট। লাইনে লাইনে থ্রিল। গায়ে কাঁটা দেয়। মারভেলাস স্টোরি। সেই রতন দত্ত এখন ফটাফট লিখছে। তার একটা বইও বেরিয়ে গিয়েছে। তা রতনবাবু তো জাস্ট একজন পোস্ট অফিস ক্লার্ক। আগে কখনও লেখেননি। এক লেখাতেই ফেমাস।'

আমার চা-খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল অনেকক্ষণ। সিগারেট খেতে পারছিলাম না বলে মাঝে মাঝে পান মশলা খাচ্ছিলাম। সামান্য পান মশলা মুখে দিয়ে বললাম, 'ভাদুড়ি মশাই, আপনি আমায় ক্ষমাঘেন্না করে দিন। আমি সত্যিই পারব না। আমার অত এলেম নেই।'

'আরে আগে থেকেই না বলেছেন কেন! চেষ্টা করে দেখুন! ট্রাই—'

হেসে বললাম, 'আমার বউদিকে বরং...'

'না না, বউদি নয়। মেয়েরা কি ভূতের গল্প লিখতে পারে। গোয়েন্দা পারেন।' ক্রিস্টি মাসিমা কী লেখাই লেখেন!

'তা ঠিক। তবে মেয়েরাও পারতে পারেন।'

'আপনি আমাকে কোড ভাঙতে বলছেন! তা পারব না।'

'কিন্তু আপনি তো যাদবপুরের শেফালি দত্তর লেখা নেবেন। তাঁর নামও লটারিতে উঠেছে বললেন।'

'রাইট। আপনার পয়েন্ট রাইট। লটারিতে তাঁর নাম উঠেছে। লেখা নিতেই হবে। মরালি আমি বাধ্য। তবে লেখাটা যে কী হবে কে জানে।...আপনি না লিখলে বাস্তবিকই মর্মাহত হব। বড় আশা করে এসেছিলাম।'

'আমি যে পারব না।'

'আমার মনে হয় পারতেন।...আজ পর্যন্ত আমরা কারও কাছ থেকে নিরাশ হয়ে ফিরিনি। আপনিই আমাদের নিরাশ করলেন।'

'সরি।'

ভজু ভাদুড়ির চা-খাওয়া শেষ হল। চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে আবার চুরুট ধরালেন। তারপর হতাশভাবে বললেন, 'মনটা বড় খারাপ করে দিলেন। একবার চেষ্টাও তো করতে পারতেন স্যার।...ভালো কথা, আপনার কোনও লেখক বন্ধু নেই?'

'না। কেন?'

'না হয় তাকে দিয়ে লিখিয়ে দিতেন। নামটা আপনারই থাকত।'

'এ আপনি কী বলছেন। এ-রকম হয় নাকি?'

'হয়—!' ভজু হাসলেন, মাথা নাড়লেন, 'আমরা তো দেখছি, স্যার। হয় অনেক কিছুই। আদ্যিকাল থেকেই লেখা চুরি হয়, নকল হয়, পরের দ্রব্য নিজের হয়। তা এসব হল অসৎ পথ। আপনি ভদ্দরলোক, কলেজে পড়ান—এমন কর্ম আপনি করবেন না জেনে খুশি হলাম। চলি তা হলে!'

'আসুন! আমি সত্যি দুঃখিত!'
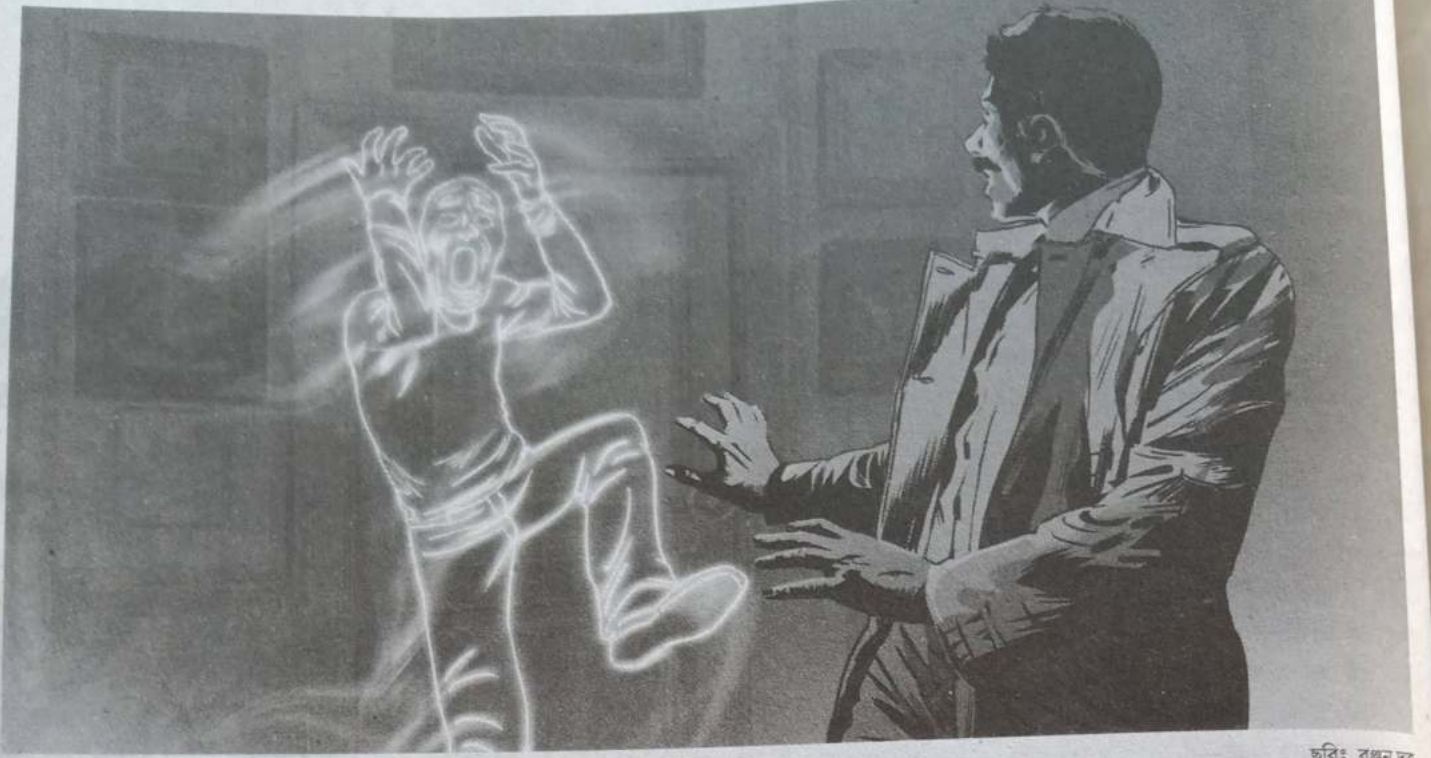
ছবিঃ রঞ্জন দত্ত

এইচ.জি. ওয়েলস্

দি ইনএক্সপিরিয়েন্সড গোস্ট

বাংলা অনীশ দেব

যে পরিবেশের মাঝে বসে ক্লেটন তার শেষ গল্প শুনিয়েছিল সেটা আজও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। বেশির ভাগ সময়টাই সে বসে ছিল ঘরের ঐ কোণে, বড় সড় অগ্নি-আধারের পাশে রাখা প্রাচীন সোফাটার ধার ঘেঁষে, আর তার পাশেই বসে ছিল স্যান্ডারসন—নিজের নাম লেখা ব্রোসলি মাটির পাইপ থেকে ধূমপানে মগ্ন। ইভান্সও ছিল, আর ছিল অভিনয় জগতের রত্ন উইশ—অবশ্য সে খুব বিনয়ীও বটে। সেই শনিবারটায় আমরা সকলে মিলে মারমেইড ক্লাব-এ এসেছি সকালবেলায়, শুধু ক্লেটনই এর ব্যতিক্রম, কারণ কালকের রাতটা সে ক্লাবেই কাটিয়েছে—এবং এ ঘটনা থেকেই তার গল্পের অনিবার্য সূত্রপাত। যতক্ষণ বল দেখা যায়, ততক্ষণ আমরা গলফ্ খেলেছি। রাতের খাওয়া-দাওয়াটাও সেরে নিয়েছি এবং প্রত্যেকের মেজাজে গল্পের যন্ত্রণা সহ্য করার মতো একটা শান্ত দয়ার আবেশ। ক্লেটন গল্প শুরু করতেই আমরা স্বাভাবিক ভাবে ধরে নিয়েছি সে গাঁজাখুরি কোনো কাহিনী শোনাচ্ছে। তবে এ কথা সত্যি যে, সে কাহিনীর শুরু করেছিল অত্যন্ত সহজ-সরল ভঙ্গীতে, যেন কোন সত্যি ঘটনা শোনাচ্ছে। কিন্তু আমরা ভেবেছি, সেটা মানুষটার দূরারোগ্য গল্প বলার কায়দা।

জানো, কাল রাতে এখানে আমি একা ছিলাম? স্যান্ডারসনের নেড়েচেড়ে দেওয়া একটা জ্বলন্ত কাঠের গুড়ি থেকে ঠিকরে ওঠা আগুনের ফুলকি-বৃষ্টির দিকে অনেকক্ষণ চিন্তামগ্ন চোখে তাকিয়ে থেকে ক্লেটন মন্তব্য করল।

শুধু ক্লাবের পোষা জন্তু-জানোয়ারগুলো ছাড়া—বলল উইশ।

হ্যাঁ, তবে ওরা বাড়ির ওদিকটায় শোয়—বলল ক্লেটন, যাই হোক, কাল রাতে—সে হাতের চুরুটে কিছুক্ষণ এক মনে টান দিল, যেন নিজের আত্মবিশ্বাস সম্পর্কে ইতস্তত করছে। তারপর বেশ শান্ত ভাবেই বলল, আমি একটা ভূত ধরেছি!

ভূত ধরেছ! বল কী? স্যান্ডারসন বলল, কই দেখি?

তখন চার-সপ্তাহ আমেরিকায় ঘুরে আসা ক্লেটনের একান্ত অনুগত ভক্ত ইভান্স চিৎকার করে উঠল, ভূত ধরেছ, তুমি? ওঃ, দারুণ! শীগগীর বল, কী করে কী হল।

ক্লেটন ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে আমার দিকে তাকাল, বলল, কেউ যে আড়ি পাতবে তা নয়, তবে ভূত নিয়ে গুজব ছড়িয়ে ক্লাবের চমৎকার পরিচর্যা-পরিবেশন পণ্ড হয়ে যাক তা আমি চাই না। তাছাড়া এটা ঠিক নিত্যকার ভূত নয়।

মনে হয় না ওটা আর কখনও আবার আসবে।

তার মানে ভূতটা তুমি ধরে রাখনি? স্যান্ডারসন বলল।

ধরে রাখতে মন চাইল না—বলল ক্লেটন।

আমরা জোর গলায় হেসে উঠতেই ক্লেটনকে একটু বিমর্ষ মনে হল। ছোট্ট করে হেসে সে বলল, বুঝতে পারছি, তবে সত্যিই ওটা একটা ভূত

ছিল। আমি ঠাট্টা করছি না। বিশ্বাস কর।

স্যান্ডারসন তার লালচে চোখ ক্লেটনের ওপর রেখে পাইপে গভীর টান দিয়ে, অনেক কথার চেয়েও বেশি ইঙ্গিতময় এক সরু ধোঁয়ার ফোয়ারা ছুড়ে দিল।

ক্লেটন ব্যাপারটা গায়ে মাখল না—এ আমার জীবনের সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা।

তোমরা তো জানো, আমি ভূত-টুত একেবারে বিশ্বাস করি না, আর আমিই কিনা শেষে একটা ভূত ধরে বসলাম, এখন গোটা ব্যাপারটাই আমার হাতে।

আরো কিছুক্ষণ গভীর ধ্যানে ডুবে রইল সে, তারপর দ্বিতীয় একটা চুরুট বের করে একটা অদ্ভুত দর্শন ছুরি দিয়ে সেটা ফুটো করতে লাগল।

তুমি ওটার সঙ্গে কথা বলেছ? উইশ প্রশ্ন করল।

তা ধর প্রায় ঘণ্টাখানেক বলেছি।

মিশুকে আড্ডবাজ? সন্দেহ-বাতিকদের দলে নাম লিখিয়ে আমিও শ্লেষের খোঁচাটা দিলাম ক্লেটনকে।

বেচারা খুব বিপদে পড়েছিল—চুরুটের ডগার ওপর ঝুঁকে পড়ে ক্লেটন বলল। সে মুখে প্রতিবাদ বা বিরক্তির লেশমাত্র নেই।

কাঁদছিল? কে যেন জানতে চাইল।

স্মৃতি রোমন্থন করে বাস্তবিকই এক দীর্ঘশ্বাস ফেলল ক্লেটন। বলল, হা ভগবান! সত্যিই কাঁদছিল বেচারা।

তুমি মেরেছ ওকে? যথাসম্ভব আমেরিকান কায়দায় প্রশ্ন করল ইভান্স।

তাকে উপেক্ষা করে ক্লেটন বলল, কখনো বুঝিনি, ভূতদের এ রকম করুণ অবস্থা হতে পারে—সে আবার আমাদের কিছুক্ষণ অপেক্ষায় রাখল, পকেট হাঁতড়ে দেশলাই খুঁজে বের করে চুরুটে আগুন ধরাল।

আমি অবশ্য একটা সুযোগ নিয়েছি—অবশেষে সে মন্তব্য করল।

আমরা এতটুকু ব্যস্ততা না দেখিয়ে প্রতীক্ষায় রইলাম।

যে সব ভূতরা সাধারণত ভয় দেখিয়ে বেড়ায়, তারা বুনো ঘোড়ার মতো গোঁয়ার্তুমি করে একই জায়গায় বার বার ফিরে আসে। কিন্তু এ বেচারা সেরকম নয়। প্রথম দেখাতেই ওকে আমার খুব দুর্বল বলে মনে হয়েছে।

চুরুটের টানে নিজের বক্তব্যকে যতিচিহ্নিত করে ক্লেটন বলল, ওর সঙ্গে হঠাৎই দেখা হয়ে গেল লম্বা বারান্দাটায়। প্রথম আমিই ওকে দেখতে পাই—আমার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ওকে ভূত বলে আমি চিনতে পারলাম। ওর চেহারাটা কেমন স্বচ্ছ আর সাদাটে, সোজা ওর বুক ভেদ করে বারান্দায় শেষ মাথার ছোট্ট জানালার আলোর রেশটুকু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। শুধু চেহারা নয়, ওর হাবভাব পর্যন্ত আমার কাছে দুর্বল ঠেকছিল। যেন কী করবে ঠিক করে উঠতে পারছে না। একটা হাত কাঠের দেওয়ালে ভর রেখে অন্য হাতটা মুখের কাছে নাড়ছে। ঠিক—এই রকম!

চেহারা কী রকম ছিল? স্যান্ডারসন বলল।

রোগা। ছোটখাটো, মাথায় খোঁচা খোঁচা কদমছাঁট চুল। কান দুটো বিচ্ছিরি। কাঁধ ভীষণ সরু। পরণে ভাঁজ করা কলার দেওয়া খাটো কেনা জ্যাকেট, ঢোলা প্যান্টুলটা পায়ের কাছটায় ছিঁড়ে গেছে। চুপিসারে আমি সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেছি। সঙ্গে আমার কোনো আলো ছিল না—পায়ে ছিল হালকা চটি। সিঁড়িতে উঠেই ওকে আমার নজরে পড়ল। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম—ভাল করে ওকে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করলাম। ভয় কিন্তু একটুও পাইনি। বরং অবাক হয়েছি আর কৌতূহলও গেছে বেড়ে। ভাবলাম, ওঃ ভগবান! এদ্দিনে তাহলে একটা ভূতের দেখা পেলাম। আর গত পঁচিশটা বছর আমি কিনা এক মুহূর্তের জন্যেও ভূতে বিশ্বাস করিনি!

হুম্—বলল উইশ।

আমি সিঁড়ি বেয়ে ওঠা মাত্রই ভূতটা আমাকে দেখতে পেল। চকিতে ঘুরে তাকাল আমার দিকে। সব মিলিয়ে অপরিণত যুবকের মুখ, থুতনি ও নাকের গড়ন কেমন দুর্বল, ঠোঁটের ওপরে খোঁচা খোঁচা গোঁফ। এক মুহূর্ত আমরা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম—ও কাঁধের ওপর দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে—এবং জরিপ করতে লাগলাম পরস্পরকে। তারপরই মনে হয় নিজের উঁচুদরের পেশার কথা ওর মনে পড়ল। ও ঘুরে দাঁড়িয়ে টান টান হয়ে খাড়া হল, মুখটা সামনে বাড়িয়ে হাত দুটো ভূতুড়ে নিয়ম মাফিক দু'পাশে ছড়িয়ে এগিয়ে এলো আমার দিকে। আর এগিয়ে আসবার সময় মুখটা হাঁ করে এক হালকা টানা চিৎকার করে আমাকে ভয় দেখাতে চাইল। কিন্তু না—ওটা শুনে এক ফোঁটাও ভয় পেলাম না। খাওয়া-দাওয়া করে আমি তখন এক বোতল শ্যাম্পেন শেষ করেছি, আর একা একা থাকার ফলে হয়তো দু-তিন পেগ—না, হয়তো চার-পাঁচ পেগ হুইস্কিও টেনে ফেলেছি, সুতরাং আমার শরীর তখন নিরেট পাথরের মতো—ভয় পাওয়া তো দূরস্থান! ভূতটাকে বললাম—'বোকার মতো চেঁচিও না! এটা তো তোমার আস্তানা নয়। তাহলে কী করছ এখানে?'

স্পষ্ট দেখলাম, ও কুঁকড়ে গেল। তারপর আবার চিৎকার করল, 'ওঁ-ওঁ-ওঁ—'

'রাখ তোমার ভূতুড়ে চিৎকার! তুমি কি এ ক্লাবের মেম্বার?' আমি বললাম, আর ওকে যে আমি পাত্তাই দিচ্ছি না সেটা দেখাবার জন্যে ওর শরীরের একটা কোণা ভেদ করে বেরিয়ে গেলাম, তারপর মনোযোগ দিলাম মোমবাতি জ্বালতে। ওর দিকে আড়চোখে চেয়ে আবার জিগ্যেস করলাম, 'তুমি কি মেম্বার?'

আমাকে জায়গা দিতে ও একটু সরে গেল, ওর মুখের ভাব কী রকম যেন মনমরা হল।

তারপর আমার চোখের নাছোড়বান্দা নীরব প্রশ্নের উত্তরে বলল, না, আমি মেম্বার নই—আমি একটা ভূত।

'সে যা-ই হও, তাতে তো আর মারমেইড ক্লাবের ভেতরে যথেচ্ছ ঘোরাঘুরি করা যায় না। তুমি কারো সঙ্গে দেখা করতে চাও, না কি?' খুব সাবধানে আমাকে কথাবার্তা বলতে হচ্ছিল, কারণ, নইলে আমার হুইস্কি-জনিত বিশৃঙ্খল ব্যবহারকে ও ভেবে বসবে আমি ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছি। জ্বলন্ত মোমবাতিটা হাতে নিয়ে ওর দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম, 'তুমি এখানে করছটা কী?'

ও ততক্ষণে হাত নামিয়ে চিৎকার বন্ধ করে ফেলেছে, লজ্জা পেয়ে ভ্যাবাচাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে চুপচাপ। কিছুক্ষণ পরে ও বলল, 'আমি এখানে ভয় দেখাতে এসেছি।'

'কে বলেছে তোমাকে ভয় দেখাতে?' শান্ত গলায় বললাম।

'বললাম তো, আমি ভূত—' যেন নিজের পক্ষ সমর্থনে ও বলল।

'সে হও গিয়ে, কিন্তু ভদ্রলোকদের প্রাইভেট ক্লাবে এসে এভাবে ভয় দেখাবার কোনো অধিকার তোমার নেই, এখানে মেয়েরা, বাচ্চারা প্রায়ই আসে। তাদের কেউ যদি হঠাৎ তোমার মুখোমুখি পড়ে যায়, তাহলে তো সত্যি সত্যিই ভয় পেয়ে যাবে। একবারও ভেবেছ সে কথা?'

'না তো, স্যার—ভাবিনি।'

'ভাবা উচিত ছিল। তাছাড়া এ জায়গাটার ওপর তোমার কি কোনো দাবী আছে? মানে, এখানে তুমি খুন-টুন কিছু হয়েছিলে?'

'না স্যার, সে-রকম কিছু নয়, তবে আমি ভাবছিলাম, জায়গাটা বেশ সেকেলে গোছের, ওক্ কাঠের দেওয়াল চারদিকে, তাই—'

'এটা একটা অজুহাত হল?' আমি শক্ত গলায় বললাম, 'এখানে আসাটা তোমার খুব ভুল হয়েছে—' বন্ধুত্বে ভরা আদেশের সুরে আরও বললাম, 'আমি হলে আর মোরগের ডাক শোনার অপেক্ষা করতাম না—এক্ষুণি উধাও হয়ে যেতাম।'

ও ভীষণ অস্বস্তিতে পড়ল। 'আসলে কী জানেন, স্যার—' ও বলতে শুরু করল। আমি হলে কিন্তু এই মুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে যেতাম—' বেশ জোর দিয়ে আমি বললাম।

'আসলে—স্যার—মানে—আমি অদৃশ্য হতে পারছি না।'

'পারছ না?'

'না স্যার। মানে, আমি কী যেন একটা ভুলে গেছি। কাল মাঝরাত থেকে আমি শুধু এখানে ঘোরাঘুরি করছি, আলমারিতে, দেরাজে, শোবার ঘরে লুকিয়ে লুকিয়ে থেকেছি। মনটা কেবলই ছটফট করছে। আগে কখনও আমি ভয় দেখাতে আসিনি—মনে হচ্ছে, না এলেই ভাল হতো।'

'না এলেই ভাল হতো?'

'হ্যাঁ স্যার। আমি অনেকবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু ঠিকভাবে পেরে উঠছি না। কী একটা ছোট্ট ব্যাপার যেন ভুলে গেছি, আর মনে করতে পারছি না।'

এ কথা শুনে, বুঝলে, আমি যেন একেবারে বোল্ড আউট হয়ে গেলাম। ও আমার দিকে এমন মনমরা চোখে তাকাল যে আমি আর তর্জন-গর্জনের সুর বজায় রাখতে পারলাম না। 'ভারী অদ্ভুত তো—' বললাম আমি, এবং কথা বলার সময় মনে হল নীচের তলায় কারো চলাফেরার শব্দ পেলাম।—'চল, আমার ঘরে চল। সেখানে গিয়ে তোমার সব কথা শুনব। আমি ব্যাপার-স্যাপার ঠিক বুঝতে পারছি না।' ওকে ধরে আমার সঙ্গে নিতে চাইলাম। কিন্তু বুঝতেই পারছ, সে চেষ্টা একরাশ ধোঁয়াকে মুঠো করে ধরবার চেষ্টারই মতো! আমার ঘরের নম্বরটা কিছুতেই আমার মনে পড়ছিল না। বেশ কয়েকটা শোবার ঘর খোঁজাখুঁজির পর আমার ঘরের দরজা নজরে পড়ল। একটা আরাম কেদারায় গা এলিয়ে ওকে বললাম, 'যাক, এইবার বসে ধীরে-সুস্থে তোমার গপ্পোটা বলো দেখি। মনে হচ্ছে, তুমি বেশ ভাল ঝামেলাতেই পড়েছ।'

যাই হোক, ও বসতে রাজি হল না, বলল, আমার আপত্তি না থাকলে ও বরং ঘরের মধ্যে একটু পায়চারি করতে চায়। তাই হল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা এক দীর্ঘ-গভীর আলোচনায় ডুবে গেলাম। একটু পরে হুইস্কি ও সোডার আমেজটা কিছুটা কমে এলে ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারলাম, কী ভয়ংকর বিপজ্জনক ভূতুড়ে ব্যাপারেই না আমি আগাপাস্তলা জড়িয়ে পড়েছি। অর্ধ-স্বচ্ছ শরীর নিয়ে পর্দাঘেরা সুন্দর পরিচ্ছন্ন সেকেলে শোবার ঘরে ও দিব্যি এপাশ-ওপাশ নিঃশব্দে পায়চারি করছে। নিয়ম-মাফিক ভূতের মতোই ওর চেহারা ও চালচলন—তফাত শুধু হালকা গলার স্বরটুকুতে। আমার মোমবাতি দানের ম্লান আলো ওর শরীর ভেদ করে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, চোখে পড়ছে দেওয়ালে টাঙানো ফ্রেমে বাঁধানো খোদাইয়ের কাজগুলো, আর ও আমাকে শুনিয়ে চলল ওর করুণ জীবন-কাহিনী—যা সদ্য সদ্য শেষ হয়েছে এই পৃথিবীর বুকে। ওর মুখের চেহারা খুব সাধু না হলেও বলতে পারি, স্বচ্ছ হওয়ার ফলে ওর পক্ষে সত্যি বলা ছাড়া পথ ছিল না।

তার মানে? হঠাৎই চেয়ারে সোজা হয়ে বসে উইশ বলল।

কী মানে? ক্লেটন জানতে চাইল।

এই—স্বচ্ছ হওয়ার ফলে—সত্যি বলা ছাড়া পথ ছিল না—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

আমিও বুঝিনি—অননুকরণীয় আশ্বাসের ভঙ্গীতে ক্লেটন বলল, তবে কথাটা যে সত্যি, এটুকু বলতে পারি। ওর কাছে শুনলাম, কীভাবে ও মারা গেছে—লণ্ডনের এক পাতাল-ঘরে ও মোমবাতি হাতে নেমেছিল কোথায় গ্যাস লিক্ করছে দেখতে—আর বেঁচে থাকতে লন্ডনেরই এক বেসরকারি ইস্কুলের ইংরিজির মাস্টার ছিল।

বেচারা! আমি মন্তব্য করলাম।

যা বলেছ। বেঁচে থাকলেও ওর জীবন ছিল উদ্দেশ্যহীন, মরে গিয়েও তাই। ও তার বাপ-মা, মাস্টারমশাই—অনেকের কথাই বলল। কেউ ওকে বুঝত না, কোনো আমল দিত না। সত্যিকারের বন্ধু বলতে কেউ ছিল না ওর। সফলতা ওর জীবনে কোনো দিন আসেনি। খেলাধূলা ও বরাবরই এড়িয়ে চলেছে এবং পরীক্ষায় ফেল করেছে বারবার। একটা মেয়ের সঙ্গে বিয়েও ঠিক হয়ে গিয়েছিল আর ঠিক সেই সময়েই ঘটল ওই গ্যাস-সংক্রান্ত দুর্ঘটনা। 'এখন তাহলে কোথায় আছ?' আমি জানতে চাইলাম, 'মানে—'

দেখলাম, ব্যাপারটা ওর কাছে ঠিক পরিষ্কার নয়। মানে যেখানেই ও থাক, ওর সঙ্গে এখন রয়েছে একদল স্বজাতীয় ভূত, আর ওরা নিজেদের মধ্যে প্রায়ই কোনো বাড়িতে গিয়ে আস্তানা গাড়বার কথা আলোচনা করে। হ্যাঁ, কোনো বাড়িকে ভূতুড়ে বাড়ি বানাবার মতলব আর কি! ওদের কাছে এই ব্যাপারটা ভীষণ রোমাঞ্চকর, তবে ওদের বেশির ভাগই সব সময় ভয়ে পিছিয়ে আসতে চায়। সুতরাং, অবশেষে ও আবির্ভূত হয়েছে।

আশ্চর্য বটে! জ্বলন্ত আগুনের দিকে চোখ রেখে উইশ বলল।

ওর কথাবার্তা শুনে আমার মোটামুটি এই রকমই মনে হয়েছে—ক্লেটন বিনয়ের সঙ্গে বলল, এক মনে পায়চারি করতে করতে মিহি সুরে ও কথা বলে গেছে—শুধু কথা—নিজের করুণ অবস্থা সম্পর্কে। ভয় দেখাতে এসে এই বিতিকিচ্ছিরি ঝামেলায় পড়ে ও ভীষণ মনমরা হয়ে পড়েছিল। সবাই ওকে বলেছিল এতে নাকি খুব মজা হবে। তা, সেই মজা পাওয়ার আশাতেই ও ক্লাবে এসে উদয় হয়েছিল, কিন্তু কোথায় কী! ওর সারা জীবনের ব্যর্থতার লিস্টে আরো একটা ঘটনা যোগ হল মাত্র। ও বলল, যখনই যা কিছু ও করতে গেছে, সেটাই নাকি কেমন তালগোল পাকিয়ে ভণ্ডুল হয়ে গেছে। ওর কথা আমি একটুও অবিশ্বাস করিনি। যদি অন্তত কারো সহানুভূতিও ভূতটা পেত—এই পর্যন্ত বলে ও একটু থামল, নজর করে দেখল আমাকে, তারপর মন্তব্য করল যে শুনতে অবাক লাগলেও আমিই নাকি প্রথম ব্যক্তি যে ওর প্রতি একটু হলেও সহানুভূতি দেখিয়েছি—এটুকু দয়াও কারও কাছ থেকে ভূতটা পায়নি।

তক্ষুনি আমি বুঝতে পারলাম, ও আসলে কি চায়, এবং মন মনে রাজিও হলাম ওকে সাহায্য করতে। চটপট উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'এ সব নিয়ে বেশী মন খারাপ কোরো না। যে করে হোক তোমাকে আবার ফিরে যেতেই হবে। নাও আর একবার তৈরি হয়ে চেষ্টা কর দেখি।' আমি এমনিতে নিষ্ঠুর হতে পারি, কিন্তু একজন যখন আমাকে সত্যিকারের বন্ধু বলে সম্মান দিয়েছে তখন তাকে সাহায্য না করাটা আমার সহ্যের বাইরে—তা সে মানুষ হোক আর ভূতই হোক। আমার কথায় ও বলল, 'আমি পারছি না।'

'পারতেই হবে।' আমি বললাম এবং ও সত্যিই চেষ্টা করতে লাগল।

চেষ্টা! বলল স্যান্ডারসন, কেমন করে?

হাত নাড়াচাড়া করে, ক্লেটন বলল।

হাত নাড়াচাড়া করে?

হ্যাঁ, বিভিন্ন জটিল ভঙ্গীতে হাত নাড়াচাড়া করে। ঐ ভাবেই ও এখানে এসে হাজির হয়েছিল, এবং একইভাবে ওকে আবার অদৃশ্য হতে হবে। ওঃ ভগবান! কী কাজেই না ফেঁসেছি!

কিন্তু, শুধু হাত নেড়ে কেমন করে—আমি বলতে শুরু করলাম।

তুমি দেখছি সব কিছুরই জট খুলতে চাও—আমার দিকে ফিরে বিশেষ কয়েকটা শব্দের ওপর জোর দিয়ে ক্লেটন বলল, কেমন করে আমি জানি না। শুধু জানি, ও অন্তত তাই করেছিল। বহু চেষ্টার পর, বুঝলে, এক সময় ওর হাতের ভঙ্গীগুলো ঠিক ঠিক হতেই ভূতটা হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

ভঙ্গীগুলো তুমি খেয়াল করেছিলে? স্যান্ডারসন ধীরে ধীরে বলল।

হ্যাঁ—বলল ক্লেটন, মনে হল কিছু একটা ভাবছে, ভঙ্গীগুলো ভারী অদ্ভুত। আমি আর সেই রোগা আবছা ভূতটা বসে আছি সেই নিস্তব্ধ জনশূন্য সরাইখানায়। আমাদের কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কোনো শব্দ সেখানে ছিল না। শুধু ছিল ওর হাতের নাড়াচাড়ায় শূন্যে তৈরি এক আবছা ছবি। একটা মোমবাতি শোবার ঘরের অন্ধকার দূর করছে, আর দ্বিতীয় একটা জ্বলন্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে ড্রেসিং-টেবিলে, আলো বলতে সব মিলিয়ে ওইটুকুই—কখনো-সখনো মোমবাতির আলো ক্ষণিকের জন্যে দপ্ করে জ্বলে উঠছে দীর্ঘ তন্বী বিহ্বল শিখায়। আর অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটতে লাগল। 'আমি পারছি না—ও বলল, আমার দ্বারা সম্ভব নয়—!' এবং হঠাৎই বিছানার পায়ের দিকে ছোট্ট চেয়ারে বসে ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে

কাঁদতে লাগল। ভগবান! কী হয়রানি একবার বোঝ।

'কী হচ্ছে কী এসব?' থাম, এ কথা বলে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে গেলাম, কিন্তু...আমার হতচ্ছাড়া হাতটা ওর শরীর ভেদ করে চলে গেল। মনে আছে, বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো ছিটকে সরিয়ে নিয়েছি আমার হাত। সামান্য শিউরে উঠে সরে এসেছি ড্রেসিং-টেবিলের কাছে। তারপর, ওকে মদৎ দিতে আমিও চেষ্টা করতে শুরু করলাম।

কী করে! স্যান্ডারসন বলল, হাত নাড়াচাড়ার ভঙ্গী করে?

হ্যাঁ, তাই।

কিন্তু—কী একটা ভেবে বলতে শুরু করেছিলাম আমি, কিন্তু সেটা খেয়াল করে উঠতে পারলাম না।

আশ্চর্য ব্যাপার তো—পাইপের গর্তে আঙুল ঢুকিয়ে স্যান্ডারসন বলল, তার মানে, তোমার এই ভূতটা সমস্ত রহস্যই তোমার কাছে—

ফাঁস করে দিয়েছে কিনা? হ্যাঁ, দিয়েছে।

হতে পারে না—বলল উইশ, এ সম্ভব নয়। কারণ, তাহলে তুমিও ওর সঙ্গে উধাও হয়ে যেতে।

ঠিক বলেছ—আমি আমার মনের কথা ফিরে পেয়ে সমর্থন জানালাম। কিছুক্ষণের জন্য সবাই চুপচাপ।

শেষ পর্যন্ত ও পারল? স্যান্ডারসন জানতে চাইল।

হ্যাঁ, পারল, তবে অনেক চেষ্টার পর—বলতে পারো হঠাৎই হয়ে গেল। ও তো হতাশই হয়ে পড়েছিল, তারপর আমাদের দুজনের মধ্যে এক চোট হল, তখন হঠাৎ ও উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে পুরো ভঙ্গীটা আস্তে আস্তে করে দেখাতে বলল, যাতে ও ভালো করে লক্ষ্য করতে পারে। 'আপনারটা খুঁটিয়ে দেখলে আমি বুঝতে পারব আমার ভুলটা কোথায় হচ্ছে', বলল ভূতটা। এবং সত্যিই পারল। কিন্তু হঠাৎ ও একটু রুক্ষ গলায় বলল, 'আপনি এভাবে তাকিয়ে থাকলে আমি পারব না—এই জন্যে তখন থেকে সব খালি গুলিয়ে যাচ্ছে। আপনাকে দেখে আমি আরও নার্ভাস হয়ে যাচ্ছি।' যাই হোক, কিছুক্ষণ আমাদের মধ্যে একটু কথা কাটাকাটি হল। বুঝতেই পারছ, আমার ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু ভূতটা একেবারে বুনো ঘোড়ার মতো বেঁকে বসল। সুতরাং, অগত্যা আমি ঘুরে দাঁড়ালাম, তাকিয়ে রইলাম বিছানার পাশে রাখা পোশাক আলমারির আয়নায়।

ও একেবারে ঝটপট শুরু করে দিল। আয়না দিয়ে আমি ওর সমস্ত কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগলাম। হাত দুটো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, এই ভাবে, এই রকম করে, বিচিত্র সব ভঙ্গী করতে শুরু করল ভূতটা, তারপর হঠাৎই ঝুপ করে এসে পরল শেষ ভঙ্গীটা—সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দুটো হাত টান টান করে ছড়িয়ে দাও দু'পাশে—এই রকম, ঠিক এই ভাবে ও দাঁড়াল। তারপরই উধাও! হাপিশ! হাওয়া! আয়না ছেড়ে বোঁ করে ঘুরে দাঁড়ালাম ওর দিকে। কিন্তু কোথায় কে! জ্বলন্ত মোমবাতি ও হোঁচট খাওয়া চিন্তা নিয়ে ঘরে আমি সম্পূর্ণ একা। ব্যাপারটা কী হল? সত্যিই কি কিছু ঘটেছে? না অতক্ষণ ধরে আমি স্বপ্ন দেখেছি?...আর ঠিক তখনই সিঁড়ির দেওয়াল-ঘড়িটা যবনিকাপাতের বিচিত্র সুরে আবিষ্কার করল, রাত একটার ঘণ্টা বাজানোর পক্ষে সময়টা বেশ জমে উঠেছে। সুতরাং!—ঢং! ব্যস্, আমার শ্যাম্পেন ও হুইস্কির তাবৎ নেশা তখন কেটে গেছে। আর কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে—ভীষণ অদ্ভুত। ওঃ ভগবান!

চুরুটের ছাইটাকে এক মুহূর্তে সে জরিপ করল, তারপর বলল, 'এই-ই সব।

তারপর তুমি ঘুমোতে চলে গেলে? ইভান্স প্রশ্ন করল।

তাছাড়া আর কী করব?

আমি উইশের চোখে তাকালাম। আমরা সবাই মিলে ক্লেটনকে ব্যঙ্গ করতে চাইলাম, কিন্তু ওর কথায় ও ব্যবহারে এমন কিছু একটা ছিল যে শেষ পর্যন্ত সেটা আর পেরে উঠলাম না।

আর সেই হাত নাড়ার কায়দাগুলো? বলল স্যান্ডারসন।

ওগুলো আমি এখনই করে দেখাতে পারি।

তাই নাকি। একটা পেনসিল-কাটা ছুরি বের করে পাইপের গর্তের ভেতরটা চাঁছতে চাঁছতে বলল স্যান্ডারসন, তাহলে করে দেখাও।

দেখাচ্ছি—বলল ক্লেটন।

দেখ, ওতে কোনো কাজ হবে না—ইভান্স বলল।

কিন্তু, যদি হয় তাহলে—আমি বলতে চেষ্টা করলাম।

জানো, আমার মনে হচ্ছে, এ সব নিয়ে ছেলেমানুষী না করাই ভালো, বলল উইশ, তারপর পা ছড়িয়ে আয়েস করে বসল।

উইশের সঙ্গে আমাদের বিতর্ক শুরু হল। তার মতে ওই সব ভঙ্গী যদি ক্লেটন নকল করতে যায় তাহলে সেটা একটা গুরুতর ব্যাপার নিয়ে ভীষণ ঠাট্টা করা হবে। কিন্তু গল্পটার এক বর্ণও কি তোমার বিশ্বাস হয়?

আমি জানতে চাইলাম।

উইশ চকিতে চোখ ফেরাল ক্লেটনের দিকে। সে তখন অগ্নি-আধারের জ্বলন্ত আগুনের দিকে তাকিয়ে মনে মনে কী যেন ওজন করে দেখছে।

হ্যাঁ, বিশ্বাস হয়—অর্ধেকেরও বেশি বিশ্বাস হয়—উইশ বলল।

ক্লেটন—আমি বললাম, তোমার গল্পের গাঁজাখুরি ধরে ফেলা আমাদের কম্মো নয়। গল্পটা এমনি ঠিকঠাকই ছিল, কিন্তু ওই অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা...তুমি আমাদের মনে একেবারে সত্যি ঘটনার মতো গেঁথে দিয়েছ। নাও বাবা, এবারে স্বীকার করে ফেল যে পুরোটাই গুল-তাপ্পি ছাড়া আর কিছু নয়।

আমার কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না করে ক্লেটন উঠে দাঁড়াল, অগ্নি-আধারের সামনে বিছানো কার্পেটের ঠিক মাঝখানটায় গিয়ে থামল, এবং ঘুরে দাঁড়াল আমার দিকে মুখ করে। এক মুহূর্ত সে নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবল, তারপর সারাটাক্ষণই তার চোখ গভীর মনোযোগে স্থির হয়ে রইল মুখোমুখি দেওয়ালের ওপর। ধীরে ধীরে সে তার দু'হাত তুলে ধরল চোখের সমান্তরাল করে, এবং শুরু করল...

এখানে বলে রাখা ভালো, প্রাচীন এবং বর্তমান স্থাপত্য কর্মের নানান্ রহস্য নিয়ে স্যান্ডারসন অনেক গবেষণা করেছে। ফলে ক্লেটনের প্রতিটি অঙ্গভঙ্গী সে রক্তাভ চোখে গভীর আগ্রহে লক্ষ্য করতে লাগল। ক্লেটনের শেষ হলে সে বলল, মন্দ নয়। তুমি জোড়াতালি দিয়ে মোটামুটি ভালোই দেখিয়েছ, তবে একটা ছোট্ট জায়গা বাদ পড়ে গেছে।

জানি—ক্লেটন বলল, তারপর হাত ছুড়ে, দুলিয়ে, ছোট্ট এক অদ্ভুত মোচড় দিয়ে থামল, এই-টা তো? ভূতটা তো এই জায়গাটাই বার বার ভুলে যাচ্ছিল। দাঁড়াও, এবার পুরোটা তোমাদের প্রথম থেকে করে দেখাই।

অস্তমিত আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসল ক্লেটন। কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে, সেই হাসিতে সামান্য ইতস্তত ভাব ছিল। সে বলল, তাহলে শুরু করছি—

আমি হলে কিন্তু করতাম না—বলল উইশ।

না না, ঠিক আছে। ইভান্স বলল, পদার্থ অবিনশ্বর। তোমার কি ধারণা এ সব ভোজবাজি ক্লেটনকে অশরীরী জগতে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে? মোটেই না। আমি তো বলব, ক্লেটন ভায়া, যতক্ষণ না তোমার হাতজোড়া কাঁধ থেকে খুলে পড়ে যাচ্ছে ততক্ষণ তুমি চেষ্টা করে যাও।

আমার মত তা নয়—উঠে দাঁড়াল উইশ, এগিয়ে এসে ক্লেটনের কাঁধে হাত রাখল, যে করে হোক তোমার গল্পটা আমাকে তুমি অর্ধেকেরও বেশি বিশ্বাস করিয়ে দিয়েছ, ফলে আমি চাই না তুমি এসব নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করো।

হায় কপাল! উইশ দেখছি ভয় পেয়ে গেছে। আমি বললাম।

হ্যাঁ, ভয় পেয়েছি! আমার দিকে ফিরে তীব্র গলায় বলল উইশ, আমার ধারণা ওইসব হাতের ভঙ্গী ঠিক ঠিক নকল করলে ক্লেটনও উধাও হয়ে যাবে। উইশের মনোভাব হয় সত্যি, নয়তো বলতে হয়, ও অভিনয় প্রশংসা করার মতো।

ও সব কিছু হবে না—আমি চিৎকার করে বললাম, এ পৃথিবীকে ফাঁকি দেবার একটাই মাত্র উপায় মানুষের হাতে আছে, আর সে হতে ক্লেটনের এখনও তিরিশ বছর দেরি। তাছাড়া...ওই রকম একটা ভূত! তোমার কী মনে হয়?

গতিশীল হয়ে আমাকে বাধা দিল উইশ। ছড়িয়ে থাকা চেয়ারের বৃত্ত ছেড়ে সে এগিয়ে এলো, টেবিলের পাশে এসে থমকে দাঁড়াল।

ক্লেটন—সে বলল, তুমি একটা বোকা।

রসিকতার আলো দু'চোখে ঝিকিয়ে হাসি ফিরিয়ে দিল ক্লেটন।

উইশ ঠিকই বলেছে। তোমাদের ধারণা ভুল—ক্লেটন বলতে শুরু করল। আমিও উধাও হয়ে যাব। এই সব হাত নাড়াচাড়ার বিচিত্র ভঙ্গী যেই শেষ হবে, বাতাস কাটার শব্দের রেশ যখন শিস দিয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে অমনি—হুস্!—এই কার্পেট পড়ে থাকবে সম্পূর্ণ খালি, অবাক বিস্ময়ে সারাটা ঘর হয়ে যাবে স্তম্ভিত, এবং পনেরো স্টোন ওজনের সুবেশ এক ভদ্রলোক টুপ্ করে গিয়ে পড়বে অশরীরী জগতে। এতে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই। তোমাদেরও থাকবে না। ফালতু তর্কের মধ্যে আমি আর যেতে চাই না। সোজাসুজি চেষ্টা করেই দেখা যাক।

না! চিৎকার করে সামনে এক পা এগিয়ে এলো উইশ এবং পরক্ষণে থমকে দাঁড়াল। কারণ ক্লেটন তখন হাত তুলে সেই প্রেতাত্মার হাত নাড়ার ভঙ্গীগুলো আবার নকল করতে শুরু করেছে।

ততক্ষণে আমরা এক অদ্ভুত উত্তেজনার চরমে পৌঁছে গেছি—বিশেষ করে উইশের আচরণের জন্য। ক্লেটনের দিকে নিশ্চল চোখ রেখে আমরা সকলে বসে আছি। বিশেষ করে আমার তখন এক বিচিত্র কঠিন নিঃসাড় অবস্থা, যেন আমার মাথার পিছন থেকে উরুর মাঝামাঝি পর্যন্ত গোটা শরীরটা ইস্পাতে পরিণত হয়ে গেছে। আর ক্লেটন এক অদ্ভুত শান্ত মুখভাব নিয়ে নিজের অবয়ব ঝুঁকিয়ে দুলিয়ে ওর হাত নাড়াচাড়ার ভঙ্গী করে চলল। যতই সে শেষের দিকে এগোতে লাগল ততই আমাদের উৎকণ্ঠা বাড়তে লাগল, একটা হিমেল হাওয়া যেন আমাদের চোখ মুখ ছুঁয়ে গেল। শেষ ভঙ্গীটুকু ছিল হাত দুটোকে টান টান করে দু'পাশে ছড়িয়ে দেওয়া এবং তার সঙ্গে মুখ তুলে ধরা। যখন সে যবনিকা পতনের কায়দায় হাত দুটো দু'পাশে ছড়িয়ে দিল, আমার শ্বাসপ্রশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এল। যদিও মানছি, এর কোনো মানে হয় না। তবে ব্যাপারটা অনেকটা যেন ছমছমে ভূতুড়ে গলার মতো। রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর অদ্ভুত ছায়াময় এক বাড়ির ভেতর বসে এই ঘটনার সাক্ষী থাকা। মনে মনে ভাবতে থাকলাম, সত্যিই কি শেষ পর্যন্ত ও—?

মুখ ওপরে তুলে, দু'হাত দু'পাশে ছড়িয়ে, নিশ্চিন্ত উজ্জ্বল অভিব্যক্তি নিয়ে ঝুলন্ত আলোর আভায় এক বিস্ময়কর মুহূর্ত ধরে দাঁড়িয়ে রইল ক্লেটন। সেই একটা মুহূর্ত আমাদের কাছে যেন একটা যুগ। আর তার পরেই আমাদের বুক ভেদ করে বেরিয়ে এল স্বস্তির এক অনন্ত দীর্ঘশ্বাস এবং আশ্বস্ত হওয়ার একগুচ্ছ অস্ফুট শব্দ, না! কিছুই হয়নি। কারণ, চোখের সামনেই দেখছি ক্লেটন অদৃশ্য হয়নি। ব্যাপারটা পুরোটাই বোগাস। আসলে সে একটা গাঁজাখুরি গপ্পো ফেঁদে সেটা আমাদের প্রায় বিশ্বাস করানোর জন্য এত কাণ্ড করে চলেছে!

...ঠিক তক্ষুনি ক্লেটনের মুখটা পাল্টে যেতে লাগল।

এই পালটে যাওয়াটা যেন কোন আলো ঝলমলে বাড়ির সমস্ত আলো পলকে নিভিয়ে দেবার মতো। ওর চোখ হঠাৎই হয়ে গেল স্থির, অচল, অনড়, ঠোঁটের হাসি গেঁথে গেল ঠোঁটের ওপরেই। পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ক্লেটন। শুধু ওর শরীরটা অল্প অল্প দুলতে লাগল।

সেই মুহূর্তটাও যেন একটা যুগ। তারপরই শোনা গেল চেয়ার নাড়াচাড়ার শব্দ, জিনিসপত্র পড়ে যাবার শব্দ, এবং আমরা ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। ক্লেটনের হাঁটুজোড়া যেন হঠাৎই রণে ভঙ্গ দিল, ও হুমড়ি খেয়ে পড়ল সামনের দিকে। পলকে উঠে দাঁড়িয়ে ইভান্স ওকে ধরে ফেলল দু'হাতে...

আমরা সকলে স্তম্ভিত। অন্তত এক মিনিট কেউ গুছিয়ে কোনো কথা বলতে পারল না। আমরা বিশ্বাস করছি, আবার বিশ্বাস করতেও পারছি না...জটিল হতবুদ্ধি ভাব কাটিয়ে যখন সম্বিৎ ফিরে পেলাম, তখন দেখি, আমি ক্লেটনের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছি, ওর খাটো কোট ও জামা ছিঁড়ে ফেলে স্যান্ডারসন ওর বুকে হাত রেখে পরীক্ষা করে দেখছে...

এ রহস্যের প্রকৃত সমাধান করা আমার জ্ঞান ও বুদ্ধির বাইরে। ভৌতিক যাদুমন্ত্রের কোনো হাত এতে আছে কিনা আমি জানি না। আমি শুধু এটুকু বলতে পারি যে হাত নাড়াচাড়ার সেই অদ্ভুত প্রক্রিয়া যে মুহূর্তে ওর শেষ হল, ঠিক সেই মুহূর্তেই ওর চেহারা পুরোপুরি পালটে গেছে, ও হুমড়ি খেয়ে পড়েছে আমাদের চোখের সামনে—এবং মারা গেছে!

সংগ্রাহক : সুমন্ত চট্টোপাধ্যায়

ঘুমের মধ্যেই চমকে উঠল অনির্বাণ। গোঙানির মতো শব্দ বেরোচ্ছে মুখ দিয়ে। দীপিকা ধড়ফড় করে উঠে বসেছে বিছানায়। চোখেমুখে জল ছিটিয়ে দিতেই একটু ধাতস্থ হয়ে বলল, 'ওই লোকটা আমায় তাড়া করেছিল দীপিকা।' দীপিকা অনির্বাণের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'কোন লোকটা? ঘুমের ঘোরে ভয় পেয়েছ কোনো স্বপ্ন দেখে।' অনির্বাণ বলল, 'স্বপ্ন নয়। ওই চোখদুটো আমার খুব চেনা দীপিকা। শুধু কোথায় দেখেছি মনে করতে পারছি না। ওই চোখদুটোতে অনেকটা ঘৃণা রয়েছে আমার জন্য।'

দীপিকা ঘরের সব লাইট জ্বালিয়ে দিয়ে বলল, 'দেখো অনি, ঘরে কেউ নেই। কেউ তোমায় ফলো করছে না।' ক্লাস ফোরের অরিত্র বাবার দিকে ঘুম চোখে ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে আছে। ওরও ঘুম ভেঙে গেছে। দীপিকা ছেলেকে জল খাইয়ে কোনো মতে ঘুম পাড়িয়ে দিল। অনির্বাণ বিছানা ছেড়ে ড্রয়িংয়ে এসে বসেছে। মুখটা থমথম। দীপিকা ওর পাশে সোফায় এসে বসল। ওর পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, 'অবচেতন মনের ভাবনাগুলোই স্বপ্ন হয়ে ফিরে আসে আমাদের কাছে। আমরা যখন স্বপ্ন দেখি তখন বহু দূরের দিল্লিবাসী মামাও একই ছাদের নীচের বাসিন্দা হয়ে যায়। এর কোনো বিশেষ কারণ আছে কিনা ডক্টরেরা বলতে পারবেন। তবে আমি একটাই কথা বলতে পারি, স্বপ্নের অর্থ খুঁজতে যেও না অনি, খুঁজে পাবে না। বরং অস্থিরতা বাড়বে বই কমবে না। চলো ঘুমোবে চলো।'

অনির্বাণ ধীরগলায় বলল, 'দীপিকা বিশ্বাস করো, আমার মন বলছে এ স্বপ্নের সঙ্গে আমার বর্তমান আর অতীতের কিছু না কিছু যোগসূত্র আছেই। ওই মানুষটাকে আমি দেখেছি। আবছা হলেও খুব চেনা ওই মুখের রেখাগুলো। দীপিকা বলল, বেশ। আবার দেখলে মনে পড়ে যাবে তুমি কাকে দেখেছ। এখন চলো। বুবাইয়ের আগামীকাল ম্যাথ এক্সাম আছে। সকালে ওকে স্কুলে দিয়ে আমি অফিস যাব অনি।'

অনির্বাণ আনমনে বলল, 'তুমি কি এটা আগে আমায় বলেছিলে?'
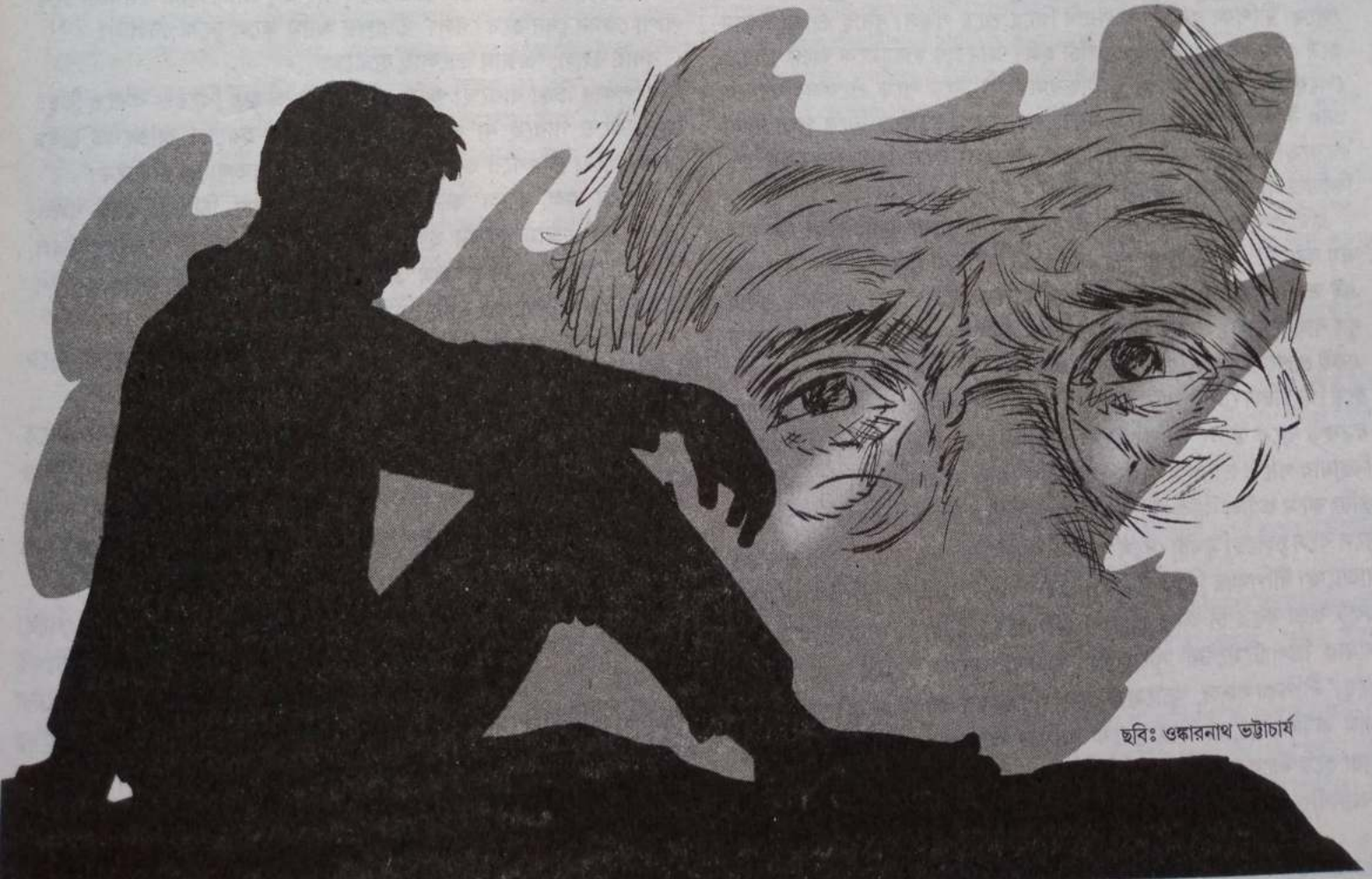
ছবিঃ ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

দীপিকা বুঝতে না পেরে বলল, 'কোনটা বলো তো এক্সাম?' অনির্বাণ বিরক্তির সুরে বলল, 'এই যে বুবাইয়ের আগামীকাল ম্যাথস আছে?'

দীপিকারও আর ভালো লাগছে না। সারাদিন অফিসে খেটে এসে ছেলেকে নিয়ে পড়তে বসাতে হয়। শুধু টিউশনের ভরসায় থাকতে পারে না ও। নিজে একবার না দেখলে শান্তি পায় না। তারপর মঞ্জুদি চলে যায় ওরা অফিস থেকে ঢুকলেই। তাই ডিনার সাজানো, বুবাইকে খাওয়ানো সব ঝামেলা মিটিয়ে রাতটুকু একটু নিশ্চিন্তে ঘুম না হলে পরের দিনটা টানবে কী করে? এই রাত দেড়টার সময় বসে অনির স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার মতো বিলাসিতা করার সময় নেই ওর। দীপিকা বলল, 'তুমি তাহলে ভাবনাচিন্তা করো, তোমার দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করো। আমি ঘুমোতে চললাম।' অনির্বাণ বলল, 'বললে না তো বুবাইয়ের ম্যাথস এক্সামের কথা কি তুমি সারাদিনে আমায় বলেছিলে?' দীপিকা বিরক্ত হয়ে বলল, 'তুমি অফিস থেকে ফেরার পরে বুবাই তো তোমায় বলল। তখন তো তুমি উদয়দার সঙ্গে কলেজের ব্যাপারে কিছু একটা ডিসকাস করছিলে ফোনে। এনিওয়ে, আমি চললাম। তুমি এসো।' অনির্বাণ বলল, 'দীপিকা, আগামীকাল আমারও কলেজ আছে। আমিই না-হয় বুবাইকে ওর স্কুলে ছেড়ে দিয়ে যাব।'

দীপিকা একটু অবাক হয়ে তাকাল অনির দিকে। গার্জেন মিটিংয়ে পর্যন্ত দীপিকাকেই পাঠায় অনি। এক্সামের দিনগুলোতে অনেকের পেরেন্টরা ড্রপ করে দেয় স্কুলে, তাতেও কোনোদিন ইন্টারেস্ট দেখায়নি অনি। বুবাইয়ের সবটুকুই দীপিকা দেখে। কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে বুবাইয়ের সঙ্গে আধঘণ্টা কার্টুন দেখা ছাড়া। ওই আধঘণ্টা বাবা আর ছেলে মিলে অনেক আগডুমবাগডুম গল্প করে। বুবাই স্কুলের বন্ধুদের গল্পও করে। দীপিকা রোজই কিচেন থেকে শুনতে পায়। এটা ওদের খুব প্রেশাস টাইম। অনি এই টাইমটাতে কোনো ফোন এলেও রিসিভ করে না। বাদবাকি বুবাইয়ের অ্যাবাকাস ক্লাস থেকে সাঁতার—সব দায়িত্ব দীপিকার। আজ হঠাৎ হলটা কী? অনি এখনও ডুবে আছে কোনো ভাবনার গভীরে। সেটা ওর ভ্রূ-র মাঝের ভাঁজ আর চোখের দৃষ্টি থেকেই বোঝা যাচ্ছে।

এখন দুটো কাঁটাই পাল্লা দিয়ে ছুটে পৌঁছে দুইয়ের ঘরে। দুটো দশ বেজে গেছে। দীপিকা বুবাইয়ের পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ল। বুবাই ওদের সন্তান হয়ে কেন যে ম্যাথসে এত কাঁচা হল! অনির্বাণ মাধ্যমিকে অঙ্কে লেটার পেয়েছিল। পরে অবশ্য ও ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি নিয়ে পড়ে প্রফেসর হয়েছে আর দীপিকা তো বরাবরই সায়েন্সের মেয়ে। ফিজিক্স নিয়ে পড়াশোনা করেছে। এখনও যদি ওকে কেউ জিজ্ঞাসা করে প্রিয় সাবজেক্ট কী, ফিজিক্স না ম্যাথস? ও চোখ বন্ধ করে উত্তর দেবে অঙ্ক।

এদিকে বুবাই ম্যাথস দেখলেই প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, 'মাম্মাম ভয় করছে।' কী করে যে ওর এই ভয়টা কাটানো যায়। অ্যাবাকাসটা যদি এই ভয়টা কাটিয়ে দেয় তো দীপিকা নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে। এমনিতে বুবাই খুব বাধ্য ছেলে। ওদের সবসময়ের পরিচারিকা মঞ্জুদিও বুবাইয়ের নামে একই প্রশংসা করে। এলোমেলো কথা ভাবতে ভাবতেই কখন চোখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল টের পায়নি দীপিকা। সকাল সাতটার অ্যালার্ম বাজার শব্দে ধড়ফড় করে উঠল ও। বুবাইকে রেডি করতে হবে। এ এক বড় কাজ। বিছানার পাশে তাকিয়ে দেখল অনির্বাণ নেই। যা বাবা, অনি কী সারারাত ড্রয়িং রুমে কাটাল নাকি! দীপিকা উঠে ড্রয়িংয়ে এসে দেখল অনি সোফায় বসে বসে ঢুলছে। মুখটা দেখে কষ্ট হল দীপিকার। মঞ্জুদি এসে গেছে, বেল বাজাচ্ছে। দীপিকার দিকে তাকিয়ে অনি বলল, 'মাথাটা টিসটিস করছে। একটু কড়া করে চা করে দিতে বলো তো মঞ্জুদিকে। শোনো কলেজে আমার ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টরা অজন্তা যাবে। আমিই যাব ওদের নিয়ে।' দীপিকা বলল, 'ভালোই হবে। বুবাইয়ের এক্সাম শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমি ক'দিন মায়ের কাছ থেকে অফিস করব। বুবাইয়েরও মামাবাড়ি ঘোরা হয়ে যাবে।'

অনির্বাণ অন্যমনস্কভাবে বলল, 'কলেজ তো অনেক দূর, এখন স্কুল এক্সকারসনে উটি নিয়ে গেছে স্টুডেন্টদের জানো? আমাদের বিনায়কদার মেয়ে ইলেভেনে পড়ে। এই তো উটি থেকে ঘুরে এল। বিনায়কদা বলছিল, টিচাররা নাকি অত্যন্ত যত্ন করে ঘুরিয়ে এনেছেন।' দীপিকা লক্ষ করল, অনি সব কথাই বলছে কিন্তু ভীষণ রকমের অন্যমনস্ক। বুবাইকে রেডি করতে করতেই ম্যাথসে শর্ট কোশ্চেন কেমন আসতে পারে তার একটা ধারণা তৈরি করার চেষ্টা করছিল দীপিকা বুবাইয়ের মনে। সঙ্গে ম্যাথস অনেকটা ম্যাজিকের মতো, এসব বলে বুবাইয়ের অঙ্কে আতঙ্ক কাটানোর চেষ্টা করছিল। এই ভয়ের চোটেই প্রতিবার জানা অঙ্কগুলো বুবাই ভুল করে আসে। ওর টিচার সন্দীপন বলে, দিদি বাড়িতে সব ঠিক করে গিয়েছিল। গতবার গার্জেন মিটিংয়ে বুবাইয়ের ম্যাথসের ম্যাম রূপকথা বললেন, 'মিসেস দীপিকা রায়, আপনার ছেলে অরিত্র কেন ম্যাথসে এত ভয় পাচ্ছে একটু নজর করুন। স্কুলে সবরকম ট্রাই করছি কোনো বিশেষ সাবজেক্টের ওপরে ভয় কমাতে। কিন্তু বাড়িতেও একটু নজর রাখুন।'

অনির্বাণ চা খেয়ে বাথরুমে ঢুকে গেল। যাওয়ার সময় বলে গেল, 'বুবাই রেডি? তাহলে আমি ওকে ড্রপ করে দিয়ে একবার ট্যাক্সের রাজীবদার সঙ্গে দেখা করে কলেজে ঢুকব। আজ যখন একটু তাড়াতাড়ি বেরোচ্ছি তখন রাজীবদার কাছে গিয়ে কাজের কথাটা সেরে ফেলব।'

বুবাইকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে অনির্বাণ। আজ একটু পরে বেরোলেও চলবে দীপিকার। অন্যদিন ওকে স্কুল বাসে তুলে দেবার জন্য তাড়াহুড়ো করে দীপিকা। শুধু এক্সামের দিনগুলোতে নিজে দিতে যায়।

ওরা বেরিয়ে যাবার পরেই নিজে আরেক কাপ চা নিয়ে বসল দীপিকা। আচমকা আজ অনি কেন নিজে স্কুলে যেতে চাইল বুবাইকে নিয়ে? অনির মধ্যে কাল রাত থেকে অদ্ভুত একটা পরিবর্তন দেখছে দীপিকা। কেমন যেন অন্যমনস্ক। দীপিকা রেডি হয়ে অফিস বেরিয়ে গেল।

দুপুরেই বাড়িতে ফোন করে খোঁজ নিল বুবাইয়ের কাছে, 'এক্সাম কেমন হয়েছে?' বুবাই একটা অদ্ভুত কথা বলল দীপিকাকে। বলল, 'মাম্মাম পাপা বলছিল, রূপকথা ম্যামকে পাপা চেনে। কোথায় যেন দেখেছে। ম্যামের কোথায় বাড়ি, বাড়িতে কে কে আছে, সারনেম কী এসব জানতে চাইছিল। আমি তো এত জানি না। শুধু সারনেমটা ঘোষাল শুনে পাপা কেমন যেন হয়ে গেল।' তারপর আমি স্কুলে ঢুকে গেলাম।

বুবাই বলল, 'এক্সাম ভালোই হয়েছে।'

দীপিকার চিন্তা বাড়ছে। অনি কেন এমন অদ্ভুত বিহেভ করছে কিছুই তো বুঝতে পারছে না ও। রূপকথা ম্যামকে হয়তো আজকেই প্রথম দেখল অনি। তারপরে ওর কেন মনে হচ্ছে রূপকথাকে ও চেনে!

দীপিকা কল করল অনির্বাণকে। অনি বেশ চিন্তিত স্বরে বলল, 'বুবাইয়ের এক্সাম কেমন হল? পেরেছে সব অঙ্ক?' দীপিকা বলল, 'হয়তো পেরেছে। কিন্তু তুমি এত টেন্সড কেন অনি? বুবাই বলছিল, ওদের ম্যাথস টিচারকে নাকি তুমি চেনো?

গলায় একটু অস্বস্তি মিশিয়ে অনি বলল, 'ও কিছু না। অনেকের সঙ্গে অনেকের মুখের মিল থাকে, তখন চেনা চেনা লাগে।

দীপিকা রোজই লক্ষ করছে, রাতে ঘুমের আগে অনির্বাণ ব্যালকনিতে পায়চারি করছে। দীপিকাকে বলেছে, 'একঘুমে সকাল হলেই নিশ্চিন্ত বুঝলে। মাঝে স্বপ্ন না এলেই হয়।' দীপিকার খুব হেল্পলেস লাগে। পরিচিত মানুষটা বদলে যাচ্ছে। অজন্তা গেলে ভালোই হবে। একটু চেঞ্জ দরকার ওর।

আজ দুদিন হল অনির্বাণ কলেজ স্টুডেন্টদের নিয়ে অজন্তা গেছে। সঙ্গে ওর ডিপার্টমেন্টের বিদিশাদি আর রক্তিমদা। দুজনের সঙ্গেই দীপিকার খুব ভালো রিলেশন। বুবাইয়ের বার্থডে পার্টিতেও এঁরা আসেন। বিদিশাদি আর ওনার হাজবেন্ড দুজনেই ভীষণ মিশুকে। ওদের বাড়িতেও গেছে দীপিকা। রক্তিম স্যার একটু গম্ভীর টাইপ। ওরা দুজন গেছে বলেই একটু নিশ্চিন্ত আছে দীপিকা।

বাবা-মা দুজনেই বুবাইকে পেয়ে যেন বাচ্চা হয়ে গেছে। বুবাইও দাদু-

দিদাকে পেয়ে খুব খুশি। অনির্বাণের বাবা-মা মারা গেছেন বুবাইয়ের জন্মের আগেই। বুবাই তাই দাদু-দিদার অবসর সময়টা বেশ ভরিয়ে রেখেছে এ-ক'দিন। ওখানে গিয়ে যেন গলার সেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ভাবটা একটু কেটেছে অনির। দীপিকার অন্তত তাই মনে হয়েছে। কিন্তু রাত দুটোর সময় রক্তিমদার ফোনে ধড়ফড় করে ঘুম ভেঙেছে দীপিকার। রক্তিমদা বললেন, 'দীপিকা, অনির্বাণ কেমন একটা করছে। প্যানিক অ্যাটাক নাকি বুঝতে পারছি না। আমি আর ও একই রুম শেয়ার করছি। আচমকা দেখি ও উঠে বসে থরথর করে কাঁপছে। আর বলছে, ওই চোখ দুটো আমার ভীষণ চেনা। তুমি এ বিষয়ে কিছু জানো দীপিকা?' দীপিকা বলল, 'রক্তিমদা দিন দশেক আগেও বাড়িতে স্বপ্ন দেখে এরকম করেছিল। বুঝতে পারছি না ঠিক কী সমস্যা হচ্ছে!' রক্তিমদা বললেন, 'তুমি ইমিডিয়েট একজন সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করো। একটা কাউন্সেলিং দরকার।' দীপিকা বলল, 'ফোনটা একবার ওকে দিন।'

অনি ফোন ধরেই ভয়ার্ত গলায় বলল, 'দীপিকা, ওই চোখদুটো আমার খুব চেনা। এটা নিছক স্বপ্ন নয়।'

দীপিকা শান্তগলায় বলল, 'কার চোখ দেখতে পাচ্ছ তুমি অনি?

বাড়ি ফিরেও একেবারে চুপ করে আছে অনি। কলেজে সাতদিনের ছুটির অ্যাপ্লিকেশন করেছে। ওর নাকি কলেজ যেতে ইচ্ছে করছে না।

রবিবার সন্ধেতে অনিকে ডক্টর প্রসূন দাশগুপ্তর কাছে নিয়ে যাবে দীপিকা। অনির্বাণ দু-একবার গাইগুঁই করেছে। যেতে চায় না। কিন্তু দীপিকা আমল দেয়নি। বিদিশাদিও ফোনে দীপিকাকে বলেছেন, 'সেদিন রাতে রক্তিমদার ডাকে আমি ওদের ঘরে যাই। অনির্বাণকে দেখি সে রীতিমতো ভয়ে কাঁপছে। তুমি খুব তাড়াতাড়ি ডক্টর দেখাও।'

ডক্টর প্রসূন দাশগুপ্তর বয়েস বছর পঞ্চাশ। শান্ত সৌম্য স্থিতধী। ভদ্রলোকের কথা বলার ভঙ্গিতে একটা আকর্ষণী শক্তি আছে। দীপিকা অনির্বাণকে চেম্বারে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে চলে আসতে চাইছিল। অনির্বাণই ওর হাতটা চেপে ধরে ছেলেমানুষের মতো বলল, 'তুমিও থাকো।' ডাক্তারবাবু ইশারায় দীপিকাকেও বসতে বললেন।

পুরো বিষয়টা শুনলেন মন দিয়ে। তারপর একটা সাদা খাতায় একটা বিন্দু এঁকে বললেন, 'মিস্টার রায়, আপনি এদিকে তাকান। একদৃষ্টে তাকাবেন। কী দেখতে পাচ্ছেন বলুন আমায় আস্তে আস্তে। বাবা বকছে দেখুন আপনাকে, আপনি স্কুলে যেতে চাইছেন না বলে। ওই দেখুন আপনার মা আপনার পিছনে লাঠি নিয়ে তাড়া করেছে। আপনি পালাচ্ছেন, ছুটছেন ছুটছেন...কেউ ধরতে পারছে না আপনাকে! কার ভয়ে ছুটছেন মিস্টার রায়?'

অনির্বাণ কাঁপা গলায় বলল, 'অঙ্কের ভয়ে। শম্ভুচরণ ঘোষাল, আমাদের ক্লাস টিচার। ম্যাথসে গোল্ড মেডেলিস্ট। হাতে লাঠি নিয়ে ঢোকেন। যারা অঙ্ক পারে না তাদের বোর্ডে ডেকে এনে বারবার বুঝিয়ে দেন অঙ্ক। কিন্তু তারপরেও যারা পারে না, স্যার তাদের মারেন।'

ডক্টর বললেন, 'স্যার আপনাকে খাতায় কম নম্বর দিলেন, আপনি ফেল করে গেলেন, আপনার বাবা বকল, তারপর?'

দীপিকা অপলক তাকিয়ে আছে অনির দিকে। 'অনির অঙ্কে ভয় ছিল? কই কোনোদিন বলেনি তো! বরং ও মাধ্যমিকে নাইনটি টু পেয়েছিল সেটাই তো বলে গর্ব করে।'

অনির্বাণ বলল, 'আমার বাবা ছিলেন আমাদের স্কুলের সেক্রেটারি। তাই স্কুলের সবাই একটু অন্যচোখে দেখত আমায়। একমাত্র শম্ভুচরণ স্যারের এসব ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সেক্রেটারির ছেলে বলে বেশি নম্বর দেবেন এমন নয়। ক্লাস নাইন থেকে টেনে উঠতে অঙ্কে ফেল করলাম। রেজাল্ট দেখেই বুঝলাম, বাবা ছেড়ে দেবে না। বাবার প্রেস্টিজ ইস্যু হয়ে যাবে।

তাই বাড়িতে গিয়ে বললাম, 'সব সাবজেক্টে বেশি নম্বর পেয়েছি, শুধু ম্যাথসে ফেল। শম্ভুস্যার ইচ্ছে করে আমায় কম দিয়ে ফেল করিয়ে দিয়েছে।'

বাবা রাগে গজগজ করলেন। বললেন, 'মাধ্যমিকে যদি ভালো নম্বর পাস তাহলে ওই স্যারকে দেখে নেব।'

আমি শম্ভু স্যারের কাছে অঙ্কে ভর্তি হলাম। বাবা ভর্তি করে দিয়ে এল। ধীরে ধীরে আমার অঙ্কের ভয়টা কেটে গেল। আমি এক বছরের মধ্যে অবলীলায় অঙ্ক কষতে লাগলাম। টেস্টে ভালো নম্বর পেলাম। মাধ্যমিকে বিরানব্বই। বাবা তখন সবাইকে বলতে শুরু করল, 'শম্ভুস্যারের কাছে টিউশন না পড়লে উনি ভালো করে পড়ান না। স্কুলে কিছুই শেখান না ইচ্ছে করে। চারিদিকে কথাটা আগুনের মতো রটে গেল। স্যার ট্রান্সফার নিলেন। স্যার কাঁদছিলেন। আমায় বলেছিলেন, 'মিথ্যে কথার এত জোর? এ যে অঙ্কের সমাধানের থেকেও দ্রুত ছড়ায় দেখছি।'

তারপর আর স্যারের খোঁজ পাইনি আমি। অন্য কোনো স্কুলে চলে গিয়েছিলেন স্যার। নিজের বাড়িঘর ছেড়ে।

আমার ছেলেরও অঙ্কে ভয়, ঠিক আমার মতো। এতদিন পরে শম্ভু স্যার আবার আমার স্বপ্নে আসছেন। সেই চোখ! জল টলটল করছিল আর ঘৃণা ঠিকরে বেরোচ্ছিল। আমি মিথ্যে বলেছি, বাবাকেও মিথ্যে বুঝিয়েছিলাম।'

অনির্বাণ দম নিল। আবার বলল, 'শম্ভুচরণ ঘোষালের মেয়ে রূপকথা বুবাইয়ের স্কুলের ম্যাথের টিচার। ও যদি চিনে যায় বুবাই আমার ছেলে? আমি ওদের স্কুলের অনুষ্ঠানের ছবিগুলো দেখছিলাম, তখনই চিনেছি রূপকথাকে। আমরা যখন পড়তে যেতাম ও বসত স্যারের কাছে। স্যারের মুখটা বসানো। একইরকম দেখতে।'

ডক্টর প্রসূন দাশগুপ্ত বললেন, 'দীপিকা, আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। যেভাবেই হোক শম্ভুবাবুর সঙ্গে একবার অন্তত ওনাকে সামনাসামনি বসাতে হবে। মনের গভীরে যে অপরাধবোধ বাসা বেঁধেছে সেটাকে কাটাতে হবে।

দীপিকা আর অনির্বাণ বাড়ি ফিরছে। দীপিকা ড্রাইভ করছে। ইচ্ছে করেই আজ অনির্বাণের হাতে স্টিয়ারিং দেয়নি। ও এখনও বিধ্বস্ত হয়ে আছে। অস্ফুটে একবার বলল, 'দীপিকা তুমি কি আমাকে এবার থেকে ঘৃণার চোখে দেখবে? আমি যে অন্যায় করেছি তার কি সত্যিই ক্ষমা আছে? আমি আমার শিক্ষাগুরুকে ঠকিয়েছি। তিনি আমায় হাতে ধরে অঙ্ক শিখিয়েছেন আর আমি তাঁর বদনাম করেছি। এ পাপের কি কোনো ক্ষমা আছে? বুবাইয়ের সেদিনের স্কুলের অনুষ্ঠানের ফটোগুলো দেখতে দেখতেই রূপকথাকে দেখতে পেলাম। সেই চোখ, সেই মুখ!' বুবাই বলল, 'রূপকথা ঘোষাল। আমরা যখন ক্লাস টেনে পড়ি তখন রূপকথা সম্ভবত ক্লাস সিক্স। তখন থেকেই ও অঙ্কে দুর্দান্ত। দীপিকাও নিশ্চয়ই ওর বাবার কাছে আমার ব্যাপারে শুনেছে। তারপরে যদি বুবাইয়ের ওপরে কোনো রিভেঞ্জ নেয়? আমার পাপের শাস্তি কি আমার ছেলেটা পাবে দীপিকা?'

দীপিকা বলল, 'শান্ত হয়ে বসো। কালকে আমরা একটা জায়গায় যাব।' অনির্বাণ বারবার বলছিল, পাপ বাপকে ছাড়ে না।

দীপিকার ফোনে রূপকথার ফোন নম্বর আছে। ক্লাস টিচারের নম্বর স্কুল থেকেই দেয় গার্জেনদের। এবারে ক্লাস ফোরের বুবাইয়ের ক্লাস টিচার রূপকথা। বাড়ি ফিরেই রূপকথাকে ফোন করল দীপিকা।

রূপকথা শান্ত গলায় বলল, 'ইয়েস ম্যাডাম বলুন।'

দীপিকা বলল, 'আমি আজ একটা অন্য বিষয়ে কথা বলব। আপনার বাবা শম্ভুচরণ ঘোষাল এখন কোথায় থাকেন?'

রূপকথা একটু অবাক হয়েই বলল, 'বাবা রিটায়ার করেছেন। এখন বাড়িতেই আছেন। কেন বলুন তো?' দীপিকা বলল, 'বাড়ি বলতে আপনাদের পুরোনো বাড়িতে?'

রূপকথা বলল, 'না না ওটা তো বিক্রি করে দিয়েছে। এখন একটা ফ্ল্যাট কিনে আছে বাবা আর মা। আমার শ্বশুরবাড়ির পাশেই। কেন বলুন তো?'

দীপিকা বলল, 'প্লিজ ম্যাম, অ্যাড্রেসটা একটু লাগবে আমার। আমি

তন্ময় চক্রবর্তী

পুজোর রুটিন

দূর দেশেতে যুদ্ধ ভীষণ,সাবধানী কার্তিক
আকাশপথে শিখছে নতুন,অস্ত্র ও টেকনিক

পড়াশুনোও পালটে গেছে,অনলাইনে ক্লাস
সরস্বতীর ল্যাপটপে সব জটিল সিলেবাস

গণেশের প্ল্যান পুজোর আগে কলকাতাতে জিম
একটা বছর, হোকনা বাপু, ভুঁড়ির ওপর থিম।

লক্ষ্মী চাইছে বৃষ্টি হবে মাঠে হলুদ ধান
শহর জুড়ে মাইকে বাজবে ফসল কাটার গান

চার ভাইবোন ঝিমোচ্ছিল, হঠাৎ এলেন মা
এখনও তোরা হোসনি রেডি, পরিসনি জামা

দূরের থেকে ঢাকের শব্দ, খুলছে দুর্গাসদন
আকাশপথে স্বর্গরথে আসছে ওরা ছ'জন।

ব্যস্ত সবাই পাড়ায় পাড়ায়, আর তো ক'টাদিন
শিউলি গন্ধ কাশের বনে ওই এল আশ্বিন!

অংশুমান চক্রবর্তী

খুঁজে বেড়াই

আলোয় ভেজে আমার পাড়া, শরৎকালের নরম ভোরে
জানলা খুলে তাকিয়ে দেখি, বন্ধুরা সব হাওয়ায় ওড়ে।
ওদের মুখে সরল হাসি, দু-হাত নেড়ে আমায় ডাকে
হঠাৎ ওরা হারিয়ে গেল কোন অজানা পথের বাঁকে।
কোথায় গেল? যাই খুঁজতে-- নদীর তীরে, পুকুর-ঘাটে
চড়ক-তলা, বামুন-পাড়া, চিরসবুজ খেলার-মাঠে।
কিন্তু কোথাও নেই তো ওরা, খুঁজতে থাকি, বয়স বাড়ে
চলছে খোঁজা আলোয় আলোয়, চলছে খোঁজা অন্ধকারে।
দু'হাত নেড়ে ডাকল কেন? প্রশ্ন জাগে আমার মনে
খুঁজে বেড়াই হাটবাজারে, স্কুলের গেটে, ফুলের-বনে।
আবার এল নতুন শরৎ, আসবে আমার বন্ধুরা কি?
নরম ভোরে লাগল হাওয়া, দু'চোখ মেলে তাকিয়ে থাকি...

ছবি : সৌজন্য চক্রবর্তী

একবার দেখা করতে চাই।'

সকালবেলা অনির্বাণ স্যারের ফ্ল্যাটের সামনে এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পা দুটো অবশ হয়ে গেছে ওর। দীপিকা বলল, 'বি স্টেডি অনি। এই সুযোগ ওনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও।'

দরজা খুললেন একজন বয়েস ষাটের মহিলা। বললেন, 'কাকে চান?' দীপিকা বলল, 'শম্ভু স্যার আছেন?' ভদ্রমহিলা ওদের দুজনকেই আপাদমস্তক দেখে বললেন, 'আসুন, ভিতরে আসুন।'

স্যার কাগজ পড়ছিলেন সোফায় বসে। অনির্বাণ দেখল সেই লম্বা টানটান শরীরটা বয়েসের ভারে অল্প ন্যুব্জ হয়ে গেছে। মাথায় সাদা চুলের আধিক্য। স্যারের বয়েস পঁয়ষট্টি হবে। চোখে গোল্ডেন ফ্রেমের চশমা। শুধু বসার ভঙ্গিমাটি সেই একই আছে। ঋজু, দৃঢ় ভঙ্গিমা।

অনির্বাণ বেশ ঘামছে। দীপিকা বলল, 'যাও।'

কত বছর পরে স্যারকে দেখছে অনি। সেই ষোলো বছরে শেষ দেখেছিল। স্যারের একটা ছেলে ছিল মনে পড়ছে। ওদের যখন মাধ্যমিক সে তখন টুয়েলভে পড়ছে। রূপকথা আর ওর দাদা দুজনেই অঙ্কে ভালো ছিল খুব। এই মুহূর্তে ছেলেটার নাম মনে করতে পারছে না অনি।

স্যারের পায়ের কাছে গিয়ে বসল অনি মাথা নীচু করে।

শম্ভুচরণ ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'একি, পায়ের কাছে কেন? সোফায় বসুন।' অনি বলল, 'স্যার আমায় চিনতে পারছেন?'

শম্ভুচরণ তীক্ষ্ণভাবে তাকাল অনির দিকে। যেন স্মৃতির হলদে পাতা খুঁজে সদ্য গোঁফের রেখা দেখা যাওয়া একটা ছেলের মুখের সঙ্গে বছর চল্লিশের মুখের মিল খোঁজার তীব্র চেষ্টা করে চলেছেন। তারপরেই উৎফুল্ল হয়ে বললেন, 'ত-তুমি অনির্বাণ? সেকেন্ড ব্রাকেট আর থার্ড ব্রাকেট অঙ্কে থাকলেই হাত কাঁপতে শুরু করত। বল বাবা বল, কেমন আছিস।'

অনির্বাণ বলল, 'স্যার আপনি আমায় ক্ষমা করেছেন?'

শম্ভুচরণ বললেন, 'দুষ্টুমির বয়েসে দুষ্টুমি করেছিস, সেসব মনে রাখলে কি চলে? তুই মাধ্যমিকে যেদিন অঙ্কে বিরানব্বই পেলি সেদিন আমি বাড়িতে তোর কাকিমাকে বলেছিলাম, আজ আমার রাজ্য জয়ের আনন্দ হচ্ছে। একদিন এই ছেলেটা সব অঙ্ক ভুল করেছিল বলে একে আমি ফেল করিয়ে দিয়েছিলাম। তুই অঙ্ক পারতিস না তা তো নয়। তুই ভুল করতিস ভয়ে। হয়তো আমাদেরই শেখানোর পদ্ধতিতে ভুল ছিল, তাই।'

অনি বলল, 'স্যার আমি আপনার নামে মিথ্যে রটিয়েছিলাম। আপনাকে ওই স্কুল ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল।'

স্যার বললেন, 'তাতে কী হল? যে স্কুলে গিয়েছিলাম সেখানেও তো ছেলেদের তৈরি করেছি। তুই প্রফেসার? ওরে কী আনন্দ।' দীপিকা একটা প্যাকেট নামিয়ে রাখল স্যারের সামনে। শম্ভুচরণ প্যাকেটটা তুলে দেখলেন, মিষ্টির বড় প্যাকেট আর খান দুই বই।

স্যারের ছেলে ডাক্তার। ডাক্তার রূপাঞ্জন ঘোষাল। অনির্বাণের স্বপ্ন শুনে স্যার হো হো করে হেসে বললেন, 'তাহলে স্বপ্নেও তোকে অঙ্কের ভূতটা ছাড়েনি বল?' অনির্বাণ বলল, 'স্যার আমার ছেলেরও আমার মতোই অঙ্কে ভয়।'

শম্ভুচরণ হেসে বললেন, 'ওকে সপ্তাহে দুদিন পাঠিয়ে দে আমার কাছে। রূপকথাকে দিয়ে পাঠিয়ে দে। ওকে আমি অঙ্ক নিয়ে পড়িয়েই ছাড়ব।'

দীপিকা বাড়ি ফিরতে ফিরতে বলল, 'অনি, আজ বড্ড হিংসে হচ্ছিল তোমায়। যখন তোমার স্যার, তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলছিলেন, তোরা তো আমার সন্তানের মতো। বিশ্বাস করো, জীবনে প্রথমবার হিংসে করলাম তোমায়।'

অনির্বাণ বলল, 'বুবাইয়ের অঙ্ক নিয়ে আর চিন্তা নেই দীপিকা। স্যার ওকে মানুষ করে দেবেন। অপরাধবোধের বোঝাটা সরে যেতে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারছি আমি।'

ছবিঃ ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

মিয়ারী পাহাড়ের যুদ্ধ

প্রেক্ষাপট

মানুষ ও মাকড়সা—এই দুই রূপ ধরতে সক্ষম আরাকিয়েনরা, অবলুপ্তি রুখতে চেয়ে বাঁদরদের দেহে নিজেদের জিন প্রতিস্থাপন করে কৃত্রিম আরাকিয়েন সৃষ্টির ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। এর ফলে একরূপধারী অর্ধ-আরাকিয়েন বা মানুষের সৃষ্টি হয়। কিন্তু, সে-প্রযুক্তির আবিষ্কর্তা কালানীলের গণিত প্রমাণ করে, দূর ভবিষ্যতে মানুষের মধ্যে ফের সুপ্ত আরাকিয়েন জিন জেগে উঠবে এবং তাঁদের শরীরে নতুন করে ফিরে আসবে দেবী আরাকিয়েন ও কালানীলসহ সমস্ত প্রধান জিনদাতা আরাকিয়েনের প্রতিলিপিরা। (বিস্তারিত—অধ্যায়-১)

এরপর অর্ধ-আরাকিয়েন সন্ন্যাসী উধীশ, দেবীকে হত্যা করে পৃথিবীতে মানুষের অধিকার স্থাপন করেন। দেবীর পালিত পুত্র জিরিয়েন, আরাকিয়েন জ্ঞানভাণ্ডারের রক্ষী হয়ে সাধক রাবটেন নাম নিয়ে তিব্বতের পাহাড়ে আত্মগোপন করেন। উধীশের প্রতিষ্ঠিত ঔধীশ সম্প্রদায় যুগযুগান্ত ধরে অবশিষ্ট আরাকিয়েনদের বিরুদ্ধে প্রহরীর ব্রত নিয়ে টিকে থাকে। (বিস্তারিত—অধ্যায়-২)

বিশ শতকে এসে মানুষের সমাজে ফের দ্বিরূপধারী আরাকিয়েনদের আবির্ভাব শুরু হয়। চিনের হাইনলিম শহরে ঔধীশদের মূল মঠের মহাসাঙ্ঘিক ঝাও লিয়াম তাদের ধ্বংস করবার জন্য বিশ্বব্যাপী অভিযান শুরু করেন। (বিস্তারিত—অধ্যায়-৩)

পাশাপাশি, দুই পুনর্জাত আরাকিয়েন সুধীর ও অমূল্য ঔধীশের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন। আরাকিয়েন বিদ্রোহীদের সাহায্যে ভুটান পাহাড়ে ঔধীশ মঠের দখল নেন তাঁরা। শাখাপ্রধান শারণিক সেখান থেকে পালাবার পথে রাবটেনের দেখা পান ও প্রভাবে আরাকিয়েনের চর হয়ে হাইনলিম শহরে পৌঁছান। (বিস্তারিত—অধ্যায়-৪)

মঠ দখলের পর তার নথিপত্র থেকে ঔধীশের মূল ঘাঁটির সন্ধান পেয়ে সুধীরের বাবা-মা বিজয় ও সেমন্তী সেখানে এক অভিযানে গিয়ে ঝাওয়ের

হাতে বন্দি হন। পাশাপাশি, আরাকিয়েন শিকারে বের হওয়া ঔধীশদের ধ্বংস করার অভিযানে বেরিয়ে সুন্দরবনের গভীরে এক যুদ্ধ চলাকালীন সুধীর বুঝতে পারে সে-ই আসলে পুনর্জাত কালানীল। (বিস্তারিত—অধ্যায়-৫)

ইতিমধ্যে দেবী আরাকিয়েনের নবজন্ম হয়েছে ঝাড়খণ্ডের মোরিবাগে অনুপমা নামে এক তরুণীর শরীরে। (বিস্তারিত—অধ্যায়-৬)

রাবটেন দেবীর উপস্থিতি বুঝতে পেরে আরাকিয়েনের স্বপ্ন-প্রক্ষেপক যন্ত্রে সে-খবর নবজাত আরাকিয়েনদের স্বপ্নে পৌঁছে দেয়া শুরু করেন। পাশাপাশি গোপন সূত্রে সে-খবর পেয়ে ঝাও অরিহন্তকে বন্দি করেন ও দেবীকে হত্যার জন্য একটি ঘাতকদলকে চিন থেকে ঝাড়খণ্ডে পাঠান। রাবটেনের চর শারণিক ঝাওকে ভুল বুঝিয়ে দলটির নেতৃত্ব নিয়ে ভারতে আসেন। (বিস্তারিত—অধ্যায়-৭)

এই ঘাতকদলের সঙ্গে বিখ্যাত মিয়ারী পাহাড়ের যুদ্ধে পুনর্জাত দেবী ও কালানীলের নতুন করে দেখা হয়। এরপর—?

—এনসাইক্লোপিডিয়া আরাকিয়ানো। পরিমার্জিত সংস্করণ। সপ্তম অধ্যায় খৃ ২৭৪৫।

১। স্বপ্নসন্দেশ

'নন্ত নরকে যাও রাক্ষসী আরাকিয়েন!'

অস্ত্রধারী সন্ন্যাসী দলের বিকট চিৎকারে কেঁপে উঠছিল গোটা পাহাড়।

সুবিশাল আটপেয়ে মাকড়সাটা মৃত্যুর মুহূর্তে ফের তার দ্বিপদ মানুষের চেহারায় ফিরে এসেছে। তার মৃত্যুশীতল মুখখানি সুন্দর।

দেবী আরাকিয়েন মৃত! নিঃশব্দে একপাশে দাঁড়িয়ে সেদিকে দৃষ্টি ধরে রেখে তার দু'চোখ বেয়ে জল ঝরে যায়।

দেবীর পায়ের কাছে উধীশের মৃতদেহ। শেষমুহূর্তের আক্রমণে উধীশের জীবনও শেষ করে দিয়ে গিয়েছেন দেবী।

ঝড় উঠেছে। ধেয়ে আসছে বৃষ্টির ধারা। আকাশ কাঁদছে।

শুধু শব্দ? না! হঠাৎ করেই যেন বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে ঝোড়ো বাতাস! গম্ভীর গলা মৃদু উচ্চারণে বলে চলেছে, 'ফিরে এসেছেন... নতুন জন্ম নিয়ে ফিরে এসেছেন তিনি...'

...হঠাৎ মিলিয়ে গেল ছবিটা। মিলিয়ে গেছে খানিক আগের সেই বরফের পাহাড়! তার জায়গায়, জঙ্গলে ঘেরা রুক্ষ এক টিলা। হাতির মাথার মতো গড়নের সেই টিলার গায়ে বসে থাকা আটপেয়ে জীবটার গায়ে বহু শতাব্দীর প্রাচীনতার ছাপ। দূরে গহন শালজঙ্গল এগিয়ে গেছে দিগন্তের দিকে।

আস্তে আস্তে বদল আসছিল জীবটার শরীরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার জায়গায় দু'পায়ে ভর করে উঠে দাঁড়ালেন একজন প্রাচীন মানুষ। মৃদু হেসে হাতের দণ্ডটা দিয়ে অনেক দূরে ছড়িয়ে থাকা এক বাগানের দিকে ইশারা করে বললেন, 'সাধক রাবটেনের স্বপ্নসন্দেশ। দেবী পুনর্জাত হয়েছেন...মোরিবাগ...এসো...!'

'সুধীর...'

তার কাঁধে হাত দিয়ে অমূল্যবাবু ডাকছিলেন। ধড়মড় করে মাথা তুলে উঠে বসল সে। মঠের জানালা দিয়ে সূর্যের প্রথম আলো এসে পড়েছে সামনের টেবিলে।

'এসে দেখি টেবিলেই মাথা রেখে ঘুমিয়ে রয়েছ। এই ক'টা দিন বুঝি টানা জেগে বসেছিলে পুঁথিপত্র নিয়ে?' টেবিলে ছড়ানো খোলা পুঁথিগুলোর দিকে চোখ রেখে অমূল্যবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

কথাটা ভুল নয়। সুন্দরবনের যুদ্ধের ঔধীশ হেরসিং ও তার ঘাতকবাহিনীকে নির্মূল করবার পর অমূল্যবাবুর নেতৃত্বে একদল আরাকিয়েনকে সুধীর পাঠিয়েছিল, মানুষের সমাজে আত্মগোপন করে থাকা আরাকিয়েনদের সন্ধানে। তারপর নিজে গোম্ফার মূল ঘাঁটিতে ফিরে এসে, গত কয়েকটা দিন চোখের পাতা এক করেনি। নিজেকে কালানীল বলে চিনতে পারার পর থেকে আস্তে আস্তে কিছু কিছু ছায়া ছায়া স্মৃতি ফিরে আসছে তার মনে। সেই স্মৃতিদের ফাঁকগুলোকে ভরাট করবার জন্য এই ক'দিন সুধীর ডুব দিয়েছিল সদ্য দখল করা এই ঔধীশ মঠের পুঁথির ভাণ্ডারে।

'ভোরের দিকে একটু চোখ লেগে এসেছিল। এখন ঠিক আছি। কতক্ষণ এসেছেন?'

'ঘণ্টাখানেক। ভালো খবর আছে।'

'যেমন?'

'আগেরবারের রিপোর্ট থেকে যে জায়গাগুলোকে তুমি সম্ভাব্য বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলে তার প্রত্যেকটাতেই সাফল্য এসেছে সুধীর। আরও ত্রিশজন নতুন আরাকিয়েনের খোঁজ মিলেছে। তাদের তিনিঝোরায় নিয়ে আসা হয়েছে প্রশিক্ষণের জন্য।'

খাওয়াদাওয়া মিটিয়ে এসে সুধীর দেখে টেবিলে ছড়ানো কাগজপত্রে বুঁদ হয়ে গিয়েছেন অমূল্যবাবু। একটু ইতস্তত করে সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা অমূল্যবাবু, একটা প্রশ্ন করব। আপনি—আপনি পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন?'

'হঠাৎ এ-প্রশ্ন করছ যে?' মুখ তুলে তার দিকে তাকালেন অমূল্য।

'আসলে এ নিয়ে একটা স্বপ্ন গত তিনদিন ধরে ঘুরেফিরে আসছে ঘুমের মধ্যে। তাই...'

'আন্দাজ করতে পারছি। সাধক রাবটেনের লেখা আমাসাদোমের পুঁথি গভীরভাবে পড়ছ তাহলে। আরাকিয়েনের পুনর্জন্মের মিথটার কথা তোমার মনে তাই ছাপ ফেলে গেছে গভীরভাবে। তবে, ওর কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।'

'যদি বলি আছে?'

'ইমপসিবল। আমি...বহুবার...'

সুধীরের চোখদুটোয় সামান্য কৌতুক, 'বেশ। তাহলে বলুন তো, সাধক রাবটেন এই পুনর্জন্মের মিথের কথা বলতে গিয়ে কার কথা উদ্ধৃত করেছেন?'

কয়েক মুহূর্ত থেমে রইলেন অমূল্যবাবু। আস্তে আস্তে তাঁর চোখদুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠছিল। সুধীরের হাতদুটো ধরে ফিসফিস করে বললেন, 'কালানীল...'

'হ্যাঁ, আমিই পুনর্জাত কালানীল অমূল্যবাবু। ফিরে আসা কিছু কিছু স্মৃতি আর গত তিনদিনের গবেষণা, এই দুটো মিলে আমি আপনাকে বলছি, বিজ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড়িয়েই ওই ফোরকাস্ট করা হয়েছিল।'

হঠাৎ হাতের কাগজপত্রগুলো একপাশে ঠেলে দিয়ে সোজা হয়ে বসলেন অমূল্যবাবু, 'কী স্বপ্ন দেখছ তুমি ক'দিন ধরে? প্রথমে সেটা বলে নাও।'

'মোরিবাগ!' সুধীরের কথাগুলো শেষ হতে মাথা নেড়ে বলে উঠলেন অমূল্যবাবু, 'নামটা ঠিক শুনেছ তুমি? আমি...'

বলতে বলতেই সঙ্গে নিয়ে আসা পেপার কাটিং-এর ফাইলটা ঘেঁটে চলেছিলেন তিনি।

'দেখ তো একবার! এ জায়গাটার মতো কী?'

রঙিন প্রিন্ট-আউটটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ স্থির হয়ে গেল সুধীরের চোখদুটো। হাতির মাথার মতো গড়নের একটা টিলা মাথা উঁচিয়ে রয়েছে লালচে জমির বুকে। চারপাশে জমিতে ইতিউতি বাবলার ঝোপ। দূরে গহন শালজঙ্গল এগিয়ে গেছে দিগন্তের দিকে।

একটু বাদে তার নীচের নিউজ আইটেমটার দিকে চোখ যেতে একটা তীক্ষ্ণ শ্বাস টেনে নিল সে বুকের ভেতর। মোরিবাগ! আর তারপর, তার একপাশে ইনসেটে মেয়েটার মুখটা চোখে পড়তে মাথাটা ঘুরে উঠল তার। স্বপ্নে এ-মুখ তাকে দেখিয়েছেন আরাকিয়েন সন্ন্যাসী! কে ও?

অমূল্যবাবু তখন বলে চলেছেন, 'তোমার সঙ্গে দেখা হবার আগে, যখন ভাবতাম পৃথিবীতে আমিই একমাত্র জীবন্ত আরাকিয়েন হিসেবে টিকে আছি, সেই তখন থেকেই ইনটারনেট ঘেঁটে চলাটা আমার অভ্যাস। বিভিন্ন জায়গায় ঘটে চলা নানান ব্যাখ্যাহীন ঘটনার খবর জোগাড় করতাম, যদি তাতে স্বজাতীয় কোনও প্রাণীর সন্ধান মেলে! সেই করতে গিয়েই তোমাদের সার্কাসটার খবর পেয়ে তদন্তে গিয়ে আমি তোমার দেখা পাই।

'অভ্যাসটা আমি ছাড়িনি। কিছুদিনের পুরোনো এই খবরটা পরশু চোখে পড়ল। একটা ডাকাতির রিপোর্ট। মোরিবাগের পাশে কয়েকটা ডাকাতকে একটা গাড়ির ভেতর বন্দি অবস্থায় পুলিশ উদ্ধার করে। এই স্থানীয় মেয়েটা, গাড়িটাকে ঘটনার খানিক আগে রাস্তায় দেখেছিল বলে পুলিশের কাছে একটা বিবৃতি দেয়। সাধারণ ঘটনা। কিন্তু এর দুটো পয়েন্ট আমার নজর কেড়েছিল। এই যে...পড়ো...এখানটা...'

কাগজটা হাতে নিয়ে অমূল্যবাবুর দেখিয়ে দেয়া জায়গাটার দিকে চোখ রাখল সুধীর। একটু পরে যখন সে মাথা তুলল, তখন চোখদুটো চকচক করে উঠেছে তার, 'আর সন্দেহ নেই অমূল্যবাবু। গাড়ির বনেটে অস্বাভাবিক মোটা, ইস্পাতের মতো শক্ত মাকড়সার জালের টুকরো, আর তারপর লক-আপের শিক দুমড়ে অপরাধীদের পালানো...সেখানেও শিকের গায়ে সেই একই জালের উপস্থিতি...আর তারপর এই স্বপ্নটা...

'আমাসাদোমের পুঁথির ''স্বপ্নশাসন'' অধ্যায়টার কথা মনে করে দেখুন অমূল্যবাবু। দূর-দুরান্তের প্রদেশগুলোর শাসকদের সঙ্গে দেবীর স্বপ্নপ্রক্ষেপক যন্ত্র দিয়ে যোগাযোগ রক্ষা...না অমূল্যবাবু। এ নিছক স্বপ্ন নয়। কেউ আমাদের কোনো খবর পাঠাচ্ছেন।'

'কিন্তু...' একটু অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে বললেন অমূল্যবাবু, 'স্বপ্নে তুমি সাধক রাবটেনকে দেখেছ বললে। তিনি প্রাক ইতিহাসের মানুষ। তিনি কীকরে...'

'উঁহু। আরও একটা সম্ভাবনার কথা এড়িয়ে যাচ্ছি আমরা। যদি সাধক রাবটেন আদৌ মানুষ না হয়ে থাকেন? স্বপ্নে তিনি আমায় তাঁর দুই রূপই দেখিয়েছেন। আরাকিয়েন অকল্পনীয় দীর্ঘায়ু হতে পারে।'

অমূল্যবাবু ঘুরে তাকালেন, 'ঠিক, সে-দাবি দুই পুঁথিতেই করেছেন তিনি। কিন্তু সুধীর, তেমন কোনও প্রমাণ আমাদের হাতে এখনও নেই। দ্বিতীয়ত, স্বপ্ন প্রক্ষেপণ করা হতো একটা যন্ত্র দিয়ে। আরাকিয়েনের সে যন্ত্র ঔধীশদের হাতে পড়তেই পারে। হয়তো সে যন্ত্র ঔধীশরাই কাজে লাগাচ্ছে! সেক্ষেত্রে এটা একটা ফাঁদ...'

'হতেই পারে। কারণ খবরটার চরিত্র এমন যে তাকে খুঁজে দেখার লোভ আমি সম্বরণ করতে পারব না। কিন্তু...'

বলতে বলতে চুপ করে গেল সুধীর। মেয়েটার ছবি দেখবার পর থেকে স্মৃতির গভীরে তোলপাড় চলছে। একই মুখ ঘুরেফিরে আসছে। কেন? হয়তো বা স্বপ্নটা সত্যি। হয়তো বা ফাঁদ। কিন্তু এ রহস্যকে ভেদ করবার জন্য যেতে তাকে হবেই সেখানে।'

একটু ভাবল সুধীর। তারপর নিজেকে সংযত করে বলল, 'সপ্তাহদুয়েক সময় দিচ্ছি অমূল্যবাবু। আপনার সমস্ত সোর্স কাজে লাগান। যেভাবে হোক মেয়েটার খবর আমার চাই। তারপর আমি নিজে যাব।'

'তুমি নিজে?'

'হ্যাঁ। আসলে স্বপ্নে যে বৃদ্ধ আরাকিয়েনকে দেখেছি, তাঁকে আমি কথা দিয়েছিলাম...'

বলতে বলতেই পায়চারি করছিল সুধীর। তার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকলেন অমূল্যবাবু। তারপর বললেন, 'স্বপ্নটা যদি সত্যি হয় তাহলে আমাদের সমস্ত হারানো গৌরব নতুন করে ফিরে আসবার সুযোগ থাকবে সামনে সেটা মানছি। আমাদের নেতা হিসেবে দেবী আরাকিয়েনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারেও তোমারই অধিকার। কিন্তু কোনও ঝুঁকি আমি নিতে চাই না। তোমার সঙ্গে একটা শিক্ষিত আরাকিয়েন বাহিনী পাঠাব আমি।...'

'না অমূল্যবাবু, প্রথমে আমি একাই যাব ওখানে।'

উঠে দাঁড়ালেন অমূল্যবাবু, 'নিয়তি আমাদের কোন পথে টেনে নিয়ে চলেছেন, জানি না। তবে, সিদ্ধান্তটা যখন তুমি নিয়েছ তখন আমার দায়িত্ব সেটাকে নিখুঁতভাবে পালন। এককালে তুমিই তো...'

'তার মানে?'

হাসলেন অমূল্যবাবু, 'মানুষের পাশাপাশি একাধিক প্রজাতির মাকড়সার রূপ ধরার ক্ষমতা ছিল একমাত্র কালানীলের। আমি এখনও জানি না আগে আমি কে ছিলাম।

২। মিয়ারী পাহাড়ের অন্ধকারে

'এভলিউশান!' ডঃ চৌধুরির স্পেশাল ক্লাসের লেকচারের কথাটা মাথায় আসতেই হাসি খেলে গেল অনুরাধার মুখে। সরলরেখার পথে অমেরুদণ্ডী থেকে মেরুদণ্ডী প্রাণীর বিকাশ, সেই থেকে ধাপে ধাপে মানুষের বিবর্তন। আর সে? সে তাহলে কী?

লাল মাটির রাস্তাটা এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে দূরে মিয়ারী পাহাড়ের হাতির মাথার মতো চুড়োটার পাশ দিয়ে। আকাশ এখন টকটকে লাল। সন্ধে নামছে। সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ মন খারাপ হয়ে গেল অনুপমার। ছোটবেলা থেকে তার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য একজনের কাছেই গিয়ে দাঁড়িয়েছে সে।

এখন, বাবাকেও সে প্রশ্নটা করবার উপায়ও নেই ! ক্লাশ থেকে বেরিয়েই বাবার নম্বরে একটা হোয়াট্স্ অ্যাপ কল করেছিল । জবাব আসেনি। কী হল বাবার?

এলোমেলো ভাবনাগুলো মাথায় নিয়ে চলতে-চলতেই হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল অনুপমা। কেউ তাকে অনুসরণ করছে। তার মানুষ শরীরের আড়ালে আরাকিয়েন অনুভূতি ভুল করবে না। আজ প্রথম নয়। গত কয়েকদিন ধরেই ঘটে চলেছে। কলেজ যাওয়া আসার পথে, রাত্রে বিছানায় শুয়ে, তার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে, সব জায়গাতেই সে এই উপস্থিতিটা টের পাচ্ছে।

মা-কে কিছু বলেনি অনুপমা। শুধু-শুধু ভয় পাবে। হয়তো পুলিশকে জানাবে। তাতে অনুপমার উদ্দেশ্যটা পূরণ হবে না। কে বা কারা তাকে অনুসরণ করছে, কেন করছে, সে নিজে আগে জানতে চায়।

থেমে দাঁড়াবার সঙ্গে-সঙ্গেই পেছনে পায়ের আওয়াজ থেমে গেছে। চারপাশের জঙ্গল থেকে সন্ধের শব্দগুলো ভেসে আসছিল। কান পেতে সে শব্দগুলোকে শুনল অনুপমা। সে টের পাচ্ছিল, ডানদিকে বেশ খানিকটা পেছনে একটা ছোট্ট এলাকায় ঝিঁঝির ডাক থেমে গেছে। এর একটাই অর্থ, সেইখানটাতে জঙ্গলের আড়াল নিয়েছে পায়ের শব্দের মালিক।

খানিক পরে সে এলাকাটার শব্দগুলো ফের স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে

এল। নিস্তব্ধ এলাকা এবার তার কাছে। এগিয়ে আসছে সে!

আবছায়া সন্ধ্যার অন্ধকারে মুখে একটা ক্রূর হাসি খেলে গেল অনুপমার। হয়তো কোনো বন্যজন্তু, হয়তো তার চেয়েও খারাপ—কোনো মানুষ! আজ সে একে ছাড়বে না।

জায়গাটাকে একবার জরিপ করে নিল অনুপমা। হাতের ডাইনে মিয়ারী পাহাড়টা এখন অনেকটা কাছে। একটুকরো পাথুরে জমি এখান থেকে ছড়িয়ে গেছে পাহাড়টার দিকে। সেদিকে একনজর দেখে নিয়েই মনস্থির করে নিল। তারপর হঠাৎ তিরের মতো ছুটে গেল মাঠ পেরিয়ে মিয়ারী পাহাড়টার দিকে।

পাদদেশে খানিকটা খোলা চত্বর। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে উঠে আসা যায় এখানটায়। অনুপমা ততক্ষণে একটা পাথরের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখে চোখ চালিয়ে দিয়েছে সামনে মাঠটার দিকে। একটা অন্ধকার শরীর আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছিল পাহাড়চূড়োর দিকে।

পাহাড়ের তলায় এসে একমুহূর্ত থামল লোকটা। এবার ওপরে এসে চাতালের মাঝখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে মানুষটা। অন্ধকারে এদিক-ওদিক দেখছে। মাথা উঁচু করে বাতাসে শুঁকছে। শরীরে হালকা একটা কাঁপুনি ছড়িয়ে গেল অনুপমার। অন্ধকারের মধ্যেই তার লুকিয়ে থাকবার জায়গাটার দিকে মুখ ঘুরিয়ে ধরেছে লোকটা। বাতাস শুঁকতে শুঁকতে এগিয়ে আসছে!

তীব্র একটা ভয়ের ঢেউ ছড়িয়ে গেল তার শরীরে। অন্ধকারের মধ্যেই বদলে যাচ্ছিল তার শরীর।

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে মানুষটা। তীক্ষ্ণ একটা ক্র-র-র-র শব্দ নিস্তব্ধতাকে ভেঙে খানখান করে দিল। ছিটকে আসা অতিকায় কালো জীবটার উড়ানপথ থেকে শেষ মুহূর্তে নিজেকে সরিয়ে নিতে গিয়েছিল লোকটা। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। তার একটা পায়ের ধাক্কা লেগে কিছুটা দূরে ছিটকে গেল।

অপেক্ষা করছিল অনুপমা। নিজেকে সামলে নিয়েছে মানুষটা। উবু হয়ে বসে হঠাৎ সে ডেকে উঠল, 'দেবী আরাকিয়েন—'

'কাকে ডাকছে ও? হয়তো ওর সঙ্গী দ্বিতীয় আততায়ী লুকিয়ে আছে কাছেই! দ্বিতীয়বার একে সুযোগ দেবে না অনুপমা। আস্তে আস্তে অতিকায় শরীর নিয়ে সে এগিয়ে যেতে শুরু করল।

লোকটার শরীরটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল। তারপর অনুপমার হতভম্ব দৃষ্টির সামনে ক্র-র-র-র শব্দ তুলে সেখানে উঠে দাঁড়াল অতিকায় আরেকটা মাকড়সা। অনুপমা ঝাঁপ দিল—

আশ্চর্য দক্ষতায় আক্রমণটাকে এড়িয়ে গেল জীবটা। অনুপমা জানে, পাশ থেকে তার অরক্ষিত শরীর যে কোন শিকারীর সহজ লক্ষ্য হতে পারে। একটা ছোট লাফ মেরে নিজেকে ঘুরিয়ে ফের তার মুখোমুখি হতে চেয়েছিল সে। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। বিরাট লাফে তার ওপরে এসে আছড়ে পড়েছে জীবটা! এবার তার মাথার পাশে নেমে আসবে উদ্যত দাঁড়া...!

কিন্তু আঘাতটা এল না। আটটা শক্তিশালী পা পাশ থেকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরে একেবারে স্থির করে রেখেছে তাকে। প্রাণপণে নিজেকে ছাড়াবার জন্য লড়ছিল অনুপমা। হঠাৎ একটা খসখসে গলা কথা বলে উঠল তার কানের কাছে, 'নিজেকে সংযত করুন দেবী আরাকিয়েন। মানুষের চেহারায় ফিরে আসুন। আমি আপনার শত্রু নই। আগে আমার কথাগুলো শুনুন।'

'এমন অবিশ্বাস্য গল্প বিশ্বাস করতে বলেন?' বিস্মিত গলায় প্রশ্ন করল অনুপমা।

'কী বিশ্বাস করব আর না করব, আমি জানি না।' তার পাশে বসা সুধীর মাথা নাড়ল। এখন মানুষের চেহারায় তারা দুজনই। 'আমাসাদোমের পুঁথিতে দেবী আরাকিয়েনের পুনর্জন্মের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা পড়লাম যখন, ভেবেছিলাম পুরোনো দিনের কোনও গল্পকথা।

'অথচ তারপর স্বপ্নটা—আর সবশেষে তার পূর্বাভাস অনুযায়ী এখানে এসে আপনাকে খুঁজে পাওয়া—এতগুলো জিনিস মিলে যাচ্ছে কেমন করে?'

বলতে-বলতে হঠাৎ থেমে গেল সুধীর, 'কেউ আসছে।'

অনুপমাও কান পেতে শুনছিল। পেছনদিকের ঢাল থেকে উঠে আসছে প্রায় নিঃশব্দ পায়ের আওয়াজ।

'এগারোজন,' হঠাৎ ফিসফিস করে বলে উঠল অনুপমা।

'আমারও তাই অনুমান। এত রাতে এখানে, কারা—'

তার কাঁধের ওপর তখন অনুপমার হাতের ছোঁয়া। ফিসফিস করে সে বলছিল, 'চারপাশ থেকে উঠে আসছে! এর একটাই অর্থ হয় সুধীর—'

'হ্যাঁ। গত দুদিন ধরে কলেজ যাওয়া-আসার পথে আমি আপনাকে অনুসরণ করছি, সেটা ঠিক। কিন্তু আপনার বাড়ির বাগানে ঢুকিনি। আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে কখনোই উঁকি দিইনি। আজও তবে আমি একাই ছিলাম না! এরা কারা অনুমান করতে পারছি।'

একই সঙ্গে বদলে যাচ্ছিল দুজনের চেহারা। তখনই পাহাড়ের ঢালের পুব থেকে বাতাসে ছিটকে এল রঙিন আলোর ঝলক। মাথার ওপর উঠে গিয়ে আলোর ঝরনা হয়ে ফেটে পড়ল। দিনের আলোর মতো উজ্জ্বল গোটা চাতালটা।

জীবদুটোর চারপাশ দিয়ে তখন উদ্যত অস্ত্র হাতে উঠে আসছে এগারোটা কালো পোশাকে ঢাকা শরীর। সামনের মানুষটার দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতর হিম হয়ে গেল সুধীরের। 'শারণিক!'

চাতালের মাঝখানে এসে একটা মশাল জ্বালিয়ে সেখানে বসিয়ে দিলেন শারণিক। কোমরে ঝোলানো চামড়ার বাক্স থেকে একটা মোবাইল ফোন বের করে তার বোতাম টিপে কানে লাগালেন। নীচুগলায় বললেন, 'শিকার পাওয়া গেছে মহান ঝাও।'

বাঁ-পাশে দাঁড়ানো বিশালদেহী সন্ন্যাসী ততক্ষণে হাতের অস্ত্র এগিয়ে ধরে নিশানা করেছেন সুধীরকে। তার দিকে ছিটকে গেলেন শারণিক। আততায়ীর উদ্যত হাতটা চেপে ধরে তিনি বলে ওঠেন, 'অস্ত্র নামাও হং ফেই। সুধীর আমার শিকার। তারপর অন্য জন্তুটা তোমার জন্য।'

সুধীরের দিকে ফিরে বললেন, 'মানুষের চেহারায় ফিরে এসো সুধীর। আমার মুখোমুখি হতে হবে তোমায় আজ।'

সুধীর কান পেতে কিছু শুনছিল। তার তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়ে ধরা দিয়েছে তখন দূর থেকে ভেসে আসা অনেকগুলো হালকা পায়ের আওয়াজ। এ শব্দ সে চেনে! মানুষের পায়ের শব্দ নয়।

নিজেকে মানুষের চেহারায় ফিরিয়ে নিয়ে এল সে। দু'পায়ে ভর করে উঠে দাঁড়াচ্ছে অনুপমাও। আসন্ন মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও বিন্দুমাত্র বিচলিত দেখাচ্ছিল না মেয়েটাকে।

পায়ের আওয়াজগুলো আরও কাছে। আর বড়োজোর একটি কি দুটি মিনিট! অনুপমাও শব্দগুলো পেয়েছে। তার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে ঘুরে তাকিয়েছিল। সুধীর তাড়াতাড়ি শারণিকের দিকে ঘুরে বলল, 'আমি প্রস্তুত শারণিক। শুধু মরবার আগে আমার একটা কৌতূহল। তুমি বেঁচে ফিরে এলে কেমন করে?

'অকারণ কথায় সময় নষ্ট করতে চাইছে এই জন্তু। প্রথম আঘাতের

অধিকার আপনার শারণিক। আঘাত করুন।' হং ফেই শারণিকের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল।

'নিজের জায়গায় ফিরে যাও। আদেশের অপেক্ষা করো।'

বলতে-বলতেই এগিয়ে এসে একটা প্রচণ্ড আঘাতে সুধীরকে ছিটকে ফেলে দিলেন শারণিক। তারপর লাফ দিয়ে তার ওপরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন...। ফিসফিস করে বললেন, 'বাঁচতে চাইলে প্রত্যাঘাত কোরো না। আর কয়েকটা সেকেন্ড। ওরা প্রায় পৌঁছে গিয়েছে—আমি সংকেত দেবার সঙ্গে সঙ্গে অনুপমাকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাবে।

মানে? শারণিক কে? সুধীরের ভাবনাচিন্তাগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল অথচ সারা শরীরে তখন ঝরে পড়ছে শারণিকের যন্ত্রণাদায়ক আঘাতগুলো। তারই মধ্যে সুধীরের কানে পৌঁছে যাচ্ছিল অসংখ্য পায়ের লাফিয়ে এগিয়ে আসবার মৃদু থুপ থুপ শব্দ। অনুপমাও হঠাৎ সতর্ক চোখে মাথা ঘুরিয়ে দেখছে—।

'এইবার—'

কথাটা বলেই হঠাৎ তাকে ছেড়ে দিয়ে গড়িয়ে গেলেন শারণিক। সঙ্গে সঙ্গেই হং ফেইয়ের সামনে দাঁড়ানো অনুপমাকে লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল সুধীর। হং ফেই হাতের অস্ত্র তুলে তাক করেছে তাদের দিকে—।

—কিন্তু অস্ত্রের ট্রিগার টেপা হল না। শুয়ে থাকা অবস্থাতেই হং ফেইয়ের দিকে লক্ষ করে অস্ত্র থেকে আগুন উগরেছেন শারণিক। অনুপমাকে জড়িয়ে ধরে বোল্ডারের আড়ালে গড়িয়ে যেতে যেতে সুধীর টের পাচ্ছিল, শারণিকের দু'হাতের দুটো অস্ত্রের অবিরাম গুলিবর্ষণ ছত্রভঙ্গ করে দিচ্ছে বাকি ঔধীশ দলটাকে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে চাতালের প্রান্তে গিয়ে ছোট ছোট কিছু বোল্ডারের পেছনে পজিশন নিল শিক্ষিত খুনের দলটা।

কিন্তু শারণিককে লক্ষ্য করে গুলি আর চালানো হল না তাদের। নীচের অন্ধকার ঢাল বেয়ে তখন উঠে আসছিল অতিকায় আরাকিয়েনের বিরাট দলটা। পেছন থেকে তাদের আক্রমণের জন্য একেবারেই তৈরি ছিল না ঔধীশ খুনির দল।

কয়েক মুহূর্ত। তারপর প্রাণহীন শরীরগুলোকে ডিঙিয়ে ওপরে উঠে এল সৈন্যদল। সুধীরকে স্তম্ভিত করে দিয়ে দলটার সামনে থাকা জীবটাকে শারণিক তখন বলছেন, 'ধন্যবাদ অমূল্যবাবু। সঠিক সময়ে পৌঁছেছেন আপনি।'

মানুষের চেহারায় ফিরে আসছিল গোটা আরাকিয়েন বাহিনী। একটু হাসলেন অমূল্যবাবু, 'আপনার ফোন কল পাবার পর আর একমুহূর্ত দেরি করিনি। কিন্তু সুধীর কোথায়?'

পরক্ষণে চাতালের অন্যপাশের বোল্ডারটার দিকে চোখ গেল। মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসলেন অমূল্যবাবু। এবং তাঁর গোটা দলটাই। অনুপমার হাত ধরে এগিয়ে আসছিল সুধীর।

'ওরা আপনাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে দেবী আরাকিয়েন।'

অনুপমা চল্লিশজনের দলটার দিকে ফিরে দেখল একবার। তাদের প্রত্যাভিবাদন জানিয়ে বলল, 'আমি দেবী আরাকিয়েন, নাকি শুধুই অনুপমা তার বিচার পরে হবে। আপনারা আমায় দেবী ভাবছেন, কিন্তু আমি এখনও তা বিশ্বাস করতে নারাজ। তবে একটা কৌতূহল মিটিয়ে নিতে চাই।'

শারণিকের দিকে ঘুরে সে প্রশ্ন করল, 'সুধীরের কাছে যে ইতিহাস সামান্য জেনেছি, তাতে আপনি একজন ঔধীশ সন্ন্যাসী। আমাদের ওপরে আক্রমণ শানাতেই এসেছিলেন। অথচ শেষ মুহূর্তে—'

মৃদু হাসলেন শারণিক, 'সে ব্যাখ্যা যিনি দেবেন সেই সাধক রাবটেন আপনারই অপেক্ষায় আছেন দেবী। তাঁর কাছে নিয়ে যাবার জন্যই আমার এখানে আসা। তাঁর আদেশেই আমি আপনার শত্রু সেজে এদেশে এসেছি।'

সুধীরের দিকে ফিরে চাইলেন, 'ফোন আমি ঝাওকে করিনি সুধীর। অমূল্যবাবুকে করেছিলাম।'

অমূল্যবাবু এবার সুধীরের সামনে এসে দাঁড়ালেন, 'তুমি এখানে চলে আসবার দিন রাত্রেই শারণিক আমার সঙ্গে কলকাতায় যোগাযোগ করেছিলেন। ঝাওয়ের আদেশে দেবীকে শেষ করবার জন্য হাইন লিম থেকে এ-অঞ্চলে অভিযানে আসা ঔধীশ হত্যাবাহিনীর খবর তিনিই আমাকে জানান। অনুরোধ করেন একটা বাহিনী নিয়ে এখানে এসে তাঁর সংকেতের জন্য অপেক্ষা করতে।'

'একজন ঔধীশ সন্ন্যাসীর কথা বিনাপ্রমাণে আপনি বিশ্বাস করে নিলেন?'

'বিনা প্রমাণে নয় দেবী। শারণিকের সঙ্গে একটা ছোট যোগাযোগ যন্ত্র ছিল। তা দিয়ে দেবী আরাকিয়েনের মানসপুত্র জিরিয়েন ওরফে সাধক রাবটেনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ করিয়ে দেন তিনি। তাঁর সঙ্গে কথা বলবার পর আমি শারণিকের বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছিলাম। তার মুখে সম্পূর্ণ ঘটনাটার বিবরণ শুনলে আপনার অনেক প্রশ্নেরই জবাব পাবেন। তাছাড়া সে কাহিনীতে আপনার ও সুধীরের ব্যক্তিগত কিছু স্বার্থও জড়িত আছে। সুধীরের বাবা-মা ও আপনার নিখোঁজ বাবার সন্ধান শারণিক জানেন। বলুন শারণিক।'

রাত শেষ হয়ে এসেছে প্রায়। নিজের কাহিনি শেষ করে অনুপমার দিকে ফিরে চাইলেন শারণিক। তাঁর গলায় গভীর দুঃখের ছোঁয়া ছিল, 'অরিহন্ত ত্রিপাঠী ও গুপ্ত দম্পতি হাইন লিম-এ ঝাওয়ের হাতে বন্দি। তবে সুখবর একটাই, বিজয় ও সেমন্তি গুপ্ত নিজেদের স্মৃতির স্বেচ্ছাবিলোপ করেছেন। ফলে আরাকিয়েন অভ্যুত্থানের বিষয়ে কোনো তথ্য এখনও ঝাওয়ের হাতে পড়েনি। যতক্ষণ না ঝাও সে-তথ্য উদ্ধার করতে পারছেন ততক্ষণ তাঁদের জীবনের কোনও আশঙ্কা নেই। কিন্তু দেবী, ঝাওয়ের হাতে বন্দি আপনার বাবার তেমন কোনও নিরাপত্তা...

'আমি সেখানে যাব।' হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল অনুপমা, এবং সুধীর, আশা করি...'

'একটু ধৈর্য ধরতে হবে দেবী।' শারণিক মাথা নাড়লেন, 'হাইন লিমের ঘাঁটিতে গিয়ে ঝাও ইয়াং এর শক্তির মোকাবিলা করবার সাধ্য এখনও আপনাদের নেই। সাধক রাবটেন আপনাদের সে-শক্তি দিতে সক্ষম। আমাকে সেই বার্তা দিয়েই পাঠিয়েছেন। তিনি আপনাদের অপেক্ষায়।'

চাঁদের আলো তরল হয়ে আসছিল। তারাগুলো মিলিয়ে যাচ্ছে আকাশ থেকে। মোরিবাগের ঘুমন্ত একটা বাড়ির জানালার কাছে নিঃশব্দে এগিয়ে এল একটা অতিকায় আটপেয়ে জীব। দাঁড়ায় ধরা একটুকরো কাগজ, বাড়িটার বারান্দায় রেখে দিয়ে একমুহূর্ত চুপ করে দাঁড়াল সে। তারপর ফের তার বাগানের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

কাগজটায় সংক্ষিপ্ত চিঠি লেখা ছিল একটা,

'বাবার খোঁজ পেয়েছি মা। তিনি বিপদে আছেন। আমি তাঁকে ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছি। আমার ওপর ভরসা রেখো।

তোমার অনুপমা'

চিঠিটা রেখে দিয়ে অন্ধকার বাগানে অপেক্ষায় থাকা বাকি জীবগুলোর কাছে এগিয়ে এল দাঁড়াল সে। তারপর আধো অন্ধকার বনভূমির মধ্য দিয়ে জাল ছুঁড়ে তিরের বেগে ছুটে গেল তারা। তাদের লক্ষ্য পুরুলিয়া শহর। সেখান থেকে মানুষের চেহারা নিয়ে কলকাতা।

সুদূর হিমালয়ের বুকে সাধক রাবটেন তাঁর দেবীর ফিরে আসবার অপেক্ষায় আছেন। **কিশোর ভারতী**

ছবিঃ মৃণাল শীল
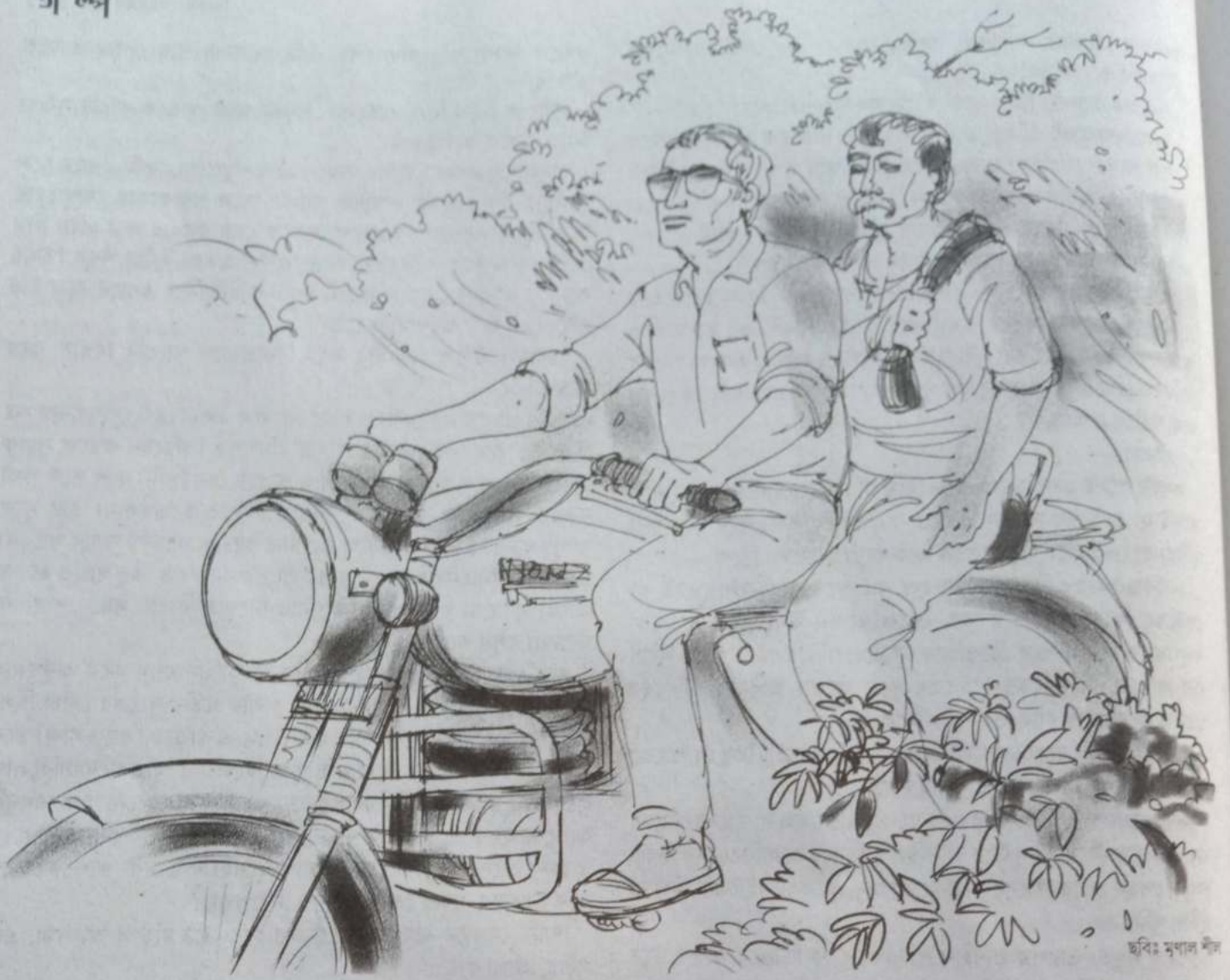
বাণী বসু

ঘুরাগাড়ির ছোটমামু

সারা বছর কলকাতায় বাইক দাবড়ে বেড়াই। শীত গ্রীষ্ম কামাই নেই। ওষুধের সাম্পল আর গুচ্ছের সত্যি-মিথ্যে লেখা চকচকে লিটারেচারগুলো ঢাউস একটা ব্রিফ কেসে পুরে বিবিডি বাগ থেকে ভবানীপুর, ভবানীপুর থেকে টালিগঞ্জ, সেখান থেকে জোকা, আবার ব্যাক করে মুকুন্দপুর, বালিগঞ্জ ফাঁড়ি, ওদিকে বেহালা, খিদিরপুর, এদিকে বৌবাজার শ্যামপুকুর...কী বলব আর, সারাটা শহর আমার অপিস। সকাল দশটায় বেরোই, বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত্তির দশটা তো বটেই। গলদঘর্ম শরীরটা থেকে গেঞ্জিটাকে আলাদা করতে প্রাণ বেরিয়ে যায়। মা মা ডাক ছাড়ি। মা এলে হাত দুটো স্রেফ বাড়িয়ে দিই অসহায়ের মতো। মা টেনে খোলে, পাঁঠার ছাল ছাড়ানোর মতো করে, বলে—ও গেঞ্জিটা এবার ফেলে দে, চুপচুপে ভিজে গেছে ঘামে। নিতাইয়ের মায়ের সাধ্য নেই ওটাকে কেচেকুচে আবার সভ্য করে তোলে।

মায়ের কথা শুনতে হলে প্রতিদিন একটা করে গেঞ্জি ফেলা যায়। সপ্তাহে ছ'টা, মাসে চব্বিশটা, তার মানে বছরে চব্বিশ ইনটু বারো ইকোয়াল টু পাঁচশো আটাশটা গেঞ্জি লাগবে। খেয়ে দিয়ে আর কাজ নেই তা হলে। গেঞ্জির দোকানেই হত্যে দিয়ে পড়ে থাকি। বোন বলে, দাদা হোসিয়ারির দোকানদারের মেয়ে দেখে একটা বিয়ে করে নে, প্রবলেম সলভড।

মেডিক্যাল রেপ্রিজেনটেটিভের এই রক্ত জল করা চাকরিটা ছেড়ে দেব ভাবছি, এমন সময়ে বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল। এরিয়া ম্যানেজার করে দিল আমাকে। মানে অত ঘুরতে আর হবে না। ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকো, ফোনে লম্বা লম্বা নির্দেশ দাও আর মাঝে মাঝে ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাসে কেতায় ভ্রমণ করো।

শেষবারের জন্যে অবশ্য ওরা আমায় পাঠাচ্ছে বাঁকুড়ায়। কেউ ওখানে চট করে যেতে চায় না। বিশেষ করে এই গরমে। বাঁকুড়া বীরভূমের গরম? ওরে বাবা মরুভূমিতুল্য। বস ভেবেছে প্রোমোশনের আগে একবার আমাকে বেশ করে সেঁকে নেবে। জানে না বাঁকড়ো শহরের মাঝ মধ্যিখানে আমার মামার বাড়ির আবদার বসে আছে। হোক না গরম কাল। সেখানে আমার জন্যে চালের রুটি, থাকরা আর সঙ্গে হংসমাংস বাঁধা। আম কাঁঠাল ইত্যাদি ফলারের জোগাড় তো আছেই।

দিন দুইয়ের মধ্যে কাজ সারা হতে মামুকে বলি বুড়ো দাদুরা কেমন আছে গো? ভাবছি একবার দেখা করে যাব। কবে আছে কবে নেই। মামা বললে—বুড়ো তো সাতানব্বই ঘা দিল। ছেলেপিলে নাতি-নাতকুড় নিয়ে আছে ফাসক্লাস।

বুড়োদাদু হলেন আমার মামার বাড়ির সবচেয়ে বড় আর সবচেয়ে বুড়ো মানুষ, দাদুদের বাবা। তিনি থাকেন এঁদের আদি বাড়ি, ঘুরাগাড়ি গ্রামে। বয়স বোধহয় নব্বইয়ের ওপর, কিন্তু খটখটে আছেন। দুই দাদু মারা গেছেন কবে। মামুরা সব ছড়িয়ে পড়েছেন। একমাত্র ছোটদাদুই জীবিত আছেন, তিনি আর তাঁর ফ্যামিলি থাকে বুড়োদাদুর কাছাকাছি, এই বাঁকড়ো জিলায়, ওই ঘুরাগাড়ি গ্রামেই। মা এবার বিশেষ করে বলে দিয়েছিল যেন বুড়োদাদুর সঙ্গে দেখা করে আসি। আমারো ওঁকে খুব ভালো লাগে। একে তো অমন খটখটে, তার ওপর জেনারেশন গ্যাপ বোঝা যায় না ওঁর সঙ্গে কথা বললে। রাজ্যের খবরাখবর রাখেন, খেলাধুলোর ব্যাপারে তো ভীষণ উৎসাহ। আমি অবশ্য বলছি ছ'সাত বছর আগেকার স্মৃতির কথা। এখন কীরকম দাঁড়িয়েছেন জানি না। আরে, মামার বাড়িতেই তো এলুম পাক্কা তিন বছর পর।

তা মামা শুনে বললে—যাবি বলছিস? তো যা। সত্যিই তোরা আজকাল ডুমুরের ফুল হয়েচিস। বুড়ো খুব খুশি হবে এখন। তবে কি জানিস, এরিয়াটায় মাওবাদীদের খুব উপদ্রব হয়েছে, দু-একটা এনকাউন্টারও হয়ে গেল পুলিশের সঙ্গে। তবে আমাদের সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে আর ওদের কী! মাইন টাইন পেতেছিল পথে। এখন তো সব সাফ হয়ে গেছে শুনতে পাই।

জষ্টি মাস শুরু হয়ে গেছে, আকাশ থেকে আগুন ঝরছে। এবছর আবার ঝড়-বৃষ্টির দেখা নেই। ট্রাভল করে করে আমার পথের ভয়ভীতি আজকাল অনেক কমে গেছে। মাওবাদী তো মাওবাদী! আমার কী? শুধু মামার বাড়ির দিকের কেন, আমাদের তিনকুলে বুড়োদাদুর মতো এত বৃদ্ধ আর কেউ নেই। সেই দাদু এখন কেমনটা হয়েছেন? এখনো কি লাঠি ছাড়াই চলাফেরা করেন? চোখের দৃষ্টি কি তেমনি সজীব, তেমনি তীক্ষ্ণই আছে?

ফোনে খবর চলে গেল। এই এক হয়েছে সেলফোন। আধুনিক পৃথিবীর সবচেয়ে চমকপ্রদ, সবচেয়ে সুবিধের উদ্ভাবন। এদিকে টাওয়ারের একটু অসুবিধা আছে অবশ্য, তবু টুকটাক খবর দেওয়া নেওয়া দিব্যি চলে। মামা বাগানের ভুতো বোম্বাই আম দিয়ে দিল পাঁচ কিলো। থলিতে ভরে বাইকে তুলে দিল মামি, সঙ্গে দিল খাবার জল, একেবারে ঠান্ডা কনকনে, ফ্রিজ থেকে সদ্য বার করা, বলল—এত ঠান্ডা গলায় ঢেল না। মাঝপথ যেতে যেতেই জলটা আর এত ঠান্ডা থাকবে না, তখন তেষ্টা মিটিও। মুড়ি দুধ কলা আম দিয়ে মাখা ফলার খেয়ে আমি যাত্রা শুরু করি। মামাতো ভাইটার সর্দিগর্মি লেগে গেছে, সে মাথায় ভিজে গামছা দিয়ে শুয়ে আছে, আমাকে এতটা পথ যেতে হবে একলা। খুব ইচ্ছে ছিল ও আমার সঙ্গে যায়, গল্প করতে করতে পথটা পার করে দেব, তার জো রইল না।

রায়পুর থানা থেকে পথ বেঁকে গেছে বারিকুল গ্রামের দিকে। গ্রাম নামেই, একটু এগোতেই ধুম জঙ্গল। একদিকে তারাফেণী নদীর খাল, এই গরমে তার জল শুকিয়ে কাদাপানা, আর অন্যদিকে ভরভর্তি জঙ্গল। শুকনো শালপাতা ছড়িয়ে আছে লাল মাটির রাস্তাটাতে। একটু এগোতেই এই জঙ্গল যেন আমায় গিলে নিল। আশেপাশে সামনে আর কিচ্ছু নজরে পড়ে না, খালি ঝোপ-ঝাড়, খালি শাল-মহুয়ার জঙ্গল। এই রাস্তায় আমি তো আগে আর কখনো আসিনি। মামাতো ভাই বিষ্টু জানে, তারই আসার কথা ছিল। তা সে তো মাথায় গামছা বেঁধে শুয়ে। মামারা আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছিল রাস্তা নাকি একেবারে নাকের সিধে, আর ঘুরাগাড়িতে পৌঁছে গেলে যে কেউ পাত্তা বলে দেবে মহাপাত্র বাড়ির।

একটা জিনিস নিশ্চিন্ত করল। সরু এই খালপাড়ের জঙ্গুলে পথে যেন এসি চলছে। কী ঠান্ডা, আর কী সুন্দর যে ঠান্ডা কী বলব। ভেবেছিলুম আরও একটা গেঞ্জি ন্যাতা হবে, তা দেখি কি জঙ্গল আমাকে মিষ্টি একটা ঠান্ডার চাদরে যেন মুড়ে নিয়েছে। পুরোপুরি প্রাকৃতিক, বললুম বটে এসি, কিন্তু এ ঠান্ডার ধরন একদম আলাদা। যেন বসন্তের ফুরফুরে বাতাসে আরামসে পথ পার হচ্ছি। মনে হল গরম বাতাসের স্রোতটা যেই গাছগুলোর সংস্পর্শে আসছে, গাছের সবুজ তাকে ঠান্ডা আর মিঠে করে দিচ্ছে। কিন্তু যতই নাকের সোজা বলুক মামারা, দেখি পথটা কোথাও কোথাও দু'ভাগ হয়ে গেছে। একটু তো ধাঁধা লেগেই যায়।

এমন সময় দেখি বাঁকের মুখে একটি লোক পথের ধুলো মেখে লাল হয়ে দঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে হাত দিয়ে বাইক থামাল।

—কোন দিকে যাইছেন, জিগ্যেস করল।

—ঘুরাগাড়ি, আমি বলি।

—আমি উদিকেই যাইছি। লিফট দ্যান যদি...

—নিশ্চয়ই, আমি খুশিমনে ওঁকে তুলে নিই। যাক আমার দুটো সমস্যাই মিটল, রাস্তাটা আর একা একা যেতে হল না। কথা বলতে বলতে চলি দুজনে। সিধা পথের কথা শুনে লোকটি বলল—পথ সিধাই ছিল। একটু পুলিশি হাঙ্গামা হওয়ায় সামান্য ঘুরপথ হয়ে গেছে। ঘুরাগাড়িতে আমি

কখনো যাইনি অথচ আত্মীয় থাকেন শুনে লোকটি বলল—ঘুরাগাড়ির নাম হওয়া উচিত ছিল ঘুরাগড়, কেন না ওখানে বনেদি বড় বড় মানুষদের বাস। আগে সব খুব বড় বড় ফ্যামিলি ছিল, এখন সব মরে ঝরে ছোট হয়ে গেছে ফ্যামিলিগুলো, বাড়ি সব বিরাট বিরাট, গোলকধাঁধার মতন। যদি কেউ মানুষ খুন করে লুকিয়ে থাকতে চায়, ওইসব বাড়িতে বছরের পর বছর থাকতে পারে।

কেমন একটা রহস্যের গা-ছমছমে ভাব যেন চারদিক থেকে আমায় ঘিরে ধরেছে। বলি—বাড়িগুলো যাঁরা তৈরি করেছিলেন নিশ্চয় খুনেদের লুকিয়ে রাখবার জন্যে করেননি।—উত্তর দ্যান না লোকটি। আমি বলি—বলুন? সেটা কি সম্ভব? উত্তর নেই। এবার আমি ব্রেক কষি, পেছনে তাকাই, পেছনের সিট শূন্য। মাথাটা যেন বোঁ করে ঘুরে গেল। ভূত নয় তো? যাই বলুন, বিপদের সময়ে যেমন আমাদের ভগবানের নাম মনে আসে, ভূতের কথাও তেমনি চট করে মনে এসে যায়, যায় না? কী রে বাবা, ভূত নাকি? রাম রাম! হয় না এরকম? বুকে হাত দিয়ে বলুন তো দাদা?

মহাপাত্র ভবনে পৌঁছে গেছি। আর কোনো অসুবিধে হয়নি। বাকি রাস্তা সোজাই, মহল্লায় ঢুকতেই মুনিষ গোছের একটি লোক আমাকে রাস্তা দেখিয়ে যে বাড়িটাতে পৌঁছে দিল সেটা সত্যিই একটা দুর্গবাড়ি। বাইরে ছোট ছোট সাবেকি ইটের পাঁচিল, জায়গায় জায়গায় ভেঙে গেছে, তবু ভেতরবাড়ি বেশ ভালোভাবেই আড়াল করে আছে। বেশ কয়েকটা সিঁড়ি পার হয়ে তবে পেলাম চৌকো উঠোন, যেটা গিয়ে পৌঁছেছে ঠাকুর দালানে। দুর্গা না বাসন্তী না জগদ্ধাত্রী ঠাকুরের একটা মাঝারি কাঠামো তার একধারে দাঁড় করানো। ঠাকুরদালান পার হয়ে ঢুকি হলঘরের মতো বিশাল একটা ঘরে। ঢুকেই চমকে যাই। বাপরে এ যে দেখি চুঁচুড়ার সেই ডাচ বাংলোগুলোর মতো অনেকটা!

সেগুলোতে এককেটা হলে একসঙ্গে তিন-চারটে বহুতল ধরে যায়, এটাতে এরিয়া হিসাবে তা খান দুই মাঝারি ফ্ল্যাটের ফ্লোর এরিয়া তো হয়েই যায়। হল্ না প্ল্যাটফর্ম আবার বোঝা দায়। দূরপাল্লার ট্রেন থাকলে দেখবেন দেহাতি লোক প্ল্যাটফর্মের জায়গায় জায়গায় যে যার লটবহর নিয়ে বসে আছে। সেখানেই খাবার কিনে এনে খাচ্ছে, কেউ আবার সওদা করা জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করছে। এ যেন সেই রকম।

দেখি এক কোণে একটা বালতির উনুনে সাতাশি বছরের বৃদ্ধা বুড়িদিদিমা কিছু একটা রান্না করছেন, দারুণ মিষ্টি গন্ধ বেরিয়েছে, একধারে ওঁদের ছেলে সাতষট্টি বছরের ছোটদাদু আর তাঁর সাতচল্লিশ বছরের ছেলে ইলেকট্রিকের তার প্লায়ার্স প্লাগ সুইচবোর্ড ইত্যাদি নিয়ে ভগবান জানেন কী ইঞ্জিনিয়ারিং করছেন। আরেকদিকে নীচু মোড়ায় বসে আমারই বয়সি আমার মামাতো বোনই হবে এই গরমে তুঁতে রঙের উল দিয়ে উল বুনছে, গোল্লাটা গড়গড় করে গড়িয়ে গেছে সেটাকে গোটাচ্ছে একটি বছর বারো তেরোর মেয়ে, আরেক মামাতো বোন মনে হয়। আর সাতানব্বুই বছরের বৃদ্ধ আমাদের বুড়োদাদু, আমার জন্য সরুচালের অন্নভোগ সাজিয়ে নিয়ে বসে আছেন। হাতপাখা নিয়ে রেডি আমার ছোটমামাতো বউদি। খালি ছোট মামাটাই নেই।

সাতানব্বুই জানতুম। বাকিগুলো আন্দাজে বসিয়েছি। যেটা বলতে চাইছি, ওই গোটা পরিবারটাকেই একটা ঘরে জটলাপাকানো দেখলুম। একটা ঘর ওরকম বিরাট বিশাল হলে অবশ্য এরকম ব্যবস্থা করাই যায়। আসলে এরকম আর্কিটেকচার কখনো তো দেখিনি, দেখিনি এমন বসবাসও।

কুশল দেওয়াদেওয়ি প্রণাম ইত্যাদি চুকল। বুড়ো দাদু দেখি একটু শুকিয়ে পাকিয়ে গেছেন। খালি চোখগুলো আগের মতোই জ্বলজ্বলে।

—বুড়ো দাদু, আপনারা কি খুব বড় জমিদার ছিলেন? খেতে খেতে জিগ্যেস করি।

নিদন্ত মুখে উনি বললেন—ছিলেন মানে? আমরা তো এখনো বড় জমিদার বাপু হে! কী বলো তো? আমাদের যে জমিজমা যার আমরা সে সব রয়েছে কিন্তু আবার নেইও।

—মানে?

—মানেটা বুঝিয়ে বলা খুব শক্ত, বুঝলে? তুমি ভেন্ন মুলুক থেকে এসেছ, তুমি বাপু বুঝবে না। তখন আমি বলি আমার চলনদার সেই লোকটির কথা। উনি বলছিলেন, আপনাদের বাড়িগুলো নাকি দুর্গের মতো। ইচ্ছে করলেই খুন করে লুকিয়ে থাকা যায়।

ছোটদাদু তাঁর প্লায়ার্স ফেলে সহসা হাহা করে হেসে উঠলেন। তাঁর ছেলে, আমাদের বড় মামা বললেন—আহা হা হা, ও ভাবে হাসলে কখনো হয়? ও ছেলে দু দিনের, তার ওপরে দিশা দিগরের কোনো খবরাখবর জানে না, বলি ভাগিনা, তুমি মাওবাদী জানো?

—তা জানি বই কি। আমি একটু বিরক্ত হয়ে বলি। মামা বলেন—ওরা জমি জমা অনেক নিয়ে নিয়েছে।

—সে কী? পুলিশে কিছু করে না?

—আহা পুলিশে টের পাবে তবে তো করবে? জমিজমা যার যার তার তারই আছে, ফলনগুলি বা তার দাম ধরো, মাওরা নিয়ে নেয়।

—কী সর্বনাশ! বলে ফেলি, আর বলতেই এবার মামাসুদ্ধ হেসে উঠলেন। আমি যেন কেমন বেবুক বনে গেলাম। এতে হাসির কী হল!

বলি—আপনাদের রিভলভার থাকা উচিত ছিল। পুলিশের উচিত ছিল যেচে আপনাদের লাইসেন্স দেওয়া।

—ছিল তো! বুড়োদাদু হাসিমুখে বললেন, এ দিকের সব জমিদারের ঘরে লাইসেন্সড, আন-লাইসেন্সড একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র মজুত, সেই কবে থেকে, এ সব জায়গা ডাকাতের আস্তিল ছিল কিনা, ঘরে ঘরেই পিস্তল রিভলভার।

তা সে রাখতে দিলে তো!

—সে কী? কে রাখতে দিলে না?

—ওই তোমাদের মাও! পিস্তল নিলে, ফসল নিলে...

—কী? কী বললেন? মানুষ নিয়ে নিল?

—কান শুনতে ধান শুনো যে দেখি নাতকুড়, বুড়োদাদু সুড়ুৎ সুড়ুৎ করে পায়েস খান।

মামু বলেন—ও ইয়াং ম্যান, ও কেন ভুলভাল শুনবে? তুমিই ফকফক করে ফোকলা দাঁতে ভুলভাল বলো। ধান ভানতে শিবের গীত যাকে বলে।

খুব ইচ্ছে ছিল, দুর্গের মতো বাড়িখানা ঘুরে ফিরে দেখি, খুনেরা কেমন লুকিয়ে থাকতে পারে...কেমন একটা রহস্য না? অ্যাডভেঞ্চারও বটে, আপিসের কাজে গিয়ে খোদ বাঁকড়োই জমিদারদের দুর্গবাড়ি দেখে এসেছি, যাতে নাকি সুলতান বাদশাদের মতো অলিগলি আছে যেখানে খুনেরা লুকিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু যতবার দেখবার কথা বলি বুড়োদাদু বলেন—কেন নাতকুড়, তুমি কি এখানে আমাকে দেখতে এসেছ নাকি খুনেদের কোতায় নুকিয়ে রাকি, তাই?

বুড়িদিদিমা আবার খুনখুন করে বলেন—আ-র বুড়ি হইচি, বাছার আমার ওপর থে মন উটে গেছে। আমি অপ্রস্তুত।

চুপ করে যাই।

রোদ পড়ে গেলে কী আর করা! বাইকে স্টার্ট দিই। পাঁচ কিলো কালো জিরে চাল সঙ্গে দিয়েছেন বুড়োদিদিমা,—তুই কলকাতায় বাড়ি নিয়া যাস। পুরো ফ্যামিলি উঠোনের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। গাছের মাথায় মাথায় ময়লা রোদ, সাদাটে আকাশ নিভে আসছে...

মাথায় হেলমেটটা লাগিয়ে বিদায় নিতে নিতে বলি—সবার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হল খালি ছোটমামার সঙ্গেই আলাপ পরিচয়টা হল না।

আমায় বেকুব বানিয়ে ঘরশুদ্ধ সব্বাই অট্টহাস্য করে উঠল। এবার উলবোনা মামাতো বোন আর উল গুটোনো মামাতো বোনটি শুদ্ধু।

কিশোর ভারতী

পাগল নাকি?
গল্প ও ছবি:-
দাদা, অসীম ভদ্র-র বাড়িটা কোনদিকে?
দিদিমণিদের কি বাঁশের বনে জায়গা জুটল না?
ওরে বাবা! সে তো পাগলা গারদ! সেখানে আপনি কী করবেন? আপনিও পাগল নাকি?

হাফ পাগল। আমি ডাক্তার।
আমাকে ভদ্রবাবু ফোন করেছিলেন।
বললেন ওনার দাদা গত দুবছর ধরে মানসিক রোগে ভুগছেন।
গত দুদিন ধরে নাকি রোগটার খুব বাড়াবাড়ি হয়েছে, অগত্যা—

আপনি কি পাগলের ডাক্তার?
আমি জেনারেল ফিজিশিয়ান।
অ্যাপেন্ডিসাইটিস থেকে মেনিনজাইটিস,
চুল ওঠা থেকে ওলাওঠা—
সবকিছুরই চিকিৎসা আমাকে করতে হয়।
অসীম ভদ্র আমার স্কুলের বন্ধু। আসুন, বাড়িটা দেখিয়ে দিচ্ছি।
কাঁচা প্রতিমার ওপর বসিয়ে দিলে?!
ঠাকুর সাজার এত শখ! দাও, এক্ষুনি প্রতিমার দাম দাও!

অসীম ভীষণ রসিক ছেলে ছিল, জানেন। ওর দাদা, মানে অনন্তদা ইতিহাসের মাস্টার ছিলেন, টিউশন পড়াতেন।
'শান্তিপূর্ণভাবে' চাঁদা আদায়
প্রতিবাদ করবেন? পাগল নাকি?
লকডাউনে কী যে হল, ভদ্রলোকের মাথা খারাপ হয়ে গেল। দাদার জন্য অসীমও কেমন যেন মুষড়ে পড়ল।
ওই যে, ওই বাড়িটা।
জানালাগুলো সিল করা কেন?
পামগাছের ওপর দিয়ে অনন্তদা পেপারওয়েট ছুঁড়ত! বলত, 'নাপাম বোমা'!
?
ওই তো অসীম। যান, কথা বলুন। তবে সাবধানে যাবেন।
আপনি আসবেন না?
নাপাম বোমায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে আমিও একজন। আপনারাই যান। গুডবাই!
নমস্কার মিস্টার ভদ্র। আমি বন্ধু ডাক্তার। আপনি কল করেছিলেন?
আমি? কই না তো! চণ্ডীদাসের খুড়ো কল করেছিলেন।
শুনেছি আপনি খুব রসিক মানুষ। তা আপনার দাদা কোথায়?
খুব ঝামেলা করছিল, তাই ঘরে বন্ধ করে রেখেছি। আসুন।
খোল! দরজা খোল! দরজা খোল বলছি!
দমাস!
ধাঁই!
সর্বনাশ! ভদ্রলোক তো ভীষণ হিংস্র হয়ে উঠেছেন দেখছি! এই অবস্থায় ওনাকে ঘরে রেখে চিকিৎসা করা বিপজ্জনক হতে পারে!

আমি একটা ইঞ্জেকশান দিচ্ছি। তারপর আমার পরিচিত একটা মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দেব।
হাস- পাতালে বছর পাঁচেক রাখবে তো?

আরে না না, কয়েকমাসের চিকিৎসা যথেষ্ট।
পাতালে বছর পাঁচেক
শিব্রামবাবু কি তাহলে ভুল লিখলেন? আরেকটা কথা, ওরা ওকে শক দেবে নিশ্চয়ই?

মানসিক রোগ হলেই শক? সিনেমায় তাই দেখায় বটে। বাস্তবে অনেক উন্নতমানের চিকিৎসা আছে।
খুব শোক পেলুম শুনে! আমার কত শখ ছিল জানেন!

আমাকে কেস হিস্ট্রিটা একটু বলুন তো, লিখে নিই।
কোন হিস্ট্রি? প্রাচীন যুগ? মধ্যযুগ? না আধুনিক?

ইয়ার্কির একটা সীমা আছে মশাই! সিরিয়াস হোন। এই ভায়োলেন্সটা কবে থেকে দেখছেন?
অবিশ্বাস বা সন্দেহবাতিক — সেরকম কিছু দেখেছেন?

ভায়োলেন্স? তা ধরুন সেই ১৯৪৭ সাল থেকেই শুরু! সব টুকরো টুকরো করে ছাড়ল, জানেন!
আর অবিশ্বাস তো উত্তরোত্তর বাড়ছে মশাই!

যদিও সেটার সূত্রপাত আরো একশো বছর আগে। সেই যেবার লর্ড ডালহৌসী দ্বিজাতিতত্ত্বের অবতারণা করলেন, সেবার থেকেই তো....
কী সব আবোলতাবোল বকছেন মশাই? আপনারও —

মস্তিষ্কের ভরকেন্দ্র কি পশ্চিমদিকে হেলে পড়ল?
হেলে না, হেলে না, জাত কেউটে! তার ছোবলেই তো নেপোর আর দই মারা হল না!

তার মানে ?
অহংকার আর আত্মসন্তুষ্টি বড় বিষাক্ত জিনিস। তার ছোবল খেয়েই তো...
-সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নেপো, মানে নেপোলিয়ন শেষ জীবনটা ছটফট করে মরল ! কী বুঝলেন ?
আমাদের দেশের অর্থনীতির নীতি কী জানেন ?
'যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ'—
এটা কে বলল আপনাকে ?
কেউ বলে নি, কেউ বলে না। চার্বাকপন্থার সামনে নির্বাক থাকাটাই আসল পঞ্চশূল নীতি !

ভুলভাল বকছেন কেন ? ওটা 'পঞ্চশীল' নীতি।
আচ্ছা, নেপোটিজম কি একরকম হিপনোটিজম ?

ফাজলামির জায়গা পান নি ! চিকিৎসা করানোর ইচ্ছে না থাকলে ফোন করেছিলেন কেন ?
রাগ করছেন কেন ? যা জানি বলছি তো !

শেষ প্রশ্ন, ওনার এরকম অবস্থা হওয়ার কোনো বিশেষ কারণ ?
লজ্জা !

হ্যাঁ, লজ্জা ! লজ্জা মানুষের পরিচয় পরিবর্তন করে দেয় !

বিশ্বাস হল না তো ? আচ্ছা, বলুন দেখি এই মূর্তিটা কার ?
এক বিখ্যাত রোমান শাসকের।

দড়াম
অবার দেখুন, লজ্জায় মাথা কাটা যেতেই —

?
!
— ভদ্রলোক কেমন 'সম্রাট কনিষ্ক' হয়ে গেলেন !

বাল্টুদা, লোকটাকে সুবিধের ঠেকছে না! চটপট কাজ সেরে পালাই চলো!
মিস্টার ভদ্র, আপনার দাদাকে একটু দেখব। দরজাটা খুলুন প্লিজ।
সাবধানে বাল্টুদা!
রেডি থাক। পালানোর চেষ্টা করবেন...
এ কী দেখছি ?!
?
দরজার দুই পাশে একই লোক!
সাবধান! পেছনে দেখুন!
ধাপ্পা!
ধাঁই
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ
ধড়াম
আপনাদের বেশী লাগে নি তো?
আমি অসীম ভদ্র, আমিই আপনাকে ফোন করেছিলাম।
আর উনি আমার যমজ দাদা, অনন্ত ভদ্র।
আমাদের দুজনেরই নামের আদ্যক্ষর একই, আমরা লিখি A.BHADRA..
একটি আছে দস্যি ছেলে, একটি ভারি শান্ত!
'অভদ্র না হলে কেউ এইরকম লাথি মারে! উফ্ফ্ফ!
আপনাকে ফোন করার পরই আমাকে এই ঘরে আটকে রেখেছে
ফোনটাও কেড়ে নিয়েছে, তাই আমি আপনাকে সাবধান করতে পারি নি।
এই ঘরের জানালা সিল করা, তাই চিৎকার করে যে লোক ডাকব, তার কোনো উপায় নেই।
চিন্তা নেই। আমার কাছে মোবাইল আছে।

হা হা হা হা ! সবই দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ ! উল্টে দেখলেই সবকিছু পালটে যায় !
অ্যাই পাগলা ! কলা খাবি ?
শেষে আমার দাদার সাথেই এরকম....
একটা পাগল 'ধরা পড়েছে'।
করোনার ভ্যাক্সিন নিয়ে অনেকেই পাগল হয়ে যাচ্ছে।
ফেসবুকে দিতে না দিতেই শ'খানেক 'হাহা' আর গোটা কুড়ি 'লাভ' রিয়্যাক্ট !
হা: হা: হি: হি:
চিন্তা করবেন না। উনি ফিরে আসবেন — সুস্থ হয়ে।
সরকারী হিসেব মতো, দেশের পাঁচজনের একজন মানুষ কোনো না কোনো মানসিক রোগে ভুগছেন।
এবং সংখ্যাটি কিন্তু মহামারীর মতো বাড়ছে !
একবার চারপাশে তাকিয়ে দেখুন তো, এদের মধ্যে কতজনকে মানসিকভাবে সুস্থ বলে আপনার মনে হয় ?
দুবেলা খাবারের বিনিময়ে পড়াতে চাই !
যে তোরে পাগল বলে — এ, তারে তুই বলিস নে কিছু।
গাছ লাগান, প্রাণ বাঁচান
?
হাতি
প্রয়োজনে রকেট উড়ে মহাকাশের গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান ঠিক করা হয়। দশ মিনিটে মারণ, পাঁচ মিনিটে উচাটন, দু'মিনিটে বশীকরণ।
সমাপ্ত ?

স্লাইস ফক্স

কাহিনি
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
চিত্রনাট্য ও ছবি
নচিকেতা মাহাত

আচ্ছা, সে না হয় হল। রুপোর সিংহাসনটা কী হবে?
ওটা গলিয়ে সমান ভাগে তিনটে সিংহাসন বানালেই হয়। মজুরিটা আমরা তিনজনে তিন তরফে দেব।
ওঃ! এর মধ্যে তরফা তরফি এসে গেল। তুমি আলাদা হতে চাইছ। তোমার মনে পাপ ঢুকেছে। অত চিংড়িমাছ খেলে ঢুকবে না? পাপের দাঁড়া বেরিয়েছে লম্বা লম্বা।
যেমন মাগুর মাছ খেয়ে খেয়ে তোর মুগুরের মতো অহংকার!
আর আমার?
তুই তো জিলিপি খাস। পেট থেকে সোজা মনের ভেতর প্যাঁচ ঢুকেছে।
সে না হয় ঢুকল, তা তোমার মাথায় হঠাৎ করে ভাগাভাগি ঢুকল কী করে?
নিশ্চয়ই কোনও উকিলের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে।
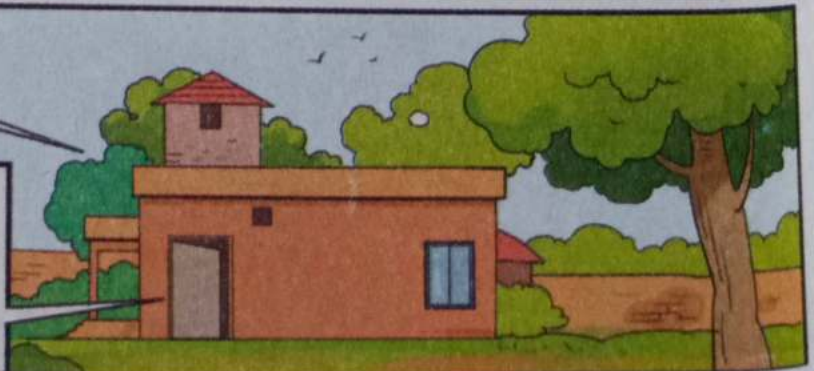
তোমরা সব চুপ করো। খোলসা করে বলো দেখি কী ব্যাপার?
যা হবেই, তা হতে দেওয়াই ভালো। এ কালে ভাইয়ে ভাইয়ে মিল হতে পারে না। মুরারিদের বাড়ি পার্টিশান হয়ে গেল। রামুরা তিন ভাইয়ে মামলা লড়ছে, পাঁচ বছর হয়ে গেল। এই বাড়ি, সম্পত্তি, ঘটি, বাটি আমি সব তিন টুকরো করব।
তুমি তিন টুকরো করার কে? হু আর ইয়ু?
তোমরা সবাই শুনলে, ও বলল, হু আর ইয়ু? মায়ের পেটের দাদাকে কি হতচ্ছেদ্দা! বলে কিনা, হু আর ইয়ু?
আমি একটু কারেকশান করে দিতে চাই। মায়ের পেটের দাদা নয়, মায়ের পেটের ভাই। কেউ দাদা হয়ে জন্মায় না। জন্মে দাদা হয়। দাদাগিরি ফলায়।
আমাদের এত দিনের আনন্দ মাটি করে দিতে চাইছ কেন বড়দা? কী হয়েছে বলো না।
কী হয়েছে? আমার কাছে খবর আছে, তুই মোল্লার চকে একটা ফ্ল্যাট বায়না করে এসেছিস।
অ্যাঁ, সে কী! কে বলল তোমায়?
হ্যাঁ রে মেজো, তাই নাকি?

আমিও খবর পেয়েছি। তুমি উত্তরপাড়ায় একটা ফ্ল্যাট কিনে ফেলেছ। পয়লা বৈশাখ গৃহপ্রবেশ।

আ-আমি! কোথায় ফ্ল্যাট? কে বলেছে শুনি? জ্যান্ত টুকরো করে ফেলব! নাম বল শুনি।

তোমাকে যে বলেছে আমার ফ্ল্যাট বায়না করার কথা, তার নামটা আগে বলো। তার কিমা করে ছাড়ব।

গুরুদাস!

গুরুদাস! স্কাউন্ড্রেল! ব্যাটা, দুজনের কাছে দু'ভাবে কথা লাগাচ্ছে।

এটা প্রায় বছর দশেক আগের ঘটনা।
স্কুলের বাঁদিকে জঙ্গলে ঘেরা পুকুরটা দেখেছিস?
ST. NEVA CONVENT SCHOOL
ও মাই গড! পুকুর ধারে সেই বড় অশ্বত্থ গাছটার ডাল থেকেই কি...
হ্যাঁ হ্যাঁ! ওই বুড়িটা নাকি এমনিও বাঁচত না বেশি দিন!
ওও-ও-ও! তাই জন্য সন্ধের পর ওদিকটায় কাউকে যেতে দেওয়া হয় না।
হরি দিন তো গেল, সন্ধ্যা হল...
হিক্
...পার করো আমারে!
অনীশ দেবের কাহিনি অবলম্বনে
অন্ধকার
বাহ্! একেবারে আদর্শ জায়গা বটে।

তাহলে এটাই ফাইনাল যে, আজ রাত এগারোটার পর দুলিকে ওই অশ্বত্থ গাছটার গায়ে নিজের নাম খোদাই করে আসতে হবে। কাল সকালে সব্বাই গিয়ে সেই প্রমাণ দেখে আসব, ক্লিয়ার?
আমরা প্রত্যেকে কোনও না কোনও সাহসের পরীক্ষা দিয়ে তবেই ক্লাবের মেম্বার হয়েছি। ইউ হ্যাভ গট দি ইজিয়েস্ট ওয়ান। পারবি তো?
পারব সুচরিতাদি
বেশ! তবে মেলাও হাত!

ভয় পাস না দুলি! মনে সাহস আন। আমি জানি তুই পারবি!
আমাকে পারতেই হবে। আমার একা বেঁচে থাকার লড়াই এটা দিয়ে শুরু।

মা-বাপি তো আর আসবে না! বড় কনভেন্টে ভর্তি করিয়ে দিয়েছে যে! ওঁদের দায়িত্ব শেষ।

ধুর পাগলি! পরের মাসেই তো গার্ডিয়ান মিটিং! ভুলে গেলি!

আর তুই একা কোথায় রে! আমরা কি নেই! সিস্টার্স, টিচার্স, প্রিন্সিপাল ম্যাম...

ও নো! তুই বেরোবি কী করে?
মিসেস হুবার্ড তো গুড নাইট উইশ করতে আসবেন! তোর বেড যদি খালি দেখেন?

ST. NEVA CONVENT SCHOOL
ওটা নিয়ে ভাবিস না! আই হ্যাভ আ প্ল্যান।

গুড নাইট গার্লস।
ST. NEVA CONVENT SCHOOL
গুড নাইট ম্যাম।
এবার পালাই! জোরে বৃষ্টি আসছে।
ইটস্ ডান!
!!

BLOCK
VENT SCHOOL
অল ইজ ওয়েল।
থ্যাংকস ডিয়ার কোলবালিশ!
সুইট ড্রিমস এভরিবডি।
ঘুম পাড়ানি মাসি-পিসি মোদের বাড়ি এসো
খাট নাই পালং নাই খুকির চোখে বসো
সমাপ্ত
চিত্রনাট্য ও ছবি: সুমন্ত গুহ

জাগিও না, আমায় জাগিও না

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

প্রবল শীতের ভোর। আলো ফুটছে ধীরে ধীরে। সার সার তাঁবুর সামনে গত রাতের জ্বালানো অগ্নিকুণ্ডগুলো এখনও জ্বলছে। যতদূর চোখ যায়, শুধু সার সার ছোট-বড় তাঁবু। অন্য দিন ভোরের আলো ফুটলেই ঘোড়ার দল সওয়ারিকে পিঠে নেওয়ার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে, হাঁক-ডাক শুরু করে। বহু মাইল দূর থেকে শোনা যায় তাদের সম্মিলিত হ্রেষারব। কিন্তু আজ যেন তারা পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে।

সত্যিই এমন শীত এর আগে দেখেনি কেউ। কাজাখের এ জায়গার নাম ওতবার। এই শুষ্ক ভূমি থেকে পথ এগিয়েছে সোজা চিনের দিকে। কাজাখের রেশম পথ। এ পথেই চিনের রেশম ব্যবসায়ীরা যাওয়া আসা করে। এই বিশাল অশ্বারোহী সেনাদলের গন্তব্যও চীন। সারা মধ্য এশিয়াকে পদানত করার পর আমীরের লক্ষ এবার মিং রাজবংশের ছত্রছায়ায় চীন অধিকার করা। তাই এই সামরিক অভিযান।

আমীর তাঁর অভিয়ানের জন্য সাধারণত বসন্তকালকেই বেছে নেন। কিন্তু, এবারের চীন অভিযানের জন্য তিনি শীতকালকে নির্বাচন করলেন কেন তা অনেকেরই বোধগম্য হচ্ছে না।

যুদ্ধ আর আমীর,—এদুটো শব্দ সমার্থক। তাঁর মতো যুদ্ধের অভিজ্ঞতা, হত্যার অভিজ্ঞতা, অন্য দেশ জয়ের অভিজ্ঞতা চেঙ্গিজের পর পৃথিবীতে কারো নেই। হয়তো তাঁর অভিজ্ঞতা তাকে বুঝিয়েছে সম্রাট হংকউ-এর চীনকে আক্রমণ করার জন্য উপযুক্ত সময় এই শীতকাল। আবার এ-ও হতে পারে যে, আমীরের শরীরে প্রবাহিত তাঁর যাযাবর পূর্বপুরুষদের রক্ত তাঁকে বেশিদিন এক জায়গায় স্থির থাকতে দেয় না।

রক্তের ডাক উপেক্ষা করা বড় কঠিন। তার ওপর আমীরের আড়ালে কেউ কেউ বলেন যে, রক্ত না দেখে নাকি বেশিদিন স্থির থাকতে পারেন না তিনি। আমীর তার এই সত্তর বছরের জীবনকালে নিজের হাতে একাই অন্তত দশ হাজার মানুষকে হত্যা করেছেন, আর তাঁর বাহিনী হত্যা করেছে দু-কোটির বেশি মানুষকে। হয়তো বা এই হত্যার নেশাতেই আর বসন্তকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাননি তিনি। তবে আমীর হয়তো অনুমান করতে পারেননি এ পথে এমন শীত। তিনি নিজেও শীতের প্রকোপে বেশ কাবু হয়ে পড়েছেন। বুকে ঠান্ডা বসেছে।

ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে সেনারা। তবে তারা বুঝতে পারছে না আজ তাঁবু গুটিয়ে আবার পথ চলা শুরু হবে কিনা!

চীন সীমান্ত এখনও বেশ কিছুদিনের পথ। এই প্রবল শৈত্যপ্রবাহের মধ্যে কীভাবে এগোবে আমীরের সেনাবাহিনী? তাঁবুর মধ্যে থাকা কিছু সেনার ঘুম আর কোনোদিন ভাঙবে না। গত রাতের প্রবল ঠান্ডা চিরদিনের মতো তাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখল এই জনহীন প্রান্তরে। আগামীতে অনেকেরই ভাগ্যেই একই ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা নিশ্চিত। কিন্তু আমীরের ইচ্ছাই শেষ কথা।

অন্য তাঁবুগুলোর থেকে আমীরের তাঁবুর বিশেষ কিছু পার্থক্য নেই। একই রকম ছাগলের চামড়ায় প্রস্তুত সেটা। আকারে সামান্য বড় শুধু। আর তার মাথায় উড়ছে আমীরের পতাকা।

আর সেই তাঁবুকে ঘিরে রয়েছে তাঁর সেনাপতি, অন্য পার্শ্বচরদের তাঁবু। তেমনই একটা তাঁবু থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন একজন। তাঁর নাম পীর মহম্মদ শা। আমীরের পরই বাহিনীতে তাঁর স্থান। কারণ, ইতিমধ্যেই আমীর ঘোষণা করে দিয়েছেন, তাঁর মৃত্যু পর তাঁর পুত্ররা নন, আমীরের বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হবেন ওই পীর মহম্মদ শা।

পীর মহম্মদ তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে প্রথমে তাকালেন আমীরের তাঁবুর দিকে। তারপর আশপাশের তাঁবুর বাইরে দাঁড়ানো অন্যদের দিকে। সবারই হাত-পা যেন ঠান্ডায় জমে গেছে। পোশাকের ভিতর যথাসম্ভব নিজেকে আবৃত রেখে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে সবাই। শিরস্ত্রান আর পাগড়ির আড়াল থেকে তাদের চোখ দুটোই শুধু দেখা যাচ্ছে। আর তাতে জেগে আছে প্রবল উৎকণ্ঠার ছাপ।

উৎকণ্ঠা পীর মহম্মদের মনেও। আমীর কী সিদ্ধান্ত নেবেন আজ? সম্যক পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে পারছেন পীর মহম্মদ। কিন্তু, আমীরকে পরামর্শ দেবার সাহস তাঁর তো দূরস্থান, পুত্র শাহরুকেরও নেই।

পীর মহম্মদ দেখতে পেলেন আমীরের ব্যক্তিগত চিকিৎসকও তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। চুঘাই নামের ওই বৃদ্ধ চিকিৎসক আমীরের বহু অভিযানের সঙ্গী। আমীর তাঁকে বেশ ভরসা করেন।

আমীর একমাত্র তাঁর দেওয়া ওষুধই নির্দ্বিধায় মুখে তোলেন। চুঘাই প্রত্যহ একবার তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন।

পীর মহম্মদ ইশারায় ডেকে নিলেন চুঘাইকে। তারপর তাকে নিয়ে এগোলেন আমীরের তাঁবুর দিকে। তাঁবুতে প্রবেশ করার আগে চাপাস্বরে তিনি চুঘাইকে বললেন, হয়তো আপনিই একমাত্র পারবেন আমীরের মত পরিবর্তন ঘটাতে।

আমীরের তাঁবুর ভিতরে বেশ কয়েকটা কক্ষ আছে। সে সব কক্ষ অতিক্রম করে তারা দুজন এসে দাঁড়ালেন আমীরের শয়ন কক্ষের সামনে। পর্দার ফাঁক দিয়ে কক্ষের ভিতরটা দেখা যাচ্ছে। একটা বড় তামার পাত্রে কাঠকয়লার আঁচ জ্বলছে। তার লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে সে কক্ষে।

আমীর উঠে বসেছেন মেঝেতে পাতা গালিচার ওপর। তাঁর গায়ে একটা চিতা বাঘের চামড়ার শাল জড়ানো। কোলে রাখা খাপসমেত বিখ্যাত তলোয়ার। তলোয়ারটা কোলে নিয়ে সেটার দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে মুখ তুলে তাকালেন আমীর।

অভ্যন্তরে ঢুকে শাসকের উদ্দেশে কুর্নিশ করলেন তাঁরা। পীর মহম্মদের মনে হল আমীরের চোখের দৃষ্টি কেমন যেন ঘোলাটে। যেন মৃদু মৃদু দুলছেন। চুঘাই তাঁকে প্রশ্ন করলেন, আজ আপনি কেমন বোধ করছেন?

মুখে কোনো জবাব না দিয়ে তিনি তাঁর একটা হাত প্রসারিত করলেন। চিকিৎসক চুঘাই তাঁর কাছে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে আমীরের হাত স্পর্শ করলেন নাড়ি দেখার জন্য। আমীরের বাহু স্পর্শ করেই তিনি বুঝতে পারলেন, তিনি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত। আর নাড়ির গতিও সুবিধার নয়।

চুঘাই বেশ কিছুক্ষণ ধরে আমীরকে পরীক্ষা করার পর বললেন, 'আপনার বুকে শ্লেষ্মার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। জ্বরও এসেছে। সুস্থ হবার জন্য শীত থেকে আপনার দূরে থাকা দরকার।'

চিকিৎসকের কথা শুনে নিশ্চুপভাবে কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবলেন তারপর ঘড়ঘড়ে কণ্ঠে পীর মহম্মদকে প্রশ্ন করলেন, 'সৈন্যরা যাত্রা শুরুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছে তো?'

না বললে পাছে আমীর ক্রুদ্ধ হন পীর মহম্মদ বললেন, 'হ্যাঁ, জাঁহাপনা।'

চুঘাই এবার আসল কথাটা পাড়লেন আমীরের কাছে। তিনি বললেন, 'তিন দিন আগে রেশম ব্যবসায়ীদের যে মাটির দুর্গটা আমরা পিছনে ফেলে এসেছি, সেখানে ফিরে গেলে শীতের প্রকোপ থেকে আপনি অনেকটা রক্ষা পাবেন।'

কিন্তু, কথাটা শুনেই আমীর বলে উঠলেন, 'সামান্য জ্বরের কারণে তুমি কি আমাকে পিছু হটতে বলছ?'

চিকিৎসক একটু আমতা আমতা করে বললেন, 'আপনার শরীরের কারণেই সেটা বলা। সামনে ঠান্ডা ক্রমশ বাড়বে...।'

আমীরের ঘোলাটে চোখ দুটো কয়েক মুহূর্তের জন্য দপ্ করে জ্বলে উঠল। তিনি বললেন, 'না, আমি পিছনে ফিরব না। মানুষ হোক বা প্রকৃতি, কেউ আমাকে পিছু হঠাতে পারেনি, আজও পারবে না। চিনের মাটিতে কাঁপন ধরাবে আমার ঘোড়ার খুড়ের শব্দ। সম্রাট হংকুই-এর ভবিষ্যৎ লিখে ফেলেছি আমি। ইসপাহান জয় করার পর আমি যেমন সেখানকার বাসিন্দাদের কাটা মুণ্ড দিয়ে মিনার বানিয়েছিলাম তেমনই চৈনিকদের কাটা মুণ্ড দিয়ে মিনার বানাব।

পীর মহম্মদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'যাও, আমার ঘোড়া প্রস্তুত করো।'

এরপর আর কথা চলে না। তাই তাঁর তাঁবু ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন তারা। অপেক্ষারত সৈনিকদের পীর মহম্মদ জানিয়ে দিলেন, 'কাফেলা সামনে এগোবে। তাঁবু গোটাও।'

তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে আসেছেন আমীর। যখন তিনি ঘোড়ার দিকে এগোলেন, তখন যেন হাঁটার গতিবেগ শ্লথ বলে মনে হল পীর মহম্মদের।

আমীরের মনের জোর যতই থাকুক না কেন তাঁর শরীর ধুঁকছে। বিশালাকৃতির ধুসর ঘোড়ার পিঠে উঠে বসেছেন। আবার যাত্রা শুরু হল। পিছনে পড়ে রইল বেশ কিছু সৈনিকের হিমশীতল মৃতদেহ।

বেলা বাড়তে লাগলেও সূর্যের তেজ নেই। যত পথ তারা এগোতে লাগলেন, ঠান্ডা ততই বাড়তে লাগল। তীব্র শিসের মতো শব্দ করে প্রবাহিত হতে লাগল কনকনে ঠান্ডা বাতাস। তবু তারই মধ্যে এগিয়ে চললেন শাসক। অনেকটা যেন যন্ত্রের মতোই।

তাঁর এক পাশে ঘোড়ার পিঠে পীর মহম্মদ, অন্য পাশে পুত্র শাহরুক। প্রবল শীতে তাঁদের আঙুলগুলো জমে যাচ্ছে। কোনো মতে লাগাম ধরে আছেন তারা। কেবলমাত্র আমীরই অবিচল, তিনি চেয়ে আছেন সামনের যাত্রাপথের দিকে।

দুপুর গড়িয়ে বিকাল হল এক সময়। সারাটা পথ আমীর কারো সঙ্গে একটাও কথা বলেননি। পীর মহম্মদ ভাবতে লাগলেন কখন এবার আমীর নিজের ঘোড়ার লাগাম টেনে হাত ওপরে তুলে এদিনের মতো যাত্রা স্থগিত করার নির্দেশ দেন। কারণ, অন্ধকার নামার আগেই তাঁবু ফেলা, অগ্নিকুণ্ড জ্বালানো, সৈন্য ও পশুদের খাবারের ব্যবস্থা সম্পন্ন করতে হয়। কিন্তু অন্য দিনের মতো বাহিনীকে থামার নির্দেশ না দিয়ে তিনি এগিয়েই চললেন।

ব্যাপারটাতে অনেকেই বেশ অবাক হলেও আমীরকে থামতে বলার মতো স্পর্ধা কারো নেই। তাই তাঁর সঙ্গে এগিয়ে চলল সকলে। ধীরে ধীরে আলো কমে আসতে লাগল।

সহসা একটা অদ্ভুত ব্যাপার খেয়াল করলেন পীর মহম্মদ। আমীর কখন যেন ছেড়ে দিয়েছেন ঘোড়ার লাগাম। আমীরের বাম হাতটা কাঁধ থেকে মাটির দিকে ঝুলছে। আমীরের ঘোড়াটা আসলে সামনের দিকে হেঁটে চলেছে তার অভ্যাস মতো। পীর মহম্মদ দ্রুত এগিয়ে গিয়ে আমীরের ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরলেন।

ঝাঁকুনি দিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ঘোড়াটা। আমীর তাঁর ঘোড়া থেকে মাটিতে পড়ে যাচ্ছিলেন। পীর মহম্মদ কোনোক্রমে তাঁর শরীরটাকে ধরে ফেললেন। তারপর চিৎকার করে সবাইকে আসার নির্দেশ দিলেন। পীর মহম্মদ আর শাহরুক আমীরকে ধরাধরি করে ঘোড়া থেকে নামিয়ে মাটিতে শুইয়ে দিলেন। ছুটে এলেন হেকিম চুঘাই। তিনি পরীক্ষা করে বুঝতে পারলেন আমীরের অবস্থা সংকটজনক, দ্রুত শুশ্রূষার প্রয়োজন।

দ্রুত তাঁবু খাটিয়ে ফেলা হল। আমীরের শরীরকে তুলে নিয়ে গিয়ে তাঁবুর পুরু গালিচার ওপর শোয়ানো হল। বেশ কয়েকটা বড় তামার পাত্রে কাঠকয়লার আগুন জ্বালিয়ে তাঁবুর ভিতরটা যথাসম্ভব গরম রাখার চেষ্টা শুরু হল।

বাইরে অন্ধকার নেমে গেছে। অজানা অচেনা প্রান্তরে তাঁবুর ভিতর আমীরের জ্ঞান ফেরাবার, তাঁকে সুস্থ করার আপ্রাণ চেষ্টা করে যেতে লাগলেন বৃদ্ধ চিকিৎসক চুঘাই আর তার সঙ্গে পীর মহম্মদ আর আমীর পুত্র শাহরুক।

আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও এক সময় তাঁরা তিনজন বুঝতে পারলেন তাদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে চলেছে। ক্রমশ শীতল, আরও শীতল হয়ে চলেছে আমীরের শরীর। মৃত্যু গ্রাস করে নিচ্ছে আমীরকে।

শেষবারের জন্য একবার চোখ মেললেন আমীর। তাঁর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লেন তারা তিনজন। আমীরের চোখে এক অপার্থিব দৃষ্টি। সেই দৃষ্টির সামনে মুহূর্তের জন্য কেঁপে উঠলেন তিনজন।

ঠোঁট ফাঁক করলেন আমীর। স্পষ্ট স্বরে বললেন, 'আমার ঘুম পেয়েছে। আমার ঘুম সেদিন ভাঙবে যেদিন আবার কেঁপে উঠবে পৃথিবী! যেই আমার কবর খুঁড়ুক না কেন, সে ডেকে আনবে আমার চেয়ে অগ্রাসী এক শত্রুকে।'

কথাটা বলার পর একদম স্থির হয়ে গেল আমীরের দেহ। বাইরের তীব্র বাতাসে থরথর করে কেঁপে উঠল তাঁবুটা। কাফেলার ঘোড়াগুলো কোন অজানা কারণে রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে একসঙ্গে অদ্ভুতভাবে ডেকে উঠল। কোন অজানা আতঙ্কে তাঁবুর ভিতর তারা তিনজনও কেঁপে উঠলেন। তারপরই সব কিছু ফের নিস্তব্ধ। এমনকী থেমে গেল বাইরের বাতাসের শব্দও।

এক অসীম নিস্তব্ধতা তাঁবুর ভিতরে। বিশ্বত্রাস আমীরের চোখদুটো শুধু চেয়ে রইল আকাশের দিকে। পীর মহম্মদ খেয়াল করলেন, আমীরের ঠোঁটের কোণে ফুটে আছে এক অদ্ভুত রহস্যময় হাসি!

ভবিষ্যৎ পৃথিবীর জন্য সম্রাটের সাবধান বাণী যেন সারারাত ধরেই ভেসে বেড়াতে লাগল তাঁবুর ভিতর। তবে সব রাতেরই যেমন শেষ হয়, এ রাতেরও শেষ হল এক সময়। আমীরের ইচ্ছানুসারে তাঁর ফেলে যাওয়া সাম্রাজ্যের শাসক হলেন পীর মহম্মদ।

ভোরের আলো ফোটার পর তিনি বাইরে এসে সকলকে আমীরের মৃত্যু সংবাদ জানালেন। এও জানালেন প্রয়াত আমীরের মৃতদেহ নিয়ে এবার ফিরতে হবে রাজধানীতে, দেহকে সমাধিস্থ করার জন্য।

কস্তুরী তেল আর গোলাপ জলে আমীরের শরীরকে সিক্ত করে রেশম বস্ত্রে জড়িয়ে ভরা হল কালো কফিন বাক্সের মধ্যে। তারপর পীর মহম্মদের নেতৃত্বে সেনাদল আবার যাত্রা শুরু করল রাজধানী সমরখন্দের উদ্দেশে।

সমরখন্দে ফিরে পূর্ণ মর্যাদায় সমাধিস্থ করা হল বিশ্ববিজেতার দেহ। আমীর চাইতেন তাঁর কবরে যেন কোনো বাহুল্য না থাকে। তাই তাঁর কবরের ওপর কোন সৌধ নির্মাণ হল না। তবে কবরের গায়ে ভবিষ্যৎ পৃথিবীকে সাবধান করার জন্য বিশ্বত্রাস তৈমুর লঙ-এর শেষ কথাগুলো লিখে দিলেন নতুন শাসক পীর মহম্মদ। তারপর কেটে গেল প্রায় পাঁচশো বছর...।

২

বেশ রাত হয়েছে। ঘরটার ভিতর ভোদকার গ্লাস হাতে অস্থির ভাবে পায়চারি করছিলেন মিখাইল গেরাসিমভ। তাঁর কয়েকজন সহকর্মী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসেছিলেন ঘরের মধ্যে। প্রত্নবিদ ও নৃবিজ্ঞানী হিসাবে বেশ নাম আছে মিখাইল গেরাসিমভের। বিশেষত একটা কাজে তার দক্ষতা তাঁকে বিজ্ঞানী মহলে বিশেষ ভাবে পরিচয় দান করেছে। তা হল, মৃত মানুষের দেহাবশেষ উদ্ধার করে ফরেনসিক পরীক্ষা ও অন্য পরীক্ষার মাধ্যমে সে মানুষটা জীবিত কালে কেমন ছিল তার হুবহু প্রতিকৃতি বা মূর্তি নির্মাণ।

এভাবে ইতিমধ্যে প্রায় দু-হাজার মৃত মানুষের প্রতিকৃতি নির্মাণ করেছেন তিনি। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রাশিয়ার প্রাচীন সম্রাট ইভান দ্য টেরিবলের দেহাবশেষের কবর থেকে তুলে এনে তাঁর প্রতিকৃতি নির্মাণ। তেমনই এক দেহাবশেষ উদ্ধার করে তার প্রতিকৃতি নির্মাণের জন্য সরকারি নির্দেশে গেরাসিমভ কিছুদিন হল এসে উপস্থিত হয়েছেন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত উজবেকিস্তানের সমরখন্দের 'গুর-ই আমীর' নামের এই অখ্যাত গ্রামে।

একসময় এ জায়গায় বিশ্বত্রাস শাসক, যাঁকে সেই সময় কেউ কেউ সম্রাট বলতেন, সেই তৈমুর লঙের রাজধানী থাকলেও তার সব চিহ্নই বর্তমানে মুছে গেছে। সামান্য কিছু উজবেক উপজাতির মানুষেরা এখন বসবাস করে এখানে। নৃতত্ত্ববিদ গেরাসিমভ যাঁর কবর আবিষ্কার করার জন্য এখানে এসেছেন, সেটা ওই একদা বিশ্বত্রাস, বিশ্বজয়ী শাসক তৈমুর লঙের কবর।

তৈমুর লঙ-এর কবর সমরখন্দে হলেও তা ঠিক কোথায় তা সবার অজানা। বহু অনুসন্ধানের পর এই 'গুল-ই-আমীর' গ্রামে এসে তিনি উপস্থিত হয়েছেন। বেশ কিছু প্রাচীন কবর আছে এ গ্রামের সীমানায়। স্থানীয় উজবেক উপজাতির লোকেরা এড়িয়ে চলে জায়গাটিকে। কবরগুলোর মধ্যে একটা কবরকে গেরাসিমভ চিহ্নিতও করেছিলেন তৈমুরের কবর বলে।

এ ব্যাপারে মোটামুটি একপ্রকার নিশ্চিত হয়ে, কবরটা খোঁড়া হল। দেখা গেল কবরের ভিতর কিছু নেই। তা দেখে হতাশ গেরাসিমভ আর তাঁর সঙ্গীরা।

এক সহকর্মী প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে কি আমাদের মিশন এখানেই শেষ। কালই আমরা মস্কোর উদ্দেশ্যে রওনা হব?'

গেরাসিমভ বললেন, 'আমি কিন্তু প্রায় নিশ্চিত ছিলাম ওটাই তৈমুর লঙের সমাধি। আমার যুক্তিনিষ্ঠ অনুমান এভাবে ভুল কেন হল সেটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না!'

একথা শুনে তাঁর অপর একজন সঙ্গী বললেন, 'এমনও তো হতে পারে যে আপনার অনুমান ভ্রান্ত নয়। ওটাই তৈমুরের কবর। তাঁর কবরে হয়তো অনেক সোনাদানা ছিল। মিশরের ফারাওদের কবরে যেমন থাকত। চোরের দল সুড়ঙ্গ খুঁড়ে তাঁর কফিন সমেত সব কিছু বাইরে বার করে নিয়ে গেছে। পাঁচশো বছর তো আর কম সময় নয়!'

প্রত্নতত্ত্ববিদ গেরাসিমভ বললেন, 'এই সম্ভাবনার কথা আমার মাথায় যে আসেনি তা নয়। তবে কোথায় আমার যেন একটা খটকা লাগছে। স্থানীয় উজবেক উপাজাতির লোকেরা এখানে বংশ পরম্পরায় বাস করে।

দেখলেন তো, কবর খোঁড়ার কাজে তারা কেউ আমাদের সঙ্গ দিতে রাজি হল না। আমাদের নিজেদেরই কবরটা খুঁড়তে হল। ওর মধ্যে কিছু যদি না থেকে থাকে তবে ওদের এমন আচরণ কেন? কেনই-বা ওরা এড়িয়ে চলে জায়গাটাকে?'

এ কথা বলে তিনি তাঁর হাতে ধরা গ্লাসে চুমুক দিতে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় তিনি একটা ব্যাপার খেয়াল করলেন।

গ্লাসটার দিকে তাকিয়ে আচমকা একটা ভাবনা মাথায় খেলে গেল

প্রত্নবিদের। তিনি তাঁর সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'কাল একবার শেষবারের জন্য কবরটায় অনুসন্ধান চালাব। এমন তো হতে পারে যে কবর চোরদের ধোঁকা দেবার জন্য স্বাভাবিক গভীরতার থেকে বেশি গভীরে তৈমুরের শবাধার রাখা হয়েছিল? আরও গভীরে খুঁড়েও যদি কোনো কিছুই সন্ধান না মেলে তখন নাহয় পরশু মস্কো ফেরার জন্য রওনা হব।'

গেরাসিমভ আর তার সঙ্গীরা যে বাড়িতে অবস্থান করছেন সেটা আসলে একটা 'চাইখানা' বা চা পাব। পাথরের তৈরি বাড়ি, কয়েকটা ঘরও রয়েছে বাড়িটাতে।

এখানে কোনো হোটেল নেই। চা পাব বা বাড়ির মালিক প্রথমে তাঁদেরকে ঘর ভাড়া দিতে রাজি হচ্ছিলনা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গেরাসিমভের নিয়োগকর্তার নাম শুনে ভয় পেয়ে ঘর দিতে বাধ্য হয়েছে।

তবে এই জায়গায় ইলেকট্রিসিটি নেই, লণ্ঠনের আলোই ভরসা। রাতে ঘুমোবার আগে বই বা খবরের কাগজ পড়ার অভ্যাস গেরাসিমভের। মস্কো থেকে খবরের কাগজ এখানে আসে ঠিকই, কিন্তু তা আসে দু-দিন পর। সকালে আসা বাসি খবরের কাগজটা নিয়েই পড়তে শুরু করলেন গেরাসিমভ।

যুদ্ধ সংক্রান্ত বেশ কিছু খবরও ছাপা হয়েছে কাগজে। বিগত দু-বছর ধরে ইউরোপের নানান প্রান্তে নানান দেশের মধ্যে লড়াই চলছে দুই জোটের মধ্যে। একদিকে জার্মানি, জাপান, ইতালি ও আরও কিছু দেশের মিলিত অক্ষশক্তি। অন্যদিকে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র বাহিনী। শুধু ইউরোপ নয়, যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছে এশিয়া-আফ্রিকাতেও, চীন-জাপানের যুদ্ধও চলছে। জার্মানি, ইতালিকে সঙ্গে নিয়ে ইউরোপের অধিকাংশ দেশ দখল করে নিয়েছে।

সোভিয়েতের সঙ্গে অবশ্য জার্মানির একটা চুক্তি হয়েছে—মলোটভ-রিবেনট্রপ চুক্তি। এই চুক্তি অনুসারে জার্মানি আর রাশিয়া নিজেদের মধ্যে তাদের দখল করা ফিনল্যান্ড, পোল্যান্ড, বাল্টিক দেশগুলো ভাগাভাগি করে নিয়েছে। অনাক্রমণ চুক্তিও হয়েছে। সোভিয়েত আপাতত নিরপেক্ষ ভূমিকা অবলম্বন করে, সারা বিশ্বের ওপর নজর রেখে চলেছে।

প্রথম দুটো পাতায় যুদ্ধ সংক্রান্ত নানা খবর পাঠ করার পর তিনি তাঁর অভ্যাস মতো ঘুমোবার আগে সময় কাটাবার জন্য অন্য খবরগুলোও পড়তে লাগলেন। সাইবেরিয়াতেও একটা ফসিল উদ্ধার হয়েছে।

গেরাসিমভ তখন সে সংবাদটা মন দিকে পড়ছিলেন, দরজায় টোকা দেবার শব্দ শুনে মুখ তুলে তাকালেন। কাচের শার্সি দেওয়া দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে এক ছায়ামূর্তি!

এত রাতে কে এলো? গেরাসিমভ উঠে গিয়ে দরজাটা খুললেন। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে অপরিচিত একজন বৃদ্ধ। ঘরের লণ্ঠনের আলো দরজার ফাঁক গলে যতটুকু বাইরে এসে পড়ছে তাতে তাঁর পোশাক দেখে স্থানীয় উজবেক উপজাতির লোক বলেই মনে হল। গায়ে আলখাল্লার মতো হাতাওলা লম্বা ঝুলের পোশাক, মাথায় পশুলোমের গোলাকার টুপি।

গেরাসিমভ লোকটাকে দেখে অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কাকে চাই?'

কাজের প্রয়োজনে বেশ কয়েকটা ভাষা পড়তে ও বলতে পারেন গেরাসিমভ। স্থানীয় উজবেক উপজাতির ভাষাও ইতিমধ্যে বেশ কিছুটা রপ্ত করেছেন তিনি। গেরাসিমভের কথা শুনে লোকটা উজবেক ভাষাতেই জবাব দিল, 'আপনাকেই। আপনার সঙ্গেই কথা বলতে এসেছি আমি।'

'কী কথা?'

লোকটা কোনো ভনিতা না করে বলল, 'যে কবরটা খুঁড়ছেন, সেটা আর খুঁড়বেন না, ওকে শান্তিতে ঘুমোতে দিন।'

গেরাসিমভ কথাটা শুনেই মনে মনে বেশ উত্তেজিত বোধ করলেন। এ কথার অর্থ, কবরের মধ্যে নিশ্চিত কেউ আছে! তবে মনের ভাব মুখে প্রকাশ না করে গম্ভীরভাবে তিনি বৃদ্ধকে প্রশ্ন করলেন, 'কার কবর ওটা?'

গেরাসিমভের প্রশ্নের জবাবে বৃদ্ধ বলল, 'ভয়ঙ্কর ক্ষমতাবান এক মানুষের। তাঁর ঘুম ভাঙলে ভয়ঙ্কর বিপদ হবে।'

শুনেই গেরাসিমভের বুকের রক্ত যেন উত্তেজনায় ছলকে উঠল। অর্থাৎ তাঁর অনুমান মিথ্যা নয়। ওই কবরের গভীরে শায়িত আছেন একদা পৃথিবীর ত্রাস তৈমুর!

গেরাসিমভ বৃদ্ধের উদ্দেশ্যে বললেন, 'কিন্তু...কবরটা যে আমাকে খুঁড়তেই হবে।'

বৃদ্ধ বলল, 'বলছি তো কবরটা খুঁড়লে ভয়ঙ্কর বিপদ হবে। তবু কবরটা তুমি খুঁড়বে কেন?'

গেরাসিমভ এবার মৃদু হেসে বললেন, 'তুমি যোসেফ স্তালিনের নাম শুনেছ? সোভিয়েতের বর্তমান সর্বাধিনায়ক?'

বৃদ্ধ জবাব দিল, 'হ্যাঁ, শুনেছি।'

গেরাসিমভ বললেন, 'তার নির্দেশেই আমি কবরটা খুঁড়তে এসেছি। এটি সরকারি কাজ। তাই এ কাজ আমাকে করতে হবে।' শেষ কথাটা বেশ দৃঢ়ভাবে বললেন।

লোকটা বেশ ক্ষুব্ধ স্বরে বলল, 'আমি বলছি, ও কবর আপনারা খুঁড়বেন না। ওখানে যিনি ঘুমিয়ে আছেন তাঁর ক্ষমতা আপনার স্তালিনের থেকে অনেক বেশি। তাঁর ঘুম নষ্ট করলে যে বিপদ নেমে আসবে, তা রোখার ক্ষমতা আপনার স্তালিনের নেই। ওই কবর খুঁড়তে গেলে আমি বাধা দেব। আর একটাও কোদালের কোপ দেওয়া যাবে না ওই কবরে। ওখানে যিনি ঘুমিয়ে আছেন তিনি আমার পূর্বপুরুষ।'

বৃদ্ধের কথা শুনে গেরাসিমভ অবাক হয়ে গেলেন। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড স্তালিন, সোভিয়েতের মন্ত্রী পরিষদের প্রধান স্তালিন, রাশিয়ার সর্বাধিনায়ক, সর্বশক্তিমান স্তালিন। উজবেকিস্তান সোভিয়েতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। তার মাটিতে দাঁড়িয়ে স্তালিন সম্পর্কে অমন অবজ্ঞার উক্তি কেউ করতে পারে? ও কথা স্তালিনের কানে গেলে লোকটাকে নিশ্চিত সাইবেরিয়ায় পাঠানো হবে।

বৃদ্ধ যেন গেরাসিমভের মনের ভাব বুঝতে পেরে আবারও বলে উঠল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই স্তালিনের থেকে সে অনেক শক্তিশালী ব্যক্তি। এ কথা ফিরে গিয়ে স্তালিনকে জানিও।'

গেরাসিমভের মনে হল যে লোকটা এবার ঔদ্ধত্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। অথবা লোকটা পাগল। কার সম্পর্কে কী বলছে সে ব্যাপারে কোনো ধারণাই নেই। গেরাসিমভ বিরক্তভাবে বললেন, 'অনেক রাত হয়েছে। তুমি এবার যাও। কবরটা আমরা খুঁড়বোই। কেউ আমাদের বাঁধা দিতে পারবে না। দরকার হলে মিলিটারি নামবে। কারণ এটা কমরেড স্তালিনের নির্দেশ।'

গেরাসিমভের কথা শুনে বৃদ্ধ কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে। তারপর তার বলিরেখাময় মুখোমগুলের ঠোঁটের কোণে একটা ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠল। সে বলল, 'দেখা যাক তবে, কে বেশি শক্তিমান!'

৩

অচেনা উজবেক বৃদ্ধ চলে যাবার পর দরজা বন্ধ করে আবার টেবিলে এসে বসলেন মিখাইল গেরাসিমভ। লোকটার আগমন তাকে একধারে যেমন বিস্মিত করেছে তেমনই রোমাঞ্চিত করেছে। এখন তিনি নিশ্চিত যে ওই কবরের মধ্যেই শুয়ে আছেন পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম নিষ্ঠুর শাসক তৈমুর লঙ!

ভাগ্যিস গেরাসিমভ পরদিন মস্কোতে না ফিরে কবর খোঁড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন! বৃদ্ধের নামটা জানা হল না গেরাসিমভের। তবে বৃদ্ধকে কিন্তু স্তালিনের নাম করে মিথ্যা বলেননি তিনি। সাতমাস আগে সত্যিই রাশিয়ার সর্বাধিনায়ক যোসেফ স্তালিন ডেকে পাঠিয়েছিলেন নৃতত্ত্ববিদকে। কমরেড স্তালিন তাঁকে বলেছিলেন, 'খুঁজে বার করতে হবে তৈমুর লঙের সমাধি। তৈমুরের কোনো ছবি বা মূর্তি কোথাও পাওয়া যায় না। কবরের মধ্যে যদি পাঁচশো বছরের প্রাচীন সেই সামরিক শাসকের দেহাবশেষ পাওয়া যায় তবে তা দিয়ে তাঁর প্রতিকৃতি নির্মাণ করতে হবে।

স্তালিন দেখতে চান তৈমুর কেমন দেখতে ছিলেন। তবে রাশিয়ার সর্বাধিনায়কের হঠাৎ এই আগ্রহের পিছনে কী কারণ আছে তা স্পষ্টভাবে গেরাসিমভের জানা নেই। হয়তো এমনও হতে পারে স্তালিনের মতো তৈমুরও কঠিন হৃদয়ের লৌহ পুরুষ ছিলেন বলে হয়তো তৈমুরের প্রতিকৃতি দেখার আগ্রহ জেগেছে তার মনে। যাই হোক স্তালিনের ইচ্ছা বা নির্দেশেই সোভিয়েত রাশিয়ার বর্তমান শেষ কথা। কাজটার মধ্যে একটা চ্যালেঞ্জিং ব্যাপারও ছিল।

পরদিন থেকেই তৈমুর সম্পর্কে বইপত্র-দলিল দস্তাবেজ ঘাটতে শুরু করেছিলেন গেরাসিমভ। তারপর একদিন মস্কো থেকে রওনা হয়েছিলেন কাজাকিস্তানের সমরখন্দের উদ্দেশ্যে। সমরখন্দে যে তৈমুরকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল তা ইতিহাস বইয়ের পাতায় লেখা আছে। কিন্তু সেটা যে সমর খন্দের কোথায় তা জানা ছিল না।

শুধু একটা বইয়ে গুল-ই আমীর গ্রামটায় তৈমুরের কবর থাকলেও থাকতে পারে বলে সামান্য একটু আভাস ছিল। রাশিয়ার গুপ্তচর সংস্থা কে জি বি-র এক অফিসার গেরাসিমভকে জানান যে এই গুল-ই আমীর গ্রামে বেশ কিছু প্রাচীন কবর আছে। স্থানীয় উজবেক উপজাতির লোকেরা নাকি ভয়ে এড়িয়ে চলে কবরখানা।

জীবিত হোক বা মৃত, তৈমুর নাম ভীতিপ্রদ। তার কবরটা এড়িয়ে চলাই স্বাভাবিক। প্রাথমিক অবস্থায় অঙ্ক কিছুটা মিলে যাওয়াতে গেরাসিমভ তার সঙ্গীদের নিয়ে চলে এসেছিলেন এখানে। তারপর—

গেরাসিমভের মনে হচ্ছিল তাঁর সহযোগীদের ডেকে নিয়ে তখনই ছুটে যান ওই কবর খোঁড়ার জন্য। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। এরপর বাতি নিভিয়ে গেরাসিমভ শুয়ে পড়লেন। কিন্তু সারা রাত উত্তেজনায় ভালো করে তাঁর ঘুম এলো না। জানলার কাচের ফাঁক দিয়ে যখন ভোরের আবছা আলো ঘরে প্রবেশ করল তখনই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন তিনি।

অবশ্য আরও বেশ খানিকটা সময় তাঁকে অপেক্ষা করতে হল সঙ্গীদের জন্য। ব্রেকফাস্টের টেবিলে তিনি তাঁর সঙ্গীদের কাছে ব্যক্ত করলেন গত রাতের সেই বৃদ্ধের কথা। শুনে তাঁর সঙ্গীরাও বেশ উত্তেজিত। কোনো রকমে ব্রেকফাস্ট সাঙ্গ করে কবর খোঁড়ার সরঞ্জাম নিয়ে গাড়ি করে তারা রওনা হয়ে গেলেন কিছু দূরে যেই কবরস্থানের দিকে। উত্তেজনায় সবাই টগবগ করে ফুটছে। গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ ছাপিয়ে গেরাসিমভ যেন শুনতে পাচ্ছেন তাঁর হৃৎপিণ্ডের লাব ডুব শব্দ! ক্যালেন্ডারের পাতায় দিনটা ২১ জুন ১৯৪১।

জায়গাটায় পৌঁছে গেলেন তাঁরা। গতকাল ছ'ফুট মতো গর্ত খুঁড়েও কোনো কিছু পাওয়া যায়নি। এদিন উৎসাহ নিয়ে সে গর্তে নেমে পড়লেন সকলে। সূর্য উঠলেও আকাশ আজ মেঘলা। রোদের তেজ নেই। কবর আরও খোঁড়ার কাজ শুরু হল। অতি সাবধানে, ধীরে ধীরে। মাটির নীচে যদি কোনো কিছু থেকে থাকে তবে তা কোদাল, বেলচা বা কার্নিকের আঘাতে যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে জন্য।

সময় এগিয়ে চলল। আকাশেও মেঘ জমতে শুরু করল। অথচ এ সময়ে বৃষ্টি হবার কথা নয়।

কয়েক ঘণ্টা কেটে গেছে কাজ শুরু হবার পর। গতদিন আর এদিন মিলিয়ে অন্তত বারো ফুট গর্ত খোঁড়া হয়ে গেছে। হঠাৎ কার্নিকের আঘাতে ঠং করে একটা শব্দ হল! মাটির তলা থেকে আবিষ্কৃত হল একটা পাথরের পাটাতন। ধরাধরি করে সেটা ওপরে তোলা হল। তারপর আবার মাটি। তবে, নৃতত্ত্ববিদরা নিশ্চিত হয়ে গেলেন অত নীচে পাথরের পাটাতন যখন আছে তবে নিশ্চিতভাবে তার নীচের মাটিতে কিছু আছে।

আবার কাজ শুরু হল। এবারে বেশি খুঁড়তে হল না। হাত খানেক খুঁড়তেই বেরিয়ে এল দ্বিতীয় পাটাতন। সেটাকেও ওপরে তোলা হল। তার নীচে আবারও মাটি।

উত্তেজনার পারদ ক্রমশ চড়ছে সকলের। খনন কাজ চলছে। বাতাসে গুমোট ভাব, ঘাম ঝরছে। তবু উৎসাহের বিরাম নেই। বেশ খানিকটা খোঁড়ার পর আত্মপ্রকাশ করল তৃতীয় একটা পাথরের স্ল্যাব। কঠিন গ্রানাইট পাথরের পাটাতনটা বেশ চওড়া আর ভারী। কিছুতেই নড়তে চায় না।

অনেকক্ষণ সময়ের পরে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একপাশে সেটা সরিয়ে ফেলা গেল। গেরাসিমভের রিস্ট ওয়াচে তখন বারোটা বাজে।

গ্রানাইট পাথরের পাটাতনটা পাশে সরিয়ে ফেলতেই তার নীচে থেকে আবিষ্কৃত হল পাথরের ঢাকনা সমেত একটা কফিন বা শবাধার! উল্লাসে চিৎকার করে উঠলেন নৃ-বিজ্ঞানী মিখাইল গেরাসিমভ আর তার সঙ্গীরা। নিশ্চয়ই এটা তৈমুরের কফিন। নইলে এভাবে মাটির তলায় কফিনটা লুকোনো থাকত না!

একটা বড় ব্রাশ দিয়ে কবরের ঢাকনার ওপর সাবধানে ধুলো মোছার কাজ শুরু হল। কিছুক্ষণ পর সে কাজ সম্পূর্ণ হতেই পাথরের ডানার ওপর আত্মপ্রকাশ করল কিছু খোদিত অক্ষর। গেরাসিমভ শুধু বিজ্ঞানীই নন, বেশ কয়েকটা ভাষায় তিনি দক্ষও। দেখলেন, লেখাটা ফার্সি। তিনি লেখাটা পাঠও করে ফেললেন। বেশ অবাকও হলেন। কফিনের ডালায় লেখা আছে 'আমার ঘুম যেদিন ভাঙবে, সেদিন আবার কেঁপে উঠবে সারা পৃথিবী।'

কিছুটা কাকতালীয়ভাবেই যেন লেখাটা পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গেই আকাশে মেঘের গর্জন শোনা গেল! বৃষ্টি নামার পূর্বাভাস। গেরাসিমভ আর তার সঙ্গীরা বুঝতে পারলেন এবার তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে হবে।

গাঁইতির ফলা দিয়ে অতি সাবধানে চাড় দিয়ে এরপর সরিয়ে ফেলা হল কফিনের ডালা। প্রত্যাশা মতোই গেরাসিমভ আর তাঁর সঙ্গীরা দেখতে পেলেন কফিনের মধ্যে শায়িত রয়েছে একটা কঙ্কাল! সময়ের প্রভাবে কঙ্কালটা টুকরো টুকরো হয়ে গেলেও করোটি থেকে শরীরের সব হাড়ই বর্তমান। ভালো ভাবে কঙ্কালটাকে দেখার জন্য কফিনের ভিতর ঝুঁকে পড়তেই একটা অদ্ভুত সুগন্ধ এসে লাগল গেরাসিমভের নাকে। চমকে উঠলেন গেরাসিমভ। এত প্রাচীন কবরের ভিতর এখনও সুগন্ধ !

তৈমুরের কবর অনুসন্ধানের কাজে নামার পর তাঁকে নিয়ে অনেকটা পড়াশোনা করেছেন গেরাসিমভ। গন্ধটা পেয়ে চমকে গেলেও তাঁর মনে পড়ে গেল ক্লোয়েন্টস মাথনের লেখায় তিনি পড়েছিলেন যে তৈমুরের মৃত্যুর পর তাঁর দেহ কস্তুরী আর গোলাপ জলে ধৌত করে আবলুস কাঠের কফিনে ভরে সমরখন্দে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কস্তুরী তেলের গন্ধ শত শত বছর টিকে থাকে।

গেরাসিমভ বুঝতে পারলেন, যে গন্ধটা তাঁর নাকে আসছে সেটা তবে কস্তুরীর গন্ধই হবে। নৃতত্ত্ববিদ শবাধারের মধ্যে থাকা নর করোটিটার দিকে তাকিয়ে রোমাঞ্চিতভাবে ভাবলেন, এই সেই মানুষ, যে একদিন সম্রাট আলেকজান্ডার, চেঙ্গিজের মতো সারা দুনিয়া জয়ের স্বপ্ন দেখতেন!

যিনি পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে একদা নিজের ঘোড়ার খুরের নীচে পদানত করেছিলেন। যে কারণে ওই সমরবিদকে তাঁর সঙ্গীরা সম্রাট বলে সম্বোধন করত! এই সেই মানুষের করোটি, যিনি ইতিহাসের পাতায় কুখ্যাত হয়ে আছেন তাঁর সামরিক নিষ্ঠুরতার জন্য। যাঁর বাহিনি হত্যা করেছিল দু-কোটি মানুষকে! পৃথিবীকে তাঁর নাম সম্পর্কে আতঙ্কিত করার জন্য যিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন পরাজিত শত্রুসেনাদের খুলি কেটে আনতে, আর তা দিয়ে তিনি সত্যিই মিনার নির্মাণ করেছিলেন। এমন ভয়ঙ্কর ঘটনার নজির পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই! এই যেই ঘোড়ার পিঠে বিশ্ববিজেতা, বিশ্বত্রাস তৈমুর লঙের মাথার খুলি। তৈমুর শব্দের অর্থ লোহা। ঠিক লোহার মতোই শক্ত ছিল লোকটার হৃদয়। সেখানে কোনো মায়া-মমতা-ক্ষমার স্থান ছিল না। পাষাণের থেকেও কঠিন হৃদয়।

গেরাসিমভ ও তাঁর সঙ্গীরা বেশ কিছুক্ষণ নির্বাক চেয়ে রইলেন কঙ্কালটার দিকে। পর পর বেশ কয়েকবার বজ্রপাতের শব্দ শোনা গেল। তা শুনে সম্বিত ফিরল গেরাসিমভের। তিনি সঙ্গীদের নির্দেশ দিলেন, তাড়াতাড়ি কঙ্কালটাকে উঠিয়ে নাও। বৃষ্টি নামবে।'

একটা স্বচ্ছ প্লাস্টিকের ব্যাগে অতি সাবধানে প্রায় ভঙ্গুর কঙ্কালের টুকরোগুলোকে ভরতে লাগল গেরাসিমভের সঙ্গীরা। এইসময় তারা খেয়াল করলেন, শবাধারের মধ্যে একটা ছোট পাথরের ফলকও রাখা আছে। তারা সেটা ধুলো ঝেড়ে গেরাসিমভের হাতে দিতেই তিনি অবাক হয়ে গেলেন ফলকটা দেখে। ফার্সি ভাষায় ফলকের গায়ে লেখা 'যে-ই আমার কবর খুলুক না কেন, সে আমার চেয়েও আগ্রাসী একজন লোককে ডেকে আনল।'

চকিতের জন্য গেরাসিমভের মনে পড়ে গেল গতরাতের লোকটার বলা কথাগুলো। তিনি ভেবেছিলেন, লোকটা নিছকই ধর্ম ভাবনা অথবা কুসংস্কারের বশে তাঁকে কবর খুঁড়তে নিষেধ করেছিল। বৃদ্ধ নিজেকে তৈমুরের বংশধর বলে দাবি করেছিল। তৈমুরের পত্নী ও উপপত্নীর সংখ্যা ছিল অগুনতি। বৃদ্ধ সত্যিই তৈমুরের বংশধর কিনা তা জানা নেই গেরাসিমভের। তবে দ্বিতীয় ফলকটা দেখে তাঁর একটা কথা মনে হল, সম্ভবত বৃদ্ধ লোকটা বংশ পরম্পরায় জানে যে তৈমুরের কবরে এমন কিছু কথা লেখা আছে। যে কারণে সে কবর খুঁড়তে নিষেধ করেছিল।

প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে প্রাচীন শাসকের দেহাবশেষ ওপরে তোলা হল। ঠিক সেই সময় সূর্য প্রায় মেঘের আড়ালে ঢেকে গিয়ে মুহুর্মুহু বজ্রপাত শুরু

হল। দেহাবশেষ সমেত প্লাস্টিকের ব্যাগটাকে এরপর একটা স্টিলের ট্রাঙ্কে পুরে সবাই সেটা নিয়ে এগোল গাড়ির দিকে। তারা গাড়ির কাছে পৌঁছতে না- পৌঁছতেই বড় বড় ফোঁটায় তুমুল বৃষ্টি নামল। তার সঙ্গে শুরু হল প্রচণ্ড ঝোড়ো বাতাস।

ট্রাঙ্ক সমেত ছুটতে ছুটতে কোনক্রমে তারা সেটা নিয়ে উঠিয়ে ফেলল গাড়ির পিছনের অংশে ক্যানভাসের ছাউনির নীচে। ড্রাইভার উঠে বসল তার আসনে। গেরাসিমভ ও তাঁর সঙ্গীরাও উঠে পড়ল গাড়ির পিছনে। এত জোরে বাতাস বইছে যে মনে হচ্ছে গাড়ির ছাউনিটাই উড়ে যাবে!

থরথর করে কাঁপছে গাড়ি। গাড়ির ইঞ্জিন চালু করল ড্রাইভার। ঠিক সেই সময় পিছনে তাকিয়ে গেরাসিমভ দেখতে পেলেন একজনকে। গাড়ি আর শূন্য কবরটার মধ্যবর্তী ফাঁকা জমিতে অঝোর বর্ষণের মধ্যে দাঁড়িয়ে গাড়িটার দিকে তাকিয়ে সেই বৃদ্ধ।

গাড়ির দিকে তাকিয়ে সে চিৎকার করে গেরাসিমভের উদ্দেশ্যে বলল, 'মনে রাখবে, তুমিই কবর থেকে ওকে তুলে নিয়ে গিয়ে এক ভয়ঙ্কর মানুষকে ডেকে আনলে। যা ঘটবে তার জন্য তুমিই দায়ী থাকবে।'

গাড়ি চলতে শুরু করল। লোকটা এরপর আরও কিছু যেন বলল। গেরাসিমভের কান পর্যন্ত পৌঁছল না। দ্রুত গেরাসিমভের দৃষ্টিপথের আড়ালে হারিয়ে গেল সেই উজবেক বৃদ্ধ।

প্রবল দুর্যোগের মধ্যে কোনক্রমে দেহাবশেষ ভরা সিন্দুক নিয়ে ফিরে এলেন তারা। তবে দুর্যোগ কিছুতেই কমছে না। বরং বেড়েই চলল। দিন কেটে গিয়ে রাত্রি নামল, তবু ঝড় বৃষ্টি আর বজ্রপাতের বিরাম নেই। বাতাসের দাপট এতটাই যে মনে হতে লাগল ঘরের শার্সির কাচগুলো যেন এখনই ভেঙে পড়বে। চাইখানার বড় ঘরটায় সারা রাত স্টিলের ট্রাঙ্ক ঘিরে বসে রইলেন গেরাসিমভ আর তাঁর সঙ্গীরা। গেরাসিমভের কানে বার বার বাজতে লাগল কথাগুলো, 'যা ঘটবে তার জন্য তুমিই দায়ী থাকবে।'

পরদিন ভোরের আলো ফোটার পর যখন ধীরে ধীরে দুর্যোগ থামল তখন সেই চাইখানা ছেড়ে বিশ্বত্রাস তৈমুরের দেহাবশেষ সঙ্গে করে গেরাসিমভ আর তার সঙ্গীরা রওনা হয়ে গেলেন মস্কো ফেরার জন্য। তাদের গাড়িটা যখন গ্রামের সীমানা অতিক্রম করছে, তখন এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল। বেশ কিছু গ্রামবাসী এসে উপস্থিতি হয়েছে গ্রামের সীমানাতে। রাস্তার দু-পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে। তাদের দেখে প্রাথমিকভাবে গেরাসিমভের মনে হল, হয়তো বা তারা তাদের বাধা দেবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে।

সরকারি নিরাপত্তা কর্মী সার্ভিস রিভলভার বার করলেন লোকগুলোকে দেখে। কিন্তু তেমন কোনো ঘটনা ঘটল না। গাড়িগুলোকে বাধা দিল না উজবেক উপজাতিরা। শুধু তারা ভয়ার্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

৪

সমরখন্দ থেকে সড়ক পথে মস্কো পৌঁছতে গাড়িতে তিনদিন মতো সময় লাগে। পথেই দিন কাটল। সঙ্গে অমূল্য জিনিস আছে, যাত্রাপথে একটুও সময় তাঁরা নষ্ট করলেন না। যে সব সরাইখানা বা মোটেলে গেরাসিমভ গাড়ি দাঁড় করালেন সেখানে লোকজনের মুখমণ্ডলে চাপা উত্তেজনার ছায়া থাকলেও তিনি আর তাঁর সঙ্গীরা সফলতার আনন্দে নিজেরা এত উত্তেজিত ছিলেন যে, কিচ্ছুই তাদের চোখে পড়ল না। বেশ কয়েকবার আকাশে যুদ্ধ বিমান উড়তেও দেখলেন তারা। তবে ব্যাপারটা তাদের চোখে নতুন কিছু বলে মনে হল না। যুদ্ধে অংশ না নিলেও মাঝে মাঝেই যুদ্ধের মহড়া দেয় রাশিয়ার যুদ্ধ বিমানগুলো।

নৃতত্ত্ববিদ গেরাসিমভ মশগুল হয়ে রইলেন সেই চিন্তায়, কখন তিনি মস্কো পৌঁছে তৈমুরের দেহাবশেষ উদ্ধারের ব্যাপারটা জানাবেন সোভিয়েতের সর্বাধিনায়ককে! কবে থেকে গেরাসিমভ তৈমুরের দেহাবশেষ নিয়ে কাজ শুরু করবেন তাঁর প্রতিকৃতি তৈরির জন্য?

তৃতীয় দিন মধ্যরাতে মস্কো পৌঁছলেন গেরাসিমভ। দেহাবশেষের ট্রাঙ্কটা সোজা নিয়ে গিয়ে তোলা হল গেরাসিমভের কর্মস্থল সরকারি ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে। ভোররাতের দিকে নিজের সরকারি ফ্ল্যাটে ফিরে এলেন গেরাসিমভ।

কয়েকমাসের অক্লান্ত পরিশ্রম আর দীর্ঘ যাত্রা পথ অতিক্রম করে আসার ক্লান্তিতে গাঢ় ঘুম নেমে এসেছিল গেরাসিমভের চোখে। বেলার দিকে তার ঘুম ভাঙল একটা শব্দে। চোখ মেলে তিনি দেখতে পেলেন এক ঝাঁক রুশ যুদ্ধ বিমান বেশ সার বেঁধে উড়ে চলেছে আকাশের বুকে। আর তাদেরই গর্জনের শব্দে ঘুম ভেঙে গেছে তাঁর।

বিছানায় উঠে বসতেই গেরাসিমভের মনে পড়ল তৈমুরের দেহাবশেষ নিয়ে মস্কো ফিরে আসার সংবাদটা স্তালিনের সচিবালয়ে জানানো হয়নি। কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে পড়লেন। টেলিগ্রাম অফিস বেশি দূরে নয়। সেদিকে হাঁটতে শুরু করলেন।

জনবহুল শহর মস্কো। হাঁটতে হাঁটতে তিনি এবার রাস্তার অনেক লোকের চোখে-মুখেই উত্তেজনার আভাস খেয়াল করলেন। রাস্তার পাশে বেঞ্চে বসে খবরের কাগজ হাতে নিয়ে উত্তেজিতভাবে কী যেন আলোচনা করছেন মানুষজন। গেরাসিমভ এবার অনুমান করলেন, কোনো একটা ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটেছে।

টেলিগ্রাম অফিসেও অন্য দিনের থেকে এদিন বেশি ব্যস্ততা। সরকারি জায়গায় টেলিগ্রাম পাঠাবার জন্য আলাদা কাউন্টার। তার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীর সঙ্গে গেরাসিমভের পরিচয় আছে। নির্দিষ্ট ফর্মে টেলিগ্রামের নির্দিষ্ট বয়ানটা লিখে সেটা সরকারি কর্মচারীর হাতে দেবার পর গেরাসিমভ জিগ্যেস করলেন, 'কিছু কি ঘটেছে নাকি? আজ টেলিগ্রাম করার জন্য এত ভিড় দেখছি!'

লোকটা তাঁর কথা শুনে মৃদু বিস্মিতভাবে বলল, 'হ্যাঁ, তা তো ঘটেইছে। কেন, আপনি জানেন না! প্রাভদা পড়েননি? বা মস্কো রেডিয়ো শোনেননি?'

গেরাসিমভ বললেন, 'না। খবরের কাগজ দু-তিন দিন পড়া হয়নি বা রেডিয়ো শোনা হয়নি। কাল গভীর রাতে মস্কো ফিরেছি। দু-তিন দিন পথেই ছিলাম।'

লোকটা তাঁকে অবাক করে দিয়ে বলল, 'গত পরশু অর্থাৎ ২২ জুন অনাক্রমণ চুক্তি ভেঙে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করেছে হিটলারের জার্মানি। রাশিয়ার মাটিতে প্রবেশ করেছে জার্মানির সাঁজোয়া গাড়ি, ট্যাঙ্ক। লাল ফৌজের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে তাদের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এবার প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন।'

২১শে জুন তারিখেই তো গেরাসিমভ তৈমুর লঙের কবরটা খুঁড়ে তার দেহাবশেষ কফিন থেকে উঠিয়েছিলেন! তাদের দেশকে জার্মানি আক্রমণ করেছে শুনে, গেরাসিমভের ঘটনাটাকে অবিশ্বাস্য বলেই মনে হল। এত বড় দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন, যাঁর সামরিক শক্তিকে সারা পৃথিবী সমীহ করে চলে, যার মাথার ওপর বসে আছেন স্বয়ং স্তালিনের মতো রাষ্ট্রনায়ক, সে দেশকেই কিনা আক্রমণ করে বসল জার্মানি! এও সম্ভব?

টেলিগ্রামের কাজ মিটিয়ে একটা প্রাভদা কিনে গেরাসিমভ নিজের ফ্ল্যাটে ফিরলেন। হ্যাঁ, সরকারি কাগজের প্রথম পাতাতেই বড় করে ছাপা হয়েছে যুদ্ধের খবর। রয়েছে স্তালিনের বিবৃতিও। তিনি জনগণকে শান্ত থাকতে বলেছেন ও যে অঞ্চলে যুদ্ধ চলছে সে অঞ্চলে লাল ফৌজকে সাহায্য করতে বলেছেন।

তিনি সোভিয়েতের প্রতিটি নাগরিককে এই বলে আশ্বস্ত করেছেন যে, অচিরেই এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটবে, লাল ফৌজ পরাজিত ও বিতাড়িত করবে হিটলার বাহিনিকে। অযথা আতঙ্কিত হবার কোনো কারণ নেই!

খবরের কাগজটা পড়ে গেরাসিমভেরও মনে হল, এ নিয়ে তাঁর বেশি উত্তেজিত হবার কারণ নেই। কারণ প্রথমত তিনি সামরিক বিভাগের সঙ্গে যুক্ত নন, আর দ্বিতীয়ত স্তালিনের যে বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে তার প্রতি তিনি আস্থাশীল। অর্থাৎ রেড আর্মি জার্মান বাহিনিকে খুব দ্রুতই সোভিয়েতের মাটি থেকে খেদিয়ে দেবে।

গেরাসিমভ ঠিক করলেন, এ সব নিয়ে বেশি না ভেবে তাঁকে তার কাজের ব্যাপারে বেশি মনোসংযোগ করতে হবে। তৈমুরের দেহাবশেষ থেকে উদ্ধার করে আনতে হবে তার প্রতিকৃতি। এ কাজ করতে অন্তত ছয় মাস সময় লাগবে। যুদ্ধ তো আর কয়েক দিনের মধ্যেই থেমে যাবে। তারপর হয়তো স্তালিন একদিন হঠাৎই তাকে ডেকে পাঠিয়ে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইবেন।

কাজেই যথাসম্ভব দ্রুত কাজ শেষ করতে হবে গেরাসিমভকে। এবং এ কাজ হতে হবে একদম নিখুঁত। কারণ এই প্রথম শুধু স্তালিন নন, সারা পৃথিবীর মানুষ প্রত্যক্ষ করবে, বহু আলোচিত এক মানুষের ছবি। যাঁর নামে একদা কেঁপে উঠত সারা বিশ্ব! গেরাসিমভ আর তার সহযোগীরা যদি নিখুঁতভাবে কাজটা সম্পন্ন করতে পারেন তবে তা নিশ্চিতভাবে সারা পৃথিবীতে গেরাসিমভের পরিচিতি ঘটাবে তৈমুরের প্রতিকৃতির সৃষ্টিকর্তা রূপে। নিজের পরিকল্পনা ঠিক করে নিয়ে গেরাসিমভ কিছুক্ষণের মধ্যেই রওনা হয়ে গেলেন ফরেনসিক ল্যাবরেটরির দিকে।

ঠিক এ সময়ই নিজের অফিস চেম্বারে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, জেনারেল গ্রেগরি জুকভের সঙ্গে যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন সর্বাধিনায়ক যোশেফ স্তালিন। সোভিয়েতের সাধারণ নাগরিকদের মতো স্তালিন বা জুকভ কেউই তিনদিন আগে পর্যন্ত অনুমান করতে পারেননি জার্মানি এভাবে সোভিয়েতকে আক্রমণ করে বসবে! কে জি বি বা অন্য কোন গুপ্তচর সংস্থার কাছে এমনও কোনো খবর ছিল না।

মন্ত্রী পরিষদের কারো কারো এই আক্রমণ সম্পর্কে অভিমত হল, তাঁরা শুনেছেন হিটলার লোকটা নাকি একটু খ্যাপাটে ধরনের। অনেক সময় মাত্র দু-তিন মিনিটের মধ্যে তিনি এমন বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন যে তাঁর ঘনিষ্ঠ সঙ্গীরাও তা আগাম আঁচ করতে পারেন না। হয়তো জার্মানির এই আক্রমণ তেমনই তাঁর তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের ফসল।

তবে জার্মানির এই অতর্কিত আক্রমণ যে সোভিয়েত বাহিনীকে কিছুটা হলেও বিপদে ফেলে দিয়েছে সন্দেহ নেই। স্থলভাগে লড়াই করার জন্য সোভিয়েতের সেনা সংখ্যা চল্লিশ লাখের কাছে, ট্যাঙ্কের সংখ্যা তেইশ হাজার। কিন্তু তারা কেউই প্রস্তুত ছিল না এই আক্রমণের জন্য। যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে নিজেদের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে দেশবাসীর সামনে সব কিছু প্রকাশ করা যায় না। তাই প্রাভদায় সব খবর জানানো হয়নি।

হিটলার তার রাশিয়া অভিযানের নাম দিয়েছে অপরেশন 'ফ্রিজ' বা 'অপারেশন বারবারোসা'। ২২ জুন ভোর চারটেয় দেড়শো ডিভিশনের জার্মান সেনাবাহিনী সোভিয়েত সীমানার মধ্যে ঢুকে অপারেশন বারবারোসা শুরু করেছে। ওদিনই রাতের মধ্যে জার্মান সেনারা রাশিয়ার আঠারোশো যুদ্ধ বিমান ধ্বংস করেছে। তাদের অধিকাংশ বিভিন্ন বিমান ঘাঁটিতে দাঁড়িয়েছিল। সাধারণ নাগরিক আর লাল ফৌজের সৈন্যরা মিলে প্রায় তিন হাজার সোভিয়েত নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে।

অতর্কিত আক্রমণে জার্মান বাহিনী যে অনেকটা ক্ষতি করতে পেরেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এদিন সকালে পাওয়া শেষ খবর অনুসারে জার্মানির প্যানজার ডিভিশন জেনারেল ডেনলির নেতৃত্বে সোভিয়েত সীমান্তের দেড়শো মাইল ভিতরে প্রবেশ করে গেছে। আকাশ পথের দখলও নিয়ে নিয়েছে জার্মান যুদ্ধ বিমান। এখনও পর্যন্ত রুশ বাহিনী জার্মানদের তেমন কোনো ক্ষয়-ক্ষতিই করতে পারেনি।

যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি ও বর্তমানে কী কী করণীয় তা নিয়ে দীর্ঘ বৈঠকের শেষে স্তালিন চুরুটে কামড় দিয়ে বললেন, 'যে যাই বলুন না কেন, আমার ধারণা হিটলারের সোভিয়েত আক্রমণ কোনও তাৎক্ষণিক ভাবনা নয়, সে দীর্ঘ দিন ধরেই ভিতরে ভিতরে রাশিয়া আক্রমণ করার পরিকল্পনা করছিল। আমাদের সৈন্য বাহিনীর ক্ষমতা সম্পর্কেও কিছুটা হলেও সে ওয়াকিবহাল। তা সত্ত্বেও আক্রমণ চুক্তি ভেঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করল কেন? আমার ধারণা যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সবথেকে বড় আক্রমণের প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই সেরে ফেলেছে হিটলার। যে ভাবেই হোক লাল ফৌজকে মোকাবিলা করতে হবে এই ঘটনার। যত দ্রুত সম্ভব, মার দিয়ে প্রথমে সোভিয়েত ভূখণ্ড থেকে তাড়াতে হবে জার্মান বাহিনীকে। তারপর প্রয়োজন বোধে লাল ফৌজ বার্লিন অভিযান করবে। তবে আমাদের লাল ফৌজের আরও সজাগ থাকা উচিত ছিল।'

জেনারেল জুকভ বললেন, 'আসলে দু-দেশের মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তিটা আমাদের নিশ্চিত করে রেখেছিল। এখন বুঝতে পারছি এটা আমাদের ভাবনার গাফিলতি। অনাক্রমণ চুক্তিটা ছিল হিটলারের শক্তিবৃদ্ধি করার কৌশল। সমগ্র ইউরোপের একচ্ছত্র অধিপতি, আধুনিক পৃথিবীর সম্রাট হতে চান তিনি। অতর্কিত আক্রমণে আমাদের কিছুটা ক্ষতি হল ঠিকই, কিন্তু

পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যাবে বলে মনে হয়। পঁচাত্তর হাজার লাল ফৌজ ইতিমধ্যে রওনা হয়েছে রণাঙ্গণের দিকে। সঙ্গে রয়েছে দেড় হাজার ট্যাঙ্ক, অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান ভেহিকল এবং চারশো ফাইটার প্লেন।'

স্তালিন বললেন, 'দেখুন কী হয়? তবে প্রতিদিন একবার করে যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় বসব আমি। আর হ্যাঁ, মন্ত্রী পরিষদের সকলকে আর পার্টির শীর্ষস্থানীয় কমরেডদের জানিয়ে দেবেন যে তাঁরা কোথাও এমন কোনো বিবৃতি না দেন, যাতে জনসাধারণের মনে হতে পারে যে লাল ফৌজ বা আমরা এই আক্রমণের ফলে বিব্রত বোধ করছি।' দিনের মতো বৈঠক শেষ করলেন সর্বাধিনায়ক।

জেনারেল চেম্বার ছেড়ে বেরিয়ে যাবার পর সেখানে প্রবেশ করলেন স্তালিনের আপ্তসহায়ক। তার হাতে ধরা ট্রে-তে একটা কাগজ। সেটা তুলে নিয়ে পড়লেন স্তালিন। একটা টেলিগ্রাম। তাতে লেখা আছে সমরখন্দ থেকে উদ্ধার হয়েছে একদা বিশ্বত্রাস তৈমুর লঙের কঙ্কাল। নৃতত্ত্ববিদ গেরাসিমভ তা নিয়ে মস্কো ফিরেছেন।

স্তালিন নিজে এ কাজের ভার দিয়েছেন গেরাসিমভকে। অন্য সময় হলে হয়তো স্তালিন এ সংবাদ পেয়ে নিজে ডেকে পাঠাতেন গেরাসিমভকে। কিন্তু জার্মানির আক্রমণের ফলে সেই চিন্তা সর্বাধিনায়কের মস্তিষ্ক জুড়ে আছে। তাই তিনি টেলিগ্রামটা পাঠ করে আপ্ত সহায়ককে শুধু নির্দেশ দিলেন, 'গেরাসিমভকে আমার তরফ থেকে একটা শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়ে কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে বলো। অন্য কোনো সরকারি সাহায্যের প্রয়োজন হলে সেই ব্যবস্থা করবে। ওর কাজে যেন অসুবিধা না হয়।'

যথা সময় সোভিয়েতের সর্বাধিনায়কের বার্তা পৌঁছে গেল বিজ্ঞানী গেরাসিমভের কাছে।

৫

বেশ উৎসাহ নিয়েই কাজ শুরু করে দিয়েছেন নৃতত্ত্ববিদ গেরাসিমভ। এ কাজ ইতিপূর্বে তিনি বহু বার করলেও কাজটা সহজ নয়। বিশেষত দেহাবশেষ যত পুরানো হয় কাজটা তত কঠিন হয়। প্রথমত দেহাবশেষ গুলোকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করতে হয়, যাতে তার কোনো অংশ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। তারপর দেহাবশেষের প্রতিটা অংশের ফরেনসিক বিশ্লেষণ করতে হয়, মাপজোক করতে হয়, প্রতিটা অংশের ছবি তুলতে হয়, ছবি আঁকতে হয়, সেগুলোকে জুড়তে হয়, আর তারপরই মৃতের অবয়ব আঁকা সম্ভব হয়। আর সেই প্রতিকৃতি কতটা নিখুঁত হবে তা নির্ভর করে কাজের প্রতিটা পর্যায় কতটা নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করা যায় তার উপর। তাই তার কাজের ব্যাপার ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারে বিন্দুমাত্র মনোযোগ দিতে আগ্রহী হলেন না গেরাসিমভ। পাছে সংবাদপত্রের খবর তাঁর মনোসংযোগ নষ্ট করে তাই তিনি সংবাদপত্র পাঠ করাও বন্ধ করে দিলেন।

সকালবেলা তিনি তার বাসস্থান ছেড়ে তার ল্যাবরেটরিতে পৌঁছান, আর ফিরে আসেন সূর্য ডোবার পর। এমনকী কোনো কোনোদিন ফ্ল্যাটে না ফিরে ল্যাবরেটেরিতেই থেকে যান। কাজের বাইরে বিশ্ব পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কই রইল না কাজপাগল নৃতত্ত্ববিদের। এভাবে কবে যে তিন মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেল, তা তিনি বুঝতেই পারলেন না।

তবে গেরাসিমভ বিশ্ব পৃথিবীর খোঁজ না রাখলেও পৃথিবী যে তাঁর নিজের নিয়মে চলবে সেটাই স্বাভাবিক। না, যুদ্ধ থামেনি, তার গতিপ্রকৃতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। সারা পৃথিবী ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছে বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়ঙ্করতম আক্রমণ রাশিয়ার ওপর সংগঠিত করেছে জার্মানি।

পঁয়ত্রিশ লাখ জার্মান সৈন্য সোভিয়েতের আঠারোশো মাইল সীমান্ত এলাকা জুড়ে নিরবিচ্ছিন্ন আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। জার্মান বাহিনীর আশি শতাংশ সৈন্য হল জার্মান। আর বাকি কুড়ি শতাংশ হল জার্মানির সহযোগী অন্যান্য দেশ বা অক্ষশক্তির সৈন্য।

ইতিমধ্যে স্তালিন জেনে গেছেন তাঁর অনুমানই ঠিক। রাশিয়া আক্রমণ হিটলারের তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নয়, তিনি নাকি ডিসেম্বর মাসেই তাঁর জেনারেল নিয়ে অপরাশেন বারবারোসার ব্লু-প্রিন্ট রচনা করেছিলেন। সে সম্পর্কে বিন্দুবিসর্গ জানতে না পারা হল কেজিবির ব্যর্থতা।

জার্মান বাহিনী তিনটে ভাগে বিভক্ত হয়ে রাশিয়া দখলের চেষ্টা করছে। উত্তরের ফৌজ বাল্টিক দেশ লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া এবং এস্তোনিয়ার ভিতর দিয়ে রুশ ভূখণ্ডে প্রবেশ করে লেনিনগ্রাদ দখলের চেষ্টা করছে। দক্ষিণের দল ইউক্রেন আক্রমণ শুরু করেছে। সম্ভবত তারা চেষ্টা করছে কিয়েভ হয়ে ডনবাস শিল্পাঞ্চল দখলের। আর মধ্যের বাহিনীর লক্ষ হল মস্কো। তারা বেলারুশ হয়ে প্রবেশ করে চেষ্টা চালাচ্ছে মস্কোর দিকে এগোনোর।

স্তালিন যা খবর পাচ্ছেন তাতে লাল ফৌজকে চূড়ান্ত ব্যতিব্যস্ত, শঙ্কিত করে তুলেছে হিটলার বাহিনীর প্যানজার ডিভিশন। সাড়ে তিন হাজার ট্যাঙ্ক আর দু-হাজার সাতশো যুদ্ধ বিমান দিয়ে অপ্রতিরোধ্য গতিতে একটার পর একটা সোভিয়েত শহর দখল করে নিচ্ছে। লাল বাহিনী তাদের সামনে দাঁড়াতেই পারছে না।

ক্রমশই তারা পিছু হঠছে। স্তালিন গভীর উদ্বিগ্ন ব্যাপারটা নিয়ে। প্রতিদিন দফায় দফায় কখনও রুশ জেনারেলদের সঙ্গে কখনও বা মন্ত্রী পরিষদের সঙ্গে মিটিং করছেন কীভাবে জার্মান বাহিনীর আগ্রাসনকে প্রতিহত করা যায় তা নিয়ে। যদিও সরকারি মুখপাত্র প্রাভদায় সমানে প্রচার চলছে, 'সোভিয়েতের বাসিন্দাদের চিন্তার কিছু নেই, কারণ, লাল ফৌজকে পরাজিত করার ক্ষমতা বিশ্বের কোনও সেনাবাহিনীর নেই। ইতিমধ্যেই সোভিয়েতের বেশ কিছু অঞ্চল জার্মান বাহিনীর হাত থেকে মুক্ত করেছে লাল ফৌজ।'

কিন্তু সব সময় ওই প্রোপাগাণ্ডায় কাজ হচ্ছে না। কারণ, জার্মান অধিকৃত অঞ্চল থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্য যেসব সাধারণ মানুষরা পালিয়ে এসে মস্কো বা অন্যত্র আশ্রয় নিচ্ছে, তারা জানিয়ে দিচ্ছে আসল সত্য। জার্মান বাহিনীকে পরাস্ত করতে পারছে না কমরেড স্তালিনের লাল ফৌজ। ধীরে ধীরে আতঙ্ক, উৎকণ্ঠা সঞ্চারিত হচ্ছে সাধারণ মানুষের মনে।

এই তিন মাসে নিজের কাজ বেশ খানিকটা এগিয়ে ফেলেছেন নৃতত্ত্ববিদ মিখাইল গেরাসিমভ। তাঁর ডান পায়ের একটা হাড়ে আঘাতের চিহ্ন আছে, উরুর কাছে বাঁধন দেওয়া থাকত, সে প্রমাণও মিলেছে। অর্থাৎ তৈমুর যে 'লঙ' অর্থাৎ খোঁড়া ছিলেন, এ কথা সত্যি।

ফরেনসিক পরীক্ষার মাধ্যমে তৈমুরের দেহাবশেষ পরীক্ষা করে নতুন এক চমকপ্রদ তথ্য উদ্ধার হয়েছে। সাধারণত মনে করা হতো মধ্য এশিয়ার যাযাবর উপজাতির মানুষদের মতো তৈমুরও খর্বকায় ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তার কঙ্কাল পরীক্ষা করে দেখা গেছে তিনি দৈর্ঘ্যে ছিলেন অন্তত পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি। যে উচ্চতাকে লম্বাই বলা চলে। তার পঞ্জর অস্থি সাক্ষ্য দিচ্ছে যে তৈমুরের বুকের ছাতিও ছিল অত্যন্ত চওড়া।

প্রতিটা সাফল্যই যেকোন কাজে আরো বেশি উৎসাহ এনে দেয়। গেরাসিমভের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটল না। আরো বেশি বেশি করে তিনি তার দুই বৈজ্ঞানিক সহকর্মীকে নিয়ে কাজে মনোনিবেশ করলেন।

আরও মাসখানেক সময় অতিবাহিত। তৈমুরের প্রতিকৃতি আঁকার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি মোটামুটি শেষ। তৈমুরের খুলি-হাড় ইত্যাদি জোড়া দিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ কঙ্কালের রূপও তৈরি হয়েছে। ফরেনসিক ল্যাবরেটরির কাচের আধারের মধ্যে শায়িত রাখা হয়েছে সেটা।

একদিন সন্ধ্যায় ল্যাবরেটরি থেকে বাইরে বেরোবার আগে সেই কঙ্কালটার দিকে তাকিয়ে তিনি তাঁর দুই সহকর্মী গ্রেগরি আর আন্দ্রেই-এর উদ্দেশ্যে গেরাসিমভ বললেন, 'তাহলে কাল থেকে প্রতিকৃতি আঁকার কাজ শুরু করব আমরা। আশা করছি আর মাস তিনেকের মধ্যেই কাজটা শেষ করে দিতে পারব। আগামীকাল সকাল দশটায় আমরা এখানে হাজির হচ্ছি।'

আন্দ্রেই বললেন, 'আগামীকাল আমার পক্ষে ল্যাবরেটরিতে আসা সম্ভব হবে না। ইভানকে ট্রেনে তুলে দিতে যাব। কিয়েভ যাচ্ছে সে।'

আন্দ্রেই আর তার স্ত্রী নাতাশার সন্তান নেই। ভাইপো ইভানকেই সন্তানের মতো মানুষ করছে, আঠারো বছর বয়স তার। গেরাসিমভ বললেন, 'ও কিয়েভ যাচ্ছে কেন? কোনো চাকরি পেল নাকি?

আন্দ্রেই গম্ভীরভাবে বললেন, 'না, চাকরি নয়। ও কিয়েভের রণাঙ্গনে যাচ্ছে ভলান্টিয়ার হিসাবে। ইভান একসময় সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং নিয়েছিল। স্তালিনের নির্দেশ, সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিংপ্রাপ্ত যুবকদের রণাঙ্গনে যেতে হবে ভলান্টিয়ার হিসাবে।'

গেরাসিমভ যুদ্ধের কোনো খবরই রাখেন না। চমকে উঠে বললেন, 'জার্মান সেনা কিয়েভ পর্যন্ত চলে এসেছে? লাল ফৌজ কী করছে।'

আন্দ্রেই বললেন, 'হ্যাঁ, কিয়েভ প্রায় দখল করে নিয়েছে হিটলারের নাৎসি বাহিনী। শুধু কিয়েভই নয়, সোভিয়েতের ছয় লক্ষ বর্গ কিলোমিটার ভূখণ্ড তারা দখল করে নিয়েছে। সামরিক ও বেসামরিক মানুষ মিলে ইতিমধ্যে প্রায় দশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। লাল ফৌজ রোজই পিছু হটছে।'

নিজের কাজের বাইরে এসব কোনো কথাই গেরাসিমভের জানা ছিল না। তিনি বললেন, 'কী বলছ? দশ লক্ষ মানুষ মারা গেছে?'

আন্দ্রেই বলল, 'এটা প্রাভদায় প্রকাশিত সরকারি পরিসংখ্যান। আসল সংখ্যা নাকি তার চেয়েও ঢের বেশি।'

এদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে আসার পর প্রয়োজনীয় কাজকর্ম শেষ করে রোজকার মতো শুয়ে পড়েছিলেন গেরাসিমভ। ভোর রাতের দিকে তিনি একটা স্বপ্ন দেখলেন। তবে, ব্যাপারটা স্বপ্ন না বলে অতীত-দর্শন বলাই ভালো। তিনি দেখলেন, কাজাকিস্তানের সেই কবর থেকে আমীরের মৃত দেহটা তুললেন তারা। শুরু হল প্রবল বৃষ্টি আর বাজের গর্জন। কোনো ক্রমে তারা বাক্সবন্দি দেহাবশেষটাকে গাড়িতে তুললেন সেটা নিয়ে ফেরার জন্য।

যাত্রা শুরুর ঠিক আগের মুহূর্তে তিনি দেখতে পেলেন প্রবল বর্ষণের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা সেই বৃদ্ধকে। সে তাঁর উদ্দেশ্যে বলল, 'মনে রাখবে, তুমিই ওকে কবর থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে এক ভয়ঙ্কর মানুষকে ডেকে আনলে। যা ঘটবে তার জন্য তুমিও দায়ী থাকবে।' তারপর সেই বৃদ্ধ যা বলল তা চাপা পড়ে গেল বজ্রপাতের শব্দে।

প্রচণ্ড জোরে বাজ পড়তে লাগল। গেরাসিমভের ঘুমও সেই শব্দে ভেঙে গেল। আকাশে এখনও ভোরের আলো ফোটেনি। তিনি দেখতে পেলেন বিকট শব্দ করে বেশ কয়েকটা যুদ্ধ বিমান ওড়াওড়ি করছে আকাশে। গেরাসিমভ অনুমান করলেন ওই যুদ্ধ বিমানগুলোর শব্দই ঘুমের মধ্যে তিনি বাজের শব্দ ভাবছিলেন।

সেদিন সকালে নির্দিষ্ট সময়ই গেরাসিমভ ল্যাবরেটরিতে পৌঁছলেন। আন্দ্রেই উপস্থিত না হলেও গ্রেগরি উপস্থিত হয়েছেন। কাজ শুরুর আগে গ্রেগরি বেশ একটু উত্তেজিত ভাবে বললেন, 'কাল রাতের ঘটনা শুনেছেন? জার্মানির দুটো যুদ্ধ বিমান নাকি মস্কোর কাছে চলে এসেছিল। আমাদের যুদ্ধ বিমান গুলি করে নামিয়েছে সে দুটোকে।'

কথাটা শুনে কেন জানি গেরাসিমভের স্বপ্নটার কথা মনে পড়ে গেল। তিনি বললেন, 'ও সেজন্যই ভোর রাতে অনেক যুদ্ধ বিমান উড়ছিল! ভালোই যুদ্ধ শুরু হয়েছে তাহলে!'

এদিন থেকে তৈমুরের প্রতিকৃতি আঁকা শুরু করলেন গেরাসিমভ।

৬

একটার পর একটা দিন কাটছে। ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে পাঁচশো বছর আগের এক লৌহ কঠিন মানুষের অবয়ব। ছবি আঁকা শুরু করার কিছু দিনের মধ্যেই গেরাসিমভও বুঝতে পারলেন ফরেনসিক প্রযুক্তির হাত ধরে যে মুখমণ্ডলের জন্ম হচ্ছে, তার মধ্যে ইতিহাসে বর্ণিত লোকটার চরিত্রর মতোই একটা লৌহকঠিন শীতলতা আছে।

ছবি আঁকার কাজ যত এগোচ্ছে, সময় যত এগোচ্ছে ততই বাড়ছে যুদ্ধের তীব্রতা। বলা ভালো জার্মান বাহিনীর আক্রমণ। অপ্রতিরোধ্যভাবে রাশিয়ার একটার পর একটা অঞ্চল দখল করছে তারা। সোভিয়েত জনগণ আর ফৌজের মৃত্যুসংখ্যা এক কোটির বেশি ছাপিয়ে। হিটলারের নাৎসি বাহিনী হয়ে গেছে তৈমুর বাহিনীর চেয়ে ভয়ঙ্কর!

যুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাব এসে পড়তে লাগল। সূর্য ডুবে গেলে অনেক সময় একাই ল্যাবরেটরিতে কাজ করেন গেরাসিমভ। সূর্য ডুবে যাবার পর হঠাৎই একদিন সন্ধ্যার পর ল্যাবরেটরির সব আলো নিভে গেল। সাধারণত ল্যাবরেটরিতে পাওয়ার কাট হয় না। হলেও বিকল্প ব্যবস্থা আছে। গেরাসিমভ ল্যাবরেটরির কেয়ারটেকারকে ডাকলেন।

লোকটা এসে জানাল, জার্মান বিমান হানার ভয়ে মস্কোয় ব্ল্যাক আউট ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ রাতে কোথাও কোন আলো জ্বলবে না। জার্মান বাহিনী নাকি মস্কোর এতটাই কাছে এসে গেছে যে তারা বিমান হানা চালাতে পারে শহরে।

গেরাসিমভ এই প্রথম যুদ্ধের তীব্রতা অনুভব করতে পারলেন। ততদিন তিনি ভেবে আসছিলেন সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। এদিন থেকে কাজের বাইরেও একটু চোখ-কান খোলা রাখতে লাগলেন তিনি। বাড়ি থেকে ল্যাবরেটরি যাওয়া আসার পথে তিনি লক্ষ্য করতে লাগলেন দিনে দিনে পথঘাট কেমন যেন সুনসান হয়ে আসছে।

সূর্য ডোবার পর ধীরে ধীরে গাঢ় অন্ধকারে ডুবে যায় একদা আলো ঝলমলে মস্কো শহর। সারা রাত ধরে শহরের মাথায় শুধু গোঁ গোঁ শব্দে চক্কর কেটে চলে যুদ্ধ বিমান। ধাতব চেন আর চাকার ঝনঝন শব্দে মস্কোর রাস্তায় টহল দেয় ট্যাঙ্ক। তবুও এরই মধ্যে কাজ করে যেতে লাগলেন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী গেরাসিমভ। ধীরে ধীরে পূর্ণতা পেতে লাগল প্রতিকৃতি।

গেরাসিমভের কাজ তখন প্রায় শেষের পথে। আচমকা পরপর তিনদিন ল্যাবরেটরিতে অনুপস্থিত হলেন তাঁর সহকর্মী আন্দ্রেই। এই গুরুত্বপূর্ণ সময় তো আন্দ্রেইয়ের অনুপস্থিত থাকার কথা নয়।

গেরাসিমভ তাঁর অপর সহকর্মী গ্রেগরিকে জিগ্যেস করে জানতে পারলেন, তিনিও কারণ জানেন না। গেরাসিমভ সিদ্ধান্ত নিলেন, দিন শেষে বাড়ি ফেরার আগে তিনি একবার আন্দ্রেইয়ের বাড়ি ঘুরে যাবেন।

সেইমতো এদিন ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে তিনি সন্ধ্যা বেলায় গিয়ে উপস্থিত হলেন আন্দ্রেইয়ের বাড়িতে। ব্ল্যাক আউটের জন্য এমনিতেই চারপাশ অন্ধকার। তার ওপর বাড়িটা যেন বড় বেশি নিঝুম বলে মনে হল গেরাসিমভের।

দরজা নক করতেই পরিচারিকা দরজা খুলে দিল। তিনি উপস্থিত হলেন বাড়ির ড্রইং রুমে। কয়েকটা মোম জ্বলছে ঘরে। একটা সোফায় বসে আছেন আন্দ্রেই আর তাঁর স্ত্রী নাতাশা। গেরাসিমভকে দেখে তাঁদের মধ্যে কোনো উৎফুল্লভাব প্রকাশ পেল না। দুজনের মুখই অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর। গেরাসিমভ একটু ইতস্তত করে তাঁকে বললেন, 'আপনি আসছেন না দেখে খোঁজ নিতে এলাম। শরীর খারাপ হয়েছে নাকি?'

আন্দ্রেই জবাব দিলেন, 'না।'

'তবে?' প্রশ্ন করলেন গেরাসিমভ। আন্দ্রেই এবার চোখের ইশারায় ড্রইংরুমের একটা দিকে গেরাসিমভের দৃষ্টি আকর্ষণ করালেন। যেখানে টেবিলের ওপর রাখা আছে একটা অল্পবয়সি ছেলের ফোটোগ্রাফ। ছবিটার সামনে সাদা ফুলের স্তবক। মোমবাতি জ্বলছে ছবির সামনে!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নীরবতা ভঙ্গ করে হঠাৎ নাতাশা চিৎকার করে উঠল, 'আপনি কি পারতেন না ইভান আর লক্ষ লক্ষ ছেলের জীবন বাঁচাতে?'

ইভান যে আর জীবিত নেই, সেটা গেরাসিমভ বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু নাতাশা এ কথা বলছে কেন? গেরাসিমভ বললেন, 'ব্যাপারটা জেনে আমিও খুব মর্মাহত হলাম। কিন্তু আমি তো সামান্য নৃতত্ত্ববিদ, রাষ্ট্র প্রধান নই। যুদ্ধ বন্ধ করার ক্ষমতা কি আমার আছে?'

নাতাশা এবার সক্ষোভে কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠল, 'অবশ্যই আছে। আপনিই দায়ী। আপনার জন্যই তো যুদ্ধটা বাধল। তৈমুর লঙের কবরের মধ্যে যখন লেখা ছিল যে তাকে কবর থেকে তুললে তার থেকেও কোনো ভয়ঙ্কর মানুষকে ডেকে আনা হবে তখন কেন আপনি তাকে তুলে আনলেন? আপনিই তো হিটলার ও তাঁর বাহিনীকে ডেকে আনলেন রাশিয়ায়। আপনার জন্যই ইভান চলে গেছে আমাদের ছেড়ে।'

নাতাশার কথাগুলো শুনে গেরাসিমভ চমকে উঠলেন। তিনি বুঝতে পারলেন আন্দ্রেই কোনো সময়ে ব্যাপারটা জানিয়েছিল তার স্ত্রীকে।

নাতাশা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে একই কথা বলে যেতে লাগল, 'কেন আপনি তুলে আনতে গেলেন ওই নিষ্ঠুর লোকটার মৃতদেহ? আন্দ্রেইকে কতবার বলেছিলাম ওই কঙ্কাল নিয়ে কাজ না করতে...'

এটা ঠিক যে তৈমুরের মৃতদেহ কবর থেকে উঠিয়ে আনার পরই হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করেছেন। ব্যাপারটা হয়তো কাকতালীয়। কিন্তু গেরাসিমভের মনে হল যুক্তি তর্ক দিয়ে এ অবস্থায় নাতাশাকে ব্যাপারটা বোঝাতে যাওয়া উচিত হবে না।

সে রাতেও ভোরের দিকে একই স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল গেরাসিমভের। কবর খুঁড়ে তৈমুরের দেহ তোলা হচ্ছে, গাড়িতে ওঠানো হচ্ছে। বৃষ্টি হচ্ছে,

বাজ পড়ছে! আর মধ্যে দাঁড়িয়ে সেই কাজাকি বৃদ্ধ গেরাসিমভের উদ্দেশ্যে বলছে, 'যা ঘটবে তার জন্য তুমিই দায়ী থাকবে, তুমিই দায়ী থাকবে...।'

ঘুম থেকে ওঠার পরও যেন সেই বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর অনেকক্ষণ তাঁর কানে বেজে চলল। গেরাসিমভ ভাবলেন, গত সন্ধ্যায় নাতাশার বলা কথাগুলো তাঁর অবচেতন মনে প্রভাব বিস্তার করার কারণেই তিনি আবারও এই স্বপ্ন দেখেছেন। যথারীতি তিনি সেদিনও ল্যাবরেটরিতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। এবং গ্রেগরিকে নিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন।

অবশেষে তিন দিনের মাথায় তৈরি হল পাঁচশো বছর আগে হারিয়ে যাওয়া এক দুর্মর শাসকের চূড়ান্ত ছবি। ইস্পাত কঠিন সেই মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে স্রষ্টা গেরাসিমভেরই অস্বস্তিবোধ হচ্ছিল। বুকের মধ্যে কাঁপন ধরানো হিমশীতল তৈমুরের চোখের দৃষ্টি। যাই হোক, গেরাসিমভের হাত ধরেই পাঁচশো বছর পর এই প্রথম জেগে উঠল একদা ঘোড়ার পিঠে বিশ্বজয়ী তৈমুর লঙের মুখচ্ছবি।

ছবিটায় ফুটে ওঠা তৈমুরের ভয়ংকর দৃষ্টি গেরাসিমভের মনে অস্বস্তির সৃষ্টি করলেও নিজের কাজ দেখে তিনি বেশ তৃপ্ত। সহকর্মীকে বললেন, 'কালই ফটোগ্রাফ তুলতে হবে। এরপর যত দ্রুত সম্ভব একটা কপি স্তালিনকে পাঠাতে হবে।'

কিন্তু আবার সেই একই স্বপ্ন! সেই বৃদ্ধ তাঁকে বলছে, 'যা ঘটবে তাঁর জন্য তুমিই দায়ী থাকবে।'

পরদিন ঘুম ভাঙার পর কিন্তু সত্যি বেশ অস্বস্তিবোধ করলেন তিনি। বার বার একই স্বপ্ন তিনি কেন দেখছেন!

৭

বেলা দশটা নাগাদ গেরাসিমভ গাড়ি নিয়ে রওনা হলেন তাঁর ল্যাবরেটরির দিকে। পথ-ঘাট এদিন যেন আরও সুনসান। রাস্তায় সামান্য যে কয়জন লোক বেরিয়েছে তাদের সকলেরই চোখেমুখেই স্পষ্ট আতঙ্কের ছাপ। গেরাসিমভ অনুমান করলেন নিশ্চয়ই বড় কোনো ঘটনা ঘটেছে। ছবি তোলার কাজ সাঙ্গ হতে দুপুর হয়ে গেল। তারপর ফিল্ম ডার্ক রুমে ডেভেলপ করতে করতে বিকাল। সহকর্মী গ্রেগরিকে বললেন, 'নোট লেখার কাজটা যদি আজ রাতের মধ্যে শেষ করতে পারি তো কালই ছবিটা সর্বাধিনায়কের অফিসে পাঠিয়ে দেব।'

গ্রেগরি বললেন, 'হ্যাঁ, পাঠাবেন। তবে কমরেড স্তালিন এখন ছবির ব্যাপারে মনোনিবেশ করবেন কিনা তাতে সন্দেহ আছে। আজ সকালেই তো মস্কোতে খবরটা এসে পৌঁছেছে।'

'কী খবর?'

গ্রেগরি জবাব দিলেন, 'লাল ফৌজ মস্কোর পথে জার্মান বাহিনীকে অগ্রসর হতে না দিলেও দখল করার উদ্দেশ্যে গতকাল স্তালিনগ্রাদ শহর আক্রমণ করেছে জার্মান বাহিনী। মরণপণ লড়াই শুরু হয়েছে। সবাই বলছে স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধের ফলাফলই নাকি ঠিক করে দেবে সোভিয়েতের ভাগ্য। এমনকী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নিয়ন্ত্রকও নাকি হয়ে উঠতে পারে স্তালিনগ্রাদের লড়াই।'

একটু চুপ করে থেকে গ্রেগরি বললেন, 'তৈমুরের কবরে লেখা সাবধান বাণী কেমন অদ্ভুতভাবে মিলে যাচ্ছে, তাই না? কবর থেকে কঙ্কালটা উঠিয়ে আনা হল আর সঙ্গে সঙ্গে হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করলেন। মৃত্যুর সংখ্যা যেভাবে প্রতিদিন বাড়ছে তাতে তো আমার মনে হচ্ছে যে নরহত্যার দিক থেকে হিটলার ছাড়িয়ে যাবেন তৈমুরকেও। হিটলার তৈমুরের চেয়েও ভয়ঙ্কর! তৈমুরের কবরে তো লেখাই ছিল, যে এসে উপস্থিত হবে সে তৈমুরের চেয়েও ভয়ঙ্কর।'

গেরাসিমভ প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি ব্যাপারটায় বিশ্বাস করেন? কঙ্কালটা তুলে আনা হয়েছে বলেই যুদ্ধের ঘটনা ঘটল?'

গ্রেগরি ম্লান হেসে বললেন, 'আমি বিশ্বাস করি বা না করি তাতে কিছু যায় আসে না। তবে কাকতালীয় ঘটনা কি বার বার ঘটতে পারে? এই যেমন আমরা কাল তৈমুরের প্রতিকৃতি তৈরির কাজ শেষ করলাম আর জার্মানি কালই, স্তালিনগ্রাদ আক্রমণ করল!'

গেরাসিমভ বুঝতে পারলেন যে তার সহকর্মীর মধ্যেও দোলাচল শুরু হয়েছে।

বিকাল হয়ে গেছে। ব্ল্যাক আউট ঘোষণা হবার পর সন্ধ্যা নামলেই অন্ধকার রাস্তা সুনসান হয়ে যায়। যান-বাহনও বিশেষ পাওয়া যায় না। গ্রেগরিকে বাড়ি ফিরতে হবে তার আগে। তাই এই বাক্যালাপের কিছুক্ষণের মধ্যেই ল্যাবরেটরি ছেড়ে চলে গেলেন। গেরাসিমভের বাড়ি ফেরার তাড়া নেই, কাজ পাগল মানুষ। একটা বড় মোমবাতি জ্বালিয়ে নোট লিখতে বসলেন তিনি।

গেরাসিমভের নোট লেখা যখন শেষ হল তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। মোমের আলোটাও নিভু নিভু হয়ে এসেছে। কাগজপত্র গুছিয়ে রেখে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিলেন ঠিক সে সময় তার চোখ পড়ল তৈমুরের ছবিটার দিকে। কাঠের স্ট্যান্ডের গায়ে একটা বোর্ডে, বোর্ডপিন দিয়ে আটকানো বড় আকৃতির ছবি। ছবির সাইজ জীবন্ত মানুষের মতো। খোলা জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এমন ভাবে সেই মুখের ওপর এসে পড়েছে যে দেখে মনে হচ্ছে সত্যিই একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে ঘরের মধ্যে।

অন্ধকারের মধ্যে শুধু তার মুখটাই দেখা যাচ্ছে। সে যেন চেয়ে আছে ঘরের একটা নির্দিষ্ট দিকে। সেদিকে আলো না পড়লেও গেরাসিমভ জানেন, সেখানে কী আছে। একটা লম্বা টেবিলে কাচের আধারে শায়িত আছে কবর থেকে তুলে আনা তৈমুরের কঙ্কাল। কয়েক মুহূর্ত পরেই গেরাসিমভের মনে হল তৈমুরের ছবিটা যেন তার দিকেই তাকিয়ে আছে! কী হিমশীতল সেই দৃষ্টি! নিজের তৈরি ছবির দিকে তাকিয়ে মুহূর্তের জন্য নিজেই কেঁপে উঠলেন গেরাসিমভ। তার পরই অবশ্য তিনি নিজের মনকে প্রবোধ দিলেন,— এসবই আলো মায়ার খেলা। যাকে বলে দৃষ্টিবিভ্রম।

ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে পড়লেন গেরাসিমভ। জার্মান বোমার আতঙ্কে ফাঁকা রাস্তা। গাড়ি চালিয়ে তিনি কিছুক্ষণের মধ্যে বাড়ি পৌঁছে গেলেন। তিনি যখন গ্যারেজে গাড়ি রেখে সদর দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছেন, সেইসময় শুনতে

পেলেন পাশের ফ্ল্যাট থেকে ভেসে আসা রেডিয়োর শব্দ। যুদ্ধের আলোচনা করতে গিয়ে রেডিয়োতে কে একজন বলছেন, 'মানব জাতীয় ইতিহাসে নাৎসি প্রধান হিটলার হলেন মধ্যযুগের তৈমুর লঙের থেকেও হিংস্র...।'

এ রাতেও ভালো ঘুম হল না গেরাসিমভের। ঘুমের মধ্যে মাঝে-মাঝেই তাঁর চোখে ভেসে উঠতে লাগল তৈমুরের ছবির অস্বস্তিকর চাউনি। বার বার ঘুম ভেঙে যেতে লাগল তাঁর। আর ঘুম ভেঙে তিনি কখনও শুনতে পেলেন আকাশে যুদ্ধ বিমানের উড়ে যাবার শব্দ, কখনও বা সাঁজোয়া গাড়ির চাকার শব্দ। এক সময় ভোর হল। প্রতিদিনের মতো নির্দিষ্ট সময় বাড়ি ছেড়ে তিনি রওনা হলেন ল্যাবরেটরির দিকে।

ল্যাবরেটরিতে ঢুকে চারপাশে তাকিয়ে তিনি দেখলেন সব কিছু আগের মতো। লোহার গরাদ বসানো বড় বড় জানলা দিয়ে সূর্যের আলো ঢুকছে ঘরে। কাচের কফিনে শোয়ানো তৈমুরের দেহাবশেষ, বোর্ডে আটকানো তাঁর ছবি, সব কিছুই দিনের আলোয় অতি স্বাভাবিক বলেই মনে হচ্ছে। তবে তাকে একটা চিঠি দিয়ে গেল কেয়ারটেকার ছেলেটা। ডাকে আসা আন্দ্রেইয়ের ইস্তফাপত্র। তাতে লিখছেন, ব্যক্তিগত কারণবশত তিনি ফরেনসিক ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানীর চাকরি থেকে ইস্তফা দিচ্ছেন। চিঠিটা হাতে দিয়ে গেরাসিমভ কিছুক্ষণ ভাবলেন। এই চাকরি ছাড়ার পিছনে ব্যক্তিগত কারণটা কী হতে পারে? তবে কি আন্দ্রেইও ভাবছে যে তৈমুরের দেহাবশেষ তুলে থানার কারণেই রাশিয়ার বুকে এই ভয়ঙ্কর বিপর্যয় নেমে এসেছে? তৈমুরের দেহাবশেষ নিয়ে কাজ করার ফলে আন্দ্রেই হারিয়েছেন তার প্রিয়জনকে?

কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রেগরি ল্যাবরেটরিতে উপস্থিত হলেন, গেরাসিমভ চিঠি তুলে দিলেন তার হাতে। নির্বিকারভাবে চিঠিটা পড়লেন গ্রেগরি। তারপর বললেন, 'আমিও ভাবছি কাল থেকে আর ল্যাবরেটরিতে আসব না। ছুটি নেব কয়েক মাসের জন্য। আমার বড় ক্লান্ত লাগছে। তাছাড়া...।' এই বলে থেমে গেলেন তিনি।

'তাছাড়া?'

গ্রেগরি জবাব দিলেন, 'ছবিটা তৈরি হবার পর থেকে আমার মনে অস্বস্তি শুরু হয়েছে। রাতে ঘুমোতে পারছি না। ঘুমের ঘোরে এই ভয়ঙ্কর মানুষটার মুখ দেখতে পাচ্ছি।'

গেরাসিমভ মনে মনে চমকে উঠলেন। গ্রেগরির মতো অনুভূতি হয়েছে তারও।

পূর্ব পরিকল্পনামতো যেদিনই তৈমুরের ছবির ফোটোগ্রাফ নোটিসহ স্তালিনের দফতরে পাঠিয়ে দিলেন গেরাসিমভ।

দু-দিনের মধ্যে স্তালিনের অফিসে পৌঁছেও গেল ছবি। স্তালিন খবরটা পেলেন ঠিকই, কিন্তু সে ছবি দেখার সময় বা ইচ্ছা কোনটাই তখন হল না। প্রতিটা মুহূর্ত এখন সোভিয়েতের সর্বাধিনায়কের কাছে মূল্যবান।

নাৎসি বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লাল ফৌজ 'পোড়া মাটি নীতি' গ্রহণ করেছিল। অর্থাৎ লাল ফৌজ পশ্চাদপসরণের সময় ফসলের খেত, খাদ্য ভাণ্ডার, ব্রিজ, রাস্তা এসব ধ্বংস করতে করতে জার্মান বাহিনীকে ক্রমশ ভিতর দিকে টেনে আনছিল যাতে একসময় জার্মানরা খাদ্যের অভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে ও লাল ফৌজের কাছে আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু স্তালিনের এই কৌশল ধরে ফেলেছেন হিটলার। স্তালিনগ্রাদ শহর আক্রমণ করেছেন তিনি।

অক্ষ বাহিনীর প্রায় পাঁচ লক্ষ সেনা একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়েছে স্তালিনগ্রাদ দখলের উদ্দেশ্যে। অনুরূপ সংখ্যায় লাল ফৌজও লড়াই চালাচ্ছে নাৎসি বাহিনীর সঙ্গে। ইতিমধ্যেই প্রায় তিন লাখ সৈন্য নিহত হয়েছে স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে। যার মধ্যে অধিকাংশই রুশ সেনা। রাশিয়ার ইতিহাসে তো বটেই, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসেও এত বড় সংঘর্ষের ঘটনা বিরল।

স্তালিনের এখন ছবি দেখার সময় কোথায়! প্রতি ঘণ্টায় নানা খবর আসছে রণাঙ্গন থেকে। সেই মতো ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে সোভিয়েতের সর্বাধিনায়ককে। স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধই যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে দেবে তা আজ পৃথিবীর সবাই অনুমান করতে পারছে।

৮

গেরাসিমভ যেদিন ছবিটা স্তালিনের দপ্তরে পাঠালেন তার পরদিন থেকে গ্রেগরিও ল্যাবরেটরিতে আসা বন্ধ করে দিলেন। গেরাসিমভ একা আসতে শুরু করলেন তাঁর কর্মক্ষেত্রে। তিনি এই ফরেনসিক ল্যাবরেটরির প্রধান। তাকে আসতেই হবে। তাছাড়া গেরাসিমভের মনের মধ্যে একটা ভাবনাও ছিল যে, একটু ফুরসত পেলেই স্তালিন হয়তো তাকে ডেকে পাঠাবেন অথবা নিদেনপক্ষে তাঁর কাজের প্রশংসা করে একটা চিঠি পাঠাবেন। যেমন তিনি পাঠিয়েছিলেন তৈমুরের কঙ্কালটা মস্কোয় আনার পর।

ল্যাবরেটরি সংলগ্ন গেরাসিমভের চেম্বার। সেই চেম্বার ছেড়ে রোজই একবার তিনি ল্যাবরেটরিতে গিয়ে সেই কাচের বাক্সটার সামনে দাঁড়ান। নিজের আঁকা ছবিটাও দেখেন তিনি। এক এক দিন সে ছবির দিকে তাকিয়ে গেরাসিমভের মনে হয়, আমীরের ঠোঁটের কোণে এক অদ্ভুত হাসির রেশ জেগে আছে। যেন তার আড়ালে জেগে আছে কোনো অপার্থিব রহস্য।

সন্ধ্যা নামার আগেই তাকে ল্যাবরেটরি ছেড়ে বাড়ির দিকে রওনা হতে হয়। কারণ সরকার থেকে নাগরিকদের নিরাপত্তার কথা ভেবে অন্ধকার নামার পর গাড়ি চলাচলের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

সময় এগিয়ে চলে। রোজ নিয়ম করে গেরাসিমভ তার অফিসে আসতে লাগলেন। অফিসে তার সঙ্গী বলতে একজন মাত্র লোক। একই সঙ্গে লোকটা গেট ম্যান, কেয়ারটেকার ও নাইটগার্ডের কাজ করে।

যুদ্ধও ক্রমশ বেড়ে চলেছে স্তালিনগ্রাদে। যুদ্ধের খবরাখবর এখন রাখছেন গেরাসিমভ। বলা ভালো, রাখতে হচ্ছে। কারণ, যুদ্ধের গতিপ্রকৃতির ওপর এখন মস্কোর জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের গতিপ্রকৃতি অনেকাংশে নির্ভর করছে। নাগরিকদের জন্য নানা ধরনের নিয়মকানুন আরোপ করছে সরকার। গেরাসিমভ ডাকঘরে গিয়েছিলেন ব্যক্তিগত কাজে। সেখানে পরিচিত একজনের মুখ থেকে তিনি শুনলেন, স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে নাকি মৃতের সংখ্যা দশ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে।

দেখতে দেখতে শীত চলে এল। মস্কোয় তুষারপাত শুরু হল। গেরাসিমভ-সহ নাগরিকদের অনেকেরই অনুমান ছিল যে, শীতের কামড় স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধের সাময়িক বিরতি ঘটবে। কিন্তু তেমন কিছুই ঘটল না। জার্মানির সিক্সথ রেজিমেন্টের সঙ্গে রেড আর্মির মরণপণ সংঘর্ষ অব্যাহত থাকল।

একদিন বিকালে ল্যাবরেটরি থেকে বাড়ি ফিরছিলেন গেরাসিমভ। অকস্মাৎ তিনি দেখলেন লোকজনের ভিড়ে রাস্তা অবরুদ্ধ। গত দুদিন ধরে অবিশ্রান্ত তুষারপাত হয়ে চলেছে। গেরাসিমভ প্রথমে ভেবেছিলেন যে বুঝি বরফ সরানোর কাজ চলছে। কৌতূহলবশত গাড়ি থেকে নেমে তিনি এগোলেন।

সামনেই একটা বিরাট চত্বর। বিপরীত দিক থেকে রাস্তা এসে মিশেছে সেখানে। গেরাসিমভ দেখলেন বহু নারী-পুরুষ নিশ্চুপভাবে সেখানে দাঁড়িয়ে কোনো কিছুর জন্য যেন প্রতীক্ষা করছে। উপস্থিত মানুষের মধ্যে একটা বড় অংশের মহিলারাও আছেন। ব্যাপারটা কী তা বোঝার জন্য গেরাসিমভও দাঁড়িয়ে পড়লেন।

প্রবল ঠান্ডা বাতাস। ঝিরিঝিরি তুষারপাত শুরু হল। কিছুক্ষণ পর গেরাসিমভ দেখতে পেলেন সার সার সাঁজোয়া গাড়ি এগিয়ে আসছে এইদিকে। গাড়িগুলো এসে চত্বরে দাঁড়াল। অদ্ভুত একটা নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে চারপাশে। গাড়িগুলোর সঙ্গে যেসব সামরিক কর্মীরা এসেছিল তারা গাড়ির ডালাগুলো খুলে দিল। মুহূর্তের মধ্যে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করে ছিটকে উথল ক্রন্দন ধ্বনি।

সাঁজোয়া গাড়ির মধ্যে শোয়ানো আছে সার সার কফিন। মস্কো থেকে স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে গিয়ে যাঁরা নিহত হয়েছেন তাঁদের দেহ বা দেহাবশেষ নিয়ে ফিরেছে গাড়িগুলো।

কবর দেবার আগে মৃতর পরিজনদের কফিনগুলো দর্শন করাবার জন্য গাড়িগুলোকে থামানো হয়েছে এখানে। এমন ক্রন্দন ধ্বনি, হৃদয়বিদারক দৃশ্য ইতিপূর্বে কখনও দেখেননি গেরাসিমভ। কেউ কাঁদতে কাঁদতে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ছে বরফের মধ্যে, কোনো নারী ছুটে যাবার চেষ্টা করছে গাড়িগুলোর দিকে! সামরিক বাহিনীর লোকেরা অবশ্য কাউকেই গাড়িগুলোর কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না। কেউ কেউ আবার বাকশক্তিও হারিয়ে ফেলেছে। পাথরের মূর্তির মতো তারা চেয়ে আছে কফিনগুলোর দিকে। তাদের মধ্যে শুয়ে আছে কারো পিতা-পুত্র-স্বামী বা ভাই।

তুষারপাত এরপর আরও জোরে শুরু হল। সামরিক কর্মীরাও এরপর গাড়িগুলোর ডালা বন্ধ করে প্রবল ক্রন্দন ধ্বনির মধ্যে কবরখানার দিকে যাত্রা শুরু করল। শেষ শববাহী গাড়িটা প্রাঙ্গণ ছেড়ে দূরে মিলিয়ে যাবার পর জমায়েত ভেঙে যেতে শুরু করল। রাস্তা এবার খুলে যাবে।

গেরাসিমভও ভারাক্রান্ত মন নিয়ে গাড়ির দিকে ফিরতে যাচ্ছিলেন। এইসময় তাঁর নজর পড়ল কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে থাকা একজনের ওপর। তার পোশাক মস্কোবাসীদের তুলনায় একটু বেমানান, তাই লোকটা গেরাসিমভের চোখ টানল। লোকটার পরনে একটা আলখাল্লার মতো লম্বা পোশাক, মাথায় একটা গোল টুপি, যে ধরনের টুপি ইসলাম ধর্মাবলম্বী উপজাতিরা ব্যবহার করে। এই ঠান্ডার মধ্যেও লোকটার পায়ে জুতো নেই। তুষারপাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে গেরাসিমভের দিকেই।

লোকটাকে ভালো করে দেখার জন্য থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। আর তার পরই গেরাসিমভ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। আরে, এ সেই উজবেক বৃদ্ধ না? যে কবর থেকে গেরাসিমভ তৈমুরের দেহাবশেষ তুলতে বারণ করেছিল! সে গেরাসিমভকে দায়ী করেছিল! এ-ই তো মাঝে মাঝে হানা দেয় গেরাসিমভের স্বপ্নে!

কয়েক মুহূর্ত মাত্র। গেরাসিমভ লোকটার কাছে পৌঁছবার আগেই সে জনতার ভিড়ে হারিয়ে গেল। তাকে আর দেখতে পেলেন না গেরাসিমভ।

গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে তিনি ভাবতে লাগলেন, তিনি কি ঠিক দেখলেন? কিন্তু কীভাবে সম্ভব? কোথায় সেই উজবেকিস্তানের সমরখন্দের অখ্যাত গ্রাম, আর কোথায় এই মস্কো! সেই বৃদ্ধ এখানে আসবে কীভাবে!

বাড়ি ফিরে ঘরের দরজা বন্ধ করার সময় পাশের ফ্ল্যাট থেকে রেডিয়োর ঘোষণা গেল তাঁর কানে। সংবাদপাঠক বলছেন, 'সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক দেশের অ-কমিউনিস্ট ভাবনার মানুষদের কাছেও অনুরোধ জানিয়েছেন সরকারের পাশে থাকার জন্য।'

গেরাসিমভ বুঝতে পারলেন, পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হচ্ছে। নইলে দেশে সামান্য কিছু যে কমিউনিস্ট মতাদর্শের বিরোধী মানুষ আছেন, তাদের কাছে স্তালিন কখনোই এমন আবেদন রাখতেন না।

কফিনগুলো দেখার পর, তাদের পরিজনদের ক্রন্দনধ্বনি শুনে গেরাসিমভের মন ভারাক্রান্ত হয়েছিল। সে মন নিয়েই শুতে গেলেন তিনি। এদিনও তাঁর স্বপ্নে হানা দিল সেই বৃদ্ধ। স্বপ্নের মধ্যে সে গেরাসিমভের উদ্দেশ্যে স্পষ্টই বলতে লাগল, যা ঘটছে, তা সবই তোমার জন্য। তুমিই দেশের বুকে টেনে এনেছে হিটলারের মতো ভয়ঙ্কর শক্তিকে।'

আর বৃদ্ধের এ কথার সঙ্গে সঙ্গে গেরাসিমভের কানে কখনও বাজতে লাগল স্বজনহারা মানুষদের সম্মিলিত ক্রন্দনধ্বনি, কখনও বা নাতাশার বলা কথাগুলো!

ভোরের আলো ফোটার আগেই ঘুম ভেঙে উঠে বসলেন গেরাসিমভ। অন্ধকার আকাশে উড়ে যাওয়া যুদ্ধ বিমানের শব্দ শুনতে শুনতে গেরাসিমভ ভাবতে লাগলেন, সত্যিই কি তৈমুরের দেহ কবর থেকে তুলে আনার জন্য হিটলার সোভিয়েট আক্রমণ করল? তিনি নিজে কি এই ঘটনার জন্য দায়ী? গেরাসিমভের মনে শুরু হল বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব।

পর পর আরও দুই রাত একই স্বপ্ন দেখে ঘুম থেকে উঠে বসলেন গেরাসিমভ। স্তালিনের কাছ থেকে যদি কোনো বার্তা পাওয়া যায় সেই আশায় তিনি ল্যাবরেটরিতে গেলেন ঠিকই, কিন্তু দিনের বেলাতেও যেন রাতের স্বপ্ন বা ঘটে যাওয়া সত্যি ঘটনাগুলোয় আচ্ছন্ন হয়ে রইলেন গেরাসিমভ।

৯

নির্দিষ্ট সময়েই অফিসে এলেন গেরাসিমভ। তিন রাত ধরে ঘুম হচ্ছে না। নিজের চেয়ারে বসার পর কেয়ারটেকার লোকটা সরকারি মোহর লাগানো একটা চিঠি দিয়ে গেল। খামটা খুললেন গেরাসিমভ। স্তালিনের অধীনস্থ সামরিক বিভাগের চিঠি। তাতে গেরাসিমভকে জানানো হয়েছে, 'এই যুদ্ধের পরিস্থিতিতে সামরিক বাহিনীর লোকেরা সাহায্যের জন্য এলে গেরাসিমভ যেন তাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য করেন।' কী সাহায্য তা অবশ্য বলা নেই চিঠিতে।

চিঠিটা পাঠ করার পর চেয়ারেই বসেছিলেন। বেশ কয়েক দিন প্রায় বিনিদ্র রজনী যাপন করছেন গেরাসিমভ। তাই দিনের বেলাতে অবসন্ন লাগছে শরীর। একটু ঝিমুনি এসে গেছিল তাঁর। এমনসময় কেয়ারটেকার এসে দাঁড়াল তার সামনে। সে বলল, 'আপনাকে একটা কথা জানাবার ছিল। হয়তো ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, তবুও আপনাকে জানিয়ে রাখা প্রয়োজন বোধ করছি।'

গেরাসিমভ ঈষৎ তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে প্রশ্ন করলেন, 'কী ব্যাপার?'

কেয়ারটেকার জবাব দিল, 'কিছুদিন ধরে মাঝ রাতে একটা লোককে এ বাড়ির আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখছি। লোকটার পরনে অদ্ভুত পোশাক। যদিও উঁচু প্রাচীর টপকে এ বাড়িতে প্রবেশ করা কঠিন, সারা রাত আমি জেগেও থাকি, তবুও আমি ব্যাপারটা আপনাকে জানালাম।'

গেরাসিমভ জানতে চাইলেন, 'কেমন দেখতে লোকটাকে?'

কেয়ারটেকার বলল, 'লোকটার পরনে আলখাল্লার মতো পোশাক, খালি পা, চাঁদের আলোতে দেখে মনে হয়েছে বুড়ো লোক।'

চমকে সোজা হয়ে বসলেন গেরাসিমভ। তবে কি তিনি ঠিক দেখেছিলেন সেদিন? লোকটা কি তৈমুরের মরদেহের খোঁজে সুদূর সমরখন্দ থেকে হাজির হয়েছে এখানে?

কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে গেরাসিমভ তাঁর কর্তব্য স্থির করে নিলেন। কেয়ারটেকারের দেখা লোকটা যদি সেই বৃদ্ধই হয়ে থাকে তবে সে কী উদ্দেশ্য নিয়ে এতদূর ছুটে এসেছে তা জানা প্রয়োজন। গেরাসিমভ কেয়ারটেকারকে বললেন, 'আজ সদর দরজা খোলা রাখবে। লোকটা যদি প্রবেশ করে তবে তাকে বাধা দেবে না। তোমার চিন্তা নেই, আজ আমি রাতে ল্যাবরেটরিতে থাকব। আমি দেখতে চাই লোকটা কী উদ্দেশ্য নিয়ে ফরেনসিক ল্যাবরেটরির সামনে ঘোরাঘুরি করছে।'

গেরাসিমভ ল্যাবরেটরিতে গিয়ে ঢুকলেন। যে টেবিলে কাচের আধারে তৈমুরের দেহাবশেষ আছে, সেই টেবিলটাকে তিনি টেনে নিয়ে গিয়ে জানলার কাছে এমন জায়গা রাখলেন, যাতে ঘর অন্ধকার থাকলেও চাঁদের আলোয় দেখা যায়। নিজের বসার আসনটা তিনি ঘরের এক কোণে এমনভাবে রাখলেন, যেখানে চাঁদের আলো পৌঁছবে না।

শীত আর তুষারে আচ্ছন্ন 'ব্ল্যাক অউট' মস্কো শহরে একসময় দিনের আলো নিভে গিয়ে রাত নামল। কিছুটা সময়ের জন্য অন্ধকারে ডুবে গেল সব কিছু। তারপর যখন ধীরে ধীরে চাঁদ উঠতে শুরু করল তখন নিজের চেম্বার ছেড়ে ল্যাবরেটরি রুমের অন্ধকার কোণে গিয়ে বসলেন গেরাসিমভ।

জানলা দিয়ে আসা চাঁদের আলোতে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে কাচের শবাধার। দেখা যাচ্ছে একদা পৃথিবী কাঁপানো শাসক তৈমুরের মাথার খুলি আর হাড়গোড়। সেদিকে চেয়ে কেউ আসবে বলে প্রতীক্ষা করছেন গেরাসিমভ। বাইরে তুষারপাত শুরু হল। সে শব্দ আর মাঝে মাঝে টহলদার সাঁজোয়া গাড়ির শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

তখন মধ্যরাত। একটা অস্পষ্ট পায়ের শব্দ প্রথমে ঘরে ঢুকল। কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। তারপর সেই পায়ের শব্দ গিয়ে দাঁড়াল সেই কাচের কফিনের সামনে। গেরাসিমভ এবার তাকে স্পষ্ট দেখতে পেলেন। চাঁদের আলো এসে পড়েছে তার মুখে। হ্যাঁ, এই সেই উজবেক বৃদ্ধ! সে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে তৈমুরের দেহাবশেষের দিকে।

বৃদ্ধ নিজেকে পরিচয় দিয়েছিল তৈমুরের বংশধর বলে। ব্যাপারটা সত্যি কিনা গেরাসিমভের জানা নেই। তবে গেরাসিমভের অভিজ্ঞ চোখ বুঝতে পারল, শবাধারে থাকা তৈমুরের খুলির সঙ্গে লোকটার খুলির একটা গঠনগত সাদৃশ্য আছে। বৃদ্ধ লোকটা এরপর কী করে তা দেখার জন্য গেরাসিমভ অন্ধকারে নিশ্চুপ হয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ কাচের বাক্সটার দিকে তাকিয়ে থাকার পর বৃদ্ধ একবার ঘরের চারপাশে দৃষ্টি ফেলল, কেউ আছে কিনা দেখার জন্য। অন্ধকারে ডুবে থাকা গেরাসিমভকে সে দেখতে পেল না।

মনে হয় বৃদ্ধ নিশ্চিত হল, ঘরে কেউ নেই ভেবে। লোকটার পিঠে একটা কাগজের বড় থলে। সেটা সে পিঠ থেকে এক হাতে নিল। তারপর অন্য হাত

দিয়ে কাচের বাক্সের ডালাটা খোলার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু চাবি দেওয়া আছে বাক্সে, ডালা খুলল না।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বৃদ্ধ এরপর হাত দিয়ে আঘাত করতে লাগল কাচের বাক্সটা ভাঙার জন্য। এত জোরে বৃদ্ধ সেই বাক্সর গায়ে আঘাত করছিল যে গেরাসিমভের মনে হল বাক্সটা এবার সত্যিই ভেঙে যাবে। কাজেই এবার আর তিনি আর চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। আত্মপ্রকাশ করলেন বৃদ্ধের সামনে।

বৃদ্ধ থেমে গেল। তবে তার বলিরেখাময় মুখমণ্ডলে ভাবান্তর হল না। সে শুধু তাকিয়ে রইল গেরাসিমভের দিকে। গেরাসিমভ তাকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কী ভাবে এখানে এসেছ? কেন এসেছ?'

বৃদ্ধ জবাব দিল, 'সমরখন্দ থেকে পায়ে হেঁটে। আমার পূর্ব পুরুষের দেহ আমি নিয়ে যেতে এসেছি। এই কঙ্কাল আমাকে দাও। আমিই আজই সমরখন্দের পথে রওনা হব। তারপর আমীরের দেহকে সমাধিস্থ করব।'

গেরাসিমভ তার কথা শুনে বললেন, 'এটা তো আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, এই কঙ্কাল এখন সরকারি সম্পত্তি। তাই তোমার হাতে তৈমুরের দেহাবশেষ আমি এভাবে তুলে দিতে পারি না।'

বৃদ্ধ এবার ক্ষুব্ধ স্বরে বলল, 'কেন তুমি বুঝতে পারছ না এই খুলি, এই হাড়গোড় তুমি কবর থেকে তুলে এনেছিলে বলেই যুদ্ধ শুরু হয়েছে? আমীরের কবরে লেখা ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হতে পারে না। তুমি আমার কথা শুনলে না। আমীরের ভবিষ্যদ্বাণীর মতোই তুমি তার চেয়েও ভয়ঙ্কর শত্রুকে ডেকে আনলে এ দেশের বুকে। কত মানুষের মৃত্যু হল তার জন্য! এখনও সময় আছে এ বিপদ থেকে রক্ষা পাবার।'

গেরাসিমভ জানতে চাইলেন, 'কীভাবে?''

বৃদ্ধ বললেন, 'কঙ্কালটা আমাকে দিয়ে দাও। আমি ওটা নিয়ে গিয়ে পূর্বের জায়গায় সমাধিস্থ করব। আমীর আবার ঘুমিয়ে পড়বেন, সব বিপদ কেটে যাবে।'

গেরাসিমভ হেসে বললেন, 'বিপদ যে কেটে যাবে তার নিশ্চয়তা কী?' বৃদ্ধের কথা এখনও ঠিক বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না।

বৃদ্ধ বলল, 'তুমি একবার খুলিটা, হাড়গুলো আমাকে দিয়েই দেখো না তারপর কী হয়!'

গেরাসিমভ বললেন, 'বললাম তো এটা এখন সরকারি সম্পত্তি। তোমাকে দেওয়া যাবে না।'

লোকটা এবার কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর বলল, 'বুঝতে পারছি তুমি এখনও আমার কথা বিশ্বাস করছ না! বিশ্বাস করছ না আমীরের ভবিষ্যদ্বাণী! তাহলে দেখো এবার আমীর তোমার জন্য কী উপহার পাঠান। তারপর যদি তোমার মনে হয় তবে আমীরের দেহটা তার কবরে ফিরিয়ে দিও। আর যদি না দাও তবে জানবে ভবিষ্যতে প্রতিটা মৃত্যু, প্রতিটা বীভৎস ঘটনার জন্য দায়ী থাকবে তুমি।'

বৃদ্ধ আর একটাও কথা বলল না। থলেটা মাটি থেকে তুলে নিল। তারপর ঘর ছেড়ে বেরোবার জন্য রওনা হল। গেরাসিমভ তার পিছন পিছন সদর দরজা পর্যন্ত এলেন। বৃদ্ধ যখন বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় নামতে যাচ্ছে তখন গেরাসিমভ তাকে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার নাম কী?'

লোকটা বলল, 'আমার নাম জেনে কী হবে? শুধু আমার কথাগুলো মনে রেখো।' নেমে তুষারপাতের মধ্যে হারিয়ে গেল বৃদ্ধ।

১০

সেদিন রাতে বৃদ্ধ চলে গেল ঠিকই, কিন্তু তার কথাগুলো যেন দিনরাত বাজতে লাগল গেরাসিমভের কানে---আমীর আবার ঘুমিয়ে পড়বেন। সব বিপদ কেটে যাবে।

এর সঙ্গে সঙ্গেই রাতে তিনি দেখতে লাগলেন নানা দুঃস্বপ্ন। কখনও তিনি দেখতে পান সেই উজবেক বৃদ্ধ আঙুল তুলে বলছে---সব কিছুর জন্য তুমিই দায়ী, কখনও দেখেন স্বামী, সন্তানহারা রমণীরা তাকে অভিসম্পাত করছে, কখনও তিনি শুনতে পান কান্নার রোল! ল্যাবরেটরিতে গিয়ে তাঁর তৈরি ছবির দিকে তাকালেই তার মনে হতে লাগল তৈমুর যেন হাসছেন তাঁর দিকে তাকিয়ে! ওঃ, নিষ্ঠুর হাসি! গেরাসিমভের এক এক সময় মনে হতে লাগল, তিনি কি উন্মাদ হতে চলেছেন? এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তির উপায় কী?

দিন পাঁচেক পর একদিন গেরাসিমভ তাঁর কর্মস্থলে যাবার পরে সেখানে হাজির হল সামরিক বাহিনীর এক ট্রাক। তার থেকে বেশ কয়েকটা বাক্স নামিয়ে সেগুলো নিয়ে লাল ফৌজের এক কর্তা হাজির হলেন গেরাসিমভের কাছে। তিনি গেরাসিমভকে জানালেন বাক্সের মধ্যে কিছু মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে। জার্মান বোমার আঘাতে দেহগুলো এমন খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেছে যে আলাদাভাবে তাদের সনাক্ত করা যাচ্ছে না। বিশেষ কারণে নাকি দেহগুলোকে সনাক্ত করা প্রয়োজন। ফরেনসিক পদ্ধতিতে সেই সনাক্তকরণের কাজটা করতে হবে গেরাসিমভকে। এ-কথা জানিয়ে বাক্সগুলো গেরাসিমভের জিম্মায় দিয়ে চলে গেলেন সেই অফিসার।

যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের দেহ ফরেনসিক পদ্ধতি সনাক্তকরণের কাজ না করলেও নানা দুর্ঘটনায় মৃত্যু হওয়া অনেকের দেহই ইতিপূর্বে ফরেনসিক পদ্ধতিতে গেরাসিমভ সনাক্ত করেছেন। এ কাজ তাঁর কাছে নতুন না। তাছাড়া সরকারি নির্দেশ যখন, কাজটা তো তাকে করতেই হবে।

গেরাসিমভ কেয়ারটেকার ছেলেটাকে ডাকলেন তার সাহায্যে বাক্সের ভিতরে রাখা দেহাবশেষগুলোকে ল্যাবরেটরির রুমের ফ্রিজে ঢোকাবার জন্য। বাক্সগুলো খোলা হতেই গেরাসিমভ চমকে উঠলেন। এগুলো সেনাদের দেহ নয়, বাক্সগুলোর মধ্যে রাখা আছে শিশুদের দেহের খণ্ড-বিখণ্ড নানা অংশ। একটা বাক্সের মধ্যে থেকে তাঁর দিকে ড্যাব ড্যাব করে তখনও তাকিয়ে আছে পাঁচ-ছয় বছর বয়সি একটা বাচ্চার ছিন্ন মুণ্ড!

কোয়ারটেকার ছেলেটা পাশ থেকে বলল, 'শুনছিলাম কদিন আগে নাকি জার্মান যুদ্ধবিমান কিয়েভে একটা বাচ্চাদের স্কুলে বোমা ফেলায় অনেক বাচ্চা মারা গেছে। মনে হয় সেখান থেকেই দেহগুলো আনা হয়েছে।'

ইতিপূর্বে বহু মৃতদেহ নিয়ে ঘাটাঘাটি করেছেন গেরাসিমভ। কারণ, এটা তাঁর কাজের অঙ্গ। কিন্তু এমন বীভৎস দৃশ্য ইতিপূর্বে কখনও দেখেননি। যুদ্ধ সত্যি কী ভয়ঙ্কর! নিষ্পাপ শিশুদেরও রেহাই দেয় না! ছিন্নভিন্ন দেহাবশেষগুলোর দিকে তাকিয়ে কদিন আগের রাতে বৃদ্ধর বলা কথাগুলো গেরাসিমভের কানে বেজে উঠল, দ্যাখো, আমীর এবার তোমার জন্য কী উপহার পাঠান!

গেরাসিমভ তাকালেন তৈমুরের ছবির দিকে। ছবিটা যেন হাসছে তাঁর দিকে চেয়ে! এটাই কি তবে গেরাসিমভকে পাঠানো আমীরের উপহার! গেরাসিমভের যেন মনে হতে লাগল সেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো তার উদ্দেশ্যে বলছে, 'তোমার জন্যই আমাদের মৃত্যু হয়েছে। এই মৃত্যুর খেলা বন্ধ কর তুমি।'

নিজের কান দুহাতে চেপে চেয়ারে বসে পড়লেন গেরাসিমভ। কেয়ারটেকার লোকটা যুদ্ধে নিহত শিশুদের দেহাংশগুলো ফ্রিজে রেখে চলে যাবার পরও একইভাবে তিনি বসে রইলেন! মনকে সংহত করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে করতে ভাবতে লাগলেন যেভাবেই হোক তাকে মুক্ত হতে হবে এই মানসিক সমস্যা থেকে। নইলে তিনি পাগল হয়ে যাবেন।

হঠাৎ একটা ভাবনা তাঁর মাথায় এলো। তিনি ভাবলেন তৈমুরের দেহাবশেষগুলো আর একবার কবরস্থ করে তো দেখাই যেতে পারে যে ওই উজবেক বৃদ্ধের কথা সত্যি কিনা! তাতে যুদ্ধ থামে কিনা!

যদি দেখা যায় যে হাড়গোড়গুলো কবরস্থ করার পরও যুদ্ধ পরিস্থিতির পরিবর্তন হল না তখন এই মানসিক চাপ থেকে মুক্ত হবেন গেরাসিমভ। কেউ আর তাঁর দিকে আঙুল তুলে বলতে পারবে না যে রাশিয়ার এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির জন্য তিনিই দায়ী। তার পর তো তিনি আবারও তুলে আনতে পারবেন কঙ্কালটাকে।

হ্যাঁ, এটাই সংকটমোচনের একমাত্র পথ। কিন্তু এ কাজ করতে গেলে তো তাঁকে রাশিয়ার সর্বাধিনায়ক স্তালিনের অনুমতি নিতে হবে। কিন্তু এই যুদ্ধ পরস্থিতিতে তিনি প্রচণ্ড ব্যস্ত। তা ছাড়া চিঠি চালাচালি অনেকটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। যদি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায় তবে ভালো হয়। কিন্তু এ অবস্থায় তিনি কি সময় দিতে পারবেন নৃতত্ত্ববিদকে? তবুও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য গেরাসিমভ একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলেন সর্বাধিনায়কের দপ্তরে।

আশ্চর্যের ব্যাপার, পরদিনই টেলিগ্রামের জবাব এসে গেল। দু-দিন পর

বেলা দশটায় স্তালিন, গেরাসিমভকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সময়ে দিয়েছেন। তবে সময় বরাদ্দ করেছেন মাত্র তিন মিনিট। টেলিগ্রামটা পেয়ে নেচে উঠলেন গেরাসিমভ। তিনি ভাবতেই পারেননি এই পরিস্থিতিতে এত দ্রুত সময় পাবেন।

গেরাসিমভকে স্তালিনের সাক্ষাতের জন্য সময় দেবার পিছনে আসলে একটা কারণ ছিল। জার্মান বাহিনী স্তালিনগ্রাদে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চালাবার পাশাপাশি লাল ফৌজ ও দেশের জনসাধারণের ওপর মনোবৈজ্ঞানিক চাপ তৈরি করার জন্য অন্য একটা প্রচারও শুরু করেছে। তা হল সোভিয়েতের বিশিষ্ট নাগরিকরা অর্থাৎ বিজ্ঞানী, ডাক্তার, চিন্তাবিদ মানুষরা নাকি আর স্তালিন তথা কমিউনিস্ট পার্টির পাশে নেই।

এ মর্মে রেডিয়োতে মিথ্যা প্রচারও শুরু করেছেন হিটলার। এ ব্যাপারটা কানে আসার পর স্তালিন ভেবেছেন যে এ প্রচারকে রোখা দরকার। কারণ, যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের সঙ্গে মানসিক লড়াইও একটা বড় লড়াই। সে লড়াইতে জয়লাভও অনেক সময় যুদ্ধক্ষেত্রের ফলাফলের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। তাই স্তালিন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে তিনি প্রত্যহ দেশের কিছু বিশিষ্ট অসামরিক ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। এবং সে সংবাদ প্রাভদা ও রেডিয়োয় প্রচার করা হবে। এই কারণেই তিনি বিজ্ঞানী গেরাসিমভকে সাক্ষাতের সময় দিয়েছেন। এর সঙ্গে তৈমুরের প্রতিকৃতির ব্যাপারে কোনও সম্পর্কই ছিল না। তিনি ছবিটা খুলে দেখারই সময় পাননি।

দুটো দিন দেখতে দেখতে কেটে গেল। গেরাসিমভ নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময় হাজির হলেন সোভিয়েতের সর্বাধিনায়কের অফিসে। তুমুল ব্যস্ততা চলছে বিশাল অফিস জুড়ে। অফিসার আর কমরেডদের দম ফেলার ফুরসত নেই। এই যুদ্ধ পরিস্থিতিতে এটাই স্বাভাবিক। গেরাসিমভ দেখলেন তার পরিচিত বিশিষ্ট কিছু বিজ্ঞানীও সাক্ষাৎ করতে এসেছেন স্তালিনের সঙ্গে।

এক সময় স্তালিনের চেম্বারে ডাক পেয়ে গেরাসিমভ সে ঘরে প্রবেশ করলেন। চুরুটে কামড় দিয়ে ভাবলেশহীন মুখে নিজের আসনে বসে রাশিয়ার সর্বাধিনায়ক। তার আপ্তসহায়ক ও একজন ফটোগ্রাফারও উপস্থিত।

স্তালিনকে যথোপযুক্ত সম্ভাষণ জানিয়ে তার মুখোমুখি আসন গ্রহণ করলেন গেরাসিমভ। ফোটোগ্রাফার একটা ছবি তুলল। পরদিন প্রাভদা পত্রিকার ছাপানো জনসাধারণকে দেখাবার জন্য। গেরাসিমভ স্তালিনের উদ্দেশ্যে বললেন, 'কমরেড! তৈমুরের দেহাবশেষ উদ্ধার করে আনার পর আপনার নির্দেশমতো তার প্রতিকৃতি নির্মাণ করে তার ছবি তুলে আপনার দপ্তরে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।'

স্তালিন জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, শুনেছি। ভালো কাজ হয়েছে। তবে ব্যস্ততার কারণে এখনও দেখে উঠতে পারিনি।'

এ কথা বলেই তিনি অন্য প্রসঙ্গে চলে গিয়ে বলতে শুরু করলেন, 'স্তালিনগ্রাদে নাৎসি বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছে আমাদের লাল ফৌজ। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, লালফৌজের হাতে পতন ঘটবে হিটলারের। আপনারা কমিউনিস্ট নেতৃত্ব ও লালফৌজের ওপর আস্থা রাখুন, জন সাধারণকে বলুন তারা যেন ভীত না হয়...।'

স্তালিন যখন তার কথা শেষ করলেন, তখন গেরাসিমভের হাতে আর পনেরো সেকেন্ড সময় বাকি। গেরাসিমভ আর সময় নষ্ট না করে স্তালিনকে বললেন, 'আপনার বার্তা আমি জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছে দেব। আর তৈমুরের কঙ্কাল নিয়ে কাজ যখন শেষ হয়ে গেছে, তখন আপনি অনুমতি দিলে সেটা আবার আগের জায়গায় রেখে আসতে পারি।'

সর্বাধিনায়ক স্তালিনের আর এখন এসব ব্যাপার নিয়ে এত ভাবার সময় নেই। গেরাসিমভের কথা শুনে তিনি বললেন, 'তেমন মনে হলে তাই করুন। আমি অফিসকে বলে দিচ্ছি আপনাকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করার জন্য। তারা আপনাকে প্রয়োজনীয় কাগজ দিয়ে দিচ্ছেন।'

সাক্ষাৎকার শেষ হয়ে গেল। স্তালিনের চেম্বার থেকে বেরিয়ে এলেন গেরাসিমভ। কিছুক্ষণের মধ্যে সরকারি আদেশনামাও পেয়ে গেলেন। গাড়িতে করে মস্কো থেকে সমরখন্দ পৌঁছতে অনেক সময় লাগবে। তাই তিনি ছুটলেন বিমানবন্দরের দিকে। স্বয়ং স্তালিনের দপ্তর থেকে আসা গেরাসিমভকে সাহায্য করার নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের ছিল না। তবে তারা গেরাসিমভকে জানিয়ে দিলেন সমরখন্দে যেতে হলে বিমানকে স্তালিনগ্রাদের ওপর দিয়েই উড়ে যেতে হবে। এবং এক্ষেত্রে প্রবল বিপদের সম্ভাবনা আছে। গেরাসিমভ তাদের জানিয়ে দিলেন, যা ঘটার ঘটবে। কিন্তু সেদিনই তিনি দেহাবশেষ নিয়ে রওনা হতে চান কাজাকিস্তানের উদ্দেশ্যে।

বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ চার আসনের একটা ছোট ফকার বিমান বরাদ্দ করলেন তাঁর জন্য। ঠিক হল, অন্ধকার নামলে রাতের বেলা বিমান আকাশে উড়বে। তাতে বিপদের সম্ভাবনা কিছু কমতে পারে।

গেরাসিমভ তার ফরেনসিক ল্যাবে ফিরে গিয়ে একটা ট্রাঙ্কের মধ্যে পলিথিন ব্যাগে ভরে ফেললেন তৈমুরের দেহাবশেষ। তারপর অন্ধকার নামার পরে সেই ট্রাঙ্ক নিয়ে ফিরে এলেন বিমানবন্দরে। কিছু সময়ের মধ্যেই বিমান আকাশে উড়ল। বিমানচালক গেরাসিমভকে বললেন, 'হয়তো এটাই আমাদের শেষ যাত্রা হতে পারে।'

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, বিমান যখন স্তালিনগ্রাদের ওপর দিয়ে উড়ে গেল তখন একটাও রকেট বা অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গানের গুলি ছুটে এলো না বিমানের দিকে। নীচের যুদ্ধবিধ্বস্ত শহরটা কেমন যেন নিঝুম, ঘুমন্ত। শেষ রাতে সমরখন্দের মাটিতে নিরাপদে অবতরণ করল ছোট্ট বিমান।

ভোরের আলো ফুটতেই সমরখন্দের বিমানবন্দর থেকে কিছু সরকারি লোককে সঙ্গে করে ট্রাঙ্ক গাড়িতে চাপিয়ে গেরাসিমভ ছুটলেন সেই ছোট্ট গ্রাম গুল-ই-আমীরের উদ্দেশ্যে। সেখানে গিয়ে প্রথমেই খোঁজ করলেন সেই উজবেক বৃদ্ধের। কিন্তু কেউ তার খোঁজ দিতে পারল না। যাই হোক, কিছু গ্রামবাসীর সাহায্য নিয়ে ইসলাম রীতি মেনে একদা পৃথিবী কাঁপানো শাসক তৈমুর লঙের কঙ্কাল গেরাসিমভ পুনরায় সমাধিস্থ করলেন তাঁর পুরোনো কবরের মাটিতেই। এ কাজ মিটতে সারাদিন কেটে গেল। মধ্যরাতে তিনি আবার বিমানে উঠে বসলেন মস্কো ফেরার জন্য।

ক'দিন ধরে প্রচণ্ড ধকল আর উত্তেজনা গেছে গেরাসিমভের শরীরের ওপর দিয়ে। বিমানে ওঠার পর ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তিনি। শেষ দিকে তিনি স্বপ্ন দেখলেন, তৈমুরের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেই উজবেক বৃদ্ধ। মুখে হাসি তার। সে হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছে গেরাসিমভকে।

একটা ঝাঁকুনি খেয়ে গেরাসিমভের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি দেখলেন, ভোরের আলো ফুটে গেছে। বিমান অবতরণ করেছে মস্কোর মাটিতে। বিমানবন্দরে পা রাখার পর গেরাসিমভ অবাক হয়ে দেখলেন বিমান বন্দরে ভোরবেলা একটা আনন্দের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। সবার মুখেই খুশির রেশ। পরক্ষণে এর কারণ জানতে পেরে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন গেরাসিমভ!

খবর এসেছে গতকাল স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধ লাল ফৌজের সেনাপতি মার্শাল জুকভ অবশেষে পরাজিত করতে সফল হয়েছেন নাৎসি বাহিনিকে। সমাপ্ত হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সব থেকে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ—স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধ।

লেখকের নিবেদন : পৃথিবীর যেসব ব্যাখ্যাহীন আশ্চর্য ঘটনা দেখা যায় তার মধ্যে এ ঘটনা অন্যতম। কেউ বলেন পুরো ঘটনাটাই ছিল অলৌকিক, আবার কেউ বলেন কাকতালীয়। তবে এ ঘটনা সত্যি যে তৈমুর লঙের কবর থেকে তাঁর দেহাবশেষ উদ্ধার করার পর কবরে ভবিষ্যদ্বাণীর মতোই তার থেকেও বড় বিপদ এসে উপস্থিত হয়েছিল রাশিয়ায়। তৈমুর যত লোককে হত্যা করেছিলেন তার থেকেও অনেক বেশি লোক নিহত হয়েছিলেন স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে। এই সংখ্যা দু-কোটিরও বেশি। আবার তৈমুরের দেহাবশেষ পুনরায় সমাধিস্থ করার পরই স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে হারতে-হারতে শেষ পর্যন্ত সফল্য প্রায় লাল ফৌজ। স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধ ছিল হিটলার আর স্তালিন দুজনের কাছেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ। স্তালিনগ্রাদে লাল ফৌজ জয় লাভ করার ফলে বদলে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতিপ্রকৃতি। কিছুদিনের মধ্যেই পরাজিত হন ও আত্মহত্যা করেন বিশ্বত্রাস হিটলার। বার্লিনের দখল নেয় লালফৌজের নেতৃত্বে মিত্র শক্তি। সমাপ্ত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। পৃথিবীর ইতিহাসের আর এক বিশ্বত্রাস শাসক তৈমুর লঙ হয়তো বা তখন হাসছিলেন তার কবরে শুয়ে। বর্তমানে তৈমুর লঙের যে ছবিটি বিশ্ববাসী দেখতে পান, তা নৃতত্ত্ববিদ গেরাসিমভেরই আঁকা প্রতিকৃতি।

অনিতা অগ্নিহোত্রী

গাছেরা গেল বেড়াতে

বিকেলের হলুদ রোদ এসে পড়েছে বনের ঘাসে। বাঁকা হয়ে। আজকাল দুপুরের পর প্রায়ই মেঘ করে। রোদ আসে না। সূর্য ডুবে যায় গাছ-গাছালির পিছনে, আকাশে আলো থাকে, লাল, বেগুনি, কমলা। কিন্তু বনের মধ্যে ছায়া ছায়া অন্ধকার। মাদুর ডিহার এই বন খুব পুরোনো। কত পুরোনো তা নিয়ে নানা জনের নানা মত। গ্রামের বুড়ো মানুষরা বলেন, এ বন রামায়ণের সময়কার। রাবণ যখন সীতামায়িকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর সিঁথি-মৌর এখানে ফেলে যান, আর জটায়ুর গা থেকে খসে পড়েছিল এক গোছা পালক। সে সব গ্রামের প্রাচীন সীতা মন্দিরে বিগ্রহের আসনের নীচে পোঁতা আছে। মেয়েরা বলে, এ বন কিছু না হোক, দুশো বছরের পুরোনো। আমাদের শ্বশুর-শাশুড়ির মুখে শুনেছি, তাঁদের দাদা, পরদাদারা ওই বনে খেলতে যেতেন।

ইদানীং মাদুরডিহার বনের উত্তর-পশ্চিম দিকটা পুরোনো, মরা গাছের জন্য একটু ক্ষয়া মতো হয়ে গেছে। সেখানে অনেক লতা-ঝোপ, উইয়ের ঢিপি হয়েছে। কিন্তু গাছ বিশেষ নেই। তাই জঙ্গল বিভাগ বনসৃজনের নামে বছর দশ হল অনেক গাছ লাগিয়েছে। তার মধ্যে আম জাম আতা পেয়ারা আছে, আবার আছে ইউক্যালিপটাস, আকাশলীনা ইত্যাদি লম্বা ঢ্যাঙা

ছবি মৃণাল শীল

গাছ। তবে সারি সারি লাগানো সে সব গাছ দেখলেই মানুষের হাতে লাগানো বন আর আপনা থেকে অনেক বছর ধরে তৈরি হওয়া বনের তফাত বোঝা যায়। এছাড়াও পুরোনো বনের মধ্যে একটু ফাঁক পেলে নতুন গাছ গজিয়ে ওঠে। হয়তো পাখির ঠোঁটে করে এনে ফেলা বীজ থেকে, কিংবা গাছের ফুলের পরাগ থেকে মৌমাছি প্রজাপতির তৈরি গাছপালা। মুশকিল হয়েছে দশ-পনেরো কুড়ি-তিরিশ বছরের এই সব অল্পবয়সি গাছেদের নিয়ে। তারা কেবল নড়েচড়ে বেড়াতে চায়। মাটির স্বাদ বদলাতে চায়। আকাশটা দেখতে চায় অন্য কোনও দিক থেকে। পৃথিবী কেমন করে ঘুরছে, জানতে চায়। গাছেরা চলেফিরে বেড়ালে সবার অসুবিধে, তারা বুঝতে চায় না। নিজেদের মধ্যে গুজগুজ করতে থাকে। পাখি প্রজাপতি ফড়িং তারা সব শোনে আর বনদেবীর কাছে পৌঁছে দেয়। এইভাবে বর্ষা গিয়ে শরৎকাল আসে।

যাই হোক, এমন এক শরতের বিকেলে বনদেবী তরুপ্রাণা সদ্য-বোনা এক কচি কলাপাতা রঙের খাদি শাড়িতে সেজে এসে দেখলেন, রোদ ঝলমল বন। কিন্তু, সব এত চুপচাপ কেন? পাখির ডাক নেই, বাদুড়ের ডানা ঝটপট নেই, গাছের পাতা নড়ছে না, এমনকী খয়েরি যে মেছো প্যাঁচাটা চ্যাঁ-চ্যাঁ করে বড় গাছের নীচু ডালের জালে উড়ে বেড়ায়, তারও দেখা নেই। কী হল, সবাই কি রাগ করেছে নাকি? বনের ভিতর থেকে ছুটতে ছুটতে এল ময়ূর! বলল, গাছেরা সব বনধ ডেকেছে আজ, বুঝলে? সে আবার কি? দাবিদাওয়া আছে নাকি কোনো?

নেই আবার? ময়ূর পেখম মেলে আনন্দে একটু নেচে নিল।

ছোট গাছেরা, সরু লম্বা গাছেরা তো সেই কবে থেকে বলছে, তারা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বিরক্ত। তাদের জায়গা পাল্টাপাল্টি করতে দিতে হবে, দিতেই হবে। বড়সড় বুড়ো গাছেরা তাদের বোঝাচ্ছে, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকাই ভালো। শিকড় জল পায়, মাটির গুণ পায়। আর আকাশে তো ডালপালা মেলা আছেই। তাতে মোটেই খুশি নয় ছোটরা। 'থাকব নাকো বদ্ধ ঘরে দেখব এবার জগৎটাকে'—স্কুলের ছেলেমেয়েরা চেঁচিয়ে কবিতা পড়ে। সেই সব শব্দের টুকরোটাকরা তাদের মাথায় ঢুকে গেঁথে গেছে। বনের বাইরেই যে গ্রামের স্কুল। তাতে কি! গাছেরা একটু বেশিই শোনে আরো অনেক প্রাণীর মতো। বনদেবীর মাথায় লম্বা সবুজ রঙের চুল। সেই খোঁপাতে আবার শালুক ফুল গোঁজা। খোঁপাটা খুলে, ফুলটা দাঁতে কামড়ে গুটিয়ে নিতে নিতে বললেন, তাই হোক, তবে। যে সব গাছেরা বেরোতে চাও, যাও যেখানে পারো। তবে মনে রেখো, ফেরার সময় নিজের জায়গাটাই যে ফেরত পাবে তেমন নয়, অন্য কোনও গাছ সেখানে দাঁড়িয়ে গেলে ঝগড়া কি ধাক্কাধাক্কি চলবে না। আর চাষের খেতে গিয়ে হাজির হয়ো না যেন বনের গাছেরা। চাষি কুড়ুল চালালে মারা পড়বে। এই ব্যবস্থা কিন্তু একবারের জন্যই, তার মানে এই নয় যে গাছেরা রোজ ইচ্ছেমতো হেঁটে বেড়াবে। মানুষদের চোখ পড়লে বনের গাছেদের সর্বনাশ, মনে রেখো।

বনদেবী চলে গেলেন ডুমুর নদীর ধারে। সেখানে পাড়ে রাখা উল্টোনো ডিঙির উপর বসে কচকচ করে দুটি ডাঁসা পেয়ারা চিবোবেন, সেটাই ওঁর রাতের খাবার। সন্ধের অন্ধকারে সব ঢাকা পড়ে গেলে নদীর জলের শব্দ শুনতে শুনতে পেয়ারা খাওয়া— আহা, কী যে মনোরম। কাল সকালে কী যে হবে ভাবতেই হৃৎকম্প হচ্ছে। ফিরে গিয়ে সবচেয়ে পুরোনো বাওবাব গাছটার মোটা ডালে পাতা ঘাসের বিছানায় ঘুমিয়ে পড়া। তবে আজ রাতে কি আর ঘুমোনো যাবে। যা ভেবেছেন ঠিক তাই! তিনি বন ছেড়ে যেতে না যেতেই আরম্ভ হয়ে গেছে গাছেদের নেতা, লম্ফঝম্প, হা হা হু হু হাসা হাসি! কে বলবে এই বন এত সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল থম মেরে। এখন সবাই নিজেদের পোঁটলাপাতি গোছাচ্ছে, তার মানে পাখির বাসা, ডিম, কুটো কাটা, মৌচাক, বোলতার বাসা যা আছে। ছোট গাছের সেসব ধনসম্পত্তি খুব বেশি নেই। আছে বড় সড় গাছেদের। তবু গাছ কমে গেছে সব এলাকায়। তাই যে যেখানে পেরেছে জায়গার দখল নিয়েছে। গাছেরা নড়াচড়া করলে পাখিরাই বা কি করে ঘুমোয়। ঝিঁঝি পোকারা খুব উত্তেজিত হয়ে ডেকে ডাকছে, কারণ এক্ষুনি মাটির ওপর থেকে রাখা লতাগুল্ম শ্যাওলার পুরু গালচেটিতে টান পড়ল বলে। পাখিরা অস্থির হয়ে অন্ধকারে পাখা ঝাপটাচ্ছে। এই সময় তারা ডালে বসে ডানায় মাথা গুঁজে ঘুমিয়ে নেয়। আজ সবার মনে ছটফটানি। কোন গাছ কখন চলতে শুরু করে তার ঠিক কি?

ভোরের আলো ফোটার আগেই, আধো অন্ধকারে কিছু জোয়ান এবং গুণ্ডামতো গাছ আগেভাগে বেরিয়ে ফাঁকা মাঠে দাঁড়িয়ে পড়েছে। জায়গা দখল অভিযান। ওদের নাকি কষ্ট হচ্ছে ভিড়ের মধ্যে। ভাবো। ওরা এখন যেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, সেটা একটা পতিত নাবাল জোতের জমি। বর্ষায় জল ভরা থাকে। এখন শুকনো। দশ-বারোটা গাছ বেশ ছড়িয়ে দাঁড়িয়েছে, কাজেই ন্যাড়া জমিটা দেখাচ্ছে সুন্দর সবুজ। এদের মধ্যে চারটে আবার সেগুন গাছ, বন বিভাগের লাগানো, বনের মধ্যে নিশ্চিন্তে রোদ জল বাতাস পেয়ে দিব্যি বড় সড় হয়েছে। সেগুন কাঠের অনেক দাম। গাছেরা নিজেরা কি তা জানে?

দিনের আলো ফোটার পর আরো আরো গাছ নিজেদের পছন্দমতো জায়গা বেছে কেউ খেতের আলে, কেউ ডুমুর নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। চাষিরা হালবলদ নিয়ে খেতে যাচ্ছে, মানুষজন নদীর খেয়া পেরিয়ে কাজে চলেছে, ছেলেমেয়েরা কল-কল করে কথা বলতে বলতে স্কুলের পথে। এরা কেউ কোনোদিন গাছেদের চলতে দেখেনি। গাছেরাও চেষ্টা করছে মানুষের চোখ এড়িয়ে এধার করতে, কে কখন চলন্ত গাছ দেখে আঁতকে উঠে ভিরমি যায়, ঠিক কি? তবে আলের উপর এতগুলো গাছতো ছিল না গো, বলাবলি করছে হাটেবাজারে যাওয়া লোকজন। নদীর ধারে গাছেদের হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে পড়া দেখে স্নানে আসা গৃহস্থ অবাক। বালি মাটিতে এই সব গাছ গজাল কবে?

সবচেয়ে মুশকিল হয়েছে গাছেদের সঙ্গে চলে আসা পাখি, তাদের বাসা, কীটপতঙ্গ শুঁয়োপোকা প্রজাপতিদের। বনের মধ্যে সবাই কেমন জড়িয়ে মড়িয়ে থাকে, এ গাছের ডাল ও গাছের কুরিতে লেগে যায়, লতারা সব গাছে চড়ে সবুজ শেকল বানিয়ে ফেলে, কেমন একটা ভিজে ভিজে ভাব বড় গাছেদের কোলে, তারাও এমন সব গাছেদের আশেপাশে গজাতে দেয়, যাদের সঙ্গে স্বভাবের মিল। এখন হঠাৎ ফাঁকা, অচেনা জায়গায় একটা করে বেখাপ্পা গাছ, তাদের ডালে ধারালো রোদ পড়ছে, হাওয়া শনশনিয়ে বইলে গাছ নড়ছে, পাখিদের বাসা নীচে পড়ে গিয়ে ছত্রখান হচ্ছে।

বাওবাব গাছ তিনটে এই বনের সব চেয়ে পুরোনো বাসিন্দা। তিনশো সাড়ে তিনশো বছর তো হবেই বয়স। নৌকায় সমুদ্র পথে যখন ওলন্দাজরা এসেছিল, তাদের সঙ্গে এসেছিল বাওবাবের চারা। এখনও ভারতের পশ্চিম উপকূলে বাওবাব আছে বেশ ক'টা। আর অজস্র আছে আফ্রিকার জঙ্গলে। মস্ত গুঁড়ি, ডালপালা ছড়ায় বহু দূর। একটা বাওবাব যেন একখানা ছোটখাটো গ্রাম। তারই একটার নীচু ডালে বনদেবীর ঠিকানা। ডাল বেয়ে কাঠবিড়ালী, উদবেড়াল, কাঠ পিঁপড়ে, শুঁয়োপোকাদের যাওয়া-আসা সারা দিন। আর পাখির ডাক এত রকমের যে মনে হয় গানের আসর বসেছে। আজ একটা কোকিল কেঁদে কেঁদে বন তোলপাড় করে দিচ্ছে। কাকের বাসায় ডিম পেড়েছিল, সেই বাসাশুদ্ধু গাছ কোথায় চলে গেছে কোকিল আর খুঁজে পাচ্ছে না। পথে অনেক ফাটা ডিম পড়ে আছে নাকি, তাই কোকিলের কান্না।

বুড়ো বাওবাব গুনগুন করে বলছে, কত দিন হয়ে গেল, প্রথমে ছিলাম আমরা তিনজন। আমাদের বলত দত্যি গাছ। ফাঁকা মাঠ ছিল ওই আকাশ

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

যেও বনে, মনে মনে

সারি সারি কত গাছ, পাখিদের কলতান,
চারিদিকে এত শোভা, কার সব বলো দান?
শিল্পীর ছবি যেন, সবুজের আলপনা,
রোদ্দুরে গাছ-ছায়া, স্বপ্নের জাল-বোনা!
হলুদেতে ছাপছোপ, নেই বাঘ ডোরা-কাটা,
এই বনে থাকে না তো গাছেদের গোড়া-কাটা!
পাখি-চোর, গাছ-চোর নেই কেউ জঙ্গলে,
মানুষের আনাগোনা দঙ্গলে দঙ্গলে!

বনে যেও মনে মনে, ভালো থাক গাছ-পাখি,
সুরে গানে মূর্ছনা, পাখিদের নাচ বাকি!

প্রদীপ আচার্য

গুরু গুগলদা

পাক পরমাণু বোমা ফাটাল যে পাল্টা
বালুচের ভূগর্ভে, কত ছিল সালটা?
ইডেনে গাভাসকার করলেন সেঞ্চুরি
কত সালে, কোন ম্যাচ, কে ছিলেন তাঁর জুড়ি?
নীল আর্মস্ট্রং থেকে কল্পনা চাওলার
মহাকাশে, চাঁদে পা পড়েছিল কার কার?
কত সালে হয়েছিল ক্যালকাটা জিমখানা?
জামশেদ নাশিরির হালফিল কী ঠিকানা?
পিট সিগারের মোট কতগুলি গান আছে?
পিকাসোর রং-তুলি রাখা আছে কার কাছে?
মেট্রোরেলের মাটি খোঁড়া শুরু কত সালে?
নেতাজি কি কখনো গিয়েছেন বরিশালে?
দিনে তাজে ক্ষণে ক্ষণে কটা রঙ বদলায়?
দুই জার্মানি কবে এক হয়ে মিশে যায়?
...নে আছে? কত সালে মাসুদুর রহমান
ইংলিশ চ্যানেলটা হেলায় পেরিয়ে যান?
সোভিয়েত কত সালে ভেঙে হল খান খান?
কত সালে ইউসুফ মালালা নোবেল পান?
...শ্নের জাল ছিঁড়ে অন্তর্জালে যা
...র উত্তর পাবি, গুরু তো গুগলদা।

ছবিঃ সৌজন্য চক্রবর্তী

পর্যন্ত। তারপর কত গাছ এল। দেখতে দেখতে মস্ত একটা বন। আমরা কোথাও যাইনি কোনো দিন। তাই কোথায় কী হচ্ছে দেখতে পাই না। তবে খবর তো সব পাই, পাখিরা খবর আনে, বাতাস আনে। বনের মধ্যে ঢুকতে সাহস লাগে, দল লাগে। দুষ্টু মানুষ তাই দশবার ভাবে ঢোকার আগে। আর যারা আসে,মধু নিতে, শুকনো কাঠ কুড়োতে, কেউ গাছের ছাল বাকলও নেয়। তারা আমাদের ক্ষতি করে না। তবে বাইরে ফাঁকায় গাছকে একা পেলে মানুষ কী করবে, বলা শক্ত।

ময়ূর কাল খুশি ছিল। আজ এল হাঁফাতে হাঁফাতে। দামি সেগুন গাছগুলো চাষিরা ছাড়বে না, কাটার জন্য কুড়ালের ধার পরখ করছে। না হলে বিজলিতে চলা করাত আছে। নদীর ধারের গাছগুলোও মারা পড়বে। ওখানে এমনিতেই বালি মাটি। গেল বলে সবকটা গাছ! বোকার দল।

সে কি, কেউ ঠেকাবে না ওদের?

ময়ূর বলল, স্কুল থেকে ফেরা ছেলেমেয়েরা হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে পড়েছে, গাছ কাটতে দেবে না।

পঞ্চায়েত অফিস থেকে পুলিশকে বলছে, পুলিশ বলছে জঙ্গল ডিপার্টকে। কিন্তু কিছু নড়ছে বলে তো মনে হচ্ছে না।

বনদেবী তরতরিয়ে বাওবাবের মগডালে গিয়ে বসলেন। কোথায় সকালে উঠে একটু শিশিরে চোখ মুখ ধুয়ে মন্দার ফুলের তাজা মধুর সঙ্গে কাঁচা হলুদ খেয়ে দিন আরম্ভ করবেন, না এত হইচই। গাছের মাথা থেকে অনেকটা দূর দূর দেখা যায়। খেত-খামার, আলের পথ, নদীর ধার। চোখের উপর হাত দিয়ে দেখে তরুপ্রাণার তো চমকে ওঠার পালা। গাছেরা করেছে কী? যেখানে পেরেছে ফাঁকা জায়গা দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছে। জমি কেমন,বসত কোথায় কিছুই দেখেনি। ধীরে ধীরে লোক জড়ো হচ্ছে। তাদের কাছে কুঠার, সড়কি, কোদাল। যে গাছ কালও ছিল না, তাকে আজ কেটে ফেললে কেউ জানতে পারবে না, কোনো খাতায় এদের হিসেব নেই।

একরাশ পাতা মুঠো করে ফুঁ দিলেন বনদেবী। সমুদ্রের শাঁখের মতো গমগম করে উঠল তার স্বর। প্রতিধ্বনি হতে লাগল চারদিকে। গাছেরা শুনল, যে যেখানে আছ, মাদুর ডিহার জঙ্গলে ফিরে এসো। এক্ষুনি। নিজের নিজের জায়গায় ফিরে আসবে। অনেক বেড়ানো হয়েছে।

অমনি মানুষের দেখল শয়ে শয়ে গাছ দুলে দুলে ছুটে দৌড়ে বনের দিকে ফিরছে। নদীর ধার, আলের রাস্তা, চাষের ক্ষেত থেকে। আর তাদের মাথার উপর চ্যাঁ-চ্যাঁ করতে করতে উড়ে আসছে নানা রঙের পাখিরা। বনটিয়া, সবুজ পায়রা, ধনেশ, বালি হাঁসেরা। বাদুড়রাও জঙ্গলে ফিরছে। তাদের অবশ্য পাখি বললে রাগ করে। সবক'টা গাছ লক্ষ্মী ছেলেমেয়ের মতো নিজের নিজের জায়গা খুঁজে দাঁড়িয়ে গেল। বেড়াবার শখ মিটেছে? স্কুলে ক্লাস টিচারের কাছে 'কি, হোমটাস্ক করে এনেছ তো?' শুনলে বাচ্চারা যেমন একসঙ্গে 'হ্যাঁ' বলে ওঠে, গাছেরাও তেমন সবাই মিলে চেঁচিয়ে 'হ্যাঁ' বলে উঠল। স্কুলের ছেলেমেয়েরা বাড়ি ফিরে গেছে। ছুটির দিন ওদের জঙ্গলে বেড়াতে ডাকতে হবে, বনদেবী ঠিক করেছেন। গাছেদের প্রাণ বাঁচিয়েছে ওরা। দুষ্টু লোকেরা ব্যাজার মুখে কুড়ুল টুড়ুল সিন্দুকে তুলে রাখতে গেছে। হাতের সামনে দিয়ে গাছ হেঁটে চলে যায়, কেউ কখনো দেখেছে?

শরৎকাল গিয়ে হেমন্ত এল। গ্রামের লোকেরা দেখল, মাদুরডিহার বনটা কেমন বড় সড় হয়েছে লম্বা চওড়ায়। গাছেরা একটু হাত-পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়েছে কিনা, কেউ আবার ঝুপসি চুল মেলে আয়েস করার চেষ্টা করছে। দু-একটা গাছ পা (শিকড়) লম্বা করে ঘুমোবার তালে আছে। সেই জন্য। **কিন্নরী উকিল**

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য

প্রিমুলা

পয়লা বৈশাখ গেল এই সেদিন। গ্রীষ্মকাল হলেও জলপাইগুড়ির বাতাসে রাতের দিকে এখনও ঠান্ডা শিরশিরে আমেজ জড়িয়ে থাকার কথা। কিন্তু এবার বৈশাখ পড়তে না পড়তেই গনগনে হাওয়া পাগলা ঘোড়ার মতো আগুনের হলকা ছড়াতে ছড়াতে ছুট দিচ্ছে কখনও পুব থেকে পশ্চিমে, কখনও উত্তর থেকে দক্ষিণে। সেদিন উদ্দালক গলায় বিরক্তি মিশিয়ে বলল, আর পারা যাচ্ছে না। এই বিচ্ছিরি গরমে পচে মরার চাইতে কোনও পাহাড়-টাহাড়ে গিয়ে ক'দিন গা জুড়িয়ে আসি চল। আমি বললাম, ছোটখাটো রুটে ট্রেকও তো করা যায়। উদ্দালকের কথাটা মনে ধরল। বলল, আইডিয়াটা মন্দ দিসনি।

উদ্দালক আর আমি ব্যাঙ্কার। থাকি জলপাইগুড়িতে। একই ব্রাঞ্চে পোস্টেড। দুজনেই ব্যাচেলর। আমরা যে শুধু পাহাড় ভালোবাসি তা-ই নয়, সময় সুযোগ হলেই দুজনে ট্রেক করতে বেরিয়ে পড়ি রুকস্যাক কাঁধে।

বাড়ি ফিরে ক্যালেন্ডার দেখলাম। সপ্তাহান্তে ন্যাশনাল হলিডে। দু-একটা দিন ছুটি প্রিফিক্স করলেই লম্বা একটা স্পেল হয়ে যায়। উদ্দালকের সঙ্গে কথা বললাম। স্থির হল আমরা গ্যাংটক যাব প্রথমে, সেখানে ফুরবা চামলিং থাকে। তার বাতলে দেওয়া প্ল্যান অনুযায়ী ওদিকেই কোনও পাহাড়ে ট্রেক করব। চামলিংও শখের ট্রেকার। ট্রেক করতে গিয়েই একবার আলাপ হয়েছিল হাসিখুশি পাহাড়ি যুবকটির সঙ্গে। এমজি রোডে ওদের গাড়ির শোরুম।

ছবি অমিত সেন
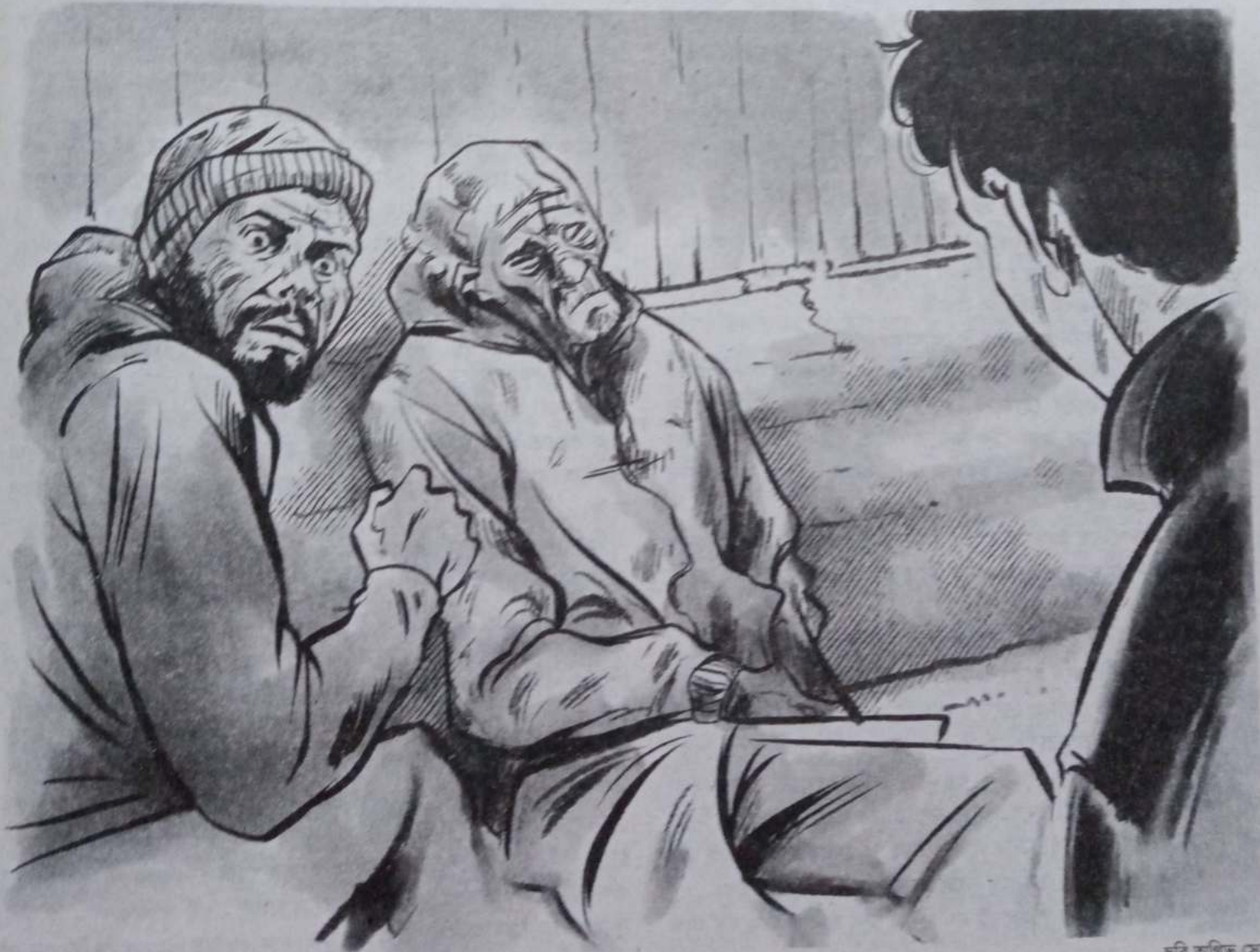
চামলিং বলল, তোমরা গ্যাংটক চলে এসো আগে। ফাঁকা থাকলে আমিও সঙ্গ দেব।

জলপাইগুড়ি থেকে বাস ধরে শিলিগুড়ি এসে গ্যাংটকগামী শেয়ারের জিপে চড়ে বসলাম আমি আর উদ্দালক। সাদা চামড়ার দুই যুবক-যুবতী আমাদের সহযাত্রী। খুব সম্ভব হানিমুন কাপল, নিজেদের নিয়েই তারা মশগুল। উদ্দালক হাসিমুখে 'হাই' বললেও যুবকটি পাথুরে মুখে 'হ্যালো' বলে মুখ ঘুরিয়ে নিল। বুঝলাম আমাদের সঙ্গে ভাব জমানোয় তারা আগ্রহী নয়। দুই শ্বেতাঙ্গ ছাড়া গাড়িতে রয়েছে মঙ্গোলয়েড মুখের এক তরুণী। পার্পল রংয়ের টি-শার্ট আর জিনস পরা মেয়েটার বয়স আঠারো-উনিশের বেশি হবে না। কানে হেডফোন গুঁজে চোখ বুজে আছে।

আমাদের গাড়ি সর্পিল পথ বেয়ে উঠছিল তিস্তাকে পাশে রেখে। তিন ঘণ্টা বাদে এল সিংতাম। এখানে চা জলখাবারের বিরতি। পথের ধারে খাবারের দোকান। মোমো থুকপা চাউমিন পাওয়া যায়। খিদে মিটিয়ে দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে সুখটান দিচ্ছিলাম। মেয়েটা কখন যেন কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। হিন্দিতে সহজ গলায় বলল, আপনারা টুরিস্ট?

আমি বললাম, টুরিস্ট বলা যায়, আবার ট্রেকার বললেও ভুল নয়। গ্যাংটকে এক বন্ধু থাকে আমাদের। গ্যাংটক পৌঁছব আগে। তারপর তিনজন মিলে ওদিকেই কোথাও ট্রেক করব।

মেয়েটি স্মিতমুখে বলল, স্যার, আপনারা থোলুং উপত্যকা গেছেন কখনও?

না যাওয়া হয়নি। বছর দুয়েক আগে সাংঘাতিক ভূমিকম্প হয়েছিল না ওদিকটায়?

হ্যাঁ ভূমিকম্পের প্রকোপে থোলুং বা সাকিয়েংয়ের মতো গ্রামগুলিতে মারা গিয়েছিল অনেক মানুষ। সিকিমের উত্তর-পশ্চিম দিকটা খুব সুন্দর। কাঞ্চনজঙ্ঘা ছাড়াও সেখানে আছে জলপ্রপাত আর বরফগলা জলের নদী। ঘন বন ছাড়াও আছে প্রাচীন থোলুং মনাস্ট্রি যা সিকিমের পবিত্র উপাসনাস্থল। অনেক বিরল শিল্প আর মূল্যবান নথি সেখানে রয়ে গেছে। এখান থেকেই নাকি লেপচা জনজাতির মানুষ একদিন জন্ম নিয়েছিল অনেকে বলে। ট্রেকারদের কাছে এই রুট বেশ আকর্ষক।

কী নাম তোমার? তোমাদের বাড়ি কি ওই পাহাড়েই?

—আমার নাম কিবো লেপচা। আপার থোলুংয়ে একসময় থাকতাম। ভূমিকম্পের সময় প্রাণ বাঁচাতে পাসিংদং নেমে আসতে হয়েছিল। শিলিগুড়ি গিয়েছিলাম কাজে। এখন পাসিংদং ফিরছি।

উদ্দালক বলল, পাসিংদং জায়গাটা কোথায়?

কিবো বলল, এখান থেকে মঙ্গন পৌঁছে সেখান থেকে পাসিংদং ষোলো কিমি। ওখানে আমাদের হোমস্টে বিজনেস আছে। ইচ্ছে করলে আজ রাতটুকু সেখানে থেকে কাল ট্রেক করতে যেতে পারেন থোলুং ভ্যালির দিকে। টাকাপয়সা যা ন্যায্য মনে হয় দেবেন। একজন গাইডও আপনাদের সঙ্গে দিয়ে দেওয়া যাবে।

উদ্দালক নীচু গলায় আমাকে বলল, নর্থওয়েস্ট সিকিমের কথা শুনেছি অনেক। সিকিমকে জানতে হলে নাকি যেতে হয় ওই পাহাড়েই। কী করবি রে, যাবি?

আমি হাসলাম, যাওয়াই যায়। চামলিংয়ের সঙ্গে বরঞ্চ কথা বলে নিই।

ফোন করলাম। রিং হয়ে হয়ে কেটে গেল। চামলিং ফোন তুলল না। তার উদ্দেশে একটা টেক্সট মেসেজ ছেড়ে মঙ্গনগামী একটা জিপে উঠে বসলাম। গাড়িতে যাত্রী বলতে আমরা তিনজনই। পিচঢালা রাস্তায় পাক খেতে খেতে জিপ যত উঠছিল তত শীত বাড়ছিল। বহু নীচে একটা রুপোলি জরির মতো নদী সঙ্গ দিচ্ছিল আমাদের। কিবো বলল, স্বর্গের এক ঝরনা থেকে জন্ম নিয়ে এই নদী মর্ত্যে পা রেখেছে। নদীর নাম রংইয়ং চু। স্থানীয়রা বলে এই নদী এতটাই পবিত্র যে, মৃতদেহ ভাসিয়ে দিলে মৃতের আত্মা স্বর্গবাসী হয়।

উদ্দালক হাসল, প্রতিটা পাহাড়েই নানারকম মিথ স্থানীয় মানুষের মুখে মুখে ঘোরে।

পাসিংদংয়ে যখন এসে পৌঁছলাম তখনও আলো ছিল। নামতে না নামতেই অদৃশ্য লাটাই দিয়ে বিকেলটাকে কেউ দ্রুত গুটিয়ে নিল। একটা পুরোনো মনাস্টারি রাস্তার ধারে। পাশ দিয়ে আঁকাবাঁকা পায়ে চলা পথ। একদিকে খাদ, অন্যদিকে ঋজু পাইন গাছেরা। কয়েক পা নেমে কিবো বলল, স্যার, এসে গিয়েছি।

কাঠের একতলা বাড়ির রংটা আনকমন। বেগুনি আর পার্পলের মাঝামাঝি। নীলচে ভাব বেশি, ম্যাজেন্টা কম। বাইরে টিনের সাইনবোর্ড টাঙানো। ইংরেজিতে লেখা মায়াল লায়াং হোমস্টে। সামনের ঢেউ খেলানো জমিতে পাহাড়ি ফুল ফুটে আছে। এই বাড়িটার রঙে-রং। কিবো চাবি বের করে তালা খুলল দরজার। মুখ ফিরিয়ে হাসল, হোমস্টে হিসেবে ভাড়া দেওয়ার জন্যই বাড়িটা বানানো হয়েছে। সাইলিদিদি এখানকার কেয়ারটেকার কাম কুক। পড়ে গিয়ে দিদির ফিমার-বোন ভেঙেছে। শিলিগুড়ির এক নার্সিং হোমে ভর্তি। তাকে দেখতেই গিয়েছিলাম। কিন্তু দিদি নেই বলে হোমস্টে তো আর বন্ধ রাখা যাবে না। চিন্তা নেই স্যার, রাতের খাবার রান্না করে তবেই বাড়ি যাব। কাল ভোরবেলা চলে আসব।

ভেতরে ঢুকলাম। দু-দিকে দুটো ঘর, মাঝে কমন স্পেস, সেটাই রিসেপশন। ইলেক্ট্রিসিটি আছে। কিবো সুইচ অন করতেই আলোয় ঝলমল করে উঠল বাড়িটা। একটা ফ্রেমে বাঁধানো ফোটো ঝুলছে দেওয়ালে। এক মঙ্গোলয়েড মুখের বৃদ্ধ। চোখে পুরু কাচের চশমা। কিবো বলল, ইনি গিয়াৎসো লেপচা, আমার দাদু। বেঁচে নেই। স্যার, এটাই আপনাদের ঘর। ডাইনিং স্পেস আর কিচেন ওদিকটায়।

ঘরটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অ্যাটাচড ওয়াশরুম। রানিং ওয়াটারের সুবিধেও মজুত। পাইপ দিয়ে জল নিয়ে আসা হয়েছে কাছের পাহাড়ি ঝরনা থেকে। কিবো চা করে নিয়ে এল। সঙ্গে পাউরুটি সেঁকা আর মুড়াই, যা আসলে আমাদের মুড়ি। আমি একমুঠো মুড়ি মুখে দিয়ে বললাম, দেখে মনে হচ্ছে এই বাড়ির বয়স বেশিদিন নয়।

কিবো বলল, ভূমিকম্পের সময় আমরা চলে এসেছিলাম এই গ্রামে। এটা তখন বানানো হয়েছিল। বাড়িটা বেশিরভাগ সময় ফাঁকাই পড়ে থাকে। লজ বা হোমস্টে-র ব্যবসা এদিকে এখনও প্রফিটেবল নয়। তবে টুরিস্ট বা ট্রেকারদের আনাগোনা ভবিষ্যতে আরও বাড়লে এই গ্রামের অর্থনীতি বদলে যাবে।

চামলিং ফোন করেছে। নেটওয়ার্ক খারাপ। কল ড্রপ হচ্ছিল। তার মধ্যেও যা বোঝা গেল তা হল, আজ সকাল থেকে তার বাবার পেটে অসহ্য ব্যথা। পরীক্ষা-টরিক্ষা করিয়ে ডাক্তার বলেছেন গলব্লাডারে স্টোন হয়েছে। কাল অপারেশন। আমরা যে পাসিংদং চলে এসেছি এবং এখান থেকে থোলুং যাব ট্রেক করতে সেটা জানিয়ে ওর বাবার দ্রুত আরোগ্য কামনা করে ফোন রাখলাম। বললাম, ফেরার সময় আমরা গ্যাংটক গিয়ে দেখা করব ওর বাবার সঙ্গে।

কিবো কাজের মেয়ে। কিচেনে গিয়ে চটজলদি ভাত, ডাল, আলুসেদ্ধ আর মুরগির মাংস বানিয়ে ফেলল। ডাইনিং টেবিলে আমাদের খাবার বেড়ে দিতে দিতে কিবো বলল, খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ুন। কাল তাড়াতাড়ি ওঠা আছে।

আটটার মধ্যেই ডিনার সেরে নিলাম। আমাদের বিদায় জানিয়ে কিবো বেরিয়ে পড়ল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলাম টর্চের আলো পাক খেতে খেতে হারিয়ে যাচ্ছে পাকদণ্ডীর মধ্যে। শরীরটা শ্রান্ত ছিল। রাতে মড়ার মতো ঘুমোলাম। ঘুম ভাঙল দরজা নক করার শব্দে। দেখি কিবো কোন ভোরবেলা এসে চা বানিয়ে নিয়ে এসেছে। পরনে কালকের সেই পার্পল টি-শার্টের ওপর ডেনিম জ্যাকেট আর ডেনিম জিনস। পায়ে গ্রিপ দেওয়া জুতো। চায়ের কাপ হাতে বাইরের বারান্দায় এলাম। সকালের রোদ্দুর ঝলসাচ্ছে ফুলগুলোর ওপর। কিবো এসেছে বারান্দায়। হেসে বলল, এই ফুলের নাম প্রিমুলা। সিকিম পাহাড়ের অহংকার হল এই ফুল। দাদু এতটাই অবসেসড ছিলেন এই

ফুল নিয়ে যে, আমাকে প্রিমুলা নামে ডাকতেন। এই বাড়িটাও তাই পেন্ট করিয়েছেন সেই রংডে।

গিজার নেই। ইমারশন হিটার দিয়ে জল গরম করে নেওয়া হল। স্নান সেরে তৈরি হয়ে নিলাম। কিবো কিচেন থেকে ডিমসেদ্ধ, কলা, পাকা পেঁপে আর টোস্ট নিয়ে ডাইনিং স্পেসে এল। আমি চেয়ার টেনে বসে বললাম, আমাদের সঙ্গে একজন গাইড দেবার কথা ছিল। কখন আসবেন?

কিবো হাসল, আমিই যাব।

বলে কী এই পুঁচকে মেয়ে। এ আমাদের গাইড। আমি আর উদ্দালক মুখ তাকাতাকি করলাম। কিবো বলল, স্যার, আমার ওপর ভরসা করতে পারেন। পাসিংদং থেকে থোলুং যাবার শর্টকাট রুট আমার থেকে ভালো আর কেউ চেনে না।

ট্রেক করা শুরু হল আমাদের। একটুক্ষণের মধ্যেই বুঝে গেলাম মাছ যেমন জলে সাবলীল, কিবো তেমনি পাহাড়ি পথে স্বচ্ছন্দ। পাসিংদং ছাড়িয়ে লিংদেন গ্রামের দিকে হাঁটছিলাম আমরা। মাটিতে বরফ জমে আছে পুরু হয়ে। রাস্তার বাঁদিকে কতগুলো সিঁড়ি। কিবো সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করেছে। মুখ ফিরিয়ে বলল, এখন পাঁচ কিমি উঠতে হবে খাড়া।

কিবো সিঁড়ি ভাঙছে তড়বড় করে। আমাদের হাঁফ ধরছে। সিঁড়ি শেষ হবার পর শুরু হল বুনো পথ। ঘন জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে পড়লাম। গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে পাহাড়চুড়ো। পাহাড়ের খাঁজ, উপত্যকা, হিমবাহ সব বরফে ঢাকা। বরফের পাহাড়ের মাথায় সোনালি সূর্য। কিবো বলল, ওই যে মাউন্ট পান্ডিম, কাবরু, সিমভো, সিনিয়লচু, জোপুনহো, গোচালা, আর ওই হল কাঞ্চনজঙ্ঘা।

একটা ছোট্ট গ্রামের মধ্যে দিয়ে গিরিখাত ধরে এগোচ্ছি। আরও খানিকটা উঁচুতে লিংদেম গুম্ফা। লোকজন চোখে পড়ল না। গৃহপালিত ছাগল-গোরু বা হাঁসমুরগিও না। কিবো বলল, এদিকের গ্রামগুলো বিধ্বস্ত। একসময় বহু লোক থাকত। ভূমিকম্পে মারা গেছে অনেকে। যারা বেঁচেছে তারা নেমে গেছে পাসিংদং বা লিংথেম গ্রামে।

হিমেল হাওয়া আক্রমণ শানাচ্ছে ঘাড়ের অনাবৃত জায়গা দিয়ে। লেদার জ্যাকেটের কলার টেনেটুনে যতটা পারা যায় তোলার চেষ্টা করছি। প্রকৃতির কী আশ্চর্য লীলা! সমতল যখন গরমে সিদ্ধ হচ্ছে তখন এখানে হাড় কাঁপানো শীত। ডানার ঝটপটানির শব্দে মাথা তুললাম। মুহূর্তে দুর্লভ দৃশ্যের সাক্ষী। মাথার ওপর উড়ছে বিরল প্রজাতির সোনালি ঈগল। আরও খানিক হাঁটার পর এক বিশাল দুর্ভেদ্য কালো পাথর এল। কিবো বলল, এটা কাঞ্চনজঙ্ঘার গার্ডওয়াল। ওই গ্রামের নাম জোংগু। পেনটং আর সাকিয়েং হল এদিকের শেষ গ্রাম। আর ওই যে পবিত্র রংইয়ং চু নদী, স্বর্গের এক ঝরনা থেকে যার জন্ম। ওই নদীর ওপারে আপার থোলুংয়ের অভিশপ্ত গ্রামেই থাকতাম আমরা।

আমি বললাম, অভিশপ্ত গ্রাম বলছ কেন?

কিবো বলল, অভিশপ্ত নয়? ভূমিকম্পের সময় গ্রামের ঘরবাড়ি সব তছনছ হয়ে গিয়েছিল। রংইয়ং চু নদীর ওপর সাঁকোটা ভেঙে গিয়েছিল জলের তোড়ে। ফলে বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে এই জনপদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। প্রকৃতির রোষ কী ভয়ংকর হতে পারে তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছিল ওই গ্রাম। থোলুং পৌঁছে দেখবেন ওই পাহাড়চুড়োয় একটা কুঁড়েঘর আছে। অথচ গোটা গ্রাম ধ্বংস হলেও সেই কুঁড়েঘরের গায়ে টোকা অবধি লাগেনি। এ হল রিমপোচের কৃপা।

এবার যে-বাঁকের কাছে পৌঁছলাম তার সৌন্দর্যের বর্ণনা করা অসম্ভব। রিংপি চু নদী রংইয়ং চু-তে এসে মিশেছে। এত ওপর থেকে স্বর্গীয় লাগছে সেই দৃশ্য। কাঞ্চনজঙ্ঘাকে বাঁদিকে রেখে রিংপি চু নদীখাত বরাবর চলছি। রাস্তা সরু আর খাড়াই হচ্ছে। কিবো বলল, স্যার, সাবধান। যে-কোনও সময় ধ্বস নামতে পারে।

কথাটা শেষ হতে না হতেই হুড়মুড় শব্দে ধ্বস নামল। ব্যাপারটা এতটাই আচমকা ঘটল যে, হকচকিয়ে গেছি। পত্রপত্রিকায় পাহাড়ে ধ্বসের ছবি দেখা আর নিজে এমন ঘটনার সাক্ষী হওয়া অন্য ব্যাপার। চোখের সামনে গাছপালা সমেত একটা পাহাড়ের অংশ সোজা তিনশো ফিট নীচে অদৃশ্য হয়ে গেল। যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেই অংশটাও যে ধ্বসে পড়বে না সেটা কে জানে।

পাথরের চাঙড়ের ওপর দিয়ে এগোচ্ছি পা টিপে টিপে। নতুন করে ধ্বস নেমে কখন যাতায়াতের পথ বন্ধ হয়ে যাবে কে জানে। কিবো রিভারবেড ধরে আগে আগে চলছে। পাখির ডাকাডাকি কানে আসছে। উড়ছে হরেক রকমের প্রজাপতি। একটা কালো পাইপের মতো সাপ স্থির হয়ে শুয়ে ছিল পথের মধ্যে। আমাদের পায়ের শব্দ পেয়ে লুকিয়ে পড়ল ঘাসপাতার আড়ালে। উদ্দালক বলল, ওই দ্যাখ ঘোড়া।

তাকিয়ে দেখি সত্যিই একটা বুনো ঘোড়া। বাদামি ঘোড়াটা জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঘাস খাচ্ছে আর চামরের মতো ল্যাজ নেড়ে মাছি তাড়াচ্ছে। আমাদের গলা শুনে ঢুকে পড়ল জঙ্গলে। পর্ণমোচী বনভূমি আরও সবুজ হয়েছে এই উচ্চতায়। গাছপালা বেশি বলে সূর্যের আলো মাটি অবধি পৌঁছয় না। ভিজে ভিজে ছায়াঢাকা জঙ্গলের ভিতরটা নিস্তব্ধ। নিজেদের পায়ের আওয়াজ আর পাখির ডাক ছাড়া কিছু শোনা যায় না। ঝরাপাতায় ঢেকে রয়েছে জঙ্গলের পথ। সঙ্গের থার্মোমিটার দেখে নিলাম। তাপমাত্রা চার ডিগ্রি। ছাই আর হলুদ রংয়ের সাদা ঠোঁটের এক জোড়া হিমালয়ান লংটেল পাখি। কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁফাচ্ছি। কিবো ভরসা দিল, আর একটুখানি স্যার।

অবশেষে থোলুং গুম্ফায় পৌঁছলাম। কিন্তু পা রেখে মনখারাপ হয়ে গেল। চারদিকে ধ্বংসের ছাপ। দোতলা গুম্ফার একতলা ধ্বসে গিয়েছে। ভাঙা পিলারের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে শুধু ওপরতলা। আশপাশের ছোট গ্রামগুলিও ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জনহীন গ্রাম কঙ্কালসার হয়ে দাঁড়িয়ে। রিমপোচের মূর্তি রয়েছে। আমরা প্রণাম জানালাম। কিবো বলল, রিমপোচে এখানে বাস করেন। এটা এই জঙ্গলের সবচাইতে পবিত্র অঞ্চল।

শীতে কাঁপছি। খিদেও পেয়েছে জোর। রুটি, ভাত, চিকেন আর ম্যাগির সুপ সঙ্গে করে নিয়ে আসা হয়েছিল। সেই খাবার দিয়ে খিদে মেটানো হল। কিবো বলল, পাসিংদং থেকে থোলুং আসার ইউজুয়াল ট্রেকিং রুট আলাদা। আমি শর্টকাট রাস্তায় নিয়ে এসেছি বলে সময় কম লাগল।

কিবো লঘু পায়ে গুম্ফার বাইরে এল। পেছন পেছন আমরাও। ঠান্ডার প্রকোপ বেড়েছে। নদী, কুয়াশা, পাহাড় আর জঙ্গলের বিমিশ্র গন্ধ আসছে নাকে। কিবো বলল, ওই সরু নদীটা হল রংইয়ং চু। ওপারে আপার থোলুং পাহাড়ে ছিল আমাদের ছোট্ট গ্রাম। কুড়ি-বাইশটা পরিবার থাকত। শ'খানেক লোক। ভূমিকম্পে সমস্ত তছনছ হয়ে গেছে। রংইয়ং চু-র ওপর আগে কংক্রিটের সেতু ছিল। ভূমিকম্পের সময় ভেঙে যায়। এখন নতুন করে একটা অস্থায়ী সাঁকো তৈরি হয়েছে।

কাঠ আর বাঁশের তৈরি সাঁকো সংযুক্ত করেছে দুদিকের পাহাড়কে। সাঁকোর রং পাসিংদংয়ের সেই হোমস্টের মতো। বেগুনি আর পার্পলের মাঝামাঝি। এই বিশেষ রংয়ের প্রতি কি এদিকের মানুষের দুর্বলতা আছে? আমি বললাম, তুমি বলছিলে যে, গোটা গ্রাম ধ্বংস হয়ে গেলেও ওই কুঁড়েঘরটাকে রিমপোচে রক্ষা করেছিলেন। এর পেছনে কী কারণ?

কিবো শান্ত গলায় বলল, বলছি। দু-বছর আগে মুহুর্মুহু কেঁপে উঠেছিল এই উপত্যকা। আগে লোকালদের বিশ্বাস ছিল পৃথিবী লণ্ডভণ্ড হয়ে গেলেও এই পাহাড় অক্ষত থাকবে। কিন্তু সেবারের ভূমিকম্প ঠকঠকানি তুলে দিল মানুষের মনে। সকলেরই আশংকা আজ বাদে কাল আরও বড় বিপর্যয় নেমে আসবে না তো? প্রাণে বাঁচতে হলে নীচে নেমে আসা দরকার। কিন্তু যাঁদের চলাফেরার শক্তি নেই তাঁদের কী হবে? মানুষ বড় নিষ্ঠুর। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের ওই কুঁড়েঘরে রেখে বাকিরা নেমে এল নীচের গ্রামে। দাদুও ছিল তাদের দলে। তাঁকে কিছুদিন চলার মতো চাল-ডাল-আনাজ দিয়ে কুঁড়েঘরটায় রেখে নেমে এসেছিল আমার বাবা-মা। আমি কাঁদছিলাম হাউহাউ করে। জাপটে ধরে রেখেছিলাম দাদুকে। আমাকে ওরা টেনেহিঁচড়ে নিয়ে এসেছিল। অথচ

রিমপোচের রসিকতা এমন, বাড়িঘরগুলো ভূমিকম্পে তছনছ হয়ে গেলেও ওই কুঁড়েঘরটার গায়ে আঁচড়টুকু লাগেনি।

সেদিনের ছবিটা কল্পনা করছিলাম মনে মনে। গুহাজীবনের দিন থেকেই আমাদের চেতনার গভীরে রয়ে গিয়েছে যেমন করে হোক নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার ভাবনা। আমি বললাম, সেই বৃদ্ধবৃদ্ধারা সকলেই কি মারা গেছেন?

কিবো একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, পর্যাপ্ত খাবার-দাবার ছাড়া দু-মাস বাঁচা যায় না, দু-বছর তাঁরা বাঁচবেন কী করে। হতভাগা মানুষগুলো কি দুঃস্বপ্নেও ভেবেছিলেন, নিজের সন্তানই তাঁদের মৃত্যুদণ্ড দেবে একদিন ? স্যার, দয়া করে আমার দাদুর শবদেহটা নামিয়ে আনুন। আমি সাঁকোর এপারে অপেক্ষা করছি। দাদুকে শেষ দেখা একবার দেখব, তারপর আপনারা নদীতে ভাসিয়ে দেবেন তাঁর শবদেহ। রংইয়ং চু স্বর্গে পৌঁছে দেবে দাদুর আত্মাকে। আমি পাসিংদং থেকে থোলুং অবধি আপনাদের সঙ্গে গাইড হয়ে এতটা পথ ট্রেক করে এসেছি। তার জন্য আমাকে একটা পয়সাও দিতে হবে না। হোমস্টের খরচও কমপ্লিমেন্টারি।

আমি বললাম, তুমি এতটা পথ ট্রেক করে এসেছ, বাকিটা যাবে না কেন? দাদুর বিকৃত শবদেহ দেখতে চাও না বলে?

কিবো বলল, যেদিন আপার থোলুংয়ের লোকেরা চরম নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছিল সেদিন থেকে ওই গ্রামের সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক চুকেবুকে গেছে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি, রংইয়ং চু নদী পেরিয়ে ওই গ্রামে আর কখনও পা রাখব না আমি। এই কারণে পাসিংদংয়ে আমার বাবা-মায়ের সঙ্গে আমি থাকি না।

উদ্দালক বলল, তোমার আবেগের ব্যাপারটা বুঝতে পারছি। পাসিংদংয়ে হোমস্টের দেওয়ালে তোমার দাদুর ফোটো দেখেছি। কিন্তু কথা হল তাঁর মৃতদেহ দেখে আমরা চিনব কী করে? শবদেহ কি আর অবিকৃত আছে? মাংস-টাংস পচে গলে গিয়ে কঙ্কালটুকুই তো পড়ে থাকার কথা এতদিনে।

কিবো বলল, ওই পাহাড়চুড়োয় তাপমাত্রা হিমাঙ্কের কাছাকাছি থাকে। তাই পচনের ক্রিয়াটা অতি ধীর গতিতে হবার কথা। ওখানে দুজন বৃদ্ধা আর তিনজন বৃদ্ধ আছেন। তিনজনের মধ্যে দাদুর মৃতদেহ চিনতে অসুবিধে হবার কথা নয়। এই নিন আমার টর্চ। অন্ধকার ঘন হবার আগেই আপনারা বেরিয়ে পড়ুন স্যার।

থোলুং গুম্ফা থেকে নেমে এসেছি। রংইয়ং চু নদী বয়ে যাচ্ছে হু-হু করে। বাঁশ আর কাঠ দিয়ে তৈরি সাঁকোটায় পা রাখলেই মচমচ করছে। সন্তর্পণে সাঁকো পার হলাম। কিবো দাঁড়িয়ে রইল ওপারে। চড়াই পথে উঠছি। ভূমিকম্প বিধ্বস্ত বাড়িগুলো ভেঙে পড়ে আছে। জায়গায় জায়গায় ধ্বসে গেছে মাটি। দু-বছর হল জনপ্রাণী থাকে না এই গ্রামে। ভাবলেই গা কেমন ছমছম করে। এদিকে অন্ধকার জমাট বাঁধছে। কনকনে হাওয়া ঝাপটা মারছে। কুয়াশা আর মেঘ এক্কাদোক্কা খেলছে। উদ্দালক ভুরু কুঁচকে বলল, আমার খটকা লাগছে। এই জনবিচ্ছিন্ন পাহাড়ে ভূতপ্রেত নেই তো ? কিবো কি ভূতের ভয়েই এল না?

আমারও মনের দেওয়াল বেয়ে ভয়ের মাকড়সা উঠছে-নামছে। বড় করে শ্বাস নিলাম আর ছাড়লাম। ভয় ভয় ভাব খানিক কাটল। আবার চড়াই ওঠা শুরু। দুর্মর সাহসে ভর করে উঠে এসেছি টিলাটার মাথায়। হাড়কাঁপানো হাওয়া দিচ্ছে থেকে থেকে। কুঁড়েঘরটার দশা জীর্ণ। একটা দুটো কাঠ জায়গায় জায়গায় ভেঙে পড়েছে। টিনের চাল ফুটিফাটা। দরজা হাট করা খোলা। ঘরের ভেতর বরফের স্তর জমে পুরু হয়ে আছে। বোঁটকা গন্ধ নাকে এল। ঘরের ভেতর কতগুলো চৌকি ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তাতে চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে রয়েছেন কয়েকজন বৃদ্ধবৃদ্ধা।

তাকালাম এদিক ওদিক। এই পাহাড়ে তাপমাত্রা বেশিরভাগ সময় শূন্যের কাছাকাছি থাকে বলেই হয়তো শরীরগুলো পচে গলে যায়নি। আবার দেহগুলো যে অবিকৃত আছে সেটাও নয়। পচনের ক্রিয়াটা চলেছে অতি ধীর লয়ে। কোণের একটা চৌকিতে এক বৃদ্ধ কোলকুঁজো হয়ে বসা। বিবর্ণ উইন্ডচিটারটার রং কোনও একসময় বেগুনি ছিল। ধূসর ফুলপ্যান্ট। গায়ে মাংস নেই বললেই চলে। তোবড়ানো গাল, কণ্ঠার হাড় গজালের মতো ফুঁড়ে বেরিয়েছে। ঢিলে কোঁচকানো হলদেটে চামড়া খোলসের মতো মানুষটির হাড়ের ওপর জড়িয়ে আছে। দুই হাতের চামড়ার নীচে জট পাকানো নীল সব শিরা-উপশিরা দেখা যাচ্ছে। মোটা কাচের চশমা নাকের ডগা অবধি নেমে এসেছে। চোখের ধূসর মণি স্থির। গিয়াৎসো লেপচাকে চিনে নিতে আমাদের অসুবিধে হল না।

কখনও শ্মশানে যে যাইনি তা নয়। মর্গে যাওয়ার অভিজ্ঞতাও আছে। কিন্তু এমন অদ্ভুত পরিস্থিতিতে আগে পড়িনি। পাঁচ-পাঁচটা মৃতদেহ পড়ে আছে এক নির্জন পাহাড়চুড়োর পরিত্যক্ত কুঁড়েঘরে। জীবিত মানুষ বলতে শুধু আমি আর উদ্দালক। কেউ দমাদ্দম হাতুড়ি পিটছে হৃৎপিণ্ডে। আমার বুক ধুকপুক করছিল। কিন্তু উদ্দালকের নার্ভ শক্ত। সামনে গিয়ে তাঁর নাকের কাছে হাতের উলটো পিঠ ধরল। তারপর তাঁর কবজি ধরে নাড়ির স্পন্দন অনুভব করতে চাইল। দুদিকে মাথা নেড়ে বোঝাল যে, শরীরে প্রাণ নেই। আমি ভয়ে ভয়ে মৃতের কপালে হাত দিলাম। বরফের মতো ঠান্ডা শরীর। উদ্দালক বলল, সাহস আন। আমি দুটো পা ধরছি, তুই হাতদুটো ধর।

শবদেহ যতটা ভারী হওয়ার কথা ছিল ততটা নয়। অসুবিধে হল না তেমন। ধরাধরি করে দুজন দেহটা নামিয়ে আনতে লাগলাম নীচে। ক্লান্ত হয়ে পড়লে মৃতদেহ নামিয়ে রাখছিলাম। খানিক বিশ্রাম নিয়ে আবার হাঁটা। নদী অবধি আসতে হাঁফ ধরে গেল। সাঁকোর ওপারে ঠায় দাঁড়ানো কিবো। কুয়াশায় তার মুখচোখ স্পষ্ট নয়। শরীরের আদলটুকু শুধু বোঝা যাচ্ছে। কিবো ধরা গলায় বলল, স্যার, আপনাদের কী বলে যে...। কিন্তু আরও চারটে শবদেহ রয়ে গেল ওই কুঁড়েঘরে। তাঁদের বিদেহী আত্মারাও কষ্ট পাচ্ছেন। আগে দাদুর দেহটার সদগতি করে নিই। তারপর বাকিদের কথা ভাবব। স্যার, শবদেহটা সাঁকোর এপারে আনবেন?

বৃদ্ধের শবদেহটা দুজন ধরাধরি করে নিয়ে এলাম রংইয়ং চু নদীর ওপারে। নামিয়ে রাখলাম পাথুরে মাটিতে। কিবোর দু-চোখে জল। বৃদ্ধের হাঁটু ছুঁয়ে প্রণাম করল ভক্তিভরে। বিড়বিড় করে কীসব উচ্চারণ করল। কান্নাভেজা গলায় বলল, স্যার, দাদুকে শেষ প্রণাম জানানো হয়ে গেছে। এবার আপনারা শবদেহটা ভাসিয়ে দিতে পারেন রংইয়ং চু নদীর জলে।

আমি আর উদ্দালক দৃষ্টি বিনিময় করে নিলাম। কিবোর কথামতো শবদেহটা ভাসিয়ে দিলাম নদীর জলে। আমাদের অবাক করে দিয়ে মৃতদেহটা জলে ডুবল না, কাগজের নৌকোর মতো খরস্রোতা নদীতে দুলে দুলে ভাসতে ভাসতে চলে গেল চোখের আড়ালে।

তখনই ঘটল অবিশ্বাস্য কাণ্ড! কিবো ধাঁ করে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল নদীর বুকে। আমরা হাঁ-হাঁ করে উঠতে না উঠতেই দেখি ডুবে গেছে। খানিক দূরে গিয়ে ভেসে উঠল কিবোর দেহ। চোখের পলক ফেলার আগেই কিবোর শরীর চলে গেল দৃষ্টিসীমার বাইরে। ব্যাপারটা এতটাই অতর্কিতে হল যে, চিন্তা করার শক্তিও যেন লোপ পেয়ে গেছিল আমাদের।

আমি হতচকিত হয়ে দেখি উদ্দালক বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে সাঁকোটার দিকে। অস্ফুটে কীসব বলছে আর আঙুল উঁচিয়ে কিছু দেখাচ্ছে। ওর তর্জনী অনুসরণ করে চমকে গেলাম। কোনও শিক্ষানবিশ আঁকিয়ে যেমন হিজিবিজি কিছু এঁকে তা পছন্দ না হলে ইরেজার দিয়ে মুছে দেয়, ঠিক তেমনি করে সাঁকোটা উবে যাচ্ছে একটু একটু করে। যেন সেটা কাঠ বা বাঁশ নয়, ধোঁয়া দিয়ে তৈরি। কয়েক মুহূর্ত লাগল সাঁকোটা নিশ্চিহ্ন হতে। থোলুং আর আপার থোলুং ভূমিখণ্ডের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া রংইয়ং চু নদীর ওপর আর কোনও সংযোগসেতু রইল না।

মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল। বুঝতে পারলাম চেতনা লোপ পাচ্ছে। কখন যে জ্ঞান হারিয়েছি জানি না। হিমশীতল জলের ঝাপটায় চোখ মেললাম। বুঝলাম একটা গুম্ফার মধ্যে শুয়ে আছি। আশেপাশে মঙ্গোলয়েড মুখের কয়েকজন মানুষ। চেনা মুখ একটাই। ফুরবা চামলিং। আমার পাশে উদ্দালক আধশোয়া।

এদিক ওদিক দেখছে। চামলিং জলের গ্লাস এগিয়ে দিয়ে উদ্বিগ্ন গলায় বলল, দাদা, তোমাদের ঠিক কী হয়েছিল বলো তো?

কিবোর সঙ্গে শেয়ারের জিপে সহযাত্রী হওয়া, সিংতাম থেকে গাড়ি বদলে মঙ্গন হয়ে পাসিংদং আসা, থোলুং ট্রেক করতে যাওয়া—সবটাই বললাম চামলিংকে। এবং তার পরের রোমহর্ষক বৃত্তান্তও শোনালাম। আমার কথা শুনে ফিসফাস শুরু হল স্থানীয় মানুষদের মধ্যে। আমি চামলিংকে বললাম, তুমি এখানে এলে কী করে?

চামলিং বলল, অপারেশন ভালোয় ভালোয় হয়ে গেছে। বাবাকে হাসপাতাল থেকে ছুটিও দিয়ে দিয়েছে। তাই তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম পাসিংদংয়ে। যে হোমস্টেতে তোমরা উঠেছিলে তার খোঁজ কেউ দিতে পারল না। তখনই খটকা লাগল। তোমরা থোলুং রুটে ট্রেক করার কথা বলেছিলে। তাই পাসিংদং থেকে দুই স্থানীয় যুবককে গাড়িতে তুলে যতটা পারা যায় এসেছি গাড়ি চালিয়ে। কয়েক কিমি উঠেছি পায়ে হেঁটে। খোঁজাখুঁজি করতে করতে রংইয়ং চু নদীর ধারে অজ্ঞান অবস্থায় তোমাদের পাই। তারপর ধরাধরি করে এই গুম্ফায় নিয়ে এসেছি। দাদা, একটু সুস্থ বোধ করছ? তাহলে উঠে পড়ো। সন্ধের আগে পাসিংদং পৌঁছতে হবে আমাদের।

পাহাড়ি পাকদণ্ডী পথে গাড়ি চলছে। চামলিং স্টিয়ারিং ঘোরাচ্ছে নিবিষ্ট মনে। আমি আর উদ্দালক জানলা দিয়ে দেখছি। আঁকাবাঁকা পথে ড্রাইভ করে অবশেষে একটা জায়গায় গাড়িটা দাঁড় করিয়ে ঘোষণা করল, পাসিংদং মনাস্টারি।

বাজনা ভেসে আসছে মনাস্টারির ভেতর থেকে। দুজন লামা দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে। ঢালু রাস্তা নেমে গেছে নীচে যা শেষ হয়েছে একটা খাদের সামনে। সামনে কোনও বাড়ি ঘর কিছুই নেই। ধু-ধু শূন্যতা। যে বাড়িটায় আমরা রাত্রিবাস করেছিলাম তা ভোজবাজির মতো উবে গেছে। খাদের ধারে পাহাড়ের ঢালে শুধু ফুটে আছে অগুনতি প্রিমুলা।

চামলিং বলল, পাসিংদংয়ের দুই যুবকের সঙ্গে থোলুং যেতে যেতে অনেক গল্প হয়েছে। দু-বছর আগের সেই মর্মান্তিক ঘটনার কথা জানতে পেরেছি তাদের কাছে। ভূমিকম্পের আশঙ্কায় অশক্ত বুড়োবুড়িদের সামান্য কিছু খাবার দাবার দিয়ে পাহাড়ের মাথায় একটা কুঁড়েঘরে রেখে নীচের গ্রামে নেমে এসেছিল বাকিরা। গিয়াৎসো লেপচাও ছিল হতভাগ্যদের দলে। কিবো তার দাদুকে ছেড়ে আসতে চাইছিল না। কিন্তু বাবা কিবোকে টেনেহিঁচড়ে নীচে নামছিল। নড়বড়ে সাঁকোটার ওপর বাপবেটির তুমুল ধ্বস্তাধ্বস্তি হচ্ছিল। বাবার হাত ছাড়িয়ে ছুট দিতে গিয়ে কিবো পড়ে যায় নদীতে। রংইয়ং চু নদী তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কিবোর লাশ পাওয়া যায়নি।

আমি আর উদ্দালক একসঙ্গে বললাম, সে কী!

চামলিং বলল, এমনটাই ঘটেছিল সেদিন। সেই রাতেই রংইয়ং চু ফুলে ফেঁপে ওঠে। বাঁশ আর কাঠের টুকরোগুলি উড়িয়ে নিয়ে যায় জলের তীব্র স্রোত। এখন সেই খরস্রোতা নদী ডিঙিয়ে আপার থোলুং যাওয়া আর সম্ভব নয়। শিকারি আর মেষপালকরা সাহসী হয়। তারাও নদী পার হবার সাহস করে না। সেই গ্রামের সব বাড়িই ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে গেছে। গ্রামবাসীরা পাসিংদং, লিংজা, সিংতাম মঙ্গন গ্রামে নেমে এসেছে। সকলে ধরে নিয়েছে যে, ওই কুঁড়েঘরে যাদের রেখে আসা হয়েছিল তারা কেউই বেঁচে নেই। জীবিত মানুষগুলোকেই বোঝা বলে ভেবেছে তারা। ওই বরফগলা খরস্রোতা নদী পার করে সেই মৃতদেহগুলিকে উদ্ধার করে আনার তাগিদ নেই কারও মধ্যে। শুধু কিবোই ছিল আলাদা গোত্রের মেয়ে।

উদ্দালক বলল, এবার পরিষ্কার হচ্ছে পুরো ছবি। কিবো নেই। তার শরীর বলেও কিছু নেই। আমরা ওকে যেমন দেখেছি তা ওর তৈরি করা বিভ্রম। দাদুর শবদেহ পাহাড়চুড়ো থেকে উদ্ধার করে এনে সদগতি করার জন্য উপযুক্ত লোক খুঁজছিল কিবো। শেয়ারের জিপে আমাদের আলোচনা শুনে কিবো বুঝতে পারে, আমরা শখের ট্রেকারস। অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা দিয়ে হয়তো এটাও বুঝতে পারে যে, আমাদের দিয়ে তার কাজ হতে পারে। সিংতামে এসে আলাপ করে আমাদের সঙ্গে। থোলুং রুটে ট্রেক করার কথা বলে। তার কথায় গন্তব্য বদলে পাসিংদং চলে আসি আমরা।

আমি বললাম, গিয়াৎসো লেপচা আর কিবো দুজনের কেউই বেঁচে নেই। সেই হিসেবে দাদু-নাতনির তো পরলোকে একসঙ্গেই থাকার কথা। তাহলে দাদুর মৃতদেহ উদ্ধার করে আনার জন্য কিবো এত ব্যাকুল হল কেন?

উদ্দালক বলল, পরলোকেরও স্তরভেদ আছে। কর্মফল বা আধার অনুযায়ী সেই স্তর নির্ধারিত হয়। এমন হতেই পারে, ব্যাখ্যাতীত কোনও কারণে মিলিত হতে পারছিল না পরলোকের দুই ভিন্ন স্তরে থাকা দাদু আর নাতনি। কিবো চাইছিল তার দাদুর শবদেহ যেন এই স্বর্গের নদীতেই ভাসিয়ে দেওয়া হয়, যার জলে একদিন ভেসে গিয়েছিল সে নিজেও। তাহলেই একদিন এই পৃথিবীর সমান্তরাল অন্য কোনও জগতে দেখা হবে তাদের। সবটাই অবশ্য আমার হাইপোথিসিস।

আমি বললাম, পাসিংদংয়ের মায়াল লায়াং হোমস্টে আর ওই সাঁকোটার মধ্যে একটা মিল লক্ষ করেছিস নিশ্চয়ই? দুটোর রংই পার্পল। তোর কী মনে হয়, ব্যাপারটা কি নিছক কোইন্সিডেন্স?

উদ্দালক বলল, উঁহু, আমার তা মনে হয় না। গিয়াৎসো লেপচার এতটাই পছন্দ ছিল প্রিমুলা ফুল যে, আদরের নাতনিকে সে নামেই তিনি ডাকতেন। কিবোর মধ্যেও তাই চারিয়ে গিয়েছে ওই বিশেষ রংয়ের প্রতি ভালোবাসা। হয়তো তুইও নোটিস করেছিস যে, কিবোর টি-শার্ট আর তার দাদুর উইন্ডচিটারের রংও ছিল তা-ই। কিবো আসলে আমাদের চোখে পরিয়ে রেখেছিল মায়াকাজল। সে যেমন যেমন ইলিউশন সৃষ্টি করেছে তেমনই দেখেছি আমরা। দাদুর মতো প্রিমুলা ফুলের প্রতি কিবোর পক্ষপাতিত্ব যে একটু বেশিই তা বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না।

পাসিংদং থেকে ফিরে আসছি চামলিংয়ের গাড়িতে। সিংতামে সেই দোকানে গাড়ি দাঁড় করিয়ে চিকেন মোমো অর্ডার করা হল। ধোঁয়া ওঠা মোমো ফর্ক দিয়ে গেঁথে তুলতে তুলতে উদ্দালক বলল, দাদু আর নাতনির এই আশ্চর্য ভালোবাসার কোনও তুলনা হয় না। সে কারণেই তো বলা হয় যে, ভালোবাসার প্রতি কখনও বিশ্বাস হারাতে নেই। কেননা ভালোবাসার চেয়ে বড় শক্তি আর হয় না। কী বলিস?

সায় দিয়ে বললাম, একদম ঠিক। স্বার্থপর এই জগতে কিবোর মতোও কেউ কেউ থাকে যাদের হৃদয়ে আজও ফোটে ভালোবাসার ফুল, যে-ফুলের নাম প্রিমুলা। কিশোর ভারতী

জন্ম ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২, অধুনা বাংলাদেশের চাঁদপুরে। কুন্তক তাঁর ছদ্মনাম। শিক্ষালাভ করেছেন চন্দ্রপ্রভা বিদ্যাপীঠ, পাকশি (বাংলাদেশের পাবনা জেলায়); প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি, প্রাবন্ধিক ও সম্পাদক। অধ্যাপনাসূত্রে যুক্ত ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। 'দিনগুলি রাতগুলি' (১৯৫৬) প্রথম কাব্যগ্রন্থ। তাঁর প্রাপ্ত নানা সম্মান ও পুরস্কারের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার (১৯৭৭), রবীন্দ্র পুরস্কার (১৯৮৯), কবীর সম্মান (১৯৯৮), সরস্বতী সম্মান (১৯৯৮), পদ্মভূষণ সম্মান (২০১১), জ্ঞানপীঠ পুরস্কার (২০১৬)। প্রয়াণ ২১ এপ্রিল ২০২১।

শঙ্খ ঘোষ

চিমনিকাকু

ময়দান থেকে লম্বা একটা দৌড় লাগালাম চিমনিকাকুর সঙ্গে।

সদ্য তখন দেশভাগ হয়েছে, কলকাতায় এসেছি পাবনার ছেলে, দেখলেই সবাই টের পেয়ে যায় এই এক হাবাগোবা! বেলগাছিয়ার নীলমণি মিত্র লেনের ভিড়-থিকথিকে একটা বাড়িতে সবাই মিলে থাকি। সেইখানেই প্রথম দেখা হয়েছিল চিমনিকাকুর সঙ্গে।

টিঙটিঙে ঢ্যাঙা, মিশমিশে কালো, মুখ থেকে গলগল করে কেবলই বেরচ্ছে সিগারেটের ধোঁয়া, চিমনিকাকুকে সেইজন্যই বোধহয় চিমনি বলে ডাকত সবাই। আসল নাম চিন্ময়'টা কোন-একদিন চাপা পড়ে গেছে একেবারে।

মাঝখানে অনেকদিন নাকি আন্দামানে ছিল চিমনিকাকু। স্বদেশী করে নয়, এমনি এমনি। কাজের খোঁজে। কী কাজ যে করেছে তা অবিশ্যি জানে না কেউ। ফিরে আসবার পর 'শোন, তাইলে, আন্দামানে যখন আছিলাম, বলে যখন-তখন শুরু করে গপপো। 'ক দেখি, কিসের মাংস খাইতে সককলের থিক্যা ভালো?' 'হাঁস, মুরগি, পায়রার মত নরম কোনও নাম পছন্দ হয় না চিমনিকাকুর, বলে 'দূর, ওইসব আবার মাংস নাকি? আসল

ম্যাংসে হইল কুমিরের ম্যাংস।'

'কুমিরের ম্যাংস?' আঁতকে ওঠে সবাই : 'খেয়েছ তুমি?'
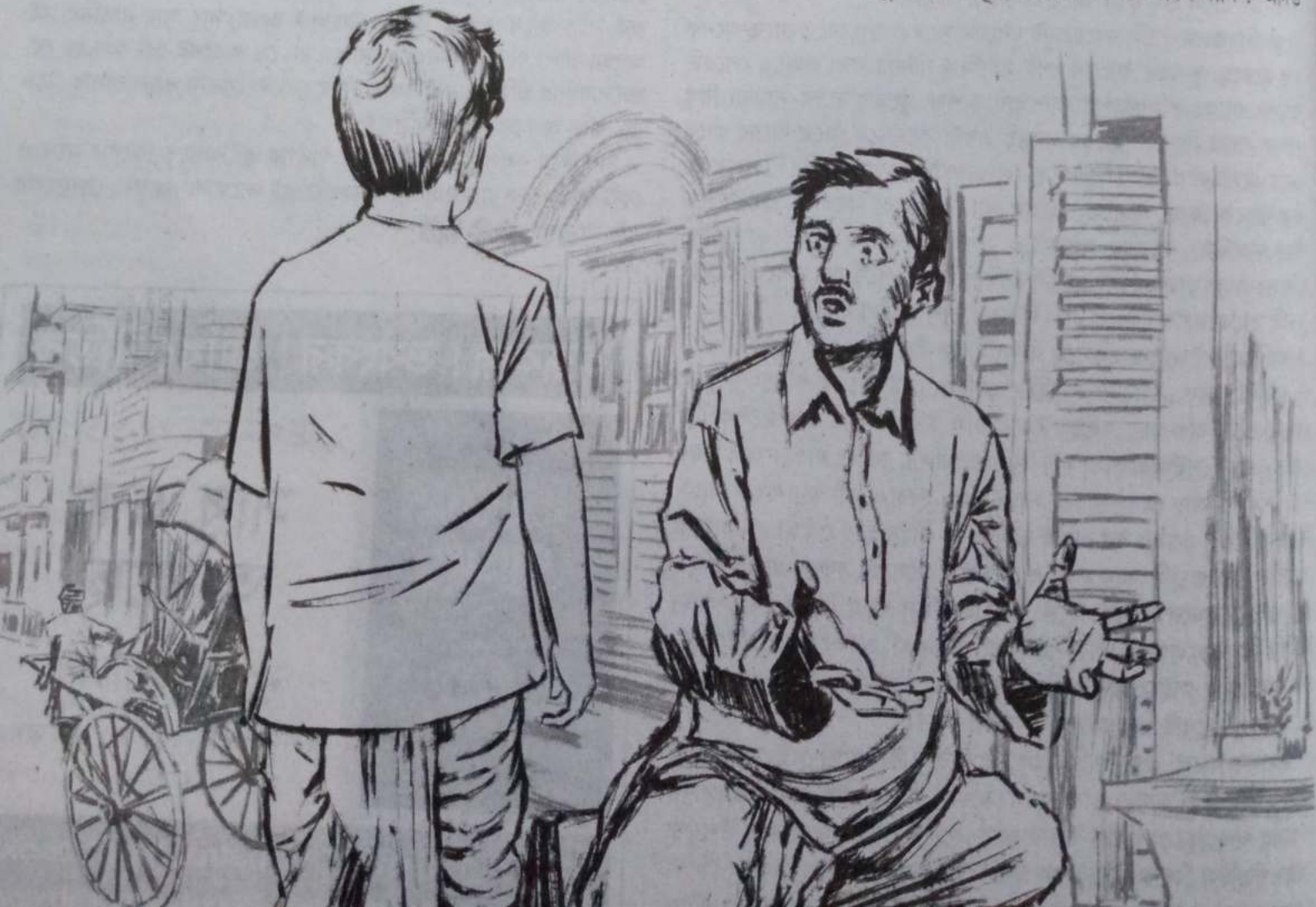
'খাই নাই?' জিবে চকাস চকাস একটা শব্দ তুলে চিমনি কাকু বলে : 'কত খাইলাম।'

'মানুষে আবার কুমিরের ম্যাংস খায় নাকি?'

'খাইব না ক্যান? ক্যাবল কুমিরেই খাইব মাইনষের ম্যাংস? তা আবার হয় নাকি? এ হইল গিয়া শোধবোধ। আঃ, বাচ্চা বাচ্চা ছোট্ট ছোট্ট কুমিরগুলার যা স্বাদ না।'

সঙ্গে সঙ্গে বড়দের মধ্যে কেউ একজন ধমক লাগিয়ে বলেন : 'থাম তো। যতসব উদ্ভুট্টি কথা।'

আন্দামানের কুমির নিয়ে খুব গর্ব ছিল চিমনিকাকুর, কিন্তু আন্দামানের সমুদ্র নিয়ে তেমন নয়। তার দেশ ছিল চাঁদপুরে, মেঘনা নদীর ওপর। তাই সব সময়েই বলত : 'সমুদ্রই কস আর যা-ই কস্, ম্যাঘনার মতন কিছু না।'

'ভারি তো দেখছ। জীবনে কব্বার তুমি গেছ চাঁদপুরে? কব্বার দেখেছ মেঘনা?' 'অনেকব্বার দেখন লাগে নাকি? একব্বারই খুব। গাঙ্গনের যদি হয় তো একব্বারেই গাইথা যায় মনের মইধ্যে। আপন দ্যাশ বইল্যা কথা। ক তোরা, ম্যাঘনার মতন নদী হয়? দ্যাখছস কখনো?'

মেঘনা যারা দেখেনি তারা বলে : 'নামটা সুন্দর।'

অমনি রেগে যায় চিমনিকাকু : 'ক্যান, শুধু নামটা ক্যান? নদীটাও সুন্দর। এক-একখান ঢেউ যদি দেকথি—'

'আচ্ছা চিমনি'—তার এক বন্ধু অমলকাকু বলে, 'এই-যে তুই পথেঘাটে সবসময়ে এ-রকম ভাষায় কথা বলিস, হাসে না কেউ? লজ্জা করে না তোর?'

ক্যান, লজ্জা করব ক্যান? নিজের মায়ের ভাষায় কথা কই, তার লইগগা লজ্জা করব ক্যান?'

সেই চিমনিকাকু হঠাৎ একদিন বলল আমাকে : 'এই ছ্যামরা, ময়দানে যাবি? ইস্টব্যাঙ্গল-মহমেডান খেলা আছে আইজ। দেখবি?'

ইস্টবেঙ্গলের খেলা? মাঠে গিয়ে দেখব? কাগজের ছবিতে নয়, একেবারে জ্যান্ত দেখতে পাব ভেঙ্কটেশ সালে আপ্পারাওকে? ছবির বাইরে সত্যি সত্যি দেখতে পাওয়া যায় এদের? কী অসম্ভব কথা।

অসম্ভবকে সম্ভব করবার আশা নিয়ে চিমনিকাকুর সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে ময়দানে গেছি সেদিন, এক শনিবার। জট পাকিয়ে পাকিয়ে মস্ত একটা লাইন দেওয়া শয়ে শয়ে মানুষ, আর খয়েরি রঙের ইয়া ইয়া ঘোড়ায় চাপা টহল দেওয়া পুলিস। উরিব্বাস, অ্যাত্ত বড় ঘোড়া? এ তো প্রায় জিরাফের গলার সমান উঁচু!

চিমনিকাকুর কাছে শুনলাম, ঘোড়ায় চাপা ওই পুলিসদের নাকি বলে মাউন্টেড পুলিস।

লাইনে দাঁড়িয়ে চিনেবাদামের খোলা ভাঙছি, কিছুক্ষণের মধ্যেই আপ্পারাওকে দেখতে পাব ভেবে রোমাঞ্চে আছি, আরাম করে ধোঁয়া ছাড়ছে চিমনিকাকু, এমন সময়ে লেগে গেল বিরাট একটা হুটপাটি। চিমনিকাকু বলে : 'ওই! লাইগগা গেল দমাদ্দম। খাড়া তো একটু এইখানে, দেইখ্যা আই একবার—' পায়ের কাছে-পড়ে থাকা একখণ্ড ইট কুড়িয়ে নিয়ে দৌড়ল লাইনের মুখের দিকে।

অল্প পরেই দেখি একেবারে একলা হয়ে গেছি আমি, ভয়-ভয় লাগছে। লাইন ভেঙে ছত্রখান, পায়ের চটি ছেড়ে যে যেদিকে পারে ছুটছে, উঁচু উঁচু তেলচকচকে সেই ঘোড়াগুলো ছুটছে তাদের পিছন পিছন, পুলিসরা সব উঁচিয়ে আছে বেটন। দূর থেকে শুনতে পেলাম চিমনিকাকুর গলা : 'লাগা লাগা, দৌড় লাগা, খাড়াইয়া থাকিস না ছ্যামরা।'

অমনি একটা লম্বা ছুট লাগাই চিমনিকাকুর সঙ্গে সঙ্গে। হল্লা আর থান-ইট ছুটে আসছে এপার থেকে ওপার থেকে, দৌড়তে দৌড়তে ভাবি, এ যে একেবারে সেই শ্রীকান্তের গল্পের মত দৌড়। গল্প তবে সত্যিও হয়? বেশিক্ষণ অবশ্য গল্পের কথা ভাববার সময় হল না। এই বুঝি পিঠে লাঠি পড়ল ভেবে অবশ হয়ে আসে পা, দৌড়তে দৌড়তে কোনরকমে এসে পৌঁছই ধর্মতলা স্ট্রিটে। চিমনিকাকু বলে : 'থাম্ এইবার, আর দৌড়ান লাগব না, হাঁটিয়াই যাওয়া যাইব এইবার। দেখলি কেমন, খেল্?'

খেলার বদলে এ-রকম একটা খেল্ দেখে আমার খুব ফুর্তি হবার কথা নয়।

চিনেবাদামগুলিও হাত থেকে পড়ে গেছে পথে। শুকনো মুখে হাঁটতে হাঁটতে বলি : 'কী হল বল তো?'

'হইব আর কী। টিকিটের লাইগ্যা হুড়াহুড়ি, এই দলে ওই দলে কাইজ্জা, তার পরে কে কার প্যাটের মইধ্যে সান্ধাইয়া দিছে ছুরি। ব্যাস, আর যাইবা কোথায়। এইরকম তো লাইগ্যাই আছে মাঠে।'

'কলকাতা এইরকম?'

'হ, এইরকমই কইলকাতা। ল, বাঁয়ে মোড় নে। বড়ো রাস্তা ছাড়।'

ঢুকে পড়ি বাঁ-পাশের এক গলিতে। চিমনিকাকুর কলকাতা মানেই এই অলিগলির কলকাতা। বলত চিমনিকাকু : 'বড়ো বড়ো রাস্তার বড়ো বড়ো দালানকোঠা, তার মইধ্যে আর মজা কী। ঠিক ঠিক কইলকাতার গন্ধ পাইতে চাস তো এইসব গলির মইধ্যে ঢুকতে হইব—'

'নীলমনি মিত্র লেনে?'

'শুধু নীলমণি মিত্র লেনে ক্যান?

মসজিদবাড়ি স্ট্রিটে, ঝামাপুকুর লেনে, পটলডাঙা স্ট্রিটে, সার্পেন্টাইন লেনে—সারপেনন্টাইন? বাঃ, নামটা তো বেশ। রাস্তার এইরকম

নামও হয়?'

সত্যি, কতরকম নামই হয় রাস্তার। সবচেয়ে বেশি অবশ্য হয় কোনও-না-কোনও মানুষের নামে।

একদিন তো ডব্লিউ সি ব্যানার্জি স্ট্রিটে ঢুকে আমার আর পা সরে না। চিমনিকাকু বলছিল : কী হইল রে? খাড়াইয়া পড়লি ক্যান?'

রাস্তার নামফলকের দিকে আঙুল তুলে বলি : 'ডব্লিউ সি ব্যানার্জি স্ট্রিট?'

'তো কী হইল?'

'সেই রাস্তায় আমি? যেখানে ডব্লিউ সি ব্যানার্জির নাম?'

চিমনিকাকু বলে। 'ঘোর বাঙাল তো ছ্যামরাটা! আরে, এইরকম তো কত নামই আছে। এইরকম দাঁড়াইয়া পড়লে তো নড়নচড়নই চলব না তোর কইলকাতায়।'

সেকথা আমার কানে ঢুকছিল না তখন। জ্ঞান বিজ্ঞানের মধুভাণ্ডে পড়েছি, কে-কি-কেন-কবে-কোথায় বইতে পড়েছি, জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম প্রেসিডেন্টের নাম কী? উত্তর : ডব্লিউ সি ব্যানার্জি। সেই ডব্লিউ সি ব্যানার্জি? পরে অবশ্য বুঝেছি চিমনিকাকুর কথাই ঠিক, ওইরকম দাঁড়িয়ে পড়লে তো কেবলই দাঁড়াতে হবে, সবদিকেই তো বিখ্যাত লোকের নাম। নামগুলি আস্তে আস্তে গা-সওয়া হয়ে এল।

অলিগলি দিয়ে গেলে কত কম হাঁটতে হয়, সেই জ্যামিতিটা তখন আমাকে বোঝাচ্ছিল চিমনিকাকু : 'ময়দানের থিক্যা বেলগাইচ্ছা, তার মানে হইল গিয়া দক্ষিণপশ্চিম থিক্যা উত্তরপুবে যাইতে চাইস তুই। তাহলে নাকবরাবর উত্তরমুখে হাঁটলে তো হইব না। কোনাকুনি হাঁটলেই তো সোজা হইব? না কী?'

'টু সাইড্‌স্ অব এ ট্রাঙ্গল্...ওইসব বলছ তো তুমি?

'হ্যাঁ...আর টুগেদার গ্রেটার দ্যান দি থার্ড সাইড। তো সেই থার্ড সাইডটা পাইতে হইলে, শর্ট কাট করতে হইলে কইলকাতার গলিগুলাই হইল আসল—' বলতে বলতে সেদিন বৌবাজার স্ট্রিটে এসে পৌঁছেছি আমরা। রাস্তার এধার থেকে ওধার পৌঁছে নতুন একটা গলির মুখে ঢুকতে যাব, এমন সময়ে এক কাণ্ড। উল্টো ফুটপাতে কিসের যেন জটলা। কী হচ্ছে ভিড়ের মধ্যে? সেদিকে তাকিয়ে চিমনিকাকু বিড়বিড় করে বলল আপন মনে : 'পড়ছে বুঝি ধরা। খাড়া তো একটু আইত্যাছি আমি।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'খাড়া খাড়া, আইত্যাছি এখনই।'

চোখের সামনে ওই ভিড়টার মধ্যে নিমিষে ঢুকে গেল চিমনিকাকু। অত বড় লম্বা মানুষটাকে একটুক্ষণের জন্য দেখাই গেল না আর। জটলাটা আরও পুঁটলি পাকিয়ে গেল। খানিক পরে হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বেরিয়ে এল চিমনিকাকু, পেরিয়ে এল পথটা, আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে বলল : 'চল একটু খাইয়া লই। টিকিটের পয়সাটা তো বাইচ্যা গেল।'

'কিন্তু করে এলে কী? কী হচ্ছিল ওখানে?'

'এই এট্টু হাতের সুখ কইর‍্যা আইলাম—'.

তারপর চোখ মটকিয়ে বলল—'বুঝলি না? মাইর‍্যা আইলাম একটু—'

'মেরে এলে? কাকে? কেন?'

'তা জানে কেডা? তোর মতনই বয়সের একটা ছ্যামরা ধরা পড়ছে ওইখানে, পিটাইত্যাছে সবাই, আমিও মারলাম দুইটা থাপ্পড়—'

'বাঃ, কিছু না জেনেই? বেশ তো—'

'আরে কিছু-একটা তো করছে নিশ্চয়ই, নাইলে কি শুধা-শুধা মারত্যাছে লোকে? ল, ঢোক এখন এইখানে, চা খাই একটু।'

একটা চায়ের দোকানে ঠেলে ঢোকাল চিমনিকাকু। ছোট ছোট কয়েকটা টেবিলের দু-দিকে দুটো দুটো করে চেয়ার, আমারই সেখানে বসতে কষ্ট হয়, চিমনিকাকু কেমন করে বসল কে জানে। বসেই একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল : 'এই-যে, এইখানে দুইটা মাটন চপ আর দুই কাপ চা।'

কাঠখোট্টা চেহারা, কাঁচাপাকা কদমছাটি চুল, পাঁচ আঙুলে চারটে আংটি পরা একজন বসে ছিল ঢুকবার ঠিক মুখেই একটা চেয়ারে, সামনে একটা টেবিল আর ক্যাশবাক্স। দোকানের মালিক নিশ্চয়।

চিমনিকাকুর কথা শুনেই হাঁক দিল সে : 'এই নন্টে, দেকচিস কী হাঁ করে, কানে যাচ্চে না কতা? দুটো মটন চপ, দুটো চা।'

এও আমারই বয়সী আরেকজন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল ওই হল্লা। মালিকের হাঁক শুনে সে চলে গেল ভিতরে।

আরও দুজন লোক ঢুকল দোকানে, বেশ ফিটফাট। চেয়ারে বসতে বসতে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েচে মশাই ওখানে? মারপিট তো দেখি লেগেই আছে রাস্তাটায়।'

মালিক বলল : 'আর বলবেন না। কদিন ধরেই একটা ছোঁড়া ঘুরঘুর করে এখানে। সবসময়ে বলে খিদে পেয়েচে। খিদে আর যায় না ওদের। আজ একেবারে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছে, দোকান থেকে কটা সিঙাড়া তুলে নিয়ে পালাচ্ছিল। ওঃ, এই রিফিউজিদের নিয়ে আর পারা গেল না মশাই। পঙ্গপালের মত জুটেছে এসে সব, দেশটাকে দিল একেবারে শেষ করে।'

তাকিয়ে দেখি, চিমনিকাকু উঠে দাঁড়িয়েছে হঠাৎ, একেবারে পালটে গেছে তার মুখ। চপ নিয়ে ততক্ষণে এসে গেছে নন্টে। এক ঝটকায় তাকে সরিয়ে দিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেল চিমনিকাকু, জিজ্ঞেস করল : 'কী কইলেন? রিফিউজি?'

'তবে আর কী? এই তো শেয়ালদা থেকে রোজ আসে দলে দলে, ভিখিরির মত, যত্তসব অপোগণ্ড হাড়হাভাতের দল—'

'চোপ' বলে একটা গর্জন করে উঠল চিমনিকাকু। সটান গিয়ে চেপে ধরল লোকটার জামার কলার। হিড়হিড় করে টেনে তুলল তাকে। হতভম্ব মালিক তখন বলছে : 'এটা কী? কী হচ্ছে এটা?'

'কী হইত্যাছে? হাড়হাভাতে? রিফিউজিরা?' 'আরে আরে, আপনাকে আমি কী বললাম, অ্যাঁ? মারবেন না কি?'

দোকানের আর রাস্তার অনেক লোক ছুটে এসেছে ততক্ষণে, ছাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছে দুজনকে, আর চোখ লাল করে চিমনিকাকু ঝাঁকিয়েই যাচ্ছে লোকটাকে, বলে যাচ্ছে শুধু : রিফিউজি? রিফিউজি? কে শ্যাষ করল দেশটারে? কে?'

অনেক চেষ্টায় থামানো হল তাকে। দোকান থেকে অনেকটা দূরে আমাদের সরিয়ে দিয়ে গেল কয়েকজন। প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটের মুখে ঢুকিয়ে দিয়ে বলে গেল ওরা : 'যান, এদিক দিয়ে বেরিয়ে যান সোজা। কলকাতার রাস্তায় অত মাথা গরম করলে চলে?'

চুপচাপ কয়েক পা হেঁটে বাঁদিকে গোবিন্দ সেন লেনে ঢুকে পড়ি আমরা। চিমনিকাকু কোনও কিছুই বলছে না আর। হাঁটতে হাঁটতে দেখি বসে পড়ল একটা ধাপির ওপর। আমার দিকে ফ্যাকাসে মুখ তুলে বলল : 'ওই পোলাটারে এখন পাই কোথায় ক তো?'

'কাকে?'

ওই যারে মারলাম? ভাইরে মারলাম? শ্যাষে আমার ভাইরে মারলাম আমি? নিজের দ্যাশের ভাইরে?' বলে লম্বা লম্বা দুটো হাতের পাতায় তার মস্ত মুখটা ঢেকে ফেলল চিমনিকাকু, ওই আধো-অন্ধকার গলির মধ্যে তার দুচোখ বেয়ে দরদর করে গড়িয়ে নামল জল।

রচনাকাল ১৯৮৫

সংগ্রাহক : রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

জয়দীপ চক্রবর্তী

গন্ধবাবা

পরিদাদু বলছিলেন, 'অতিমারিতে সাবধান থাকাটা যেমন জরুরি, একইরকম দরকারি অযথা সিঁটিয়ে না থাকাটাও।'

সুছন্দা চায়ের সঙ্গে খাওয়ার জন্যে আলু পকোড়া তৈরি করছিলেন রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে। কথাটা কানে যেতে, বলে উঠলেন, 'নাতিটাকে আর খেপিও না পরিকাকু। এমনিতেই বিকেল চারটে বাজতে না বাজতেই আজকাল সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ছে বাড়ি থেকে। এখন তুমি যদি বেশি সাহসী হয়ে ওঠার কথা বলো, একে আর ঠেকানো যাবে না।'

'খুব ভালো।' পরিদাদু সুছন্দার কথাটাকে তেমন গুরুত্ব না দিয়ে বললেন, 'তুই তো ভালো করেই জানিস খুকু, চিরকাল আমি দস্যি ছেলেদেরই দলে। দিন-রাত বই মুখে বসে থাকা গুড বয়দের আমার না পসন্দ...'

'ব্যস, হয়ে গেল।' সুছন্দা গজগজ করতে শুরু করলেন, 'শানুটা এমনিতেই বিশ্ব ফাঁকিবাজ। এখন অনলাইন ক্লাসের চক্করে পড়ে সেই ফাঁকিবাজি আরও বেড়েছে। তোমার কথা শুনে এইবার বইপত্তরে আর হাতই ছোঁয়াবে না।'

শানু চুপ করে অ্যাকটিভিটি টাস্ক টুকে নিচ্ছিল। প্রতিবাদ করে উঠল, 'আমি পড়াশুনোয় ফাঁকি দিই না পরিদাদু। লাস্ট সামেটিভ এগজামেও আমি কিন্তু অ্যাবাভ নাইনটি পারসেন্ট পেয়েছি...'

পরিদাদু শানুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'তোর মা তোকে গড়পড়তা বাঙালি করে রাখার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে রে। এরপর কোনদিন

ছবি ঃ ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

দেখবি আমার সঙ্গে খুকু তোকে আর মিশতেই দেবে না...'

'পরিকাকু। খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু বলে দিচ্ছি।' ট্রে-তে সাজিয়ে চা আর পকোড়া নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে হাসিমুখে বললেন সুছন্দা, 'তুমি শানুকে আমার বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলছ।'

অরুণাংশু খবরের কাগজে পড়ছিলেন গম্ভীর মুখে। কাগজ রেখে সোজা হয়ে উঠে বসলেন। চায়ে চুমুক দিয়ে পরিদাদুর দিকে চাইলেন, 'তোমার মতলবটা কী, ঝেড়ে কাশো তো। নাতির জন্যে হঠাৎ এমন দরদ উথলে উঠল।'

পরিদাদু হেসে বললেন, 'শানুটার কথা ভাবলে মায়া লাগে অরুণ। সারাদিন কম্পিউটার, মোবাইলে মুখ গুঁজে রয়েছে। মাঝেমধ্যে কাছেপিঠে হলেও একটু বেড়িয়ে টেড়িয়ে আসা উচিত।'

'এই অবস্থায় কোথায় যাবে? অবিশ্যি অনেকেই বেরিয়ে পড়ছে। সোস্যাল মিডিয়ায় ছবিও পোস্ট করছে। কাঁহাতক ভয়ে ভয়ে নিজেদের ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখবে মানুষ? কিন্তু আমার বাপু ভরসা হয় না। আমাদের বুস্টার ডোজও হয়ে গেছে। শানুটার তো সে সুরক্ষাটুকুও নেই।'

'ওরও তো স্কুল থেকে ভ্যাকসিনের বন্দোবস্ত হয়েছে।'

'হয়েছে।' শাওন ঘাড় কাত করে বলল।

'তাহলে আর কী। ধেই ধেই করে নেচে বেড়াও।' সুছন্দা রাগী গলায় বলে।

'হুঁ।' পরিদাদু বললেন, 'বেড়ানো মানে দূরে যেতে হবে কেন? চারদিকে চোখ মেলে তাকালেই যে কত দেখার জিনিস আছে।'

শাওন অমনি বলে উঠল, 'দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া/ ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া/ একটি ধানের শিষের ওপর/ একটি শিশিরবিন্দু...'

'ঠিক।' পরিদাদু বললেন, 'তেমনই একটা শিশিরবিন্দু দেখে আসি চলো। কাছেই।'

'কোথায়?' অরুণাংশু জিগ্যেস করলেন।

'আঁধারমানিক।'

'অ্যাঁ! কোথায়?'

'বারুইপুর থেকে যে রাস্তাটা সোজা আমতলার দিকে চলে গেছে, সেই পথে। বারুইপুর, পদ্মপুকুর থেকে খুব বেশি হলে মিনিট কুড়ি পঁচিশের জার্নি।'

'কী ব্যাপার বলো তো? হঠাৎ আধাঁরমানিক নিয়ে পড়লে কেন?' অরুণাংশু বললেন।

পরিদাদু এক মুহূর্ত চুপ করে বসে রইলেন। তারপর বললেন, 'এই ছোট্ট ট্রিপটা সাজেস্ট করছি খুকুর জন্যেই।'

'তাই নাকি?' সুছন্দা বললেন।

'ইয়েস ম্যাডাম', পরিদাদু হাসলেন, 'আমরা বাকিরা এই ট্রিপে ফাউ।'

'কেন?' সুছন্দা জিগ্যেস করলেন।

'দিন দুই-তিন হল, এক আশ্চর্য সাধুর খবর কানে আসছিল।'

'কী রকম?' অরুণাংশু জিগ্যেস করলেন।

'আধাঁরমানিক এলাকার ফকিরপাড়ায়, বট-অশ্বত্থের ঝুরির ফাঁকে বহু প্রাচীন এক মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে।'

'কোন ঠাকুরের মন্দির গো পরিকাকু?'

'মন্দিরটা কোন ঠাকুরের তা কেউ জানে না। জানার উপায়ও নেই।'

'কেন?'

'ওটা এতই প্রাচীন যে মন্দিরটা কার বানানো, কোন দেবতা সেখানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, কিছুই জানা যায়নি। মাটি খুঁড়তে গিয়ে ওই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষটুকুই পাওয়া গেছে। তবে ওই এলাকার মানুষেরা জায়গাটিকে খুব মানে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দু-একখানা পাথরকেই শিব হিসেবে পুজো করে ওরা। মেলা বসে চৈত্র-বৈশাখ মাসের দিকে।'

'এখন তো মেলার সময় নয়।' শাওন বলল।

'না, এখন মেলার সময় নয়', পরিদাদু শাওনের কথারই প্রতিধ্বনি করলেন, 'আমরা সেখানে যাব অন্য একটি কারণে। প্রায় সপ্তাখানেক হল গাছের নীচে এক সাধু এসে আস্তানা গেড়েছেন। এলাকার লোক তাঁকে গন্ধবাবা নাম দিয়েছেন।'

'গন্ধবাবা।' শাওন মজা পেয়ে জিগ্যেস করল।

'হ্যাঁ, তিনি সর্বক্ষণ কুমকুম-চন্দন লেপে রাখেন কপালে, গায়ে। আর একটিই কথা বলেন, আমি এক বিশেষ পুষ্পগন্ধ খুঁজতে এসেছি।'

'ফুলের গন্ধ! কোন ফুলের?' সুছন্দা আশ্চর্য হয়ে বলে উঠলেন।

'সেইটেই তো রহস্য!' পরিদাদু ঠোঁট ওল্টান, 'এলাকার মানুষ যে যেমন পাচ্ছে, নিয়ে আসছে সাধুর কাছে। সাধু ফিরেও তাকাচ্ছেন না সেসব ফুলের দিকে। বলে চলেছেন, ইয়ে নেহি, ইয়ে নেহি।'

'তাঁর খাওয়া থাকা?' অরুণাংশু জিগ্যেস করলেন।

'গ্রামের লোকই খাওয়ার ব্যবস্থা করছে। আহার তাঁর সামান্য। একমুঠো নিরামিষ সেদ্ধ ভাত। রাতে একবাটি দুধ...'

'ব্যস?' সুছন্দা অবাক হয়ে বলেন।

'হ্যাঁ ওইটুকুই।' পরিদাদু মাথা নাড়লেন, 'রাতে ওই গাছের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে মন্ত্রোচ্চারণের ঢঙে এক অদ্ভুত গান করেন...'

'কী গান?'

পরিদাদু একটা অর্থহীন ছড়া কাটতে শুরু করলেন,

'যে ফুল থেকে রক্ত ঝরে যে ফুল ঝরায় রক্ত
যে ফুল ভক্ত শক্তেরও নয় যে ফুল সত্যভক্ত...
সেই ফুলেরই গন্ধে ছোটে হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি
জাদুকরের ঝোলায় ঘুমোয় শুভেচ্ছা ও প্রীতি...
কার হাতে দিই, কার হাতে দিই আঁকড়ে রাখা সুতো
যে বোঝে সে বুঝবে জানি ছল, চাতুরি, ছুতো...
বুঝতে পেলেই আসুক ছুটে সেই ফুলটির গন্ধ
আলো যখন কালোয় ঢেকে দু চোখ রাখে বন্ধ...'

'আরে, এ তো বাংলা গান!' সুছন্দা অবাক হয়ে বলে উঠলেন, 'একটু আগে তাঁর 'ইয়ে নেহি' বলা শুনে ভেবেছিলাম সাধু নন বেঙ্গলি।'

'কবিতাটা কিন্তু খুবই ইন্টারেস্টিং।' অরুণাংশু চোখ গোল গোল করে বলে উঠলেন, 'এটা একটা হেঁয়ালি নাকি হে পরিমল? নাকি কোনো গুপ্তধনের সূত্র-টুত্র?'

'সেইটেই তো বুঝতে চাইছি।' পরিদাদু মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, 'সেইজন্যেই সাধুর সামনাসামনি হওয়াটা দরকারি।'

'তাই বলো।' সুছন্দা বললেন, 'আমার জন্যে ট্রিপ প্ল্যান করার কথাটা ফাঁকা বুলি।'

'তা কেন?' পরিদাদু নরম গলায় বললেন, 'তেমন হলে আমি তো একাই গিয়ে ঘুরে দেখে আসতে পারতাম। আমার বন্ধু শ্যামল থাকে ওখানে। ভাবলাম, তোর সাধু-টাধুর ওপরে এত ভক্তি শ্রদ্ধা। গন্ধবাবাকে তোর ভালোই লাগবে...'

'শ্যামলবাবুই কি এতসব জানিয়েছেন তোমায়?' অরুণাংশু জিগ্যেস করলেন।

'হ্যাঁ।' শ্যামল সাধুর এই উদ্ভট গান নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করছিল। বলছিল, এলাকায় কোথা থেকে একটা আধ পাগল সাধু এসে জুটেছে অথচ গ্রামের লোক তাকে নিয়েই মেতে আছে। লোকটা সত্যি-সত্যিই

পাগল না হতেও তো পারে। কে যে কী মতলব নিয়ে ঘুরছে, ওপর থেকে দেখে কি বোঝা যায়?'

'শ্যামলবাবুর কথাটা উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয় কিন্তু।' অরুণাংশু বললেন।

'কে উড়িয়ে দিচ্ছে? আমি যথেষ্ট সিরিয়াসলিই নিচ্ছি ব্যাপারটা। গানটাও রীতিমতো ভাবাচ্ছে আমায়।'

২

দক্ষিণমুখী পুরনো মন্দিরটা প্রায় ধ্বংসস্তূপ হয়ে গেছে। তিন দিকের ফুট সাতেক উঁচু দেওয়াল ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। দেওয়ালগুলো কাদার গাঁথনিযুক্ত খুব পাতলা পাতলা ইট দিয়ে তৈরি।

'এই মন্দির কত দিনের পুরনো?' অরুণাংশু জিগ্যেস করলেন।

'খুব পুরনো।' শ্যামল মণ্ডল হাসলেন, 'কিন্তু কত পুরোনো তা কেউ বলতে পারে না। একবার মন্দিরের সামনে মাটি কাটার সময় একটা তামার সিকি পাওয়া গিয়েছিল। ১৮৩৫ সালের। লোকে বলে এটা শিবমন্দির। কয়েকটা প্রাচীন কালো পাথর আছে মন্দিরের মধ্যে। ওগুলোকেই শিবজ্ঞানে পুজো করে সবাই।'

'হুঁ', মাথা নাড়লেন অরুণাংশু, 'তার মানে অন্তত দুশো বছরের পুরনো।'

'তার থেকে অনেক বেশি', পরিদাদু বললেন, 'মন্দিরের ইটের গঠন তাই বলে। এসব অঞ্চল অত্যন্ত পুরনো। সঠিক উপায়ে খুঁড়লে প্রচুর পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়ার সম্ভাবনা।'

গন্ধবাবা বসেছিলেন মন্দির থেকে খানিক তফাতে। মাটির একটা চ্যাটালো ঢিবির ওপরে। আধবোঁজা চোখ। পরনে ত্যাগবস্ত্র। লম্বা চুলে জটা। গোঁফ দাড়িতে মুখ প্রায় ঢাকা। ফাঁকা অংশটুকুতে চন্দন লেপে রাখা। তাঁর হাতে পায়ে মাথায় নানান ধরনের সুগন্ধী ফুলের সাজ। ভক্তদের দেওয়া।

শ্যামল মণ্ডল চাপা গলায় বললেন, 'বুঝলি পরিমল, গন্ধবাবা দু'বেলা নিজের আহার্যটুকু ছাড়া দক্ষিণা, ফল, মিষ্টি, কিছু নেন না। কথাও বলেন না তেমন।'

'আশ্চর্য!' সন্ন্যাসীর দিক থেকে চোখ না সরিয়ে বললেন পরিদাদু।

সুছন্দা বললেন, 'কী একটা যেন ম্যাজিক আছে মানুষটার চেহারার মধ্যে। দেখলেই মনে ভক্তি আসে।'

'চল খুকু, সামনে গিয়ে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে আসি।' বলেই সামনের দিকে হাঁটা লাগালেন পরিদাদু। শাওন মনে মনে উত্তেজনা বোধ করছিল। অবিশ্বাসী না হলেও সাধু-টাধুর প্রতি তেমন ভক্তিও পরিদাদুর নেই। তার মানে কোথাও একটা খটকা লেগেছে পরিদাদুর।

সামনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু মানুষ বসে ছিল। তারা সরে গিয়ে ওদের জায়গা করে দিল। সুছন্দা মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। শাওন আর অরুণাংশুকেও বললেন। পরিদাদু গন্ধবাবার সামনে গিয়ে মাটির ওপরে বসে পড়লেন। দু'হাত বুকের কাছে জড়ো করে প্রণাম জানালেন তাঁকে। গন্ধবাবা স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন পরিদাদুর দিকে। গোঁফ-দাড়ির আড়ালে তাঁর মুখে ধীরে ধীরে একটা রহস্যময় মৃদু হাসি ফুটে উঠেই আবার মিলিয়ে গেল। সে হাসিটুকু শাওনের চোখ এড়াল না।

সুছন্দা নিজের পার্স থেকে একটা ঝকঝকে একশো টাকার নোট বের করে গন্ধবাবার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। প্রণামী। কিন্তু গন্ধবাবা সজোরে দু'দিকে মাথা নাড়াতে লাগলেন। সুছন্দা প্রায় জোর করেই টাকাটা তাঁর পায়ের ওপরে রাখলেন। গন্ধবাবা দ্রুত মাটি থেকে টাকাটা তুলে নিয়ে নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে মুঠো বন্ধ করলেন। চোখ বুজিয়ে বসে রইলেন। তারপর শাওনের ডান হাতটা টেনে নিয়ে তার তালুর ওপরে নিজের মুঠো খুলে ফেললেন। একশো টাকার নোটটির সঙ্গে আরও একটা এক টাকার কয়েন।

সুছন্দার হাত কাঁপতে লাগল। পরিদাদুর কপালে ভাঁজ পড়েছে।

গন্ধবাবার মুখে আবার একটা অদ্ভুত হাসি ছড়াল। হঠাৎই পরিদাদুর দিকে চাইলেন। গলায় কৌতুক নিয়ে বললেন, 'অপেক্ষা করতে করতে যে ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছিলাম।'

'আমার জন্যে?'

'তা নইলে কার জন্যেই বা এখানে আসন বিছিয়ে বসে আছি?'

'কিন্তু কেন?' ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া গলায় জিগ্যেস করলেন পরিদাদু।

গন্ধবাবা সে প্রশ্নের আর উত্তর দিলেন না। চোখ বুজিয়ে দু'হাত তুলে দুলে দুলে গাইতে শুরু করলেন,

'যে ফুল থেকে রক্ত ঝরে যে ফুল ঝরায় রক্ত
যে ফুল ভক্ত শক্তেরও নয় যে ফুল সত্য ভক্ত...
সেই ফুলেরই গন্ধে জোটে হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি
জাদুকরের ঝোলায় ঘুমোয় শুভেচ্ছা ও প্রীতি...

৩

ফেরার সময় অটোতে পরিদাদু অন্যমনস্ক গলায় একবার বললেন, 'গন্ধবাবার হাতের আঙুলগুলো, গলার স্বর, চেনা চেনা লাগছে কেন?

তাঁকে কি আগে দেখেছি?'

সুছন্দা বললেন, 'আজ আমাদের ওখানেই রাতের খাওয়াটা সেরে যেও।'

'উঁহু', দু' দিকে মাথা নাড়ালেন পরিদাদু, 'আমাকে বাড়ি যেতে হবে।'

'কেন?' অরুণাংশু ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করলেন, 'কী এমন জরুরি কাজ?'

'আমার একটু একা থাকা দরকার।'

'আমার বাড়িতে একা থাকতে কে আটকাচ্ছে তোমাকে?' অরুণাংশু বললেন, 'তোমার জন্যে একখানা ঘর তো রাখাই থাকে। সেখানে বসে শুয়ে যত খুশি ভাবো না। বুঝতেই তো পারছি, কিছু একটা রহস্য দানা পাকিয়ে উঠছে। সে রহস্যটা যে কী, তা না জানা পর্যন্ত আমরাই কি নিশ্চিন্ত হতে পারব?'

'আচ্ছা ঠিক আছে। চলো।'

শাওন মনে মনে খুশি হল। পরিদাদু সঙ্গে থাকলে তাকে আর পায় কে। পরিদাদুর সঙ্গে থাকলে সন্ধেবেলা পড়তে না বসলেও মা তেমন বকাবকি করতে পারবে না।

তেমনটা অবশ্য হল না। বাড়ি ফিরে হাত-মুখ ধুয়ে, চেঞ্জ করে সেই যে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন পরিদাদু, বেরোবার নামটিও নেই। সন্ধে গড়িয়ে রাত নামল।

ঘড়ির কাঁটা যখন দশটার দিকে গড়াতে শুরু করেছে, সুছন্দা অরুণাংশুকে বললেন, 'পরিকাকুর ব্যাপারটা কী বলো তো? খাওয়া-দাওয়া করবে না?'

'ডাকব?' একটু ইতস্তত ভঙ্গিতে বললেন অরুণাংশু। আর ঠিক তখনই দরজা খুলে বেরোলেন পরিদাদু। পুরো মুখটা খুশিতে ঝলমল। সুছন্দার দিকে তাকিয়ে তাড়া দিলেন পরিদাদু, 'খুকু, জলদি খাওয়ার বন্দোবস্ত কর। এক্ষুনি বেরোতে হবে।'

'এখন, এই রাতে?' অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন অরুণাংশু।

হ্যাঁ, 'আঁধারমানিক', পরিদাদু একগাল হাসলেন, 'শ্যামলকেও বলে দিয়েছি। ও অপেক্ষা করবে। হাতে সময় নেই আর।'

'ব্যাপারটা কী?' সুছন্দা চোখ বড় বড় করে জিগ্যেস করেন।

'আমি সত্যিই এবার বুড়ো হচ্ছি।' পরিদাদু হো-হো করে হেসে উঠলেন, 'নইলে এই সামান্য বিষয়টা বুঝতে এত সময় লেগে গেল আমার!'

'অত ভনিতা না করে ব্যাপারটা একটু খুলে বলবে?' অরুণাংশু অসহিষ্ণু গলায় বললেন।

পরিদাদু হাসতে হাসতেই বললেন, 'গন্ধবাবার গানটা আমার উদ্দেশে একটা সোজাসাপটা মেসেজ। সুচিন্তন আমাকে গভীর রাত্রিতে তার সঙ্গে দেখা করতে নির্দেশ দিচ্ছে।'

'সুচিন্তনটা আবার কে?'

সুচিন্তন আমার এবং শ্যামলের বহুদিনের বন্ধু। আঁধারমানিকেই থাকত। ছেলেবেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবি এবং খামখেয়ালি ছিল। কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়ে দারুণ রেজাল্ট করেও চাকরি-বাকরি না করে পেশাদার ম্যাজিশিয়ান হয়ে গেল ছেলেটা। ব্ল্যাক ম্যানড্রেক নামে দেশে বিদেশে খেলা দেখিয়ে বেড়াত এক সময়...'

'ঠিক, ঠিক।' অরুণাংশু মাথা নাড়লেন, 'মনে পড়েছে। কিন্তু বহুদিন তাঁর শো-এর আর কোনও বিজ্ঞাপন দেখি না।'

'দেখবে কী করে?' অন্তত বারো-তেরো বছর ধরে সে তো নিরুদ্দেশ। কেউ তার খবর পাইনি। আজ এতদিন বাদে তাকে আবার দেখলাম।' পরিদাদু থামলেন। হেসে বললেন, 'আর শ্যামল তো এখনও চিনে উঠতে পারেনি তাকে...'

'গন্ধবাবা?' শাওন বলে ওঠে।

'আবার কে?' হাসতে হাসতে মাথা নাড়লেন পরিদাদু।

খেতে খেতে শাওন জিগ্যেস করল, 'কিন্তু ওই গানটার মানে আমি তো এখনও বুঝতে পারছি না পরিদাদু।'

'আমিও বুঝিনি।' সুছন্দাও বললেন।

'বোঝার জন্যে মাথা ঘামাতে হবে।' পরিদাদু মৃদু হাসলেন।

'মাথা আমাদের অত সহজে ঘামে না।' খেতে-খেতেই অরুণাংশু বললেন, 'তুমিই বলে দাও বাপু।'

জামালকাকু এসে গেছে। শাওনরা গাড়িতে চড়ে বসল। যেতে যেতে পরিদাদু বলতে থাকলেন, 'সুচিন্তনটা সন্ন্যাসী হয়েও পাল্টায়নি। একইরকম ইন্টেলিজেন্ট আর রহস্যপ্রিয়। আমাদের কাছে সরাসরি পরিচয়টা ভাঙতে পারত। তা নয়, সেই আমাকে পরীক্ষায় ফেলা।'

'কিন্তু গানের মানেটা?'

'পরিমল শব্দটার মানে জানিস শানু?'

'হুঁ।'

'কী?'

'ফুলের গন্ধ।' বলেই চমকে উঠল শাওন, 'আরিব্বাস, পরিদাদু কী দারুণ! যে ফুল থেকে রক্ত ঝরে/ যে ফুল ঝরায় রক্ত... তুমি সেনাবাহিনীতে ছিলে বলেই...'

'সাবাশ।'

'তুমি তো সত্যি সত্যিই চিরকাল শক্তের নয়, সত্যেরই ভক্ত...', অরুণাংশু হাসলেন, 'গন্ধবাবা যে বিশেষ পুষ্পগন্ধ খুঁজছেন তার সন্ধান তো পাওয়া গেল। কিন্তু জাদুকরের ঝোলায় কী প্রীতি উপহার আছে বলো তো তোমার জন্যে?'

'গিয়ে দেখা যাক।' পরিদাদু হাসলেন।

সুছন্দা বললেন, 'কিন্তু এই মাঝরাত্তিরে তাঁর কাছে যাওয়া কেন?'

'সেটাও সুচিন্তনই বলতে পারবে', পরিদাদু বললেন, 'আমি শুধু তার নির্দেশ পালন করছি। ওই যে সে তার গানের ধাঁধার শেষে বলে দিয়েছে, আলো যখন কালোয় ঢাকা থাকবে এবং সকলের দু'চোখ বন্ধ থাকবে, তখনই ছুটে যেতে হবে তার কাছে।'...

গন্ধবাবা মাটির বেদির ওপরেই বসেছিলেন। আকাশে চাঁদ জ্বলজ্বল করছে। পরিদাদুদের দেখেই উঠে দাঁড়ালেন, দু' হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'জানতাম, পরিমল আমার বার্তাটা বুঝবেই এবং আজই ফিরে আসবে। আমিও বসে আছি তোদেরই অপেক্ষায়।'

শ্যামল অভিমানের সুরে বললেন, 'আমাকে নিজের পরিচয়টা দিতে কী হয়েছিল তোর? শুধু-শুধু এই ক'দিন এত কষ্ট করে খোলা আকাশের নীচে পড়ে রইলি। আগে জানলে কিছুতেই এখানে থাকতে দিতাম না।'

'ওইজন্যেই তো পরিচয় দিইনি।' গন্ধবাবা ভারি মিষ্টি করে হাসলেন, 'সন্ন্যাসীর পূর্বাশ্রমের নাম মুখে নেওয়া নিষেধ। গৃহীর বাড়িতে গিয়ে ওঠাও তার পক্ষে সমীচীন নয়।'

'তাই বলে —'

'আমার এখানকার কাজ শেষ। সন্ন্যাসের নিয়মানুযায়ী গৃহত্যাগের বারো বছর পরে একবারের জন্যে এসেছিলাম ভিটে দেখতে। আর এসে মনে হল, একটা কাজ বাকি থেকে গেছে এখনও! তখনই পরিমলের কথা মনে এল। মনে হল, 'আমার এই কাজে পরিই ঠিকঠাক সাহায্য করতে পারবে আমাকে। সে জন্যেই তোর মারফত পরিমলকে ডেকে আনতে চেয়েছিলাম আমার কাছে ওই গানের মধ্যে দিয়ে।'

'তুই কিছু একটা দিতে চাস আমাকে?'

'হ্যাঁ রে পারি। এইটে', ঝোলা থেকে একটা ইঞ্চি ছয়েক লম্বা কালো পাথরের মূর্তি বের করে এনে পরিদাদুর হাতে দিলেন গন্ধবাবা, 'জাগতিক এই একটি জিনিসের মোহই আমি ত্যাগ করতে পারিনি এতদিন। সঙ্গে করে বয়ে বেড়িয়েছি। অনেকদিন থেকেই মনে হচ্ছিল, সন্ন্যাসীর পক্ষে এ আসক্তিটুকুও বেমানান। এখানে আসার পর মনে হল, এই ঠিক সময়। নিজের পুরনো ভিটের মায়া যখন চিরকালের মতো ত্যাগ করতে চলেছি, সে বালগৃহের ইষ্টমূর্তিকেই বা বয়ে বেড়াই কেন। মাঝপথেই তোর মুখ ভেসে উঠল পরিমল। আমার এই শেষ সুকৃতির সঠিক মূল্য একমাত্র তুইই হয়ত বুঝবি। তাই চাইছিলাম, তোর হাতে এঁকে তুলে দিয়ে যাই যাতে এই মূর্তির একটা কোনো উপযুক্ত বন্দোবস্ত হয়।'

'কী মূর্তি এটা?' পরিদাদু, শ্যামল মণ্ডল, অরুণাংশু তিনজনেই একইসঙ্গে জিগ্যেস করলেন।

'প্রায় হাজার খানেক বছরের পুরনো, খুব রেয়ার তারামূর্তি। জটারমানিকের এই প্রাচীন মন্দিরের কাছে মাটি খুঁড়েই পাওয়া গিয়েছিল একসময়। আমার ঠাকুর্দা পেয়েছিলেন। আমাদের বাড়ির দক্ষিণ দিকের পুকুরটা খুঁড়তে গিয়ে। জেনে আশ্চর্য লেগেছিল, আমার ঠাকুর্দা সেকালেও কত আধুনিক মনের মানুষ ছিলেন। দেবীমূর্তি নয়, এই পাথরের মূর্তিটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নানিদর্শন হিসেবেই সংরক্ষণ করেছিলেন তিনি।

'জিনিসটা পেলি কোথায়?' পরিদাদু জিগ্যেস করলেন।'

'বাড়ির একটা পুরনো ট্রাঙ্ক থেকে মূর্তিটা উদ্ধার করেছিলাম। সঙ্গে ঠাকুর্দার হাতে লেখা একটা নোটবুক', ঝোলা থেকে একটা জীর্ণ খাতার মতো কিছু বের করে মূর্তিটার সঙ্গে একইসঙ্গে পরিদাদুর হাতে দিলেন গন্ধবাবা, 'এই যে। এই দুটো জিনিস তোকে দিয়ে আজ সত্যিকারের ফকির হলাম আমি পরিমল। ঠাকুর্দাদার নোটবইটা সময় করে পড়িস। লেখাগুলো পড়ে দেখলে বুঝতে পারবি, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ইতিহাস নতুন করে লেখা সত্যিই কতখানি জরুরি...।'

'এগুলোর কথা পাঁচকান করতে চাস না বলেই এত রাতে ডেকে পাঠালি?' পরিদাদু হাসলেন।

'ঠিক তাই।' গন্ধবাবা পরিদাদু আর শ্যামল মণ্ডলের কাঁধ স্পর্শ করলেন, 'বুঝিসই তো সব। এলাকার মানুষের সেন্টিমেন্ট অন্যরকম হতেই পারত। তারা এসব জানলে হয়ত এই মূর্তি ভাঙা মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে পুজো করারই দাবি করে বসত। অথচ তুই তো জানিস, আইনত তা হয় না...।'

'এখন তুই যা ভালো বুঝিস করিস', তারপর মৃদু গলায় বললেন 'আসি। রাতে না হলে এত সহজে এ গ্রামের মানুষের কাছ থেকে ছুটি পাওয়াও ভারি মুশকিল হতো। আমার পরিচয় এরা কেউ জানে না। সে পরিচয় কেউ জানুক তা আমি চাইওনি। কিন্তু একজন অচেনা সন্ন্যাসী হিসেবেও যে ভালোবাসার বাঁধনে এরা আমাকে বেঁধেছে, সে বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়াও কম কঠিন নয়। সে আমার সন্ন্যাসধর্মের পক্ষে বড় হানিকর।'

'আসি মানে?' শ্যামল জড়িয়ে ধরলেন তাঁকে, 'এতক্ষণ ধরে তোর অনেক লেকচার শুনেছি। কিন্তু আর নয়। এবার তোকে আমি কিছুতেই ছাড়ব না।'

'আমি রমতা সাধু', গন্ধবাবা হাসেন, 'একজায়গায় বেশিদিন থাকার জো নেই আমার। বুঝলি রে, এই আনন্দের ভাগ হয় না।'

তারপর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে কারও দিকে না তাকিয়ে জ্যোৎস্নাভেজা পথের ওপর দিয়ে হাঁটতে থাকেন গন্ধবাবা।

শাওন একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে সেই ক্রমশ ফিকে হয়ে যাওয়া ছায়ামূর্তির দিকে। **কিশোর ভারতী**

সুখেন্দু মজুমদার

রোদের রুমাল

আটকে থেকে খাঁচার মাঝে
মন বসে না কোনও কাজে।

আসতে গিয়ে পাড়ায় ভিন
রাত নাচছে তা ধিন ধিন।

নদীর বুকে জাগছে চর
চেনা মানুষ কেউবা পর।

ভয়ভীতিতে কাঁপছে বুক
মুখোশ আঁটা, কোথায় মুখ।

মনের কথা পাহাড় প্রায়
কয়েকটা তার হারিয়ে যায়।

বাতাস বলে, ফেরত নেবে
একটু পাশে বসতে দেবে।

ঘরের কড়া ঝনাত ঝন
ভাঙ, ভেঙে ফেল থাক বারণ।

থাকে থাকুক হাজার মানা
এই নে রোদের রুমালখানা।

কাজী মুরশিদুল আরেফিন

বড় হতে চাও

বড় হতে হতে আরও বড় হও
হয়ো না কো কেউ ছোটো,
রোদ গায়ে মেখে ছোট কুঁড়ি থেকে
ফুল হয়ে তুমি ফোটো।

সাগরের মতো কেউ বড় নয়
আকাশের মতো হবে?
পাহাড়ের মতো বড় হতে চাও
সূর্যটা হবে কবে?

বড় বড় তারা জ্বলে মিটিমিটি
দূরবিনে চোখ রাখো,
হোক ওটা বড়, চাঁদটাকে তুমি
খাতাতেই বসে আঁকো।

দুনিয়াটা দ্যাখো দুই চোখ মেলে
থাকবে না এক কোণে,
বড় হতে চাও মানুষের মতো
বড় হও আগে মনে।

ছবি: সৌজন্য চক্রবর্তী

সাগরিকা রায়

মধুবাতা ঋতায়তে

মধু একগাদা ওষুধপত্র নিয়ে এসে বেডসাইড টেবিলের ওপরে রাখতে রাখতে মাকে দেখল, 'শরীর ঠিক আছে মা? পেটের ব্যথাটা নেই তো এখন?'

সুভার পেটের ব্যথা আছে। না, মধুকে বলবে না সুভা।

বাইরে মোহনা কাকে কী বলছিল। মা অসুস্থ বলে মাঝে মাঝেই চলে আসে। সুভার মনে হল আজ বৃষ্টি হতে পারে। বৃষ্টিতে সুভার ভারি ভয়। চট করে ঠান্ডা লেগে যাওয়াটা সুভার একটা রোগ। আর মা অসুস্থ হলে মধু ভারি বিব্রত হয়ে পড়ে। এলোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি করে মাকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করে। বয়স তো বেশি নয় ছেলের। মাত্র পনেরো। কিন্তু বড্ড দায়িত্বজ্ঞান। কোনওভাবেই মাকে কষ্ট দিতে চায় না মধু।

সুভা আস্তে আস্তে উঠে বসল। আজ শরীরটা একটু ভালো। মধুর জন্য ঘন দুধের চা বানাতে ইচ্ছে করছে। ছেলেটা ভালোবাসে। ও একটু পরে কোচিং-এ যাবে। অতিমারির কারণে দুটো বছর বড্ড এলোমেলো গেছে। এখন আস্তে আস্তে সমে ফিরছে সব। কলোনির নেপুর মুখ মনে পড়ে সুভার। করোনাতেই চলে গেল নেপু। ওর মায়ের সঙ্গে বেশ ভাব ছিল। নেপুর মা কোথায় আছে এখন?

মাকে চা বানাতে দেখে খুশি হল মোহনা, 'আমাকে এট্টু দিও মা। কতদিন তোমার হাতের চা খাইনি।'

ভালো লাগে সুভার। ছেলেমেয়ের সঙ্গে আগের মতো করে বাঁচতে ইচ্ছে করে। মাঝে মাঝে সবকিছু কেমন উল্টোপাল্টা হয়ে যায়। কখনও কখনও অনেক দূর থেকে তুফানি জেঠির ডাক শোনে সুভা, 'ও সুভা, এদিকে আয়। তেঁতুল যে পেকে গেল। পাড়তে হবে।' সেই সময় অদ্ভুত সুন্দর বাতাস বয়ে যায়। মিষ্টি গন্ধ সেই বাতাসে।

আর তখনই ছেলেবেলার মানিকপুর গ্রাম, শেতলা মন্দিরের পিছনের তেঁতুলগাছটা হুট করে সামনে চলে এসে

ডালপালা নাড়াতে থাকে। সে যেন হো-হো করে হাসছে, 'সুভা...সুভা... ধরতে পারে না না...।'

মধু ডেকে উঠলেই চমক ভাঙে সুভার।

আজ মধুকে খাওয়াতে ইচ্ছে হল বলে আলুর পরোটা বানিয়েছে সুভা। মধু খেতে খেতে রাগ করছে, 'কেন তুমি...? একা বাড়িতে থাকো। আগুনের সামনে কি না গেলে চলছিল না?'

সুভা হাঁপিয়ে গিয়েছে। অনেকদিন পরে চাপ পড়েছে শরীরে। শুয়ে থাকতে থাকতে জবুথবু হয়ে পড়ছিল। এখন হাঁপ ধরেছে। তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

ময়দা মেখে দিয়ে গেছে মোহনা। ওর কাছাকাছি বিয়ে হয়েছে, সময় পেলেই মাকে দেখে যায়। সুভা জানলার সামনে বসে দূরে কোথায় ঠং-ঠং করে বাসন পড়ার আওয়াজ পায়। কাদের বাড়িতে বাসন পড়ল? সংসারের খুটিনাটি শব্দ ভালো লাগে।

সুভা বিছানায় বসে গল্পের বই পড়ার চেষ্টা করে। মধু বাইরের জামাপ্যান্ট চেঞ্জ করে মায়ের কাছে এসে বসল। হেসে বলে, 'কেমন গল্পটা? নিঝুমপুরের কঙ্কাল পড়েছ মা?'

সুভা হাসে, 'এর চেয়ে আমার কড়া অভিজ্ঞতা আছে। আমার সেজ কাকিমা যেদিন মারা যান,সেদিন খুব ভয়ের কাণ্ড হয়েছিল। আমার বছর বারো বয়স। সেদিন ছিল বুধবার। কাকির অসুখের বাড়াবাড়ি চলছে। সকলেই কাকির ঘরে একতলায়। আমি ছোট মেয়ে, একা একা এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছি। দোতলা সুনসান। একেবারে কোণের ঘর থেকে খুস খুস শব্দ। কে? নিশ্চয় হিমানীদি। লাফাতে লাফাতে কোণের ঘরে ঢুকে দেখি অচেনা এক লোক ,সাদা আধময়লা ধুতি পরা, একগাল দাড়ি নিয়ে বসে খুস খুস করে কতগুলো পাটকাঠি ভাঙছে।

অবাক হয়ে বললাম, 'তুমি কে?'

সে আমার দিকে তাকাল। পাটকাঠিগুলো থেকে একটি পাটকাঠি নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পিছন পিছন বেরিয়ে আর লোকটিকে দেখতে পেলাম না। ঠিক সেইসময় নীচে কান্নাকাটির আওয়াজ। তুফানি জেঠি বলল, 'ওরে, সে চলে গেল!'

আমি ছুটে কাকির ঘরে গিয়ে দেখি,কাকি ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে। স্থির অচঞ্চল দৃষ্টি। কাকির মাথার কাছে সেই দাড়িওলা লোকটি দাঁড়িয়ে আছে। হাতে একটা লম্বা পাটকাঠি।

জেঠির ছেলে ললিতদাদাকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'দাদা, ওই লোকটা কে গো?'

দাদা কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। মনে হয়, অজানা জগতের অধিবাসী এসেছিল বুঝলি। তবে পাটকাঠি কাকির মাথার কাছে পাওয়া গেল।'

'বলো কী মা? সাঙ্ঘাতিক!'

'কাকি নিঃসন্তান ছিলেন। মৃত্যুর পরে নিঃসঙ্গ মানুষটির পাশে এসে কি দাঁড়িয়েছিল সেই লোকটা?'

ইদানিং মা মৃত্যু নিয়ে বড্ড ভাবছে। মধু প্রসঙ্গ পালটে দিতে বলল, 'আচ্ছা মা, খুড়োমশাই কেমন আছে আজ?'

সুভা হেসে বলল, 'ভালোই আছে। খাঁচার বাইরে বসে রোদ পোহাচ্ছিল। গলা উঁচু করে কোঁকর কোঁ করল দুবার।'

মধুর মোরগ 'খুড়োমশাই' অতি বুদ্ধিমান। মধুদের বাড়ির সামনে দিয়ে হাটের রাস্তা। ভ্যানে করে গুচ্ছের মোরগ নিয়ে যাচ্ছিল একটা লোক। কী করে ভ্যান থেকে নেমে সোজা মধুদের বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়েছিল একটা মোটাসোটা মোরগ। ঢুকে লুকিয়েছিল ওটা মধুর কাকা সুরথের কম্পিউটার রুমে। সুরথই ডেকে বলল, 'এখানে একটা মোরগ লুকিয়ে আছে। কার মোরগ রে?'

এদিকে যার মোরগ, সেই ভ্যানওলা সেদিন বেজাই চিল্লামিল্লি করেছে। কিন্তু মোরগ রা কাড়েনি। তাই খুঁজে পায়নি। এত বুদ্ধি দেখে মধু ওর নাম রেখেছে 'খুড়োমশাই'।

খুড়োমশাইকে দেখতে গিয়ে মধু দেখল,পাশের বাড়ির অশোকের সঙ্গে সুরথ কাকা রাশিয়া আর ইউক্রেনের যুদ্ধ নিয়ে কথাবার্তা বলছে। মধুর ভালো লাগে না, ও 'প্রেতিনীর কান্না' বইটা পড়ার উদ্যোগ নিচ্ছিল। ঠিক তখনই মেঘ ডেকে উঠল। মধু চট করে মায়ের ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখল। মা বৃষ্টিকে ভয় পায়। ভিজলেই মায়ের শরীর খারাপ হয়। এই ঠান্ডায় বৃষ্টি নামলে মা শীতে কষ্ট পাবে বেশি।

মধু ঘরে ঢুকে বাবার ছাতাটাকে নামাল। বিকেলে সত্যস্যারের কোচিং-এ যেতে হবে। ছাতাটা খুলে দেখতে গিয়েই বিপত্তি হল। মট করে ভেঙে গেল ছাতার একটা কাঠি।

বাড়ি থেকে মেঘালালের স্টেশনের ধারের দোকানে পৌঁছে ছাতা সারাই করে আনতে আনতে কিছুটা দেরিই হল। মধুর খিদে পাচ্ছিল। মা নিশ্চয়ই ওর জন্য বসে আছে, নিজেও খায়নি।

বাড়ির কাছাকাছি আসতেই কাকাকে হন্তদন্ত হয়ে ডাক্তার কুণ্ডুকে নিয়ে বাড়ির ভিতরে যেতে দেখে মধু ভীষণ ভয় পেল। কাকা ডাক্তার নিয়ে এসেছে কেন?

ছুটে বাড়িতে ঢুকেছে মধু। একদল টিয়েপাখি নারকেল গাছের ওপর দিয়ে উড়ে গেল ডাকতে ডাকতে। মধু দেখল, ডাক্তার কুণ্ডু মায়ের ঘরের ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। কাকা সুরথের সঙ্গে নিচু স্বরে কিছু বলতে বলতে মাথা নাড়ছেন।

মধু ছুটে ঘরে ঢুকতে চেয়েছে। কিন্তু পা আটকে যাচ্ছিল ওর। আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে যেতে কাকার কান্নার আওয়াজ পাচ্ছিল। মধু আশ্চর্য চোখে চেয়ে দেখল, সুভা নামের ছোট্ট মেয়েটি মানিকপুর গ্রামের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। একদিন বলেছিল, মরে যাওয়ার আগে জন্মভূমিতে যেতে চাই রে মধু। মধুর বিশ্বাস হচ্ছিল না ওকে ছেড়ে মা চলে যেতে পারে।

সারাদিনের পরে যখন রাত এল, সবাই আস্তে আস্তে যে যার বাড়ির দিকে চলে গেল, তখন মধু মায়ের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। আজ কি মা আসবে না মধুকে দেখতে?

মোহনা পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'আজ আমি তোর কাছে থাকি ভাই?'

মধু মাথা নাড়ল 'না'। আজ মা আসবে।

জামগাছ থেকে শব্দ করে পাতা পড়ছিল টিনের চালের ওপরে। রাত

দ্বৈতা হাজরা গোস্বামী

পুজো হল শুরু

মেসোপটেমিয়া থেকে মেসো এল কাল
মিশরের মামি রাঁধে কাঁকড়ার ঝাল
সিন্ধুনদের তীরে হবে মহাভোজ
অথর্ববেদে পাবে রেসিপির খোঁজ
মহেঞ্জোদাড়ো থেকে এল মেজো পিসি
হাতে নিয়ে নাড়ু আর আচারের শিশি
চিনেবাদামের ঠোঙা হাতে চিনু মামা
নীলনদ ঘুরে এল গায়ে নীল জামা
মায়া সভ্যতা থেকে মায়া মাসি আসে
ভাজা দিয়ে ভিজে ভাত খেতে ভালোবাসে
ইনকায় ইনকাম হয় নাকি বেশি
পুষ্পক রথে চড়ে ঘোরে প্রতিবেশী
এসব গল্প বলে ঘরে ডেকে ডেকে
মামার জামাই এল জামাইকা থেকে
আমার তো ভারি মজা মন উড়ু উড়ু
আজটেকে আজ থেকে পুজো হল শুরু।

সুস্মেলী দত্ত

সবুজ ভাবনায়

তারপরে কী তারপরে কী অবাক চোখে ভয়
হঠাৎ যদি আকাশ ভাঙে তারাদের কী হয়!

চাঁদবুড়ি যে চরকা কাটে রাত্রিদিন ধরে
অন্য গ্রহে বুনবে নাকি? কান্না জোরে জোরে—

সূর্যমামু পালাই বলে মুখটি করে হাঁড়ি
আকাশ কই আকাশ কই মহাশূন্যে পাড়ি

পাহাড় ছোটে সাগর ছোটে গোল পৃথিবী মাঝে
ধুত্তেরিকা ভাবনাগুলো কেমন আজেবাজে...

তার চেয়ে বরং পুঁতব চারা লকলকিয়ে গাছ
সবুজ যত হাসবে তত পরশুরা কাল আজ

এই না ভেবে খোকন সোনা খিলখিলিয়ে হাসে
তাই দেখে মা আদর করে, বড়োই ভালোবাসে।

গভীর হলে সামান্য শব্দও অনেক বড় হয়ে যায়। মধু একবার উঠে দরজা খুলে দাঁড়াল। ঘুটঘুটে অন্ধকার উঠোনের মাঝখানে কেউ দাঁড়িয়ে। স্পষ্ট নয়,অথচ অস্তিত্ব রয়েছে। একদৃষ্টে যেন মধুর দিকে তাকিয়ে আছে। মধু ডাকল, 'মা!'

সে জবাব দিল না। শব্দও করল না। মধু এক-পা দু-পা করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ভয় কীসের? যে আছে, সে সবচেয়ে আপনজন।

তাহলে উঠোনের ওপরে পা রাখতেই কোথায় কে যেন উসখুস করে উঠেছে। খুড়োমশাই জেগে আছে। আজ ওকেও খাবার দেওয়া হয়নি। মোরগটা বুঝে গিয়েছে এই বাড়ি থেকে একজন চলে গিয়েছে।

দূরে কোথাও সিটি বেজে উঠল। নাইট গার্ডের সিটি ওদের বাড়ির পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। রাতের শেষ ট্রেন চলে যাচ্ছে তার চাকার ছন্দে। জামগাছ থেকে কয়েকটা পাতা এসে পড়ল মধুর মাথার ওপরে।

মধু চমকে উঠেছে। এক পরাবাস্তব জগতের অধিবাসীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে ও। প্রকৃতি সে কথা বুঝতে পারছে। উঠোনের মাঝামাঝি এসে থমকে দাঁড়াল মধু। যতই এগিয়ে যাচ্ছে,ততই সে যেন দূরে সরে সরে যাচ্ছে। কেন এমন হচ্ছে? মধুকে কি ভয় পাচ্ছে সে? মধু ছেড়ে দেবে না। ওকে যেতেই হবে। জানতে হবে না কেন না খেয়ে, মধুকে না বলে চলে গেল সে?

মধু পা বাড়িয়েছে, পিছন থেকে টর্চের আলো। মোহনা চেঁচিয়ে উঠেছে, 'মধু! মধু কোথায় যাচ্ছিস?'

মোহনা এসে হাত ধরে নিয়ে গিয়েছে। জল খেতে দিয়েছে। ভাইকে বোঝাতে চেষ্টা করছে, মানুষ মরণশীল। তাকে যেতে হয়। কেউ কাউকে আটকে রাখতে পারে না।

ঘোরের মধ্যে কতগুলো দিন কেটে গেল। মায়ের শ্রাদ্ধের দিন বাগুইহাটি, উলুবেড়িয়া, কাদালিয়া, পঞ্চান্নগ্রাম, কানাইয়ের মোড় থেকে আত্মীয়স্বজন এসেছে। মধু সারাদিন যন্ত্রের মতো কাজ করে যাচ্ছিল। পুরোহিতমশাই কাজ করাচ্ছিলেন। কাজ শেষ হতে হতে বিকেল গড়িয়ে গেল। মধু বারান্দার এককোণে দাঁড়িয়ে ভাবল,মানুষ এভাবেই চলে যায় তাহলে! এতদিনের সম্পর্ক এভাবেই শেষ হয়ে যায়? তাহলে যে রবীনমামা বললেন, 'আত্মার বিনাশ নেই! আত্মা এমন এক জিনিস,যাকে আগুন পোড়াতে পারে না, জলে ডোবে না, কোনওভাবেই নষ্ট হতে পারে না। আত্মা অবিনশ্বর।'

বারান্দায় দাঁড়িয়ে গুগল সার্চ করে আত্মা সম্পর্কে পড়ছে সে। কিছু বোঝে, অনেকটাই বোঝে না। রবীনমামা তোয়ালে মেলতে এসে মধুকে দেখে পাশে দাঁড়ান, 'তোমার মা কোথাও যাননি। এই বাতাসে, আলোতে, জলে-স্থলে সর্বত্র ছড়িয়ে গেছেন। যেখানে তাকাবে, জেনে রেখো সেখানেই তিনি আছেন। তোমার পাশেই আছেন। এই বাতাসে, আলোতে, নদীর জলে মধুময় হয়ে তিনি আছেন। মধুবাতা ঋতায়তে..., ওম মধু ওম মধু...।'

মাঝরাতে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি এল। মধু বৃষ্টির শব্দ শুনে উঠে বসে। মা বৃষ্টিকে ভয় পায়। উঠেই থমকে গেল। মা নেই এখন!

জলের ছাট আসছে মধুকে ভিজিয়ে দিতে। মধু আবার ঘরে ঢুকে যাচ্ছিল। খুব জোরে মেঘ ডেকে উঠল। মধু চমকে চাইল বাইরের অন্ধকারের দিকে। বৃষ্টি নেমেছে। শ্রাদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরে আত্মাকে বিদায় জানানো হয়ে গিয়েছে। মা এখানে আর ঢুকতে পারবে না ! মা বাইরে থাকবে? মধু তাড়াতাড়ি ছাতাটা বারান্দার এককোণে মেলে দিল। মা এখানে এসে বসুক।

লম্বা বারান্দার এককোণে ছাতা মেলে দিয়ে খানিক দাঁড়িয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে মধু। সারাদিনে একফোঁটা জল ফেলেনি যে চোখ,সেই চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়ছিল। কেউ জানল না, ছেলের মেলে রাখা বিরাট ছাতার নীচে অদৃশ্য এক অবয়ব ধীরে ধীরে এসে আশ্রয় নিল। বাইরে বৃষ্টির ঢল নেমেছে। ছাতার নীচে কাঁপতে থাকে জন্ম জন্মান্তরের সম্পর্ক।

ছবি : সৌজন্য চক্রবর্তী

প্রযুক্তিগত ভাবে মানুষ যত এগিয়েছে ততই বেড়েছে প্রকৃতির প্রতি তার অবহেলা। প্রকৃতির ধ্বংসস্তূপের উপরেই ক্রমশ গড়ে উঠেছে আধুনিক মানব সভ্যতার ইমারত। মানুষের অতিবিবর্তনের ফলে সৃষ্ট দূষণ, মানুষেরই কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে তার সহজাত প্রাকৃতিক অধিকার।

বর্তমানে, ২২২২ খ্রিস্টাব্দের কলকাতাবাসীরা হয় অত্যন্ত ধনী নয় অতি দরিদ্র, কিন্তু এদের কারও কাছেই বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক অক্সিজেনের জোগান আজ আর নেই।

শহরের যেখানে এককালে ময়দান ছিল, সেখানে এখন গজিয়ে উঠেছে এক বিশাল কারখানা। কোনও গাছ আর বেঁচে নেই এ শহরে। প্রযুক্তির আড়ালে, শহরের সবটুকু সবুজ সেই কবে ফুরিয়ে গিয়েছে।

এখন আশ্বিনের মাঝামাঝি। অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহ। কিন্তু কাশফুল দেখতে গেলে যেতে হবে সেই কলকাতা ন্যাচারাল হেরিটেজ মিউজিয়ামে। সময়ের অতল গর্ভে হারিয়ে যাওয়া নানাবিধ প্রাকৃতিক সম্পদকে সংরক্ষিত করে রাখা আছে এই মিউজিয়ামে।

এত কিছু পাল্টে যাওয়া সত্ত্বেও, ২২২২-এর কলকাতায় যেটা এখনও পাল্টায়নি, সেটা হল বাঙালির উৎসবমুখরতা।
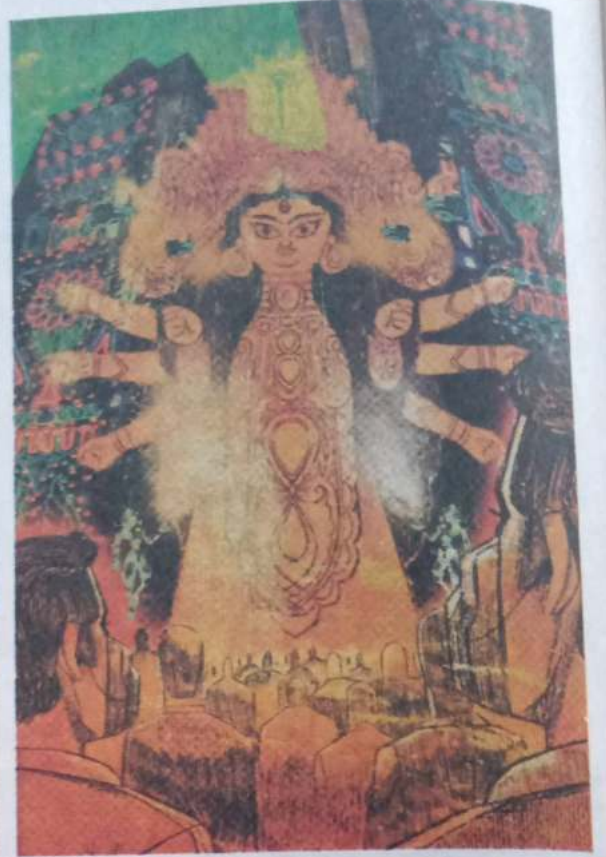
আজ মহানবমী। দুর্গাপুজোয় মাতোয়ারা কলকাতা।

একদিকে শুভ শক্তির আরাধনায় উদ্ভাসিত গোটা শহর...

আর অন্যদিকে, শহরের এক প্রান্তে, গঙ্গাবক্ষের যাবতীয় বর্জ্য ও আবর্জনার সংমিশ্রণে তখন **জেগে উঠছে** ...

ওদিকে...

কলকাতা, ২০২২

ডঃ ব্রহ্ম-এর চেম্বার

DRRRING DRRRING DRRRING

ফোন বেজে ওঠে...

টেলিফোনে কথোপকথন:
ডঃ ব্রহ্ম
ক্লারা (কসমিক পিস কাউন্সিল)

দুঃখিত। কিন্তু আমি মনস্টার হান্টার নই।

মানছি। কিন্তু মনস্টারদের ব্যাপারে এই গোটা ব্রহ্মাণ্ডে আপনার মত জ্ঞান আর কার আছে বলুন! প্লিস না বলবেন না! আপনি সাহায্য না করলে আপনার শহর কলকাতা ধ্বংস হয়ে যাবে আর কিছুক্ষণেই।

ক্লারা, একটা সেলেস্টাল গ্লিচ চলছে প্যারালাল টাইমলাইনে, আমি এই সময়ে ঠিক টাইম ট্রাভেল করতে চাইছিলাম না...

ডক্টর! প্লিস! না করবেন না! অন্তত আপনার শহরের জন্য...

বেশ। কি ধরনের মনস্টার?

থ্যাঙ্ক ইউ ডক্টর! আসলে কি ধরনের মনস্টার বোঝা যাচ্ছে না এখনও। টেস্ট স্ক্যানে কোনও হার্টবিট পাওয়া যায়নি। ট্রাঙ্কুলাইজার ড্রোনও ব্যর্থ। যতদূর মনে হচ্ছে কোনও ইনরগ্যানিক টাইপ...

বুঝলাম।

আপনার টাইম ট্র্যাভেল শিপের 'ওটিপি'-টা পাঠিয়ে দিই তাহলে? শিপ আপনার ডেনে মিনিট খানেকের মধ্যে পৌঁছে যাবে, আর-

সেসবের প্রয়োজন নেই। আমার নিজস্ব স্পেস-টাইম ওয়াচ আছে। কাজ হয়ে গেলে জানতে পেরে যাবেন। ধন্যবাদ।

আর আপনার ফিজটা... হ্যালো? হ্যালো?... হ্যালো?!!...

SLAM

হাসালে ক্লারা! অবশ্য, ব্রহ্ম-কে আর তুমি কতটুকুই বা চেন...

রুড! মুখের উপর ফোনটা কেটে দিল! স্যার ডগ, সত্যিই কি লোকটার এত ক্ষমতা!?

কলকাতা,২২২২
নিমেষে দুশো বছর টাইম ট্র্যাভেল করে, ২২২২-এর কলকাতায় গঙ্গাবক্ষের এক পরিত্যক্ত জাহাজের উপর- আবির্ভাব হল ডঃ ব্রঙ্কের। তার সামনে তখন জেগে উঠেছে সেই অজানা বিভীষিকা... কিন্তু কী এই অদ্ভুত জীব?... আদৌ জীব কি?...
নামঃ বর্জ্যবেতাল
ধরণঃ অজৈব/ অপ্রাকৃতিক / মনুষ্য সৃষ্ট
উৎসঃ গঙ্গার জল দূষণকৃত যাবতীয় বর্জ্য পদার্থ ও আবর্জনা।
স্বভাবঃ চারপাশের মানুষ ও মনুষ্যসৃষ্ট সব কিছু ধ্বংস করে সেই ধ্বংসাবশেষ ভক্ষণ করে আরও বেড়ে ওঠা।
প্রতিকারঃ আণবিক বিস্ফোরক প্রয়োগ করে দেখা যেতে পারে। এছাড়া আর কোনও উপায় এখনও অব্দি জানা যায়নি।
ডঃ ব্রঙ্কের স্পেস-টাইম ওয়াচের মনস্টার সার্চ ডিটেক্টারে ফুটে ওঠে জলজ্যান্ত বিভীষিকার যাবতীয় বৃত্তান্ত...
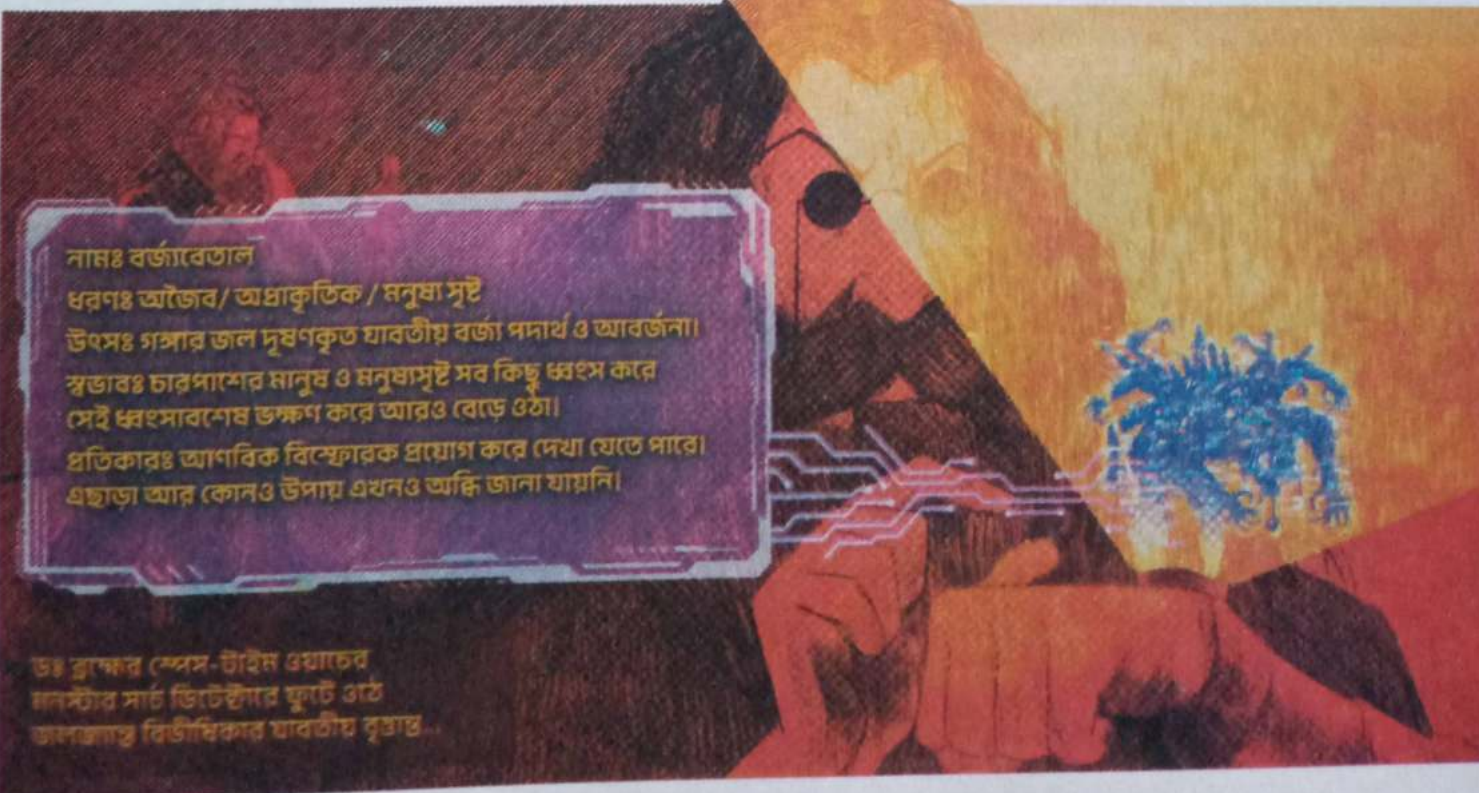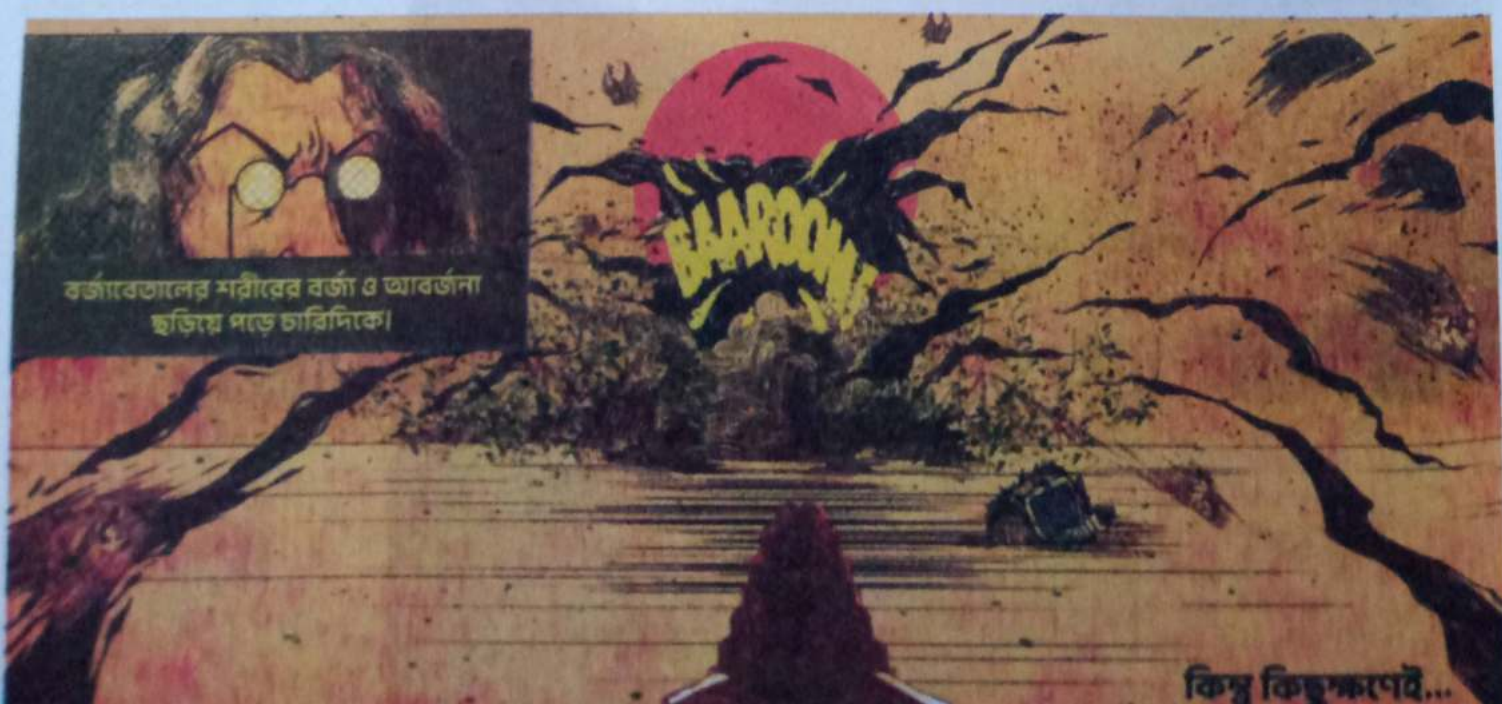
ডঃ ব্রহ্ম বুঝতে পারে শহরকে বাঁচাতে তাকে ধ্বংস করতেই হবে বর্জ্যাবেতাল-কে।

সে হাতে তুলে নেয় অ্যাটম স্ম্যাশার যন্ত্র।

আবার যে কে সেই! সদ্য ছিটকে পড়া বর্জ্য পুনরায় একত্রিত হয়ে পুনর্গঠিত হতে লাগলো বর্জ্যবেতাল। নদীর সব বর্জ্য জুড়ে, দ্বিগুণ বেগে উঠতে থাকলো তার শরীর... ডঃ ব্রহ্ম বুঝতে পারে, যে তার অ্যাটমিক স্ম্যাশার যন্ত্রে কাজ হওয়ার নয়...

... এই বর্জ্যবেতাল-কে পুরোপুরি ধ্বংস করার উপায় একটাই, আর সেটা হল, এই বর্জ্যবেতালের জন্মের পিছনের কারণ-কে ধ্বংস করা। ডঃ ব্রহ্ম কসমিক পিস কাউন্সিলের কর্ণধার স্যর ডস-কে কল করে এবং বলে...

ডস, তুমি জানো আমি মনস্টার হান্টার নই। যদিও কলকাতাকে বাঁচাতে, আমি আমার অ্যাটম স্ম্যাশার দিয়ে এই বর্জ্যবেতালকে এক প্রস্থ ধ্বংস করেছি কিন্তু সে আবার জেগে উঠছে। বারবার অ্যাটম স্ম্যাশার দিয়ে ধ্বংস করে একে বিনাশ করা সম্ভব নয়। একে থামানোর একমাত্র উপায় শুধু তোমার হাতেই আছে...

বর্জ্যবেতালের একবার জন্ম হলে বিনাশ অসম্ভব। তাই বর্জ্যবেতাল-কে একমাত্র ধ্বংসের উপায় হল অতীতে নদীর দূষণ রোধ করা। কারণ দূষণ রোধ হলে তবে বর্জ্যবেতালের জন্মও রোধ করা যাবে। এবং তবেই একমাত্র ভবিষ্যতে এ শহর কিম্বা পৃথিবীকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। আর এই দূষণ রোধ করা তোমার পক্ষেই সম্ভব। ভালো ভাবে শোনো... আমার টাইমলাইনে, অর্থাৎ ২০২২-এ তোমার পক্ষ থেকে কোনও অফিশিয়াল এজেন্টকে পাঠিয়ে দাও- যে কিনা গিয়ে সরকারকে ভালো ভাবে বিষয়টা বুঝিয়ে বলবে...

ডস (ফোনে, অন্য প্রান্ত থেকে)ঃ কিরকম?...

ডঃ ব্রহ্ম-এর কথা মতই কাজ হল। ২০২২-এর শেষের দিকে গঙ্গা দূষণ সরকারি ভাবে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হল।

২০২২-এর গঙ্গা দূষণ রোধের ফলে ২২২২-এর গঙ্গা এখন পরিষ্কার। তবে ২২২২-এর শহর কলকাতার আরও অনেক শুদ্ধিকরণ প্রয়োজন। কিন্তু আপাতত, বর্জ্যবেতালের বিনাশের পর ২২২২-এর কলকাতা সুরক্ষিত। দুর্গা পুজো চলছে পুরোদমে। শহরবাসী জানতেও পারল না কত বড় বিপদ থেকে তারা রক্ষা পেল। সবই সম্ভব হল ডঃ ব্রক্ষের জন্য...
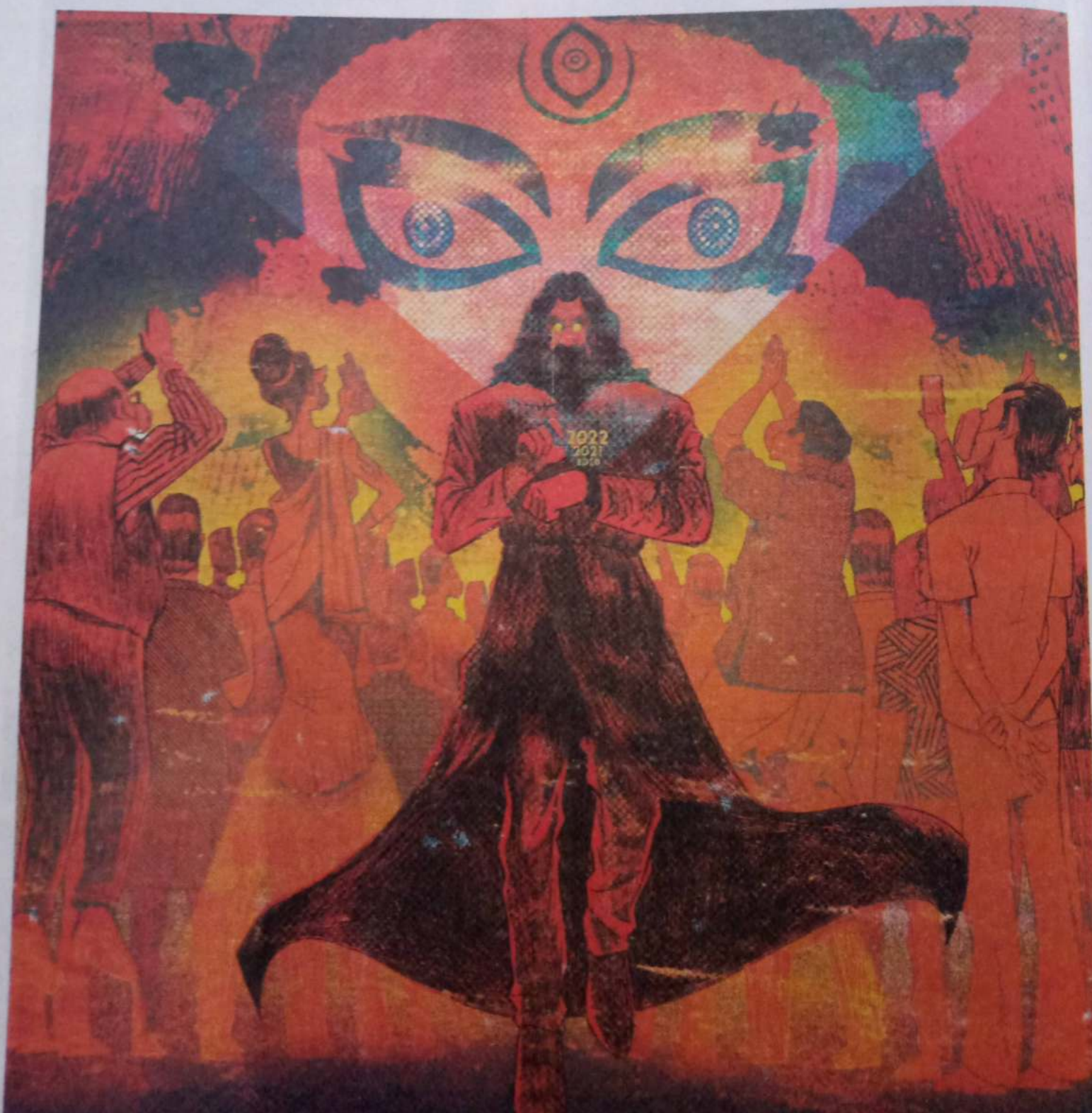
ইনভেস্টিগেট
কাহিনি
ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়
চিত্রনাট্য ও ছবি
প্রদীপ্ত মুখার্জি
একদিন সকাল সকাল
আই ওয়ান্ট টু মিট ম্যানেজার।
স্টেটব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
উস তরফ স্যার।
ম্যানেজার
ম্যানেজারের ঘরে।
বলুন, আপনার জন্য কী করতে পারি।
আই অনন্ত সরখেল, ইনি অর্ণব ভট্টাচার্য। আমি ব্যাঙ্কে ইনভেস্টিগেট করতে এসেছি।
কোথা থেকে আসছেন স্যার?
মানে? কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি?
দেখছি স্যার। একটু বসুন।
একটু পরে
ইনি আমাদের অ্যাকাউন্ট্যান্ট।
ওঃ! কতক্ষণ বসে আছি। চটপট কাগজপত্র বের করুন।
কী কী দেখবেন বলুন।
যতরকম আছে, ততরকম।
তা কী করে সম্ভব স্যার? একদিনে এত...
আচ্ছা, আপনারা ব্যাঙ্ক খুলে বসে আছেন কেন? এদিকে আসুন দিকি।
বলি, এটা এখানে কীজন্যে টাঙিয়ে রেখেছেন?
ইনভেস্ট ইন স্টেটব্যাঙ্ক

রোববার সকাল।
এই আপনার ইনভেস্টিগেট! হাঃ হাঃ হাঃ।
কী যে বলেন স্যার!

আচ্ছা মামা, তুমি কিন্তু এখনও কোনও পিওর ডিটেকশন করোনি। যাকে বলে ইনভেস্টিগেট করা!

আমি কি পেশাদার গোয়েন্দা নাকি?

তা হলেও আমরা চাই তুমি অন্তত একটা ক্রাইম ইনভেস্টিগেট করো।
হ্যাঁ, অন পাবলিক ডিমান্ড, আপনাকে করতেই হবে!

হুম! ঝামেলা ইনভাইট করতে বলছিস? আচ্ছা, তপাদারকে ফোন করে দেখি।

হ্যালো, কমিশনার স্যার নাকি? আমি জগুদা। কেমন আছ? শোনো, আমি একটা উটকো ঝামেলায় পড়ে গেছি...টুকলু আর অনন্তবাবুর রিকোয়েস্টে আমাকে একটা ক্রাইম কেস সলভ করতে হবে...হাসছ! আমার অবস্থা বুঝেও! কাইন্ডলি তোমার থানার ওসিদের খবর পাঠাও, ক্রিটিকাল ক্রাইম কিছু ঘটলে যেন আমায় খবর দেয়।... ওকে, থ্যাঙ্ক ইউ ভাই।

পরদিন সকালে

ট্যাংরা থানা থেকে বলছি স্যার।

একটু পরে একটা একতলা বাড়ির সামনে।

ছুরি দিয়ে ব্রুটালি গলার
নলি কেটে খুন। কাল রাতে ঘটেছে।
ঘরের দরজা ভেতর থেকে
বন্ধ ছিল।

নমস্কার।
এরা মৃত নলিনী
সমাদ্দারের দুই ভাই।
খবর পেয়ে এসেছেন।
আমি স্যার
নলিনীর ছেলেবেলার
বন্ধু, হরিহর গাঙ্গুলি!

ভেতরে ঢুকে
উনি কি একাই
থাকতেন?

হ্যাঁ স্যার। বিয়ে-থা করেননি। ছোট
চামড়ার ব্যবসা ছিল। ব্যবসার কাজের
জন্যই এই বাড়িটা ভাড়া নিয়েছিলেন,
প্রায় পনেরো বছর আগে।
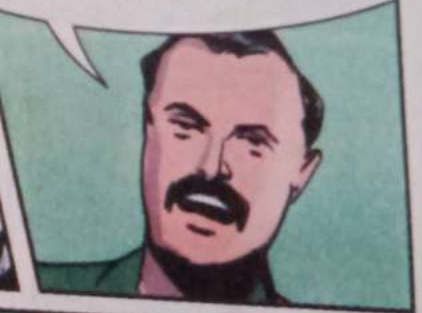
আপনারা কোথায়
থাকেন? যাতায়াত
ছিল?

আমি থাকি পার্ক সার্কাস
ট্রাম ডিপোর কাছে, মেজদা
থাকে বেলেঘাটায়।
আমিও থাকি
পার্ক সার্কাসে।
আমরা সুযোগ পেলেই
আড্ডা মেরে যেতাম। হরিহরদা
তো প্রায় রোজই টুঁ মারতেন।
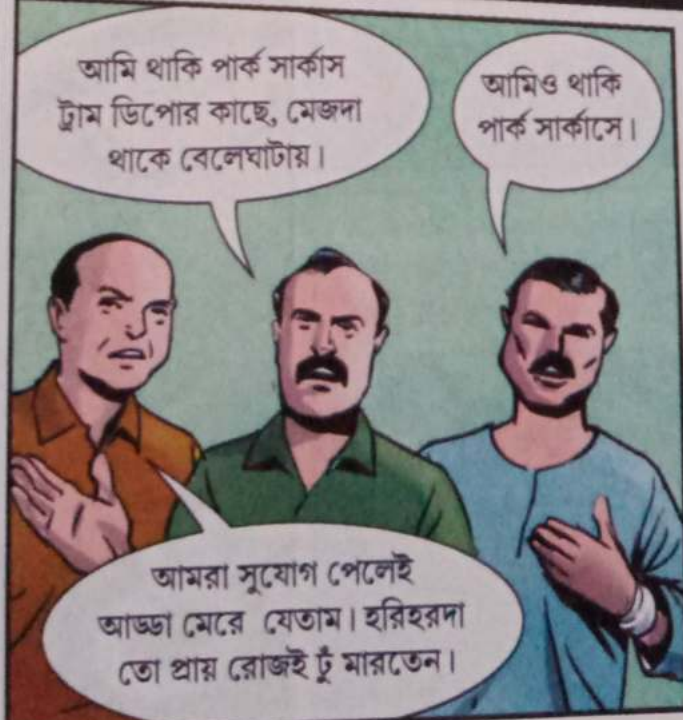
কাল কেউ
এসেছিলেন?
না!

পাড়ার ছেলেরা কাল রাতে কাউকে আসতে দেখেছে। অন্ধকারে চেনা যায়নি।
চুল!

খুনটা কখন হয়েছে?
রাত এগারোটা থেকে দুটোর মধ্যে।

আততায়ী কাচের জানলা ভেঙে এসেছিল টাকার লোভে। আলমারি খুলে টাকা সরিয়েছে।

মেঝেতে ওটা কী?

ঘুমের ট্যাবলেটের ফয়েল। নলিনীবাবু ইনসমনিয়ার রুগি ছিলেন, ঘুমের ওষুধ খেতেন...সবাইকে বাইরে যেতে বলুন।

আমিও চলি।

প্রথম কে দেখল?

ভোরবেলায় রান্না আর ঘরের কাজের বুড়ি দরজা ধাক্কায়।

কোনও সাড়া না পেয়ে প্রতিবেশীরা দরজা ভেঙে ঢুকে দেখে এই দৃশ্য!

আলমারির চাবিটা আনকোরা নতুন! গায়ে ফাইল ঘষার দাগ। বানানো হয়েছে।

এর মানে খুনি প্রায়ই আসত। কোনও সুযোগে চাবির ছাপ তুলে নিয়েছে।
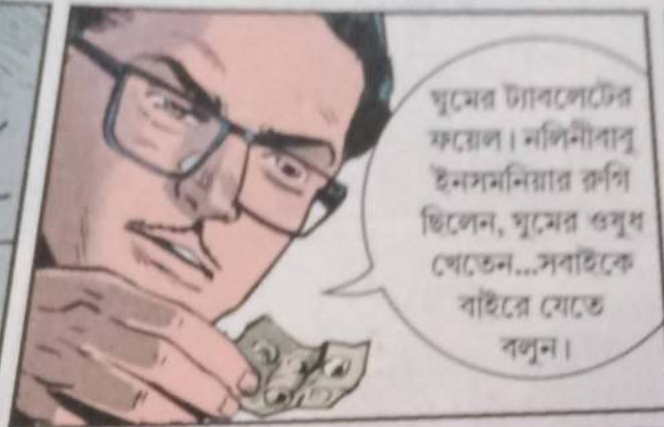
ভাঙা জানালার সামনে

সে জানত নলিনীবাবু কোথায় টাকা রাখেন। এটা দেখেছেন?

রক্ত! ভাঙা কাচে খুনির শরীর কেটে গেছিল।

আর কোথাও রক্ত নেই কেন?

ঘরময় খোঁজাখুঁজি করতে করতে হঠাৎ আলমারির তলায় —

ওটা কী?

পেয়েছি! মোক্ষম প্রমাণ। রক্ত মাখা রুমাল।

প্রমাণ নাম্বার টু হল নলিনীবাবুর বাঁ-হাতের মুঠোয় ধরা এক গাছা চুল।

চুল! মানে কাচ ভাঙার শব্দে ঘুম ভেঙে যায় নলিনীবাবুর। বাধা দিতে গিয়ে খুন হন।

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী

চারনোবিলে অনিলিখা

২৬ আগস্ট, কল্যাণগড়

কিছুদিন আগেই মিঃ পাই ফিরেছেন স্পেন থেকে। এবারের অভিজ্ঞতা ওঁর বেশ ভয়ঙ্কর। একটা ছত্রাক, সামান্য একটা ছত্রাক যে কতটা সাঙ্ঘাতিক হতে পারে, সেটাই ড্রয়িংরুমে বই পড়তে পড়তে ভাবছিলেন তিনি। কিছুতেই বইতে মন বসছিল না।

একইসঙ্গে ডেভিডের জন্যে মন খারাপ। কিছুক্ষণ আগেই ডেভিডের মৃত্যুর খবরটা পেয়েছেন। ডেভিডের মতো একজন বিজ্ঞানী ও প্রিয় বন্ধুকে হারানো সত্যিই বেদনাদায়ক। মাদ্রিদের একটা হাসপাতালে আজ সকালে মারা গেছে ডেভিড। নামী ডাক্তাররাও কিছু করে উঠতে পারেনি। সবের পিছনে সেই ছত্রাক!

ড্রয়িংরুমে মিঃ পাই-এর ল্যান্ডলাইন ফোনটা একটানা বেজে যাচ্ছে। আজকাল বড্ড আজেবাজে ফোন আসে। বেশিরভাগের সঙ্গেই বিজ্ঞানের সামান্যতম যোগাযোগ থাকে না। তাই কয়েকদিন আগে মিঃ পাই গণেশকে এইসব ফোন ধরতে বারণ করেছেন। কিন্তু বলার ফলে তারপর থেকে গণেশ কোনও ফোনই ধরছে না।

ফোনটা আবারও বাজছে দেখে মিঃ পাই বাধ্য হয়ে বললেন, গণেশ, দেখো তো কার ফোন?

খানিকবাদে গণেশের উত্তর আসে, স্যার, অনিলিখার ফোন।

অনিলিখা?

মিঃ পাই সঙ্গে সঙ্গে সোফা থেকে লাফিয়ে উঠে ফোনের দিকে এগিয়ে যান। এই একজনের ফোন কখনও অকারণে আসে না।

কী ব্যাপার অনিলিখা? তুমি তো রীতিমতো ভ্যানিশ হয়ে গেছ। কোথায় আছ তুমি?

উল্টোদিকে অনিলিখার কথা স্পষ্ট শোনা গেল না। কথা কেটে কেটে যাচ্ছে।
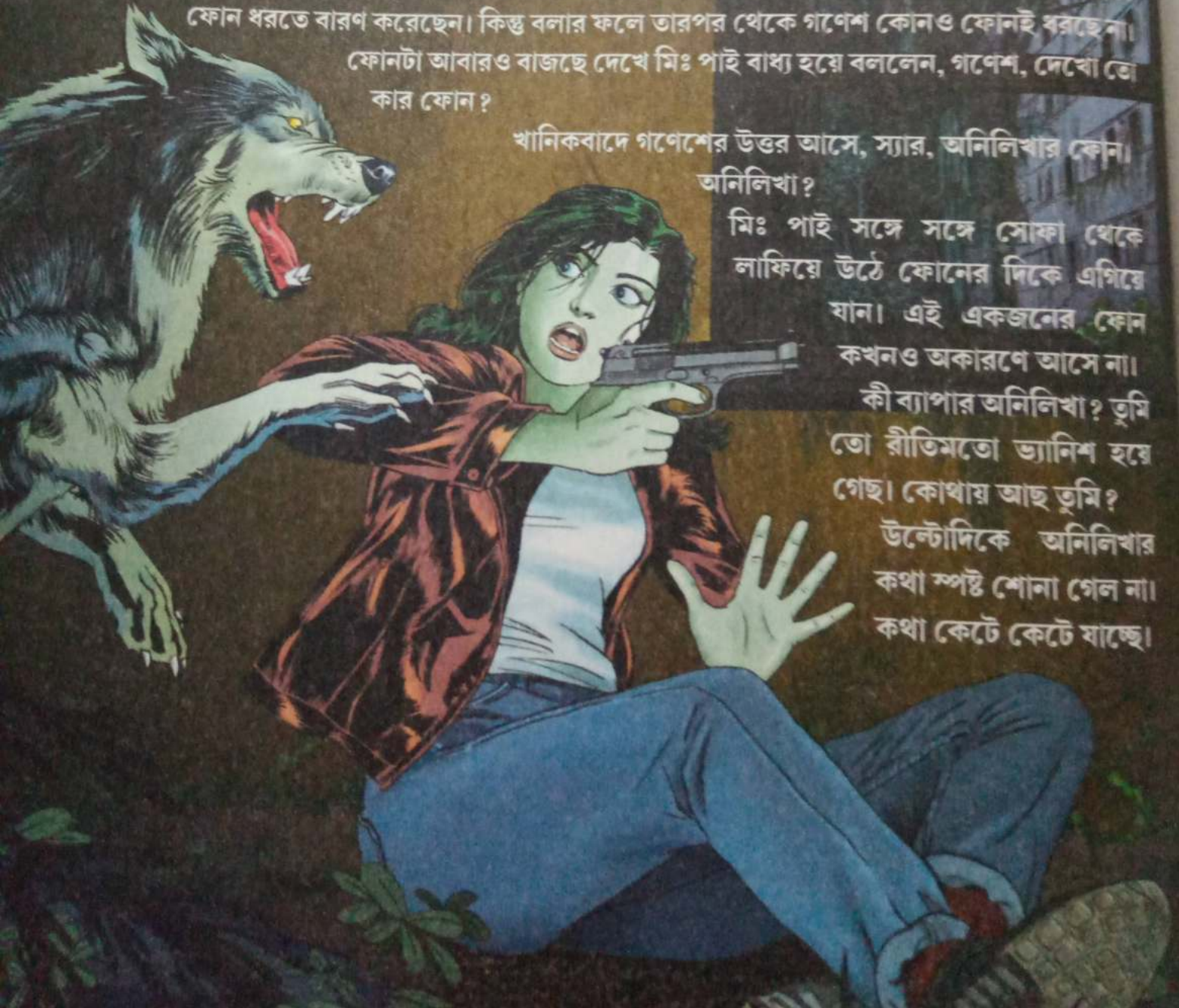
কী বলছ? শুনতে পাচ্ছি না। তোমার দিকের নেটওয়ার্ক খুব খারাপ। কিছু শোনা যাচ্ছে না।

আরও কিছু অস্পষ্ট কথা ভেসে এল উল্টোদিক থেকে।

নাহ, কোথায় আছ বলো তো? কীসের বিল? ইলেক্ট্রিসিটি বিল?

মিঃ পাই, আমি চারনোবিল থেকে বলছি। ইউক্রেনের চারনোবিল।

সর্বনাশ। চারনোবিল। সেখানে আবার কবে গেলে?

হ্যাঁ, আমি আপনার সঙ্গে একটা জরুরি ব্যাপারে কথা বলতে চাই ফোন কেটে যাওয়ার আগে। এখানে আমরা একটা গোপন অভিযানে এসেছিলাম। কিন্তু আমার সঙ্গে যে চারজন এসেছিল, তাদের সবাই এখন নিখোঁজ। আমি এখন এখানে সম্পূর্ণ একা। চারদিকে গভীর জঙ্গল, কেউ কোথাও নেই। একটা খুব দরকারি কথা জানাতে...

ফোনটা কেটে গেল।

হ্যালো, অনিলিখা, হ্যালো। শুনতে পাচ্ছ?

কোনও উত্তর এল না।

একটা অচেনা নাম্বার থেকে ফোনটা এসেছিল। মিঃ পাই সেই নাম্বারে চেষ্টা করলেন। না পেয়ে তারপর অনিলিখার মোবাইল ফোনে কয়েকবার চেষ্টা করলেন। ফোন সুইচড অফ।

মিঃ পাই উত্তেজনায় ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে শুরু করলেন। তাহলে কী অনিলিখার মৃত্যু আসন্ন! চারনোবিল এখন তো মৃত্যুপুরী! ও কী করতে চারনোবিল গেল? অনিলিখার যদি সত্যি কিছু হয়!

তাঁর হাঁটার গতিবেগ বেড়ে গেল। আর কেউ না জানুক, মিঃ পাই জানেন চারনোবিলে কী হয়েছে।

সেই ফাঙ্গাস সংক্রমিত নেকড়ে বাঘটা এসেছিল চারনোবিল থেকে। এখন ওই নেকড়ে বাঘটা নিশ্চয়ই সেই অচেনা ফাঙ্গাসের একমাত্র শিকার নয়। একটা সংক্রমিত নেকড়ে বাঘের মাধ্যমেই যদি স্পেনে এরকম বড় বিপর্যয় ঘটে থাকে, তাহলে অনিলিখার ওখান থেকে বেঁচে ফেরা অসম্ভব। অনিলিখার সঙ্গীরাও নিশ্চয়ই সে কারণেই উধাও, হয়তো ইতিমধ্যেই ওদের শিকার!

এব্যাপারে নিশ্চয়ই কিছু একটা বলতে চেয়েছিল অনিলিখা।

এখানে কিছু কথা আগে থেকে বলা দরকার।

মিঃ পাই দু'সপ্তাহ আগে স্পেনে গিয়েছিলেন একটা সায়েন্স কনফারেন্সে। একা নয়, সঙ্গে মিঃ পাই-এর বন্ধু ডেভিডও ছিলেন। ডেভিড কেম্ব্রিজের প্রফেসার। রোবোটিক্সের রিসার্চের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত। সেখানে থাকাকালীন বন্ধু জুওলজিস্ট কার্লোসের বাড়ি যান। কার্লোসের অনুরোধেই যাওয়া। কার্লোস তার কিছুদিন আগেই এক বৈজ্ঞানিক অভিযানে গিয়ে পরিত্যক্ত শহর চারনোবিল থেকে একটা নেকড়ে বাঘ সঙ্গে করে এনেছে। বিশেষ অনুমতি ছাড়া চারনোবিল যাওয়া যায় না। ওখানকার জীবজগতের উপর এত বছরে পরমাণু বিস্ফোরণের কী প্রভাব পড়েছে—তাই ছিল কার্লোস ও তার সঙ্গীসাথীদের অভিযানের মূল উদ্দেশ্য।

১৯৮৬ সালে চারনোবিলের প্ল্যান্টের চার নম্বর রিয়াক্টরে পারমাণবিক বিস্ফোরণের কথা তো সবারই জানা! তারপর থেকে ওই এলাকায় রেডিও অ্যাক্টিভিটির মাত্রা অস্বাভাবিক রকম বেশি হয়ে যাওয়ায় সবাই শুধু ওখান থেকেই নয়, আশেপাশের সব শহর ছেড়ে চলে যায়।

বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন সেই সময়। এত বছরেও কোনও মানুষের বাস নেই ওখানে। পরিত্যক্ত শহর জুড়ে ঘন জঙ্গল। জঙ্গলের মধ্যে আছে বিশাল বিশাল বিল্ডিং। আর তার গা বেয়ে লতাপাতা, আগাছার রাজপাট।

প্রশ্ন উঠতে পারে কেন কার্লোস ওই নেকড়ে বাঘকে চারনোবিল থেকে সঙ্গে করে এনেছিল!

তার পিছনে কিছু কারণ ছিল অবশ্য। বাঘটার কিছু অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে কার্লোস অবাক হয়। চারনোবিলের ওই ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে গিয়েই কার্লোসের চোখে পড়ে একটা নেকড়ে বাঘ। এরা সাধারণত জোটে ঘোরে। ওটা ছিল একা, দলছুট। খুব ফ্রেন্ডলি, যেন মানুষের সঙ্গ পছন্দ করে। কার্লোসদের সঙ্গে-সঙ্গেই ঘুরছিল নেকড়েটা। কার্লোস ও তার সহবিজ্ঞানীদের সব কথা যেন বাঘটা ভালোই বুঝতে পারছিল। এবং সেই কারণেই নেকড়েটার উপরে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার উদ্দেশে সঙ্গে করে নিয়ে চলে আসে সে।

মিঃ পাই কার্লোসের বাড়িতে নেকড়ে বাঘটাকে দেখেন। শুধু ওই নেকড়েটার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়, অন্য আরেকটা ক্ষমতা দেখে অবাক হন। যেন বাঘটাই পুরো বাড়ির অঘোষিত কর্তা, সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ ওর হাতে। এমনকী কার্লোসও যেন ওর দ্বারা প্রভাবিত, যেন ওর কথা অনুযায়ী কার্লোসকেও সব ব্যাপারে বুঝে-সুঝে চলতে হয়।

রাতে কার্লোসকে ওই পোষা নেকড়ের পিছন পিছন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেন মিঃ পাই।

পরের দিন মিঃ পাই সকালে উঠে দেখেন কার্লোস তখনও বাড়ি ফেরেনি। শুধু তাই নয়। একজন ছাড়া বাড়ির অন্য সব কাজের লোকেরাও হঠাৎ ছুটিতে চলে গেছে। ব্রেকফাস্টের পর কার্লোসের খোঁজে বেরোনোর সময় হঠাৎ মিঃ পাই পিছন থেকে মাথায় আঘাত পান। উনি অজ্ঞান হয়ে যান।

জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর দেখেন উনি একটা অন্ধকার ঘরে বন্দি। কতক্ষণ বন্দি ছিলেন জানেন না, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই টের পান যে কে বা কারা যেন ওর ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে।

দরজা খুলে যায়। নেকড়ে বাঘের সঙ্গে দেখা যায় ওই বাড়ির সেই থেকে যাওয়া পরিচারককে যে খুব সম্ভবত মিঃ পাই-এর মাথায় আঘাত করেছিল। হিংস্রভাবে এগিয়ে আসতে থাকে নেকড়ে বাঘটা। কিন্তু মিঃ পাই-এর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার ঠিক আগে, গুলির শব্দ আসে। ডেভিড পিছন থেকে গুলি করেছে নেকড়েটাকে। ডেভিডের বেশ কয়েকটা গুলিতে বাঘটা মারা যায়।

পরে বোঝা যায় যে ওই নেকড়ে বাঘটাকে নিয়ন্ত্রণ করছিল এক অজানা ফাঙ্গাস। একই ফাঙ্গাস পরে ছড়িয়ে পড়েছিল ডেভিডের মধ্যেও। সেজন্য তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।

আজ সকালেই ডেভিডের মৃত্যুর খবরটা পেয়েছেন মিঃ পাই। বুঝতে পেরেছেন অনুমান ঠিক। নেকড়ের মতো ডেভিডের মধ্যেও ওই একই ছত্রাকের ইনফেকশন পাওয়া গেছে। ছত্রাক মারা যাওয়ার আগে তার বসতি ধ্বংস করে গেছে।

কী করে ডেভিডের মধ্যে গেল ওই ছত্রাক? পরজীবী ওই বিশেষ ছত্রাক বুঝতে পেরেছিল যে তাদের নতুন হোস্ট দরকার। বিশেষ করে এমন একজন হোস্ট যে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় স্বশাসিত যুদ্ধজাহাজ রিসার্চের সঙ্গে যুক্ত আছে। ডেভিডের শেষ রিসার্চ ছিল সেটাই।

মিঃ পাই জানেন ওরা আবার আসবে। ওরা আবার খোঁজ করবে নতুন শিকারের, নতুন হোস্টের। ওরা শিকারের অপেক্ষায় থাকবে ওদের ওই চারনোবিলের রাজত্বে। হয়তো এরকম কিছু হোস্টের মাধ্যমে মানবজগতকে আস্তে আস্তে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করবে ওরা।

এত দেশ, এত শহর থাকতে সেই চারনোবিলেই গিয়ে হাজির হল অনিলিখা! কিন্তু কেন?

মিঃ পাই মনে মনে বলে ওঠেন, আমার যে চুপ করে বসে থাকলে চলবে না। জানতে হবে ওই ছত্রাকদের কোষীয় গঠন। এমন ন্যানোবট তৈরি করতে হবে, যারা ওদের ধ্বংস করবে ওদেরই কৌশলে, ওদেরই খেলায়। অনিলিখাকে যে করেই হোক বাঁচাতেই হবে। কিন্তু কোথায় পাবেন তিনি সেই মারাত্মক ছত্রাক?

আগের বছর, ১৫ এপ্রিল, লন্ডন

আজকের দিনটা লন্ডনের অন্য দিনগুলোর মতো নয়। গত কয়েক সপ্তাহ বেশ ভালোই ঠান্ডা ছিল। মাঝে মধ্যে ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি, হাড় কাঁপানো ঠান্ডা হাওয়া। সেখানে আজ হঠাৎ করে গরম পড়েছে। মাথার উপরে ঝকঝকে নীল আকাশ, কিছু ছেঁড়া পেঁজা তুলোর মতো সাদা মেঘ নিজের খেয়ালে ভেসে বেড়াচ্ছে। লন্ডনবাসীরা এরকম একটা হঠাৎ করে পাওয়া রৌদ্রোজ্জ্বল দিন কখনও মিস করতে চায় না। তাই ক্যাফেগুলোতে বেশ ভিড়। লাঞ্চটাইম পেরিয়ে গেলেও অফিসে ফেরার ইচ্ছে কারোরই নেই।

ভিড়ের মধ্যে দিয়েই লন্ডনের হাইড পার্কের সন্নিবর্তী একটা নামী হোটেলে পরপর তিনটে গাড়ি এসে ঢুকল। অতি সাধারণ গাড়ি। এরকম অভিজাত হোটেলের সামনে এমন গাড়ি সাধারণত দেখা যায়।

যে তিনজন এসেছেন এই গাড়িতে, তারা শুধু ধনকুবের নয়, বিশ্ব জুড়ে থাকা তিনটে ফরচুন হান্ড্রেড কোম্পানির মালিক। কিন্তু তারা কেউ চায়নি, তাদের এই মিটিং অন্য কারো চোখে পড়ুক। তাই এই সাবধানতা অবলম্বন।

হোটেলের বিশাল মিটিং রুমে আলোচনা শুরু হল।

এই তিনজনের মধ্যে আছেন—এক বিশ্বখ্যাত তেল কোম্পানির মালিক, এক নামী গাড়ির কোম্পানির মালিক, এবং তৃতীয় জন বিখ্যাত স্টিল কোম্পানির মালিক।

প্রথমজন বলল, এরকম চললে আমাদের সব ব্যবসা বন্ধ করে দিতে হবে। চারদিকে গ্রিন লবি যেভাবে বাড়াবাড়ি শুরু করেছে যে কিছুই করা যাচ্ছে না। এতদিন তাও সরকারের সাপোর্ট ছিল আমাদের ওপর। কিন্তু এখন সেটাও নেই। সব আলোচনায় শুধু গ্লোবাল ওয়ার্মিং আর গ্লোবাল ওয়ার্মিং! আর সবার উপরে কার্বন এমিশন কমানোর জন্য চাপ।

ঠিকই। আমাদের খুব দ্রুত কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আগে কিছু বিজ্ঞানী অন্তত আমাদের দলে ছিল। কিন্তু এখন তারাও ভয়ে আর কিছু বলে না। সাধারণ জনতা আরও খেপে উঠছে। আরে বাবা, ইন্ডাস্ট্রি রিভোলিউশনের সময়ের থেকে দু-ডিগ্রি বেশি গরম হলে যেন পুরো পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে! আরেকটু বেশি ঝড় হবে, বন্যা হবে, হিমবাহ আরেকটু বেশি গলবে, একটু খাদ্য সঙ্কট দেখা দেবে, এই তো! সব কিছুই না হয় বুঝলাম, কিন্তু আমাদের চলবে কী করে! গাড়ির কোম্পানির মালিক মুখ বেজার করে বলল কথাগুলো।

আমার একটা আইডিয়া আছে। তৃতীয়জন বলে।

হ্যাঁ, সেজন্যেই তো আসা। আপনি যে একটা আইডিয়ার কথা বলেছিলেন! প্রথম ও দ্বিতীয় জন একসঙ্গে বলে উঠল।

সেই কথায় আসি। এসবের থেকে নজর অন্যদিকে ঘোরাতে হবে। তা ছাড়া কোনও উপায় নেই। ধরুন যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়, বা অতটা না হোক, দুটো বড় দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধে, বা কিছু দেশে গৃহযুদ্ধ বাধে, সেক্ষেত্রে এসবের কথা সবাই ভুলে যাবে। কে আর তখন চিন্তা করবে গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে। কী বলেন?

ভালো আইডিয়া। কিন্তু কীভাবে? যুদ্ধ চাইলেই তো আর হয় না! দ্বিতীয়জনের কণ্ঠে সংশয়।

কাজটা অবশ্যই সহজ নয়। কিন্তু কিছু খরচ করলে, ঠিক ব্যবস্থা করা যাবে। যদি কিছু না করে চুপচাপ বসে থাকি, এ তো একপ্রকার আত্মহত্যা। এখন তো একটা সাধারণ লোকও কেস করে আমাদের কোম্পানি বন্ধ করে দিতে পারে।

,সত্যি, এটা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এভাবে যুদ্ধ-অশান্তি ছড়িয়ে কি চিরকাল এদের থামিয়ে রাখা যাবে? প্রথমজনের চোখে জিজ্ঞাসা।

হ্যাঁ, যাবে। যদি আমরা কয়েক বছরের জন্য যুদ্ধ বা গৃহযুদ্ধ শুরু করাতে পারি, কয়েক বছরের জন্য গ্রিন হাউস গ্যাস এমিশন কমানো—এসব নিয়ে উন্মাদনা থামাতে পারি, তাহলেই কেল্লাফতে! তৃতীয়জন ভরসা দিল।

কীভাবে? প্রথমজন শুধাল।

এমনিতেই গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর জন্য এর মধ্যেই বেশ কিছু দেশে খাবারের চরম সঙ্কট দেখা দেবে। খাবার জল পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাবে না। কী করবে তখন সেখানকার লোকেরা? তখন সেসব দেশের মানুষ আরও বাধ্য হবে অন্য দেশে যেতে। তখন যুদ্ধ বাধবেই। সুদান, নাইজেরিয়া, ক্যামেরুন, ইয়েমেন, বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে এভাবে গৃহযুদ্ধ লেগে যাবে। যত দারিদ্র বাড়বে, তত অশান্তি বাড়বে, তত লোকে আরও কম গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে ভাববে।

এবার উন্নত দেশগুলোর কথায় যদি আসি। যত উত্তর মেরুর বরফ গলবে, দেখবেন রাশিয়া, ন্যাটোর দেশগুলো, আর চীনের মধ্যে ওই জায়গার দখল-অধিকার নিয়েও প্রতিযোগিতা বাড়বে, রেষারেষি থেকে যুদ্ধ হবে, ওদের নিউক্লিয়ার ওয়ারের দিকেও নিয়ে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়।

ঠিক বলেছ। কিন্তু এখন আমাদের তার জন্য ঠিক কী করতে হবে? প্রথম জন ব্ল্যাককফিতে চুমুক দিয়ে বলল।

সেটারই একটা খসড়া করে এনেছি। এমনভাবে করতে হবে যাতে কোনওভাবে সন্দেহের তির আমাদের দিকে না ঘোরে। আর যদি ঘোরেও, যেন আমাদের সরাসরি ইনভলভমেন্ট প্রমাণ করতে না পারে। এ কাজে আমাদের সাহায্য করবেন একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী। ওনার বেশ কিছু নভেল আইডিয়া আছে।

বিজ্ঞানী? কে সেই বিজ্ঞানী? আবারও বাকি দুজন একসঙ্গে বলে উঠল।

আমরা সবাই এনার নাম শুনেছি। তবে বিশেষ কিছু কারণে ওনাকে এখন সব নামী বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। কিন্তু এককথায় জিনিয়াস। বাইরে অপেক্ষা করছেন। বিজ্ঞানীর নাম ডক্টর গিল হারভে।

১৭ এপ্রিল, ভলক্যানোস ন্যাশনাল পার্ক, রোয়ান্ডা

প্রায় ত্রিশজনের আমেরিকান টুরিস্টের গ্রুপটা এগিয়ে যাচ্ছিল ভলক্যানোস ন্যাশনাল পার্কের পাহাড়ি পথ ধরে। সঙ্গে বেশ কয়েকজন স্থানীয় লোক যারা গরিলা ট্র্যাকিং পোর্টার হিসেবে কাজ করছে। এদের আগের জেনারেশন চোরাকারবারীর কাজ করত। নানান বন্যজন্তু হত্যা করে রোয়ান্ডার জঙ্গলে এদের প্রায় নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছিল। উধাও হয়ে যাচ্ছিল এখানকার বিখ্যাত মাউন্টেন গরিলাও। বিশ্বের যে কয়েকটা জায়গায় এদের দেখা মেলে তাদের মধ্যে এই জায়গা সবার আগে। সে জন্য সবসময় টুরিস্টদের ভিড় এখানে।

এখন এখানকার স্থানীয় লোকেরা বুঝেছে যে এদের জীবন ও জীবিকা নির্ভর করছে এসব গরিলাদের উপরে। পরবর্তী প্রজন্ম তাই পোর্টার হিসেবে কাজ করে বুঝতে শিখেছে এদের সংরক্ষণ করা কতটা জরুরি। দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসা টুরিস্টদের মাউন্টেন গরিলা দেখানর দায়িত্বটা এই পোর্টাররাই পালন করে আসছে।

বেশির ভাগ মাউন্টেন গরিলা গ্রুপে থাকে। কখনও দশজনের গ্রুপে, তো কখনও তিরিশজনের। এমনিতে এরা খুব শান্ত ভদ্র, তবু টুরিস্টদের বিশেষ কিছু নিয়মনীতি মানতেই হয়। যেমন গরিলাদের চোখের দিকে না তাকানো, ছুটে কাছে না যাওয়া, অহেতুক বিরক্ত না করা। এসব নিয়ম পোর্টাররা আগেই ডিব্রিফিং-এর সময় বারবার করে বলে দেয়। না মানলে দু-একবার গরিলা খেপে গিয়ে তেড়ে এসেছে, এরকম ঘটনাও ঘটেছে।

উচ্চবিত্ত টুরিস্টের গ্রুপ। ঘন পাহাড়ি জঙ্গলে জলকাদার মধ্যে দিয়ে হাঁটার জন্য সবার পায়ে গাম্বুট। এরা কিগালি অব্দি এসেছে ফ্লাইটে। তার পরে জিপে চলেছে মাউনট বিসুকের পথে। আজ মেঘলা আকাশ। হাতে হাইকিং-এর লাঠি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে পর্যটকের দল।

হঠাৎ যেন সামান্য জোরে কথা বলে উঠল এই পোর্টারদের দলের মধ্যে একজন— ইমানুয়েল। ও-ই সবথেকে বেশি বছর ধরে এই কাজ করছে। কিছু দূরে পাহাড়ের উপরে একটা গরিলার দল দেখতে পেয়েছে ও। প্রায় জনা তিরিশের একটা বড় গ্রুপ।

এবারে ফিসফিসিয়ে ইমানুয়েল বলল, কাছে যেও না। দূর থেকে দেখো।

ওই দলের কয়েকটা গরিলা ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। নাহ, ঠিক ওদের দিকে নয়। পাশ কাটিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল ওরা।

হঠাৎ ইমানুয়েলের কণ্ঠস্বর যেন বদলে গেল। গলায় ভয়ের সুর। কারণটা বুঝতে অবশ্য সময় লাগল না। গরিলার দল চারদিক থেকে কৌশলে ঘিরে ধরেছে ওদের। কয়েকজন নীচের দিক থেকে উপরে, কেউ উপর থেকে নীচে ওদের দিকে আসতে শুরু করেছে। শুধু বাচ্চা গরিলাগুলোকে দূরে সরিয়ে রেখে ওদের কাছে এগিয়ে আসছে ওরা।

শুড উই রান? একজন কমবয়েসি টুরিস্ট বলল।

নো নো। স্টে হোয়্যার এভার ইউ আর। দে উইল ডু নাথিং। দে আর ভেরি পিসফুল। তাছাড়া আমাদের থেকে অনেক বেশি জোরে দৌড়তে পারে ওরা। ছুটলে ওরা আরও তাড়া করবে। কিছু না করলে ওরা পাশ কাটিয়ে চলে যাবে।

সবাই ইমানুয়েলের কথা শুনে সেইভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কিন্তু না, ঘটনা এবারে ঠিক সেরকম হল না। কিছুক্ষণের মধ্যে গরিলার দল আরও কাছে এগিয়ে এল। আর তারপরেই শুরু হল মরণ চিৎকার। এক এক জনের পা ধরে পাথরের উপর দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে লাগল গরিলারা। তারপর ছুড়ে ফেলতে লাগল পাহাড়ের উপর থেকে নীচের দিকে। যারা পালাতে চাইল তাদের ধাওয়া করে এনে ছুড়ে ফেলে দিল নীচের দিকে।

বত্রিশ জন মারা পড়ল ওই গরিলাদের হাতে। প্রথম বার এই পার্কে এরকম ঘটনা হল।

কিছুদিনের মধ্যেই খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এই খবরে শুনে টুরিস্ট আসা বন্ধ হয়ে গেল। উপার্জনের আর কোনও উপায় রইল না স্থানীয়দের। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ল রোয়ান্ডার নানান প্রান্তে।

১০ মে, মসম্যান, ডেইনট্রি রেনফরেস্টের কাছে, অস্ট্রেলিয়া

এরকম ঘটনা কি আগে কখনও কোথাও হয়েছে জেমস?

নাহ, আমার তো এরকম ঘটনার কথা মনে পড়ছে না। তবে ক্যাশুয়ারি মাঝেমধ্যে অনেককে আহত করেছে, খেপে গিয়ে আক্রমণ করেছে এরকম বেশ কিছু ঘটনা আছে। কখনও খাবারের জন্য বা কখনও প্ররোচিত হলে এরা খেপে গিয়ে এরকম করে থাকে।

কিন্তু এভাবে একেবারে অকারণে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে দুটো পাখি মিলে বাচ্চাদের স্কুল আক্রমণ করেছে, একের পর এক বাচ্চা ও টিচারদের পা দিয়ে আঘাত করেছে, পায়ের নখ দিয়ে বাচ্চাদের শরীর চিরে দিয়েছে—এরকম ঘটনা কখনো হয়নি।

ওই স্কুলে খাবার দাবার কিছু ছিল? বা অন্য কিছু যার জন্যে এরকম টার্গেট করে থাকতে পারে?

নাহ, সেরকম কিচ্ছু ছিল না। একদম অন্য দিনের মতো সব কিছু স্বাভাবিক ছিল। স্কুলে ক্লাস হচ্ছিল। তার মধ্যে হঠাৎ হানা। এরা সাধারণত মানুষকে এড়িয়ে চলে। এই বিষয়ে আমার কিছু জুওলজিস্ট বন্ধুর সঙ্গে আজ সকালে কথা বললাম। প্রফেসার ডোনাল্ড এদের উপরে কুড়ি বছর ধরে রিসার্চ করেছেন। ওনাকেও কনসাল্ট করলাম। উনিও বললেন এরকম ঘটনা আগে কখনও হয়নি। তবে উনি দেখছেন বিষয়টা।

একটাকে তো গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে। অন্যটাকে খুঁজে পাওয়া গেছে? ওটা সবার আগে খুঁজে বার করতে হবে।

আধ ঘন্টার মধ্যে বাইশটা বাচ্চা আর তেরো জন শিক্ষককে মেরে জঙ্গলে ফিরে গেছে, ভাবা যায়!

শুনেছি এদের সঙ্গে নাকি ডায়নোসরদের একটা প্রজাতির ডাইরেক্ট লিঙ্ক আছে।

হ্যাঁ, জেনেটিকালি সেটা দেখা গেছে। কিন্তু একই সঙ্গে এরা যতই হিংস্র হোক না কেন এরকম ঘটনা আনহার্ড অফ। সামথিং কোয়াইট আনন্যাচারাল। দেখো, আমরা একটা মুহূর্তও নষ্ট করতে পারি না। আমার উপরে প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে চাপ দিতে শুরু করেছে। বারবার ফোন পাচ্ছি।

হ্যাঁ, স্যার, আমরা দেখছি। আমি এখনি আমার টিম নিয়ে আবার জঙ্গলে ঢুকব।

ঠিক আছে, যে-কোনও দরকারে আমাদের জানিও। প্রাইম মিনিস্টার সরাসরি এই বিষয়ে আপডেট চান। অপোজিশন খেপে উঠেছে, জনসাধারণকে আরও খেপিয়ে তুলছে, বলছে জঙ্গলের এত কাছে কোনও স্কুলে উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকা উচিত ছিল। সবই সরকারের দোষ।

হ্যাঁ, স্যার, নিশ্চিন্ত থাকুন। উই উইল ডু এভরিথিং পসিবল। পাখিটাকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ঠিক ধরব। জ্যান্ত বা মৃত।

এই বলে পুলিশ সুপারের রুম থেকে বেরিয়ে যায় দুঁদে শিকারি জেমস।

২২ মে, রেকাভিক, আইসল্যান্ড

রেকাভিক শুধু আইসল্যান্ডের রাজধানী নয়, প্রায় ষাট শতাংশ মানুষের বাস এখানে। শীতের সময় বরফের চাদরে মুড়ে থাকে বলেই হয়তো গরমের সময়ে এখানে চব্বিশ ঘণ্টাতেও দিন শেষ হয় না। এখানে এই কয়েকমাসে জীবনের সব আনন্দ শুষে নিতে চায় এখানকার অধিবাসীরা।

রেকাভিক থেকে কিছু দূরেই ক'দিন আগে চালু হয়েছে ওরকা প্ল্যান্ট। এরকম প্ল্যান্ট সারা বিশ্বে এই প্রথম। বাতাস থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড শুষে নিয়ে তাকে লাইমস্টোন পাথরে পরিণত করা হয় এই প্ল্যান্টে। এভাবেই বাতাস থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড সরিয়ে গ্লোবাল ওয়ার্মিং কমানো সম্ভব। এরকম একটা প্ল্যান্ট কোনওভাবেই গ্লোবাল ওয়ার্মিং কমাতে পারবে না। দু হাজার হাজার এরকম প্ল্যান্ট নানান দেশে তৈরি হলে শুধু যে লোকেদের সচেতনতা বাড়বে তাই নয়, উষ্ণতা বাড়ার হার সামান্য কমানো যাবে।

আইসল্যান্ডে আগ্নেয়গিরি থেকে উদ্ভূত অনেক ব্যাসল্ট পাথর আছে। বাতাস থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস টেনে নিয়ে ওই ব্যাসল্ট পাথরের সঙ্গে মিশিয়ে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট তৈরি করা হয় এই প্ল্যান্টে, যা লাইমস্টোন পাথর হিসেবে মাটির নীচে সঞ্চিত হয়।

এই প্ল্যান্টে ইনভেস্ট করেছে বিভিন্ন সংস্থা, বিভিন্ন পরিবেশ সচেতন সংস্থা। যদিও ওরকা সাম্প্রতিককালে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যেসব কোম্পানি তাদের কর্মকাণ্ডে মূলত ফসিল ফুয়েল ব্যবহার করে, তাদের তারা এই সুযোগ দেবে না। সেক্ষেত্রে তাদের মধ্যে ফসিল ফুয়েল ব্যবহার কমানোর কোনও ইচ্ছে থাকবে না।

রেকাভিক শহর থেকে দূরের এই প্ল্যান্ট দেখা যায়। এখানকার অধিবাসীরা জানে তাদের অস্তিত্ব নির্ভর করছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং কমানোর উপরে। তারা তাই দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করে এই প্ল্যান্টকে। গর্বের সঙ্গে এই প্ল্যান্টের কথা বলে।

কিন্তু আজ বিকেল ছ'টা নাগাদ দূর থেকে আসা একটা প্রবল বিস্ফোরণের আওয়াজে কেঁপে উঠল সারা শহর। মুহূর্তে ব্যাপারটা বোঝা গেল। বিশাল এক বিস্ফোরণ হয়েছে ওরকা প্ল্যান্টে।

প্রায় পুরো প্ল্যান্ট ভস্মীভূত। প্ল্যান্টের কন্ট্রোল সেন্টারে থাকা চারজন মূল অপারেটরের মৃত্যু হয়েছে। কী করে সেটা এখনও বোঝা যায়নি। সিসিটিভি ক্যামেরা সব পুড়ে যাওয়ায় কিছুই পরিষ্কার করে বোঝা না গেলেও দেখা গেছে ঘটনার দিন এক অজানা অচেনা লোক নিরাপত্তার সব স্তর ভেদ করে কন্ট্রোল সেন্টারে পৌঁছে গিয়েছিল।

আপাতদৃষ্টিতে এটা কোনও টেররিজমের ঘটনা বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

১০ জুন, কলকাতা আলিপুর চিড়িয়াখানা, ভারত

মন্ত্রী আফতাব আলি আলিপুর চিড়িয়াখানায় বেড়াতে এসেছেন। সঙ্গে ওর স্ত্রীও আছে। আফতাব আলি অত্যন্ত প্রভাবশালী বনদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী। কিছুদিন আগে আফতাব আলির কিছু কথা নিয়ে বেশ কিছু জায়গায় অশান্তি ছড়িয়ে পড়েছিল। কিছু বিতর্কিত কথার জন্য একটা গ্রুপ খুনের হুমকিও দিয়েছিল। তাই চিড়িয়াখানার মধ্যেও নিরাপত্তা রক্ষীদের সঙ্গে নিয়ে ঘুরছিল।

বাঘের খাঁচার কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ ওর দেহরক্ষীর চিৎকারে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে কিছু দূরে একটা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। বাঘটার ক্রুদ্ধ গর্জনে মনে হল ওর পুরো শরীর অবশ হয়ে গেছে। ভয়ে সেখানেই বসে পড়ল আফতাব আলি। জ্ঞান হারানোর আগে লক্ষ করল একটা হলুদ কালো ডোরাকাটা চেহারা দ্রুত এগিয়ে আসছে ওর দিকে।

পরের দিন সব কাগজের হেডলাইন ছিল—চারটে বাঘের আক্রমণে নিহত বারো। শতাধিক আহত। মৃতদের মধ্যে রাজ্যের প্রভাবশালী বনদপ্তরের মন্ত্রী আফতাব আলিও আছেন। বাঘগুলোকে শেষে গুলি করে মেরে ফেলতে হয়েছে। কিন্তু এরকম ঘটনা আগে কলকাতা চিড়িয়াখানার ইতিহাসে কখনও ঘটেনি।

রহস্য এখানেই যে, সব বাধা পেরিয়ে চার-চারটে বাঘ কীভাবে বেরিয়ে এল! যেন একজন আরেকজনকে সুপরিকল্পিতভাবে বেরোতে সাহায্য করেছে। তা না হলে এটা কোনওভাবে সম্ভব ছিল না। তারপরে একই সঙ্গে যেভাবে একে একে বিভিন্ন লোককে আক্রমণ করেছে, সেখানেও যেন তীব্র বুদ্ধির ছাপ।

এরকম ঘটনা শুধু কলকাতা কেন, সারা বিশ্বেও কখনও ঘটেনি।

এই ঘটনা নিয়ে রাজ্যে বড় ধরনের অশান্তি শুরু হল। কারণ অনেকের ধারণা আফতাবকে মারার জন্য ইচ্ছে করে বাঘ ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। এর পিছনে কোনও ধর্মীয় ষড়যন্ত্র আছে।

১৪ জুন, মোগাদিসু, সোমালিয়া

সোমালিয়ায় দীর্ঘ গৃহযুদ্ধ অবশেষে একটু থেমেছে। কত লক্ষ সোমালিবাসী যে এই যুদ্ধে মারা গেছে কে জানে!

প্রেসিডেন্ট হাসান শেখ মাহামুদ খুব শক্ত হাতে জিহাদীদের শেষ করেছেন।

তবে এখনও দেশের মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চল টেররিস্ট গ্রুপ আল-শাবাবদের অধীনে। আল-শাবাব আর আল-কায়দার মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। এরা এসব জায়গা থেকে ট্যাক্স সংগ্রহ করে। এখানকার বাচ্চা ছেলেমেয়েদের জোর করে টেররিস্ট গেরিলা ইউনিটে নিয়মিত ভর্তি করে।

প্রায় দু-যুগ ধরে চলা গৃহযুদ্ধ ও চরম অশান্তির পর একটু হলেও নিয়ম-শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে।

তবে এসব এলাকায় শান্তি খুবই অস্থায়ী। যে-কোনওদিন আবার শুরু হয়ে যেতে পারে। এজন্য নিজের বিশাল প্যালেসে সব রকম সিকিউরিটির ব্যবস্থা করেছেন প্রেসিডেন্ট।

এদেশে আসলে জাতীয় সংহতি শব্দটার কোনও অর্থ নেই। এখানে দেশ চালাতে হয় শুধু স্বৈরাচারী হিসেবে নিজের বশংবদ ও অনুগতদের নিয়ে। কেউ প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে নেই, প্রশ্ন যাতে আর কোনওদিন না আসে তার ব্যবস্থা করতে হয়।

প্যালেসের বাগানের হ্যামকে শুয়ে এসবই ভাবছিলেন উনি।

হঠাৎ যেন আকাশ কালো হয়ে এল। উনি ও ওনার সিকিউরিটির দায়িত্বে থাকা লোকেরা কিছু বোঝার আগেই নেমে এল প্রায় শ'খানেক ঈগলের দল। তারা যেন তাকেই হত্যা করতে এসেছে। বন্দুকের গুলি চালানোরও সময় পেল না কেউ। আধঘন্টার মধ্যে যখন সেনা ঢুকল বাগানে তখন সেখানে কয়েকটা মৃতদেহ পড়ে আছে। তার মধ্যে আছে হাসানের দেহও।

কয়েক ঘন্টার মধ্যে সে খবর ছড়িয়ে পড়ল সোমালিয়ার প্রান্তে প্রান্তে। আবার শুরু হয়ে গেল রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ।

২৮ জুন, হাবড়া, ভারত

বিশ্বজিৎদাই বলছিল—আমাদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা আমাদের চারদিকে অ্যালিয়েন ঘুরে বেড়াচ্ছে, শুধু আমরাই টের পাই না। ধরে নে এই ঘরেই এরকম এক অ্যালিয়েন আমাদের সঙ্গে বসে আছে, দিব্বি মাছের চপ খেতে খেতে ঠ্যাং দোলাচ্ছে হয়তো। শুধু আমরা বুঝতে পারছি না।

কথাটা যে অনিলিখাদিকে উদ্দেশ্য করে সেটা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে প্রতিক্রিয়াটা এল অনর্থবাবুর দিক থেকে। উনি চিংড়ি মাছের চপ খেতে খেতে চেয়ারে বসে এতক্ষণ একটা গান গুনগুন করতে করতে পা দোলাচ্ছিলেন। হঠাৎ খেয়াল করে থেমে গেলেন, আর কৌতূহলী চোখে বিশ্বজিৎদার দিকে তাকালেন।

অনেক দিন পরে আমাদের শনিবারের আসর একেবারে ফুল হাউস। তবে এবারে আমরা কলকাতার প্রতীকের বাড়িতে মিট করছি না। আমাদের আজকের আড্ডা হাবড়ায়। সহেলীর কাকার বাড়িতে। হাবড়া স্টেশনের ঠিক পাশেই বিশাল বাড়ি সহেলীর কাকার।

অনেকদিন ধরেই সহেলী আমাদের এখানে আসতে বলে। অবশেষে অনিলিখাদিই বলল যে এবারে চল, হাবড়া ঘুরে আসি। আড্ডাও হবে আর তোর কাকা ওখানকার ক্রিকেট ক্লাবের প্রেসিডেন্ট না? সবাই মিলে ক্রিকেট খেলাও যাবে।

মানে! অনিলিখাদি, তুমি ক্রিকেটও খেলতে পারো নাকি!

হ্যাঁ, আমি তো কলেজ লেভেলে খেলেছি। আমেরিকায় যখন পড়তাম, তখনও খেলেছি।

ব্যাটসম্যান না বোলার?

অলরাউন্ডারও বলতে পারিস। তবে ব্যাটিংটা বেটার করি।

পাশ থেকে বিশ্বজিৎদা সমানে কেশে যাচ্ছে। সেটা শুনে প্রায় অগ্রাহ্য করে অনিলিখাদি বলে উঠল, তোর কাকাকে বলিস ছেলেদের বিরুদ্ধে মেয়েদের একটা ক্রিকেট ম্যাচ হবে। অবশ্য যদি বিশ্বজিৎ রাজি থাকে খেলতে। ও নাকি খুব ভালো ফাস্ট বোলিং করে শুনেছি। আমার আবার ফাস্ট বোলিংয়ের বিরুদ্ধে চার-ছয় মারতে খুব ভালো লাগে।

এই ঐতিহাসিক কমেন্টের পরে হাবড়া না এসে আর কোনও উপায় ছিল না। সেই যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল সেদিন, তার জেরেই ঠিক তার দুই সপ্তাহ বাদে আমরা হাবড়ায় সহেলীর কাকার বাড়ি এসে হাজির হয়েছি।

এই প্রথম আমরা, মানে ছেলেরা সবাই বিশ্বজিৎদার দিকে, অনিলিখাদির এগেন্সটে। সহেলী, কেয়া, পুনাম, রূপসা—এরা সবাই অনিলিখাদির দলে।

বিকেল চারটে থেকে ম্যাচ। আপাতত দুপুরে জমাটি খাওয়ার পরে আমরা সবাই আড্ডায়।

সঙ্গে অনর্থবাবু এসেছেন। উনি এখন কয়েকমাসের জন্য আমেরিকা থেকে ভারতে এসেছেন। উনিও লাফিয়ে উঠলেন আসবেন বলে। তবে শুধুই দর্শক হিসেবে।

বিশ্বজিৎদার কমেন্টে পা দোলানো থামিয়ে উনি বলে উঠলেন, তা অনিলিখা তোমার কী মত এ ব্যাপারে! অ্যালিয়েনদের খোঁজ পাওয়া যায় না কেন?

পাওয়া যায় না কে বলল? আমার ধারণা এই পৃথিবীতেই আছে। আমি তাদের পরিচয়ও পেয়েছি। তাছাড়া মহাবিশ্বে তো আছেই। আমরা আসলে যেভাবে মহাবিশ্বে এতদিন প্রাণী খুঁজেছি, তাতে পরিবর্তন আসতে চলেছে। তখনই ওদের খুঁজে পাওয়া যাবে।

অনর্থবাবু 'মহাবিশ্বে মহাকাশে' গানটা হঠাৎ করে বেসুরো গলায় শুরু করেছিলেন। তাঁর গান থামিয়ে দিয়ে তন্ময় বলল, কীভাবে?

ধর, আমরা এতদিন ভেবেছি যেখানে জল সেখানে প্রাণ। সে জন্য জল কোথায় থাকতে পারে, তা খুঁজেছি। আমরা কার্বন বেসড লাইফ ফর্ম খুঁজেছি কারণ, পৃথিবীর সব পরিচিত জীবই কার্বন-বেসড। কিন্তু এখন মনে করা হচ্ছে মহাবিশ্বে অন্য কোনও জীব থাকতে পারে যারা সিলিকন-বেসড, কারণ সিলিকনেরও কার্বনের মতো অন্য চারটে পরমাণুর সঙ্গে বন্ড তৈরি করে সিলিকন-বেসড কমপ্লেক্স লাইফফর্ম তৈরি করার ক্ষমতা আছে। সেরকম কোনও জীব আমাদের পৃথিবীতে থাকলেও আমরা তার খোঁজ এতদিন করিনি। মহাবিশ্ব তো অনেক দূরের কথা।

বিকেল সাড়ে চারটে, খেলার মাঠে

বাড়ি থেকে মাঠ বেশি দূর নয়। তবু আমাদের জন্য বেশ কয়েকটা গাড়ির ব্যবস্থা ছিল। এলাহি ব্যবস্থা। তাতে করেই মাঠে এসে পৌঁছলাম। এই মাঠে যে নিয়মিত বড় খেলা হয় তা দেখেই বোঝা যায়। বেশ সুন্দর পিচ।

পঁচিশ ওভারের খেলা। বিশ্বজিৎদা টসে জিতে মেয়েদের আগে ব্যাট করতে পাঠালো। আমাদের এসে বলল, দেখবি পাঁচ ওভারে অল আউট হবে সবক'টা। দু-ঘন্টার মধ্যে বাড়ি ফিরে ফের তপসের ফ্রাই খাওয়া যাবে।

ব্যাপারটাতে আমাদের সবারই মত ছিল।

কিন্তু ফল হল উলটো। অনিলিখাদি যে এত ভালো ব্যাটিং করে কে জানত। রূপসা আর সহেলীর দুই উইকেট প্রথম ওভারে পড়ে গেলে নামল অনিলিখাদি ও শ্রেয়া। শ্রেয়া এখানকার স্থানীয় মেয়ে। স্টেট লেভেলে খেলেছে। বেশ ভালো খেলে।

কিন্তু অনিলিখাদি হল আসল সারপ্রাইজ এলিমেন্ট। শ্রেয়ার থেকেও অনেক ভালো খেলে। শ্রেয়ার সঙ্গে জুটি বেঁধে যা মারতে শুরু করল আমাদের বলা যায় নাজেহাল অবস্থা।

বিশ্বজিৎদা ক্যাপ্টেন হিসেবে বারবার যতই ফিল্ড আর বোলার চেঞ্জ করুক না কেন আর কোনও উইকেট পড়ে না। দশ ওভারে বিরানব্বই রান।

হঠাৎ দেখি দূর থেকে অনর্থবাবু চিৎকার করতে করতে ছুটে আসছেন।

অনর্থবাবুর ওই পাগলের মতো ছুটে আসা দেখে অনিলিখাদি হাত তুলে আমাদের সবাইকে থামতে বলল।

কী ব্যাপার!

ডেড! মারা গেছে। লাশ। কী সর্বনাশ! অনর্থবাবু দেখি দূরে যে বেঞ্চিতে বসেছিলেন, সেদিকটা দেখিয়ে বলতে বলতে আমাদের দিকে ছুটে আসছেন।

অনিলিখাদির সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই ছুট লাগালাম বেঞ্চিটার দিকে। বেঞ্চিটা মাঠের বাইরে। রাস্তার ধারে। ওখানেই অনর্থবাবু বসে খেলা দেখছিলেন। অনিলিখাদির একটা ছয় মারার পরে ভয়ে দূরে এসে বসেছিলেন যাতে গায়ে বল না লাগে। আমরা দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম, আরেকজন কেউ বসে আছে পাশে।

কাছে গিয়ে দেখি সেই ব্যক্তির ঘাড় একদিকে কাত হয়ে গেছে। মুখ থেকে লালা গড়িয়ে শুকিয়ে গেছে।

অনিলিখাদি নাড়ী দেখে বলল, ডেড। কিন্তু বডি টেম্পারেচার দেখে মনে হচ্ছে এক-দেড় ঘন্টার মধ্যেই মারা গেছেন। শরীর এখনও গরমই আছে। তারপর অনর্থবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার সঙ্গে কোনও কথা হয়েছিল?

না, মানে আমার দিক থেকে হয়েছিল। আমি ভাবছিলাম ভদ্রলোক চুপ করে আমার কবিতা শুনছেন। পর পর চারটে শোনালাম। কিন্তু এত ধৈর্য ধরে কোনও কথা না বলে শুনছেন বলে, ভালো করে দেখতে গিয়ে বুঝলাম...। একটু থেমে ফের বলে উঠলেন, কী হয়েছে মনে হচ্ছে? হার্ট অ্যাটাক?

টেস্ট না করে বোঝা যাবে না। ইমিডিয়েটলি পুলিশে খবর দিতে হবে। সহেলীর কাকা ইতিমধ্যেই পুলিশে, অ্যাম্বুল্যান্সে ফোন করেছে।

খেলাটেলা সব তখনই বন্ধ।

৫ জুলাই, কল্যাণগড়, মিঃ পাই-এর বাড়ি

অনিলিখা ছুটে এসেছে মিঃ পাই-এর বাড়িতে। ক্রিকেট মাঠে মারা যাওয়া সেই ব্যক্তির পরিচয় পুলিশ পেয়েছে। নাম অরুনাভ সান্যাল। বহু বছর দেশের বাইরে। আমস্টারডামে 'ব্রেনবো' বলে একটা সংস্থায় জীববিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করছিলেন। কিছুদিনের জন্য দেশে ফিরে এসেছিলেন।

অরুনাভবাবুর বাবা হাবড়ার কাছে এক স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। বেশ কয়েক বছর হল মারা গেছেন। ওদের বাড়িটা ফাঁকাই পড়ে থাকত। কিছুদিন আগে অরুনাভবাবু থাকতে শুরু করেছিলেন। তেমন কারো সঙ্গে মিশতেন না। মৃত্যু হার্ট অ্যাটাকে বলে সন্দেহ করা হলেও নিশ্চিতভাবে বলা যায়নি।

ভদ্রলোক বাড়িতে সিকিউরিটি গার্ড ছাড়াও সি সি টিভি ক্যামেরা ও আরও অত্যাধুনিক সিকিউরিটি সিস্টেম বসিয়েছিলেন। হাবড়ার মতো জায়গায় এক বিজ্ঞানীর হঠাৎ এত কেন নিরাপত্তার দরকার হয়ে পড়ল?

অনিলিখার সব কিছু শুনেই কেন জানি মনে হয়েছে ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিক নয়। এবিষয়ে সরাসরি কিছু কথা বলা দরকার মিঃ পাই-এর সঙ্গে।

গণেশ অনিলিখাকে ড্রয়িংরুমের সোফায় বসিয়ে মিঃ পাইকে ডাকতে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মিঃ পাই হাজির। হাতে একটা হেমেন্দ্রকুমার সমগ্র।

বইটা টেবিলের উপরে রেখে উল্টোদিকের সোফায় বসে একগাল হেসে বললেন, এ তো দারুণ সারপ্রাইজ অনিলিখা! বলো কী ব্যাপার?

আপনি যেটা নিয়ে ভাবছেন, আমিও সেই বিষয়েই কিছু প্রশ্ন নিয়ে এসেছি।

মানে? আমি কী বিষয় নিয়ে ভাবছি, সেটা তুমি জানলে কী করে?

ওই যে টেবিলের উপরে আধখোলা কাগজ যেখানে অরুনাভবাবুর মৃত্যুর খবরটা বেরিয়েছে। তারপরে ওই যে 'হেমেন্দ্রকুমার সমগ্র' বই-এর গায়ে লাগিয়ে রাখা পোস্ট ইটে ব্রেনবোর ওয়েব সাইট অনুযায়ী ফোন নাম্বার লিখে রেখেছেন—তা থেকেই বুঝলাম আপনিও ওই নাম্বারে কাউকে না পেয়ে নির্ঘাত ফোন করতে গিয়েছিলেন আপনার কোনও বন্ধুকে। আমিও চেষ্টা করেছিলাম।

ওরে বাবা, কী অবসারভেশন! হ্যাঁ, ঠিকই। ব্রেনবোর নাম্বারে না পেয়ে আমার এক ইউরোপীয় জীববিজ্ঞানী বন্ধুকে ফোন করে খবর নিচ্ছিলাম। বলো কী ভাবছ?

আসলে শুধু এটা নয়, বেশ কিছু ঘটনা মাথায় ঘুরছে। জানি না এগুলো কোনওভাবে কানেক্টেড কিনা। এই ধরুন, চিড়িয়াখানার ঘটনাটা—চারটে বাঘের খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের মধ্যে দারুণ সমন্বয় রেখে আক্রমণের ঘটনা, মোগাদিসুতে ঈগলের আক্রমণের ঘটনা, অস্ট্রেলিয়ায় ক্যাশুয়ারির আক্রমণের ঘটনা—এসবের মধ্যে কোথায় যেন মিল আছে।

হুম। অনিলিখা, তুমি ডক্টর জশুয়া শেঙ্গের নাম শুনেছ?

না, খেয়াল করতে পারছি না।

না শোনাটাই স্বাভাবিক। তোমার ফিল্ডের নয়। দু-বছর আগে উনি একটা খুব বড় আবিষ্কার করেছিলেন। উনি আমাদের ব্রেনের নিউরন ইঁদুরের ব্রেনে ট্রান্সপ্লান্ট করে রিসার্চ করেছিলেন।

ইন্টারেস্টিং! বলে অনিলিখা সোফাতে নড়েচড়ে বসল।

আসলে পারকিনসন্সের মতো স্নায়ুরোগের চিকিৎসা এবং এটা ঠিক কেন হয়—সেটাই ছিল জশুয়ার রিসার্চের বিষয়। সেখানে দেখা যায়, ইঁদুরের মধ্যে বেশ কিছু মানুষের মতো স্বভাব আছে। পরে উনি মানুষের নিউরাল স্টেমসেল নানান প্রাণীর ব্রেনসেলে মিশিয়ে দেখছিলেন। কিছু প্রাণীতে অস্বাভাবিক কিছু মনুষ্যসুলভ ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। এই নিয়ে তখন বিজ্ঞানী মহলে হইচই শুরু হয়।

আপনি কী বলতে চান এই ঘটনাগুলোর পিছনে এই একই কারণ? এ তো সত্যি বেশ চিন্তার ব্যাপার। যদি ওই চিড়িয়াখানার বাঘের ব্রেনসেলে মানুষের ব্রেনসেল ঢুকিয়ে তার বুদ্ধি-বিবেচনা মানুষের মতো করে দেওয়া হয়ে থাকে...

এক্সাক্টলি! এছাড়া, কেন জশুয়া শেঙ্গের নাম বললাম বলো তো?

ওই 'ব্রেনবো' সংস্থার সঙ্গে ওনার যোগাযোগ আছে?

হ্যাঁ। ওটাই খুঁজে পেলাম। উনি আমেরিকা ছেড়ে এখানে এসে কী করছিলেন, এই সংস্থাটা কী কাজ করছিল, সেটা বোঝা দরকার। আমার মনে হয় এমন কিছু রিসার্চ ওরা করছিল, যা আমেরিকায় নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেজন্য উনি আমস্টারডামে চলে আসেন।

কিন্তু প্রশ্ন হল অরুণাভবাবুর মৃত্যুর সঙ্গে এসব রহস্যের কোনও যোগাযোগ আছে কিনা। উনি এমন কী জানতেন, যার জন্য ওনাকে সরিয়ে দেওয়া হল?

তুমি ইউরোপে প্রায়ই যাও। কোনও প্ল্যান আছে নেদারল্যান্ডস যাওয়ার?

অনিলিখা মুচকি হেসে সায় দিল। বলল, পরের মাসে যেতে পারি, তখন একবার যাব ভাবছি।

হ্যাঁ, অবশ্যই দেখো। কেন জানি না। আমিও তোমার সঙ্গে সহমত। কিছু একটা অস্বাভাবিক আছে। সাধারণ চোখে সেটা ধরা পড়বে না।

মিঃ পাই একটু থেমে ফের বললেন, তুমি অক্টোপাসের চোখ লক্ষ করেছ?

কেন বলুন তো? মানুষের চোখের মতো একরকম বলে?

ঠিক তাই। দেখো আমরা সবাই অক্টোপাসের কথা জানি, কিন্তু আমরা এরকম একটা বিস্ময়কর বিষয় নিয়ে কেউ ভাবিনি। কেউ না!

আমাদের অর্থাৎ মানুষের ও অক্টোপাসের কমন পূর্বপুরুষ, অর্থাৎ যেখান থেকে আমরা আলাদা হয়ে যাই বিবর্তনের ধারায়, সেটা প্রায় ছ'শো মিলিয়ন বছর আগে। যেখানে শিম্পাঞ্জীর ও আমাদের কমন অ্যান্সেটার মোটে দশ মিলিয়ন বছর আগের, কিন্তু ওদের থেকে অক্টোপাসের চোখের সঙ্গে আমাদের অনেক বেশি মিল।

উঁহু, দশ নয়, ষোলো মিলিয়ন বছর আগে শিম্পাঞ্জীদের থেকে আলাদা হয়ে যাই আমরা। তোমার আই কিউ দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি অনিলিখা! আমার মাথায় এই চিন্তাটা শেষ কয়েকদিন ধরে ঘুরছে। দেখো, কোনওরকম যোগাযোগ না থাকা সত্ত্বেও যদি চোখ একরকম হতে পারে বিবর্তনের নিয়মের বাইরে গিয়ে, বুদ্ধির ক্ষেত্রেও কী হাইলেভেল ইন্টেলিজেন্স একইরকমভাবে হঠাৎ করে কোনও এক প্রাণীর মধ্যে গড়ে উঠতে পারে না?

হয়তো অক্টোপাস কতটা বুদ্ধিমান, সেটাও আমরা বুঝতে পারছি না। হয়তো ওদের বুদ্ধির বিকাশ অন্যভাবে গড়ে উঠেছে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা মানুষের থেকে এগিয়ে।

গুড থট প্রসেস। ইনটেলিজেন্স ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হয়। আমরা যেভাবে মানুষের ইন্টেলিজেন্স বিচার করি, সেই একই ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে হয়তো অন্য কোনও প্রাণীর ইন্টেলিজেন্স মাপা ঠিক নয়। নাহ, অনিলিখা, তুমি আমার বাড়িতে কিছুদিন এলে আমার কাজগুলো অনেক তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাবে। মাঝে মধ্যে সময় করে এসো।

১৫ আগস্ট, সুইসরেল, সুইজারল্যান্ড

জুরিখ থেকে জেনিভা প্রায় দু-ঘন্টার রাস্তা। ট্রেনের দু-দিক দিয়েই অপূর্ব দৃশ্য। ট্রেনের বাঁ-দিকে বসলে নাকি আরও ভালো দৃশ্য চোখে পড়ে, লেকটা এদিকেই পড়ে। তাই বাঁ-দিকের সিটে বসেছিল অনিলিখা।

ট্রেন বেশ ফাঁকা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু লোক বসে আছে। জুরিখ ছাড়ার আধ ঘন্টা পর থেকেই শুরু হয়ে গেল পাহাড় উপত্যকা, ছোট ছোট গ্রাম, খামার বাড়ি, সুইস কটেজ। লুসারন পেরোনোর পরেই বাঁ-দিকে লেক শুরু হয়ে গেল। পাহাড় আর লেক। প্রকৃতি দেবী কোনও কার্পণ্য করেননি

সুইজারল্যান্ডকে সাজানোর জন্যে, সব কিছু দিয়ে নিখুঁতভাবে সাজিয়েছেন।

বাইরের এই দৃশ্য দেখতে দেখতে এত বিভোর হয়ে গিয়েছিল অনিলিখা, খেয়ালই করেনি কখন উল্টোদিকে এক বৃদ্ধ এসে বসেছেন। প্রথমে কিছুটা দ্বিধা থাকলেও একটু পরেই নিশ্চিত হল অনিলিখা। বিখ্যাত পরিবেশবিদ, প্রকৃতিবিদ বিজ্ঞানী মরিস অ্যাশ। আশির কাছাকাছি বয়স।

অনিলিখা ইংরেজিতেই জিগ্যেস করল, আপনি স্যার মরিস অ্যাশ না?

চমকে উঠলেন ভদ্রলোক। হেসে বললেন, তা আমি তো সেরকম কোনও সেলিব্রিটি নই, আমাকে চিনতে পারলে কী করে?

মৃদু হেসে অনিলিখা বলল, আমি ঠিক শিওর ছিলাম না যদিও। আপনার বেশ কিছু বই পড়েছি আমি। বইয়ের পিছনে আপনার ছবি দেখেছি। সেখান থেকেই। তবে আপনি চিরকালই মিডিয়াকে অ্যাভয়েড করেছেন, যেটা অন্য অনেকের ক্ষেত্রে খাটে না। সেজন্য আমারও একটু দ্বিধা ছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যে আড্ডা বেশ জমে উঠল। অনিলিখা বাঁ দিক থেকে উঠে ভদ্রলোকের উলটো দিকে গিয়ে বসল। এরকম আলাপের সুযোগ ছাড়া যায়! গত তিরিশ বছর ধরে গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর বিরুদ্ধে প্রধান যোদ্ধাদের মধ্যে উনি একজন। উনিই প্রথম কীভাবে কোরাল রিফ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তার ছবি সবার সামনে তুলে ধরেছিলেন। তুলে ধরেছিলেন কীভাবে একের পর এক প্রাণী জীবজগৎ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, তার বৃত্তান্ত।

কথায় কথায় অনিলিখা হঠাৎ করেই বলল, আচ্ছা, এবারে ডাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের অ্যানুয়াল কনফারেন্সে গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর বিরুদ্ধে সেরকম কোনও কণ্ঠস্বর শোনা গেল না কেন?

ভদ্রলোক তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন অনিলিখার দিকে। তারপর বললেন, আমরা খুব শক্তিশালী লবির বিরুদ্ধে লড়ছি, বুঝলে অনিলিখা? যারা চাইলে, যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। তারা চায়নি ডাভোসে এ বিষয়ে কোনও আলোচনা হোক, তাই হয়নি।

কিন্তু এখন তো প্রায় একশো পঁয়ত্রিশটা দেশ কার্বন এমিশন কমানোর টার্গেট নিয়েছে!

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওটা আই ওয়াশ, লিগালি বাইন্ডিং কিছু নয়। অনেক দেশই কিছুই করছে না। তাছাড়া কিছু শক্তিশালী সংস্থা বুঝেছে যে কার্বন ফুট প্রিন্ট কমাতে গেলে তাদের ব্যবসার বারোটা বেজে যাবে। তারা এখন ডেস্পারেটলি অন্য কিছু করার চেষ্টা করছে।

আর সেটা কী?

বৃদ্ধ একবার চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে নীচু স্বরে বললেন, নজর অন্যদিকে ঘোরানোর চেষ্টা করছে। অনেক টাকা, সুযোগ-সুবিধে দিয়ে সব পরিবেশবিদ ও বিজ্ঞানীদের কিনে নিচ্ছে। ডেটাপয়েন্ট বদলে দিচ্ছে। আমাদের মতো লোকদের চুপ করিয়ে দিচ্ছে। বুঝতেই পারছ কারা সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবে যদি কার্বন নিক্রমণ কমাতে বাধ্য করা হয়! সব কিছু ঠিক দিকে এগোচ্ছিল। কেন জানি না গত সাত-আট মাস সবকিছু আবার পাল্টে গেছে। মিঃ লুই প্রিস্টার কথা শুনেছ?

হ্যাঁ, পরিবেশবিদ লুই প্রিস্টার? দু-সপ্তাহ আগে ফ্রান্সে গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেলেন তো। খুব আনফরচুনেট।

ব্যাপারটা আরও আনফরচুনেট কারণ ওটা কোনও দুর্ঘটনা নয়। প্ল্যানড মার্ডার। সুপরিকল্পিত হত্যা।

মানে? কী বলছেন!

ঠিকই বলছি। আমার মনে হয় আমারও খুব বেশি সময় নেই হাতে। সেজন্য কিছু বিষয় এখানে জানাতে এসেছি।

বিশ্বজুড়ে আরও বেশ কয়েকটা মৃত্যু হয়েছে গত কয়েক মাসে, যা আমার চোখ এড়ায়নি। কোনওটাই স্বাভাবিক নয়। বলতে পারো, একটু একটু করে গ্রিন লবিকে ভেঙে ফেলা হচ্ছে।

আচ্ছা, জানি না আপনি লক্ষ্য করেছেন কিনা, বেশ কিছু ঘটনা থেকে মনে হচ্ছে কেউ বা কারা যেন বিভিন্ন দেশে নানান ঘটনা ঘটিয়ে সেই দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থার অবনতি চাইছে, বা এমন কিছু করছে যাতে প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এটা অবশ্য আমার ধারণা।

স্যার মরিস যেন চমকে উঠলেন। বলবেন না ভেবেও শেষে বলেই ফেললেন, তোমার সন্দেহ ভুল নাও হতে পারে।

জেনেভাতে নামার আগে স্যার মরিস হঠাৎ করে বলে উঠলেন, আমি মরজেসের বঁ রিভেজ প্যালেস হোটেলে আছি। তুমি তো এখানে কয়েকদিন আছ। পারলে একদিন এসো। একসঙ্গে ডিনার করা যাবে।

সে তো আমারও খুব ভালো লাগবে। আপনি গত চল্লিশ বছর ধরে দেশ-বিদেশে নানান দুর্গম জায়গায় অভিযানে গেছেন। সে সব গল্প শোনা যাবে। আমি অবশ্য তিনদিন আছি এখানে। আপনার নাম্বারটা দিন।

হ্যাঁ, নিয়ে নাও।

১৭ আগস্ট, জেনিভা, সুইজারল্যান্ড

ইউনাইটেড নেশনস-এর সব অফিসের হেড কোয়ার্টার জেনিভায়। সেজন্যেই অনিলিখার এখানে বিশেষ কাজে আসা।

ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের এক সিনিয়র অফিসারের সঙ্গে সকালে একটা দরকারি মিটিং ছিল। দুপুর একটা নাগাদ অনিলিখা সেই বিল্ডিংয়ের নিরাপত্তার ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে এসে খেয়াল করল, কয়েক ঘণ্টা আগে স্যার মরিসের একটা মেসেজ এসেছে।

সন্ধে সাতটায় ডিনারে যদি অনিলিখা যোগ দিতে পারে, উনি খুব খুশি হবেন। উনি আছেন জেনিভা থেকে মিনিট কুড়ির দূরত্বে শহর মরজেসের সেই হোটেলে।

স্যার মরিস কেমন মানুষ সে ব্যাপারে অনিলিখার কিছুই জানা নেই। তবে বই পড়ে লেখক সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়। তাতে মনে হয়েছে খুব আদর্শবাদী এবং সাহসী মানুষ মরিস। আদর্শের জন্য নিজের প্রাণ দিতেও দ্বিধা করবেন না। এরকম মানুষকে অনিলিখা খুব শ্রদ্ধা করে।

এমনিতে ইচ্ছে ছিল সন্ধের দিকে জেনিভার লেক, জেনিভার পুরোনো শহরের দিকটা ঘুরে দেখার। কিন্তু তার থেকে স্যার মরিসের সঙ্গে কথা বলা অনেক বেশি দরকার। উনি নিশ্চয়ই সাম্প্রতিক কালের এসব ঘটনার বিষয়ে আরও কিছু জানেন। গত পরশু সেটা প্রথম পরিচয়ে বলেননি।

মরজেস পৌঁছাতে ঠিক বারো মিনিট লাগল। এখানে একদম ঘড়ির কাঁটা ধরে ট্রেন চলে। এক মিনিট দেরি হলেও পাশে লাল রঙে ডিলেড বাই ওয়ান মিনিট বলে পরিবর্তিত সময় দেখানো হয়। তবে সেরকম খুব কমই হয়।

মরজেস খুব পুরোনো শহর। ব্রোঞ্জ যুগে অর্থাৎ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ ২৭০০ বছর আগেও এখানে মানুষের বসতি ছিল। পরে ১২৮৬ সালে লুই অফ স্যাভয় এখানে এক দুর্গ তৈরি করেন। মরজেস সেই সময় থেকে আবার খুব গুরুত্বপূর্ণ শহরে পরিণত হয়।

মরিস নিজেও গ্লোবাল ওয়ার্মিং কমানোর জন্য সব কিছু মেনে চলেন সেটা ওঁর ব্যবহারেই বোঝা যায়। আগের দিনই বলেছিলেন যে নেহাৎ বাধ্য না হলে উনি এখন গাড়ি ব্যবহার করেন না। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বেশিরভাগ কাজ সারেন, গাড়ি, প্লেন সবেতেই কার্বন এমিশন বাড়বে।

এই হোটেলটাও কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমানোর জন্য যা যা করা সম্ভব, সব কিছুই করে। এমনকী খাবারের ক্ষেত্রেও এরা স্থানীয় কৃষকদের উৎপাদন করা জিনিস ব্যবহার করে।

খোলা বাগানে একসঙ্গে ডিনার করতে বসে স্যার মরিস বললেন, তুমি তো খুব বিখ্যাত মহিলা অনিলিখা? আমার কীরকম অজ্ঞতা দেখো, শুধু প্রকৃতি নিয়ে মেতে থাকি। পরশু ট্রেনে তুমি হঠাৎ যখন চারদিকের অশান্তি ও যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্নটা করলে, আমি একটু ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, তুমি কারোর স্পাই, বা গুপ্তচর কিনা। এটা তো সারাধারণ কারো খেয়াল করার কথা নয়!

তারপর আমার সেক্রেটারি মারিয়ার কাছে তোমার সম্বন্ধে সব তথ্য পাওয়ার পর আমি নিশ্চিন্ত হই। তুমি ঠিকই বলেছ। অনেক কিছুই ঘটছে। আমি নিশ্চিত, এগুলো ঘটানো হচ্ছে। কে বা কারা এর পিছনে আছে তা আন্দাজ করতে পারলেও কীভাবে করছে তা বুঝতে পারিনি। আমার ধারণা এর পিছনে খুব বড় কোনও বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞানীদের টিম কাজ করছে। এই যে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে জঙ্গিরা নিষিদ্ধ কেমিক্যাল ওয়েপন ব্যবহার করছে বলে শোনা যাচ্ছে, সেটা ওদের হাতে পৌঁছচ্ছে কী করে! এই যে সোমালিতে

প্রেসিডেন্টের প্যালেসে হঠাৎ করে ঈগলের আক্রমণ বা অস্ট্রেলিয়ায় বাচ্চাদের স্কুলে ক্যাশুয়ারির আক্রমন— এই ঘটনাগুলোর কোনও ব্যাখ্যা আছে কি? আমি খবর পেয়েছি 'ব্রেনবো' বলে একটা সংস্থা যুক্ত আছে এদের সঙ্গে।

ব্রেনবো— নেদারল্যান্ডসের সংস্থা, তাই তো?

হ্যাঁ। পারলে একটু খোঁজ নিয়ে দেখো। এসবের পিছনে আছে তিন মাথা। তবে তারা আমাদের সবার ধরাছোঁয়ার বাইরে। তাদের বিরুদ্ধে সরাসরি কোনও কিছু প্রমাণ পাওয়াও যাবে না।

জেনিভার লেকেই এখন অব্দি এসে পৌঁছেছে। গ্লেসিয়ার সরে গিয়ে এসব লেক তৈরি হয়েছে। ডিনারের পর হোটেল লাগোয়া লেকের ধারে হাঁটতে হাঁটতে মরিস বললেন, এদের লবি ইচ্ছে করে পরমাণুযুদ্ধ সংক্রান্ত উত্তেজনাও বাড়াচ্ছে। ফের যদি সবাই পরমাণু অস্ত্র প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে, গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর কথা আর কে ভাববে!

এই লবিতে কারা আছে?

স্যার মরিস এবারে কোনও উত্তর দিলেন না।

পড়ন্ত সূর্যের আলোয় লেকটা যেন আরও মোহময় হয়ে উঠছিল। সীগালের দল হাওয়ার নেশায় মাতালের মতো উড়ে বেড়াচ্ছিল।

মিনিট পাঁচেক বাদে স্যার মরিস আবার শুরু করলেন, কারোর নাম সামনে আনার আগে এসব ঘটনার পিছনের রহস্য বুঝতে হবে। সেটা সামনে আনলেই এরা এক্সপোসড হয়ে যাবে। ডক্টর গিল হারভের নাম শুনেছ? খুব নামী কিন্তু কুখ্যাত বিজ্ঞানী। এসব ঘটনার সঙ্গে ওঁর কিছু একটা যোগাযোগ থাকতে পারে।

চমকে উঠল অনিলিখা। এই ডক্টর গিল হারভের সঙ্গে অনিলিখার দুবার বিশেষ কারণে গভীরভাবে পরিচয় হয়েছে। দুবারই একদম শেষ মুহূর্তে গিল হারভে রক্ষা পেলেও ওনার সমস্ত ষড়যন্ত্র অনিলিখা সামনে এনে একটা বড় সংখ্যক মানুষকে বাঁচিয়েছে।

অনিলিখা বলল, হ্যাঁ, আমি চিনি, কিন্তু আপনি কী করে জানলেন যে ডক্টর গিল হারভের সঙ্গে এসব ঘটনার যোগাযোগ আছে?

আমি শুনেছি, ডক্টর গিল হারভে ও তার কোম্পানি এদের সঙ্গে কাজ করে। সেখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এঁরা অনেক কিছু করার চেষ্টা করছে। বলে একটু থেমে ফোনটা এগিয়ে দিলেন অনিলিখার কাছে।

এই দুটো কোম্পানির উপরে আমার সন্দেহ আছে।

অনিলিখা স্ক্রিনে দেখল দুটো নাম—একটার কথা আগেই শুনেছে, ব্রেনবো, অন্যটা সুইজারল্যান্ডের ব্যাসেলে অবস্থিত একটা বিখ্যাত ফারমা ও ড্রাগ কোম্পানি। নাম মেডলা।

এই মেডলাই আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে কোভিডের ভ্যাকসিন তৈরি করার ব্যবস্থা করেছে, তাই না? শুনেছি সমুদ্রে ভাসমান জাহাজে কোভিডের ভ্যাকসিন তৈরি করছে যাতে খুব কম খরচে ওই ভ্যাকসিন মডিউলার ভাবে তৈরি করে আফ্রিকার মানুষকে দেওয়া যায়। এ বিষয়ে ওরা ইউ এন-এর গ্লোবাল ফান্ডের সঙ্গেও তো কাজ করছে!

হ্যাঁ, কিন্তু শুধু ড্রাগ নয়, আমার কাছে খবর আছে এরা কেমিক্যাল ওয়েপনও তৈরি করছে একই ফেসিলিটি ব্যবহার করে।

ও মাই গড! ভেবে দেখলে এটা তো ওদের পক্ষেই করা সহজ। আর এভাবে জঙ্গিদের হাতে পৌঁছে দেওয়াও সহজ।

আর ইউ এন-এর গ্লোবাল ফান্ড ছাড়াও ওদের এই বিষয়ে অনেক অর্থ সাহায্য করছে একটা খুব বড় গাড়ির কোম্পানি ভক্সজেন। বুঝতেই পারছ কী হতে চলেছে! তুমি অবশ্যই ওদের অফিসে যেও। আমার এক চেনা লোক আছে ওখানে, সে তোমাকে খুলে বলবে। আমি পরে তোমাকে তার কথা জানাবো।

হাতঘড়ির দিকে নজর পড়ল অনিলিখার। বাইরে যথেষ্ট আলো থাকলেও সাড়ে ন'টা বাজে। এবারে ফিরতে হবে।

স্যার মরিসকে বিদায় জানানোর সময় মরিস অনিলিখার হাত দুটো সস্নেহে জড়িয়ে ধরে বললেন, আমার অনেক বয়স হয়ে গেছে। আমার পক্ষে আর কিছুই করা সম্ভব নয়। কিন্তু তোমার সম্বন্ধে যতটুকু জেনেছি, আমার ধারণা তুমি পারবে। এই বিশ্বকে বাঁচাতেই হবে। আমরা কিছু অত্যন্ত ক্ষমতাশালী খারাপ মানুষের হাতে খেলার পুতুল হয়ে উঠছি। এদের পিছনে যারা আছে, তাদের কখনই সহজভাবে আইনের সামনে আনা যাবে না। অন্যভাবে কিছু করতে হবে। সে দায়িত্ব পারলে তুমি নিও।

অনিলিখা মরিসকে হোটেলের কাছাকাছি একটা জায়গা অব্দি এগিয়ে দিয়ে স্টেশনের পথ ধরল। রাস্তা এখন ফাঁকা হয়ে এসেছে। সমুদ্রের ধার ছেড়ে পুরনো শহরের পাথরের সরু সরু অলিগলি ধরে এগোনোর সময় লক্ষ করল দোকান, পাব, রেস্টুরেন্ট সবই বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তার ষড়ভুজ ল্যাম্পের হলুদ আলোয় পুরোনো শহরের পাথরের রাস্তা যেন আরও রহস্যময় হয়ে উঠেছে। হাওয়ায় মিষ্টি ফুলের গন্ধ ভাসছে।

হঠাৎ মনে হল পাশের একটা গলি দিয়ে একটা মুখে মাস্ক পরা কালো বিশাল চেহারার লোক বেরিয়ে এল। অনিলিখা কিছু বোঝার আগেই ওর মুখের উপরে লোকটা রুমাল চেপে ধরল। অনিলিখা একটা উগ্র গন্ধ পেল। অবশ হয়ে এল ওর পুরো শরীর।

১৭ আগস্ট, রাত বারোটা, মরজেস, সুইজারল্যান্ড

শরীর খারাপ লাগছে? ফ্রেঞ্চ ভাষায় কোনও এক পুরুষকণ্ঠ বলে উঠল।

প্রথমে মনে হল কে যেন বহুদূর থেকে ডাকছে। আস্তে আস্তে হুঁশ ফিরে পেতে দেখল পাশে উবু হয়ে বসে আছেন এক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা। আর অনিলিখা রাস্তায় শুয়ে আছে।

ক'টা বাজে? কোনোমতে জিগ্যেস করল অনিলিখা।

রাত বারোটা। এত রাতে এখানে তোমাকে পড়ে থাকতে দেখে আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসি। আমার স্ত্রী মারিয়া পাঁচ মিনিট আগে তোমাকে দেখে বাড়ির জানলা দিয়ে।

এটা কোথায়?

মরজেস।

এবারে অনিলিখার সব কিছু খেয়াল হয়।

বৃদ্ধা বললেন, মনে হয় মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলে! ডাক্তার দেখিয়ে নিও। আজকাল কমবয়েসিদেরও কত কিছু হয়। কোনওরকম চোট পাওনি তো?

রাস্তার এক কোণে পড়ে ছিল অনিলিখা। উঠে দাঁড়াল ধীরে ধীরে। আশ্চর্যভাবে গায়ে সেরকম কোনও ব্যথা টের পেল না সে।

বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে ধন্যবাদ জানিয়ে স্টেশনের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

কে ছিল লোকটা? কেন হঠাৎ করে এরকম করল। কিছু চুরিও তো করে নি। তাহলে? ঠিক কী হয়েছিল! মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ও স্টেশনে পৌঁছে যায়। রাত এখন বারোটা বেজে দশ। ঘড়িতে দেখাচ্ছে জেনিভার ট্রেন বারোটা কুড়িতে।

২০ আগস্ট, বাজিল, সুইজারল্যান্ড

দু-দিন আগে অনিলিখা জেনিভা থেকে জুরিখে ফেরত এসেছে। জুরিখে একটা দরকারি মিটিং ছিল অনিলিখার।

১৭ তারিখে অজ্ঞান হওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে ধন্ধে থাকলেও সে বিষয়ে কিছু খোঁজ নেওয়ার সময় পায়নি। প্রথমত বিদেশ বিঁভুই। ভাষার সমস্যাও আছে। জার্মান বা ফ্রেঞ্চ ভালো করে না জানলে, বোঝানো মুস্কিল। তাছাড়া পুলিশকে জানাতে হলে আবার মরজেসে যেতে হবে। সে আবার দু-ঘন্টার জার্নি। তাছাড়া কিছু খোয়া যায়নি, শরীরে কোনও আঘাত লাগেনি, এসব বললে কেউ আসল ঘটনাটা বিশ্বাস না করে ভাববে অন্য কোনও কারণে হয়তো অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। এখানে মাত্র কয়েকদিনের জন্য নানান কাজ নিয়ে আসা। তার মধ্যে এসবের জন্য সময় পাওয়া খুব শক্ত।

তার থেকে বাজিলে যাওয়া দরকার। যদি মেডলা সংস্থার সম্বন্ধে কোনও খোঁজ পাওয়া যায়।

১৯ তারিখ একটা ডিনার মিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন অন্য এক ফারমা কোম্পানির উচ্চপদস্থ অফিসার। মেডলার এক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্টকে উনি ভালো করে চেনেন। তার সূত্রেই পরের দিন মিটিং ঠিক হল।

সকাল দশটায় মিটিং ছিল। সাড়ে ন'টা নাগাদ বাজিল পৌঁছে গেল

অনিলিখা। স্টেশন থেকে মেডলার অফিস হাঁটা পথ। ভারি সুন্দর শহর। দূরে বরফ ঢাকা আল্পস দেখা যাচ্ছে। এখানে সারা বিশ্বের অনেক নামী ফার্মা কোম্পানির অফিস আছে, যাদের মধ্যে 'রশ মেডিক্যালস', 'নোভোনরডিস্ক' ও আছে। মেডলার অফিসের আর্কিটেকচারটা খুব সুন্দর, পুরো কাচের বিল্ডিংটা অনেকটা ইংরেজি 'এ' লেটারের মতো দেখতে।

রিসেপশনিস্টের সঙ্গে দেখা করতেই মহিলা বললেন, মিঃ ক্রিস মুলার দেখা করতে পারবেন না। হঠাৎ বিশেষ একটা দরকারে ওনাকে বেরোতে হয়েছে।

অবাক হল অনিলিখা। অনিলিখার নাম্বার ছিল ওনার কাছে। জানাতে পারতেন। তাহলে কি উনি কিছু আন্দাজ করেছেন! আর তাই মিটিংটা অ্যাভয়েড করলেন?

অনিলিখা ধন্যবাদ জানিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে আবার ট্রেন স্টেশনের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

মিনিট পাঁচেক যেতে না যেতে হঠাৎ যেন ওর মনে হল পিছন পিছন কেউ একজন আসছে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল একজন ছোটখাটো চেহারার লোক ওর দিকে এগিয়ে আসছে।

লোকটা অনিলিখার কাছে এসে ইংরেজিতে বলল; চলুন, যেতে যেতে কথা বলি। আমি মেডলাতে কাজ করি। এক বছর আগে ঢুকেছি। আমি সব জানি। আপনার পরিচয়ও। জানতাম ক্রিস আপনার সঙ্গে দেখা করবেন না। সব কিছু না জেনে এখানে কেউ কারোর সঙ্গে দেখা করে না এখন। স্যার মরিস আমার খুব পরিচিত। স্যার মরিসকে কিছু জিনিস জানানোর ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে চলে যাওয়ায় আমি ওনাকে পুরোটা বলতে পারি নি। দুদিন আগেই পুরো খবরটা পেয়েছি। স্যার মরিস বলেছিলেন ওনার কিছু হলে আপনাকে জানাতে।

স্যার মরিসের চলে যাওয়া! ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না। অনিলিখার ভ্রুদুটো কুঁচকে উঠল।

সে কি, খবরটা পাননি? উনি মারা গেছেন ১৭ তারিখ রাতে, দুদিন আগে। আমিও কালকের আগে জানতাম না। সেই দিনই উনি আমাকে ফোন করে বলেছিলেন যে আপনি এখানে এলে আপনাকে এখানকার ব্যাপারে সমস্ত খবরাখবর জানাতে। আমার ধারণা উনি বুঝতে পারছিলেন যে ওনার মৃত্যু আসন্ন।

অনিলিখা থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তার মানে সেই রাতেই অনিলিখার সঙ্গে দেখা হওয়ার পরে উনি মারা গেছেন! কীভাবে!

কীভাবে মারা গেলেন উনি?

সেটা নিয়ে তদন্ত হচ্ছে, তবে স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। কোনওভাবে পয়জন দেওয়া হয়েছিল।

আশ্চর্য! তা আপনি কী বলবেন বলছিলেন এই কোম্পানির ব্যাপারে।

মেডলার কর্মকাণ্ডের কথা জানেন তো?

হ্যাঁ, কোভিডের ভ্যাকসিন ও আগামীদিনে এরকম কোনও সংক্রমণের ভ্যাকসিন ইউরোপ বা আমেরিকা বা ভারত থেকে না এনে যাতে আফ্রিকার কাছে কোথাও কম খরচে বানানো যেতে পারে, তার জন্য বেশ কিছু মডিউলার কনটেনার তৈরি করেছে। ওই কন্টেনারগুলোর সাহায্যে ও প্রশিক্ষিত অপারেটরদের সাহায্যে যাতে জাহাজের মধ্যেই এসব ড্রাগ তৈরি করা যায়।

কিন্তু এটা কী জানেন যে একইভাবে কেমিক্যাল ওয়েপন তৈরি করা যায় ওই সব কন্টেনারে। শুধু কিছু উপকরণ ও কন্টেনারগুলোর কন্ট্রোল সেটিং বদলে দিয়ে। সেটাই করছে মেডেলা। সেই প্রমাণ আমি এই সপ্তাহে পেয়েছি।

সেটা কীভাবে সম্ভব?

এখন এখানে এসব নতুন ড্রাগ প্রস্তুতিতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়। এখানকার স্পিংজ ল্যাবেও দেখবেন কীভাবে সেটা করা হয়। এসব সফটওয়্যার ব্যবহার করে কিছু ভারচুয়াল মলিকিউল তৈরি করা হয় ভ্যাকসিন তৈরির প্রসেসে। এই সব ভারচুয়াল মলিকিউলের সামান্য পরিবর্তনে ভ্যাক্সিনের জায়গায় কেমিক্যাল ওয়েপন বানানো যায়। এর মধ্যে VX-এর মতো অতি শক্তিশালী নার্ভ এজেন্টও আছে। ওরা সেটাই করছে।

কী সাংঘাতিক! সেজন্য এত লোক মারা যাচ্ছে আফ্রিকার সোমালিয়া, উগান্ডা, ইথিওপিয়া ও আরও নানান দেশে!

শুধু আফ্রিকা নয়, জাহাজের মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় এরকম ফেসিলিটি তৈরি করা হয়েছে। ড্রাগের সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়বে নিষিদ্ধ কেমিক্যাল ওয়েপন। এমন এমন নতুন ধরনের কেমিক্যাল ওয়েপন তৈরি করা হচ্ছে যা চট করে ধরাও পড়বে না। ওখানে এমন সফটওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে যা প্রতি ছয় ঘণ্টায় নতুন ভারচুয়াল মলিকিউলের সন্ধান দেবে। কিন্তু এর বেশি আমি কিছু বলতে পারব না। এটুকু বললাম কারণ প্রফেসার আর নেই।

বলে লোকটা করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, আপনিই এখন আমাদের ভরসা।

লোকটা যেরকম হঠাৎ করে এসেছিল ঠিক সেরকমই হঠাৎ করে আবার ডান দিকে একটা গলি ধরে নিল।

অনিলিখা এগিয়ে গেল ব্যাসেল স্টেশনের দিকে। ওর মুঠোয় একটা ছোট্ট বোতামের মতো পেনড্রাইভ, যা ওই লোকটা করমর্দনের সময় দিয়ে গেছে। এর মধ্যেই নিশ্চয়ই সব প্রমাণ আছে।

২৩ আগস্ট ইউট্রেকট, নেদারল্যান্ডস

স্যার মরিসের মৃত্যুর খবরটা পাওয়ার পরে অনিলিখা বুঝেছিল ওর হাতে সময় কম। নিশ্চয়ই ওনার মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়। হয়তো সেই একই কারণে ওর নিজের উপরেও আক্রমণ হয়েছিল।

একইসঙ্গে অনিলিখা বেশ কিছু রিসার্চ করে বুঝতে পারছিল এসবের পিছনে কারা আছে। তারা কী করতে চায়। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণ না পেলে এদের মতো শক্তিশালী ধনকুবেরদের বিরুদ্ধে কিছুই করা সম্ভব নয়।

পেনড্রাইভের সব তথ্য অবশ্য যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়েছে অনিলিখা, যার জন্য ইতিমধ্যেই মেডলার কর্মকাণ্ডের উপরে নজরদারি শুরু হয়ে গেছে।

এদের দলে আছে খুব সম্ভবত বিজ্ঞানী গিল হারভে। এরকম প্রতিভাবান এক বিজ্ঞানী যে কী কী করতে পারেন তা সবই জানা আছে অনিলিখার। সব স্বীকৃত বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানকে ঘৃণা করেন বিজ্ঞানী গিল। বিজ্ঞানকে যে শুধু মানবকল্যাণে ব্যবহার করা উচিত, এটা উনি বিশ্বাস করেন না।

জুরিখ থেকে দু-ঘণ্টার ফ্লাইট আমস্টারডাম। আমস্টারডামের পাশের শহর ইউট্রেকট। নেদারল্যান্ডসের চতুর্থ বড় শহর ইউট্রেকট। ইউট্রেকট বহু শতক ধরে নেদারল্যান্ডসের ধর্মীয় রাজধানী ছিল। এখানেই 'ব্রেনবো'র অফিস। খুঁজে পেতে একটু সময় লাগল। অফিসটা শহরের বাইরের দিকে। ক্যাব থেকে নেমে কিছুটা হাঁটার পর কমলা রঙের বিল্ডিংটা দেখা গেল। বেশ বড় জায়গা জুড়ে অফিস। বিশাল গেট। কিন্তু তার বাইরে তালা ঝুলছে। কোনও কারণে অফিস কী বন্ধ?

দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল অনিলিখা। এত দূরে আসা যার জন্য, সেই উদ্দেশ্য কি শেষে ব্যর্থ হয়ে যাবে?

ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকা। বিভিন্ন ফ্যাক্টরি-অফিস বিল্ডিং অনেকটা দূরে দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

হঠাৎ লক্ষ করল খুব লম্বা, রোগামতো একটা লোক ভ্যান থামিয়ে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। দু-হাতে বাঘের উল্কি করা।

লোকটা ডাচ ও ইংরেজি মিশিয়ে বলল, আপনি কি কাউকে খুঁজছেন এখানে? ব্রেনবোর এখানকার অফিস তো অনেকদিন বন্ধ হয়ে গেছে।

আপনি কি এই অফিসের?

না, না। তবে আমার কাজ ছিল এখানে থেকে জীবজন্তুদের বন্দরে নিয়ে যাওয়া। সেজন্য আসতাম। তবে এখন তো বন্ধ হয়ে গেছে।

কী ধরনের জীবজন্তু নিয়ে যেতেন?

লোকটা তার উত্তর না দিয়ে উল্টে জিগ্যেস করল, আপনি কি এখানে কারোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?

হ্যাঁ, ডক্টর গিল হারভের সঙ্গে। হঠাৎ করে ওই নামটাই করল অনিলিখা।

আচ্ছা, স্যার গিলের সঙ্গে। কিন্তু ওরা সবাই তো যদ্দুর জানি চারনোবিলে চলে গেছেন। এখানকার ফ্যাক্টরি অফিস সব কিছু বন্ধ করে।

সে কী! কবে?

তা প্রায় দু-মাস হয়ে গেল। আমারও অনেক ক্ষতি হয়ে গেল। আগে নিয়মিত একটা রোজগার ছিল। নানান দেশের সার্কাসে, চিড়িয়াখানায় এরা জন্তু পাঠাত। ভালোই টাকা দিত ওরা আমাকে।

কিন্তু এটা তো ওষুধের কোম্পানি, তাই না?

আমি অতো জানি না। তবে ঠিক বলেছেন মনে হয়। ওসব জীবজন্তুদের ওষুধ দিয়ে আরো তাগড়াই করে পাঠাত।

তা এখানকার সবাই কী এখন চারনোবিলে?

হ্যাঁ, প্রায় সবাই চলে গেছে। শুধু একজন বৃদ্ধ প্রফেসার ছিলেন। বেশ ভালো বয়স। উনি মিঃ গিলের সঙ্গে কাজ করতেন। উনি যাননি। তবে ওঁর শরীর বেশ খারাপ। সেই কারণেই হয়তো যাননি।

এখন উনি কোথায় আছেন?

এখানকার হাসপাতালে। এখানে একটা বড় হাসপাতাল আছে।

কী নাম ওনার?

জশুয়া শেন্স।

অনিলিখার খেয়াল হল এই নামটাই সে শুনেছিল মিঃ পাইয়ের কাছে। যিনি আমেরিকা এসে প্রথম এই কোম্পানির প্রতিষ্ঠা করলেন, তিনিই পড়ে রইলেন এখানে!

ধন্যবাদ জানিয়ে অনিলিখা এগিয়ে চলল সেই হাসপাতালের খোঁজে।

তবে দেখা পেতে বেশ সময় লাগল। মিঃ জশুয়া শেন্স বিশেষ অসুস্থ। ক্যান্সারের শেষ পর্যায়। ঘণ্টা পাঁচেক অপেক্ষার পরে দেখার সুযোগ হল।

অনিলিখা মিঃ পাইয়ের পরিচয় দিয়ে শুরু করল। ভেবেছিল বৃদ্ধ কিছুই বলবেন না। কিন্তু মিঃ পাই ও অনিলিখার কথা উনি আগে শুনেছেন। অপ্রত্যাশিতভাবে জশুয়া শেন্স বলতে শুরু করলেন।

আমি আর মৃত্যুর ভয় পাই না। সে তো আজ নয়ত কাল আসবেই। তাই সব জানিয়ে যেতে চাই তোমাকে। আসলে আমি চেয়েছিলাম মানুষের বিভিন্ন ব্রেন রিলেটেড অর্থাৎ মানসিক অসুস্থতার কারণ খুঁজে বার করতে। যাতে তার সঠিক চিকিৎসা বার করা যায়। এটা সারা বিশ্বের কাছেই একটা বিশাল সমস্যা। অনেক মানুষ ব্রেনের নানান অসুখে ভোগে, বলা যায় তাদের অনেকের ক্ষেত্রে মৃত্যুর অনেক আগেই মৃত্যু হয়। আমার বাবারও সেরকম মৃত্যু হয়েছিল। এর চিকিৎসার জন্য আমার অ্যাপ্রোচ একটু আনকনভেনশনাল ছিল।

প্রথমে মানুষের ব্রেনসেল ও ইঁদুরের ব্রেনসেলের মিশ্রণ দিয়ে শুরু করলাম। দেখলাম ইঁদুরের মধ্যে বেশ কিছু মানুষের মতো স্বভাব দেখা যাচ্ছে। পরের ধাপে আমি মানুষের নিউরাল স্টেমসেল লেমুরের এম্ব্রোয়নিক ব্রেন সেলে মিশিয়ে আরও সাফল্য পাই। বেশ কিছু প্রাণীতে অস্বাভাবিক রকম কিছু মনুষ্য সুলভ ব্যবহার দেখতে পাই, যেটা নিয়ে তখন বিজ্ঞানীমহলে হইচই শুরু হয়ে যায়।

হিউমান নিউরাল ট্রান্সপ্ল্যান্ট আগেও হয়েছে। তবে মানুষের ব্রেনসেলের সঙ্গে অন্য প্রাণীর ব্রেনসেল সঠিকভাবে মেশানোর টেকনিক আমারই আবিষ্কার। বলা যায়, ফল হল এনিমাল উইথ হিউমান ব্রেন সেল।

কিন্তু এর পরের ধাপে আমার উদ্দেশ্য ছিল 'কাইমেরা' তৈরি করা—যেখানে সেই প্রাণীর ব্রেনসেলের সঙ্গে মানুষের ব্রেনসেল মিশে থাকবে ও সেই প্রাণী এভাবে তার নিজস্ব চেতনা-সত্তা খুঁজে পাবে। মানুষের থেকেও উন্নত মস্তিষ্ক ও বুদ্ধি থাকবে সে প্রাণীর।

এরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এমন কিছু প্রাণী তৈরি করি যা এমন বিশেষ কিছু ইন্টেলিজেন্সের অধিকারী যা কোনও মানুষেরও নেই। যেমন ধরো, এক ধরনের ঈগল যারা খুব সহজে অন্যদের তার দলে টেনে নিতে পারে। সবাইকে এক লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তাদের উপর খুব সহজে প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

মিঃ গিল আমাকে এখানে টেনে আনেন। আমার আবিষ্কৃত 'ব্রেনবো মাইস'-এর নামেই এই সংস্থার নাম। ইচ্ছে ছিল সবরকম কন্ট্রোলের বাইরে গিয়ে কিছু করার। সেজন্য এখানে আসা। তবে আমার কোনও খারাপ উদ্দেশ্য ছিল না।

বিভিন্ন টেকনিক্যাল বিধি-নিষেধের জন্য আমেরিকাতে এসব নিয়ে রিসার্চ করা সম্ভব ছিল না। এখানে এসে আমার সুবিধেই হল।
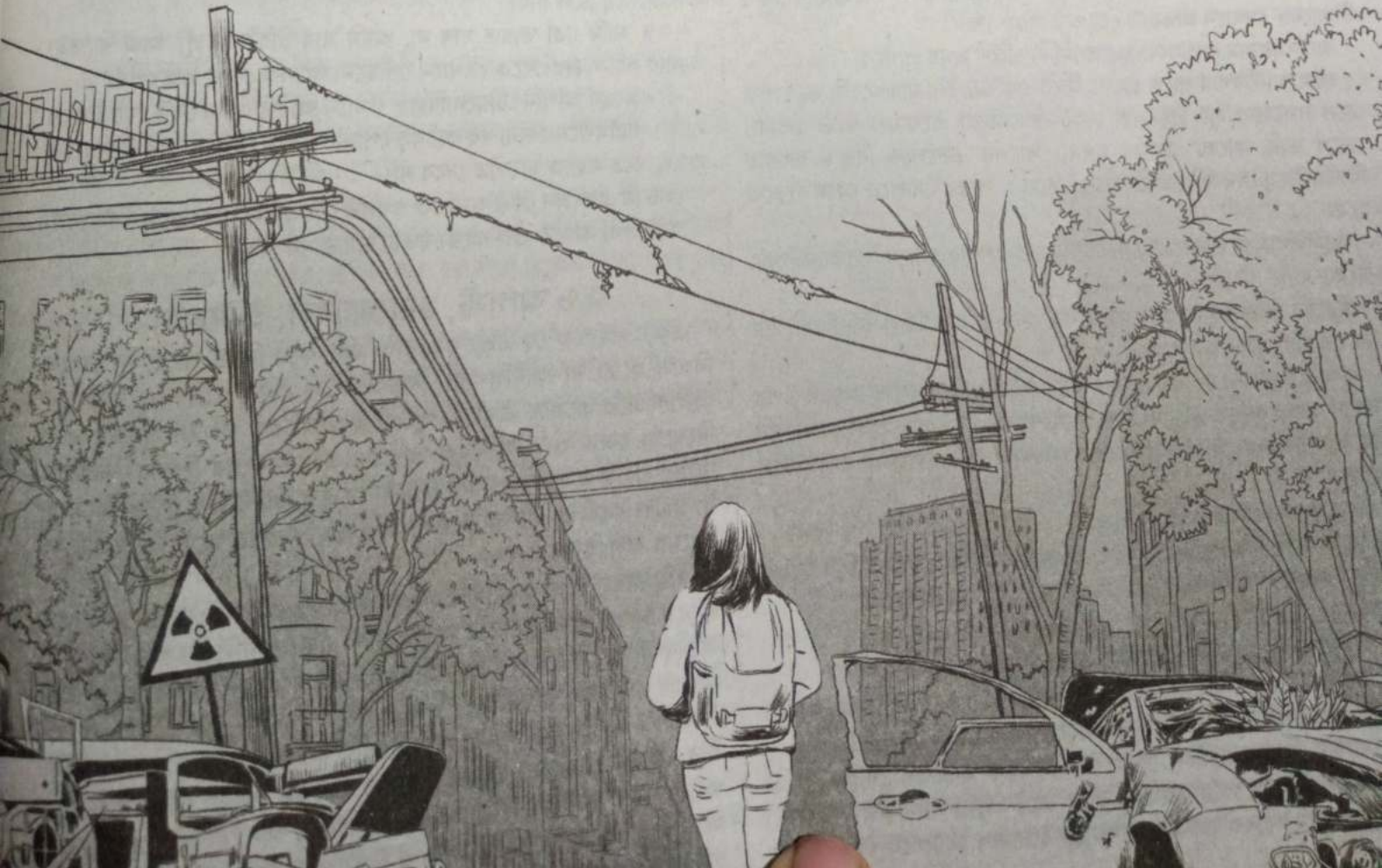
যখন যা চাই, তাই পেয়ে যাচ্ছিলাম, যা আগে কখন পাইনি। অর্থের কোনও অভাব ছিল না।

কিন্তু আপনি কী জানতেন যে এখানকার উদ্দেশ্য খুব ভালো কিছু ছিল না। প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন দেশের মধ্যে যুদ্ধ বা গৃহযুদ্ধ শুরু করানোর। আমার ধারণা এখান থেকে আপনারা ক্যাশুয়ারি, বাঘ, ঈগল, গরিলা, এরকম আরও নানান জীবজন্তু বিভিন্ন দেশে পাঠান সেই উদ্দেশ্যেই।

মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওনার। ভাঙা গলায় বলে উঠলেন, তুমি তাহলে অনেক কিছুই জেনে গেছ। কী করে আন্দাজ করলে জানি না। তবে অনুমান ভুল না। আমি নিজেও অনেক পরে সে উদ্দেশ্য জেনেছি। পরে জানতে পারলাম আমার তৈরি করা প্রাণীগুলো একটা একটা করে হারিয়ে যাচ্ছে। যখন বুঝলাম আমাকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে ওই সব প্রাণী দিয়ে মিঃ গিল সারা বিশ্বে নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করছে, তখন বাধা দিলাম।

গিল তখনই প্রতিশোধ নিল। আমার রক্তে বিষ ছড়িয়ে দিল। ওরা এত শক্তিশালী যে আমার কিছুই করার ছিল না। আমি ফিনিশড অনিলিখা! কী ভেবেছিলাম আর কী হল!

কিন্তু আমি জানি ওরা কী করতে চলেছে। ওরা জানে চারনোবিলে গেলে সব ধরনের নজরদারি এড়ানো যাবে। সেখানে কেউ ওদের ধরতে পারবে না। আমার ধারণা গিল এমন কিছু এক্সপেরিমেন্ট করতে চায় যা শুধু চারনোবিলের মতো হাই-রেডিয়েশন পরিবেশেই করা সম্ভব, কারণ সেখানে জেনেটিক মিউটেশন খুব তাড়াতাড়ি হয়। কিন্তু ঠিক কী করতে চায় ওরা ওখানে গিয়ে?

সেটা তো তোমাকে ওখানে গিয়েই দেখতে হবে। আমি তোমার নাম অনেক শুনেছি অনিলিখা। যদি কেউ পারে, সে হল তুমি। তুমি পারলে চলে যাও। তবে তুমি আমার কাছে পৌঁছালে কী করে? ওরা নির্ঘাত আমার উপরে সব সময় নজর রেখেছে। সাবধানে থেকো।

সকাল থেকে এসব নিয়ে ছোটাছুটি করতে গিয়ে কিছুই খাওয়া হয়নি। এখন সন্ধে আটটা। তবে বাইরে ভালোই আলো আছে। খানিকটা পথ হেঁটে আমস্টারডাম সেন্ট্রাল যাওয়ার ট্রেন ধরল অনিলিখা।

এখনও অনেক কাজ বাকি। সবার আগে চারনোবিল যেতে হবে। কিন্তু কীভাবে? সেখানে যাওয়াটা তো অত সহজ নয়।

আমস্টারডাম সেন্ট্রাল পৌঁছতে মিনিট চল্লিশ সময় লাগবে।

হঠাৎ অনিলিখার পাশে ট্রেনের সিটে এক ভারতীয় মাঝবয়েসি ভদ্রলোক এসে বসলেন। সুট-টাই পরা একটু গোবেচারা প্রফেসারসুলভ চেহারা। চোখে ভারী কালো ফ্রেমের চশমা। পাশের ভদ্রলোক বিশুদ্ধ বাংলায় ফিসফিসিয়ে যেন স্বগতোক্তি করে উঠলেন, পরের স্টেশনে নেমে পড়তে হবে।

অনিলিখা ঘুরে তাকাতেই লোকটা নিজের ফোনটা এগিয়ে দিল অনিলিখার দিকে।

খবরের হেডলাইনটা ও সঙ্গের ছবিটা দেখে চমকে উঠল অনিলিখা। ওর নিজের ছবি। আজকের কাগজ।

খবরটা জার্মানে। ফোনটা ফেরত নিয়ে লোকটা ফের বলল, আমার উপর সম্পূর্ণ ভরসা করতে পারেন। পরের স্টেশনেই নেমে পড়তে হবে। আপনি যে আমস্টারডাম সেন্ট্রালে ফিরবেন সে খবর ইন্টারপোলের কাছে চলে গেছে।

কিন্তু আমার ছবিটা কাগজে কীজন্য?

সি সি টিভির ক্যামেরার ছবিতে আপনাকে স্যার মরিসকে বিষ ইঞ্জেক্ট করতে দেখা গেছে!

মানে? অসম্ভব!

ইতিমধ্যে পরের স্টেশন বিলমার এসে পড়েছে।

লোকটার সঙ্গে অনিলিখা বেরিয়ে এল। গেটের দিকে না গিয়ে কিছুটা হেঁটে রেল লাইন পেরিয়ে স্টেশন চত্বরের বাইরে বেরিয়ে এল লোকটা।

লোকটা নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, আমি ভারতের 'র'তে আছি। আইএএস ছিলাম, পরে এই সারভিসে জয়েন করি। নাম রজত মুখার্জী। আপনার নাম অনেক শুনেছি। আপনাকে ইউরোপ থেকে যে-কোন ওভাবে বার করে ভারতে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে। স্যার মরিসের মৃত্যু খুব হাই প্রোফাইল কেস। আপনি তার মেন সাসপেক্ট।

কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। কীভাবে ওরা প্রমাণ করবে যে আমি স্যার মরিসকে বিষ ইঞ্জেক্ট করেছি, যখন এরকম কোনও ছবি বাস্তবে থাকতেই পারে না!

জানি ফেক, কিন্তু আসলের থেকেও বেশি বিশ্বাসযোগ্য। এই ছবিটা দেখুন। রজত ফোন থেকে একটা ছবি বার করে দেখাল।

অবিকল অনিলিখার মুখ, পোশাক, মুখের এক্সপ্রেশন। স্যার মরিস যেন ঘুমোচ্ছেন একটা বেঞ্চিতে বসে বসে। অনিলিখা ওনার হাতে কিছু একটা ইঞ্জেক্ট করছে।

এ আমার ছবি হতেই পারে না!

জানি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে ঠিক আপনার ছবি শুধু না, আপনার কিছু ভিডিও তৈরি করা হয়েছে, যা আপনি নিজে দেখলেও অস্বীকার করতে পারবেন না। আপনার পোশাক, আপনার মুখের ভাব, হাঁটার প্যাটার্ন—সব কিছু নিখুঁত। তাছাড়া আপনি তো ওই দিন ওনার সঙ্গে ছিলেন বেশ কিছুক্ষণ। অনেকেই আপনাকে স্যার মরিসের সঙ্গে দেখেছে ঘটনার এক ঘণ্টা আগেও।

এতক্ষণে বুঝতে পারছি আমাকে কেন অজ্ঞান করা হয়েছিল। যাতে ওই সময় আমি অন্য কোথাও ছিলাম এরকম কিছু প্রমাণ না দিতে পারি, কোনও অ্যালিবাই না থাকে। কত বড় ষড়যন্ত্র!

শুধু এটাই নয়, আপনাকে আরও বেশ কিছু কারণে ইন্টারপোল খুঁজছে। বাজিলে একজনকে আপনার সঙ্গে দেখা গিয়েছিল। লোকটা ইংল্যান্ডের এম আই সিক্সের। হি ইজ অলসো ডেড। এছাড়া আরও আছে। সবই মিথ্যে সাজানো মামলা। সেজন্যই আমরা এগিয়ে এসেছি। কারণ এখানে একবার ধরা পড়লে আমরা আর কিছু করতে পারব না। বড় কিছু ভারতবিরোধী শক্তিও চায় আপনাকে ধরা হোক। খুব শক্তিশালী কিছু লবি এর পিছনে আছে। ওরা হয়তো আপনাকে মেরেই ফেলবে। আমাদের বিশেষ হেলিকপ্টারে আজ রাতেই আমরা আপনাকে এখান থেকে রাশিয়া হয়ে ভারত নিয়ে চলে যাব।

কিন্তু আমি তো ভারত যাব না, আমি যাব চারনোবিল। আজ রাতেই। আমার ধরা পড়ার থেকে সেখানে পৌঁছনো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

কী বলছেন আপনি! চারনোবিল? ওখানে আবার এখন কেউ যেতে পারে নাকি! পারমিশনের জন্য বহু কাঠখড় পোড়াতে হবে। ইউক্রেনের চেকপয়েন্ট আছে, অত সহজে ছাড়পত্র দেবে না।

লেট মি এক্সপ্লেন কেন আমাকে ওখানে যেতেই হবে। পারলে আজকেই।

অনিলিখা বলতে শুরু করে। যতটা জানে সব কিছু।

২৬ আগস্ট, চারনোবিল, ইউক্রেন

একটা শহরকে যে এভাবে প্রকৃতি গ্রাস করে নিতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হতো না অনিলিখার। নেদারল্যান্ডস থেকে UH 60 ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টারে এসেছে এখানে। পুরোটাই ভারতের 'র' অরগানাইজ করে দিয়েছে। রজত শুনে বুঝেছিল ভারতও এই ষড়যন্ত্রের শিকার। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এমন কিছু ঘটনা ঘটানো হয়েছে, এমন কিছু ফান্ডিং এসেছে যা প্রমাণ করে যে এদের উদ্দেশ্য ছিল অন্য দেশের মতো ভারতেও সব ধরনের অশান্তি তৈরি করা।

দিল্লি রায়টে ধৃত আনোয়ার আবদুল্লাকে তিহার জেলে মেরে যে অশান্তি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, তার মূলেও নাকি এরা। অনিলিখার কাছ থেকে অনেক কিছু জেনেছে। জেনেছে কারা এই বিশ্বব্যাপী ষড়যন্ত্রের পিছনে লুকিয়ে থাকা মূল কান্ডারি।

পাইলট ছাড়াও অনিলিখার সঙ্গে এসেছে রজত, একজন বিখ্যাত ভারতীয় জীব বিজ্ঞানী। তাছাড়া মেজর র‍্যাঙ্কের একজন আর্মি অফিসারও আছেন। খুব কম সময়ের মধ্যে এদেরকে নিয়ে আসা হয়েছে। মূল উদ্দেশ্য মিঃ গিলের ল্যাব খুঁজে বার করা ও উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া। এই ল্যাব চারনোবিলের কাছে প্রিপেয়াত শহরে এটুকু জানা গেছে। স্যাটেলাইটে

দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। চারদিক জঙ্গলে ঢাকা।

ওদের হেলিকপ্টার দেড়ঘণ্টা বাদে প্রিপ্রায়াতে ল্যান্ড করল। চারদিকে হাই রাইস বিল্ডিং। গত ছত্রিশ বছর ধরে এসব বিল্ডিংয়ে কেউ থাকে না।

ওদের সবার সঙ্গে গাইগার কাউন্টার রয়েছে, রেডিয়েশনের মাত্রা মাপার জন্য। এখানে চারদিকে এখনও রেডিও অ্যাক্টিভ বর্জ্য ছড়িয়ে আছে। সেজন্য কোনও জায়গাই নিরাপদ নয়। মাঝে মধ্যেই গাইগার কাউন্টারের অ্যালার্ম বেজে উঠে জানিয়ে দিচ্ছে সেই জায়গা নিরাপদ নয়। ওদের সঙ্গে আছে উপযুক্ত আগ্নেয়াস্ত্র। স্নাইপার রাইফেল, সাব মেশিনগান। অনিলিখার সঙ্গে আছে 'গ্লক সেভেন্টিন' সেমি অটোম্যাটিক পিস্তল।

কখন কী বিপদ আসে বলা মুস্কিল। ওই ল্যাবের কোনও জীবের মুখোমুখি যদি হঠাৎ পড়তে হয়। তাছাড়া সবার সঙ্গে আছে স্যাটেলাইট ফোন।

চারনোবিলের চারদিকে ওয়েস্টল্যান্ড। মনে হয় এ যেন এক অন্য পৃথিবী। মানবসভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরে যেন ওরা ফিরে এসেছে। পরিত্যক্ত বিল্ডিংগুলো ভঙ্গুর চেহারা নিয়ে উদাসীনভাবে দাঁড়িয়ে আছে। যে পথ একসময় বেশ প্রশস্ত ছিল, সেই পথ এখন প্রায় হারিয়ে গেছে লতাপাতায়, গাছগাছালিতে। অনেক গাছের পাতাই লাল। অতিরিক্ত রেডিয়েশনে হয়তো এরকম হয়েছে।

প্রিপায়েত খুব ছোট জায়গা। তবু এর মধ্যে কোনও কিছু খুঁজে বার করা সহজ নয়। যেন জঙ্গলের আড়ালে হারিয়ে যাওয়া এক রাজ্য।

অনিলিখা লক্ষ করল, ফোনে কোনও নেটওয়ার্ক নেই। ভরসা এখানে শুধু স্যাটেলাইট ফোন।

পথে একটা বাচ্চাদের স্কুল পড়ল। বাইরে থেকেই ভেতরটা দেখা যাচ্ছে। জানলা দরজা সব ভাঙা। এখনও চারদিকে বইপত্র ছড়িয়ে আছে। চেয়ার টেবিলগুলো ধুলোর আস্তরণে ঢাকা।

কী এক অজানা আকর্ষণে অনিলিখা স্কুলবাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল। এখানে যেন সময় থমকে আছে। মাটিতে পড়ে থাকা একটা গ্লোব। কিছুক্ষণের জন্য যেন হুঁশ ছিল না অনিলিখার। ঘরের মধ্যে আগাছা গজিয়েছে। একটা অন্য ঘরে ছেঁড়া জুতো, খবরের কাগজ পড়ে আছে। ১৯৮৬ সালের সেই অভিশপ্ত দিনের কাগজ। অনিলিখার মনে হল চারদিকে সবাই যেন আছে। ও যেন ট্রেসপাসিং করছে।

একটা মুহূর্ত যেন সব কিছু পাল্টে দিয়ে গেছে। অথচ এ সবের পিছনে যে মূল কারণ সেই রেডিয়েশনকে বোঝা যায় না, দেখা যায় না।

দেওয়ালময় ছবি। বেশ কিছু বাচ্চাদের সাদাকালো একটা ছবি দেওয়ালে এক জায়গায় এখনও টাঙানো আছে।

কোথায় আছে এই বাচ্চাগুলো এখন? এদের উপরে কী সেদিনের রেডিয়েশনের প্রভাব পড়েছিল? বাচ্চাদের সেই ছবির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ওর খেয়াল হল ওর সঙ্গে স্কুলের মধ্যে আর কেউ নেই। ওরা কী বাইরে অপেক্ষা করছে?

চট করে স্কুলের বাইরে বেরিয়ে এল। কিন্তু কেউ নেই। কোথায় গেল ওরা! আশেপাশের জঙ্গল খুঁজে দেখল অনিলিখা। কেউ কোথাও নেই।

স্যাটেলাইট ফোনে ওদের নাম্বারে এক এক করে ফোন করল অনিলিখা। রিং হয়ে যাচ্ছে। কেউ ধরল না।

হেলিকপ্টারে ফিরে গেল ওরা? ফেরার পথ অনিলিখার ঠিক খেয়াল ছিল। বেশ খানিকক্ষণ এদিক ওদিক খুঁজে শেষমেশ দেখল যেখানে হেলিকপ্টার ছিল, ঠিক সেখানেই আছে। তাহলে?

আবার ফোনে চেষ্টা করল। কেউ ধরল না। তাহলে কি বড় কোনও বিপদে পড়ল ওরা?

দুটো পসিবিলিটি হতে পারে। যদি এমন কোনও জায়গায় ওরা পৌঁছোয়, যেখানে এই ফোনের সিগন্যাল ঠিকমতো কাজ করছে না, বা দ্বিতীয় পসিবিলিটি—যদি ওরা কেউ বেঁচে না থাকে। সেটা ভাবতেই একটা ভয়ের শিহরন খেলে গেল ওর সারা শরীরে।

একজনের কথাই এই পরিস্থিতিতে প্রথম মনে আসছে। মিঃ পাই। ফোনটা বার করে মিঃ পাইকে ফোন করল অনিলিখা। উলটো দিকে রিং হতেই কী যে আনন্দ হল অনিলিখার! কেউ তো আছে এখনও মৃত এই পৃথিবীতে। গণেশ ফোন ধরেছে।

প্রায় পরমুহূর্তে মিঃ পাই ফোন ধরলেন। কিন্তু কাজের কথা বলার আগেই হঠাৎ করে ফোনটা কেটে গেল। নো সিগন্যাল।

এই প্রথম অনিলিখা ভয় পেল। এ যেন পরিত্যক্ত এক পৃথিবীর মাটিতে ও একা। সঙ্গের গাইগার কাউন্টারে মাঝেমধ্যে অ্যালার্মের শব্দ ছাড়া এই জঙ্গলের, এই শহরের সব শব্দই যেন ওর অচেনা।

আবার সেই জায়গায় ফিরে গেল অনিলিখা, যেখানে ওদের শেষ দেখেছে। আশেপাশের জঙ্গল ভালো করে খুঁজতে গিয়ে হঠাৎ ও দেখতে পেল কাদার উপরে কয়েকটা পায়ের দাগ। দাগ দেখে মনে হয় যেন ছুটছিল। সে পায়ের দাগ লক্ষ করে ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে খানিকটা এগোতেই একটা খোলা জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে অনিলিখা। ছড়িয়ে পড়ে আছে চারটে মৃতদেহ।

কিন্তু ওদের মুখ-এর দিকে তাকানো যাচ্ছে না। মুখ, শরীরের যে-কোনও খোলা জায়গায় যেন কেউ খুবলে খুবলে খেয়েছে। খুব সূক্ষ্ম কিন্তু গভীর অজস্র গর্ত, খুব ধারালো কিছু দিয়ে ছোট ছোট ফুটো করলে যেমন হয়। সেসব জায়গা থেকে রক্ত বেরিয়ে চোখ মুখ বীভৎস হয়ে উঠেছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে বন্দুক চালানোর সামান্যতম সুযোগও পায়নি ওরা। এটা কোনও পরিচিত প্রাণীর কাজ নয়।

এখন আর ভয় নয়, রাগে ঘৃণায় যেন কিছুক্ষণের জন্য চিন্তা করার ক্ষমতা হারালো অনিলিখা। এ সবের পিছনে মিঃ গিল। এবারে ওকে শেষ করতেই হবে। তা না হলে এই প্রাণীর হাতে পুরো বিশ্বধ্বংস হয়ে যাবে।

সন্ধে হয়ে এসেছিল। আরও প্রায় একঘণ্টা ওই ল্যাবের খোঁজ করল অনিলিখা। কিছু পেল না। আরেকটু ঘুরে অনিলিখা বুঝল এই অন্ধকারে আর ঘোরা ঠিক হবে না। পথে ও চারটে নেকড়ের একটা দল দেখেছে, যারা ওর দিকে বেশ হিংস্র চোখেই তাকাচ্ছিল। দেখার পরপরই আপনা থেকে বন্দুকে হাত চলে গেছে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে ওরাও আর কাছে আসার আগ্রহ দেখায়নি।

কিন্তু এই জঙ্গলে ওরাই শুধু একা নেই। আছে আরও অজানা অনেক জীব যার মধ্যে এমন কোনও জীব আছে যা একজন প্রশিক্ষিত আর্মি মেজরকে, ও এক উচ্চবুদ্ধিসম্পন্ন সিনিয়র মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স অফিসারকেও কয়েক মুহূর্তে শেষ করে দিতে পারে। অবাক ব্যাপার হল, একটা গুলিও চলেনি। কী ছিল ওই জীবটা? কেন ওরা গুলি চালালো না! অথচ নিশ্চয়ই আগে থেকে দেখেছিল। তা না হলে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করত না।

তাছাড়া ওই জীব ছাড়াও এখানে হয়তো ভালুক আছে, আছে বুনো কুকুরের দল, আছে হিংস্র বনবিড়াল। এমন কী আমুর শ্রেণীর বাঘও এখানকার জঙ্গলে থাকতে পারে।

এদের মধ্যে কিছু প্রাণীর ব্রেনসেলে নিশ্চয়ই মিঃ গিল মানুষের ব্রেনসেল মিশিয়ে তাদেরকেও অতিমানবীয় বুদ্ধি দিয়েছে। তার দৌলতে হয়তো তারা অনেক দূর থেকে লক্ষ্য রাখতে পারে, গন্ধ পেতে পারে, বা টার্গেট অন্যমনস্ক বা ভয় পেয়েছে কিনা তা বুঝতে পারে। এরকম হাজারটা উপায়ে হয়তো আরও সহজে শিকার খুঁজে পেতে পারে এই নতুন প্রজাতির উচ্চবুদ্ধিধারী জীবেরা।

কিন্তু অনিলিখা আজ রাতে থাকবে কোথায়? যেদিকে তাকায় শুধু ভাঙা বাড়ির কঙ্কাল আর গভীর জঙ্গল। একটাই ভরসা। এরকম এক অন্ধকার দিনেও চাঁদের আলোর কোনও কার্পণ্য নেই। সেই আলোর ভরসাতেই এগিয়ে যাওয়া। এখানে মাঝে মধ্যে মনে হয় যেন কোনও প্রাণই বেঁচে নেই। মাথার উপর দিয়ে কোনও পাখির ঝাঁক উড়ে যেতে দেখেনি এতক্ষণেও।

কিছু দূর হেঁটে অনিলিখা দেখল একটা অপেক্ষাকৃত ভালো বড় বাড়ি। ভিতরে ঢুকে বুঝল এটা আসলে কোনও এক সময় থিয়েটার ছিল। একদিকে ভাঙা স্টেজ। বড় বড় ফাঁকা ঘর। অবশ্য ফাঁকা বলাটা ঠিক নয়, কারণ আশেপাশে শিয়াল বা কুকুর শ্রেণীর প্রাণীর উপস্থিতি ও টের পাচ্ছিল। তবু তার মধ্যেই দোতলার একটা ভাঙা ঘরে রাত কাটানোর উপায় খুঁজে নিল।

তবে ঘুম এল না। বাইরে থেকে কনকনে ঠান্ডা হাওয়া জানলা দরজা দিয়ে ঢুকছে। বাইরের জঙ্গল যেন অপার্থিব সব শব্দে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। যেখানে শুয়েছে আছে ও সেখানে গাইগার কাউন্টারে দেখাচ্ছে চার মাইক্রোসিভারট। অর্থাৎ রেডিয়েশনের মাত্রা সামান্য বেশির দিকে।

পাশের অচল স্যাটেলাইট ফোনটা ব্যবহার করে কাউকে ফোন করা যায় কিনা তার চেষ্টা করল কয়েকবার। এই রাতই হয়তো শেষ রাত। হয়তো ওদের মতোই অনিলিখার মৃতদেহ পাওয়া যাবে কোনও একদিন, যেখানে ওর মুখও চেনা যাবে না। একটু তন্দ্রা এসেছিল। কিন্তু কীসের শব্দে সে তন্দ্রা ভেঙে গেল। কিছু একটা এসে দাঁড়িয়েছে খোলা ভাঙা দরজার সামনে। তার হলুদ চোখদুটো জ্বলছে। আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে অনিলিখার দিকে। স্বপ্ন?

মুহূর্তে অনিলিখা বুঝল, এটা একটা নেকড়ে বাঘ। পরমুহূর্তে ওর হাতে ধরা পিস্তল গর্জে উঠল। কিন্তু তার আগেই নেকড়েটা লাফ দিয়েছে। এক লাফে অনিলিখার গায়ের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিন্তু দাঁত বসানোর আগেই ডান হাতের কনুই দিয়ে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে আবার গুলি করল অনিলিখা। ছিটকে গিয়ে আর্তনাদ করে উঠল নেকড়েটা। আরও দু-দুবার গুলি করতে বাধ্য হল অনিলিখা। প্রত্যেকবার শহরের অপার্থিব নীরবতা যেন গুলির আওয়াজে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ওই নেকড়ে যেন মৃত্যুযন্ত্রণায় গর্জন করে উঠল—হাউউউউউউউ। আস্তে আস্তে কমে আসা আওয়াজটার সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা স্থির হয়ে গেল।

বাইরে দূর থেকে একই সঙ্গে যেন কয়েকটা নেকড়ে চেঁচিয়ে উঠল—উউউউউউ।

অনিলিখার চোখেও জল। ওকে তো ও মারতে চায়নি। কিন্তু বাধ্য হয়ে...।

অনিলিখা এবারে টের পেল নেকড়েটা না কামড়াতে পারলেও বেশ গভীর নখ বসিয়েছে ওর হাতে, কনুই এর কাছে। আর সেখান থেকে উষ্ণ লাল তরল বেরিয়ে আসছে। পুরো হাত কিছুক্ষণেই রক্তে লাল হয়ে গেল। বাথরুমে একটা ধুলোমাখা ছেঁড়া কাপড় পড়ে ছিল। ওটা দিয়েও ক্ষতের জায়গাটা খানিকটা আটকে রক্ত থামানোর চেষ্টা করল অনিলিখা।

মৃত্যু যতই কাছে আসুক না কেন তবু বাইরের এই অপার্থিব সৌন্দর্যকে এক মুহূর্তের জন্য অস্বীকার করা যায় না। চাঁদের আলো গায়ে মেখে পুরো জঙ্গল, এই অজানা পৃথিবী যেন আরও মোহময়ী হয়ে উঠেছে। কী অদ্ভুত এই রাত।

মৃত নেকড়েটা হিংস্র দাঁত বার করে ঘরের কোণে পড়ে আছে। রক্তধারা গড়িয়ে পড়েছে ঘরের মেঝেতে। এ কী মিঃ গিলের শিকার? তা না হলে আলাদা একটা নেকড়ে বাঘ হঠাৎ করে ওর উপরে আক্রমণ করবে কেন? তবে এটাই হয়তো শেষ নয়। এরকম আরও আসবে।

চাঁদ ঢলে পড়েছে। এর পরে আবার কী অজ্ঞাত বিভীষিকা এগিয়ে আসে কে জানে!

এই রাতটা জেগে থাকতেই হবে। তা না হলে হয়তো আর কালকের ভোর দেখা যাবে না। সেমিঅটোম্যাটিক পিস্তলটা হাতে নিয়েই বসে রইল অনিলিখা।

অনিলিখার যখন ঘুম ভাঙল তখন বাইরে দিনের আলো। মনটা মুহূর্তে গতকাল রাতের সব ভয়, টেনশন মুক্ত হয়ে গেল। সামনে কিছু দূরে ওই বিশাল খয়েরি নেকড়ে বাঘটার রক্তাক্ত দেহ এখনও পড়ে আছে। হাতের ব্যাথাটা ভালোই বেড়েছে। হাতে বাধা কাপড়টা রক্তে ভিজে গেলেও এখন আর নতুন করে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত পড়ছে না। আস্তে আস্তে ওই থিয়েটার বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এল অনিলিখা।

প্রায় এক ঘণ্টা খোঁজাখুঁজির পর খুঁজে পেল ল্যাব বিল্ডিংটা। এটাই এখানকার একমাত্র অক্ষত বিল্ডিং। সামান্য সারিয়ে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু ইচ্ছে করে এমনভাবে গাছ গাছালির আড়ালে আছে, যে চট করে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ভেতরে ঢুকতেই বুঝল বাইরে থেকে সাধারণ একটা বিল্ডিং মনে হলেও ভেতরে নানান প্রযুক্তিতে সাজানো একটা অত্যাধুনিক ল্যাব। কিন্তু সব দরজা খোলা পড়ে আছে কেন? কোনও সিকিউরিটি সিস্টেম কাজ করছে না কেন? সবাই কোথায়? বন্দুকটা হাতে নিয়ে খুব সন্তর্পণে এগোল অনিলিখা। একটু এগোতেই কারণটা বুঝল সে।

একটা অত্যাধুনিক ল্যাবের উপর দিয়ে যেন কোনও ঝড় বয়ে গেছে। বেশ কিছু চেয়ার টেবিল উল্টে পড়ে আছে। মেঝেতে পড়ে আছে কম্পিউটার, স্ক্যানার, নানান ধরনের সেন্সর। কিন্তু কেউ কোথাও নেই। নাকি আছে?

দেখে বোঝা যায় এখানে যারা ছিল, তারা কয়েক সপ্তাহ আগেও এখানে কাজ করেছে। কিন্তু তারা গেল কোথায়? বিশাল ল্যাব থেকে বেরিয়ে একটা চওড়া করিডর। তার দুপাশ দিয়ে বন্ধ পরপর কিছু ঘর। একটা বিশ্রি পচা গন্ধ আসছে। কিছুটা এগোতেই চমকে উঠল অনিলিখা। লবির চারদিকে একের পর এক মৃতদেহ পড়ে আছে। শরীরগুলো পচে ফুলে ফেঁপে উঠেছে, কিন্তু সবুজ বা লালচে হয়ে ওঠেনি।

মনে হচ্ছে ২-৩ দিনের মধ্যেই হয়েছে এ ঘটনা। সবার যেন একই রকম চেহারা। আসলে আলাদা করা যাচ্ছে না কারণ সবার মুখে-হাতে হাজারটা ছোট ছোট ফুটো। যেন কেউ পেন্সিল বা পিন বার বার গভীরভাবে ফুটিয়েছে শরীরে। শুকনো রক্ত লেগে আছে মুখে চোখে।

কিন্তু এদের মারল কে? কোনওভাবে কি এসব এক্সপেরিমেন্ট ভুল দিকে এগিয়েছিল? এখানকার কোনও প্রাণীই কী এভাবে এদের মেরেছে?

মৃতদেহগুলো পেরিয়ে করিডরের পাশ দিয়ে থাকা পর পর কাচের ঘরগুলোর মধ্যে একটা ঘরের দিকে তাকিয়ে থমকে গেল অনিলিখা। সেখানে মিঃ গিল হারভে একটা চেয়ারে বসে আছে। মাথা একদিকে কাত। ওনার দেহে একই রকম ফুটো। কিন্তু সেই অজানা প্রাণীর হাতে মৃত্যুর আগেই বোধহয় মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করেছিলেন বিজ্ঞানী গিল। ক্ষতচিহ্ন সেরকমই বলছে।

হাতটা চেয়ার থেকে ঝুলছে। একটা রিভলভার নীচে পড়ে আছে। কিন্তু কী কারণে আত্মহত্যা করতে হল কুখ্যাত জিনিয়াস বিজ্ঞানী গিল হারভেকে?

সামনে একটা চিঠি রাখা।

চিঠিটা হাতে নিয়ে চমকে উঠল অনিলিখা। ওকেই লক্ষ্য করে লেখা চিঠি।

অনিলিখা,

আমি হেরে গেলাম। আমি জানি তুমি এখানে আসবে। একমাত্র তুমিই আসতে পারবে এখানে। কী আশ্চর্য দেখো তোমাকে এতবার জীবন্ত দেখতে চেয়েছিলাম, যাতে তোমাকে আমার হাতে শেষ করতে পারি, কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে এসে মনে হচ্ছে আমার সব কিছু জ্ঞান, বুদ্ধি যদি তোমাকে দিয়ে যেতে পারতাম...তুমিই হয়তো ওদের থামাতে পারবে। তুমিই হয়তো আমাদের শেষ আশা। আমি বন্ধ ঘরে বসে আছি। কিন্তু জানি ওরা আসবে।

তুমি নিশ্চয়ই জেনে গেছ আমি কী করতে চেয়েছিলাম। আমি চেয়েছিলাম মানুষের ব্রেন সেল ও বিভিন্ন জীবের ব্রেনসেলের সঠিক সংমিশ্রণে এমন এক জীব তৈরি করতে যা আমাদের থেকে বুদ্ধিতে অনেক এগিয়ে থাকবে। হয়তো বুদ্ধির সংজ্ঞাই পাল্টে দেবে। পারলামও শেষে। শুধু একটা নয়, একাধিক। কখনও মানুষের থেকে বুদ্ধিতে অনেক এগিয়ে থাকা বাঘ, কখনও গরিলা, কখন লেমুর, কখনও নেকড়ে তো কখন গরিলা। কিন্তু তারপরে?

হঠাৎ একদিন বুঝলাম আমি নিজের অজান্তে এভাবে পরীক্ষানিরীক্ষা করতে করতে এরকম এক বুদ্ধিতে বহুগুণ এগিয়ে থাকা লেমুরের শরীরে এক অদ্ভুত ছত্রাকের জন্ম দিয়েছি, যে ছত্রাক আমার চেনাজানা সব জীবের থেকে আলাদা। হয়তো এ জায়গার মাত্রাতিরিক্ত রেডিয়েশনের জন্য দ্রুত জেনেটিক মিউটেশনের হার এর পিছনে দায়ী। কীভাবে যে এই অ্যালিয়েন ছত্রাক ওই লেমুরের শরীরে সৃষ্টি হল, সেটা আমার কাছে খুব বড় রহস্য।

সেই পরজীবি ছত্রাক সব সময় খোঁজে অন্য কোনও প্রাণ, অন্য কোনও জীব যার মধ্যে সে টিকে থাকতে পারবে। সব সময় এমন আশ্রয় খোঁজে যা কিনা সবথেকে শক্তিশালী। কিছুদিনের মধ্যে এর কাছে আমি হার স্বীকার করলাম। একের পরে এক হোস্টের মাধ্যমে ও আমার রাজত্বে এসে আমার সিংহাসনই কেড়ে নিল। আমার সব ক্ষমতা কেড়ে নিল।

কিন্তু শেষে যে সে এরকম এক জীবে আশ্রয় নেবে সেটা কখনও আন্দাজ করতে পারিনি!

সেটা যে কী তা বুঝেছি কয়েক দিন আগে। এখানে একধরনের অদ্ভুত বিষাক্ত পিঁপড়ে পাওয়া যায়, যা খানিকটা বুলডগ অ্যান্টের মতো। কিন্তু অনেক বেশি বিষাক্ত। অনেক বেশি দলবদ্ধ। আমার ধারণা এই পিঁপড়েটা শুধু এখানেই আছে, হয়তো এখানকার অত্যাধিক

রেডিয়েশনের কারণে ওই বুলডগ অ্যান্ট বিবর্তিত হয়ে এখানে এই জীব সৃষ্টি হয়েছে। লক্ষ লক্ষ পিঁপড়ে তারা সবাই তাদের দলপতির নির্দেশে চলে। আকারে ওই এক ইঞ্চির এই দলপতি পিঁপড়েকে শেষে আশ্রয় করল এই ছত্রাক।

কী বুদ্ধি দেখো। ভালুক নয়, নেকড়ে নয়, মানুষ নয়, আমি নই, সে বেছে নিল এমন এক জীব যে সবার অলক্ষ্যে সব জায়গায় পৌঁছে যেতে পারে, লক্ষ লক্ষ পিঁপড়েকে সংঘবদ্ধ করতে পারে। এই বিশ্বের সব থেকে শক্তিশালী জীবকে এই অ্যালিয়েন ছত্রাকটা পরিচালিত করতে শুরু করল। ভাবতে পারো কী হতে পারে যদি লক্ষ কোটি এ ধরনের পিঁপড়ে এভাবে সংঘবদ্ধ হয়, যদি উন্নততম বুদ্ধির অধিকারী হয়, উন্নততম দৃষ্টি আর রণকৌশলের অধিকারী হয়। এদের কাছে সমগ্র মানবজাতি কয়েক ঘণ্টায় হেরে যাবে।

আমি হেরে গেছি অনিলিখা। তুমি যত তাড়াতাড়ি পারো, এখান থেকে পালিয়ে যাও। তবে হয়তো পারবে না। তুমিও পারবে না। ওরা চারদিকে ছড়িয়ে আছে। বুঝতেও পারবে না মৃত্যু এত চুপচাপ পাশে এসে দাঁড়াতে পারে। সব রকম নিরাপত্তা নেওয়া সত্ত্বেও ওরা আমার ল্যাবে শেষে ঢুকে পড়েছে। আমার সব কর্মীকে শেষ করে দিয়েছে।

আমি এখন এই বন্ধ সিল্ড ঘরে বসেও জানি খানিকক্ষণের মধ্যে আমার দশাও ঠিক অন্যদের মতোই হতে চলেছে। সবার মৃতদেহ বাইরে চারদিকে ছড়িয়ে আছে। মৃতদেহ ছড়িয়ে আছে আমার সৃষ্ট অন্য সব প্রাণীরও। আমি জানি না কীভাবে এদের থেকে তুমি এই বিশ্বকে বাঁচাবে। তুমি যদি এখান অব্দি পৌঁছতে পারো, তবে এখন বাইরে গিয়ে দেখবে কেউ নেই এখানে, সব শেষ, সব শেষ।

বিদায়।

অনিলিখা চিঠিটা নামিয়ে রেখে চারপাশে তাকাল। বীভৎস পচা গন্ধ চারদিকে। মিঃ গিল নিশ্চয়ই দরজা খুলে দেননি। তবু ঠিক ঢুকে এসেছে এরা এ ঘরেও। কিন্তু এখন এরা কোথায়? এ ঘটনা অবশ্য দুই থেকে তিন দিন আগে হয়েছে। বডি ডিকমপজিশন সেরকমই দেখাচ্ছে।

কিন্তু তারা কোথায়? সেই বিবর্তিত পিঁপড়ের দল?

এখানে কোনও জায়গাই সেফ নয়। কিন্তু এদেরকে থামাতেই হবে কোনওভাবে। নিজের প্রাণের ভয়ে ভীত নয় অনিলিখা। এরা যদি চারনোবিলের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে!

বেরোতে গিয়ে বুঝল বাইরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ঘন জঙ্গলের মধ্যে মুষল ধারা বৃষ্টি। যেন প্রলয় এসে গেছে। সঙ্গে বজ্র বিদ্যুৎপাত। সেই বিদ্যুতের আলোর রেখা ভেতর থেকেই দেখা যাচ্ছে। এ যেন সব কিছু শেষ হয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত।

কিন্তু এর মধ্যেও বেরিয়ে গিয়ে আসন্ন এই বিপদের কথা কোনওভাবে জানাতে হবে বাইরের জগৎকে যাতে মানবসভ্যতা আরও কিছুদিন টিকে থাকার শেষ চান্স পায়। যাতে বিশ্বের সেরা প্রযুক্তির সাহায্যে এদের সঙ্গে লড়াই করা যায়।

কিন্তু বেরোতে গিয়ে হঠাৎ চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল অনিলিখা। এ কী অপার্থিব জগৎ। বাইরের রাস্তা, ঘাস, মাটি সব কালো হয়ে গেছে। আকাশও ঘন কালো মেঘে ঢাকা পড়েছে। শুধু কিছু সবুজ গাছগাছালি আর কিছু বিল্ডিং বাদে এই দিগন্ত বিস্তৃত কালো রঙ মাটি থেকে আকাশে যেন গিয়ে মিশেছে। এ'যেন ঠিক এক অন্য গ্রহের পরিবেশ তৈরি করেছে।

কী করে এত চট করে বদলে গেলো এখানকার মাটির রঙ, ঘাসের রঙ। পরক্ষণেই বুঝতে পারল অনিলিখা কারণটা। লক্ষ লক্ষ না তারও বেশি কোটি কোটি কালো পিঁপড়েতে মাটি, ঘাস, নীচের সব দিক ঢাকা পড়ে গেছে। তারা সবাই অনিলিখার বাইরে আসার অপেক্ষায় আছে। কিন্তু তারা ভেতরে আসছে না কেন? এরাই কী সেই বিবর্তিত বুলডগ অ্যান্ট? পুরো দেহ-মাথা কুচকুচে কালো। হিংস্র চোখ দুটো শুধু লাল। শুঁড় দুটো মাথার উপরের দিকে তুলে এরা যেন এক অদ্ভুত আনন্দে মেতেছে। হয়তো ভাবছে অনিলিখাই এই বিশ্বের শেষ মানুষ। একে শেষ করলেই ব্যস।

কিন্তু না। ভুল ভাঙল। এরা অনিলিখাকে দেখছে না। এরা শুধুই এই বৃষ্টিধারার আনন্দে নাচছে। যেন এই বৃষ্টির অপেক্ষায় এরা যুগের পর যুগ অপেক্ষা করেছে। আর আজ সেই বৃষ্টির পরশ পেয়ে মেতে উঠেছে।

অনিলিখা ল্যাবের অন্য দিক দিয়ে বেরোতে গিয়েও দেখল সেই একই দৃশ্য। অপেক্ষা করতে হবে। বেরনো অসম্ভব। এঁরা সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

কিন্তু এর পরে যেটা হল, সেটার জন্য অনিলিখা আদৌ প্রস্তুত ছিল না। ভিজে মাটির মধ্যে ঢুকে যেতে লাগল পিঁপড়েগুলো। একটার পর একটা। মনে হল যেন মাটির মধ্যে একটা যুদ্ধ চলছে।

এই ঘটনা কতক্ষণ চলেছিল কে জানে! তিন-চার-পাঁচ ঘন্টা, নাকি তারও বেশি কে জানে! বৃষ্টি যখন থামল তখন সন্ধে হয়ে গেছে। ওই সব পিঁপড়ে মাটির তলায় ঢুকে গেছে। শুধু কিছু পিঁপড়ের ক্ষতবিক্ষত দেহ বাইরে পড়ে আছে।

মেঘমুক্ত নীল আকাশে আবার চাঁদ উঠেছে। আবার কোথা থেকে যেন কোনও নেকড়ে বাঘের ডাক শোনা যাচ্ছে। মাথার উপরে তারাখচিত আকাশ আবার যেন নতুন জীবনের সম্ভাবনার কথা বলছে।

তাহলে কী বৃষ্টি হলে এদের এরকম মরণ নাচ ও তারপরে মৃত্যু হয়! তার সঙ্গে সঙ্গে কী ওই অ্যালিয়েন ছত্রাকও শেষ হয়ে গেল!

এই প্রথম একা একা জোরে হেসে উঠল অনিলিখা। এত কিছু করে ওই অ্যালিয়েন ছত্রাক এসব পিঁপড়েদের এই প্রবণতার কথা জানতে পারেনি বা তাতে কোনও পরিবর্তন আনতে পারেনি।

১০ সেপ্টেম্বর, কলকাতা, শনিবারের আসর

অনিলিখাকে উদ্ধার করেছিল ভারত সরকারের একটা অ্যাডভান্সড লাইট হেলিকপ্টার।

অনিলিখাদের যে হেলিকপ্টার করে চারনোবিলে নিয়ে আসা হয়েছিল, তার লোকেশন দেখে ও যারা এসেছিল তাদের কারো সঙ্গে যোগাযোগ না করতে পেরে 'র' অর্থাৎ ভারতের 'রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং' পুরো ব্যাপারটা নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করে। পরে ইউক্রেন সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গেও যোগাযোগ করে। তারপরেই সংগঠিত হয় এই উদ্ধারকার্য।

শনিবারের আসরে কেউই এসব ব্যাপারে কিছুই জানত না। টপ সিক্রেট ঘটনা বলে এখনও মিডিয়ার কাছেও খবরটা আসেনি। হয়তো কোনওদিন আসবেও না।

তবে খুব রহস্যজনক ভাবে 'ভক্সজেন' গাড়ির ম্যানেজিং ডিরেক্টর কার অ্যাক্সিডেন্টে গতকাল মারা গেছেন। একই সঙ্গে গতকাল গ্রিসের এক রিসোর্টে মেডলা সংস্থার প্রধানেরও সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে।

একই দিনে দুই এত বড় সংস্থার শীর্ষে থাকা দুই ব্যক্তির মৃত্যুকে অনেকেই খুব দুর্ভাগ্যজনক বলছেন।

বহুদিন পরে অনিলিখাকে হাতে ব্যান্ডেজ লাগানো অবস্থায় শনিবারের আসরে ঢুকতে দেখে প্রতীক বলল, কী ব্যাপার অনিলিখাদি! তুমি তো সেই ক্রিকেট ম্যাচের পর থেকে আমাদের ভুলেই গেছ! এতদিন বাদে? তা হাতে চোটটা কীসে পেলে?

বিশ্বজিৎদা সেদিকে একবার তাকিয়ে মুচকি হেসে বলে উঠল, সেদিনের ক্রিকেট ম্যাচ থেকে, আবার কী! আরে বাবা, আমার দেড়শো মাইল স্পিডের বোলিং-এর হাতে লাগলে এই হবে। হাড় ভেঙেছে, তাই তো? তবে অনিলিখা তো আর সেটা মুখে বলবে না। বলবে কোনও নেকড়ে বাঘ বা ভিনগ্রহী প্রাণী কোনও গভীর জঙ্গলে অনিলিখাকে একা পেয়ে হাতে কামড় বসিয়েছে। কী ঠিক বলছি কিনা অনিলিখা?

অনিলিখাদি মুচকি হেসে বলে, তোমার কথা কখনও ভুল হতে পারে! ঠিক তাই।

একটু থেমে অনিলিখাদি ফের জোরে চেঁচিয়ে বলে ওঠে, মাসিমা, আজ কিন্তু আমরা সবাই লুচি আর কষা মাংস খাব। অনেক গল্প বলার আছে। আমি মোহনের দোকানে কষা মাংস বলে এসেছি।

আমরা সবাই আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম। যাক, অনেক দিন বাদে নতুন কিছু শোনা যাবে অনিলিখাদির কাছ থেকে। লুচি আর কষা মাংস তো সঙ্গে আছেই! কিশোর ভারতী

শিবরাম চক্রবর্তী

নিবারণের নিমন্ত্রণ রক্ষা

জন্ম ১৯০৩ সাল। সাহিত্যজীবনের শুরু কবি হিসেবে। প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম 'মানুষ'। বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন অল্পবয়েসেই। তাঁর বিখ্যাত বই 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'র মধ্যে সেই অভিজ্ঞতার অল্পবিস্তর ছাপ আছে। পরে হাসির গল্প লিখতে শুরু করে বাংলা সাহিত্যের হাসির 'সিংহাসন'টি দখল করে নেন। দীর্ঘকাল বাস করেছেন মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের মেসবাড়িতে। তাঁর ভাষায় 'মুক্তারামের তক্তারামে শুক্তোরাম' খেয়ে কাটিয়ে দিয়েছেন আমৃত্যু। প্রয়াণ ২৮ আগস্ট ১৯৮০।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় নিবারণ আবার আমায় ফোন করল—আমার বন্ধু নিবারণ।

'ভাই শিবরাম, যদি তুমি ঘন্টা দু-একের জন্য একবার আসতে পারো তাহলে—তাহলে—এত বাধিত হই যে কী বলব! তোমার পোর্টেবল বাংলা টাইপরাইটারও হাতে করে নিয়ে এসো। হ্যাঁ—আর যদি ভালো রাইটিং প্যাড থাকে—আছেই নিশ্চয়ই তোমার! গল্প লেখার বদভ্যাস রয়েছে যখন!—সেটাও সঙ্গে আনতে ভুলো না! নিদেনপক্ষে ডজন দু-তিন চিঠির কাগজ হলেও চলবে, খুব ডিসেন্ট হওয়া চাই কিন্তু।'

'ভাই নিবারণ—' বলে শুরু করেছি, আমাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। টেলিফোনের কানেকশন কেটে দিল মাঝখান থেকে। কিংবা নিবারণই নিজে, রিসিভার নামিয়ে রেখে আমাকে নিবারণ করল কি না কে জানে! বলতে যাচ্ছিলাম যে তক্ষুনিই বাড়ি ছেড়ে বেরুনো আমার পক্ষে সম্ভব নয়, হাতে কাজ রয়েছে, গল্প লেখার কাজ, হয়তো এমনি কিছু একটা কৈফিয়ত দিতে যাচ্ছিলাম—কিন্তু ওজর-আপত্তি নিবারণের কাছে নিষ্ফল। কোনোদিনই সে-সবে সে কর্ণপাত করে না—টেলিফোনে আরো কম।

নিবারণ ছাড়াও যে আমাদের আর কোনো প্রিয়জন কিংবা প্রয়োজন থাকতে পারে, এটা ওর ধারণার বাইরে, চিরদিনই তাই দেখে আসছি। কাজেই কোনো অজুহাতেই যখন পার নেই, পোর্টেবলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হল।

'সত্যি! ভারি লক্ষ্মীছেলে তুমি!'—আমাকে দেখামাত্রই নিবারণ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে : 'তোমার মতো বন্ধু হয় না! আজকালকার জড়বাদী জগতে সবাই আত্মসর্বস্ব। পাড়ার লোকেরা যখন আমার কাছে বন্ধুদের স্বার্থপরতার কথা পাড়ে, আমার চোখ সজল হয়ে ওঠে, আমি তাদের বলি, তোমরা আমাদের শিবরামকে দ্যাখোনি, শিবরামকে চেনো না, তাহলে বলতে না এ কথা। বন্ধু বলতে কী বোঝায় তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত—তার জাজ্বল্যমান উদাহরণ হচ্ছে ওই শিবরাম! আমাদের মূর্তিমান শিবরাম! যাক, এখন চট করে বসে পড়ো তো! আমার কয়েকটা চিঠি
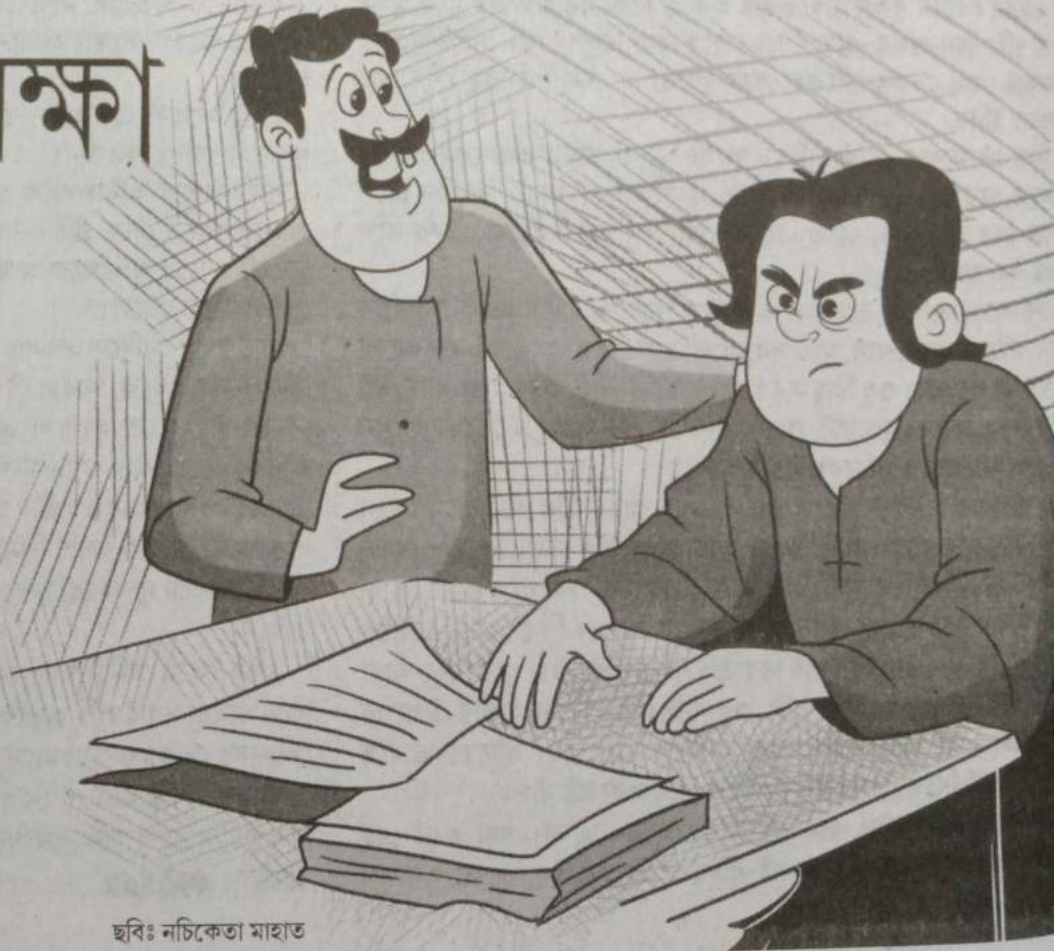
ছবিঃ নচিকেতা মাহাত

টাইপ করে দাও, কেমন? বলব কী, ক'দিন থেকে আঙুলে এত ব্যথা যে কলম ধরতে পারছিনে।'

এই বলে কাগজ পাকিয়ে, ভার্জিনিয়া টোব্যাকো ভরে সিগ্রেট বানিয়ে সে টানতে শুরু করে দিলে—তার ব্যথিত আঙুলের সাহায্যেই।

'একটা সার্কুলার লেটারের মতো হবে—' নিবারণ বিবৃত করে : 'বুঝলে কিনা! কিন্তু সবগুলোই আলাদা আলাদা টাইপ করা চাই। সার্কুলার চিঠি বলে জানতে দিতে চাইনে কাউকে। তা ছাড়া, "প্রিয় মহাশয়" দিয়েও শুরু করা চলবে না—একটু ব্যক্তিগত, একটু ঘনিষ্ঠতাজ্ঞাপক করতে চাই চিঠিগুলোকে। যেমন ধরো, ভাই মেঘেন, কিংবা, প্রিয় জগদিন্দ্র, এই ধরনের, বুঝলে কিনা!'

খুব লম্বা চিঠি নাকি? আশঙ্কিত হয়ে প্রশ্ন করি।'

'না, এমন আর কী বড়ো।' নিবারণ বলে : 'এই আধ পাতাটাক কেবল!—'

আমার গলা ঘড়ঘড় করে ওঠে : 'কতগুলো করতে হবে?'

'আমি বেশি কষ্ট দেবো না তোমায়,' দয়ার্দ্র কণ্ঠ নিবারণের : 'ডজন খানেক করে দাও আজ রাত্রে। তাহলেই হবে। তুমি তো জানো, বন্ধুদের ওপর আমি আনডিউ অ্যাডভ্যানটেজ নিতে একদম ভালোবাসিনে। আমার কাজ করে কৃতার্থ হবার তোমার যতই উৎসাহ থাক না কেন, তোমাকে বেশি খাটাবার আমার আগ্রহ নেই। তোমার মতো বন্ধুত্বের একেবারে আদর্শস্থল না হতে পারি, তবে আমি—আমিও—হ্যাঁ, আমিও তোমার চেয়ে নেহাত কম যাইনে! উপরোধ করে একজন প্রাণের বন্ধুকে ঢেঁকি গেলাব সে পাত্র নই আমি।

'হয়েছে হয়েছে! আর বলতে হবে না—' আমি বাধা দিয়ে বলি—'নিজের প্রশংসা শুনতে আমার লজ্জা করে।'

'তাহলে, আমি বলে যাচ্ছি, তুমি আরম্ভ করো। যদি প্রথম ডজন খানেক পাঠিয়ে কোনো ফল না হয়, তখন আবার আর একদিন তোমায় ফোন করব। এসো তখন।'

নিবারণ আর আমি একসঙ্গে আরম্ভ করি। নিবারণ যা কথায় বলে, আমি তা কাজে পরিণত করতে সচেষ্ট হই।

ভাই জগদিন্দ্র,

সেবার যখন তোমার সঙ্গে দেখা হল, সেই যখন তুমি কলকেতায় এসেছিলে, তুমি আমাকে গরমের ছুটিটা তোমাদের কালিমপঙের বাড়িতে কাটাতে বলেছিলে। সেজন্যে আমি কৃতার্থ। তোমার অনুরোধ রাখতে পারলে সত্যি আমি খুব সুখী হতাম, বলতে কি, এই গরম কালটা কালিমপঙে কাটানোর মতো আরামের আর কিছুই হতে পারে না, অতীব আনন্দের সঙ্গেই আমি তোমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতাম, কিন্তু ভাই অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আমাদের মেঘেন, আমাকে আগে থাকতেই, তাদের পুরীর বাসাতে গ্রীষ্মের ছুটিটা কাটাবার কথা বিশেষ করে জানিয়ে রেখেছে, তার নিমন্ত্রণ না রাখলে সে ভারি দুঃখিত হবে, অতএব, তোমাদের ওখানে যেতে পারলাম না এজন্যে কিছু মনে কোরো না ভাই।

ভালো কথা, ইতিপূর্বে প্রকাশিত আমার কবিতার বই তোমাকে পাঠিয়েছিলাম, তুমি পেয়েছ কি না জানিনে। কবিতাগুলো তোমার কেমন লাগল, জানালে সুখী হব। ইতি—

তোমাদেরই—

শ্রীনিবারণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি ওর দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি।

'তুমি কী বলতে চাও যে সত্যিই তোমাকে একজন লোক নেমন্তন্ন করে রেখেছে? গরমের ছুটিটা তাদের ওখানে কাটাবার জন্যে?'

'তোমার এই প্রশ্নের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ রয়েছে,' নিবারণ ভারি গম্ভীর হয়ে যায় : 'কেন? আমাকে কি কেউ নেমন্তন্ন করে না? করতে নেই কি? আমি নিমন্ত্রিত হবার অযোগ্য? না, আমাকে নিজেদের মধ্যে পেলে কারো খুশি হয়ে ওঠবার কথা না? না, যেখানে আমি যাই, যাদের সঙ্গে মিশি, তারা সবাই মিইয়ে যায়—দমে যায়—ভড়কে যায় আমাকে দেখলেই? অর্থাৎ আমি তাদের আনন্দের উৎস হয়ে উঠতে পারিনে? কী বলতে চাও তুমি? শুনি? এরকম বক্র ইঙ্গিত করার মানে?

আমি কোনো জবাব দিতে পারিনে।

'তবে, হ্যাঁ, সত্যি কথা জানতে চাও যদি—' নিজে থেকেই বলে নিবারণ : 'তাহলে বলতে হয় একটাও নেমন্তন্ন আমি পাইনি এখনো। আদপেই না। এমনকী, মেঘেন হতভাগারও না। যে রকম চালাক ছেলে—সে নেমন্তন্ন করবে? সেই কারণেই তো এই সার্কুলার চিঠি পাঠানো, যাতে একটা-না-একটা এসে জুটে যায়।'

'বুঝতে পারছিনে।' আমি বলি : 'এভাবে যে কী করে নেমন্তন্ন বাগাবে, তা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির বাইরে।'

'এই ধরনে হবে, বুঝলে কিনা—' নিবারণ বিশদ করতে চেষ্টা করে :

'জগদিন্দ্রের কথাই ধরো। বড়দিনের বন্ধে ও যখন কলকেতায় এসেছিল তখন বহুবার ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। কত জায়গাতেই না। এবং কত কথাই না হয়েছে আমাদের মধ্যে। কত কী বিষয়েই না আমরা আলোচনা করেছি। সেইসব কথাবার্তার ফাঁকে-ফোকরে, সে যে ঘুণাক্ষরেও কখনো, গ্রীষ্মের ছুটিটা তাদের কালিমপঙে কাটাবার আভাস আমাকে দ্যায়নি, এ কথা সে ধারণা করেই উঠতে পারবে না। তার বিশ্বাস হবে যে সত্যিই সে আমাকে নেমন্তন্ন করে ফেলেছিল, হয়তো কোনো অসতর্ক অবস্থায়। এমনও হতে পারে যে, যখন আমি তার প্রবন্ধগুলোর প্রশংসা করছিলাম—তার সেই অখাদ্য লেখাগুলোর—সেই দুর্বল মুহূর্তেই সে এই দুর্ঘটনা করে বসেছে!—'

'জগদিন্দ্রের প্রবন্ধের—?' আমার দম আটকে আসে : কী করে প্রশংসা করলে? ধৈর্য ধরে পড়তে পেরেছ তুমি?'

'পড়বার দরকার হয় না। না পড়েই প্রশংসা করা যায়। তোমার গল্পই কী আমি পড়ি? কিন্তু না পড়েই বলে দিতে পারি, তোমার গল্প ও তার প্রবন্ধের চেয়ে কোনো অংশে ন্যূন নয়।'

নিজের নিন্দাতেও আমি লজ্জিত হয়ে পড়ি—নিন্দা, প্রশংসা আমার কাছে সমান। প্রসঙ্গটা আমি পালটাতে চাই : 'না হয়, জগদিন্দ্রের ধারণা হল যে তোমাকে নেমন্তন্ন করেছে কিন্তু তাতেই বা কি? তুমি তো আর তার কাছে যাচ্ছ না। অর্থাৎ যেতে পারছ না—মেঘেনের কাছেই তোমাকে যেতে হচ্ছে, তুমি জানিয়ে দিয়েছ।'

তপন বাইন
ইচ্ছে ডানা

অঙ্ক আমার ভালো লাগে না ইচ্ছে করে না মন বসে না
জটিল কতক নিয়মকানুন আর তো কিছুই না!
আমার কেমন নীরস লাগে সূত্র গেঁথে এগিয়ে চলা
লাভ ক্ষতির ওই হিসেব ছাড়া কিছুই কি নেই বলা?

বরং অনেক লাগে ভালো
শেষ বিকেলের আকাশ ছুঁতে
বকের পাখায় মুখ লুকিয়ে অবাক আলোয় মিশে যেতে
তোমার কোলে মাথা রেখে চাইগো তারার হিসেব পেতে
ধূমকেতুদের ঝাঁপিয়ে পড়া
দেখতে যে চাই আঁধার রাতে।

ওর চেয়ে মা গল্প বলো পলাশীর সেই আম বাগানের
মহান সে-সব আত্মত্যাগের, মোহনলাল আর মীরমদনের
অস্ত্র হাতে মীরজাফরের দাঁড়িয়ে থাকার তামাশা শুনি
স্বাধীনচেতা শেষ নবাবের পরাজয়ের সেই গল্পখানি!

সৌম্যেন্দু সামন্ত
ক্ষমতা যাচাই

'দীপু, যা তো নিয়ে আয় ডাকঘর থেকে---
পোস্টকার্ড একখানা, যাতে চিঠি লেখে।'

'এখনই আনছি, তবে পয়সা তো দাও---
আনব ছুটেই আরও যা যা তুমি চাও।'

'পয়সা দিয়ে তো পারে আনতে সবাই,
আনতে পারে বাঘের দুধও যদি চাই।

এনে তা দ্যাখা ফ্রি-তে, করিস না ''বোর''---
দেখি তোর কতখানি বুদ্ধির জোর।'

দীপু একছুটে গিয়ে আনে লেখা-পোস্টকার্ড
বাবা বলে, 'তুই দেখি বুদ্ধির ভাঁড়!'

'আমি তো বুদ্ধু, তুমি দেখাও জাদু---
তা দেখে বলুক সবে---সাধু! সাধু! সাধু!
সাদা-কার্ডে লিখতে তো পারে সব্বাই,
লেখা-কার্ডে লিখে হোক ক্ষমতা যাচাই!'

'আহা, এর একটা জবাব আসবে তো? তাতে জগদিন্দ্র আমাকে জানাবে যে আমার কবিতার বই সে পায়নি। বলা বাহুল্য, আমার কবিতার বই তাকে আমি পাঠাইওনি।'

'তবু আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে, এতে করে তোমার কী যে সুবিধে হবে।' সন্দিগ্ধভাবে ঘাড় নাড়ি।

'তোমার বোঝাবার দরকার করে না। ঘটে একফোঁটা বুদ্ধি থাকলে তো বুঝবে? সারারাত তোমার সঙ্গে বকাবকি করে কাটাই আর আমার কাজ এদিকে পণ্ড হোক?—' নিবারণ দুর্নিবার হয়ে ওঠে : 'নাও আমার চিঠিগুলো চটপট সেরে ফ্যালো দেখি। তারপর দিন সাতেক পরে এসে খবর নিয়ো, বুঝিয়ে দেবোখন তখন। তোমাদের বুদ্ধি অনেকটা মেওয়ার মতো, সবুরে ফলে।'

দিন সাতেক পরে খবর নিতে গেলাম।

'জবাব এসেছে একটা,' বলল নিবারণ, হাসিমুখেই বলল : 'শিলং-এর বটকেষ্টর কাছ থেকেই এসেছে। আমাদের বটকেষ্ট গো? যার ধারণা যে সে নাটক লিখতে পারে। খানকতক লিখেওছে, কলকাতার থিয়েটারগুলোয় প্লে ও হয়েছে নাকি, শুনতে পাই।'

'হ্যাঁ, জানি।' আমি বলি : 'খুব খারাপ লেখে না নেহাত। তোমার কবিতার মতোই উপাদেয়। কেবল কান পেতে শোনাটাই কষ্টকর, এই যা।'

'আমার কবিতার তুমি বুঝবে কী? কবিতা বোঝা অত সোজা নয় হে! তোমার গল্পের মতো না, যে লিখে ফেললেই হল। মিল খুঁজবার জন্যে তিনখানা ডিকশনারিই রাখতে হয়েছে, রীতিমতো।' ঠোঁট উলটে জানিয়ে দ্যায় নিবারণ।

'আমি কী বলেছি যে সোজা? যা শুনতেই অত কষ্ট তা লিখতে না জানি কী! সে আমি বুঝতে পারি। কিন্তু যাক, বটকেষ্ট কী লিখেছে শুনি?'

'লিখেছে যে,—এই দ্যাখো না!—'চিঠিখানা ফেলে দেয় আমার দিকে। সাফল্যগর্বে ওর সারা মুখ সমুদ্ভাসিত। পড়ে দেখি :

ভাই নিবারণ,

গ্রীষ্মকালে তুমি আমাদের শিলং-এ আসতে পারবে না জেনে আমরা যে কী দুঃখিত হয়েছি তুমি আন্দাজ করতে পারবে না। তোমার সঙ্গলাভের আনন্দ যে একবার পেয়েছে সেই জানে। তোমাকে আমাদের সান্নিধ্যে পাবো জেনে সত্যিই আমরা লালায়িত হয়েছিলাম। কিন্তু, আমরা বুঝতে পারছি যে মেঘেনকে হতাশ করা তোমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। এবং সেটা উচিতও নয়, আমাদের মতে। কেননা, মেঘেন আমাদের বন্ধু, সে ভাবতে পারে, আমরা তোমাকে ভাঙিয়ে নিলাম, সেটা ভালো দেখায় না। আশাকরি পুরীতে তোমার আরামেই ছুটিটা কাটবে। হ্যাঁ, ভালো কথা, তোমার কবিতার বইটি কিন্তু আমরা পাইনি। ইতি—

ভবদীয়—
বটকৃষ্ণ গাঙ্গুলি

পড়লাম, পড়ে বুঝলাম, যতটা বোঝা আমার ক্ষমতার মধ্যে। কিন্তু এহেন দায়সারা চিঠি পেয়ে, নিবারণ এতখানি উৎসাহিত কেন কিছুতেই বুঝতে পারলাম না।

'বেশ তো! তাতে কী? জিগ্যেস করি।'

'বটকেষ্টকে আমার কবিতার বই পাঠিয়ে দিয়েছি। আর লিখে দিয়েছি, মেঘেনের ছেলেমেয়েরা হামে পীড়িত, মেঘেন জানিয়েছে। অতএব শিলং-এ যেতে আমার কোনো বাধা নেই।'

নিবারণের বাহাদুরিতে আমি হাঁ করে থাকি। অনেকক্ষণ পরে অবশেষে বলি : 'তাহলে আজই তুমি রওনা হচ্ছ? কী বলো?'

না আজই নয়। আরো খানকতক জবাবের অপেক্ষা করছি। খানছয়েক পাবো আশা করি। তার ভেতর থেকে যাদের বাড়ি রান্নাবান্না ভালো এবং ঝালটাল একটু কম খায়—এইরকম একটা বেছে নিতে হবে। নিমন্ত্রণ রক্ষা করা সোজা নয় তো!' **কিশোর ভারতী**

রং মশাল/ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭। রচনাকাল ১৯৪০
সংগ্রাহক : রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

ছবি : সৌজন্য চক্রবর্তী

নবীনচন্দ্র তার নাতনি ডালিয়াকে নিয়ে প্রত্যেকদিন পার্কে জগিং করতে বেরোন। এই সাতষট্টি বছরের দাদামণি আর এগারো বছরের ডলকে যারা দেখে তারাই কুর্নিশ করে। বাব্বা, কী দম! একদিনও কামাই নেই। আর কী বন্ধুত্ব দু'জনের। তিন রাউন্ড দৌড়ে দাদামণি বেঞ্চে বসে বিশ্রাম নেন। কিন্তু ডলের ওসব বিশ্রাম-টিশ্রামের ব্যাপার নেই। হাঁফিয়ে না ওঠা পর্যন্ত সে দাঁড়ায় না।

এরকমই জগিং করতে করতে ডালিয়ার আলাপ হয় নীলাদ্রি সেনগুপ্তর সঙ্গে। নীলাদ্রি একজন ভেটেরেনরি ডাক্তার। তাঁর কাছ থেকে সে কয়েকদিন ধরে অনেকরকম গল্প শুনল। আর সেই সব শুনে নীলাদ্রি আঙ্কলের হাত ধরে টানতে টানতে দাদামণি যে বেঞ্চিতে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন সেইখানে নিয়ে এল একদিন।

এসেই সে বলে উঠল, 'আমাকে একদিন নিয়ে যেতেই হবে। কোনও কথা শুনব না।'

বিনতা রায়চৌধুরী

জিনিয়াসেরও জিনিয়াস

ছবিঃ স্যমন্তক চট্টোপাধ্যায়

নবীনচন্দ্র একবার তাঁর ডলের মুখের দিকে তাকালেন, একবার এই আগন্তুক ভদ্রলোকের দিকে। ডালিয়া তখন দু'জনের আলাপ করিয়ে দিল।

নীলাদ্রিই ডলের দাদামণিকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন, 'আমার একটা প্রাইভেট চিড়িয়াখানা আছে। ঠিক চিড়িয়াখানা বললে ভুল হবে, পশু-পাখির জন্য একটা রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার। আপনার নাতনি শ্রীমতী ডালিয়া সেই চিড়িয়াখানাটি দেখতে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।'

ডালিয়া তার নামের আগে 'শ্রীমতী' শুনে রীতিমতো সম্মানিত। কারণ ওই শব্দটি সে সাধারণত মায়ের আর পিসিমণির নামের আগেই শুনতে অভ্যস্ত। নীলাদ্রি সেনগুপ্তর ওপর তার ভক্তি-শ্রদ্ধা আরও বেড়ে উঠল। তার সঙ্গে দাদামণির কাছে আবদারের গুরুত্বও।

তখন ডাক্তার নীলাদ্রি নিজেই নবীনচন্দ্রকে বললেন, 'আসুন না একদিন আপনারা আমার চিড়িয়াখানায়। আশাকরি ভালোই লাগবে।'

নবীনচন্দ্র কথা দিলেন, শিগগিরই যাবেন একদিন।

২

সব ঠিকঠাক করে নবীনচন্দ্র এক রবিবার ডলকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাওয়া ঠিক করলেন। ডালিয়ার মা বলল, 'বাড়িতে বসে থেকেই বা কী হবে, ডালুর সঙ্গে আমিও যাই।' পিসিমাও এদের সঙ্গ নিলেন, 'আমিই বা একা বাড়ি থেকে কী করব। ডালুর জন্য চিন্তা হবে শুধু শুধু। তাছাড়া চিড়িয়াখানা দেখতে কার না ভালো লাগে?'

ব্যস। ডালিয়া একহাতে মা, অন্য হাতে পিসিমণিকে ধরে দাদামণির ঘরে হাজির হল। দাদামণি কিছুটা অবাক সুরে বলে উঠলেন, 'কী ব্যাপার! তিন শ্রীমতী একসঙ্গে?

'ইয়েস দাদামণি। এই তিন ''শ্রীমতী''কে নিয়ে একজন ''শ্রী'' চিড়িয়াখানায় চলবে।'

'তা চলুক। কোনও আপত্তি নেই। তবে কিনা, এদিকে একটু অসুবিধা দেখা গেছে।'

'অসুবিধা? যাওয়া হবে না?'

'তা ঠিক নয়। আসলে নীলাদ্রির সঙ্গে আগে থেকে সব কথা হয়েই আছে, কিন্তু একটু আগে তিনি ফোন করে জানালেন, একটা বিশেষ কারণে নিজে ওখানে উপস্থিত থাকতে পারবেন না। তার জন্য কোনও অসুবিধা হবে না। এও বললেন, ওখানকার কেয়ারটেকার মনোরঞ্জন সব দায়িত্ব নিয়ে দেখাবে।'

'তাহলে আর অসুবিধা কোথায়? কী মজা!'

অনেকটা রাস্তা। সেই ক্যানিং পেরিয়ে যেতে হয়। ডালিয়ার মা বলল, 'এটা একটা লং-ড্রাইভ হল।'

ডালিয়া হাততালি দিয়ে বলে উঠল, 'তাই? তাহলে তো লং ড্রাইভে থেমে খাওয়া-দাওয়া করতে হবে।'

পিসিমণি বাধা দিলেন, 'ডালু, দিনে দিনে বরং চিড়িয়াখানাটা দেখে আসি।'

পাঁচিল ঘেরা ছোট বাগান। বাইরে থেকে মনেই হয় না, ভেতরে চিড়িয়াখানা আছে। এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে হাত জোড় করে দাঁড়াল, 'নমস্কার। আমি মানব। এই বাগানের দেখাশোনা করি, প্রাণীদেরও। স্যার আমাদের সব বলে রেখেছেন।'

'আমিই সেই ছোট দিদিমণি ডালিয়া। আর এরা আমার মা আর পিসিমণি।'

প্রথমেই চোখে পড়ল বড় বড় আমগাছ। সারি দিয়ে কলা বন। আরও অনেকরকম গাছ। আর গাছের মধ্যে মধ্যে খাঁচায় নানারকম পাখি। খাঁচার জাল এত সূক্ষ্ম আর মিহি যে মনে হবে পাখিরা গাছের সঙ্গেই আছে।

মানব হাত দিয়ে দেখাল, 'বহু রকম পাখির আশ্রয়। চলুন আগে পাখিদের দেখাই।'

'পাখিরাশ্রয় বললেন যেন?'

নবীনচন্দ্রর জিজ্ঞাসায় মানব হেসে ফেলল, 'ডাক্তারবাবু সবাইকেই আশ্রয় দেন। বলেন, মানুষের মনের খোঁজ তো পাওয়াই যায়। ওদের ভাষা আছে। কিন্তু পশু-পাখির মনের খোঁজ পাওয়া মুশকিল।'

প্রচুর পাখি আছে এখানে। সব পাখিদের শেষে একটা খাঁচায় একটা কাক বসে আছে দেখে বলে উঠলেন নবীনচন্দ্র, 'কাক পুষেছেন নাকি তোমার ডাক্তারবাবু?'

মানব হেসে মাথা নাড়ল, 'না। কাকটা আহত হয়ে বাগানে পড়েছিল। ''খ্যা-খ্যা'' মতো আওয়াজ করছিল। ডাক্তারবাবু বললেন, ওকে শিগগির তুলে এনে একটা খাঁচায় রাখো। নইলে অন্যেরা ঠুকরে দেবে। 'তারপর?'

'তারপর ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, ওর একটা ডানায় লেগেছে। আমি ড্রেসিং করে দিলাম, তুমি একটু যত্ন করো। উড়তে পারলে ছেড়ে দেব।'

একটা বড় হল ঘরে এসে পৌঁছল ওরা।

এখানে এসে সব্বাই চমকে গেল। আরে! ছোট ছোট অসংখ্য খাঁচা। আর তার মধ্যে কুকুরছানা। প্রত্যেকটা খাঁচায় একটা করে ছানা। নানা বয়সি। নানা টাইপের।

মানব দেখাতে লাগল, 'এটা স্প্যানিয়াল, এটা স্পিজ। এটা অ্যালসেশিয়ান, এটা...।'

'আলাদা আলাদা করে আলাদা আলাদা খাঁচায় কেন?'

'এরা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা প্রজাতির। প্রত্যেকের জীবনধারণ এবং জীবন যাপন আলাদা। ওই দিকে দেখ।'

ডালিয়ারা হলের বাইরের চত্বরে তাকিয়ে দেখল, কী কাণ্ড! শেড-এর নীচে অনেকগুলো উনুনে রান্না হচ্ছে। রান্নার জিনিসগুলো প্রায় একই ধরনের। ভাতের মতোই দেখতে, কিন্তু শুধু ভাত নয়। রসুইকররা বড় বড় হাতা দিয়ে নাড়াচ্ছে।

ডালিয়ার মা না বলে পারলেন না, 'মনে হচ্ছে কুকুরদের জন্য ভাত বা অন্য কিছু রান্না হচ্ছে। কিন্তু এত ভাগে কেন?'

'তার কারণ এদের প্রত্যেকের ডায়েট আলাদা। কবে, কখন, কী—সব ডাক্তারবাবু ঠিক করে দেন।'

পিসিমণি গালে হাত দিয়ে বলে উঠলেন, 'ওমা, আমরা তো জানি কুকুররা মাংস ভাতই খায়।'

মানব হেসে উঠলেন, 'ম্যাডাম, কত বিদেশি কুকুর আছে, একেবারে রেয়ার স্পেসিমেন প্রজাতির। যদি ভুল করেও নুন মিশে যায় খাবারে, ওর লোম খসে যাবে।'

ডালিয়ার মা জিগ্যেস করলেন, 'এত কুকুর ছানা নিয়ে কী করেন ডাক্তারবাবু?'

উত্তরটা নবীনচন্দ্র দিলেন, 'নীলাদ্রি আমাকে বলেছেন উপযুক্ত খরিদ্দার পেলে বিক্রি করে দেন। তবে বিভিন্ন শর্তাবলীসহ ফর্ম ফিলআপ করতে হয়।'

'বিক্রি করেন কেন? এমনিই দিয়ে দিতে পারেন।'

'এমনিই দিয়ে দিলে, লাইন পড়ে যাবে। যারা নিয়ে যাবে বাইরে গিয়েই চড়া দামে বিক্রি করে দেবে। তাছাড়া ডাক্তারবাবু বলেন, বিনামূল্যে কিছু পেলে তার কদর করে না কেউ। আমাদের চিড়িয়াখানাটা চালানোর কথাও ভাবতে হবে, তাই না?'

ডালিয়া বলে উঠল, 'দাদামণি, এই কুকুরছানা কিনে দাও না আমাকে। আমি পুষব।'

'না।' মা বললেন, 'খুব মায়া পড়ে যায়! কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে সে সন্তানশোকের সমান হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না বিশাল হ্যাপা।'

ওরা একটা বড় খাঁচার সামনে দাঁড়াল। খাঁচার মধ্যে সাতটা খরগোশ। কী সুন্দর দেখতে। ছুটোছুটি করে খেলছে। মেঝেটা বালি দিয়ে ভর্তি।

'এরা কী করে এল এখানে? কিনে এনে রেখেছেন?'

'না-না, ওদের দান করেছেন এক ভদ্রমহিলা।'

'ভদ্রমহিলা!'

হেসে ফেললেন মানববাবু, 'শুনুন তাহলে। ভদ্রমহিলার মেয়ে একবার বায়না করে দুটো বাচ্চা-বাচ্চা খরগোশ কিনে এনেছিল। ডালিয়ার মতোই সে। সেই খরগোশ যে বেড়ে বেড়ে চব্বিশটা হয়ে যাবে সেটা সে নিজেও ভবেনি, তার মায়েরও মাথায় আসেনি।'

'তারপর ওরা বাড়তেই থাকল?'

'হ্যাঁ, বাড়তেই থাকল। ভদ্রমহিলা আর পেরে উঠছেন না। বন্ধু-বান্ধবকে ডেকে ডেকে বলতেন, 'এই তোমরা কেউ খরগোশ নেবে?'

বাড়ির বুড়ি রাঁধুনিকে দুটো খরগোশ দেওয়া হল তার নাতির পোষার জন্য। ড্রাইভারকে দেওয়া হল চারটে, তার মেয়ের জন্য। এভাবে একে ওকে দান শুরু হল। তাও বাকি রয়ে গেল সাতটি খরগোশ।'

'এই সাতটা?'

'হ্যাঁ। ডাক্তারবাবুর শরণাপন্ন হলেন ভদ্রমহিলা। ডাক্তারবাবু রাজি হলেন।'

ডালিয়া ওদের গল্প শুনে আর কেঁদে ফেলে আর কী! প্রতিজ্ঞা করে, 'আমি কখ্খনো কিছু পুষতে চাইব না মা।'

ওরা আর একটু এগিয়ে দেখল একটা কাচের ঘর।

সেই কাচের ঘরে একটা বড় সাপ শুয়ে আছে। ওদের পায়ের আওয়াজে উঠে বসল। খাঁচার ধারে চলে এল, আবার ফিরে গেল। কেবলই ঘোরা ফেরা করতে লাগল।

'সাপ কেন রেখেছেন ডাক্তারবাবু? এও কী পোষ্য, নাকি পণ্য?'

'কোনওটাই না। অন্যদের বাঁচানোর জন্য একে ধরে রেখেছেন। সাপটি খুবই নিরীহ, বিষধর হলেও কামড়ায় না। তবে এখানকার আবাসিকরা তো সেই ভরসায় থাকতে পারে না। এ এখান থেকে যাবে না। এখানেই খুঁজে খুঁজে ফেরে তার সঙ্গিনীকে। বেচারা জানে না, সঙ্গিনী মারা গেছে। ডাক্তারবাবু একে সযত্নে রক্ষা করছেন, বলেন, সঙ্গিনী খুঁজে পেলে তার সঙ্গে গভীর জঙ্গলে ছেড়ে আসব।

'সব আবাসিকরাই তো জিনিয়াস মানববাবু।'

'আসল জিনিয়াসকে দেখাই চলুন। কুকুরের ডাক শুনছেন না?'

'শুনছি তো, আপ্রাণ ডাকছে কুকুর। কেন বলুন তো?'

'এদিকে আসুন।'

মানববাবু অন্যদিকে গেলেন। একটা বড় খাঁচার মধ্যে একটা কালো কুচকুচে হাউন্ড। চিৎকার করে ডাকছে। আছড়ে পড়ছে গরাদের ওপারে। আবার ডাকছে। বিরামহীন ডাক। কতরকমভাবে ডাকছে। কখনও যেন উল্লসিত, কখনও বিনীত, কখনও অধৈর্যের, আবার কখনও তার চিৎকারে মিশে যাচ্ছে কান্না।

পিসিমণি জিগ্যেস করল, 'ও এভাবে ডাকছে কেন?'

'মনে করছে ওর প্রভুরা বুঝি কেউ এল।'

'কেন? ও নিশ্চয়ই ওর মালিককে চেনে। আমাদের দেখে চেঁচাবে কেন?'

'ও তো চেনে স্পর্শ দিয়ে। অচেনা পায়ের শব্দ হলেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে আর ডাকে—এসো, আমার কাছে এসো। ছোঁও আমাকে। ওর নাম জিনিয়াস। আজ ও বেচারা, কৃপাপ্রার্থী। প্রভুর স্পর্শের জন্য লালায়িত। গরাদে মুখ রেখে ডেকেই চলেছে ডেকেই চলেছে।'

নবীনচন্দ্র বলেই ফেললেন, 'এমন মূর্খ কুকুর তো জীবনে দেখিনি। রাস্তার নেড়ি কুকুরও মানুষ চেনে। আর এ আমাদের দেখে মনে করছে আমরা ওর প্রভু?'

'দেখতে পেলে তো চিনবে? ও তো অন্ধ!'

'সে কী...!' সকলের মুখ থেকেই এই একটা শব্দ বেরিয়ে এল।

'হ্যাঁ। জিনিয়াস ছিল দুর্দান্ত হাউন্ড। বাড়ির ছেলে জিদান যেমন ভালোবাসত ওকে, তেমনই শিক্ষিত করে তুলেছিল। সকলে বাড়ি থেকে কোথাও ঘুরতে গেলে জিনিয়াসকে বাড়িতে ছেড়ে রেখে যেত।

কিন্তু মানুষের হিংস্র বুদ্ধির কাছে কেউই দাঁড়াতে পারে না।

একরাতে বাড়ি খালি ছিল। ডাকাতের দল বাড়ির দরজা ভেঙে ঢোকার চেষ্টা করে। জিনিয়াসের প্রবল ডাক ওদের চমকে দিয়েছিল। ওরা সঙ্গে সঙ্গে দরজার তলা দিয়ে কুকুরকে চুপ করানোর জন্য ওষুধ স্প্রে করে।

জিনিয়াস কাবু হয়ে পড়লেও চুপ করে না। যতবার চোরের দল দরজায় হাত দেয়, ততবারই চিৎকার করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ওরা একটা স্মোক বম্ব টাইপের কিছু ঘরের মধ্যে ছুঁড়ে দেয়। তাতেও জিনিয়াস মুখ বন্ধ করে না।

যখন বাড়ির লোক ফিরে আসে তখন নেতিয়ে পড়া জিনিয়াসকে আবিষ্কার করে দরজার সামনে। জিদান তার প্রিয় জিনিয়াসকে নিয়ে ভেটেরেনারি হাসপিটালে ছুটে যায়। বাঁচার আশা ছিল না জিনিয়াসের, তবে বেঁচে গেল। কিন্তু অন্ধ হয়ে গেল জিনিয়াস।

বাড়ির লোকের বোঝা হয়ে উঠল সে। কতদিন সহ্য করবে লোকে? কিন্তু কীভাবে সরাবে বাড়ি থেকে? জিদান ওকে বাড়ি থেকে সরাতে কোনোমতেই রাজি নয়। শেষ পর্যন্ত ড. নীলাদ্রি সান্যালের সঙ্গে ওদের দেখা হয়। ডাক্তারবাবু ওকে এখানে আনার প্রস্তাব দেন। সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। সেই থেকে জিনিয়াস এখানে।'

'বাড়ির লোকেরা আসত?'

'হ্যাঁ, আসত বইকি! প্রথম প্রথম খুব আসত। শেষ দিকে শুধু জিদানই আসত। আর বললে বিশ্বাস করবেন না, জিনিয়াস সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারত। তখন তার কী লম্ফ-ঝম্ফ! 'তারপর আসা বন্ধ করে দিল জিদান?'

'না, তা নয়। জিদান বোম্বে আই-আই-টি-তে পড়তে চলে গেল। যাওয়ার আগে দেখা করতে এসেছিল। অনেকক্ষণ কোলের কাছে রেখে আদর করেছিল। তারপর চলে যাওয়ার সময় জিনিয়াস কী করেছিল, না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। প্রভুর পায়ে ধরে কাঁদছিল। জিদানও কাঁদছিল। যাওয়ার সময় বলে গেল, 'ওকে দেখবেন। বাড়ি এলে, আমি আসব।'

ডালিয়ার পিসিমণি বললেন চোখ মুছতে মুছতে, 'ব্যস, শেষ?'

'হ্যাঁ, প্রায় তাই-ই। একবার ফোনে স্পিকার অন করে কথা বলতে চেষ্টা করেছিল জিদান। কিন্তু তাতে হিতে-বিপরীত হয়েছিল। জিনিয়াস ভাবল, তার মালিক এসেও কেন তাকে কাছে টানছে না, ছোঁয়া দিচ্ছে না? উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। জিনিয়াস কী করে আধুনিক প্রযুক্তি বুঝবে? জিদান বলেছিল, আমি এরপর আপনাদেরই ফোন করে জেনে নেব।'

দেখল, অনেকক্ষণ চিৎকার করে খাঁচার একপাশে নিজের থাবার ওপর মুখ রেখে বসে আছে জিনিয়াস। ও বুঝে গেছে, এরা কেউ ওর বাড়ির লোক নয়।

ডালিয়ার যে কী হল, ও খাঁচার সামনে এগিয়ে গিয়ে বলে উঠল, 'হাই জিনিয়াস।' কান দুটো খাড়া করে উঠে দাঁড়াল জিনিয়াস।

'আই অ্যাম ডালিয়া। আই অ্যাম নট ইওর মাস্টার। বাট আই লাভ ইউ জিনিয়াস।' জিনিয়াস গরাদে মুখ রেখে তিনবার ডাকল।

মানবরঞ্জন বললেন, 'তোমার সম্ভাষণের উত্তর দিল জিনিয়াস। বলেছিলাম না, খুব ভদ্র।'

গাড়ি বাড়ির দিকে ফিরছে। দিনটা প্রায় শেষ। সবাই চুপ।

দাদামণি নীরবতা ভাঙলেন। বললেন, 'সত্যি, ওর জিনিয়াস নাম সার্থক। কী বলিস্ ডল?'

ডালিয়া চোখ মুছে বলল, 'ওখানে যারা থাকে, তারা তো সকলেই জিনিয়াস দাদামণি। কিন্তু দ্যাট ভেরি জিনিয়াস, জিনিয়াসেরও জিনিয়াস। ও তিনবার শুধু ডাকেনি, আমাকে 'হ্যালো' বলেছিল। আমি স্পষ্ট শুনেছিলাম।' কিশোর ভারতী

অভীক মুখোপাধ্যায়

কায়নাত মঞ্জিল

এ বাড়িতে নয়ন হাতেগোনা ক'বার মাত্র এসেছে। শেষবার এসেছিল আট বছর আগে। গ্রামের নির্জন প্রান্তে, পাহাড়ের কোল ঘেঁষে সবুজ উপত্যকার ওপর তিনতলা পেল্লায় প্রাসাদ। সামনে অন্তত একশো স্কোয়ার মিটারের ঘাস চকচকে বিশাল বাগান জুড়ে ফুটে থাকে চোখ জুড়ানো ফুল। কায়নাত মঞ্জিল। একটা পিচ ঢালা সরু পথ গেটের সামনে দিয়ে চলে গেছে সর্পিল বাঁক নিয়ে। রাস্তার অপর পারে একটা দিঘি।

জাহিদ চৌধুরীর আমন্ত্রণ পেয়ে নয়ন এবারে দেশে একাই এসেছে ইউএস থেকে।

প্রশ্ন হল জাহিদ চৌধুরীটা কে? নয়নের সঙ্গে তাঁর কী-ই বা সম্পর্ক?

জাহিদ চৌধুরীর প্রপিতামহ শাহনওয়াজ চৌধুরী ছিলেন এ-তল্লাটের জমিদার। কায়নাত মঞ্জিল হল তাঁর বসতভিটে। শাহনওয়াজ চৌধুরীর আবার শিকারের প্রচণ্ড নেশা ছিল। কায়নাত মঞ্জিলের দেওয়ালে দেওয়ালে শোভা পাচ্ছে শাহনওয়াজ চৌধুরীর হাতে প্রাণ-হারানো বাঘ, হরিণ, বুনো মোষের মাথা কিংবা চামড়া।

জমিদারি চলে গেলেও জাহিদ চৌধুরীর জীবনযাপন বিলাসবহুল। পরদাদা, দাদাহুজুর, আব্বাজান যা রেখে গেছেন, তা এই জন্মে শেষ হওয়ার নয়।

জাহিদ চৌধুরীর বাবা রশিদ চৌধুরী আর নয়নের বাবা হীরক সরকার ছিলেন অভিন্নহৃদয় বন্ধু। জাহিদ ডাকতেন হিরু কাকা বলে। নয়ন যখন মায়ের গর্ভে, তখনই হীরক সরকারের অকালমৃত্যু হয়। রশিদ চৌধুরী কথা দিয়েছিলেন, 'দিদিভাই, ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনও চিন্তা করবেন না।' নিজের কথা রেখেছিলেন রশিদ চৌধুরী। অবশ্য সে দিন দেখার জন্যে

ছবিঃ কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল

বেঁচে থাকেননি নয়নের মা-ও। ছেলেকে জন্ম দিয়েই চিরদিনের জন্য চোখ বুজেছিলেন। মা-বাপ হারা নয়নকে পড়াশোনা করানোর জন্যে বিদেশেও পাঠিয়েছেন নিজের খরচে। নয়ন ওখানেই সেটল হয়ে যায়। রশিদ চৌধুরীর মৃত্যুর পরে পরিবার এবং পারিবারিক সম্পত্তির রাশ তাঁর একমাত্র ছেলে জাহিদের হাতে আসে। জাহিদের সঙ্গেও সুসম্পর্ক নয়নের।

মাস খানেক আগে হঠাৎই একদিন জাহিদ চৌধুরী নয়নকে জানালেন, ভাই, আমাদের বাড়িটা বিক্রি করে দিতে চলেছি। তোমাকে যে একবার আসতে হবে।

আমাকে? কেন?

বাবা উইলে তোমাকে এই বাড়ির অর্ধেক মালিকানা দিয়ে গিয়েছিলেন। তাই বাড়ি বেচতে গেলে তোমার সইসাবুদের দরকার।

কায়নাত মঞ্জিলে তার অংশীদারি আছে, অবাক নয়ন। রশিদ চৌধুরী মানুষ, নাকি দেবতা? বাবার বন্ধু হয়ে তিনি বাবার সব দায়িত্ব পালন করে গেছেন। আবার নিজের বসতবাড়ির অর্ধেকটাও দিয়ে গেছেন তাকে!

বায়না আগেই নেওয়া হয়ে গিয়েছিল এ-বাড়ির। বাকি টাকাটা দিয়ে ক্রেতা সইসাবুদের পালা মিটিয়ে নিয়েছেন। বাড়ি এখন আর জাহিদ চৌধুরী, নয়ন সরকারের হাতে নেই। টেকনিক্যালি হস্তান্তর হয়ে গিয়েছে। শুধু আসবাবপত্র সরাতে কিছু সময়ের দরকার। ক্রেতা বলেছেন, 'আপনার যা সময় লাগে নিন।'

আর কোনও কাজ বাকি নেই। আজ কায়নাত মঞ্জিলে শেষ রাত। আগামীকাল জাহিদ চৌধুরী চলে যাবেন কোলকাতার ফ্ল্যাটে, আর নয়ন ফিরে যাবে স্টেটস্-এ।

একলাই থাকেন জাহিদ। বিয়েথা করেননি। নরম মেজাজের মানুষ। হাসিখুশি চেহারা। লম্বাটে মুখ। পাকানো শরীরে মেদ নেই। মাথার চুলগুলো শনের নুড়ির মতো সাদা। বয়েস কিন্তু মেরেকেটে পঞ্চাশ।

এমন জায়গায় ভূতের গল্প ভালো জমবে, দাদা। নয়ন জাহিদ ভাইকে দাদা বলেই সম্বোধন করে।

ভূতের গল্প...? এগারোটা বাজে। রেডিয়াম ডায়ালের ঘড়িটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন জাহিদ ভাই। রাতের খাওয়া সেরে বাগানটাতে চেয়ার পেতে বসেছেন দুজনে।

জাহিদ ভাই আকাশের দিকে তাকিয়ে।

কী দেখছেন, দাদা?

চাঁদ খুঁজছি। হিসেব মতো আজ পূর্ণিমা হওয়ার কথা।

অ। কিন্তু আপনি যেভাবে চাঁদ খুজছেন, তাতে মনে হচ্ছে ভূতের সঙ্গে চাঁদের একটা সম্পর্ক আছে।' হেসে উঠল নয়ন।

আছে বইকি। এই গল্পে অবশ্যই আছে।

ভূতের সঙ্গে অমাবস্যার চাঁদের কিছু সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে। তাই বলে চাঁদনি রাতে...

কথাটা শেষ করতে দিলেন না জাহিদ চৌধুরী। বললেন, চন্দ্রাহত শব্দটা শুনেছ?

না। ইংরেজি মাধ্যমের বোর্ডিং স্কুলে পড়েছে নয়ন। তারপর বিদেশে। বাংলা ভাষা নিয়ে চর্চার সুযোগ তার হয়নি।

হ্যাভ ইউ এভার হার্ড দ্য ওয়ার্ড লুনাটিক?

হ্যাঁ। লুনাটিক মানে পাগল।

অতটাও সরলীকরণ করো না। বলা হয়, যারা উন্মাদ, তারা নাকি পূর্ণিমার রাতে ভরা জোছনা দেখলে নিজেদের মনটাকে বশে রাখতে পারে না।

নয়ন কিছু বলল না। কী বলতে চাইছেন জাহিদ ভাই? আশপাশ ভারী হয়ে উঠেছে বাগানের হাসনুহানা ফুলের গন্ধে। বাতাস এই সুগন্ধ পিঠে করে নিয়ে যাচ্ছে পাহাড়চুড়োর দিকে।

দুহাতে ব্যাকব্রাশ করা চুলগুলোয় হাত বুলিয়ে নিলেন জাহিদ ভাই। মুখচ্ছবিটা পানসে পানসে। ফ্যাসফ্যাসে স্বরে বললেন, হিরু কাকা কীভাবে মারা গিয়েছিলেন জানো, নয়ন?

করোনারি থ্রম্বোসিস। একথাই শুনে এসেছে নয়ন।

এটা সত্য নয়। তোমার বাবার মৃত্যুর পেছনে একটা ঘটনা আছে।

বাবা...নয়নের মুখে কথা সরছে না।

হুম। তোমার বাবার মৃত্যু স্বাভাবিক ছিল না।

জন্মের আগে বাবাকে আর জন্মের পর পরই মা'কে হারিয়েছি। তারপর আপনিই আমার অভিভাবক। আমি অবাক হচ্ছি আমার নিজের ইতিহাসকে আমার কাছ থেকেই এভাবে গোপন করা হয়েছে জেনে। প্লিজ, বলুন।

আবার একবার ঘড়িটা দেখে নিলেন জাহিদ ভাই। এগারোটা পাঁচ। দমকা হাওয়া ভেসে এল একবার। সঙ্গে তাজা ফুলের আঘ্রাণ। ঠিক আছে। আজ সব বলব। যা শুনবে, তা সত্যি ঘটনা। কিছু মানুষের উপস্থিতিতে ঘটেছিল। কিন্তু সেইসব সাক্ষীরা আজ আর কেউই জীবিত নেই। তাই প্রমাণ করার সমস্ত পথ বন্ধ। আমি গল্পের ছলে প্রতিটা চরিত্রের নামধাম বদলে বলব, যাতে তুমি প্রথম থেকেই তাদের সম্পর্কে কোনও খারাপ ধারণা পোষণ না করো। কারণ তুমি তাদের চেনো কিংবা চিনবে।

ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের মধ্যে থেকে চাঁদ উঁকি মারছে। ছায়া পড়ছে বাগানে। হাওয়ায় মাতোয়ারা ফুলের দল অকাতরে খোশবাস লুটোচ্ছে।

যা বলব, তা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিনি। অন্যের মুখে শোনা। চাঁদের মরা আলো এসে পড়ল জাহিদ চৌধুরীর মুখে।

কার মুখে শুনেছিলেন?

ধরে নাও, তাঁর নাম সঙ্কেত ধর। তিনি হিরুকাকার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন।

কবেকার ঘটনা এটা? নাকি সেটাও বলা যাবে না?

নাহ্। সময় লুকোনোর কোনও প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র স্থান আর পাত্র বদলে দিয়ে গোপনীয়তা রক্ষা করলেই চলবে। উনিশশো উননব্বই-এর জানুয়ারি মাসের কথা।

আমার জন্মের ছ'মাস আগের।

রাইট। এই যে সঙ্কেতবাবুর কথা বললাম, ইনি সমাজের অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের একজন উচ্চ প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি ছিলেন। দেদার অর্থ। বিশাল সম্পত্তি। যে বাড়িতে থাকতেন, সেটা একদম প্যালেসের মতো।

প্যালেস শুনেই নয়ন একবার মুখ তুলে তাকাল কায়নাত মঞ্জিলের দিকে—তিনতলাটাকে ঘিরে যেন ধূসর কুয়াশা জমছে। সত্যিই কিছু ঘটছে নাকি বেবাক চোখের ভুল?

নয়নের চোখ পড়ে ফেলেছেন জাহিদ ভাই। হাসলেন। বললেন, 'সেই বাড়িটাও কিন্তু কায়নাত মঞ্জিলের মতোই বিশাল ছিল। কড়ি আর বরগার ঘর। বড় বড় দরজা জানলা। কাঠের সিঁড়ি। সিঁড়ির রেলিং-এর প্রান্ত পেতল দিয়ে বাঁধানো। আর বাড়ির সামনে এমনি বড় বাগান।

সঙ্কেত ধর হিরু কাকাকে চিঠি লিখেছিলেন। পত্রপাঠ হিরু কাকা তাঁর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। চিঠিতে লেখা ছিল, বড় বিপদ। তুমি এখুনি এসো।

সবাই ভাবে, ধন-দৌলত মানুষকে সুখী করে তোলে। ভুল। মিথ্যে। সুখ এমন এক মানসিক অবস্থা, তা কোনও কিছুর বিনিময়ে কেনা যায় না। অন্তর থেকে না এলে কৃত্রিমভাবে তৈরি করা অসম্ভব। হিরু কাকা সঙ্কেতবাবুর বাড়িতে গিয়ে যা দেখলেন, তা তাঁকে অবাক করে দিল। চার দেওয়ালের মধ্যে তাঁরা একটা ভয়ানক সত্যকে গোপন করে রেখেছিলেন। সঙ্কেতবাবুর একমাত্র ছেলে বাবু তখন মৃত্যুশয্যায়। কী

হয়েছে, তা কেউ বলতেই পারছিল না। হিরু কাকা দেখেই বুঝলেন, সে স্বাভাবিক নেই।

বাবুর তখন আঠেরো-উনিশ বছর বয়েস। তাগড়াই জোয়ান ছেলে। কিন্তু মাস চারেকের রোগভোগে তখন সে যেন একেবারে দড়ি পাকিয়ে গেছে। ওজন কমেছে বিচ্ছিরিভাবে। হাড্ডিসার। গায়ে রক্ত নেই বলে চামড়া বিবর্ণ। চামড়া কুঁচকে এমন অবস্থা যে শরীরের যে-কোনও অংশ ধরে টান দিলে সেটা আর স্বাভাবিক আকারে ফিরবে বলে মনে হয় না।

বাড়ির তেতলায় বাবুর ঘরে নিয়ে যাওয়া হল হিরু কাকাকে। সে তখন সারাদিন ধরে অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। যেটুকু সময় জাগছিল, কারো সঙ্গে কথা বলত না। মুখের ভেতর জিভটা ক্রমশ কালচে বর্ণ ধারণ করছিল। একটার পর একটা দাঁত পড়ে গিয়ে পচনধরা মাড়ি। মনে হচ্ছিল কেউ জ্যান্ত মানুষের চামড়া ছাড়িয়ে নিয়েছে। মুখে আর হাতে ফোসকার মতো তাজা ক্ষতমুখে রক্ত। মানুষ নয়, বাবু তখন যেন অশরীরী আত্মা!

বাবুর বাহ্যিক রোগলক্ষণ নিয়ে এগুলোই বললেন সঙ্কেতবাবু। বুঝলে হিরু, দুর্বল শরীর নিয়ে অন্যের সাহায্য ছাড়া সে এক পা-ও হাঁটতে পারছে না। কিন্তু পূর্ণিমার রাত এলেই ওর মধ্যে অস্বাভাবিকতা দেখা দিচ্ছে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে উন্মাদের মতো চিৎকার করে, প্রলাপ বকে। অশ্রাব্য কথার তোড়ে ওর ঘরে কেউ টিকতে পারছে না। গত পূর্ণিমায় তো...

হিরু কাকা সঙ্কেতবাবুকে জিগ্যেস করলেন, গত পূর্ণিমায় কী করেছিল বাবু?

কাঁপা কাঁপা হাতে তিনি বাবুর ঘরের একমাত্র জানলাটার দিকে আঙুল তুলে বললেন, বাবু ওই ওখানে গিয়ে বসেছিল।

জায়গাটা দেখে শিউরে উঠলেন হিরু কাকা।

ওখানে? জানলায়?

জানলার গবরাটে।

ওখানে বসে পা ঝুলিয়ে দিয়েছিল ভেতর দিকে? জানলাটায় তো গরাদ নেই? ওভাবে বসলে যে উলটে পড়ে যাবে তিনতলা থেকে?

ভেতরে বসে পা ঝোলায়নি। ওই বিটের ওপরে উঠে দুটো পা দিয়ে মুরগির মতো উবু হয়ে বসেছিল। কিচ্ছু না ধরে। মুখটা বাইরের দিকে ছিল।

বাইরে বারান্দাও নেই। কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার! তারপর? কীভাবে নামালে ওকে?

নামাতে পারিনি। ও নিজেই নামল।

যাক, বাবা! বড় কোনও বিপদ যে ঘটায়নি ছেলেটা!

এবারে সঙ্কেতবাবুর শরীরটা কাঁপতে শুরু করল। মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরোল না। চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে। দুর্বোধ্য এক ভেজা ভাষা সেখানে। হিরু কাকা শুধু এটুকুই বুঝলেন যে, সেদিন কোনও বড় অঘটন ঘটেছিল। তিনি সময় দিলেন বন্ধুকে। একটু ধাতস্থ হয়েই বলো নাহয়।

সঙ্কেতবাবু বলতে শুরু করলেন—

সেই রাতে বাবুর দাপাদাপি বেড়ে গিয়েছিল। অন্যদিন কিন্তু অতটাও বাড়াবাড়ি হয় না। আমি ঘরেই ছিলাম। একটু জল বাড়িয়ে ধরেছি মুখের কাছে, যদি তেষ্টা মিটলে আনচান ভাবটা কমে। ওমা, আমার বুকে সজোরে এক লাথি মারল বাবু। আমি ছিটকে মুখ থুবড়ে পড়লাম মেঝের ওপরে। নিজেকে একটু সামলে ঘুরে দেখি বাবু জানলার গবরাটে গিয়ে বসেছে। আমি তখন বাবু...বাবু...ও কী করছিস বলে ওকে ধরতে যাব কী, বাবু এক লাফ দিল একেবারে নীচে।

হায় হায় করতে করতে জানলার দিকে ছুটলাম। আমি তখন নিশ্চিত যে আমার ছেলেটা রক্তের স্রোতের মধ্যে নির্জীব মাংসপিণ্ড হয়ে পড়ে আছে।

কিন্তু যা দেখলাম, তাতে মাথা ঘুরে যাওয়ার জোগাড় হল। যে বাবু অন্যের সাহায্য ছাড়া এক পা চলতে পারছে না, সে কিনা এই তিনতলা থেকে লাফ মেরে পা দুটো ভাঁজ করে মাটি ছুঁয়েছে একেবারে শিকারী বেড়ালের কায়দায়। কিচ্ছু হয়নি। আর তারপর...

তারপর কী হল?

তারপর বাবু মাটিতে পা ভাঁজ করে বসে থাকা অবস্থাতেই আমার দিকে ঘুরে তাকাল। না। দেহটা ঘোরায়নি। মাথাটা...শুধু মাথাটা ঘোরাল। একেবারে একশো আশি ডিগ্রি। মনে হচ্ছিল, যেন অন্য কেউ জোর করে ওর মাথাটা ঘুরিয়ে দিচ্ছে পেছনদিকে। মুখে জোছনার রুপোলি আলো পড়ছে তখন। মুখে একটা পৈশাচিক হাসি। সে হাসির কোনও বর্ণনা আমি দিতে পারব না। আর ওর চোখ দুটো...উফফ্! চোখ দুটো—জ্বলে লাল হয়ে আসা কাঠের টুকরোয় কেউ ফুঁ দিয়েছে যেন। অন্তর পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয় সেই দৃষ্টি।

দেখে মনে হচ্ছিল ওর শরীরের নিয়ন্ত্রণ ওর হাতে নেই। অন্য কোনও শক্তি রাশ ধরেছে। ওভাবে বুকজ্বালানো দৃষ্টি দিয়ে আমাকে দেখতে দেখতে আচমকাই ও জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল। আমরা আবার ধরাধরি করে ওকে তুলে এনে বিছানায় শুয়ে দিলাম।

ডাক্তার, বদ্যিরা জবাব দিয়ে দিয়েছে। এই রোগের কোনও নিদান কারো কাছে নেই। সমস্ত রিপোর্ট ওকে। কেউ কোনও কূলকিনারা পাচ্ছে না। ওরা বলছে, ছেলের মনের রোগ। ও নাকি পাগল। তুমি আমার প্রিয়তম বন্ধু। আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করো। আমি চির কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব। আমার ছেলেকে বাঁচাও।'

'বাবুর রোগ সেরেছিল? বাবা পেরেছিল?' নয়ন বলল ঘোরের মধ্যে শুনে চলেছিল জাহিদ চৌধুরীর কথাগুলো।

'তোমার বাবার ভারি মায়াময় চাহনি ছিল, নয়ন। এত মায়া। মানুষের দুঃখ দেখলে এত নিখুঁত টান। বন্ধুর ছেলের অমন ভয়াবহ দশা দেখে হিরু কাকা কিন্তু তাদের ফেলে পালালেন না। বললেন, এই বিপদ থেকে উদ্ধার করার মতো লোক একজন জানা আছে। আমি আজই তাঁর কাছে খবর পাঠাচ্ছি। যতদিন পর্যন্ত না বাবু ঠিক হচ্ছে, আমি এখানেই থাকব।'

সেই লোক এল?

হুম। এলেন।

তিনি কে?

একজন শাক্ত সাধক। দিন দশেক পর তিনি গভীর রাতে এলেন। এলাকা তখন সুনসান। নীরব। শুধু সঙ্কেতবাবুদের পুরোনো আমলের পাঁচিল ঘেরা বাড়িটা থেকে ভেসে আসছে চিৎকার চেঁচামিচির আওয়াজ। কান পাতলে শোনা যায় অকথ্য ভাষায় বাবু সমানে গালিগালাজ করে চলেছে।

রক্ত খাব, রক্ত। হাহাহা। সব কটাকে পুঁতে ফেলব। আমার জন্যে খাবার নিয়ে আসছিস? খাবার নয়, তোকে খাব। আয়! আয়! আয়! হাতের নাগালে আয়! ভয় পাস না।

এসবের মধ্যেই সেই সাধক লম্বা লম্বা পা ফেলে সঙ্কেতবাবুদের বাড়ির গেট ঠেলে ঢুকে বাগানের মধ্যে দাঁড়ালেন। তিনতলার ঘরের দিকে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ।

হিরু কাকা ততক্ষণে তাঁকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে আসবেন বলে ছুটে গেছেন। সাধকের দৃষ্টি লক্ষ্য করে তাঁকে বললেন, ওই ঘরেই রাখা হয়েছে বাবুকে।

জানি। মেঘের মতো গলায় সাধক কথাটা বললেন।

হিরু কাকা লজ্জায় জিভ কাটলেন। বাবা তো অন্তরের সব কথাই জেনে

গেছেন। মুখটা হাসি হাসি করে রেখেছেন হিরু কাকা। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে তাঁর মনেও শঙ্কা।

হীরক, আমায় ওই ঘরে নিয়ে চলো।

আসুন...আসুন।

দরজা ঠেলে বাবুর ঘরের ভেতরে পা রাখলেন সাধক। পেছনে হিরুকাকা। ঘরের মধ্যে খাবারের থালা ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন সঙ্কেতবাবু। বাবু সন্ধে থেকে বাড়াবাড়ি করছে দেখে তার হাত-পা বেঁধে রাখা হয়েছে। আজ পূর্ণিমা নয়, তাও সে যেন উম্মাদ হয়ে উঠেছে।

সাধককে দেখেই মাথা নামিয়ে নমস্কার করার চেষ্টা করলেন বাবুর বাবা। চোখে আর্দ্র আকুতি। হঠাৎ একটা খুনখুনে হাসি শুরু করল বাবু। সম্পূর্ণ অপরিচিত ঘষাটে মেয়েলি একটা গলায় বলল, তুই এসেছিস? আমি জানতাম তুই আসবি। আমি জানতাম।

সাধক দমবার পাত্র নন। তিনি হুঙ্কার দিলেন, ওসব ভেলকি আমায় দেখিয়ে লাভ নেই। কে তুই? এই ছেলেকে নিষ্কৃতি দে!

হাত পা বাঁধা অবস্থাতেই উঠে বসার চেষ্টা করল বাবু। পারল না। এবার তার দেহটা শূন্যে ভেসে উঠছে। পেট আর বুকটা উঁচিয়ে আছে। দৃশ্যটা দেখে ভয়ে সঙ্কেতবাবুর হাত থেকে ভাতের থালাটাই পড়ে গেল। ঝনঝন করে শব্দ হতেই বাবুর শরীরটা ধপ করে পড়ল বিছানার ওপরে।

সারা ঘর জুড়ে একটা পচা গন্ধ। হিংস্র অসুস্থ পশুর মতো আস্ফালন করছে বাবু। সারা গা জুড়ে লাল ছোপ ছোপ দাগ ফুটে উঠছে। অবিরাম গালির স্রোত বেরিয়ে আসছে তার মুখ থেকে।

সাধক শান্ত স্বরে বললেন, ওসব নোংরামি করে কিছু পাবি না। বল, কে তুই? এই ছেলে তোর কী ক্ষতি করেছে?

কথাটা শুনেই বাবুর চেহারা আরও বীভৎস হয়ে উঠল। পেশিগুলো তেজি সাপের মতো টানটান। কালো জিভটা সাপের মতো হিলহিল করে নাড়িয়ে বলল, বলব না। তুই খুঁজে নে।

তুই যেই হোস, শয়তান...আমি তোকে শেষ বারের মতো সাবধান করছি। একে ছেড়ে চলে যা। আমি যদি তোকে স্পর্শ করি, তুই যন্ত্রণা পাবি।

পরোয়া করি না। আমি যাব না। যাব না। যাব না...

যেতে হবে। তোকে যেতে হবে।

না। না। কিছুতেই না।

বাবুর গলায় এখনও সমানে অন্য কেউ কথা বলছে।

দাঁড়া, তোকে একটু ছুঁয়েই দেখি। সাধক আর কথা না-বাড়িয়ে নিজের ঝুলি থেকে মন্ত্রপূত সিঁদুর নিয়ে বাবুর কপালে স্পর্শ করালেন।

তোর ঘাড়ের রগ আমি কামড়ে ছিঁড়ে ফেলব। তোর সব রক্ত চুষে তোকে ছোবড়া বানাব। কথা বলতে-বলতে বাবুর রক্ত লাল চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। মুখটা আরও পাংশু হয়ে যাচ্ছে।

হিরু কাকা আর সঙ্কেতবাবু অবাক হয়ে দেখলেন সাধক স্পর্শ করামাত্র বাবু কেমন জবাই করা মুর্গির মতো তড়পাচ্ছে বিছানায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বাবু গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। ছোপ ছোপ দাগগুলো গায়েব। ঘরের মধ্যেকার সেই পচা গন্ধটা কেটে গেছে এবার।

সঙ্কেতবাবু সাধকের পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। গুরুদেব, আপনি আমার ছেলেটাকে বাঁচান। যা লাগবে বলুন। আমার অর্থের অভাব নেই। শুধু ওকে পুনর্জীবন দিন।

ধুর, বোকা! টাকা দিয়ে সব কেনা যায় নাকি? ওঠ। ওঠ। আমার পায়ে পড়ে লাভ নেই। ওপরওয়ালার পায়ে পড়, কাজ দেবে।

তখন সঙ্কেতবাবুর চোখের কোণে জমা জল। একটা নীরব ডাক ফুটে উঠেছে দৃষ্টিতে। পুত্রের জন্য পিতার আকুতি।

শোন, তোর ছেলে এক নিম্ন শ্রেণীর পিশাচের পাল্লায় পড়েছে। তার নাম চন্দ্রভুক। সে চাঁদের আলোয় উম্মাদ হয়ে ওঠে। আমি ক্ষণিকের জন্যে তাকে তাড়ালেও সে কিন্তু বাবুকে মুক্তি দেয়নি। আমার ধারণা সে আবার আসবে। আপাতত আমি একটা বন্ধন দিয়ে যাচ্ছি তোর ছেলের জন্য। তাতে কাজ হবে কিনা জানি না। আমি ফিরব হপ্তা তিনেক পরে। পূর্ণিমার রাতে তোর ছেলেকে নিয়ে বসব।

এরপর সাধক নিজের ঝুলি থেকে এগারোটা পেরেক বের করে হিরু কাকার হাতে দিয়ে বললেন, এগুলো কোনও সাধারণ পেরেক নয়। মন্ত্রসিদ্ধ। ছেলেটার খাটের চারদিকের মেঝেতে এই এগারোটা পেরেক একদম গেঁথে দাও। আমি এখানে আর বেশিক্ষণ থাকব না। এখনি আমার ফেরার ব্যবস্থা করো। প্রস্তুতি নিতে হবে। যুদ্ধ আসন্ন।

সাধকের কথা অক্ষরে অক্ষরে পালিত হল। তাঁর ফিরে যাওয়ার বন্দোবস্ত করে দেওয়া হল সঙ্গে সঙ্গে। আর পেরেকগুলো আমূল বিদ্ধ করে দেওয়া হল বাবুর ঘরের মেঝেতে।

সকালে বাবুর ঘরের দরজা খুলে হিরু কাকারা যা দেখলেন তাতে চক্ষু ছানাবড়া হওয়ার সামিল। বাবু নিজের বিছানায় অকাতরে ঘুমোচ্ছে। হাত আর পায়ের বাঁধন সব ছেঁড়া। আর মেঝেতে পুঁতে দেওয়া এগারোটা পেরেককে উপড়ে ফেলে রাখা আছে শানের ওপরেই। প্রত্যেকটা পেরেককে বাঁকিয়ে কেন্নোর মতো গুটি পাকিয়ে দিয়েছে কোনও অমানুষিক শক্তি।

এটা সরাসরি চ্যালেঞ্জ করা হয়ে গেল সাধকের শক্তিকে। সকলে নিরুপায়। সঙ্কেতবাবুদের কাছে সাধকের পথ চেয়ে বসে দিনগত পাপক্ষয় করা ছাড়া আর কোনও উপায় রইল না।

পূর্ণিমার আগের দিন সাধক আবার এলেন। তিনি প্রস্তুতি নিয়েই এসেছেন এবারে। রাতের খাওয়া সারার আগে তিনি সঙ্কেতবাবুকে বললেন, আজ ছেলেকে কিছু খেতে দেবেন না যেন।

অসহায় দৃষ্টি নিয়ে মাথা নেড়ে সাধককে হ্যাঁ বললেন সঙ্কেত ধর।

পরদিন সকাল থেকেই শুরু হল তোড়জোড়। প্রথমেই চুনের মতো সাদা কিছু দিয়ে গোটা বাড়িটাকে পরিধি করে দাগ দেওয়া শুরু করলেন সাধক। সঙ্গে বিড়বিড় শব্দে তিনি মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগলেন। অভিচার শেষ হতে সাধক বললেন, আজ এই বাড়ির ত্রিসীমানায় কাকপক্ষীও আসবে না। কোনও মানুষও আসবে না দেখবেন। তবে আমার এই বন্ধন কেবল সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। একমাত্র কোনও অস্বাভাবিক

কিছুই এর মধ্যে প্রবেশ করবে। এটা কোনও বন্ধন নয়। এ হল অপশক্তিকে চেনার চিহ্ন।

সত্যি সত্যিই সেদিন কেউ আর ও বাড়ির ছায়া মাড়াল না। যে দুধওয়ালা দুধ দিতে আসে, সেও কোনও এক অজানা কারণে বেপাত্তা। সন্ধে ঘনাতেই আকাশে উঠল রুপোর থালার মতো গোল একটা চাঁদ। এবার শুরু হবে আসল কাজ।

হিরু কাকা সাধককে এসে বললেন, ধুম জ্বর এসেছে বাবুর।

সাধক হাসলেন—হবে...হবে...আজ অনেক কিছু হবে। জ্বর আসবে, জ্বর ছাড়বে। অনেক কিছুই হবে।

বাগানে যজ্ঞের আয়োজন করেছেন সাধক। সমিধ দিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে তিনি প্রশান্ত মুখে বললেন, যাও, এবার তোমাদের ছেলেকে নিয়ে এসো এখানে।

সঙ্কেতবাবু আর হিরু কাকা মিলে বাবুকে ধরে ধরে আনলেন। চাঁদের আলো গায়ে পড়তেই সে মৃগী রোগীর মতো কাঁপতে শুরু করেছে।

বসাও ওকে।

যজ্ঞের আগুনে বাবুর মুখটা আরও বিবর্ণ লাগছে।

ক্রিয়া আরম্ভ করার আগে সাধক বললেন, তোমরা বাবুকে বসিয়ে এখান থেকে সরে দাঁড়াও। আমি তোমাদের গাত্রবন্ধন করে দিচ্ছি। মনে রাখবে, এখানে যাই ঘটুক, তোমরা নিজেদের জায়গা ছেড়ে একচুলও নড়বে না। একটু ভুলচুক হয়েছে কী, আর তোমাদের ছেলেকে আমি রক্ষা করতে পারব না।

নিজের কথামতো কাজ সেরে সাধক এবার পূজায় বসলেন। বাবুর বসে থাকার ক্ষমতা নেই। সে আধশোওয়া হয়ে রয়েছে।

শুরু হল যজ্ঞ। সুন্দর চাঁদের আলোয় কেঁপে কেঁপে উঠছে বাবুর দেহটা।

কিছুক্ষণ অমন চলার পর আচমকাই মনে হল বাতাস স্তব্ধ হয়ে গেছে। কোথাও কোনও শব্দ নেই। এমনকী বাগানে যেসব পোকামাকড়ের একঘেয়ে ডাক শোনা যাচ্ছিল, তারাও নিজেদের বুলি হারিয়ে ফেলেছে।

চোখ বন্ধ করে মন্ত্র বলে চলেছিলেন সাধক। এবার দপ করে চোখ খুললেন। বললেন, সে আসছে...সে আসছে...।

জান্তব একটা ডাক শোনা গেল খুব কাছেই। সবার দৃষ্টি আপনা আপনি চলে গেল গেটের দিকে। গেট খোলা। খুলেই রাখা হয়েছে কারো আগমনের জন্য। সে না এলে ফয়সালা হবে না যে।

দুটো জ্বলজ্বলে চোখ দেখা গেল গেটের মুখে। লাল অঙ্গার যেন। একটু একটু করে সেটা এগিয়ে আসছে। সকালে যে দাগ সাধক দিয়েছিলেন, তা অবলীলাক্রমে পার করে ভেতরে প্রবেশ করল।

একটা কুকুর। বীভৎস দেখতে। যেন সদ্য নরক থেকে উঠে এসেছে।

কুকুরটা এক পা, এক পা করে এগিয়ে আসতে লাগল হিরু কাকাদের দিকে।

বাতাস ভারী হয়ে উঠতে লাগল পূতিগন্ধে। অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসার মতো অবস্থা।

ভুক করে একটা শব্দ হল। কুকুরের ডাক। তারপর চাপা ক্রুদ্ধ গর্জন।

কিন্তু যে কুকুরটা এগিয়ে এসেছে সে করেনি। ডাকটা এসেছে গেটের দিক থেকে। আবার সবাই সেদিকেই তাকাল। আরেকটা কুকুর।

অবাক হওয়ার পালা তখনও শেষ হয়নি। আরও একটা কুকুর দাঁড়িয়েছে এসে। তার পেছনে আরও একখানা। একটা দুটো করে গুণতে গুণতে হিরু কাকা যখন শেষ করলেন, তখন সংখ্যা হয়েছে নয়। ন'টা কুকুর।

দাগ পেরিয়ে আসা কুকুরগুলো যে সাধারণ জীব নয় তা বোঝাই যাচ্ছে। থরথর করে কাঁপছেন সঙ্কেতবাবু। হিরু কাকা রুদ্ধশ্বাস হয়ে প্রতিটা মুহূর্ত পার করছেন।

অকস্মাৎ উঠে বসল বাবু। তার চোখজোড়া এখন রক্ত-লাল। মাথা চালতে শুরু করল আস্তে আস্তে।

দুলুনিটা ক্রমশ দ্রুত হচ্ছে বাবুর। সাধক এবার যজ্ঞের আগুনে কীসের যেন আহুতি দিলেন। সাদা ধোঁয়ায় ঢেকে গেল গোটা বাগান। সঙ্গে সঙ্গে গরর গর গর্জন করে প্রথম কুকুরটা এগিয়ে এসে বাবুকে লক্ষ্য করে লাফ দিল। তা দেখেই আশঙ্কায় বুদ্ধি লোপ হয়েছে সঙ্কেতবাবুর। তিনি দৌড়ে ছেলেকে বাঁচানোর জন্যে এগোলেন। সাধক সেই দৃশ্য দেখে হায় হায় করে উঠেছেন ততক্ষণে। হিরু কাকা অবস্থা সামাল দিতে সঙ্কেতবাবুকে আটকাতে চেষ্টা করলেন। দুজনে জড়ামড়ি করে আছড়ে পড়লেন ঘাসের ওপরে। কুকুরের পালের মধ্যে থেকে একটা কুকুর এসে কামড়ে ধরল হিরু কাকার ঘাড়টা। ঘাড়ের রগ ছিঁড়ে মুহূর্তের মধ্যে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। যজ্ঞ পণ্ড হয়ে গেল। নিরুপায় সাধক তখন হিরু কাকা আর সঙ্কেতবাবুকে রক্ষা করার জন্যে যজ্ঞের আগুন তুলে ছুঁড়ে মেরেছেন কুকুরগুলোকে। আগুনকে ভয় পেয়েই হোক বা অন্য কোনও কারণে কুকুরের দল চোখের নিমেষে সেখান থেকে মিলিয়ে গেল। আর বাবু মাথা চালতে চালতে লুটিয়ে পড়ল বাগানের বুকে।

হিরু কাকার ইনজুরিটা মারাত্মক ছিল। প্রচণ্ড রক্তক্ষরণে তাঁর অকালমৃত্যু হল সেই রাতেই,' এই পর্যন্ত বলে থামলেন জাহিদ চৌধুরী।

আর বাবু? বাবুও কি...

না। বাবুর কিছু হয়নি। সে বেঁচে গিয়েছিল। তবে সেই সাধক বলেছিলেন, এই যজ্ঞ যেহেতু বিঘ্নিত হয়েছে, এর ফল আশা করা যায় না। কিন্তু পিশাচ রক্তের স্বাদ পেয়েছে। জীবনের আহুতি হয়েছে। তাই পূর্ণ সম্ভাবনা, সে আর ফিরে আসবে না। আশা করি, তোমার ছেলে সুস্থ হয়ে যাবে। তবুও এই ছেলেকে চোখে চোখে রাখবে।

'তার মানে বাবুর সুস্থতার গ্যারান্টি তিনি দিতে পারেননি?'

হ্যাঁ। সেটাই দাঁড়ায়। সাধক নিজেও বুঝতে পারেননি বাবুর বিপদ কেটেছিল কিনা। তবে বাবুর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছিল তার পরে।

অদ্ভুত ব্যাপার! আমার বাবার মৃত্যু রহস্যটা জেনে আজ একটু হালকা লাগছে। শুধু একটা কথাই জানা গেল না।

কী?

বাবু ওই চন্দ্রভূক পিশাচের কবলে কীভাবে পড়েছিল?

বাবুর প্রপিতামহ নাকি বাড়ির গোপন কুঠুরিতে পারলৌকিক চর্চা করতেন। প্রেতচক্র বসাতেন। তাঁর মৃত্যুর পরে সেই ঘর বন্ধ হয়ে যায়। বাবু কোনোভাবে সেই ঘরের সন্ধান পেয়ে সেখানে ঢোকে। ভুলবশত সে সেই প্রেতচক্রকে জাগ্রত করে নরকের দ্বার খুলে ফেলে। এবং তার ফলস্বরূপ চন্দ্রভূক পিশাচের পাল্লায় পড়ে। বাকিটা তো বললামই।

কিন্তু অত সহজে বাবুকে ছেড়ে চলে গেল ওই পিশাচ?

বলা মুশকিল। হয়তো সে অন্য কোনও শরীর পেয়ে সেখানেই বাসা বেঁধেছে। এর উত্তর আমার কাছে নেই। চলো, নয়ন, এবার উঠি আমরা। রাত প্রায় বারোটা বাজছে। বলতে বলতেই উঠে দাঁড়িয়েছেন জাহিদ চৌধুরী।

শেষ প্রশ্ন করব, দাদা।

কী?

বাবুর আসল পরিচয়টা জানতে চাই। আমার বাবার মৃত্যু বাবুকে রক্ষা করতে গিয়ে হয়েছিল। এটুকু জানার অধিকার আমার আছে বইকি। তবে সত্যি বলতে কি, ওর প্রতি আমার কোনও রাগ নেই। আমি কোনওভাবেই বাবু বা তার পরিবারকে ভুল বুঝব না।

তাহলে বলি শোনো, আমিই সেই বাবু। সঙ্কেত ধর আসলে আর কেউ নন, আমার বাবা রশিদ চৌধুরী।

পিলে চমকে উঠেছে নয়নের। মেঘ কেটে গেছে আকাশে। চাঁদের আলো এসে জাহিদ ভাইয়ের মুখে পড়ছে। তার হঠাৎ খেয়াল হল, আরে, আজ তো পূর্ণিমা। কিশোর ভারতী

সবুজ মন

রাজশ্রী বসু অধিকারী

রামু শামু নিধি একসঙ্গে পা ফেলে ফেলে দূরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। রিপন ঘাসের ওপরে বসে ওদের দেখে। সামনের দিকে মাইল মাইল ধানজমি। কচি ধানের শিস গজিয়েছে। ততটুকুই লম্বা হয়েছে যাতে হাওয়া ছুঁয়ে গেলে ছড়িয়ে রাখা সবুজ ভেলভেটের পর্দায় ঢেউ লাগে। সেই ঢেউ রিপনের মাথার ভেতর রিনরিন করে একটা একটা গানের কলি তৈরি করতে থাকে।

রোজ শেষদুপুরে রামুদের নিয়ে এইখানে এসে বসে ও। ধানজমির মাঝখানে বড় একটা মাঠ। বিশাল একটা সবুজ কার্পেট পাতা আছে সেই মাঠে। সেইখানে ঘুরে ঘুরে রামু শামু নিধি চরে বেড়াতে ভালোবাসে। খাদ্যবস্তুর দিকে ওদের নজর নেই বিশেষ। বরং এই মাঠে এসে ঘুরে বেড়ানোয় বেশি আগ্রহ। ওবাড়িতে আরও দু'জন রাখাল কাজ করে, সমীর আর নরেশ। মোট বারোটা গরুর মধ্যে সমীর চারটে আর নরেশ পাঁচটার দেখভাল করে।

প্রথমদিন ঘোষবাবু ওকে বলেছিল তিনখানা গরুর দায়িত্ব নিতে হবে। সকালবেলা জাবনা দেওয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, সময়মতো খড় বিচুলি সামনে ধরা, বিকালে চরতে নিয়ে যাওয়া। বিনিময়ে রিপন দু'বেলা পেটপুরে খেতে পাবে, বছরে তিনবার হাফপ্যান্ট আর শার্ট গেঞ্জি, মাস

ছবিঃ মৃণাল শীল

গেলে আটশ' টাকা মাইনে পাবে। বাড়িতে দিদি আছে। এতদিন বাবা ছিল। দু'দিনের ধুম জ্বরে বাবা মারা যাওয়ার পর ওরা দুই ভাই বোন অথৈ জলে পড়ল। অনেক ভাবনাচিন্তা করে রিপন এসে ঢুকে পড়েছে ঘোষবাবুর গোয়ালে। মানুষটা ভালো। সব শুনে প্রথমেই বলেছিল, 'তুই কুসুমপুর স্কুলে ক্লাস সেভেনে পড়িস না? পারবি রাখাল বাগালের কাজ করতে?'

'পারব, পারব বাবু...।'

'তোর স্কুল? না না পড়া ছাড়লে কীকরে চলবে? অত ভালো রেজাল্ট তোর।'

রিপন চুপ করে ছিল। ঘোষবাবু ওদের স্কুলে গিয়েছিলেন অ্যানুয়াল স্পোর্টসের সময়। হাতে করে ওকে প্রাইজও দিয়েছিলেন। তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'এই টাকাটা তোকে আমি এমনি-এমনিই দিতে পারি, কিন্তু দেব না। পরিশ্রম করেই রোজগার করতে হবে। কিন্তু পড়া ছাড়লেও তো চলবে না।'

এর কী উত্তর হয় রিপনের জানা ছিল না। সে চুপ করেই দাঁড়িয়েছিল। ঘোষবাবু ওকে বিশাল গোয়ালের কাছে নিয়ে এলেন। রামু শামু নিধির গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, 'কাজে নিচ্ছি তোকে। এই তিনটে গরুর দেখাশোনা তুই করবি। কিন্তু পড়া ছাড়লে চলবে না। রাতের বেলায় যে ক্লাস হয় সেইখানে যাবি। আমি হেডস্যারকে বলে দেব যাতে পরীক্ষাটা একসঙ্গেই দিতে পারিস। এবার যা। কাল থেকে কাজে লাগবি।'

'আর শোন, এই দুশোটা টাকা রাখ। দিদিকে বলবি খানিক খানিক চাল ডাল আটা কিনে নিতে। এটা ধার দিলাম। মাইনে পেয়ে মাসে পঞ্চাশ টাকা করে শোধ দিবি।'

সেই থেকে রিপন রামু শামুদের দেখাশোনা করে। ওদের কাজ কিছু কম নয়। দূরের জঙ্গল থেকে বেছে বেছে কচি ঘাস কেটে আনতে হয় বোঝা বোঝা। সারাদিন ধরে খায় তিনজন। ওদের গা ডলে ডলে জল ঢেলে স্নান করায়। রিপন নতুন বলে নরেশ আর সমীর গোয়াল পরিষ্কার করার কাজটা ওর ওপরে দিয়ে দায় সেরেছে। কষ্ট হলেও রিপন যত্ন নিয়েই করে। নরেশরা যখনই এদিকওদিক যায়, ওদের ভাগের গরুগুলোকেও রিপনই দেখাশোনা করে। কার ডাবার ঘাস ফুরিয়েছে, কে আরও একটু খড় বিচুলির আশায় এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, কে বিশ্রামের জায়গা নোংরা করে ফেলেছে গোবর ফেলে, সবটা ওকেই খেয়াল রাখতে হয়। মুখ ফুটে আপত্তি করেনি। ওর শুধু অপেক্ষা বিকালের জন্য। রোদ পড়ে আসা বিকালবেলাটা ভারি ভাল লাগে। মনে হয় রামু শামু নিধিও এই সময়টার জন্যই অপেক্ষায় থাকে।

রিপন বোঝে সেটা ঘাসের জন্য নয়। রামুরাও ভালোবাসে সেই ধানজমি ঘেরা মাঠটায় যেতে। কেন মনে হয় সেকথা জিগ্যেস করলে গুছিয়ে বলতে পারবে না। একদিন নরেশকে একথা বলতে গিয়ে প্রচুর খোরাক হয়েছিল। এখনো ওরা হাসাহাসি করে ওকে দেখিয়ে। তাই কাউকে আর কিছু বলে না রিপন। কিন্তু ও সত্যিই গরুদের ভাষা বোঝে। এই যে রামু শামু নিধি মাঠের অপেক্ষায় থাকে সেটা ওদের চোখেই ফুটে ওঠে! আর এখানে একবার পৌঁছে গেলে ওরা যে তিনজনেই একবার করে রিপনের দিকে তাকিয়ে ডেকে ওঠে হাম্বাআআআ..., রিপন বোঝে ওটা ওরা ওকে থ্যাঙ্ক ইউ বলে গেল। রিপন পেছন থেকে যখন হেঁকে বলে, 'এ এ এ রামুয়া শামুয়া নিধিয়া আ আ আ, ধানজমিতে যাস না কো...',তখন ওরা আরেকবার থামে চলতে চলতে, ওর দিকে তাকিয়ে ঘাড় নেড়ে ল্যাজ নেড়ে তারপর এগিয়ে যায় সামনে।

রিপন লক্ষ করেছে, ওরা ভুলেও মাঠ ছেড়ে ধানজমিতে নামে না। তার মানে ওরা রিপনের কথা মানেও।

এই পারস্পরিক বোঝাবুঝিটা রিপন নিজের মধ্যেই রাখে। তবু মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় ঘোষবাবুকে জানায়। তাঁর গরু, তাঁকে তো জানানোই উচিত।

একমাত্র দিদিকেই বলেছিল ওর এই কানেকশনের কথা। এটাও বলেছিল যে ও ঘোষবাবুকে বলতে চায়। কিন্তু দিদি বারণ করেছে। বলেছে কোন দরকার নেই।

অন্যদিনের মতো আজও ওদের নিয়ে রিপন এসেছে মাঠের ধারে। আসার সময় দূর থেকেই দেখতে পেল যেখানটায় ও বসে, সেখানে একটা দাদা আর দিদি মোটরসাইকেলের ওপর বসে গল্প করছে। রামুদের মাঠে ছেড়ে রিপন গিয়ে একটু দূরে একটা ঢিপির ওপর বসে। ওর একটা বাঁশের বাঁশি আছে। রথের মেলা থেকে দিদি কিনে দিয়েছিল। পকেটে করে এখানে রোজই নিয়ে আসে। চেষ্টা করে সুর তোলার। হয় না, তবু চেষ্টা করে যায়। আশা করে একদিন নিশ্চয়ই সুর তুলতে পারবে। আজ বাঁশিটা হাতে নেয় কিন্তু লজ্জায় ফুঁ দিতেই পারে না। ওই দাদা দিদিটা কাছেই দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। দিদিটা খুব রেগে রেগে কিছু বলছে। আর দাদাটা তাকে থামানোর জন্য হাত নেড়ে নেড়ে কিছু বলতে চাইছে।

নানারকম ভাবছিল রিপন, হঠাৎ দেখে দিদিটা জোরে জোরে হাঁটতে শুরু করেছে। দাদাটা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বাইক স্টার্ট করে পেছনে এগিয়ে গেল। অনেকটা দূর এগিয়ে গেছে দু'জনেই। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু কথা শোনা যাচ্ছে না। দাদাটা পেছন থেকে গিয়ে ধরে ফেলেছে দিদিটাকে, কী সব বলছে। দিদিটা ঘাড় ঝাঁকিয়ে উত্তর দিচ্ছে। রিপন তাদের দিকেই দেখছিল। হঠাৎ ওর নজরে পড়ে হাত কয়েক দূরে ঘাসের ওপর পড়ে থাকা কালো চকচকে মতো জিনিসটা। কাছে এসে কুড়িয়ে নেয়, আর ধক করে ওঠে বুকের ভেতর।

মোবাইল। হ্যাঁ, মোবাইলই তো ! এটা ওই দাদা বা দিদি কারো হবে। রিপন হাতে নিয়েই দৌড়ে দূরে দাঁড়ানো দাদা দিদিটার কাছে যাওয়ার জন্য পা বাড়ায়। কিন্তু দু'পা যেতে না যেতেই দেখতে পায় দু'জনকে নিয়েই মোটরবাইকটা চোখের পলকে হুউউস করে এগিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। রিপন রাস্তার মাঝখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে। সন্ধ্যা নামছে। কী করবে বুঝতে পারে না। ওর অনেক স্কুলের বন্ধুর হাতে ও মোবাইল দেখেছে। কিন্তু সেগুলো এত সুন্দর নয়। ও জানে এই মোবাইল জিনিসটা একটা খাজানা। কী নেই এখানে ! এটার মধ্যে আছে যত পাহাড় নদী মরুভূমি আর শহরের হদিশ। ইউটিউব, ফেসবুক, ইন্টারনেট এই শব্দগুলোও ওর অজানা নয়। ওদের ক্লাসে অম্লান, স্বরূপরা মাঝে মাঝে লুকিয়ে মোবাইল নিয়ে আসে। বাদবাকি ছেলেরা সুযোগ পেলেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে মোবাইলগুলোর ওপর। রিপনকেও ওরা বলে হাতে নিয়ে দেখতে। কিন্তু পরের জিনিস রিপন কখনো সহজে নিতে পারেনা। দূর থেকেই দেখে।

আজ হঠাৎ মোবাইলটা হাতে পেয়ে গিয়ে কী করবে ভেবে পায় না রিপন। ও কি এটা ঘাসের ওপরেই রেখে দেবে? নাকি নিজের কাছে রাখবে? কিন্তু ঘাসে রেখে দিলে কেউ না কেউ তো নিয়ে নেবে। নানা কথা ভাবে। শেষ পর্যন্ত ঠিক করে ওর কাছেই মোবাইলটা রাখা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার নিজেকে অপরাধী মনে হয়। অন্যের জিনিস না বলে ও নিজের কাছে রাখবে? এ তো অন্যায়। বেশ কিছুক্ষণ রিপন দাঁড়িয়ে থাকে মোবাইলটা হাতে নিয়ে। খেয়াল হয় রামুর ডাকে। কখন যে রামু শামু নিধি এসে দাঁড়িয়েছে ওর পাশে! ওরাও জানে সন্ধে হয়ে গেছে, এবার ডেরায় ফিরতে হবে। অন্যদিন রিপনই সুর করে করে ওদের ফিরে আসার জন্য ডাকে। আজ পেছনে দাঁড়িয়ে রামু ডাকে, 'হাম্বা আ আ আ'। রিপন বুঝে নেয় রামু বলছে, 'এখনো দাঁড়িয়ে আছ? চল, এবার ফিরে চল, আবার কাল আসব।'

নিধিও যোগ দেয় রামুর সঙ্গে।'

রিপনকে মনে পড়িয়ে দিচ্ছে নিধি, এরপর আবার রাত্রিবেলার ক্লাসে যেতে হবে ওকে। তিনজনের গলকম্বলে হাত বুলিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। তার আগে মোবাইলটা সযত্নে পকেটের ভেতরে ঢুকিয়ে নিতে ভোলে না। বরং কাল নিয়ে আসবে সঙ্গে করে। কাল তারা

নিশ্চই ফেরত নিতে আসবে।

ঘোষবাবুর গোয়ালে সবাইকে ঢুকিয়ে প্রতিদিনের নিয়মমতো নিজের খাবারের থালা নিয়ে বারান্দায় বসে পড়ে ও। মাথা নীচু করে খেয়ে নিচ্ছে, কানে আসে নরেশের কথা।

'এই যে এবার ইস্কুলে যাবেন রাখালমশাই। আমাদের তো কিছু হল না, ইনি গরু চড়িয়ে জজ ম্যাজিষ্টর হবেন। 'সমীর হা-হা করে হাসে। রিপন একটাও কথা বলে না। এসব টিপ্পনি ওরা হামেশাই কেটে থাকে। এসব বাজে কথায় ওর মন নেই। আজ আরোই অন্যমনস্ক। শুধুই মনে হচ্ছে কখন একবার ওই মোবাইলটায় ইউটিউব দেখবে।

ক্লাসে গিয়ে আজ রিপন মন দিতে পারেনি। ক্লাস শেষে বাড়ি ফিরে অন্যদিন দিদির সঙ্গে সারাদিনের সব গল্প করে। আজ চুপ।

'কী রে ভাই? এত চুপচাপ যে আজ? স্যর বকেছে বুঝি?'

'না তো! আমাকে কেউ বকে না। সবাই ভালোবাসে।'

'তাহলে কিছু বলছিস না যে? আজ তোর রামু শামু নিধি কোন কথা বলেনি বুঝি?' দিদি হেসে উঠে ভাই এর পিঠে হাত বোলায়। রিপন বুঝতে পারে না, দিদিকে ব্যাপারটা বলবে কি বলবে না। কিছু কিছু বিষয়ে দিদি খুবই কড়া। সবসময় বলে কখনো পরের জিনিসে লোভ না করতে, নজর না দিতে। বলে যেটা পছন্দ হবে সেটা নিজেকেই অর্জন করে নিতে হয়।

অথচ আজ মন মানছে না। কেবলই ইচ্ছে করছে মোবাইলটা নেড়েচেড়ে দেখতে। একবার মনে হচ্ছে কী হবে একবার ইচ্ছেমত দেখলে, ও তো আর নিয়ে নিচ্ছে না, কাল তো দিয়েই দেবে। আবার মনে হচ্ছে পরের জিনিস মনে লোভ নিয়ে ছোঁয়াও পাপ।

'দ্যাখ ভাই, কেউ যদি তোকে কিছু বলে থাকে, কোন কিছুতে তোর মনখারাপ হয়ে থাকে তো আমাকে বল। মনে রাখিস তুই গরু চরানোর কাজ করিস বলে তোর জীবন এখানেই শেষ নয়। তোকে লেখাপড়া শিখে অনেক বড় হতে হবে।'

দিদি পাশে শুয়ে অনেক কথা বলে যায়। রিপন চুপ। একসময় ঘুমিয়ে পড়ে দিদি। রিপন অনেকবার ভাবে উঠে একবার মোবাইলটা বের করে দেখবে। পারে না। ইচ্ছা আর দিদির বারণ দুই এর টানাপোড়েনে ক্লান্ত রিপন একসময় ঘুমিয়ে পড়ে।

সকাল হয় দিদির কঠিন ডাকে, 'ভাই, ভাই, কী রে এটা? কোথা থেকে এল তোর স্কুলের ব্যাগে? কার থেকে চুরি করেছিস এত দামি জিনিস?' মোবাইলটা হাতে নিয়ে দিদি আগুন চোখে তাকিয়ে আছে রিপনের দিকে। ভ্যা করে কেঁদে ওঠে দিদিকে জড়িয়ে ধরে, 'আমি চুরি করিনি গো, আমি লোভও করিনি। আমি একবারও খুলেই দেখিনি কোওও।' সবটা খুলে বলে দিদিকে।

'এবার বুঝলাম কেন কাল রাত্রে চুপ করে ছিলি,' ভাই এর মাথায় হাত বুলিয়ে বলে দিদি। তারপর আঁচল দিয়ে মুখটা মুছিয়ে দিয়ে বলে, 'চা খেয়ে নিয়ে কাজে যাওয়ার আগে একবার থানায় মোবাইলটা জমা দিয়ে যা। যার জিনিস সে নিশ্চয়ই খুঁজতে আসবে।'

এখন রিপনের মনে আর কোন ভার নেই। থানায় বড়বাবুকে সব কথা বলে মোবাইলটা জমা করে দিয়ে এসেছে। ওর খুব ইচ্ছে করছিল, তাও ও একবারের জন্যও ওটা হাতে নিয়ে দেখেনি, ও যে ঘোষবাবুর জন্য পড়াশোনা করতে পারছে, বড় হয়ে ও যে জজ ম্যাজিষ্ট্রেট হতে চায়, এসব কথাও বলেছে বড়বাবুর প্রশ্নের উত্তরে।

কাজে এসে মহা আনন্দে রামু শামু নিধির গা পরিষ্কার করে দিচ্ছিল ও। রামুদের বলেছে সব কথা। ওরা তো শুনে অবাক। নিধি বলেছে, 'হা আম্বা আ, তোমার মনটা খুব সবুজ।'

চারজনের জোর আড্ডা চলছিল। হঠাৎ রামু ডেকে ওঠে, 'হাম্বা আ...। দেখ তোমার পেছনে কে।'

'কে রে রামু?' পিছন ফিরে অবাক রিপন। ঘোষবাবু আর থানার বড়বাবু পাশাপাশি দাঁড়িয়ে।

বড়বাবু একটা প্যাকেট রিপনের দিকে এগিয়ে ধরেন, 'এই নাও, এটা তোমার। খুব যত্ন করে রাখবে, আর পরীক্ষায় খুব ভালো করতে হবে। তাহলে আবার একটা এরকম গিফট পাবে।' রিপন বুঝতে পারে না বড়বাবু কেন উপহার দিচ্ছেন ওকে। ঘোষবাবু হেসে বলেন, 'নে রিপন, এটা তোর সততার পুরস্কার। বড়বাবু খুব খুশি হয়েছেন কুড়িয়ে পাওয়া মোবাইলটা তুই থানায় জমা দেওয়ায়। উনি তোর জন্য একটা মোবাইল কিনে এনেছেন। আর ওই মোবাইলটা যার, সে থানায় এসে একটু আগেই নিয়ে গেছে।'

'এটা আমার নিজের মোবাইল?' জিগ্যেস করে রিপন। দিদির শেখানো ভাষায় বলে, 'এটা আমার নিজের অর্জন তো? আমি দেখতে পারি?'

বড়বাবু বলেন, 'হ্যাঁ, এটা তোমার নিজের অর্জন। নিজের স্বভাবের দ্বারা অর্জন।' তারপরেই ঘোষবাবুর সঙ্গে যেতে যেতে বলেন, 'এই ছেলেটা আপনার একটা অ্যাসেট। ঠিকমত গাইড করলে ও অনেকদূর যাবে।'

রিপন মনে মনে ঠিক করে মোবাইলটা চালু করে প্রথমেই ডিকশনারি খুলে 'অ্যাসেট' শব্দের মানেটা শিখে নেবে।

হবু রাজার দেশে পঞ্চু

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

ছবিঃ নচিকেতা মাহাত

পঞ্চু ঘুমিয়ে পড়েছিল। চলন্ত ট্রেনের টয়লেটের পাশে কোনও ভাবে গুটি-সুটি মেরে শুয়ে হাঁ করে ঘুমোচ্ছিল পঞ্চু। তা এর চেয়ে ভালো জায়গা আর তার জুটবে কী করে? পেশায় সে ছিঁচকে চোর। ভদ্দরলোকদের তাড়া খেয়ে পালিয়ে পালিয়েই জীবনের অর্ধেকটা তার কেটে গেল। এখনও ফিরছে সে তাড়া খেয়েই।

গভীর ঘুমে তলিয়েছিল পঞ্চু। আর ঘুমোলেই ওর মুখটা হাঁ হয়ে যায়। নিশ্বাস তখন নাক দিয়ে না বেরিয়ে বেরোয় মুখ থেকে।

ঘুমের মধ্যেই এক পেল্লাই সাইজের মাছি ঢুকে পড়ল পঞ্চুর হাঁয়ের মধ্যে...।

থুঃ...থু...থু...ঘুম ভেঙে উঠে বসল পঞ্চু। তারপর একটা হাই তুলে আশপাশে তাকাল।

ট্রেনটার হল কী! কামরার ভেতরটা ঘুট ঘুট করছে অন্ধকার। কোনও সাড়াশব্দও নেই।

ক্যাঁ...ক্যাঁ...ক্যাঁ...

চমকে উঠল পঞ্চু। বোধহয় একটা রাতজাগা পাখি ডাকতে ডাকতে কামরার বাইরে দিয়ে উড়ে গেল।

তখনই পঞ্চু বুঝতে পারল ট্রেনটা দাঁড়িয়ে পড়েছে কোন এক তেপান্তরের মাঠের মাঝখানে।

ইস! পাশের টয়লেট থেকেই দুর্গন্ধ ভেসে আসছে।

পঞ্চু উঠে ট্রেনের কামরার দরজাটা খুলে দাঁড়াল। সামনে বিশাল এক খোলা মাঠ। সেই মাঠের শেষে এক আলোকিত জনপদ।

পঞ্চু অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে ট্রেন থেকে নেমে পড়ল। তারপর সেই আলোকিত নগরীর দিকে হাঁটতে শুরু করল।

কিছুটা পথ যেতেই চোখে পড়ল ওদিক থেকে কেউ একজন আসছে। তার এক হাতে জ্বলন্ত মশাল। আগন্তুক একজন বৃদ্ধ। অদ্ভুত তার চেহারা। মাথা ভর্তি ধপধপে সাদা চুল। বুক পর্যন্ত সাদা দাড়ি। চোখে গোল চশমা। পরনে নানারঙের ঝলমলে আলখাল্লা।

কে ইনি? এই গভীর রাতে হাতে মশাল নিয়ে তেপান্তরের মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে?

বৃদ্ধ ইতিমধ্যে কাছাকাছি এসে পড়েছে। হাতের মশালটা বাগিয়ে পঞ্চুকে ভালোভাবে দেখে বলে,—দেখি বাবা তোমার চোখ দুটো।

পঞ্চু হতভম্ব। বৃদ্ধ হেসে বলে,—আমি জাদুকর অষ্টবক্র স্বামী। তোমায় দেখে মনে হচ্ছে তুমি পারবে। এবার দেখি তোমার হাতের আঙুলগুলো।

তার মানে? পঞ্চু না বলে পারে না, এই রাত দুপুরে আপনি কী জাদু দেখাতে চাইছেন?

জাদু তো তুমি দেখাবে হে। বলেই জাদুকর অষ্টবক্র স্বামী পঞ্চুর ডান হাতটা খপ করে ধরে সেটা তার চোখের সামনে তুলে ধরল। তারপর পঞ্চুর হাতের আঙুলগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল। এরপর খুশিতে ডগমগ হয়ে বলল,—মিলে গেছে! মিলে গেছে! তুমিই পারবে মহারাজের শূলদণ্ড থেকে আমার বাঁচার একটা উপায় বার করতে।

নির্ঘাত এক পাগলের পাল্লায় পড়েছে, পঞ্চু নিশ্চিত। জাদুকর অষ্টবক্র স্বামী এবার দাড়ি নেড়ে হেসে বলল,—তুমি তো বাবা যে-কোনও বন্ধ তালা খুলতে পার, তাই না?

হ্যাঁ, তা পারি। যে-কোনও তালা ভাঙতেও পারি।

সে তোমার আঙুল দেখেই বুঝেছি। এখন চল দেখি।

কোথায়?

রাজবাড়ি। রাজা হবুচন্দ্রের রাজবাড়ি। আগামীকাল সকালে রাজ দরবারে তোমায় পেশ করব।

হবুচন্দ্র রাজা! সে তো পঞ্চু ঠাকুমার মুখে গল্প শুনেছে। হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী!

নিশ্চয়ই ভাবছ আমি পাগল? জাদুকর অষ্টবক্র স্বামী হেসে বলল, না হে না। ওই যে দেখতে পাচ্ছ না হবুচন্দ্র রাজার রাজ্য? আমি ওখান থেকেই আসছি।

পঞ্চু এবার দেখতে পেল আলোকিত নগরীর মাঝখানে সুন্দর এক রাজপ্রাসাদ। মণিরত্নের জেল্লায় জ্বলজ্বল করছে প্রাসাদ সৌধ।

চলো হে চলো। দেখবে রাজামশাই তোমার এই বিদ্যের কথা জানলে খুব খাতির করবে। তারপর যদি 'মহা প্রকোষ্ঠের' বন্ধ তালাটা খুলে একটা নতুন চাবি বানিয়ে দিতে পার, তবে তো কথাই নেই!

কী যে বলছে লোকটা! তবু কৌতূহলের বশে সে জাদুকরকে অনুসরণ করল।

সম্প্রতি হবু রাজ্যে নাকি এক অঘটন ঘটেছে। রাজবাড়ির 'মহাপ্রকোষ্ঠের' চাবি চুরি হয়েছে।

পঞ্চু জিগ্যেস করেছে মহাপ্রকোষ্ঠে আছে কী?

কেউ তা জানে না। জাদুকর বলে, জানেন শুধু রাজা হবুচন্দ্র আর তাঁর মন্ত্রী গবুচন্দ্র।

আপনি তো জাদুকর। আপনিও জানেন না?

না হে না। জানলেও ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করার উপায় নেই। মহাপ্রকোষ্ঠের রক্ষক ছিল নীলাক্ষী সেন, মহারাজের এক বিশ্বস্ত কর্মচারী। জাদুকর বলে, কিন্তু কিছুদিন আগে হঠাৎ সে মহারাজের কাছে এসে অভিযোগ করে, যথেষ্ট সাবধানতা সত্ত্বেও মহাপ্রকোষ্ঠের চাবি খোয়া গেছে। শুনে মহারাজ আঁতকে উঠলেন। বললেন, মহাপ্রকোষ্ঠের সম্পদ হস্তচ্যুত হলে তিনি জীবন বিসর্জন দেবেন। মন্ত্রী গবুচন্দ্র তখন মহারাজকে অনেক স্বান্তনা দিলেন। চাবি চোরকে ধরার অনেক চেষ্টা করলেন। রাজার সেপাইসান্ত্রীরা সারা রাজ্য চুঁড়ে যত চাবিওয়ালা আর ছিঁচকে সিঁধেল চোর ছিল ধরে নিয়ে এল। কিন্তু কেউ মহাপ্রকোষ্ঠের তালা খুলতে পারল না। তখন মন্ত্রী আমায় ডেকে পাঠালেন।

কেন? আপনি তো আর পুলিশ নন।

হুঁ...হুঁ...বাবা। তার চেয়েও বেশি। আমার এক আশ্চর্য বিদ্যা জানা আছে। অষ্টবক্র স্বামী বলল, তার নাম 'নখ দর্পণ।'

নখ দর্পণ!

হ্যাঁ। এই জাদুবিদ্যা বলে আমি কোনও হারানো দ্রব্য এবং চোরকে কোনও ব্যক্তির বুড়ো আঙুলের নখের দর্পণে দেখতে পারি।

বলেন কী!

হ্যাঁ বাবা পঞ্চু। ততক্ষণে অষ্টবক্র পঞ্চুর নাম এবং কীর্তিকলাপ জেনে ফেলেছে। বলল, কিন্তু সমস্যা হল, যে-কোন মানুষ তার নখ দর্পণে চোরকে দেখতে পারবে না।

তাহলে?

তার কোনও একটা হাতে পাঁচের বদলে ছ'টা আঙুল থাকতে হবে। অনেক খুঁজে তেমন একজন মানুষকে পাওয়াও গেল। সে জল্লাদ মার্তণ্ড খাঁড়া। তার বুড়ো আঙুলের পাশে একটা ছোট্ট আঙুল গজিয়ে আছে। তার মানে আমার মন্ত্র তার ওপর খাটবে।

কথা বলতে বলতে ওরা রাজপ্রাসাদের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। জাদুকর অষ্টবক্রকে দেখে রক্ষীরা সসম্মানে পথ ছেড়ে দিল।

সুরম্য রাজপ্রাসাদ। মশালের আলো। কিন্তু সব প্রাচীন। যেন কয়েকশো বছর আগে ওরা পৌঁছে গেছে।

জাদুকর বলল, এসো হে পঞ্চু। আজকের রাত তুমি আমার ঘরেই বিশ্রাম করবে। কাল তোমায় নিয়ে যাব রাজদরবারে।

পঞ্চু বলল, কিন্তু নখ দর্পণে মার্তণ্ড কাকে দেখল বললেন না তো?

জাদুকর ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বলল,—জল্লাদ মার্তণ্ড খাঁড়া তার নখ দর্পণে যার ছবি দেখল সে আর কেউ নয়, মহাপ্রকোষ্ঠের রক্ষক স্বয়ং নীলাক্ষ সেন।

বলেন কী! তারপর?

যা হবার তাই হল।

মানে?

মানে মহারাজ নীলাক্ষ সেনকে ধরে নানাভাবে জেরা করলেন, কিন্তু সে কিছুতেই অপরাধ স্বীকার করল না। তখন বাধ্য হয়ে মহারাজ তাকে শূলদণ্ড দিলেন। কিন্তু দণ্ড কার্যকর করার আগেই গুপ্তচর এক নিদারুণ খবর আনল। চুরিটা করেছে নীলাক্ষর যমজ ভাই বিড়ালাক্ষ।

বলেন কী?

হ্যাঁ বাবা। আসলে যমজ হলেও বিড়ালাক্ষর সঙ্গে নীলাক্ষর দীর্ঘকাল সম্পর্ক ছিল না। নানা অপরাধকর্মে হাত পাকিয়েছিল বিড়ালাক্ষ। মহাপ্রকোষ্ঠের চাবিও একদিন তার যমজ ভাই নীলাক্ষর অজান্তেই চুরি করে নিয়ে যায়।

কিন্তু তাহলে আপনার নখ দর্পণ...

নখ দর্পণ ঠিকই ছিল। দুই ভাই একরকম দেখতে। কিন্তু চোর বিড়ালাক্ষের নাকের নীচে যে একটা আঁচিল ছিল সেটা জল্লাদ মার্তণ্ড ঠিক লক্ষ করেনি। কিন্তু একথা জেনে হবুচন্দ্র মহারাজ আমার ওপর রেগেই আগুন। আমিই নাকি মার্তণ্ডকে ঠিক ছবিটা দেখাতে পারিনি। মহারাজ আমায় সাতদিন সময় দিয়েছেন। এর মধ্যে যদি আমি তালা খোলার লোক খুঁজে আনতে না পারি, মহারাজ আমাকেই শূলে চড়াবেন।

পঞ্চু একটা হাই তুলে বলল, এ কাজ তো আমার বাঁয় হাত কা খেল। আগে আমার পেশাই ছিল তালার হারানো চাবি তৈরি করা, তালা খোলা। নেহাত বাজারটা খারাপ হয়ে গেল তাই এ লাইনে এলাম।

২

পরদিন সকালেই জাদুকর অষ্টবক্র স্বামী পঞ্চুকে নিয়ে গিয়ে হাজির হল হবুচন্দ্র রাজার দরবারে।

পঞ্চু ছেলেবেলায় হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রীর কথা শুনেছিল। এবার স্বচক্ষে দেখল। রাজা হবুচন্দ্র যেমন মোটা বেঁটে, মন্ত্রী গবুচন্দ্র তেমনি রোগা আর লম্বা। পরনের রাজবেশও বিচিত্র। হবুচন্দ্র রাজার মুকুটটা সোনার। মন্ত্রী গবুচন্দ্রের মাথার সোনালি পাগড়িটা কান পর্যন্ত বাঁধা।

জাদুকর পঞ্চুর গুনপনা ব্যাখ্যা করল। মহারাজ বলল, বাঃ বাঃ। এবার দেখাও দেখি তোমার কেরামতি।

পঞ্চুকে নিয়ে যাওয়া হল 'মহাপ্রকোষ্ঠের' সামনে। মন্ত্রী গবুচন্দ্র বললেন, পারবে তো হে এই প্রকোষ্ঠের দরজার তালা খুলতে?

পঞ্চু কোন কথা না বলে ওর সঙ্গের লম্বা শিকটা তালার গর্তে ঢুকিয়ে বেশ কিছুক্ষণ নাড়া চাড়া করতেই খুলে গেল তালা।

সঙ্গে সঙ্গে হবুচন্দ্র চেঁচিয়ে উঠলেন,—জিও জিও বেটা। ফুটবলের মতো দেহটাকে নিয়ে লাফিয়ে উঠেছেন।

এরপর ভারী দরজাটা খুলতে যাচ্ছিল পঞ্চু, কিন্তু তার আগেই হাঁ হাঁ করে উঠলেন মহারাজ হবুচন্দ্র,—না, না। তালা খুলেছ, তোমাদের কাজ শেষ। এবার ওই দরজার একটা চাবি বানিয়ে দাও দেখি।

চাবি! এবার মুখ ব্যাজার করল পঞ্চু। বলল, বহুকাল ওই কাজ ছেড়ে দিয়েছি মহারাজ। তবে আমার হাতের এই ব্যাঁকানো শিকটা দেখছেন, এর সাহায্যে আপনি যখন বলবেন ওই দরজার তালা খুলে দিতে বা বন্ধ করে দিতে পারব।

মহারাজ হবুচন্দ্র এবার মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, এ তো মহামুশকিল হল। ওকে তো তাহলে বন্দি করে রাখতে হয়।

মহারাজ আপনি বরং এই ছোকরাকেই আপনার মহাপ্রকোষ্ঠের রক্ষক করে রাখুন। তাহলে যখন দরকার পড়বে প্রকোষ্ঠের দ্বার খুলে আবার বন্ধ করবে।

সর্বনাশ! এক ছিঁচকে কিনা চোর হবে মহারাজের মহাপ্রকোষ্ঠের রক্ষক?

কিন্তু সে কিছু বলার আগেই রাজা হবুচন্দ্র বললেন, বাঃ বাঃ! মন্ত্রী গবুচন্দ্র, তুমি ঠিক বুদ্ধি বার করেছ। এই ছোকরাই আমার মহাপ্রকোষ্ঠের রক্ষক।

৩

দিব্যি দিন কাটছিল পঞ্চুর। মহাপ্রকোষ্ঠের সামনে বসে থাকা আর রাজবাড়ির ভালোমন্দ খাওয়া।

তাকে যারা নজরে রাখে সেই দুজনকে পঞ্চু মাঝে মাঝে দেখতে পায়। সারা মুখ আর শরীর কালো পোশাকে ঢাকা। শুধু চোখ দুটো খোলা। হাতে খোলা তলোয়ার।

কিন্তু পঞ্চুর মতো এক জাত চোরের পক্ষে আর কতদিন রক্ষক সেজে বসে থাকতে ভালো লাগে? মাঝে মাঝে ওর হাত দুটো নিশপিশ করে ওঠে।

অবশেষে একদিন সুযোগ এল। অনেক রাত। হঠাৎ ওর ঘুম ভাঙল কারুর হাতের ঠেলায়। পঞ্চু চোখ মেলে দেখল ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে দুই পাহারাদারের একজন। কিন্তু এখন ওর মুখ ঢাকা নয়। মশালের আলোয় পঞ্চু দেখল ওর দু'চোখের মনি পিঙ্গল বর্ণ।

কে? কে তুমি?

আমি বিড়ালাক্ষ সেন। নীলাক্ষ সেনের যমজ ভাই।

তুমিই তো ওই প্রকোষ্ঠের চাবি চুরি করেছ।

হ্যাঁ। আমি পাহারাদার সেজে এতদিন ছিলাম। আজ সুযোগ এসেছে।

কী সুযোগ?

ওই মহাপ্রকোষ্ঠের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে ওখানকার সমস্ত ধন ঐশ্চর্য লুঠ করার। বলতে বলতে সে তার পোশাকের ভেতর থেকে একটা মস্ত চাবি বার করে বলল, বলো, তুমি আমার সঙ্গী হতে রাজি কিনা?

—কি...কিন্তু...

—কোন ভয় নেই। অন্য পাহারাদারকে আমি মাদক খাইয়ে অচেতন করে এসেছি। এখন বল, আমার সঙ্গে প্রকোষ্ঠে ঢুকবে কিনা।

যতই হোক, পঞ্চু পেশায় চোর। সে ভাবল, এই সুযোগে কিছু হাতিয়ে এই অদ্ভুত রাজ্যটা থেকে কেটে পড়াই ভালো।

পঞ্চু বিড়ালাক্ষের সঙ্গী হল। মহাপ্রকোষ্ঠের বিশাল দরজাটা খুলে ভেতরে পা দিল বিড়ালাক্ষ। পঞ্চুও অনুসরণ করল মশাল নিয়ে।

বিশাল ঘরের মধ্যে গোটা কয়েক কফিনের মতো বাক্স। আর কিছু নেই। নিশ্চয়ই বাক্সগুলোর মধ্যেই হবুচন্দ্র রাজা লুকিয়ে রেখেছে ধনসম্পদ। বলতে বলতে বিড়ালাক্ষ একটা বাক্সের ডালা খুলেই ভয়ে আঁ আঁ আঁ করে চেঁচিয়ে উঠল।

পঞ্চু উঁকি মেরে দেখল বাক্সের মধ্যে শুয়ে আছে একটি দেহ। যেন জীবন্ত। ভয়ে শিউরে উঠল পঞ্চু। ও কী তবে ভ্যাম্পায়ার?

—না হে ছোকরা, যা ভাবছ তা নয়। ওগুলো মমি। মহারাজের পূর্বপুরুষদের মৃতদেহদের এভাবেই রাজবৈদ্যরা মমি করে রেখেছেন।

পঞ্চু চমকে ফিরে তাকিয়ে মূর্ছা যাচ্ছিল।

যে দুজন এসে দাঁড়িয়েছে তাদের মধ্যে একজন জল্লাদ মার্তণ্ড খাঁড়া। আর দ্বিতীয় সিড়িঙ্গে ব্যক্তিটি স্বয়ং গবুচন্দ্র।

—শৃঙ্খলিত করো।

মহামন্ত্রীর আদেশে জল্লাদ মার্তণ্ড পঞ্চু আর বিড়ালাক্ষর হাতে লোহার হাতকড়া পরিয়ে দিল।

ঠিক তখনই মহাপ্রকোষ্ঠের মেঝেটা শব্দ করে কেঁপে উঠল।

৪

পরদিন রাজা হবুচন্দ্রের দরবারে পঞ্চু আর বিড়ালাক্ষকে বিচারের জন্য হাজির করা হল। মহারাজা বিচার করে দুই অপরাধীকেই শূলদণ্ড দিলেন।

জল্লাদ মার্তণ্ড দুই দণ্ডিত অপরাধীকে নিয়ে গেল হত্যা ক্ষেত্রে। সেখানে প্রায় বারো ফুট উঁচু একটা বাঁধানো মঞ্চ। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়। তার ঠিক পাশে মাটিতে পোঁতা হয়েছে একটা শূলদণ্ড।

প্রথমে বিড়ালাক্ষকে সেই মঞ্চে তোলা হল। তারপর তাকে জল্লাদ মার্তণ্ড বসিয়ে দিল ছুঁচলো শূলের ডগায়।

পঞ্চু আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল। কিন্তু জনতার উল্লাসধ্বনিতে তার চিৎকার ঢাকা পড়ে গেল। এবার আসছে পঞ্চুর পালা।

কিন্তু তার আগেই ঘটে গেল এক আশ্চর্য কাণ্ড।

পায়ের তলার মাটি ভীষণভাবে কাঁপতে শুরু করল। অকস্মাৎ ভূমিকম্প শুরু হয়েছে! ভয়ানক ভূমিকম্প!

চোখের সামনে ভেঙে পড়ল হত্যামঞ্চ। চারদিকে মাটিতে বড় বড় ফাটল...শুধু জল্লাদ নয়—একের পর এক লোকজন মাটির ফাটলে ঢুকে যেতে লাগল...চারদিক থেকে শোনা যাচ্ছে শুধু ভয়ার্ত আর্তনাদ...!

না! আর নয়...এক মুহূর্ত এখানে নয়! পঞ্চু প্রাণপণে ছুটতে লাগল দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে...ছুট...ছুট—কেবল ছুটে চলা...!

ছুটতে ছুটতে দাঁড়িয়ে পড়ল পঞ্চু। জিভটা বেরিয়ে এসেছে! নাঃ, আর ছুটতে পারবে না।

আর ঠিক তখনই চোখে পড়ল তার ছেড়ে যাওয়া ট্রেনটা মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে একইরকম ভাবে—একটা ঘুমন্ত অজগরের মতো। হ্যাঁ, এই ট্রেনটাই তো। কোন সন্দেহ নেই। পঞ্চু একলাফে ট্রেনের কামরার মধ্যে ঢুকে পড়ল। অমনি ট্রেনটা চলতে শুরু করল।

পঞ্চু টয়লেটের পাশে তার ছেড়ে যাওয়া জায়গাটায় আবার এসে বসল। তারপর কামরার ভেতরের দিকে তাকাল। ওই তো, ঘুমন্ত প্যাসেঞ্জারদের নাসিকা গর্জন শোনা যাচ্ছে। জ্বলছে নাইট বাল্বগুলো।

বাইরের দিকে তাকিয়ে মুখ বাড়াল পঞ্চু। কোথাও কোন আলো নেই। পঞ্চু বসে ভাববার চেষ্টা করল। ঘটনাগুলো কী সত্যিই ঘটেছিল?

কিশোর ভারতী

ছবিঃ স্যমন্তক চট্টোপাধ্যায়

কমলেশ কুমার

আলোকতরণী

ঝিঙেপোঁতা নবজাগরণ ক্লাবের বিশাল মাঠে এখন তিল ধারণের জায়গা নেই। গত তিনদিন ধরে এখানে এক জাদুকর অভাবনীয় সব খেলা দেখাচ্ছে।

যদিও জাদুকর একা নয়, তার সাঙ্গপাঙ্গ মিলিয়ে জনা দশ-বারো তো হবেই। আট-ন' বছরের বাচ্চা থেকে ষাট-সত্তর বছরের বুড়ো, কে নেই সেই দলে! যেমন রোমহর্ষক সেসব খেলা, তেমনই ভয়ঙ্কর। যারা খেলা দেখাচ্ছে, তাদের জীবনের ঝুঁকিও প্রচণ্ড।

প্রতিদিন বিকেলের দিকে শুরু হচ্ছে বুকের উপর দিয়ে বাইক চালানো। একজন শুয়ে পড়ছে মাটির উপরে, তার উপর দিয়ে দ্রুতগতিতে বাইক ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অন্য আর একজন।

রন্টু বন্ধুদের কাছে শুনেছে, আজ নাকি একজনকে পিছমোড়া করে বেঁধে মাটিতে গভীর গর্ত করে ফেলে দেওয়া হবে। তারপর মাটি চাপা দিয়ে দেওয়া হবে। দু'তিন দিন পর তাকে গর্ত খুঁড়ে তুলে আনা হবে। লোকটা বেঁচে তো থাকবেই, কোনো ক্ষতিও নাকি হবে না।

এরকম অবিশ্বাস্য সব খেলা আজ ক্লাবের মাঠে সামনাসামনি দেখা যাবে।

এরকম অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে রন্টু বিকেলবেলা ভুলাই, পঞ্চু, মানস আর সানডের সঙ্গে নবজাগরণ ক্লাবের মাঠে চলে এসেছে।

সানডে রন্টুকে বলেছে, 'আবার ধোলাই খাওয়ার ইচ্ছে না থাকলে চুপচাপ থাকিস।'

ভুলাই রন্টুকে একটু বেশিই ভালোবাসে, ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বলেছে, 'রন্টু ভাই আমার, ওখানে মুখ টিপে থাকবি। ঠোঁট যেন ফাঁক হতে না দেখি আমি।'

পঞ্চু বলেছে, 'বহু লোকজন থাকবে। প্রয়োজনে হাততালি দিবি, কিন্তু মুখ থেকে যেন একটা শব্দও না বেরোয়।'

রন্টুর অভ্যাস, কিংবা বলা ভালো, বদভ্যাস একটা রয়েছে। সেজন্যে কম কথা শুনতে হয় না ওকে।

ঝিঙেপোঁতা আদর্শ বিদ্যামন্দিরের ক্লাস এইটের ছাত্র ও, পড়াশোনায় ও মাঝারি ধরনের। কখনও পাশ নম্বর পেতে একটু টানাটানিও যে হয় না, সেটা বললে মিথ্যে বলা হবে। কিন্তু সকলের কাছে রন্টুর মহা দুর্নাম অন্য একটা কারণে। সেটা হল ওর হাসি।

শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি। রন্টু যদি হাসতে শুরু করে, ওকে থামানো দায় হয়ে পড়ে।

কান মুলে দিয়ে, চুলের মুঠি টেনে ধরে, পিঠে চড়াম-চড়াম করে

বেতের বাড়ি মেরে কিছুতেই নিরস্ত করা যায় না ওকে, বরং উল্টোটাই বেশি দেখা যায়। কানমলা, চড়-চাপাটি খেয়ে ওর হাসির তোড়টা বেড়ে যায় আরও। বাঁধভাঙা জলের স্রোতের মতো ও হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে।

গতমাসে স্কুলের জীবন বিজ্ঞানের শিক্ষক ষষ্ঠীচরণ সাঁপুই পড়া ধরছিলেন সকলকে। তিনি কথা বলতে গেলে তোতলান। থেমে থেমে নিজের সমস্যাটা থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করেন।

সকলের মতোই রন্টুর কাছে এসে তিনি থামলেন। পিটপিট করে দুবার তাকিয়ে রন্টুকে বললেন, 'সা-সা-সা...'

রন্টু স্যারের দিকে তাকিয়ে একটু বোঝার চেষ্টা যে প্রথমে করেনি তা নয়, একটা জবাবও দিতে গেছিল, 'সা-নি-ধা-পা! স্বরলিপির কথা বলছেন স্যার!'

তখনো ষষ্ঠীস্যার 'সা-সা' করে যাচ্ছেন দেখে রন্টু আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জবাব দিয়েছিল, 'সত্যি বলতে আমি গানের কিছুই বুঝি না স্যার! খেলা, গান-টান আমার দ্বারা হয় না!'

ষষ্ঠীচরণ সাঁপুই থামলেন। বললেন, 'সালোকসংশ্লেষ কোন আলোতে সবচেয়ে বেশি হয়?'

এবারে স্যার একটুও তোতলালেন না। রন্টু জিভ দিয়ে শুকিয়ে যাওয়া দুটো ঠোঁট একটু চেটে নিয়ে বলল, 'সাদা আলোতে স্যার? মানে, শুনেছি তো গাছ দিনের বেলায় সালোকসংশ্লেষ করে, তবে হলুদও হতে পারে। সূর্যের রং একটু হলদেটেও হয়।'

উত্তরটা শুনে ষষ্ঠীবাবু গর্জন করে উঠলেন। বললেন, 'তোকে মেরে আজ তক্তা বানাব আমি। তবেই আমার নাম ষষ্ঠীচরণ সাঁ-সাঁ-সাঁ...'

সাঁ-তে আটকে যাওয়ার কারণে রন্টুর সেই যে হাসি শুরু হল, থামল স্কুল ছুটি হওয়ার পরে। মাঝখানে সত্যি সত্যিই ষষ্ঠীস্যার ওকে মেরে তক্তা বানিয়ে দিয়েছেন। উনি যত মারেন, রন্টু তত হাসে, অবশেষে স্যারও রণে ভঙ্গ দিলেন।

এরকমই আর একটা ঘটনা ঘটল সেদিন স্কুলে। ইতিহাসের নতুন শিক্ষক রাখহরি সমাদ্দার জয়েন করেছেন সদ্য। মারাত্মক রাশভারী মানুষ।

সকলে একমনে স্যারের পড়া শুনছিল, শুধু সানডে প্রথম বেঞ্চে বসে স্যার পিছনে ঘুরলেই ঝুঁকে ঝুঁকে কী যেন দেখছিল।

ক্লাস শেষ হতেই সকলে সানডেকে ঘিরে ধরে কারণ জানতে চাইল।

সানডে ব্যাগ থেকে জলের বোতলটা বের করে দু'ঢোক জল খেল। তারপর গম্ভীর মুখে বলল, 'ফলস!'

'মানে?'

সানডে আরও গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর নামি গোয়েন্দাদের মতো কপাল কুঁচকে বলল, 'রাখহরি সমাদ্দারের চুলগুলো সত্যি নয়। ওই ঘনকালো ঢেউখেলানো চুলগুলো পুরোটাই ফলস! স্যার পরচুলো পরে আছেন। গ্যারান্টি! আমি পষ্ট দেখেছি। ঘাড়ের থেকে চুলের মধ্যে হাফ ইঞ্চি ফাঁক আছে।'

রন্টু-সহ বাকিরা কেউই কথাটা বিশ্বাস করেনি সেদিন। কিন্তু তার ঠিক দু'দিন পরে থার্ড পিরিয়ডটা শেষ করে স্যার যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন, মারাত্মক একটা ঝড় উঠল। হঠাৎ দমকা হাওয়া এসে চোখমুখ ঢেকে দিল ধুলোবালিতে। রন্টু সিঁড়ি বেয়ে উঠছিল ঠিক সেসময়েই। ধুলোবালির তোড়ে ও চোখটা বন্ধ করে নিয়েছিল খানিকক্ষণ। যখন চোখ খুলল, দেখল একটা টাকমাথা অচেনা লোক কাচুমাচু মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। তার দিকে বেশ খানিক্ষণ ড্যাবড্যাব করে চেয়ে থেকে লোকটাকে চিনতে পেরেছিল রন্টু। রাখহরি সমাদ্দার! হঠাৎ দমকা হাওয়ায় স্যারের পরচুলোটা উড়ে গিয়ে সামনের নর্দমায় পড়েছে। সেই যে হাসি শুরু হল রন্টুর, থেমেছিল বাড়িতে ফিরে শিঙাড়া আর মুড়ি খেতে খেতে।

এই বীভৎস হাসির তাণ্ডব হেডস্যারের কান পর্যন্ত পৌঁছেছিল। হেডস্যার রন্টুকে পরের দিন পরপর তিনটে ক্লাস দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। এরকম হাসতে হাসতে ফেঁসে যাওয়ার অজস্র নজির রয়েছে রন্টুর, ওর বন্ধুরা তার সাক্ষী।

আজ কেউ শাস্তি দেওয়ার নেই ঠিকই, তবে অমন বীভৎস সব খেলা দেখতে দেখতে মারাত্মক হাসি পেলে দর্শকদের মনোসংযোগ ব্যাহত হবে। তারা বিরক্ত হবে। তাই সানডে, পঞ্চু, ভুলাই, মানসরা পইপই করে বলেছে, মজাদার কোনও দৃশ্য দেখলেও ওরকম না হাসতে।

যত সময় এগোচ্ছে, নবজাগরণ ক্লাবের মাঠটা লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠছে। চারিদিকে শুধু কালো কালো মাথা। রন্টুরা একটু আগে চলে আসায় পছন্দমতো একটা জায়গায় বসে পড়তে পেরেছে।

নির্ধারিত সময়ের সামান্য একটু পরেই শুরু হল শো। সেই জাদুকর ঝকমকে একটা পোশাক পরে আছে আজ।

মুখের সামনে মাইক্রোফোন লাগিয়ে সে বলতে শুরু করল, 'ঝিঙেপোতা নবজাগরণ ক্লাব আমাদের যে সুযোগ দিয়েছে আজ, তারজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা জানাই উপস্থিত সকল দর্শকদের। যে খেলাগুলো আজ আমরা দেখাব, তা একইসঙ্গে যেমন আকর্ষণীয়, তেমনি মারাত্মক বিপজ্জনকও। সামান্য হিসেবের গরমিল হলে জীবনের ঝুঁকিও থেকে যায়। পেটের দায়ে আমরা এসব কাজ করি, আপনাদের আনন্দ দেওয়াটাও আমাদের একটা উদ্দেশ্য। এখানে মনোসংযোগ রক্ষা করা খুবই দরকার।' একটু থেমে সেই জাদুকর বলে চলল, 'অযথা হই-হুল্লোড় করবেন না। ভালো লাগলে প্রতিটি খেলার শেষে হাততালি দেবেন, কিন্তু দয়া করে চিৎকার চেঁচামেচি করে আমাদের কর্মীদের বিপদের মধ্যে ফেলবেন না।'

পঞ্চু আলতো করে একবার রন্টুর পিঠে চাপড় মারল। জাদুকরের অদ্ভুত পোশাক দেখে রন্টুর গমকে-গমকে হাসি উঠে আসছিল প্রথম থেকেই। খুব কষ্ট করে সামলে নিচ্ছিল নিজেকে।

প্রথম খেলাটাই হাত-পা বেঁধে গর্তে ফেলে দেওয়ার। রন্টু দেখল একটা বারো-চোদ্দো বছরের রুগ্নপ্রায় ছেলেকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত পিছমোড়া করে বাঁধল ওরা। তারপর আগে থেকে কেটে রাখা বিরাট একটা গর্তের মধ্যে তাকে ফেলে দিয়ে মাটি চাপা দিয়ে দিল।

সেই জাদুকর পুনরায় মাইকটা মুখের কাছে নিয়ে বলতে লাগল, 'ছেলেটার নাম ভিকি। ওকে এই যে গর্তে ফেলে দেওয়া হল, পরশু বিকেলে আবার তোলা হবে। আপনাদের সকলের মনের সন্দেহ দূর করতে নিজের হাতে মাটি চাপা দিতে পারেন। আসবেন নাকি কেউ?'

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে কুড়ি-পঁচিশ জন লোক ছুটে এল। পাশে স্তূপাকার করে রাখা মাটি হাত দিয়ে সরিয়ে সরিয়ে ফেলতে লাগল গর্তের মধ্যে। পঞ্চু আর সানডেও গেল গর্তটা মাটি দিয়ে বুজিয়ে দিতে।

আট-দশটা অন্যান্য খেলা হওয়ার পরের পর্বে শুরু হল বুকের উপর দিয়ে বাইক চালানো। একটা বছর সত্তরের বুড়ো লোক শুয়ে পড়ল মাঠের মাঝখান বরাবর। তার বুকের উপরে একটা কাঠের পাটাতন রেখে দেওয়া হল। এরপর মাঠের একেবারে শেষপ্রান্ত থেকে অল্পবয়সি একটা ছেলে মারাত্মক স্পিডে বাইকটা চালিয়ে নিয়ে এসে বৃদ্ধ লোকটার বুকের উপর দিয়ে উঠে গেল।

দর্শকরা ফেটে পড়ল উল্লাসে। হই-চই করতে নিষেধ থাকলেও শুনল না কেউ। পঞ্চু দেখল রন্টু একমনে খেলা দেখছে।

জাদুকর পুনরায় ঘোষণা করল, 'এবার আরও কঠিন খেলা দেখবেন আপনারা। বাইকের বদলে ইরফানচাচার বুকের উপর দিয়ে ট্রাক্টর চালানো হবে এবার। ইরফানচাচার জন্য আপনারা সকলে জোরে হাততালি দিন একবার।'

হাততালির ঝড় উঠল আবার। সঙ্গে প্রবল হুল্লোড়।

পঞ্চু দেখল ঝিঙেপোতা গ্রামের সব লোকজন এলেও এত ভিড় হত না। আশেপাশের সব গ্রামের মানুষ এসে জড়ো হয়েছে আজ।

যথারীতি ট্রাক্টর চলতে শুরু করল। ধোঁয়া উড়িয়ে এগিয়ে আসতে লাগল অপেক্ষারত ইরফানচাচার দিকে। ইরফানচাচা বুকের উপর কাঠের পাটাতনটা নিয়ে শুয়ে আছে চুপটি করে।

দর্শকদের মধ্যে থেকে শুরু হয়েছে টীকাটিপ্পনি। কেউ বলছে, 'বুড়োটা পটকে না যায়!'

কেউ বলছে, 'বুড়োটাকে জমি ভেবে ট্রাক্টরের ড্রাইভার যেন লাঙল চালিয়ে না দেয়!'

সানডে হাসতে হাসতে বলল, 'স্যান্ডউইচ হয়ে যাবে রে বুড়োটা এবার!'

কথাটা শুনে সকলে হেসে উঠল।

একটা শিরশিরে হাওয়া দিচ্ছে। বাতাসে এতক্ষণ গুমোট ভাব ছিল একটা, সেটা কেটে যাচ্ছে। আর খানিক বাদেই সন্ধে নেমে আসবে। এটাই বোধহয় আজকের শেষ খেলা।

সকলে চিৎকার করছে। ট্রাক্টরটা ইরফানচাচার থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে। হঠাৎ সকলে থামিয়ে দিল গর্জন। স্থির নিঃশ্বাসে সময় পেরোল কয়েক সেকেন্ড। তারপর ট্রাক্টরের ড্রাইভার প্রচণ্ড জোরে স্পিড তুলল গাড়ির। চোখের নিমেষে ট্রাক্টরটা ইরফানচাচার বুকের উপর উঠে পেরিয়ে গেল বিদ্যুতের গতিতে।

কয়েক মুহূর্তের একটা বিরতি। দর্শকরা নিজেদের হৃৎপিণ্ডের শব্দও শুনতে পাচ্ছিল বোধহয়।

সকলে তাকিয়ে দেখল ইরফানচাচা কাঠের পাটাতনটা ফেলে দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। দর্শকদের দিকে তাকিয়ে ঝুঁকল একটু। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল হুল্লোড় আর চিৎকার।

কেউ বলল, 'লোকটার বয়স হলে কী হবে, স্ট্রং!'

কেউ বলল, 'টিএমটি বার!'

সানডে আর পঞ্চুরা খেলা দেখতে দেখতে এতক্ষণ রন্টুর কথা ভুলে গিয়েছিল। হঠাৎ ওদের চোখ পড়ল রন্টুর দিকে, দেখল মাথা নীচু করে বসে রয়েছে ছেলেটা।

ভুলাই আর মানস দেখল, রন্টুর পিঠটা কেঁপে-কেঁপে উঠছে।

সানডে ওকে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল, 'আবার হাসিভূত ভর করল তোকে এই সন্ধেবেলা! নে, আগে হেসে নে, তারপর বাড়ি যাস।'

ঝিঙেপোঁতার নবজাগরণ ক্লাবের মাঠ দর্শকশূন্য হয়ে এসেছে। ইতস্তত দু'চারজন। রন্টু তখনো মাথা নীচু করে বসে রয়েছে। পিঠটা কাঁপছে মাঝে-মাঝে।

পঞ্চু ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল, 'আরে! শুধু শুধু হাসছিস কেন আবার!'

ভুলাই এবার টেনে তুলল ওকে। আর তারপরেই সকলে অবাক হয়ে গেল। রন্টুর দু'চোখ ভেসে যাচ্ছে জলে।

'এতক্ষণ তুই কাঁদছিলি রন্টু! কিন্তু কেন?'

'শরীর খারাপ লাগছে? পেটে ব্যথা? মাথার যন্ত্রণা করছে? নাকি খিদে পেয়েছে রে?' বলল সানডে।

'কী হয়েছে বল!' মানস বলল।

রন্টু জামার হাতায় চোখদুটো মুছে নিল। তারপর কাঁপাকাঁপা গলায় বলল, 'ভগবান গরিব তৈরি করে দেয় না, বরং আমরা একে অপরকে সহযোগিতা করি না বলেই দারিদ্র্য সৃষ্টি হয়। তাই না রে? তা না হলে, ভিকির মতো ওইটুকু একটা ছেলে, কিংবা ইরফানচাচার মতো অত বুড়ো একটা মানুষকে এত কষ্ট করতে হয়!'

পঞ্চুরা দেখল, আরও কীসব বলে চলেছে রন্টু। বেশিরভাগ কথারই অর্থ বুঝতে পারছে না ওরা।

দ্রুত সন্ধে নেমে আসছে ঝিঙেপোঁতার মাঠে। রন্টু তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে চলেছে। পঞ্চুরা এটুকু বুঝতে পারছে, হাসিভূতে ভর করা ছেলেটা মানুষের কষ্টে কাঁদতেও পারে, যেটা আবার বহু মানুষ, শত চেষ্টা করলেও করতে পারে না। কিশোর ভারতী

গৌতমেন্দু রায়

ওঁরা এলেন

শহর থেকে অনেক দূরে অচেনা এক গ্রামে
ভোরের বেলা উড়িয়ে ধুলো বাসটা এসে থামে
গাঁয়ের তখন ঘুম ভাঙেনি, আকাশটা ঘোর নীল
গাছের ডালে ঝিমোয় বসে ময়না, শালিখ, চিল
দিঘির জলে পদ্ম শালুক দেখছে মাথা তুলে
কোত্থেকে এই বাসটা এল, নেহাতই পথ ভুলে?

বাসের দরজা যাচ্ছে খুলে নামছে ময়ূর পক্ষী
কার্তিকও যে নামল দেখো, তার পেছনে লক্ষ্মী
হাঁসকে নিয়ে সরস্বতী নামেন শান্ত মুখে
ছোট্ট গনেশ লাড্ডু হাতে আছেন বড়ই সুখে।
ওই যে দেখো নামেন উমা, ছড়িয়ে পড়ে আলো
দূর হবে সব দুঃখ এবার, সবার হবে ভালো
বাসটা এবার ঘুরবে জানি শহর থেকে গঞ্জে
গাইছে আকাশ আগমনী, উঠছে নেচে মন যে।

মোহম্মদ শাহবুদ্দিন ফিরোজ

থাকব কাদের সাথে?

বিষ মেশানো হাওয়াতে নেয়া শ্বাস
মুখ লুকিয়ে শূন্য ধরি হাতে।
পলিথিনের মোড়কে সর্বনাশ
এখন আমি থাকব কাদের সাথে?

হাতের ভেতর আগলে রাখি কাকে?
তুলছে ফসল গাছের গুঁড়ি কেটে
দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরি মাকে।
বিষ-ভেজালের সভ্যতা এই পেটে।

বাঁচতে হলে দু'হাত তুলে বলি—
গড়বো সবুজ শুনব না আর মানা।
এই পরিবেশ আমরা গড়ে তুলি
বন্ধু হবে প্রজাপতির ডানা...

জয়ন্ত দে

আশ্রয়

সেদিন সন্ধে থেকেই ঝড় বৃষ্টির সঙ্গে পাওয়ার কাট। আমরা জনা দশেক ভূতের মতো অন্ধকারে ক্লাব ঘরের দোতলায় বসে আছি। কে যেন বলল, 'আজ অমাবস্যা।'

বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। বাবলু বলল, 'মুড়ি তেলেভাজা হলে এখন জমে যেত!'

'পাবে কোথায়?' সন্টু বলল, 'চা-ও হবে না। বিশুদা চায়ের দোকান বন্ধ করে চলে গেছে।'

আমি বললাম, 'সেসব না হোক, ভূতের গল্প তো হতে পারে—সেটা কি পাওয়া যাবে?' কারও মুখে কথা নেই। আবার বললাম, 'কি নিঝুমবাবু, স্টকে কি কিছু আছে?'

'আমাকে বলছেন ভূতের গল্প? না স্যার আমি ভূত দেখিনি।'

'ভূত দেখেননি তো কী হয়েছে। ভূতের গল্প নেই?'

নিঝুমবাবুর মতো ভালো কথকঠাকুর আর কেউ নেই। তাই সবাই বলে উঠল, 'একটা ভূতের গল্প হয়ে যাক। স্টক ঝেড়ে দেখুন।'

নিঝুমবাবু আমতা আমতা করে বললেন, 'ভূতের গল্প কি না জানি না, তবে একটা ঘটনা আছে। শুনবেন?'

সমস্বরে সম্মতি জানালাম।

ছবিঃ অমিত সেন

'নওসাদ সাহেব ছিলেন আমার কলিগ। অনেকদিন আগে আমরা একবার তাঁর বাড়ি গিয়েছিলাম। বসিরহাটের প্রত্যন্ত গ্রামে। বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম। নওসাদ সাহেবের পরিবার চমৎকার। যেমন শিক্ষিত, তেমনই সম্ভ্রান্ত। গ্রামে তাঁদের বিস্তর সম্মান, জমিজমা প্রচুর। সারাদিন ছিলাম। যাওয়ার পর পরই নওসাদ সাহেব আমাদের অদ্ভুত একটা জিনিস দেখালেন। তাঁদের বাড়ির লাগোয়া ছোট্ট একটা জায়গা। বাড়ির উঠোনই বলা যায়। নানা ফুল গাছ লাগানো। খুব শান্ত পরিবেশ। সেই বাগানের গেট খুলে নওসাদ সাহেব আমাদের ভিতরে নিয়ে গেলেন। বললেন, 'আসুন, আমাদের পরিবারের সবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।'

নওসাদ সাহেব বললেন, 'এটা আমাদের পারিবারিক কবরস্থান।'

'পারিবারিক কবরস্থান মানে?'

নওসাদ সাহেব হাসলেন, 'ওই যে আমার মা ওখানে শুয়ে আছেন। ঠিক তার ওপাশের দিকে তাকান। পর পর দুটো কবর দেখছেন— একটায় আমার ঠাকুরদা আর তার পাশে আমার ঠাকুমা।'

আমরা চমৎকৃত হয়ে তাকিয়ে আছি।

নওসাদ সাহেব বললেন, 'মায়ের ডান দিকে আমার বড়দি। বড়দির পায়ের কাছে লতানে গোলাপ গাছ, সারা বছর ফুল হয়, আর ঝরে—। তার পাশে আমার বাবার জায়গা।'

'বাবার মানে!'

আমরা তিনজন একসঙ্গে আঁতকে উঠলাম। কারণ, একটু দূরে বারান্দায় ইজি চেয়ারে নওসাদ সাহেবের বাবা বসে আছেন। তাঁর পাশে রাখা আমাদের নিয়ে যাওয়া বইগুলো।

দুই

ওই বইগুলোর কথা আগে বলে নিই।

আমাদের যখন নওশাদ সাহেবের বাড়ি ঘুরতে যাওয়ার দিনক্ষণ ঠিক হল, তখনই নওসাদ সাহেব অদ্ভুত একটা কথা বললেন। আমাদের তিনজনকেই একসঙ্গে ডেকে বললেন, 'আপনারা সকাল সকাল আসুন। এসে ব্রেকফাস্ট করবেন। দুপুরে খাবেন। কচি পাঁঠার মাংস খাওয়াব। ঘাস খাওয়া, কালো কচি পাঁঠা। স্বাদে অতুলনীয়। হাড়সুদ্ধ খেয়ে নেবেন। ভালো চিংড়ি পাওয়া যায়। গলদা চিংড়ি, জ্যান্ত অবস্থায় ট্রান্সপারেন্ট, মনে হবে কাচের। মালাইকারি হবে। আমিনা দারুণ রাঁধে। আশা করি আপনাদের কারও চিংড়িতে অ্যালার্জি নেই। স্পেশাল হচ্ছে পুকুরের মাছ। সেটার জন্য আপনাদের ছিপ-বঁড়শি-চার—সব দেব। প্রচুর মাছ আছে। যা ধরবেন—তাই ভেজে খাওয়াব। বেশি ধরলে আমিনা ভেজে দেবে, সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে আসবেন। আর ধরতে না পারলে শুধু মাছের লেজের ঘাই দেখবেন জলে।'

মৃদুল বলল, 'আমরা কেউই মাছ ধরতে জানি না। ধরে দেবেন, ভেজে দেবেন, খাব। পুকুরের মাছ!'

নওসাদ সাহেব হাসলেন, 'ওটি হবে না। আমরা পুকুরের মাছ নিজেরা ধরি না। ধরে খাই না। ধরে কাউকে খাওয়াইও না। পুকুর আর তার মাছ আপনাদের জন্য রাখা আছে। এবার আপনাদের কিসমত।'

আমি বললাম, 'আমাকে ছিপ দেবেন, আমি ধরব। ছোটবেলায় মামারবাড়ি গিয়ে ছিপে মাছ ধরেছি, খুব পারব।'

'গুড। এই তো রাজীববাবু রাজি।'

আমরা সবাই হেসে উঠলাম।

তখনই নওসাদ সাহেব বললেন, 'আর একটা কথা, আপনারা যখন আমাদের বাড়ি যাবেন, তখন নিশ্চয়ই হাতে করে কিছু নিয়ে যাবেন। মানে ভদ্রতা করে মিষ্টি টিষ্টি, খাবার দাবার। যদি না নিয়ে যান খুশি হব। যদি নিয়ে যাওয়ার কোনও প্ল্যান থাকে, তবে কোনও খাওয়ার জিনিস নেবে না দয়া করে। প্লিজ!'

'মানে?' এটা কেমন ব্যাপার? ভদ্রতা, শিষ্টাচার আছে তো—! শুধু হাতে যাব?'

'শুধু হাতে যাবেন কেন? কী নিয়ে যাবেন—আমি বলে দিচ্ছি।'

'বলুন, বলুন।'

'সেরেফ বই। বই নিয়ে যাবেন।'

'বই!' খাবারের বদলে বই!'

'জি। আমার বাবা সারাদিন বসে বই পড়েন। বলতে পারেন বই-ই ওনার সঙ্গী। আমরা কেউ দেশের বাড়িতে থাকি না। শনিবার দৌড়ে দৌড়ে যাই, সোমবার হাঁপাতে হাঁপাতে কলকাতায় ফিরে আসি। আমিনা বাবাকে দেখাশোনা করে। শনিবার বাবা সকাল থেকে আমাদের যাওয়ার অপেক্ষায় থাকেন। খাবার দাওয়ার আয়োজনে ব্যস্ত থাকেন। রবিবারও তাই। সোমবার ভোর ভোর বেরিয়ে আসি। বাবা সোমবার ভোর থেকে আবার একা। তখন তাঁর বই-ই সঙ্গী। আপনারা যদি বই দেন, বাবা খুব আনন্দ পাবেন। মিষ্টি দিলে কে খাবে? আমিনা কাজের লোকদের বিলিয়ে দেবে। বা, হয়তো ওটাই আপনাদের রিটার্ন গিফট হবে। তখন আপনাদের খারাপ লাগবে।'

সুশান্ত হাসল, 'রিটার্ন গিফট!'

'জি। জেনারালি গ্রামে গেলে মানুষ রিটার্ন গিফট নেয়—আম, জাম, পেঁপে, লাউ...। আমার বাবা কিন্তু ওসব আপনাদের দেবেন না। বাবা সবাইকে রিটার্ন গিফট দেবেন বই।'

'আপনার বাবা বই আনাবেন? তাহলে বলব—বারণ করবেন।' আমি বললাম।

'বাবা শুনবেন না। তবে বই আনাবেন না, স্টক থেকেই দেবেন। আসলে বাবার অনেক ছাত্রছাত্রী। বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসে। তারাই বাবাকে বই গিফট দেয়। রিটার্ন গিফটে বাবা তাদের বই দেন। বই আদান প্রদানে একটা বিনিময় প্রথা চলে।'

'বাহ্, দারুণ ব্যাপার তো। ঠিক আছে। আপনার বাবার জন্য বই নিয়েই যাব। কিন্তু কী বই নেব?'

'চেষ্টা করবেন আনকমন বই নিতে। কমন হয়ে গেলে, মানে বাবার পড়া থাকলে, রেখে দেবেন, অন্য কাউকে দেবেন। তাতেও অবিশ্যি অসুবিধে নেই।'

আমার মনের মধ্যে খচখচ করে, আনকমন কী বই দেওয়া যায়? ঠিক করে নিই কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়ায় যাব। আলতো গলায় জিগ্যেস করি—'উনি কী পড়তে ভালোবাসেন?'

'সব ধরনের বই পড়েন। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ। ইতিহাস থেকে যে কোনও ধর্মীয় বই, রহস্য গোয়েন্দা অ্যাডভেঞ্চার। অনুবাদ সাহিত্য। আমার বাবা মেডিকেল পড়তে পড়তে থার্ড ইয়ারে ছেড়ে দেন। ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি, উর্দু, চারটে ভাষার বই। শুধু ভূতের গল্পের বই দেবেন না। বয়েস হয়েছে তো।'

'কেন? ভূতের গল্প বারণ কেন?'

'ওই যে বললাম—বয়েস হয়েছে। গুরুপাক জিনিস—যদি রাতে পেটে মোচড় দেয়—।'

আমরা নওসাদ সাহেবের কথা মেনেই তাঁর বাবার জন্য বই এনেছি। সুশান্ত কলেজ স্ট্রিট গিয়েছিল। বলল, 'এরপর যদি কমন পড়ে আমার কিছু করার নেই।'

নওসাদ সাহেবের বাড়ি গিয়ে তাঁর বাবার হাতে বইগুলো তুলে দিলাম। দেখলাম—মানুষটার দু-চোখ ঝকঝক করে উঠেছে।

তিন

ফিরে আসি সেই কবরের কথা। আমরা মোহাবিষ্টের মতো তাকিয়ে থাকি নওসাদ সাহেবদের পারিবারিক কবরখানার দিকে। চারদিকে ফুলে ফুলে ভরে আছে। কাঞ্চন, টগর, বেলি, জুঁই, শিউলি, জবা...।

চারদিকে ফুলের সুবাস। সামনে নওসাদ সাহেব, তাঁর গা ঘেঁষেই আমরা তিনজনে দাঁড়িয়ে।

সুশান্ত বলল, 'একটা কথা বলব, আপনাদের কাছাকাছি কি কোনও সাধারণের জন্য কবরখানা নেই?'

'থাকবে না কেন।'

'তাহলে বাড়ির ভেতর?'

'দেখুন, নিজের ঘর বিছানা থাকতে কে অন্য লোকের জায়গায় গিয়ে ঘুমোবে? সবাই নিজের ঘর বিছানায় সবচেয়ে বেশি স্বচ্ছন্দ।'

মৃদুল বলল, 'বাড়ির ভেতর কবরখানা—অসুবিধে হয় না?'

'অসুবিধে হবে কেন, বরং সুবিধে। নিজেদের কাছাকাছি থাকল। তাদের দেখভালে সুবিধে হয়।'

মৃদুল মাথা চুলকাল। 'না, আসলে শ্মশান, কবর, সিমেট্রি—কেমন একটা ফিলিং হয়।'

'তা হতেই পারে। সেখানে অন্য অন্য লোক আছে বলে। কিন্তু যেখানে নিজের লোকজন থাকে, সেটা তো আপন জায়গা।'

আমি মৃদুলকে চোখ ইশারা করলাম, থাম। ও ভূতপ্রেতের ভয়ের কথা বলতে চাইছে, নওসাদ সাহেব এড়িয়ে যাচ্ছেন।

সুশান্ত বলল, 'তবে, একটা বিষয় আমার ভালো লাগল না। আপনার বাবা বেঁচে, অথচ তাঁর জন্য কবরের জায়গা চিহ্নিত করে রাখাটা। না, না এটা ঠিক নয়।'

নওসাদ সাহেব হাসলেন, 'শুনুন, আমার জন্যও জায়গা নির্বাচন করা আছে। আমার ভাইয়ের জন্যও। বাবা নিজে জায়গা সিলেকশন করে দিয়েছেন। তাহলে কী বলবেন? উনি বাবা হয়ে সন্তানের মৃত্যুচিন্তা করছেন?'

সারাদিন খুব আনন্দ করে ফিরে এলাম।

কিন্তু নওসাদ সাহেব এলেন না। এলেন না তো এলেন না। তার পরেরদিনও নওসাদ সাহেব এলেন না। কলকাতা ফিরলেন তিনদিন পেরিয়ে। ফিরলেন যেন বিধ্বস্ত একজন মানুষ।

'কোনও প্রবলেম? কোনও হেল্প করতে পারি?'

উনি অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'না, তেমন কিছু নয়—বই কিনতে কি আপনি গিয়েছিলেন?'

সুশান্ত বলল, 'না, আমি গিয়েছিলাম।'

নওসাদ সাহেব দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন, 'আপনাদের আমি বলিনি—আমার বাবা কেন মেডিকেল পড়া বন্ধ রেখে ফিরে এসেছিলেন। কারণটা আর কিছু না, বাবার মেডিকেল কলেজের বন্ধুরা মজা করে ভয় দেখাতে বাবার বিছানায় একটা কাটা পা রেখে দিয়েছিল। তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাই আপনাদের বলেছিলাম—ভূতের বই দেবেন না। আপনারা শুনলেন না। বইগুলো আমি বা আমিনা চেক করিনি। তারপরেই এই বিপত্তি—।'

'কী হয়েছে?'

'আপনাদের দেওয়া বইয়ের মধ্যে একটা ভূতের গল্পের বই ছিল। রাতে তিনি সেই বই পড়েন। এবং আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন। দিশাহারা হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে সারারাত বসে থাকেন কবরখানায়। মা আর দিদির কবরের মাঝখানে আশ্রয় নেন। ভোরে বাবাকে দেখতে পায় আমিনা। তখনই আমাকে-ভাইকে খবর দেয়। সারারাত হিমে ঠান্ডায় বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।'

আমি মাথা নীচু করি। সুশান্তও হতবাক। বিড়বিড় করে মৃদুল বলল, 'ভূতের ভয় পেয়ে আপনার বাবা কবরে গিয়ে আশ্রয় নিল!'

নওসাদ সাহেব বললেন, 'ভয় পেয়ে আপনি কার কাছে আশ্রয় নেবেন? মা বাবা ভাই বোন স্ত্রী সন্তানের থেকে আপন কে আছে!'

কিশোর ভারতী

ফর্মুলা

রোহন রায়

এক

তা বলে ওষুধটা আপনি নষ্ট করে ফেলবেন?

—তোমাদের হাতে পড়তে দেবার চেয়ে সেটা অনেক ভালো। ফর্মুলা থেকে ওষুধ বানিয়ে নিতে কতক্ষণ?

—এটাই তাহলে আপনার ফাইনাল সিদ্ধান্ত? ওষুধটা আমাদের দেবেন না?

—এক কথা আর কতবার বলব বলো তো? শুধু তোমাদের কেন, কোনও ফার্মা কোম্পানিকেই আমি ফর্মুলা দেব না। নিজেই যা করার করব। ফাইনাল টেস্টটা হয়ে যাক, তারপরেই কোমর বেঁধে নেমে পড়ব।

—এরকম একটা ওষুধের প্রোডাকশন, ডিসট্রিবিউশন কোন লেভেলের হতে পারে কোনও ধারণা আছে আপনার?

—নেই। হয়ে যাবে। শিখে নেব। ইন ফ্যাক্ট, এইসব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করেও দিয়েছি।

—আপনি সায়েন্টিস্ট মানুষ, কেন এসবের চক্করে পড়ছেন? বিজনেস-ফিজনেস কি আপনার কাজ?

—তোমরা তো কয়েক লাখ টাকা দাম করবে। ক'জন কিনতে পারবে? বাকিদের কী হবে? মশা-মাছির মতো মরবে সব? না ম্যাক। আমার ওষুধ সবার জন্য।

—একটা মারণ-রোগের ওষুধের একটু তো দাম হবেই ডঃ সেন। মানুষের জীবন-মরণের প্রশ্ন।

ছবি: কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল
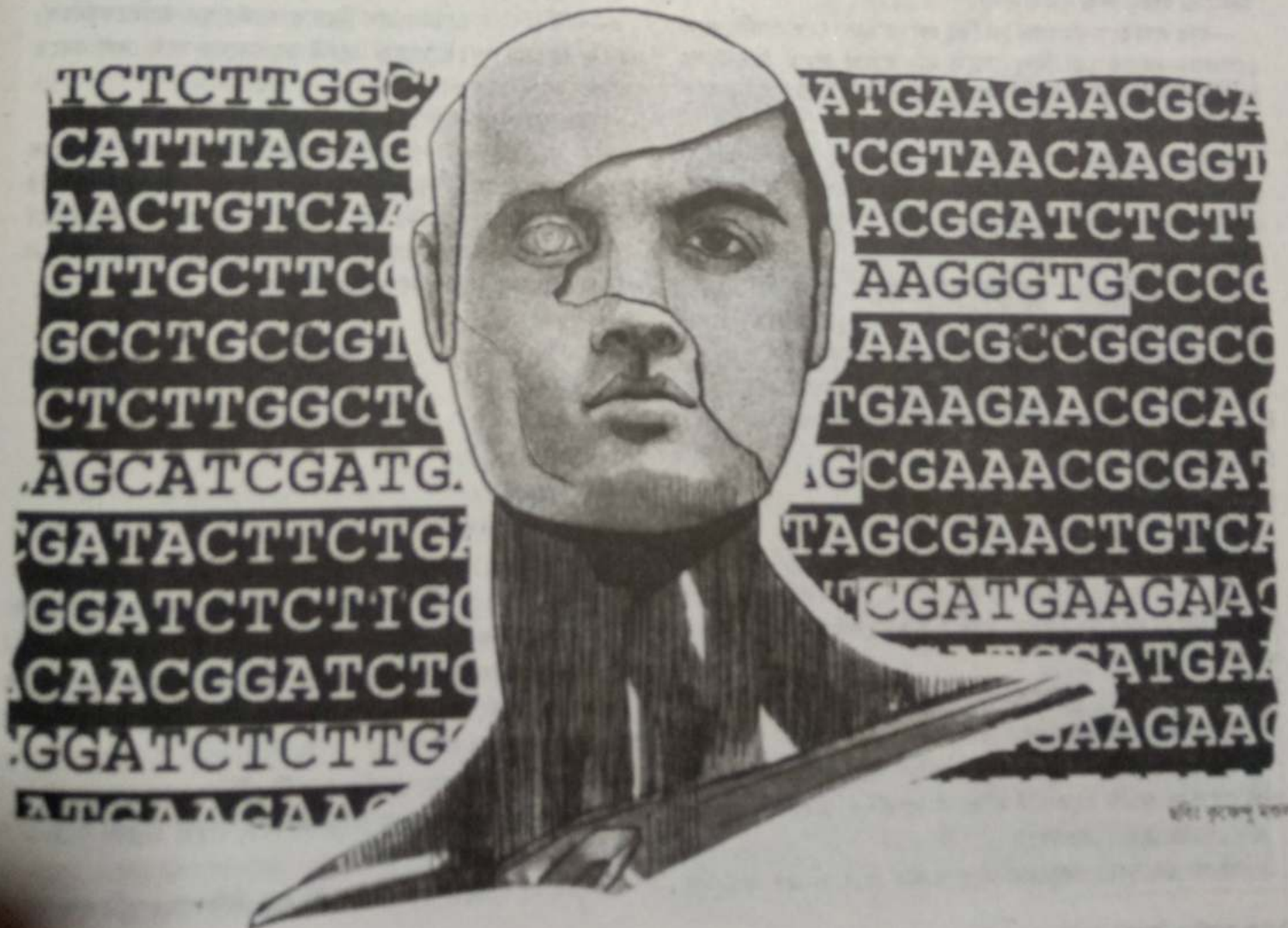
—সেইজন্যেই তো। হাতে-গোনা কিছু মানুষ বাকি সমস্ত মানুষের জীবন-মরণ নিয়ে খেলেই যাবে, এটা হতে দেওয়া যায় না। সম্ভব হলে আমি এই ওষুধের দাম এক ডলার রাখব। তোমাদের যেমন সমাজসেবা করলে চলবে না, আমারও তেমন এই ওষুধটা নিয়ে ব্যবসা হতে দিলে চলবে না। সরি।

—আরেকবার ভাবুন ডক। প্লিজ। ব্ল্যাঙ্ক চেক রেডি আছে, এই দেখুন। পাঁচের পর যতগুলো শূন্য আপনি চান। গিভ ইট আ সেকেন্ড থট, প্লিজ।

—লোভ থাকলে কি এতদিন ভাঙাচোরা পৈতৃক বাড়িতে পড়ে থাকি? আদ্দিকালের একটা ইনোভা চালিয়ে ঘুরি? লোভ আমার নেই। লজ্জা-ঘেন্না-ভয় কোনোটাই নেই। ফ্যামিলি নেই, পিছুটানও নেই। ফলে আমাকে চেকমেট করা তোমাদের কম্ম না। তাই বলছি, নিজেদের এবং আমার সময় নষ্ট কোরো না। তোমাদের যা যা ডোজ দেবার, দিয়ে তো দেখলে...। আরও কিছু কি বাকি আছে? ইলেকট্রিক শক-টক দেবে? দিয়ে নাও তাহলে। কিন্তু যা করার চটপট করো। সময় নষ্ট কোরো না।

—না-না। সে রিস্ক নেওয়া যায় না। আপনার মাথাটাই তো সম্পদ। তাছাড়া আমরা তো খুনি নই, আমরা বিজনেসম্যান। চলুন আপনাকে আপনার ফ্ল্যাটে নামিয়ে দিয়ে আসি।

—অবশেষে বুঝলে! থ্যাঙ্কিউ।

—ওয়েলকাম। তবে বেশি আনন্দ পাবেন না। খেলা কিন্তু সবে শুরু। আমাদের নজর এড়িয়ে ওষুধ বা ফর্মুলা কোথাও পাঠাতে পারবেন না। আপনি চব্বিশ ঘণ্টা আমাদের নজরদারিতে থাকবেন।

—সে আমি জানি। বাথরুমের সময়টা একটু কনসিডার কোরো। আর কিছু চাই না।

—ইয়ার্কি মারছেন? আপনি বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হতে পারেন, আমাদের হাতও কিন্তু কম লম্বা না।

—হাত লম্বা হয়ে খুব লাভ তো কিছু হল না ম্যাক। আমার বাড়ি, ল্যাব তোলপাড় করেও তো কিচ্ছু পেলে না। আমার সমস্ত ডিভাইসের সিকিউরিটি কোড ভেঙেছ, মেল হ্যাক করেছ। একটা কুটো নাড়তে বাকি রাখোনি। কিন্তু ফলাফল তো ফক্কা।

—পেয়ে যাব। আমাদের হাতে অনেক সময়। আমাদের কোনও তাড়া নেই। তাড়া বরং আপনারই। ফর্মুলা যেখানেই থাক, শেষপর্যন্ত আমাদের কাছেই আসবে। সেটা যেভাবেই হোক। কতদিন লুকিয়ে রাখতে পারেন দেখি।

—বেশ। তোমার যখন এত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, তাহলে বলেই দিই। ফর্মুলা বাড়িতেই রয়েছে, ল্যাবে নয়। এ-ও বলে দিচ্ছি, তোমাদের নাকের ওপর দিয়েই ওটা পাচার করব। তোমরা কিচ্ছু করতে পারবে না। চ্যালেঞ্জ।

—ওভার কনফিডেন্স বাজে জিনিস ডক। এত ভালো একটা ডিল দিলাম, আপনি রিফিউজ করলেন। এরপর এমন অবস্থা না হয় যে শ্যামও গেল, কূলও গেল।

দুই

—নখ থেকে রক্ত বেরোচ্ছে কেন?

—একটু খাতির-যত্ন করেছে আর কী। যাক গে, সেসব বাদ দাও। আগে আমাকে ভালো করে স্ক্যান করো। ট্র্যাকার বা মাইক্রোফোন কিছু না-কিছু পাবেই।

—পেয়ে গেছি স্যার। দুটো। আপনাকে কি ওরা অজ্ঞান করেছিল?

—হ্যাঁ। বেশ খানিকক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম।

—হার্টের কাছে একটা মাইক্রোরেকর্ডার চিপ লাগিয়েছে। আরেকবার একটু কষ্ট করে অজ্ঞান হতে হবে স্যার। আনাস্থেশিয়া দেব।

—বেশ। আরেকটা কোথায়?

—বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলের নখে একটা ট্র্যাকার। নখ কাটলেই বেরিয়ে যাবে।

—শ্রীবিলাস, পনেরো মিনিটের মধ্যে সব সেরে নাও। তারপর পুলিশ স্টেশনের নম্বরটা ধরে দাও আমায়। দিনকয়েক পুলিশ পোস্টিং নিয়ে রাখা দরকার।

—তাতে কি খুব লাভ হবে স্যার?

—না। তবু। পুলিশকে জানিয়ে রাখা ভালো। ফাইনালি কাজে দেবে।

তিন

—খারাপ খবর ম্যাক। দুটো ডিভাইসই বের করে ফেলেছে। বাড়ি ঢুকেই।

—বের করে ফেলবে তো জানা কথাই। একটা চান্স নিয়েছিলাম। সামান্য কিছু একটা ক্লু-ও যদি পাই। তা চেষ্টাটা একেবারে জলে যায়নি।

—কিছু পেলে নাকি?

—হ্যাঁ। এই শ্রীবিলাস লোকটা...কিছু একটা গণ্ডগোল আছে।

—কেন?

—ডঃ সেন স্ক্যান করার কথা উচ্চারণ করতে না করতে ও ফুল বডি স্ক্যান করে ফেলল কী করে? এত দ্রুত? স্ক্যানার নিয়ে আসতেও তো মিনিমাম সময় লাগে, তারপর তো স্ক্যান করবে। বুঝতে পারছ কী বলছি?

—কিন্তু শ্রীবিলাসের ফুল হিস্ট্রি তো আমাদের কাছে আছে। মেদিনীপুরের ডেবরায় বাড়ি। বছর সাতেক ডঃ সেনের কাছে আছে। রান্নার হাত অসাধারণ।

—মিথ্যে হিস্ট্রি তৈরি করা এমনকী হাতি-ঘোড়া ব্যাপার?

—তা বটে।

—ডঃ অসীম গুপ্তকে চেনো?

—না। কে?

—আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে কাজ করছেন ক্যালিফোর্নিয়ায়। ডঃ সেনের প্রিয় বন্ধু। ইংল্যান্ডে এলেই ডঃ সেনের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। একটু খোঁজ লাগাও তো।

—অত ঝামেলায় না গিয়ে শ্রীবিলাসকে তুলে নিলেই তো হয়।

—না, না, তোলাতুলি নয়। যেটা ভাবছি সেটাই যদি হয়, তাহলে ওর সঙ্গে লাগতে যাওয়াটা বোকামি হয়ে যাবে। তুমি খোঁজ লাগাও। আর বাসুকে বলে দাও, ডঃ সেনের বাড়ি থেকে কিচ্ছু যেন ওদের নজর এড়িয়ে বেরোতে না পারে। নাথিং। একটা মাছি বেরোলেও যেন সেটাকে স্ক্যান না করে না ছাড়ে। বুড়ো কিন্তু সাংঘাতিক ধুরন্ধর।

চার

—এই দেখুন।

—কী এটা?

—রেকর্ডার।

—কোথায় ছিল?

—এই অপেলটায়।

—বোঝো কাণ্ড! নিশ্চিন্তে ফলও খেতে দেবে না।

—চিন্তা নেই স্যার, যা কিছু আনছি সব স্ক্যান করে তবেই ঘরে ঢোকাচ্ছি। একটু সতর্ক থাকতে হচ্ছে আর কি। আরেকটা কথা বলাই হয়নি আপনাকে। ভোররাতে একটা টিকটিকি আপনার শোবার ঘরে ঢুকেছিল ঘুলঘুলি দিয়ে। আপনি তখন ঘুমোচ্ছিলেন। টিকটিকিটা আসলে একটা হাই রেজলিউশনের ক্যামেরা।

—কী আপদ রে বাবা! রাতবিরেতে টিকটিকির সঙ্গে যুদ্ধ করলে?

—যুদ্ধ আর কী! ঝুলঝাড়ু দিয়ে নামিয়ে ঘাড়টা হালকা করে টিপে দিলাম।

—তুমি না থাকলে যে আমার কী হত শ্রীবিলাস! তুমি হচ্ছ আমার

অন্ধের যষ্টি। একটু কড়া করে কফি খাওয়াবে নাকি?

—অবশ্যই স্যার।

—বানাও। আমি যাই। ততক্ষণে পায়রা উড়িয়ে আসি।

—পায়রা ওড়াবেন? হঠাৎ?

—দুষ্টু লোকগুলোর সঙ্গে একটু খেলব।

—বুঝেছি। ওরা ভাববে আপনি পায়রা দিয়ে ফর্মুলা পাচার করছেন, তাই তো?

—ইয়েস। সারাদিন একটা বাড়ির ওপর নজরদারি করা কী চূড়ান্ত বোরিং কাজ বলো তো! তাই ওদের একটু বিনোদন দিচ্ছি। আর কিছু না হোক, একটু টাইমপাস তো হবে।

—ল্যাবে কবে যাবেন স্যার?

—ফর্মুলাটা রওনা হয়ে যাক, তারপর।

পাঁচ

—তোমার অনুমানই সত্যি ম্যাক। শ্রীবিলাস একটা সুপারফ্লেক্স হিউম্যানয়েড। ভার্সন ৩ পয়েন্ট জিরো। অসীম গুপ্তই ওকে বানিয়েছিলেন। এ ব্যাটা রেজিস্টার্ড হাউজ-কম্পানিয়ন না। সেজন্যই আমাদের কাছে কোনও ইনফরমেশন ছিল না।

—সুপারফ্লেক্স তো এখনও বাজারে ছাড়া হয়নি?

—না। ডিফেন্স বিভাগের আন্ডারে ট্রায়ালে আছে। তার মানে ডঃ সেনের কাছে নিশ্চয়ই ওকে রাখার স্পেশাল পারমিশন আছে।

—তা-ই হবে। অস্বাভাবিক কিছু নয়। সেন দেশের সেরা মেধাদের একজন।

—কতগুলো পুলিশ দিয়েছে দেখেছ?

—হ্যাঁ, তবে পুলিশকে নিয়ে তো চিন্তার কিছু নেই। আসল চিন্তা এই শ্রীবিলাস। এ ব্যাটাকে এলিমিনেট না করলে সেনকে বাগে আনা মুশকিল।

—আচ্ছা একে অ্যাবডাক্ট করে সিস্টেম ম্যানিপুলেট করে দিলে হয় না? তাহলে তো এর সাহায্যেই কাজ হাসিল হয়ে যাবে।

—অ্যাবডাক্ট করা খুব সহজ হবে কি? সুপারফ্লেক্স রোবো কিন্তু সাংঘাতিক জিনিস। একাই চল্লিশজনের পাঙ্গা নিয়ে নেবে।

—আমার কিন্তু একটা অন্যরকম সম্ভাবনার কথা মাথায় আসছে।

—কী?

—ফর্মুলা শ্রীবিলাসের মধ্যেই নেই তো?

ছয়

—শ্রীবিলাস, সময় হয়ে গেছে। তুমি রেডি?

—হ্যাঁ স্যার।

—সাইকেল চেক করে নিয়েছ? সব ঠিক আছে?

—সব ওকে স্যার।

—বেশ। তোমার ব্যাগে চারটে প্যাকিং বাক্স আছে। প্রথমে যাবে আর্ট গ্যালারির সামনে। রাত ১১টা ৫ মিনিটে আর্ট গ্যালারির সামনে থেকে মিঃ শেরিংহ্যাম একটা বাক্স নেবেন। তারপর তুমি চলে যাবে ন্যাশনাল ফুটবল মিউজিয়াম। রাত ১১টা ৪০ মিনিটে মিউজিয়ামের সামনে থেকে মিস জনসন একটা বাক্স নেবেন। তারপর টাউন হল। সেখানে তিন নম্বর বাক্স নেবেন মিসেস হ্যামক, রাত ১২ টা ১০ মিনিটে। শেষে কাসলফিল্ডে আরবান হেরিটেজ মিউজিয়ামের সামনে থেকে রাত ১২টা ৩০-এ চার নম্বর বাক্স নেবেন মিঃ চ্যাং। ক্লিয়ার?

—ক্লিয়ার স্যার।

—তাহলে রওনা হয়ে পড়ো। দুগগা দুগগা।

—স্যার, একটা কথা জিগ্যেস করব? রাগ করবেন না তো?

—রাগ করব কেন? বলো।

—এর একটার মধ্যেও তো ফর্মুলা নেই, না?

—এত বোকামি আমি কেন করব শ্রীবিলাস? বাক্সগুলোর মধ্যে কী আছে শুনবে?

—কী?

—একটা করে 'বেটার লাক নেক্সট টাইম' লেখা চিরকুট। এছাড়া বিছুটির পাতা থেকে তৈরি একটা স্পেশাল পাউডার ছড়ানো আছে। একবার হাতে লাগলে তিনদিন পর চুলকানি থামবে। একটু জব্দ হোক ব্যাটারা।

—অসাধারণ স্যার। আচ্ছা, ফর্মুলা কি এই ফাঁকেই পাচার করবেন? আজই?

—আজ? হতেই পারে। আবার না-ও হতে পারে। ইন ফ্যাক্ট, পাচারের পদ্ধতিটা এতই সিম্পল যে ওটা নিয়ে বিশেষ ভাবছিই না। যে-কোনও সময়ই হতে পারে।

—মাপ করবেন স্যার, আমাকে কি একটু ডিটেলে বলা যাবে?

—দ্যাখো শ্রীবিলাস, আমি এবং আরও দু-একজন ছাড়া আর কেউই সবটা জানে না, জানবেও না। ফর সেফটি। আমি কী বলছি তুমি বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই। তোমাকে করাপ্ট করা খুবই কঠিন, কিন্তু অসম্ভব তো নয়।

—সরি স্যার। এরকম প্রশ্ন আমার করা উচিত হয়নি। ভেরি ভেরি সরি।

—না-না, সরির কিছু নেই। কৌতূহল হতেই পারে। ইন ফ্যাক্ট, তোমায় কিছুটা হিন্ট দিতেই পারি। তাতে অসুবিধার কিছু নেই। আচ্ছা, বলো তো তথ্য সংরক্ষণ করার আধুনিকতম পদ্ধতি কোনটা? সবচেয়ে সহজ এবং সুবিধাজনক?

—ইলেকট্রনিক চিপ।

—রাইট। ফলে সকলেই ভাবছে আমি যখন কোনও খাতায় বা ডিভাইসে লিখে রাখিনি, তার মানে কোনও চিপেই ফর্মুলাটা রেখেছি। সকলেই চিপ খুঁজে বেড়াচ্ছে। তুমিও কি তাই ভাবছ?

—হ্যাঁ স্যার।

—আমি সেটাই করিনি। আমি ফর্মুলা এমন এক জায়গায় লিখে রেখেছি যেটা ভেবে ওঠাই মুশকিল, খুঁজে পাওয়া তো অনেক পরের কথা। বিষয়টা একটু গোড়া থেকে বলি। দ্যাখো, ইনফর্মেশন ডিজিটালি প্রিসার্ভ করার উপায় বের হবার পর আমাদের কাজ অনেক সহজ হল। অনেক কম পরিশ্রমে, কম খরচে, অনেক কম জায়গায় অনেক বেশি তথ্য ধরে রাখার উপায় আমরা বের করে ফেললাম। কিন্তু কথা হচ্ছে, তথ্যের পরিমাণ যে ক্রমশই বাড়ছে। এত রাশি রাশি তথ্য আমরা রাখব কোথায়? বুঝতে পারছ সমস্যাটা?

—বুঝতে পারছি স্যার। আপনি বলে যান।

—গুগল, ফেসবুক বা উইকিপিডিয়ার মতো কোম্পানিগুলোর ডেটা সেন্টার কেমন হয় জানো? অ্যাত্তো বড় বড় স্টোরেজ সব। তা-ও জায়গা কম পড়ে যাচ্ছে। ক্লাউড স্টোরেজও এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান নয়, কারণ তার স্পেসও টেকনিক্যালি অফুরন্ত নয়। এদিকে ডিজিটাল ডেটা তো বেড়েই চলেছে। এই মুহূর্তে ব্যক্তিগত তথ্য বাদে পৃথিবীর মোট ডিজিটাল তথ্যের পরিমাণ শুনলে চমকে যাবে। ১৭৫ জেটাবাইট। ১ জেটাবাইট হচ্ছে ১ ট্রিলিয়ন গিগাবাইট। ১ ট্রিলিয়ন মানে ১০ লক্ষ কোটি। বুঝতে পারছ?

—ওরে বাবা।

—ফলে বিজ্ঞানীদের এমন কোনও স্টোরেজের কথা ভাবতে হচ্ছে, যেখানে অল্প জায়গায় অনেক তথ্য জমিয়ে রাখা যাবে। বছরকয়েক হল, বিজ্ঞানীরা সেই ম্যাজিক স্টোরেজ খুঁজে বের করে ফেলেছেন।

—কী?

—ডিএনএ।

—ডিএনএ?

—ইয়েস।

—মানে, জীবের ডিএনএ?

—হ্যাঁ।

—কী করে?

—ভেরি সিম্পল। ডিএনএ হচ্ছে যে কোনও জীবকোশের সমস্ত তথ্যের চাবিকাঠি। বলতে পারো আমাদের কোষের ইন্টার্নাল হার্ড ড্রাইভ। মানে, আমার সমস্ত জৈবিক তথ্য লেখা আছে আমার ডিএনএ-তে। সব জীবেরই তাই হয়। বিজ্ঞানীরা দেখলেন, অন্যান্য তথ্যও ডিএনএ-তে সংরক্ষণ করা সম্ভব, যদি সেটা ডিএনএ-র ভাষায় লেখা যায়। এবং এক্ষেত্রে সবচেয়ে সুবিধা যেটা, সেটা হচ্ছে অনেক কম স্পেসে অনেক বেশি তথ্য সংরক্ষণ করা যাবে। দেখা যাচ্ছে, একটা কফি মগের অর্ধেক পরিমাণ ডিএনএ-তেই গোটা দুনিয়ার সব তথ্য ধরে যাবে। অবশ্য এই প্রক্রিয়াকে পুরোদস্তুর কাজে লাগানোর পথে একমাত্র বাধা হচ্ছে খরচ। এই নিয়ে কাজ চলছে এখনও।

—কিন্তু ডিএনএ-তে তথ্য কীভাবে স্টোর হবে স্যার?

—বললাম যে। তথ্যগুলোকে ডিএনএ-র ভাষায় লিখে ফেলতে হবে। আমি বুঝিয়ে বলছি ব্যাপারটা। আচ্ছা বলো তো, সাধারণ কম্পিউটার তথ্য পড়ে কীভাবে? বাইনারি সংকেতের সাহায্যে, তাই তো? আমরা দেখছি ভ্যান গঘের 'স্টারি নাইট' ছবি, কম্পিউটার দেখছে বাইনারি সংকেত, মানে গাদাখানেক ১ আর ০-এর নির্দিষ্ট সমাহার। ডিএনএ-র মূল গঠনকারী একক হল চার রকমের ক্ষারক অণু—অ্যাডেনিন (A), গুয়ানিন (G), সাইটোসিন (C) আর থাইমিন (T)। ফলে ডিএনএ-তে ডিজিটাল ডেটা লিখতে গেলে বাইনারি সংকেতকে লিখতে হবে ডিএনএ-র ATGC—সংকেতের ভাষায়। PCR প্রক্রিয়ায় এমন সংকেত-বিশিষ্ট ডিএনএ বানিয়ে ফেলা কোনও ব্যাপার না। তো এই কৌশলই আমি প্রয়োগ করেছি আমার ফর্মুলা লিখে রাখার জন্য। সোজা কথায়, আমি একটা বিশেষ ডিএনএ-র মধ্যে আমার ফর্মুলা লিখে রেখেছি। ব্যস, অনেকটা বলে ফেলেছি। আর জেনে তোমার কাজ নেই।

—খুবই জটিল ব্যাপার স্যার।

—আসলে খুবই সহজ। ভারি সুবিধাজনক জিনিস ডিএনএ। বিরাট বিরাট ডেটা-সেন্টারের ঝামেলাই থাকছে না। সাধারণ রেফ্রিজারেটরের সর্বনিম্ন উষ্ণতায় রাখলে কয়েকশো বছর দিব্যি টিকে যাবে। আবার চাইলে আলাদা করে না রেখে যে কোনও জীবের ডিএনএ-তেও ইচ্ছামতো তথ্য এঞ্জিনিয়ার করে দেওয়া যায়।

—কোন ধরনের জীব স্যার?

—যে-কোনও জীবই হতে পারে। যে-কোনও উদ্ভিদ বা প্রাণী, অণুজীবও হতে পারে। ফ্রম ব্যাকটেরিয়া টু বটগাছ, ফ্রম হামিং বার্ড টু হিপোপটেমাস-এনিথিং। সেক্ষেত্রে কারিকুরি করা সেই ডিএনএ নিজের প্রতিলিপি বানাতে শুরু করবে, আর জীবের নিজস্ব অজস্র তথ্যের মাঝে অতি সামান্য অংশ জুড়ে সে রেখে দেবে আমার ফর্মুলা। মানে সে ক্ষেত্রে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এরকম, যে-কোনও একটা জীব নিজের ডিএনএ-র মধ্যে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে আমার ওষুধের ফর্মুলা। ভাবো একবার! কী থ্রিলিং ব্যাপার না?

—আমি রোবট না হলে নিশ্চয়ই মাথা ঘুরে পড়ে যেতাম স্যার।

—বালাই ষাট। মাথা ঘুরুক তোমার শত্রুর।

—তাহলে বেরিয়ে পড়ি স্যার?

—হ্যাঁ। যাও। আর শোনো, টেক কেয়ার। ওরা কিন্তু তোমার ওপরেও হামলা করতে পারে।

—চিন্তা নেই স্যার। আমি সবসময় রেডি।

শ্রীবিলাসের সাইকেল মেন গেট থেকে বেরিয়ে ডানদিকের রাস্তা ধরল। দরজা বন্ধ করে এক কাপ ব্ল্যাক কফি নিয়ে বসলেন ডঃ সেন।

রাত ১০টা ৫০। দামিনীর খাবার সময় হয়ে গেছে।

ডঃ সেন যথাসম্ভব শান্ত থাকার চেষ্টা করছেন, কিন্তু মনের উচাটন ভাবটা কাটতে চাইছে না কিছুতেই। এক-একটা মুহূর্তকে যেন কেউ চিউয়িং গামের মতো টেনে লম্বা করে দিচ্ছে। দামিনী দেরি করছে কেন?

ভাবতে ভাবতেই জানলার বাইরে থেকে খুট করে একটা মৃদু শব্দ এল। স্বস্তির শ্বাস ফেললেন ডঃ সেন। নরম গলায় ডাকলেন, 'মিনি! দামিনী! এসে গেছ?'

বাইরের অন্ধকারের গর্ভ থেকে বিদ্যুতের মতো ছিটকে বেরিয়ে এল ছোটো এক দলা অন্ধকার। কালো কাবলি বেড়ালটা এক লাফে ডঃ সেনের কোলে এসে উঠল। দু-একবার তাঁর আস্তিনে ল্যাজ আর মুখ ঘষে গোল্লা পাকিয়ে শুয়ে পড়ল কোলের ওপর।

কালো নয় ঠিক। যাকে কালো বলে তার থেকে দু-পর্দা কম। রংটার নাম আইগেনগ্রাও। অন্ধকারের রং। চোখ বুজলে যে রং আমরা দেখি, সেই রং। বড় সুন্দর। তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। ডঃ সেন স্নেহভরে হাত বোলাতে লাগলেন প্রাণীটার নরম, রোমশ গায়ে।

দামিনীর জন্য মাছ-ভাত মেখে রাখা আছে। সঙ্গে শেষপাতে দুধ। খেয়েই দামিনী বেরোবে। রাতের অন্ধকারে, সবার চোখের আড়ালে ফর্মুলা চলে যাবে এই গলিতেই দুটো বাড়ি পরে, মিঃ হার্ভের বাড়ি। তারপর কাল সকালের ফ্লাইটে টরন্টো। টরন্টো ইউনিভার্সিটির ডঃ জোয়েল ওয়াটারম্যান আর মেলানিয়া বুথ অপেক্ষা করছেন ফর্মুলাটার জন্য।

দেওয়ালের বিরাট গ্র্যান্ডফাদার ক্লকে ঢং-ঢং করে এগারোটা বাজল। দামিনী নড়েচড়ে আরেকটু গুছিয়ে শুল।

মনটা আচমকা ভারী হয়ে এল ডঃ সেনের। আবার কবে ওর সঙ্গে দেখা হবে, কে জানে! **কিশোর ভারতী**

দেবারতি মুখোপাধ্যায়

নতুন স্যার

স্টেলের পাশের ঢালু পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে কিছুদূর গেলে ডানদিকে একটা বাঁক। তার ধারে লম্বা লম্বা পাইন গাছের সারি নিঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাঁকটার আড়ালে চকোলেট চুপ করে দাঁড়িয়েছিল।

পাশে স্কুলের নিজস্ব ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। বই, খাতা, পেন, বল থেকে যাবতীয় স্টেশনারি জিনিস পাওয়া যায়। স্টোরের মালিক সতীশ ত্রিবেদী পাকা ব্যবসাদার। একটা পেন কিনতে গেলেও তিনি আরো দশখানা জিনিস গছিয়ে ছাড়বেন। চকোলেটকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সতীশজি মাফলার গলায় জড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে এলেন, 'ও চকোলেট। কী করছ?'

'নাথিং সতীশজি।'

'আমার স্টোরে এসো না একবার, নতুন টাইপের পেনসিল এসেছে।'

চকোলেট অনিচ্ছাসত্ত্বেও এগিয়ে এল। পেন আর পেনসিলের প্রতি তার টান সবার জানা। তাছাড়া সতীশজি বেশি হাঁকডাক করলে মুশকিল আছে।

'এই যে! কী সুন্দর খাঁজকাটা পেনসিল!' সতীশজি সোৎসাহে দেখাতে শুরু করলেন, 'এটা অনলি ফিফটিন রুপিজ। কিন্তু তোমার জন্য টুয়েলভ।'

'থ্যাংক ইউ। আমার পেনসিল আছে।'

'হা! হা! কী যে বলো। পেনসিল তো সবারই থাকে। কিন্তু এরকম খাঁজকাটা পেনসিল তুমি কারুর কাছে পাবে না।' সতীশজি প্যাক করতে শুরু করলেন, 'দশটা দিয়ে দিই?'

'না না!' চকোলেট আঁতকে উঠল, 'অতগুলো লাগবে না। আপনি... আপনি দুটো দিন।'

ছবি: ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

'দুটো?' সতীশজি মুষড়ে পড়লেন, 'ওকে। পাঁচটা নাও, তোমার জন্য ইলেভেন রুপিজ।'

চকোলেট বেজার মুখে ঘাড় নাড়ল।

সতীশজি বললেন, 'তবে এই পেন্সিলে ভালো লেখা হবে ওয়ান্ডার রাইটিং প্যাডের ওপর।'

'ওয়ান্ডার রাইটিং প্যাড!'

'হ্যাঁ। তিনশো টাকা দাম। কিন্তু তুমি স্পেশাল কাস্টমার, তোমার জন্য দুশো নব্বই। আর হ্যাঁ, তোমার ফ্রেন্ড অক্ষয়ের তো সামনে বার্থডে। ওর জন্য কিছু নেবে না? একটা ভালো অ্যাডভেঞ্চার নভেল?'

মিনিট পনেরো পরে একটা বই, পেনসিল, রাইটিং প্যাড, ইরেজার, পেনসিল বক্স, আরো কিছু টুকিটাকি নিয়ে চকোলেট সতীশজির স্টোর থেকে বেরোল।

ওদিক থেকে কোলাহল আর ভেসে আসছে না। নির্ঘাত সব চুকেবুকে গেছে।

দূরে ঝকঝকে পাহাড়ের সারি। তার গায়ে গায়ে ফিনফিনে তুলোর মতো ভেসে বেড়াচ্ছে মেঘের দল। বেশ শিরশিরে বাতাস বইছে। অক্টোবরের শেষ। চকোলেট তাড়াহুড়োয় কটেজ থেকে বেরিয়ে এসেছে, গায়ে সোয়েটার চাপায়নি। এখন ওর বেশ শীত-শীত করছে। তা করুক।

দু-তিনমাস হল, চকোলেটের আর গরম শীত, কিছুরই তেমন অনুভূতি হয় না। এমনকী, জুন মাসের শেষে যখন বাবা দেখা করতে এসেছিল, ওকে শুধু একটা পাতলা পুলওভারে ঘুরতে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কিছু বলেনি, সারাদিন ঘোরার পর ওর মাথায় আলতো চুল ঘেঁটে শুধু বিড়বিড় করেছিল, 'ভালো থাকিস।'

চকোলেট ভালোই আছে। এই তো দুর্গাপুজোর পর বাবা-মা দুজনেই কেমন 'শুভ বিজয়া' লেখা গ্রিটিং মেসেজ পাঠিয়েছিল, ও উত্তর পাঠিয়েছে।

আচ্ছা, শেষ কবে বাবা-মা একসঙ্গে এসেছিল? চকোলেট দূরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে মনে করতে চেষ্টা করে। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। গতবছর পুজোর পর। মা আকাশের মতো নীল একটা শাড়ি পরে এসেছিল। বড় সানগ্লাস আর খোলা চুলে মা'কে কী সুন্দর যে লাগছিল! উঁচু ক্লাসের দাদাদিদিগুলোও হাঁ করে দেখছিল।

চকোলেটের বন্ধুরা নিজের ফিসফিস করছিল, 'চকোলেটের মা অ্যাকট্রেস জানিস তো! বাংলায় ভেরি ফেমাস! আর ওর বাবা ফিল্ম ডিরেক্ট করে। চকোলেট ইস অ্যা সেলিব্রিটি কিড, ইউ নো?'

চকোলেটের বাবা-মা আর একসঙ্গে আসে না। দুজনে এখন আলাদা থাকে, মা আজকাল মুম্বাইতেই বেশি কাজ করে। সেখান থেকে বিদেশে খুব যেতে হয়। মা প্রচণ্ড ব্যস্ত, ফোন করার সময়ই পায় না। মাঝেমধ্যে 'টেক কেয়ার' জাতীয় মেসেজ। কখনো ফোন করলে বলে, 'ক্রিসমাসের ছুটিতে তোমায় আমি মুম্বাই নিয়ে আসব বাবু, আমরা একসঙ্গে একমাস থাকব, দারুণ সময় কাটবে। তোমার বার্থডেও আছে এক তারিখ, সেলিব্রেট করব একসঙ্গে।'

চকোলেটের বলতে ইচ্ছে হয়, 'আগে তো পয়লা জানুয়ারি আমার জন্মদিন তোমরা একসঙ্গে সেলিব্রেট করতে। সেটা তো একবার করতে পারো, মা!'

কিন্তু ও মুখে কিছু বলে না। মন খারাপও করে না। যদিও ওদের স্কুলের বন্ধুরা বলে, ক্লাস সিক্সে ওঠার পর ও হঠাৎ করেই খুব চুপচাপ হয়ে গেছে।

আগে বাবা-মা এলে তিনজন কাছাকাছি ঘুরে আসত, পাহাড়ি ট্রেইল বেয়ে হাঁটত অনেকদূর। হাই হিল জুতোয় মা বেশি হাঁটতে পারত না বলে বাবা আর ওর মা'কে খুব খেপাত, আর মা অমনি রেগেমেগে তড়বড়িয়ে উঠে আবার হাঁটতে শুরু করত।

সেই সোনালি দিনগুলো হারিয়ে গেছে। চিরকালের জন্য। চকোলেট দ্রুত মন সরিয়ে আনল। ওই প্রসঙ্গটা খুবই ছোঁয়াচে, মনে একবার এলেই মন সেই স্মৃতিগুলোকে চোখের পাতায় ছড়িয়ে দিতে আরম্ভ করে। বিরক্তিকর। তার চেয়ে মনে মনে শীতের ছুটির প্ল্যান করা অনেক আনন্দের। মা বলেছে, মুম্বাই থেকে ওরা গোয়া ঘুরতে যাবে। যাক, তবু মা'কে কাছে পাওয়া যাবে।

চকোলেট আবার স্কুলের দিকে চোখ রাখল। সকাল থেকে সাজো সাজো রব। প্রায় পাঁচশো একর জায়গা জুড়ে পাহাড়ের কোলে দাঁড়িয়ে থাকা ওদের এই দেড়শো বছরের পুরোনো ক্যাথলিক স্কুল এমনিতে খুবই শান্ত। এত বড় ক্যাম্পাস, ছাত্রছাত্রীরা খেলার মাঠে, ব্যাডমিন্টন কোর্টে বা বাস্কেটবল খেলতে গিয়ে যত শোরগোলই করুক, হলঘরে যত জোরেই প্রেয়ার করুক না কেন, আশপাশের প্রকাণ্ড পাহাড়ি গাছগুলো, অদূরের পাহাড়গুলো সব গিলে খেয়ে নেয়। স্কুল ক্যাম্পাসে ঢুকলেই একের পর এক বাঁধানো রাস্তা, সার দিয়ে গথিক ধাঁচের বাড়ি, ইউরোপিয়ান কটেজের আদলে হোস্টেল, আর সবুজ মাঠ। কেয়ারি করা নাম না জানা অসংখ্য গাছ। চোখ জুড়োনো ফুলের সারি। এত বড় স্কুলে পড়াশুনো করে পাঁচহাজারেরও বেশি ছাত্রছাত্রী। নার্সারি থেকে টুয়েলভ। হোস্টেল বাড়িই রয়েছে একুশ বাইশটা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাকি এই স্কুলের পড়ুয়ারা যুদ্ধে লড়েছিল। সেইসব সরঞ্জাম রাখাও রয়েছে স্কুলের মিউজিয়ামে। শুধু তাই নয়, প্রিন্সিপ্যাল ফাদার লরেন্স সগর্বে বলেন, এখনো যদি কোনও যুদ্ধবিগ্রহ বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয়, ওদের গোটা স্কুলটা বাইরের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে, এবং সেইভাবে তিনমাস সব ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে থাকতে পারে।

এতবড় স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল যখন কোনও কারণে গোটা ক্যাম্পাসে হইচই ফেলে দেন, তখন বুঝতে হবে ব্যাপার মোটেই সাধারণ নয়, বরং বেশ গোলমেলে।

চকোলেট আবার উঁকি মারল। সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখদুটো গোল-গোল হয়ে গেল।

সর্বনাশ! প্রিন্সিপ্যাল ফাদার লরেন্স নতুন স্যারকে সঙ্গে করে যে এদিকেই আসছেন! সঙ্গে রয়েছেন ম্যাথস টিচার মিঃ প্যাট্রিকও। সিনিয়র সেকশনের লাইব্রেরি বিল্ডিং-এর পাশ দিয়ে মৃদুমন্দ গতিতে হেঁটে হেঁটে আসছেন তিনজনে। পেছন পেছন আসছে দুজন সিকিউরিটি আঙ্কল।

অদ্ভুত ব্যাপার! আজ রবিবার বিকেলবেলা। ফাদার লরেন্স এই সময় চার্চে উপাসনার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকেন। এই কয়েকবছরে চকোলেট কোনওদিনই সেই নিয়মের ব্যত্যয় হতে দেখেনি। আজ হঠাৎ কী হল? চকোলেট দ্রুত একটা পরিত্যক্ত বাড়ির ফাঁকে ঢুকে গেল। ওদের স্কুলে এইসব ভাঙাচোরা বাড়ি প্রচুর।

চকোলেট চারপাশে তাকিয়ে নিল। বলা যায় না, পেস্ত্রি বলে কিন্ডারগার্টেনের বিচ্ছু মেয়েটা কোথা থেকে আবার উদয় হয়। এই অবস্থায় ওকে দেখতে পেলেই অমনি চোখ পাকাবে, 'ছিঃ চকোলেট দাদা, তুমি ইভসড্রপিং করছ! জানো না, অন্য কারুর কথাবার্তা এইভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে শুনতে নেই?'

মেয়েটা খারাপ নয়, বরং বুদ্ধিটা বেশ সরেস, কিন্তু ওর ওই পাখিদের সঙ্গে অনর্গল কথা বলে যাওয়াটা হজম হয় না চকোলেটের। সে'কথা বললেই পেস্ত্রি গম্ভীরমুখে বলে, 'সব বাচ্চারাই পশুপাখিদের সঙ্গে কথা বলতে পারে। পৃথিবীতে আসার সময় পাখিদের আর পশুদের ভাষা তো আমরা শিখেই আসি। দ্যাখোনি, একমাস দু'মাসের বেবিরাও কেমন কলকল করে? ছোটবেলায় আমরা সবাই ওদের সঙ্গে কথা বলি। বড় হতে হতে সেই ভাষা ভুলে যাই। যাদের মনে কোনও পাপ থাকে না, তারাই তো শুধু পাখিদের সঙ্গে কথা বলতে পারে!

চকোলেট কিছুতেই মনে করতে পারে না, সত্যিই ও কোনওদিন পাখিদের ভাষা জানত কিনা। কিন্তু পেস্ত্রির সঙ্গে তর্ক করতেও সাহস পায় না। এর আগে পেস্ত্রি অদ্ভুত সব খবর সরবরাহ করে ওকে বাঁচিয়েছে।

চকোলেট আবার ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল।

নতুন স্যার একটা সুতির টি শার্ট আর জিন্স পরে ঈষৎ ঝুঁকে হেঁটে আসছেন। বয়স চল্লিশ হবে, ফর্সা রোগা লম্বা গড়ন, মাথার চুলগুলো এই বয়সেই বেমানানভাবে সাদা। ফাদারের কথায় তিনি মৃদু হাসছেন, আবার কখনো কখনো ঘাড় নেড়ে নিজেও কিছু বলছেন।

কাছাকাছি আসামাত্র কথোপকথন শুনতে পেল চকোলেট।

'না ডঃ সেন, আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না, আমাদের স্কুলের ছেলেমেয়েরা আপনার কাছে পড়বে। গত সাতদিন ধরে এই নিয়ে ভাবলেই আমার শিহরন হচ্ছে!' মিঃ প্যাট্রিক উচ্ছ্বসিতভাবে বলছেন।

নতুন স্যার হাসলেন, 'যদি বলি, আমি নিজেও বিশ্বাস করতে পারছি না, সেটা কি আপনার কাছে বিশ্বাসযোগ্য হবে, মিঃ প্যাট্রিক?'

'কী যে বলেন!'

'আমাদের জীবনে অনেক কিছুই আচমকা ঘটে যায়, যা ভেবে কোনও খেই পাওয়া যায় না। তবু জীবন চলে। সময় এগোয়। এটাই নিয়ম।'

'উঃ! উঃ!' চকোলেট ছিটকে বেরিয়ে এল বাড়ির খাঁজ থেকে। কী একটা পোকা কামড়েছে পায়ে। একখানা মাঝারি মাপের জোঁক!

চকোলেট ভয় পেল না। এইসব উপদ্রব সামাল দিতে ও এক্সপার্ট। ও হাতের তর্জনি আর বুড়ো আঙুল দুটোকে সন্তর্পণে জোঁকটার মুখের কাছে নিয়ে গেল। খুব সাবধানে জোঁকের মুখের সিলটাকে ভেঙে দিল। এতে জোঁকটাও মরবে না, আবার ওর গা থেকে ঝরে পড়েও যাবে।

ফাদার লরেন্স চকোলেটকে দেখে চমকে উঠলেন, 'হেই চকোলেট! হোয়াট আর ইউ ডুইং হিয়ার?'

'কিছু না স্যার!' থতমত খেয়ে বলল চকোলেট।

'কিছু না তো ওরকম একটা জায়গায় ঢুকেছ কেন! সাপখোপ থাকতে পারে। নতুন স্যারের ওয়েলকাম সেরিমনিতে ছিলে না?'

'গেছিলাম স্যার।' মাথা নীচু করল চকোলেট, 'শরীরটা তেমন ভালো লাগছিল না তাই...!'

'শরীরের আবার কী হল?' ফাদার লরেন্স চিন্তিত হয়ে পড়লেন, 'হসপিট্যালে চলে যাও। ডঃ শর্মা আছেন। একা যেতে পারবে? না কোনও অ্যাটেনড্যান্টকে ডাকব?'

'না স্যার, ঠিক আছি!'

ওদের স্কুলের নিজস্ব হসপিট্যাল আছে। কিন্তু সেখানে আর যাবেই বা কেন? এই রোগের কি কোনও ওষুধ হয়?

'গুড। তোমার মা আমায় প্রতি সপ্তাহেই ফোন করে খোঁজ নেন।' ফাদার লরেন্স আশ্বস্ত হয়ে নতুন স্যারের দিকে তাকালেন, 'চকোলেট গাঙ্গুলি। ক্লাস ফাইভ। ব্রাইট স্টুডেন্ট।'

মিঃ প্যাট্রিক বলে উঠলেন, 'ওর বাবা-মা দুজনেই ফিল্মে আছেন, ফেমাস...!'

এই বাবা-মা'র পরিচয় দেওয়াটা আগে চকোলেটের ভালো লাগত, এখন বিরক্ত লাগে। হয়তো ওর বাবা মা এত বিখ্যাত না হলে তিনজনে একসঙ্গেই থাকত! চকোলেটকে এতদূরে পড়তে আসতেও হত না।

নতুন স্যার হাসিমুখে হাত বাড়ালেন, 'হ্যালো চকোলেট! ভালো আছ?'

'ইয়েস স্যার!' পরিষ্কার বাংলা শুনে চকোলেট একটু অবাক হল। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ও দ্রুত ছুটতে লাগল কটেজের দিকে। ওদের স্কুলে হোস্টেলকে বলে কটেজ। সেই কটেজের দায়িত্বে থাকেন কটেজ আঙ্কল আর কটেজ আন্টি। তাঁরাই সবার বাবা-মা।

পাহাড়ি ঢালু রাস্তায় একটা করে বাড়ি, অনেকটা সবুজ জায়গা, তারপর আবার আরেকটা বাড়ি। হাঁপাতে হাঁপাতে ও যখন সিনিয়র কটেজের সামনে গিয়ে পৌঁছল, তখন দেখে পেস্ট্রি চুপ করে বসে আছে সামনের বোগেনভেলিয়া গাছের বেদিতে। ওর কাঁধের ওপর বসে আছে ছোট্ট একটা পাখি। কেঁপে কেঁপে ডাকছে পাখিটা, আবার কখনো উড়ছে পেস্ট্রির মাথার ওপর।

'টুই ক্কিচ টুই টুই কিচ!'

'তাই নাকি! দেখি জিগ্যেস করে! আজকাল এমন খিঁচিয়ে থাকে, কথা বলতেই ভয় লাগে।'

'ক্কিচিচ টুই টুই!'

'ঠিক বলেছিস!'

চকোলেট পেস্ট্রির সামনে দাঁড়ানোমাত্র পাখিটা ওর দিকে কটমট করে তাকিয়ে উড়ে গেল। অদৃশ্য হয়ে গেল পাইন গাছগুলোর ফাঁকে। 'কী হয়েছে? এখানে বসে আছ কেন? বৃষ্টি নেমেছে, ভিজে যাবে তো!'

'তোমার জন্যই তো বসে আছি।' খনখনে স্বরে বলে উঠল পেস্ট্রি, 'নতুন স্যারের ওয়েলকাম সেরিমনিতে দেখতে পেলাম না, ভাবলাম কী হল, দেখে আসি। ওমা, তারপর তো শুনি অন্য কেস!'

চকোলেট এখন আর পেস্ট্রির পাকা পাকা কথায় অবাক হয় না। বয়স মাত্র সাত বছর কিন্তু, মেয়েটা প্রচণ্ড পাকা। চকোলেট ওর থেকে পাঁচবছরের বড় হলে কী হবে, ওকে পেস্ট্রি পকেটে পুরে রাখে। মাঝে মাঝে চকোলেটের যে রাগ হয় না তা নয়, একটা পুঁচকে মেয়ে যদি ওকে বকুনি দেয়, তখন ওর ইচ্ছে হয়, পেস্ট্রির দু'খানা ঝুঁটি ধরে নাড়িয়ে দিতে।

কিন্তু চকোলেট নিজেকে সংবরণ করে। ওর বাবা আছে, মা আছে, পেস্ট্রির কেউ নেই।

চকোলেট ভ্রু কুঁচকে বলল, 'ভেতরে এসো।'

সব কটেজেই একটা করে বড় ঘর রয়েছে, অন্য কটেজ থেকে কেউ এলে সেখানে বসে গল্পগুজব করা হয়। এই মিনিটখানেকের বৃষ্টিতেই পেস্ট্রি বেশ ভিজে গেছে। এই কটেজের আন্টি তোয়ালে নিয়ে এগিয়ে এলেন।

চুল-টুল মুছে এসে পেস্ট্রি বলল, 'তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে নতুন স্যারকে ফলো করছিলে কেন?'

আগে হলে চকোলেট পেস্ট্রির এই কথাগুলোয় চমকে একশা হত। কিন্তু এখন আর অবাক হয় না। বলল, 'বাঃ! খবর এরমধ্যেই পৌঁছে গেছে? তোমার অ্যান্টেনাগুলোর সত্যি কোনও জবাব নেই।'

পেস্ট্রি কাঁধ ঝাঁকাল, 'তুমি আড়ি পাতছিলে, পাশের গাছটাতেই তো উইটি বসেছিল যেখানে।'

'উইটি, সে আবার কে?'

'রবীন পাখি। ওই যে এক্ষুনি উড়ে গেল!'

এতদিন মিষ্টি বলে পাখিটার কথা শুনেছে। চকোলেট বলল, 'এর নামও নিশ্চয়ই তোমারই দেওয়া!'

'কারেক্ট!' পেস্ট্রির মুখ হাসিতে ভরে গেল, 'উইটিই তো উড়ে এসে আমায় সব বলে গেল। তুমি নাকি লুকিয়ে লুকিয়ে নতুন স্যারদের কথা শুনছিলে। ছি ছি। এ'সব কী ধরনের ম্যানারিজম তোমার?'

'তোমার স্পাইগুলো ফ্রিতে কাজ করে?'

'মানে?'

'না জিগ্যেস করছি আর কি। উড়ে বেড়াচ্ছে গুপ্তচর হয়ে, তোমায় হাঁড়ির খবর দিচ্ছে। চকোলেট মুখ বেঁকাল, 'তা তারা আমার পেছনে না ছুটে বেরিয়ে এই নতুন স্যারটাকে তো একটু স্টাডি করতে পারে! আমাদের স্কুলের উপকার হয়।'

'কী উপকার শুনি?'

'সবাই নতুন স্যারকে নিয়ে ধেইধেই করে নাচছে। এমন করছে যেন আমাদের স্কুলে এর আগে কোনও নতুন স্যার, নতুন ম্যাম আসেননি।'

'কী বলছ তুমি! এত বড় সায়েন্টিস্ট আমেরিকার কেরিয়ার ছেড়ে দিয়ে পড়াতে এসেছেন, এমন আগে কখনো হয়েছে?'

'সেটাই তো ফিশি ব্যাপার। সবাই বাহবা দিচ্ছে। কিন্তু কারণটা কী বলতে পারে?

দিনপনেরো আগে চকোলেট যখন প্রথম শুনেছিল, তখনই ওর বেশ সন্দেহজনক লেগেছিল। বিখ্যাত মহাকাশবিজ্ঞানী ডঃ সুধন্য সেন সব ছেড়েছুড়ে নাকি কালিম্পং-এ ওদের এই স্কুলে আসছেন পড়াতে।

টিচারদের মধ্যে হইহই পড়ে গিয়েছিল। ডঃ সুধন্য সেন নাকি এই স্কুলেরই প্রাক্তন ছাত্র, আগাগোড়া চোখ ধাঁধানো কেরিয়ার। কিন্তু নিজের স্কুলের প্রতি ভালোবাসায় তিনি কেরিয়ারের মধ্যগগনেই চলে আসছেন এখানে। গত কয়েকদিন ধরে ফাদার লরেন্স এই কথাগুলো একাধিকবার বলেছেন।

চমকের এখানেই শেষ নয়। তাঁর একমাত্র পুত্রকেও নাকি তিনি এই সেশানে এই স্কুলে ভর্তি করিয়েছেন। কিন্তু ছেলের পরিচয় উনি প্রকাশ করবেন না। উনি চান, তাঁর ছেলে সাধারণভাবে এখানে বেড়ে উঠুক। অন্য কোনও স্কুলে খুঁজে বের করা তবু সম্ভব ছিল, কিন্তু এই বিশাল স্কুলে কাউকে খুঁজতে যাওয়া খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজার শামিল।

তবে এটা ঘটনা, 'সেন' পদবির কেউই কোনও ক্লাসে ভর্তি হয়নি। তার মানে কি, ডঃ সুধন্য সেন নিজের ছেলেকে পরিচয় লুকিয়ে ভর্তি করেছেন? কেন এই লুকোছাপা? কেনই বা এখানে পড়াতে আসা?

মাসখানেক কেটে গেছে। ডঃ সুধন্য সেন সবার অত্যন্ত প্রিয় শিক্ষক হয়ে উঠেছেন। ইলেভেন-টুয়েলভের ছাত্ররা এমন সহজ সরল ভাষায় ফিজিক্স পড়েনি, তারা উচ্ছ্বসিত। এমনকী, কয়েকজন ছাত্রছাত্রী আর্টস বা কমার্স থেকে স্পেশাল আবেদন করে চলে এসেছে সায়েন্স স্ট্রিমে। ডঃ সেন ফিজিক্স

পড়াতে গিয়ে পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে শুরু করেন, তারপর ধীরে ধীরে ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, অংক সবকিছু এমন মিলেমিশে যায় তাঁর পড়ানোয়, সবাই মুগ্ধ হয়ে শোনে।

প্রথমে ডঃ সেনকে শুধু নাইন থেকে টুয়েলভের ক্লাস দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় অন্য ক্লাসেও অঙ্ক করানোর দায়িত্ব নিয়েছেন। চকোলেটদের পড়ান অঙ্ক আর ফিজিক্যাল সায়েন্স। এমনকী কিন্ডারগার্টেনেও তাঁর গল্প বলার স্পেশাল ক্লাস রাখা হয়েছে।

সুধন্য সেন ধীরে ধীরে কথা বলেন, চোখদুটো ঝকঝকে, সবকিছুকেই গল্প করে বোঝান। সবাই তাঁর ব্যক্তিত্বে মোহিত। শুধু একজন ছাড়া। চকোলেট। ডঃ সেন ওদের ক্লাসে প্রতিটি স্টুডেন্টের প্রতি আলাদাভাবে মনোযোগ দেন।

তবু চকোলেট খুশি হতে পারে না। সুধন্য সেনের ওই হাসির আড়ালে নিশ্চয়ই অন্য রহস্য আছে। মন খচখচ করে।

একদিন একটা কাণ্ড হল। চকোলেট ক্লাস শেষ করে লাইব্রেরিতে গিয়েছিল। আগে ওর খুব একটা বই পড়ার নেশা ছিল না, কিন্তু পেস্ট্রির সঙ্গে মিশে ওরও এখন গল্পের বইয়ের অভ্যেস হয়েছে। গত একমাসে ও বেছে বেছে মুম্বাই আর গোয়ার ওপর বই পড়েছে অনেক। মা'কে সেগুলো বলে অবাক করে দেবে।

সেদিন বিকেলে এনিড ব্লাইটনের একটা বই নিয়ে সুনসান রিডার্স রুমের টেবিলে বসে সবে দু'পাতা এগিয়েছে, হঠাৎ কাঁধে একটা স্পর্শ।

চকোলেট পেছন ফিরে তাকিয়েই চমকে উঠল। সুধন্য সেন। মুখে হাসি। ধীরে ধীরে বললেন, 'তুমি চকোলেট গাঙ্গুলি! স্টোরের সতীশজি বলছিলেন, তুমি পেন খুব পছন্দ করো?'

চকোলেট বলল, 'হুঁ।'

'আমিও করি। আমার কাছে দারুণ দারুণ পেনের কালেকশন আছে। স্বরোভস্কির নাম শুনেছ?'

'না।'

'অস্ট্রিয়ার একটা হীরের ব্র্যান্ড। তাদের তৈরি হীরের পেন আছে আমার কাছে।' ডঃ সেন ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেললেন, 'তোমায় দিয়ে দেব!'

'আমায়?' চকোলেট অবাক।

'হ্যাঁ। তুমি আমার বাংলোয় আসতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই। কবে?'

'সামনের রবিবার বিকেলে! তোমায় আরো অনেক কিছু দেখাব।'

চকোলেট কিন্তু ডঃ সুধন্য সেনের বাংলোয় যায়নি। কোনওদিনই যায়নি। তারপর থেকে স্যারের সঙ্গে মুখোমুখি হয়েছে বারকয়েক, উনি কিছু বলেননি, শুধু স্মিত হেসেছেন।

'আচ্ছা, নতুন স্যার ভ্যাম্পায়ার নয় তো?' স্কুলের ফুটবল খেলা দেখতে দেখতে একদিন চকোলেট পেস্ট্রির দিকে তাকাল।

'ভ্যাম্পায়ার!'

'হ্যাঁ, যারা মানুষের রক্ত চুষে খায়।'

'তাদের তো দুটো দাঁত লম্বা হয়, সেন স্যারের তো তা নয়!'

'তো? এরকম পাহাড়ি স্কুলেই কিন্তু তারা থাকে।' চকোলেট চোখ ঘুরিয়ে বলেছিল, 'হতেই তো পারে, সুধন্য সেন একটা ভ্যাম্পায়ার, এখানে এসেছে স্টুডেন্টদের রক্ত চুষে খাবে বলে। আমাকেও হয়ত ওইজন্যই ডাকছিল! কয়েকদিন পরেই আমি মুম্বাই যাব, দুর্বল হয়ে পড়তাম।'

পেস্ট্রি বলেছিল, 'তুমি একটু বেশি বেশি ভাবছ চকোলেটদাদা। নিজের স্কুলকে ভালোবেসে কেউ পড়াতে আসতে পারে না? ডঃ সেন খুব ভালো। জানো, ওয়ান টুতে উনি বেকিং শিখিয়েছেন?'

'বাবা! সবকিছুই দেখছি উনি পারেন!'

ডঃ সেনের সুখ্যাতি করলেই চকোলেট কেমন দায়সারা ভাব করে এড়িয়ে যায়। চকোলেটের পাশের বেডে থাকে দিল্লির ছেলে যুবরাজ শ্রীবাস্তব। যুবরাজ আর ও একদিন সতীশজির স্টোরের পাশ দিয়ে ডাইনিং হলে যাচ্ছে, সতীশজি খপ করে ধরলেন।

'যুবরাজ! ক্যায়সে হো ভাই? কী দারুণ গাড়ির স্টিকার এসেছে, দেখেছ?'

'গাড়ির ছবি দেওয়া স্টিকার? কই দেখি!'

চকোলেটের পেন আর পেন্সিলের প্রতি দুর্বলতা সতীশজির অজানা নয়। তিনি পেনের বিশাল সম্ভারও খুলে বসলেন, 'এই দ্যাখো। লেটেস্ট মডেল। ইমপোর্টেড ফ্রম আমেরিকা।'

'এখন লাগবে না সতীশজি!'

এই স্কুলে মূলত উচ্চবিত্তরাই পড়ে। প্রত্যেকেই মাসে মাসে ভালো পকেটমানি পায়।

'আরে নাও না! এই পেনটা এই স্কুলে শুধু একজন ছাড়া কারুর কাছে নেই। তোমার জন্যই এটা রেখে দিয়েছি চকোলেট!'

চকোলেটের চোখদুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। পেনটা সত্যিই সুন্দর দেখতে। কালোর ওপর উজ্জ্বল সোনালি রং। ওপরে একটা পাথর।

সতীশজি বললেন, 'নিয়ে নাও। ছ'শো টাকা দাম। কিন্তু তোমার জন্য পাঁচশো আশি।'

'ওরে বাপ। এত দাম?'

সতীশজি বলে উঠলেন, 'ডঃ সেন বলছিলেন, পেনটা এত স্মুথ লেখে।'

'কে বলছিলেন?'

'ডঃ সুধন্য সেন। নতুন স্যার। অত বড় মানুষ বলছেন মানে বুঝে নাও, পেনটা কত ভালো।'

অমনি চকোলেট ছিটকে দোকান থেকে বেরিয়ে এল। হনহন করে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে ঢুকল ডাইনিং হলে। থরে থরে সাজানো রয়েছে ব্রেকফাস্টের ফল, কেক, ব্রেড, ডিমসেদ্ধ, টোস্ট। সবার কলকল করে কথাবার্তায় গমগম করছে হলঘর।

যুবরাজ বলল, 'এই, তোর সেন স্যারকে নিয়ে কী সমস্যা বল তো!'

'সমস্যা হতে যাবে কেন? আমার ওঁকে নিয়ে এত নাচানাচি পছন্দ হয় না।'

'কেন?'

চকোলেট বিড়বিড় করল, 'সেদিন ক্লাসে সন্তোষ যেই বলল, শীতের ছুটিতে ও বাবা মায়ের সঙ্গে আমেরিকা ঘুরতে গিয়েছিল, নাসায় ঘোরার ব্যাপারে বলতে যেতেই সেন স্যার প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দিলেন, দেখলি!'

'হুম, মনে আছে।'

'একজন মহাকাশবিজ্ঞানী নাসার নাম শুনে কথা ঘোরাবেন কেন?'

যুবরাজ বলল, 'হয়তো তাঁর সেটা অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে।'

'তাঁর নিজের ছেলে যদি এই স্কুলেই ভর্তি হয়ে থাকে, তাঁর ছেলেকে নিয়ে ঘুরতে দেখেছিস? তোকে তো আরো একটা কথা বলিনি।'

'কী?'

'সেদিন ল্যাবে গিয়ে তন্নতন্ন করে ইন্টারনেটে খুঁজেছি। ডঃ সুধন্য সেন নামে বিজ্ঞানীর নাম পাইনি।'

'সেকী!'

'তবে আর বলছি কী? এই লোকটা নির্ঘাত ইম্পস্টার।

যুবরাজ চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'ছাড় না! ভালো পড়ান, আমাদের মোটিভেট করেন, যথেষ্ট!'

হয়তো বা। কিন্তু চকোলেট ঠিক শান্তি পায় না। স্কুলের অনেক আঙ্কলই ছোটবেলায় এই স্কুলে পড়েছে। জুনিয়র সেকশনের রবার্ট আঙ্কল ওর সবচেয়ে কাছের। গোলগাল আমুদে রবার্ট আঙ্কল যেমন মিশুকে, তেমনই ভালোবাসেন ছাত্রছাত্রীদের।

এক বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে ও চলে গেল জুনিয়র হোস্টেলে। তার আগে খেলার মাঠে, লাইব্রেরিতে পেস্ট্রিকে খুঁজল, পেল না। কে জানে, কোথায় হয়তো বসে আছে।

কিন্তু রবার্ট আঙ্কল মাথা নাড়লেন, 'না চকোলেট। ডঃ সেন আমাদের সময়ে এখানে পড়েননি, তাই আমি চিনি না।'

'আরো অনেক আঙ্কলই এখানকার এক্স স্টুডেন্ট। তাঁরাও চেনেন না?'

'নাহ! হয়ত অনেকটা জুনিয়র হবেন।'

'আর ডঃ সেনের ছেলে কোন ক্লাসে পড়ে, আঙ্কল?'

আমরা ওঁর ছেলেকে চিনিই না। কিন্তু তুমি হঠাৎ এসব জানতে চাইছ কেন?'

'না এমনি!' চলে আসছিল চকোলেট, রবার্ট আঙ্কল ডাকলেন,

'চকোলেট!'

'ইয়েস আঙ্কল?'

'তুমি ভালো আছ তো?'

চকোলেট থমকে দাঁড়াল। বলল, 'হ্যাঁ আঙ্কল। ঠিক আছি।'

'আমার কাছে এসেছিলে, তুমি তখন সবে ক্লাস ওয়ান। এখন বড় হয়ে গেছ। তবু তোমায় দেখলেই আমি সব বুঝতে পারি চকোলেট।' একটু থেমে বললেন, 'মা ফোন করেন?'

আবার সেই ছোঁয়াচে প্রসঙ্গ। চকোলেট মুখ নিচু করে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, যাতে কিছুতেই ওর চোখের পাতা না ভেজে। 'হ্যাঁ। মা এখন মুম্বাইতে থাকেন। শীতের ছুটিতে মা'র কাছে গিয়ে একমাস থাকব, আঙ্কল!'

'ভেরি গুড!' রবার্ট আঙ্কল কিছুক্ষণ দেখলেন। তারপর এগিয়ে এসে ওর কাঁধে চাপড়ে দিলেন, 'ব্রেভ বয়! তোমার যখন মন চাইবে, আমার কাছে চলে আসবে, কেমন?'

ফেরার সময় একটা ডাল দিয়ে ঝোপগুলো নাড়াতে নাড়াতে চকোলেট আসছিল। ছুটির দিন যত এগিয়ে আসছে, তত ওর মন খুশিতে ভরে যাচ্ছে। আহ, কতদিন পর মায়ের গন্ধ পাবে, মায়ের বুকের কাছে ছোট্ট হয়ে ঘুমোবে।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ পেক্টির উত্তেজিত গলা, 'চকোলেটদাদা। এদিকে শিগগির এসো! এদিকে!'

চকোলেট পেক্টিকে খুঁজতে চেষ্টা করল। সামনেই স্কুলের মিউজিয়াম। মিউজিয়ামের পাশে সরু অন্ধকার গলি। সেখান দিয়ে অনেকটা হেঁটে গেলে পাহাড়ের খাদ। খাদের ধারে স্কুলের কবরখানা। আর তার পাশেই আকাশ ঢেকে দাঁড়িয়ে থাকা প্রকাণ্ড ডালপালা মেলা জায়ান্ট ট্রি। পেক্টির চিৎকার ওদিক থেকেই আসছে।

এদিকে কেউ আসে না। সবাই এই গলি পেরোনোর সময় আড়চোখে তাকাতে তাকাতে পালায়। কিন্তু পেক্টির আবার এখানটাই বেশি পছন্দ। যখন তখন কবরখানায় এসে বসে থাকবে। যে কবরখানায় এই স্কুলের সব প্রিন্সিপ্যালরা ঘুমিয়ে আছেন, সেখানে বসে গল্প করতে পেক্টি কী আনন্দ পায় কে জানে! চকোলেটের তো বুক কাঁপে।

একটা পাইন গাছের নীচে বসেছিল পেক্টি। পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে সন্ধে নামছে দ্রুত। পাহাড়ি এলাকায় ঝুপ করে অন্ধকার হয়ে যায়। চকোলেট একটু কড়া গলায় বলল, 'কী হচ্ছে পেক্টি? এই সন্ধেবেলা এখানে কেন? কিন্ডারগার্টেনের আঙ্কলকে বলব নাকি?'

পেক্টি ভ্রূক্ষেপ করল না। শুধু ইশারা করে কাছে ডাকল।

প্রকাণ্ড এক দৈত্যের মতো আকাশ ঢেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে জায়ান্ট ট্রি। ফলে, এমনিতেই এদিকে আলো কম। চকোলেটের গা ছমছম করে উঠল। পেক্টির কাছে গিয়ে বলল, 'কী হয়েছে?'

'কিছু হয়নি। এখানে চুপ করে বসো।'

ওপাশ থেকে কোনও একটা চতুষ্পদ প্রাণী লাফিয়ে ছুটে চলে গেল। চকোলেট ভয়ে কেঁপে উঠল, 'এখানে বসব কেন? অন্ধকার হয়ে আসছে তো!'

'আজ মাসের এক তারিখ। এখন ছ'টা। ঠিক সাড়ে ছ'টায় একটা কাণ্ড ঘটবে, চুপ করে বসে দ্যাখো!'

'কী ঘটবে?'

'দ্যাখোই না! উইটি আর মিস্টির খবর ভুল হয় না।'

অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল দ্রুত। ভয়ে চকোলেটের যখন নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম, ঠিক তখনই পায়ের শব্দ।

'কে-কে আসছে?'

'শ-শ-শ...!'

একটা লোক ধীরে এগিয়ে আসছিল। গলির শেষ প্রান্তে এসে একবার থমকে দাঁড়াল। তারপর এগিয়ে যেতে লাগল খাদের দিকে।

পাহাড়ের কিনারায় গিয়ে দাঁড়াল লোকটা। দূরের পাহাড়ে তখন মুক্তোর মতো আলো জ্বলে উঠেছে। সেদিকে তাকিয়ে লোকটা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'আমায় ক্ষমা করো, সুধন্য! ক্ষমা করো!'

চকোলেট চমকে পেক্টির দিকে তাকাল। পেক্টিও অবাক। ফিসফিস করে বলল, 'উইটি ঠিকই খবর দিয়েছিল গো! নতুন স্যার প্রতি মাসের এক তারিখে...ইনি তাহলে সুধন্য সেন নন? ইনি তাহলে কে গো?'

চকোলেটের কথা বন্ধ হয়ে যায়। ঘামে ভিজে ওঠা ওর মুঠোর মধ্যে খালি মোবাইলটা ভাইব্রেট করতে থাকে। মা ফোন করছে!

আজ প্রেয়ারের লাইনে সব ছেলেমেয়েরাই বেশ চঞ্চল। তাদের এই ছটফটানি স্বাভাবিক, কারণ আজকের পর স্কুলে একমাসের ছুটি পড়ে যাচ্ছে। নতুন বছরের মাঝামাঝি আবার ফিরবে সকলে। না সকলে নয়, অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী। পেক্টির মত যাদের কেউ নেই, তারা থেকে যাবে স্কুলেই।

চকোলেট চুপচাপ প্রেয়ারের লাইনে দাঁড়িয়েছিল। যুবরাজ কাল ভোরের ফ্লাইটে দিল্লি চলে যাচ্ছে। অক্ষয় যাবে আজ রাতের ট্রেনে, ওর বাড়ি মালদা। হংসিকা, আশুতোষ, অবিনাশ, ডিম্পি সবাই চলে যাবে।

চকোলেট যাবে না! এই প্রথম শীতের ছুটিতে একাই থাকবে।

কী করে যাবে? মা হঠাৎ ফোন করেছিল। বিদেশে হঠাৎ একটা বড় ফিল্মের প্রোজেক্ট পেয়েছে মা, সেটা হাতছাড়া করা মানে কেরিয়ারে পিছিয়ে যাওয়া। মা ঈষৎ কাঁপাস্বরে বলেছিল, 'চকোলেট! তুমি বড় হয়েছ। আমি জানি, তুমি চাও না মায়ের কেরিয়ারে ক্ষতি হোক! তোমার বাবা নিজের প্রভাব খাটিয়ে কলকাতায় আমার অনেক প্রোজেক্ট ক্যানসেল করিয়ে দিয়েছে। তোমায় এসব কথা বলতে চাইনি। কিন্তু মুম্বাইতে আমার পায়ের মাটি শক্ত করতেই হবে। আই প্রমিস, ফিরে এসেই আমি তোমাকে দেখতে যাব?'

বড় হয়ে যাওয়া চকোলেট চোখ মুছল। না, মা পিছিয়ে যাক, সে চায় না। অসুবিধা কী আছে? এখানে পেক্টির মতো তো আরো অনেকেই থাকবে, যাদের কেউ নেই। পেক্টি বলছিল, কয়েকদিন পরেই নাকি বরফ পড়বে। সাদা বরফকুচিতে ছেয়ে যাবে স্কুলের সবক'টা বাড়ির ছাদ।...চকোলেটের ঠিক সময় কেটে যাবে।

কিন্তু তার আগে আজ ওকে সেই কাজটা করতেই হবে। পেক্টি যতই বারণ

করুক, ও শুনবে না। এমন সুবর্ণ সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। ডঃ সুধন্য সেন দুদিনের জন্য কোনও কাজে গেছেন বাইরে।

প্রেয়ারের পর ফাদার লরেন্স বলতে শুরু করলেন, 'মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, যারা বাড়ি চলে যাচ্ছ, তাদের মেরি ক্রিসমাস ইন অ্যাডভান্স এবং হ্যাপি নিউ ইয়ার। পরিবারের সঙ্গে খুব ভালো সময় কাটাবে। বাড়ির বয়স্কদের সময় দেবে, সম্মান করবে, ছোটোদের ভালোবাসবে। যিশুও তাহলে তোমাদের ভালবাসবেন।'

'ইয়েস স্যার!' সবাই সমস্বরে গলা মেলাল।

'আর যারা এখানে থাকবে, তাদের জন্যও ভালো খবর আছে। আমরা কয়েকজন তো থাকবই, এবার থাকবেন সেন স্যারও। তোমরা কি জানো, ডঃ সেন খুব ভালো আইস স্কেটিং করতে পারেন? আমেরিকাতে উনি অনেক প্রাইজ জিতেছেন স্কেট করে। আমি এরমধ্যেই বেশ কিছু স্কেটিং শু্য অর্ডার দিয়েছি স্কুলের জন্য। আমরা সবাই মিলে স্যারের কাছে স্কেটিং শিখব। দারুণ হবে!'

চকোলেট আর পারল না। ওর গলা দিয়ে বেরিয়ে এল, 'বাট হি ইজ অ্যা লায়ার, ফাদার!'

মুহূর্তে সূচীভেদ্য নৈঃশব্দ্য! শিক্ষক থেকে ছাত্রছাত্রী সবাই ঘুরে তাকাল চকোলেটের দিকে।

'হোয়াট আর ইউ সেয়িং, মাই বয়?' ফাদার লরেন্স বিমূঢ়। মিস জেনি, মিঃ প্যাট্রিক, মিঃ শর্মার মত অন্য শিক্ষকরাও হতবাক।

'ইয়েস ফাদার। ঠিকই বলছি।' আঙুল উঁচিয়ে বলল ছোট্ট চকোলেট, 'ডঃ সুধন্য সেন নামে আমেরিকায় কোন মহাকাশবিজ্ঞানী নেই, কোন বিজ্ঞানীই নেই।'

এত বড় ক্যাম্পাস থমথম করছে। অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা কটেজ আঙ্কল, আন্টিরা, অ্যাটেনডেন্টরা স্তব্ধ।

'আপনি নিজেই তো বলেন স্যার, সত্যি কথা বলতে ভয় পাবে না।' উত্তেজনায় চকোলেটের গলা কাঁপছিল, 'উনি সুধন্য সেনের পরিচয়ে এখানে এসেছেন। প্রতি মাসের এক তারিখে উনি খাদের কাছে গিয়ে বলেন, ক্ষমা করো সুধন্য! বিশ্বাস না হলে জিগ্যেস করুন। দিজ পার্সন ইজ অ্যান ইম্পস্টার।'

হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে বলে উঠলেন ফাদার লরেন্স, 'আমি সব কথাই জানি, চকোলেট!'

চকোলেট চমকে উঠল।

'হ্যাঁ। গত বছর আয়ারল্যান্ডের একটা স্কুলে একটা লোক হঠাৎ ঢুকে নির্বিচারে গুলি চালিয়েছিল। মারা গিয়েছিল তেইশটা বাচ্চা। খুব হইচই হয়েছিল। তাদের মধ্যে ছ'বছরের একটা বাচ্চার নাম ছিল সুধন্য। সুধন্য সেন। ঠিকই বলেছ, নতুন স্যারের নাম সুধন্য নয়। তাঁর আসল নাম সুপ্রতিম সেনগুপ্ত। সুধন্য ছিল তাঁর একমাত্র সন্তান।' ফাদার লরেন্স দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

সবাই স্থবির হয়ে শুনছে প্রিন্সিপ্যাল স্যারের কথা।

'তোমরা জানো, আমিও এই স্কুলেই পড়তাম। আমারই সহপাঠী ছিল সুপ্রতিম। অসম্ভব ভালো ছাত্র ছিল। শুধু লেখাপড়াতেই নয়, আরও অনেকরকম গুণ ছিল ওর। পাশ করে বিদেশে গিয়েছিল পড়তে। তারপর আয়ারল্যান্ডের এক নামজাদা বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কের অধ্যাপনা। এদিকে আমি চলে আসি সম্পূর্ণ অন্য দিকে। পড়াশুনো শেষ করে চার্চের কাজে আসি। কিন্তু বন্ধুত্বে কোনওদিনও ছেদ পড়েনি। সুপ্রতিমের স্ত্রী মারা যান বছরকয়েক আগে। তারপর থেকে সুপ্রতিম ওর ছেলেকেই আঁকড়ে ধরেছিল। হঠাৎ ওইরকম একটা আঘাত!'

ফাদার লরেন্সের চোখ জলে ভরে আসছিল, 'তোমরা বিশ্বাস করবে না, সুপ্রতিম পাগল হয়ে গেল। অত বড় একজন প্রোফেসর সারাদিন খালি পায়ে ডাবলিনের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। খায় না, চুল কাটে না।'

'তোমাদের সবসময়েই বলি, স্কুলজীবনের বন্ধুত্বের মতো নির্ভেজাল, আন্তরিক বন্ধুত্ব আর কোনওদিনই হয় না। বন্ধুর এমন অবস্থায় আমি দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম! অনেক বুঝিয়েও যখন পারলাম না, বললাম, চলে আয় এখানে! আমি কথা দিচ্ছি, তুই এখানে হাজার হাজার সুধন্যকে খুঁজে পাবি, তাদের পড়াবি, শেখাবি, তাদের সঙ্গে খেলবি।

'সুপ্রতিম চলে এল এখানে। যাতে কেউ ওকে অতীতের আঘাত মনে করাতে না পারে, তাই ওর সবকিছু আমি বদলে দিলাম। কাগজে কলমে অবশ্য ঠিকই রয়েছে। এই স্কুলের হেড অ্যাকাউন্ট্যান্ট মিঃ কলিন্স আর আমি ছাড়া কেউ জানল না। ওকে বললাম, কেউ জানবে না, তুই আমার বন্ধু। যেভাবে বছর পঁয়ত্রিশ আগে এই স্কুলের মাটিতে আমাদের বন্ধুত্ব শুরু হয়েছিল, সেভাবেই আবার শুরু হবে। তুই ভেবে নিবি, এই স্কুলেই তোর সুধন্য রয়েছে, কোথাও একটা রয়েছে।

'অনেক বোঝানোর পর সুপ্রতিম রাজি হল। শর্ত দিল একটাই, বাকি জীবনটা ও এই স্কুলে বেঁচে থাকবে ওর ছেলের পরিচয়ে!'

ফাদার লরেন্সের গলা বুজে আসছিল, 'তবু প্রতি মাসের এক তারিখ এলে ও কেমন চঞ্চল হয়ে যায়, আজও! চলে যায় খাদের ধারে। আমি ফোন করি ঘন ঘন। আবার বোঝাই।'

ফাদার লরেন্স চকোলেটের দিকে তাকালেন, 'আমি জানি, ও তোমাকে একদিন ওর বাংলোয় যেতে বলেছিল। আসলে, ওর ছেলেও তোমারই বয়সি ছিল! আর সেও পেন অন্ত প্রাণ ছিল। আমি জানি। আমি ওকে বুঝিয়েছি, প্রথমেই তো সব বরফ গলবে না। সময় লাগবে! এভাবেই চলছে। হ্যাঁ, আমি এই স্কুলের সবার কাছে আমার বন্ধুকে বাঁচানোর জন্য মিথ্যা বলেছি, তার জন্য আমি ক্ষমা চাইছি! তোমরা সবাই আমায় পারলে ক্ষমা করো।'

ক্রিসমাস থেকে নববর্ষ, স্কুলটাকে যে এইভাবে আলোয় আলোয় সাজানো হয়, এবারে না থাকলে চকোলেট জানতেই পারত না। স্কুলের পাঁচ হাজার পড়ুয়ার মধ্যে রয়েছে মাত্র শ'চারেক, কিন্তু তাতেই ওদের আনন্দের সীমা নেই!

এই কয়েকদিনে আইস স্কেটিং-এ চকোলেট যতটা না পাকাপোক্ত হয়েছে, তার চেয়ে বেশি আয়ত্ব করেছে পেস্ত্রি। ওইটুকু একটা মেয়ে যে এমন দ্রুত স্কেট করতে পারে, চকোলেট ধারণা করতে পারেনি। দিনরাত স্কেটিং রিঙ্কে গিয়ে প্র্যাক্টিস করে চলেছে। সুধন্য স্যার বলেছেন, পরের বছর ওকে ন্যাশনালে খেলতে পাঠাবেন।

চকোলেট নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছিল। আর মাত্র এক মিনিট। তারপরই নতুন বছর, আর চকোলেটের জন্মদিন!

বাবা-মা দুজনেই ফোন করেছিল। বাবা বলেছিল, 'তোর বার্থডে গিফট বাবদ টাকা ট্রান্সফার করেছি স্কুলে, নিয়ে নিস, কেমন?' মা বলেছিল, 'আমি তো ওইসময়ে ফ্লাইটে থাকব। মেসেজ শিডিউল করে রেখেছি সোনা অনেক আদর ছোট্ট চকোলেটটাকে!'

দূরে স্কুলের ক্লকটাওয়ারে ঢং-ঢং করে বারোটার ঘণ্টা বাজা শুরু হল। চকোলেট চমকে ওঠে। এক দুই তিন...বারো!

হ্যাপি বার্থডে চকোলেট! আজ থেকে তুমি তেরো বছরের বিগ বয়!

নিজের মনেই নিজেকে বলতে যাচ্ছিল ও, কিন্তু হঠাৎ দরজায় শব্দ হয়। আলো জ্বলে ওঠে কটেজের ঘরে। ওমা! চকোলেট নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না।

পেস্ত্রি, টিফানি, জয়িতা, আকাশ, আরো অনেকে এসেছে! কারুর হাতে বেলুন, কারুর হাতে বাঁশি! সবাই ঝলমলিয়ে বলছে, 'হ্যাপি বার্থডে!'

আর সবার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সুধন্য স্যার। তাঁর হাতে একটা প্রকাণ্ড বড় কেক। মুখে চোখে হাসি জ্বলজ্বল করছে। মিটিমিটি হেসে বলছেন, 'হ্যাপি বার্থডে টু আওয়ার লিটল ডিটেকটিভ!'

'চকোলেটদাদা!' পেস্ত্রি চেঁচিয়ে ওঠে, 'স্যার তোমার জন্য নিজে কেক বানিয়ে এনেছেন, দ্যাখো!'

'তোমার জন্মদিনেও বানাব পেস্ত্রি! কিন্তু কন্ডিশন একটাই!' সুধন্যস্যার কৌতুকমাখা চোখে তাকান, 'আমাকেও পাখিদের ল্যাংগুয়েজ শেখাতে হবে!'

টুং শব্দে মোবাইল ফোনে মায়ের মেসেজের আলো জ্বলে ওঠে। কিন্তু চকোলেট সেদিকে তাকায় না। ছুটে গিয়ে ও জড়িয়ে ধরে স্যারকে!

স্যারও জড়িয়ে ধরেন ওকে। ফিসফিস করেন, 'স্বরোভস্কি পেনটা এনেছি চকোলেট। তুমি নেবে? ওটা...ওটা সুধন্যর খুব প্রিয় ছিল।'

রাজা ভট্টাচার্য

দাচিগাঁওয়ের রাত

ঠের তৈরি দোতলা বাড়িটায় পা দেওয়ার পরেই টিটিনের মনে হল, 'এই বাড়িতে যদি ভূত না-থাকে, তাহলে দুনিয়ার কোথাও নেই।'

আগে যাওয়া হল কাশ্মীরেই। বাড়িসুদ্ধু সবাই মিলে সে দারুণ হইচই। আশপাশ দেখা হয়ে গেল প্রথম তিন দিনের মধ্যে। চতুর্থদিন রাত্তিরে ওরা লিনজ্ নামের একটা রেস্টুরেন্টে 'আজওয়ান' খেতে গেল। সে এক এলাহি ব্যাপার, খানিক ভাত, আর মাংসের ছ'রকম কাশ্মীরি পদ। তেড়ে খাওয়াদাওয়া করে হাঁটতে হাঁটতে ফেরার সময় ছোটকা বলল, 'কাল আমরা একটা দারুণ জায়গায় যাব। তোরা কেউ দাচিগাঁও নামটা শুনেছিস?'

সকলেই মাথা নাড়ল।

ছোটকা বলল, 'এটা একটা রিজার্ভ ফরেস্ট। কাছেই, বেশিক্ষণ লাগবে না। জীবজন্তু খুব কিছু দেখা যায় না বটে, কিন্তু সিনিক বিউটি সাঙ্ঘাতিক। জঙ্গলের ভিতরে দারুণ একটা বাড়ি আছে। আজই পেলাম পারমিশন।'

প্রথম গেট পেরিয়ে বেশ খানিকটা পথ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পেরতে হল গাড়িতেই; তারপর পড়ল আর একটা গেট। এই গেটের মুখে রীতিমতো একটা সেনা-ছাউনি। এখানে এসে ইস্তক এই একটা ব্যাপার দেখে আসছে ওরা। কাজেই গেটটা খুলে দেওয়ার

ছবিঃ ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য
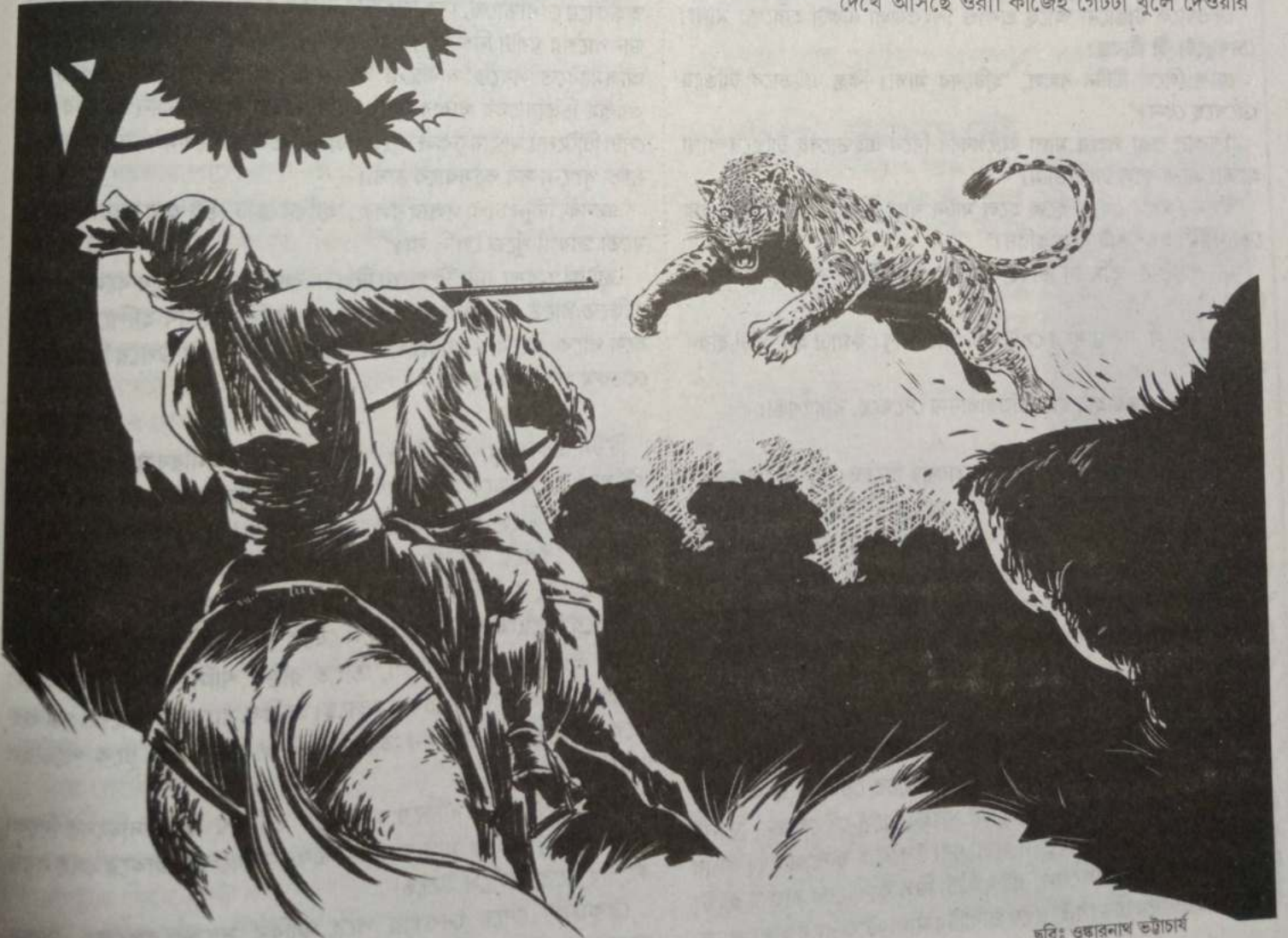
জন্য একজন কেউ ছুটে আসছে, এইটুকু দেখেই নিশ্চিন্ত হল টিটিন। গাড়ি চালিয়েই ভিতরে ঢুকে পড়ল ওরা; আর নেমে হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

এত সুন্দর জায়গা পৃথিবীতে আছে, এক মিনিট আগেও ভাবতে পারেনি।

কাঠের বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে গেটের কাছেই। এটা আসলে বাড়িটার পিছন দিক। সামনে একটা ঘন সবুজ ঢেউ-খেলানো জমি চলে গেছে সেই পাহাড়ের সানুদেশ পর্যন্ত। তার মাঝে মাঝে ছোট-বড় সব গাছ। বড়গুলো চিনার। ছোটগুলো যে অ্যাপ্রিকট—দাদাই বলে দিল। এই এপ্রিল মাসে সেগুলো ফিকে গোলাপি ফুলে ফুলে সেজে উঠেছে। চিনারের নীচের ছায়াময় জায়গাটুকুও এখন ছেয়ে আছে হরেক রঙের ফুলে—সাদা, নীল, বেগুনি। সবকিছুর উপর এসে পড়েছে বেলা দশটার ঝকঝকে রোদ্দুর।

এইবার ওরা বুঝতে পারল, বাড়িটা এইভাবে রাস্তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেন। মাঠের দিকে মুখ করেই বানানো হয়েছে। লম্বা বারান্দা, তাতে সার সার চেয়ার পাতা; তার মধ্যে একটা আদ্দিকালের বেতের চেয়ার।

ওরা তিনজন লাফ দিয়ে নেমে এল বাড়ির সামনের ঢালু লনটায়। মখমলি সবুজ ঘাসে গড়াগড়ি দিতে ইচ্ছে করছে।

বড়রাও মাঠে নেমে ছুটোছুটি করতে শুরু করে দিল। এইসময় দাদাই বলল, 'টিটিনবাবু! একবার এদিকে আসুন!'

বেজায় খুশি হলে দাদাই টিটিনকে আপনি বলে। টিটিন দৌড়ে গেল, 'বলো, দাদাই!'

'বলো দেখি টিটিনবাবু, এটা কী?'

দাদাইয়ের আঙুল লক্ষ করে তাকিয়েই এক লাফে পিছিয়ে এল।

দেওয়ালে টাঙানো আছে প্রকাণ্ড শিংওয়ালা একটা হরিণের মাথা! চোখদুটো কী জীবন্ত!

ঢোক গিলে টিটিন বলল, 'হরিণের মাথা! কিন্তু এইভাবে টাঙিয়ে রেখেছে কেন?'

'শিকার করা পশুর মাথা আগেকার দিনে এইভাবেই টাঙিয়ে রাখা হতো। একে বলে ট্যাক্সিডার্মি।'

'ইসস! মাংস খেতে ইচ্ছে হলে মাটন খাক, চিকেন খাক! এগুলোর তো ফার্মিং হয়! তাই বলে হরিণ!'

'না, দাদুভাই, তুমি যা ভাবছ, তা নয়। শিকার-টিকার অনেক হতো। কিন্তু—'

থেমে বলল, 'কিন্তু কথা সেটা নয়, টিটিনবাবু! কথাটা হল, এটা হরিণ নয়।'

অ্যাঁ! হরিণ নয়? হ্যাঁ, হ্যাঁ, চিড়িয়াখানায় দেখেছে, বারাশিঙা।

'দাদাই! এটা বারাশিঙা!'

দাদাই হেসে বললেন, 'হুঁ! বেশ কাছাকাছি গিয়েছ! এর নাম হাঙ্গুল।'

ততক্ষণে পিলু আর বিতানও চলে এসেছে টিটিনের পিছন পিছন। এমন সময় যে ভদ্রলোক গেট খুলে দিয়েছিলেন, তিনি ফের চলে এলেন; হাতে মস্ত চাবির গোছা। প্রকাণ্ড তালাটা খুলে ফেললেন। বড়রা তখনও মাঠে, ফলে ওদের মধ্যে প্রথম বাড়িটার ভিতরে ঢুকল টিটিনই; এবং মিনিট তিনেকের মধ্যেই ওর মনে হল—'এই বাড়িতে ভূত থাকবেই।'

সত্যি বলতে কী, বাড়িটায় কিছু সময় কাটালেই এই কথাটা মনে আসতে বাধ্য। বহুকালের পুরোনো বাড়ি; কাঠের তৈরি, পুরু কার্পেটে মোড়া। ইতিমধ্যে কেয়ারটেকার জাকির সাহেব এসে পৌঁছেছেন; তিনিই ঘুরিয়ে দেখালেন ওদের বাড়িটা। লম্বা এবং টকটকে ফর্সা মানুষ। বসার ঘরটায় ঢুকে প্রথমেই বললেন, এই বাড়িটা ছিল কাশ্মীরের রাজার হান্টিং লজ; দাদাই একদম ঠিক। বাইরে যে প্রাণীটির মাথা স্টাফ করে রাখা আছে, তাকে হাঙ্গুল বলে। সেটাকেও রাজা মেরেছিলেন।

এরপরেই জাকির সাহেব বললেন, 'অব ইসকো দেখিয়ে। প্রায় একশো বছর হয়ে গেল এই পিয়ানোর বয়েস। এককালে খোদ মহারাজ, বা তাঁর মেমসাহেব এই পিয়ানো বাজিয়েছেন এই স্টুলে বসেই।'

শুনে টিটিনের গা শিরশির করে উঠল। জিগ্যেস করল, 'আমি একটু বাজাব?'

জাকির একগাল হেসে বললেন, 'জরুর! নিশ্চয়ই বাজাবে!'

কাজেই ভয়ে ভয়ে অদ্ভুত দেখতে স্টুলটায় বসে পিয়ানোর রিডগুলোয় হাত দিল টিটিন। উফ্‌! সত্যিই পড়ে থেকে থেকে একদম নষ্ট হয়ে গেছে। বেজায় মুখে উঠে পড়ল টিটিন।

পিয়ানোর পাশেই একটা ক্ষুদে গুহা। জাকির সাহেবের কথা শুনে বুঝতে পারল, একেই বলে 'ফায়ার প্লেস।' 'আইয়ে ইস তরফ।' বলে ভিতরের দিকের দরজাটা খুলে ফেললেন জাকির। 'ওরেব্বাস রে!' বলে এক লাফে পিছিয়ে এল ছোটকা। ততক্ষণে অবশ্য ছোটকা সামলে নিয়েছে। 'সরি...হেঁ হেঁ!'

ছোটকা যে কেন ঘাবড়ে গিয়েছিল, সেটা অবশ্য দেখা হয়ে গেছে টিটিনের।

এই ঘরটার ভিতরের দিকের দেওয়ালে টাঙানো আছে প্রকাণ্ড একটা চিতার চামড়া। অদ্ভুতভাবে আলো সেট করা হয়েছে এই ঘরটায়, সেই আলো গিয়ে পড়েছে চিতাটার উজ্জ্বল চোখে। ফলে সেই মৃত চিতার চোখ এখনও জ্বলছে।

ভয়ে ভয়ে ঘরটায় ঢুকল টিটিন, পিছন পিছন অন্যরাও। আবছা অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে, ঠিক চিতাটার নীচেই রাখা আছে খাওয়ার টেবিলটা, ডানপাশের ঘরটা নিশ্চয়ই রান্নাঘর, আর অন্যদিকের দেওয়ালে টাঙানো আলমারিতে সযত্নে সাজানো আছে হরেকরকমের কাপ-ডিশ-চামচ। ওরকম চিতাবাঘের থাবার নীচে বসে খাওয়াটা যে কোন্ ধরনের শখ, সেটা টিটিনের মাথায় ঢুকল না। গোটা একতলাটাই কেমন যেন, অন্ধকার, সাত-পুরনো সব আসবাবে ঠাসা।

এমনকী দিদুন চাপা গলায় বলল, 'হ্যাঁ রে ছোটা, তুই আর রাত কাটানোর মতো জায়গা খুঁজে পেলি না?'

ছোটকা অবশ্য মোটেই পাত্তা দিল না কথাটাকে, 'কী যে বলো মা! এই বাড়িতে রাতে থাকার জন্য কত বড় বড় অফিসার সব হাপিত্যেশ করে বসে থাকে, জানো? চলো দেখি!' দিদুনকে হাত ধরে উপরে নিয়ে গেল। বেডরুম সব উপরেই।

টিটিন একা রয়ে গেল নীচে। কী যেন একটা অন্যরকম ব্যাপার আছে এই ঘরগুলোয়। মনে হচ্ছে, যেন বহুকালের পুরোনো একটা সময়, ঘাপটি মেরে বসে আছে এই প্রায়ান্ধকার ঘরগুলোয়। এতটুকু সুযোগ পেলেই নিঃশব্দে বেরিয়ে আসবে ওই পিয়ানোর তলা থেকে, ফায়ারপ্লেসের গর্তটা থেকে, বা সিঁড়ির নীচের ঘুপচি জায়গাটা থেকে।

উপরে গিয়ে অবশ্য এসব ভুলে যেতে বেশিক্ষণ লাগল না। ঘরগুলো রোদে ভরা, বড় বড় জানলা, তাতে রঙিন শার্সি। লনের দিকে টানা বারান্দা, তাতে দোলনা-চেয়ার ঝুলছে। জাকির সাহেব শিকারের গল্প শুরু করে দিয়েছেন। কয়েকদিন আগেই এই লনটায় নাকি ঢুকে পড়েছিল দু'দুটো লেপার্ড।

টিটিন একটু দূরে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল সামনের দিকে। দূরের পাহাড়গুলোর মাথায় বরফ, এখন সকালের রোদ্দুরে সেই বরফ রুপোর মতো ঝলসে উঠছে।

ব্রেকফাস্ট সেরে নেওয়ার পরে জাকির সাহেব বললেন, 'চলুন, আপনাদের প্রথম ওয়াচ টাওয়ারটা দেখিয়ে আনি।'

কিছুটা চড়াই ভেঙে উঠে এসে ওরা দেখতে পেল ওয়াচ-টাওয়ারটা। কাঠের তৈরি দোতলা ওয়াচ-টাওয়ার, তার একতলাটা প্রায় একটা ঘরের মতোই। ডানপাশ থেকে উপরে উঠে গেছে ঘোরানো সিঁড়ি। দোতলাটায় শুধু বুক পর্যন্ত রেলিং, আর উপরে ছাদ; বাকিটা খোলা।

এমন সুন্দর জায়গা কক্ষনও দেখেনি টিটিন। এখন পূর্বদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে ওরা সবাই। সামনে উঠে গেছে ঘন সবুজ পাহাড়ের ঢাল, তারও পিছনে দেখা যাচ্ছে বরফে-ঢাকা পাহাড়চূড়া। ডাইনে নেমে গিয়েছে গভীর খাদ।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর বিতান বলল, 'দাদা,কাউকে দেখা যাচ্ছে না রে!'

টিটিন হেসে বলল, 'এখানে আবার কাকে দেখা যাবে? রিজার্ভ ফরেস্ট না?'

এই সময় ছোটমা হঠাৎ 'হরিণ!' বলে চেঁচিয়ে ওঠায় নীরবতা মুহূর্তে উধাও। কেন না জাকির সাহেব উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন। ছোটকা হি হি করে হেসে উঠেই চুপ করে গেল। এমন সময় 'হরিণ'-টাও গম্ভীর গলায় 'হাম্বা-আ-আ' করে ডেকে উঠল!

দুপুরে তোফা খাওয়া-দাওয়ার পর বাকি সবাই মিলে গিয়ে বসল বারান্দায়। বিতান আর পিলু মাঠে নেমে পড়ল। টিটিনও মাঠে যাবে বলেই নেমে আসছিল, এমন সময় একটা অদ্ভুত শব্দ কানে এল ওর।

টুং টাং...টুং টাং...।

খুব পুরনো আর দামি কোনও গ্র্যান্ড পিয়ানোর বাজনার শব্দ। কেউ খুব দরদ দিয়ে বাজাচ্ছে। এখনও এসব শেখানো হয় না অবশ্য ওদের। অন্য কোথাও বাজাচ্ছে কেউ, কারণ শব্দটা খুব মৃদু, ক্ষীণ।

পরে কেয়ারটেকার ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করতে হবে—ভাবতে ভাবতে দরজার দিকে এগোল টিটিন; আর তখনই ওর চোখে পড়ল...

সব জানলা-দরজা বন্ধ থাকার ফলে নিচের ড্রয়িংরুমে এখন নিমনিমে অন্ধকার। দরজার পাশে রাখা পিয়ানোর রিডগুলোয় এই নির্জন দুপুরে যেন প্রাণের স্পন্দন দেখা দিয়েছে। খুব...খুব সামান্য ওঠানামা করছে তার হলদে হয়ে-আসা চাবিগুলো, যেন অদৃশ্য কোনও বাজনদার স্টুলটায় বসে বাজাচ্ছে পিয়ানোটা, ভেসে আসছে দূরাগত সুর। টুং টাং...

টিটিন বুঝতে পারল, ওর ঘাড়ের রোমগুলো খাড়া হয়ে উঠছে।

ঠিক এই সময় এক ঝটকায় খুলে গেল বারান্দার দিকের দরজাটা। পিলু আর বিতান দাঁড়িয়ে আছে সেখানে, ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়ছে ওদের। খুব ছুটোছুটি করে খেলছিল নিশ্চয়ই।

কয়েক সেকেন্ডের জন্য টিটিন অসাড় হয়ে গিয়েছিল। সম্বিত ফিরে পেয়ে আবার তাকাল পিয়ানোটার দিকে। বন্ধ হয়ে গেছে তার রিডের স্পন্দন, নিয়মিত ওঠানামা। বন্ধ হয়ে গেছে সুর। তারপরেই একটা আশ্চর্য ব্যাপার খেয়াল করল টিটিন। স্টুলের উপরে চকচকে কুশনটা সামান্য ফুলে উঠল, যেন এতক্ষণ স্টুলটায় বসে ছিল কেউ।

চেপে রাখা নিঃশ্বাস ফেলে ঘরটা থেকে বেরিয়ে এল টিটিন। এইরকমই হওয়ার কথা অবশ্য। ওকে বারান্দায় বেরিয়ে আসতে দেখে পিলু বলল, 'রেস করবি, দাদা?'

টিটিন বলল, 'বরং নদীর পাড়ে যাই, চল। দারুণ না জায়গাটা?'

কিন্তু গেটের কাছে গিয়ে ওরা একটু ভড়কে গেল। মস্ত গেটটা বন্ধ, একটা বিরাট তালা ঝুলছে।

যে ভদ্রলোক ওদের গেট খুলে দিয়েছিলেন, তিনি একতলার টানা বারান্দাটার শেষে একটা ঘরে ঢুকে পড়েছিলেন, ও খেয়াল করেছিল। দুই ভাইকে দাঁড় করিয়ে নুড়ি-বিছানো রাস্তাটা ধরে টিটিন ফিরে এল বারান্দায়। ড্রয়িংরুমের দরজাটা পেরিয়ে হেঁটে যেতে যেতে হঠাৎ

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

লনের শেষটা যেখানে পাহাড়ের ঢালু জমিতে মিশে গেছে, সেখান থেকে ভেসে আসছে অদ্ভুত একটা গর্জন, যেমনটা ও কক্ষনও শোনেনি। 'ঘ্রাও! ঘ্রাও!!' কীসের শব্দ এটা?

সামনের দরজাটা খুলে গেল শব্দ করে। সেই ভদ্রলোক প্রায় ছিটকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন বারান্দায়। ভয়ার্তকণ্ঠে বললেন, 'লেপার্ড! জলদি ঢুকে পড়ো।' উপরের গল্পের আওয়াজটাও থেমে গেছে আচমকা! মায়ের গলা শোনা গেল শুধু, 'পিলু! বিতান! টিটিন!'

লেপার্ড! পিলু আর বিতান যে দাঁড়িয়ে আছে গেটের সামনে।

টিটিন গেটের দিকে ছুট লাগাল। ওই দুজনও দৌড়তে শুরু করেছে লজের দিকে। দশ সেকেন্ডের মধ্যে দুই বিচ্ছু উঠে পড়ল বারান্দায়; সেই ভদ্রলোক বিদ্যুদ্বেগে ওদের ঘরটায় ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

টিটিন একটা ব্যাপার দেখে ভয়ে কাঠ হয়ে গেল।

বারান্দার দেওয়ালে হাঙ্গুলের মুখটা ঘুরে গিয়েছে ডানদিকে, যেদিক থেকে ভেসে আসছে ওই ভয়ংকর রক্ত জল-করে দেওয়া গর্জনটা।

ওকে প্রায় টেনে ঘরে ঢুকিয়ে নিয়ে ধড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছেন ভদ্রলোক। তখনও তিনি থরথর করে কাঁপছেন।

ততক্ষণে সিঁড়ি বেয়ে ঝড়ের বেগে নেমে এসেছে বড়রা। ওরা নিরাপদে ঘরে ঢুকে পড়েছে সবাই, এটা দেখার পর লেপার্ড দেখার আশায় উপরে ছুটল সবাই।

শুধু জাকির সাহেব ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে রইলেন সিঁড়ির পাশটায়। স্পষ্টত, কিছু একটা তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছে।

তিনি ফিরে তাকালেন সেই ভদ্রলোকের দিকে। তারপর চাপা গলায় বললেন, 'ফিরোজ! দিস ইজ নট আ লেপার্ড অ্যাট অল! হোয়াট দ্য হেল ইজ দিস?'

সিক্সে পড়লেও, টিটিনের বুঝতে অসুবিধে হল না, জাকির সাহেব এমন ভয়ানক অবাক হয়েছেন কেন! কীসে!

এই ডাক টিটিনও চেনে। এটা চিতার ডাক। টিভিতে দেখেছে।

এও জানে, শেষ ভারতীয় চিতাটা মারা গিয়েছিল অন্তত সত্তর বছর আগে!

রাতে জঙ্গল যে এমন অন্য চেহারা ধরে, টিটিনের ধারণাই ছিল না! আজই সকালে এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে গিয়েছে ওরা। জলের আর ফুলের আর পাতার ঝিলমিলে রঙ দেখতে দেখতে। এখন হেডলাইটের আলো পড়ছে শুধু সামনের ভাঙাচোরা রাস্তাটুকুর উপরেই; বাকি পৃথিবী গাঢ় অন্ধকারে। মাঝে মাঝে রাস্তার পাশে দপ করে জ্বলে উঠছে লাল টুকটুকে চোখ, ধড়ফড়িয়ে উড়ে যাচ্ছে মাটিতে বসে থাকা নাইটজার পাখি।

ঘাসজমির উপর দিয়ে গাড়িটা যখন দ্বিতীয় ওয়াচ-টাওয়ারের নিচে গিয়ে দাঁড়াল, তখন রাত প্রায় ন'টা। এই জায়গাটায় বড় গাছ তেমন নেই, ঢালু ঘাসজমি গড়িয়ে গেছে সংকীর্ণ খাদের দিকে, তার ওপাশে খাড়া উঠে গেছে পাহাড়।

আজ যেন দাদাইয়ের অন্য রূপ। নিঃশব্দে, শুধু হাতের ইশারায় বলে দিল, কে কোথায় দাঁড়াবে। সবার আগে, রেলিঙে হাত রেখে দাঁড়াল তিন খুদে! টিটিনের ঠিক পিছনে দাঁড়াল দাদাই নিজেই।

প্রায় আধঘণ্টা পরে, চাঁদ যখন পাহাড়ের মাথা ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা উঠে এসেছে, সেই সময় টিটিন আচমকা বুঝতে পারল, ওর কাঁধের উপর চেপে বসছে দাদাইয়ের শক্ত আঙুলগুলো। চমকে উঠে সামনের দিকে বড় বড় চোখে তাকাল টিটিন, আর জমে গেল।

পাইনের জঙ্গল ভেদ করে, লাবণ্যময় গতিতে নেমে আসছে একটা প্রাণী। ছিপছিপে লম্বা চেহারা, সরু কোমর আর কাঁধের নিখুঁত গড়ন থেকে টিটিনের বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হল না—ইনি কে। চিতা! লেপার্ড নয়, চিতা!

এক মুহূর্তের জন্য টিটিনের মনে হল, তাহলে কি এইসব জঙ্গলে আজও টিকে আছে কয়েকটা চিতা? পরক্ষণেই ওর মনে পড়ল, শ্রীনগর থেকে দাচিগাঁও বড়জোর দু'ঘণ্টার পথ। এখানে এমন কিছু দেখা গেলে সে খবর নিমেষে রাষ্ট্র হয়ে যেত!

চিতাটা নিঃশব্দে নেমে এল খাদ পর্যন্ত। এখন মাঝে শুধু একটা সংকীর্ণ খাদ, একটা গাছের আড়াল পর্যন্ত নেই।

কয়েক সেকেন্ড মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল চিতাটা, তারপর ভারহীন লঘু একটা লাফ দিয়ে পেরিয়ে এল খাদ। তারপর ঘাড় তুলে উপরের দিকে তাকাল চিতাটা। সরাসরি টিটিনেরই মুখের দিকে। পলকে বদলে গেল মুখটা। দপ করে জ্বলে উঠল দুই হলুদ চোখ, বেরিয়ে এল দাঁত।

এক পা পিছিয়ে গিয়ে কুঁজো হতে লাগল চিতাটা। লাফ দেবে এইবার। শিকার ওর নাগালের মধ্যেই লেজটা লাঠির মতো শক্ত হয়ে উঠেছে...

গুড়ুম করে শব্দটা এমনই অপ্রত্যাশিত ছিল যে, টিটিন মৃত্যুর ভয় ভুলে গিয়ে লাফিয়ে উঠল! কে চালাল গুলি? জাকির সাহেব? কিন্তু তিনি তো বন্দুক আনেননি! চিতাটাই বা কোথায় গেল? পরমুহূর্তেই একটা কপকপ আওয়াজ শুনে চোখ ফেরাল টিটিন। আওয়াজটা আসছে ওদের ডানদিক থেকে।

জ্যোৎস্না ভেদ করে এগিয়ে আসছে একটা প্রশিক্ষিত ঘোড়া। বাঁহাতে লাগাম, আর ডানহাতে বন্দুক ধরে তার পিঠে যিনি বসে আছেন, তাঁর ঠোঁটের উপর শৌখিন গোঁফ, মাথায় পাগড়ি, বুকের উপর মুক্তোর মালা; কিন্তু পরনে খাঁটি শিকারের পোশাক।

বিস্ফারিত চোখে টিটিন দেখল, টাওয়ারের আড়াল থেকে রুদ্রমূর্তিতে বেরিয়ে এল সেই চিতাবাঘ! সঙ্গে সঙ্গেই গর্জে উঠল রাইফেল—গুড়ুম! গুড়ুম! গুলি খাওয়া চিতা লাফিয়ে উঠল সোজা উপরের দিকে!

চেঁচিয়ে উঠল টিটিন, 'দাদাই!'

ওর জ্ঞান ফিরল দোতলার শোয়ার ঘরে। দিদুন ওর চোখেমুখে জল থাবড়াচ্ছিল, আর মা কাঁদছিল। দাদাই ওর হাত ধরে বসেছিল পাথরের মতো। এক লাফে উঠে বসল টিটিন, 'দাদাই! চিতা!!'

দাদাই বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'ওয়াচ-টাওয়ারে আমরা কিচ্ছু দেখতে পাইনি, দাদুভাই! কিচ্ছু না! তুমিই না সেদিন আমাকে বললে— কতকাল আগে ভারত থেকে চিতা লুপ্ত হয়ে গেছে? তাহলে কেন তুমি চিতার ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলে?'

বিস্ময়ে টিটিনের চোখ বড় বড় হয়ে গেল,'কিচ্ছু দেখোনি? চিতা, ঘোড়ায় চড়া সেই লোকটা...'

'নাথিং! কোথায় চিতা? কোথায় ঘোড়ার উপর লোক? এই হান্টিং লজে আসার সময় থেকেই তুমি ভয় পাচ্ছিলে।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল দাদাই, অমনি টিটিনের চোখে পড়ল দাদাইয়ের পিছনে আড়াল হয়ে যাওয়া ছবিটা।

তীব্র স্বরে ও চেঁচিয়ে উঠল,'এই তো সেই লোকটা! এই লোকটাই তো একটু আগে ঘোড়ায় চড়ে...'

'সেটাও হতে পারে না দাদুভাই!' হতাশ গলায় বলল দাদাই,'এটা হল কাশ্মীরের শেষ রাজা, হরি সিং-এর ছবি। বুঝেছ? সেই সিক্সটি-ওয়ানে তিনি মারা গেছেন। তুমি বড্ড ভয় পেয়ে গিয়েছ। গরম কফি খাও এক কাপ, সুস্থ লাগবে। এসো, বাইরে কী সুন্দর চাঁদের আলো...'

করুণ চোখে একবার সবার মুখের দিকে তাকিয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল টিটিন, তারপর আবার দাঁড়িয়ে পড়ল।

বারান্দায় টাঙানো ওয়েস্টলি রিচার্ডসের ২৭৫ মডেলের বন্দুকটার মুখ থেকে এখনও বেরিয়ে আসছে অল্প অল্প ধোঁয়া!

বিবেক কুন্ডু

মন্দব্যূহ

বাক্সেং গ্রাম, ভুটান-চীন বর্ডার, ৬ মাস আগে...

মোটাসোটা ভেড়াটাকে নিয়ে ধাপে ধাপে নেমে যাওয়া সবুজ ঘাসের গালিচা ধরে নেমে আসছিল নোরবু। মাথার ওপর চক্কর খাচ্ছিল খুদে প্লেনের মতো জিনিসটা। মাঝেসাঝেই ইন্ডিয়া থেকে সুন্দর সুন্দর গিফট আসে এগুলোয় চড়ে। চলার স্পিড বাড়িয়ে দিল নোরবু।

জমির প্রায় ৫০ মিটারের মধ্যেই ছিল জিনিসটা। হঠাৎ করেই উঠতে শুরু করল ওপরে, স্পিড বাড়িয়ে উড়ে চলল নদীর পার বরাবর।

ভারতের কোনও এক জায়গায় মোবাইল স্ক্রিনের দিকে চেয়ে চুপচাপ বসেছিল একজন। বাচ্চাদের গিফট পাঠাতে যে ড্রোনটাকে পাঠিয়েছিল, তার ভিডিও ফিডে নদীর ধারের নতুন কুঁড়েবাড়িগুলো ফুটে উঠতেই নড়েচড়ে বসল সে। লাল পতাকাটা দেখে বুঝল, এর মধ্যেই লাইন অফ কন্ট্রোলে আস্ত একটা গ্রাম বানিয়ে ফেলেছে চীন। বাড়তে বাড়তে শিলিগুড়ি হয়ে সোজা দেশের ভেতরে ঢুকে পড়বে!

তড়িঘড়ি একটা নম্বর ডায়াল করল সে। মাসতিনেক আগে লাদাখে ইন্দো-চীন বর্ডারের ঘটনা বেশ চাপে ফেলেছিল দেশের সুরক্ষা দপ্তরকে। এমনটা আবার ঘটবার আগেই খবরটা ঠিক জায়গায় পৌঁছনো দরকার।

হিমাচল প্রদেশ, ৫ সেপ্টেম্বর, সকাল ৭টা

মোরেনের ওপর সাবধানে পা ফেলে খাড়াই পথ বেয়ে নামছিলেন গর্ডনসাহেব। কিছুক্ষণ আগেই পেছনে ছেড়ে এসেছেন প্রায় বরফে মোড়া ভয়ংকর সুন্দর ভাবা পাস, চড়াই পথ পেরিয়ে যেখানে ১৬০০০ ফুটেরও বেশি উচ্চতায় পৌঁছতে ঘাম ছুটে গিয়েছিল তাঁর। চারপাশ বদলাচ্ছিল ক্রমশ, ভাবার সবুজকে ছাপিয়ে ফুটে উঠছিল পিন উপত্যকার রুক্ষ চেহারা।

পিঠে পোর্টেবল তাঁবুসহ বড়সড় রাকস্যাকটা থাকায় কাঁধটা ধরে গিয়েছিল। তবুও বয়ে চলা পাহাড়ি বাতাস যে সুরমূর্ছনার সৃষ্টি করছিল, তাকে সম্বল করে স্পিতির দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিলেন গর্ডন। মাঝে মাঝে হাইকিং স্টিকটা দুহাতে ধরে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন সামান্য। অসামান্য এই ট্রেকের জন্য এ কষ্ট সহ্য করাই যায়। ফিরে যেতেই রোজকার সভ্য জীবন আবার গ্রাস করে ফেলবে তার স্বাভাবিক নিয়মানুবর্তিতায়। তাই যতক্ষণ এই নির্জন অনিয়মের মধ্যে থেকে মনকে মুক্ত করে রাখা যায়, ততক্ষণই ভালো।

মোরেনের পিঙ্গল বাদামি স্তরটার ওপর থেকে থেকে পাহাড়চূড়ায় ফুটে উঠছিল অবিন্যস্ত তুলোর মতো জমে থাকা তুষার। কাঁধে ঝুলে থাকা মিররলেস ক্যামেরায় কয়েকটা ওয়াইড অ্যাঙ্গল শট নিলেন গর্ডন। জুম করে দূরে থাকা পিন নদীর সর্পিল চেহারাটা তুলতে যাবেন, এইসময় হঠাৎই থমকে দাঁড়ালেন তিনি। জেট গতিতে বয়ে চলা বাতাসের ফাঁকে একটা বেমানান শব্দ কীভাবে যেন ঢুকে পড়েছে। কিছুক্ষণ কান পেতে শুনতেই বুঝতে পারলেন এটা কুকুরের ডাক। ওদের নিয়ে কাজ করবার পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে গর্ডনের, তাই এ ডাকের মানে বুঝতে পারলেন সহজেই। বিপদে পড়ে নির্ঘাত সাহায্য চাইছে বেচারা। কিন্তু সে আছেটা কোথায়?

এবড়োখেবড়ো মোরেন পেরিয়ে বরফের ওপর লাঠি ফেলে ফেলে এগিয়ে গেলেন গর্ডন। কুকুরের ডাকটা জোরে শোনা যেতে লাগল ক্রমশ। ভারী আওয়াজ, নিঃসন্দেহে কোনও বড়সড় জাতের কুকুর। একটা খুদে বোল্ডারের কাছাকাছি আসতেই দেখতে পেলেন মূর্তিমানকে।

ভারী পেশীবহুল চমৎকার চেহারা। গায়ের লাল কালো মেশানো ব্ল্যাক অ্যান্ড ট্যান চেহারা, খাড়া দুটো কান এবং লোমের বাহার স্পষ্ট তার জাত চিনিয়ে দেয়। চমকে উঠলেন গর্ডন। এ পাণ্ডববর্জিত এলাকায় এমন সুন্দর জার্মান শেফার্ড! বেচারাকে কেউ ফেলে চলে গেল নাকি? তাঁর দিকে সোজাসুজি চেয়ে দুবার জোরে ডাক দিল কুকুরটা। পেছনের পা দিয়ে পাথুরে জমি খুঁড়ে ফেলল বেশ খানিক।

অদ্ভুত ব্যাপার! ও কি কিছু দেখাতে চায়? এগিয়ে গিয়ে খোঁড়া জমিটার ওপর ঝুঁকে পড়লেন গর্ডন। জার্মান শেফার্ড বরফের ওপর লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল খানিকটা। মুখ ঘুরিয়ে সোজা চেয়ে রইল ঢালুজমি বরাবর নীচে নেমে যাওয়া বন্ধুর মোরেন সম্বলিত ধূসর জমির দিকে। যার ফাঁকে ফাঁকে বৈপরীত্য ফুটিয়ে তুলেছে ইতিউতি ছড়িয়ে থাকা টুকরো টুকরো পাতলা বরফের স্তর।

এইবার ব্যাপারটা আন্দাজ করলেন গর্ডন। কুকুরটা সম্ভবত চায় উনি ওর পেছন পেছন আসেন, ওঁকে কিছু দেখানোই ওর আসল উদ্দেশ্য।

শেফার্ডকে ফলো করতে গিয়ে বেপথে বেশি ঢুকে পড়লে মুধ গ্রামে পৌঁছতে বেশ দেরি হয়ে যাবে। আজ বিকেলের মধ্যে ওখানে পৌঁছলেই পিন-ভাবা ট্রেকের সমাপ্তি। এরপর চেনা ড্রাইভার রাজু ভাইয়ার গাড়িতে চেপে সোজা কাজা। সেখানে একদিন কাটিয়ে মানালি হয়ে চণ্ডীগড়। সেখান থেকে ফ্লাইট ধরে সোজা বেঙ্গালুরু ফেরত। ফিরে একটা বড়সড় কনফারেন্স আছে যেখানে গর্ডনের নতুন রিসার্চ নিয়ে একটা হাফ ডে সেশন থাকার কথা। এর জন্য অনেক প্রস্তুতি নিয়েছেন গর্ডন, শরীর মনে চাপও পড়েছে কম নয়। তাই নাগরিক কৃত্রিমতাকে দূরে ঠেলে এই দুর্গম নির্জন যাপনে খানিকটা এনার্জি বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া।

বেশিদূর যেতে হল না, শীতল মরুভূমির পাথুরে রাস্তায় খানিকটা নেমে আসার পর গর্ডন দেখতে পেলেন কুকুরটাকে। ও যেখানে থেমেছে তার পাশেই মাটিতে পড়ে আছে একটা মাউন্টেন বুট। ভুরু কুঁচকে উঠল গর্ডনের। অ্যাপারচার কমিয়ে জুম লেন্সে বিভিন্ন দূরত্বে শট নিলেন বেশ কয়েকটা। হাইকিং স্টিকের সাহায্যে লম্বা লম্বা পা ফেলে পৌঁছে গেলেন সামনে।

কাত হয়ে পড়ে থাকা জুতোটার চারপাশে চাপ চাপ রক্তের দাগ। দেখে মনে হয় তাড়াহুড়োতে খুলে ফেলে দিয়েছে জুতোর মালিক। কোনওভাবে ব্যালেন্স ফেল করে নীচে গড়িয়ে পড়ে সংজ্ঞা হারিয়েছে সম্ভবত। বুটটা হাতে নিয়ে ভালোভাবে দেখলেন গর্ডনসাহেব। জুতোর ওপরের দিকটা ড্যামেজড, নাকের কাছে ধরতেই গান পাউডারের হাল্কা গন্ধ পেলেন গর্ডন।

ঢাল বরাবর আরও খানিকটা নেমে এলেন তিনি। ঠিক তখনই চোখে পড়ল ব্যাপারটা।

অদূরে পিন উপত্যকার ধূসর পথ এগিয়ে গেছে স্পিতির দিকে। তার ঠিক ওপরেই বরফের মুকুট পরা পাহাড়চুড়ো এবং গাঢ় নীল আকাশ মিলেমিশে কেমন অদ্ভুত সুন্দর ক্যানভাসের জন্ম দেয়, চোখের সামনে দেখলেন গর্ডন। বয়ে চলা হাওয়ার শব্দ এবং জনমানবহীন শূন্যতা সেখানে জুড়েছে স্বর্গীয় আবহ। এসবের মাঝে একটা ঢাল বরাবর চিত হয়ে পড়ে থাকা দেহটা এক বড়সড় ব্যতিক্রম, নিয়মের মাঝে হঠাৎ ঢুকে পড়া অনিয়ম।

হাইকিং স্টিকটাকে অবলম্বন করে কোনওরকমে পড়ে থাকা মানুষটার কাছে এলেন গর্ডন। ঢালের দিকে ঝুলে থাকায় তার মাথাটা দেখা যাচ্ছে না, পা দুটো ধরে আস্তে আস্তে টেনে আনলেন নিজের দিকে। গায়ে সি গ্রিন এবং বেগনি রঙ মেশান মোটাসোটা জ্যাকেট, কালো রঙের ডেনিম ট্রাউজার। এক পায়ে মোজা পরা, তাতে রক্তের দাগ, অন্য পায়ের জুতোটা অক্ষত আছে। লোকটার খোলা জ্যাকেটের ফাঁক দিয়ে একটা নস্যি রঙের খুদে স্লিং ব্যাগ চোখে পড়ছে যেটা সম্ভবত কাঁধে ক্রস করে লাগানো, পিঠের রাকস্যাকটা একদিকের কাঁধে আলগাভাবে লাগা অবস্থায় গড়াগড়ি দিচ্ছে জমিতে। রক্তের দাগ লাগা মোজাটা খুলে দেখলেন গর্ডনসাহেব, লোকটার গোড়ালির খানিক ওপরে বেশ খানিকটা কাটা দাগ, কারোর গা ঘেঁষে গুলি বেরিয়ে গেলে এমন দাগ থাকার কথা। এর মানে লোকটা গুলিবিদ্ধ নয়। সম্ভবত মোটা মাউন্টেন বুটটার জন্য বেঁচে গেছে।

সাবধানে লোকটাকে একেবারে কাছে টেনে নিলেন গর্ডন। লোকটার মুখটা দেখা গেল এবার। মাথায় উলের টুপি, নাক-মুখ-কপালে ছড়ে যাওয়ার দাগ, চোখের নীচে কালশিটে, গায়ের রঙ মাঝারি। মোটা গোঁফ, খোঁচাখোঁচা দাড়ি মুখটা দেখে লোকটার বয়েস বছর চল্লিশেক মনে হয়। গলার পাশে জাগুলার ভেইনে হাত রেখে ক্ষীণ পালস পেলেন গর্ডন, তবে লোকটার অবস্থা যে বেশ সিরিয়াস তাতে সন্দেহ নেই, অন্তত বারো চোদ্দো ঘণ্টা সে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছে বলেই মনে হয়।

ওর ঝুলে থাকা ঘাড় দেখে কেমন যেন সন্দেহ হল গর্ডনের। হাত দিয়ে ঘাড়ের নীচে সার্ভিকাল অংশটা অনুভব করতেই বুঝলেন সেখানে ফ্র্যাকচার রয়েছে। ফ্র্যাকচারটা সম্ভবত মেরুদণ্ডের C1 এবং C2 ভার্টিব্রা জুড়ে, যারা অ্যাটলাস এবং অ্যাক্সিস নামে পরিচিত। লোকটার মাথার পশমের টুপিটা সরিয়ে দিতেই একটা ব্লান্ট ইনজুরির দাগ চোখে পড়ল। খুলির ক্রেনিয়ামে আঘাত লেগেছে, সামান্য ড্যামেজ হলেও হতে পারে। লোকটা সম্ভবত তাতেই সংজ্ঞা হারিয়েছে। পড়ে যাওয়ার সময় নির্ঘাত জোরদার ধাক্কা খেয়েছে কোনও পাথরে। অথবা ভোঁতা কিছু দিয়ে কেউ আঘাত করেছে তাকে।

লোকটার পরিচয় পাওয়া দরকার। ওর জ্যাকেট রাকস্যাক ও জামা-প্যান্ট হাতড়ে পাওয়া গেল না কিছু। ওর কাঁধ থেকে স্লিং ব্যাগটা খুলে আনলেন গর্ডন। সেখানে বেশ কিছু কাগজপত্রের মাঝে একটা রাজধানী এক্সপ্রেসের ই-টিকিটের প্রিন্টআউট পাওয়া গেল। দশ দিন আগের ডেট। পি সিং, বয়েস ৪১। মেল। এছাড়া গাদাগুচ্ছের বিল এবং অন্যান্য কিছু কাগজ। এছাড়াও ব্যাগটায় কিছু আছে বলে মনে হল গর্ডনের। হাত দিয়ে মনে হল নোটবুক জাতীয় কিছু যেটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। বেশ কিছুটা হাতড়াবার পর একটা চামড়ার পার্টিশন অনুভব করলেন গর্ডন। তার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে পাওয়া গেল একটা চেন, তারও ভেতরে হাত ঢোকাতে বেরিয়ে এল চামড়ার

একটা পকেট ডায়েরি। জিনিসটা বেশ দামি দেখে বোঝা যায়। সেই সঙ্গে একটা খুদে স্টাইলিস লাইটার যার গায়ে গৌতম বুদ্ধের ছবি প্রিন্ট করা আছে। এবার তাঁর চোখ পড়ল কুকুরটার দিকে। এক নজরে তাঁর দিকে করুণভাবে চেয়ে রয়েছে বেচারা। ওর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে গর্ডন বুঝলেন, লোকটা ওর মালিক না হলেও বেশ কাছের।

চটপট স্লিং ব্যাগটা নিজের কাঁধে ঝুলিয়ে লোকটাকে টেনে নিয়ে এলেন খানিক ওপরে। পিঠের রাকস্যাকটা ঠিকমতো অ্যাডজাস্ট করে এককাঁধে ঝুলিয়ে নিলেন লোকটাকে। লোকটার ওজন প্রায় সত্তর কিলো, তবে গর্ডনের কম্ব্যাট ট্রেনিং থাকায় সমস্যা হল না তেমন। গর্ডন চলতে শুরু করলে কুকুরটা কুঁইকুঁই শব্দ করল একবার। ওখানেই বসে রইল চুপচাপ।

'কাম!' গর্ডন আওয়াজ দেওয়ায় সারমেয় ঘাড় কাত করল একবার। এরপর দৌড়ে পড়ে থাকা রাকস্যাকটা মুখে নিয়ে খোঁজার চেষ্টা করল কিছু। এরপর দৌড়ে চলে গেল অন্যদিকে।

কিছুটা এগোনোর পরই দুভাগে ভাগ হয়ে গেল রাস্তাটা। জার্মান শেফার্ড সোজা তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। কুকুরটা ওঁকে ইশারা করছে ওর পেছন পেছন আসার জন্য।

এখন দৈবই ভরসা, তাই ওকে ফলো করাই মনস্থির করলেন গর্ডনসাহেব। একটা কাঁধ ধরে গিয়েছিল, সাইড চেঞ্জ করে লোকটাকে নিলেন অন্য কাঁধে। পেছন পেছন কিছুটা যেতেই চোখে পড়ল পিন নদীর একটা সূক্ষ্ম ধারা। নদীর ওপর একটা নড়বড়ে দড়ির ব্রিজ, কুকুরটা ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে সেদিকেই। মনের জোরে কাঁধের ভারসহ ব্রিজের ওপর এসে পড়লেন গর্ডন। এই সময় চোখে পড়ল ব্রিজের উলটো দিক থেকে আসছে জনাতিনেক লোক, সঙ্গে পাহাড়ি ছাগল ভেড়ার পাল।

ওদের হাত নেড়ে থামতে ইশারা করলেন গর্ডন। কাছাকাছি পৌঁছতেই ওদের দুজন এগিয়ে এল গর্ডনের দিকে।

'কয়ি দিক্কত হ্যায় সারজি?' গর্ডনের একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল ওদের একজন। পাহাড়ি মেষপালক।

'এ লোকটার ঘাড়ে মাথায় খুব খারাপ চোট। হাড়ও ভেঙেছে। একে সেফ জায়গায় পৌঁছে দিতে একটু সাহায্য করবে আমায়? তোমরা সাহায্য না করলে আমার পক্ষে কাজটা অনেক কঠিন হবে।'

গর্ডনের কথায় কাজ হল ম্যাজিকের মতো। ওদের দুজন ঘায়েল লোকটাকে গর্ডনের কাঁধ থেকে নামিয়ে বয়ে নিয়ে চলল ব্রিজের ওপারে।

একজন পাহাড়ি হিন্দিতে বলল, 'সারজি, হাসপাতাল তো এখানে পাওয়া ঝামেলা। এখানে কিছুক্ষণ আগে টুরিস্টদের একটা গাড়ি দেখেছিলাম, ওর ড্রাইভার আমার চেনা। একটু এগোলেই মোবাইল টাওয়ার চলে আসবে, আমি ওকে কল করে ধাবায় অপেক্ষা করতে বলব। আপনি খচ্চরের পিঠে চড়তে পারবেন?'

'খচ্চর?'

'হাঁ সাব। এখানে গাড়ি ছাড়া আমাদের যাতায়াতের ওই একটাই মাধ্যম। আপনাকে আমরা ধাবাটায় নিয়ে যাব, ওখানে টুরিস্টদের গাড়ি থাকবে। চারটে গাধা আর তিনটে খচ্চর আমাদের সঙ্গে আছে। আপনি একটায়, এই বেহোশ সাহাব একটায়, আর অন্যটায় আমি, ঠিকমতো চললে একঘণ্টায় পৌঁছে যাব।'

কুকুরের দিকে তাকালেন গর্ডন। ও সন্দিহান ভাবে চেয়ে আছে ওঁর দিকে। ওর মুখে ধাতব কিছু ধরা আছে। গর্ডন হাত বাড়াতে এগিয়ে এসে পায়ের কাছে জিনিসটা রাখল জার্মান শেফার্ড। জিনিসটা হাতে তুলে গর্ডন দেখলেন, ওটা কুকুরের নেম ট্যাগ, যাতে ইংরিজিতে লেখা জিপসি।

সামান্য হাসলেন গর্ডন। 'চলুন আপনার খচ্চরের পিঠে চড়া যাক। যদি কিছু মনে না করেন, সবচেয়ে বেশি মাল বইতে পারে, সেই খচ্চরটার ওপর আমি বসতে চাই। দরকারে জিপসিকে তুলে নেওয়া যাবে। ভয় নেই, আমার ঘোড়া চড়ার প্রফেসনাল ট্রেনিং নেওয়া আছে। সামলে নেব।'

'আইয়ে সাব।' তিন নম্বর লোকটা ততক্ষণে দুটো খচ্চরকে নিয়ে চলে এসেছে।

'জিপসি—' গর্ডন জোরে ডাকতেই বুক চিতিয়ে ওঁর সামনে এসে দাঁড়াল জার্মান শেফার্ড।

ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন তিনি। খচ্চরের দিকে ইশারা করে বললেন, 'এবার এগোনো যাক বুঝলি। তোর ভালোবাসার মানুষকে বাঁচাবার চেষ্টা আমি করবই। সেইসঙ্গে যে বা যারা তার এই অবস্থার জন্য দায়ী, তাদের ঠিক খুঁজে বের করব। দ্যাটস মাই প্রমিস।'

খচ্চরের পিঠে বসে ক্রমশ স্পিতির দিকে এগিয়ে চললেন গর্ডনরা।

হিমাচলের অন্য প্রান্তে ছিমছাম পাহাড়ি জনপদ কল্পায় এক হোটেলের রুমে তখন কিন্নর কৈলাস পাহাড়ের দিকে চেয়ে চুপচাপ বসেছিল একজন। একটা লিস্টে চোখ বোলাচ্ছিল মাঝে মাঝে। পাশে খাটে রাখা একটা লম্বা বাক্স, যার ভেতর ভাঁজ করা অবস্থায় ঘুমোচ্ছে তার প্রিয় স্নাইপার রাইফেলটা।

স্পিতির কাজটা নির্বিঘ্নে সমাধা হয়েছে বলেই ধরে নেওয়া যায়। বেঙ্গালুরু ফেরার আগে এক্সট্রা কাজ সারতে হবে একটা। হিমাচল পুলিশের এক বড়সড় অফিসার সাংলা হয়ে সিমলার দিকে যাবেন কাল। পাহাড়ি রাস্তার বাঁকেই তাঁকে নিকেশ করতে হবে, কাজটা এমনভাবে করতে হবে যেন দুর্ঘটনা বলে মনে হয়। চাকায় একটা অব্যর্থ শট, ব্যালেন্স হারিয়ে গাড়ি সোজা খাদের ভেতর। নিখুঁত প্ল্যানের কথাটা ভেবে মনে মনে হেসে উঠল সে।

২। কাজার পথে কিরামি মঠ, সন্ধে ৬টা

টেন্টে আধশোয়া অবস্থায় সকালে পাওয়া ডায়েরিটা উল্টেপাল্টে দেখছিলেন গর্ডন। কালো মলাটের ছোট ডায়েরি, যার পাতায় পাতায় টুকরো টুকরো কথা এবং হিসেব লেখা।

একটা জায়গায় এসে থামলেন গর্ডন। একটা গোলের ওপর কতগুলো ইংরিজি অক্ষর। লেখা রয়েছে। দেখে মনে হয় মানুষের নামের আদ্যক্ষর।

'একটু বিশ্রাম হল?' মোলায়েম গলাটা শুনে মুখ তুলে তাকালেন গর্ডন। নীল টেন্টের দরজাটা ফাঁক করে যে লাল হলুদ পোশাকের সৌম্যকান্তি ভদ্রলোক ঝুঁকে দাঁড়িয়ে, তিনি একজন বৃদ্ধ লামা।

'আমি লামা গুয়াতোং', টেন্টের ভেতর বসে বললেন ভদ্রলোক। 'এখানকার অ্যাডমিন বলতে পারেন। আপনাকে আমার খুব ভালো লেগেছে। এমন মনের জোর সচরাচর চোখে পড়ে না।'

'আমাদের মহাগুরু বলেন, জগতকে খুশি রাখতে হলে যেটা দরকার সেটা হল কমপ্যাশন অর্থাৎ সহানুভূতি। আপনার মধ্যে সেটা ভরপুর আছে। কাজেই আপনি এখানে সবসময় স্বাগত। এই খাবারটা খেয়ে নিন। আপনাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে, বেশ ধকল গেছে।'

সামান্য হাসলেন গর্ডন। ভদ্রলোকের হাতের বাটিতে একনজর দেখে বললেন, 'থুকপা মনে হচ্ছে?'

'ঠিকই ধরেছেন। এই মুহূর্তে আর কিছু নেই। রাতে বার্লির খিচুড়ি বানাতে বলব।'

'সো নাইস অফ ইউ। লোকটিকে কেমন দেখলেন?'

'বেশি দেরি হলে মারা যেত নিশ্চিত। এখনও বেশ ক্রিটিকাল।'

'বাঁচবে বলে মনে হয়?'

'আমাদের এই মনাস্টারিতে অনেক মিরাকল হয় বোসসাহেব। এই লোকটিকে এখানে রেখে যান, বেঁচে যাবেন, এটুকু গ্যারান্টি দিতে পারি। জাগতিক বোধের উর্ধ্বে এমন অনেক কিছু হয়, যা আপনার বিজ্ঞান ধারণা করতে পারবে না।'

'বুঝলাম। উনি এখন কোথায়?'

'ভেতরের গুম্ফায় শুয়ে আছেন। এখনও অচেতন। গোপন কক্ষে ওঁর জন্য

বিশেষ প্রার্থনা করছেন আমাদের মঠের মহাভিক্ষু।'

'ওঁর ওপর সম্ভবত হামলা হয়েছিল। সেফটির জন্য এখানে আন্ডারগ্রাউন্ড থাকাই ভালো। আচ্ছা, ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, এই গোপন কক্ষের ব্যাপারটা কী?'

'ওয়েল, স্বয়ং মহাকাল সেখানে অবস্থান করেন। আপনি হয়তো জানেন না, একশো বছর আগে এই মঠ সরিয়ে ফেলা হয়েছিল হিম্মার পাহাড়ে। মহাকালের মূর্তি কিন্তু একচুলও সরানো যায়নি। এক রাতে নতুন মঠ হঠাৎই ভেঙে পড়ে ভূমিকম্পে। তখন আবার পুরোনো জায়গায় এই মঠের পুনর্নির্মাণ হয়। এই যে মঠ দেখছেন, এটা সেই নবনির্মিত ক্যাম্পাস। মহাকাল যখন মহাগুরুকে ইঙ্গিত করেছেন, ইনি ঠিক বেঁচে যাবেন। কাল সকালে মহাগুরু তান্ত্রিক উপাচারে বসবেন।'

'বুঝলাম। আপনারা বোধহয় বজ্রযান মতের উপাসক, তাই না?'

'হ্যাঁ, তন্ত্রের ব্যাপারটা বৌদ্ধধর্মের অন্য মতবাদগুলোয় আপনি পাবেন না।'

'রাইট, একটু আগে যে কমপ্যাশনের কথা আপনি বললেন, সেটা তো বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের বিশেষ গুণ।'

শুনে হাসলেন ভিক্ষু। হাত নেড়ে বললেন, 'আপনার অনেক বিষয়ে পড়াশোনা আছে দেখছি। এবার খেয়ে নিন। আমি বরং যে টুরিস্ট ভদ্রলোকের গাড়িতে আপনি এলেন, তাঁকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

ভদ্রলোক বেরিয়ে যাওয়ার মিনিট সাতেকের মধ্যেই যিনি এসে ঢুকলেন তিনি যে বাঙালি দেখলেই বোঝা যায়। বছর তিরিশেক বয়েস, চোখে চশমা, ছিপছিপে লম্বা চেহারা। হাতে একটা লম্বা স্টিক, যার গোড়ায় লাগান খুদে গোপ্রো ক্যামেরা।

'নমস্তে, ম্যায় দেবরাজ, তখন ধাবায় ভালো করে আলাপটা হল না। আপনি গর্ডন বোস তো?' ধপ করে টেন্টের মেঝেয় বসে পড়লেন ভদ্রলোক।

'হুম।'

'যাক, আপনি বাংলা বলতে পারেন কিনা, এইটে নিয়েই সন্দেহ ছিল। আমি একজন ইউটিউবার, আমার ট্রাভেল রিলেটেড একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে। দ্য ইন্ডিয়ান নোমাড। প্রায় সাড়ে সাত লাখ সাবস্ক্রাইবার।'

'দ্যাটস গ্রেট।'

'গ্রেট তখনই, যখন আপনি আমার চ্যানেলের জন্য একটা ইন্টারভিউ দেবেন।'

'ইন্টারভিউ?'

'হ্যাঁ, পিন ভাবা পাস ট্রেকের অভিজ্ঞতা নিয়ে। আপনি বিখ্যাত লোক মশাই, আপনার ভিডিও আমার চ্যানেলে থাকলে খুব ভালো লাগবে। ট্রেকের সঙ্গী আবার আপনার পেট ডগ, ব্যাপারই আলাদা!'

'আপনি আমায় আগে দেখেছেন নাকি?'

'আপনার ছবি দেখেছি। কাগজে।'

দেবরাজ সেলফি স্টিকটা বাড়িয়ে ক্যামেরাটা ধরল গর্ডনের সামনে। সামান্য হেসে বলল, 'ট্রেক নিয়ে চট করে টেন্টের বাইরে একটু বাইট নিয়ে নিই? মিনিট দশেকের বেশি লাগবে না।'

এই সময় তাঁবুর দরজাটা ফাঁক করে মুখ বাড়াল জিপসি।

ওকে সঙ্গে নিয়ে টেন্টের বাইরে ইন্টারভিউ স্টাইলে গর্ডনের ভিডিও শুট করে নিল দেবরাজ।

কী একটা মনে পড়তে বলল, 'একটা কথা তো আপনাকে বলতেই ভুলে গেছি বোসসাহেব। যে ইনজিওরড ভদ্রলোককে আপনি এখানে নিয়ে এলেন, আমি কিন্তু তাকে পাহাড়ি রাস্তায় দেখেছি। গাড়ি থামিয়ে একটা জায়গায় আমি ভিডিও শুট করছিলাম, ভদ্রলোক দৌড়তে গিয়ে ধাক্কা খেয়েছিলেন আমার গায়ে। দেখে মনে হল, কিছু দেখে ভয় পেয়ে পালাচ্ছেন। আমার ভিডিওতে ওনার ফুটেজ আছে।'

'বলেন কী? সেটা দেখা যায়?'

'আপনার ফোনে সেই অংশটা আমি ট্রান্সফার করে দিচ্ছি। তা আপনি কাল সকালে ফিরবেন তো?'

'হ্যাঁ, আমার গাড়িটাকে এখানে আসতে বলে দিয়েছি, ওতেই বেরিয়ে পড়ব। আপনার কাছে একটা রিকোয়েস্ট ছিল দেবরাজ।'

'হ্যাঁ, বলুন না।'

'এই ভদ্রলোকের কথা আপনার কোনও ভিডিওতে উল্লেখ করবেন না প্লিস। তাতে ওনার সেফটি কমপ্রোমাইজড হতে পারে।'

'নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন। আমার ভিডিওতে শুধুই ভ্রমণ থাকে, নাথিং এলস।'

দেবরাজ বেরিয়ে যাওয়ার পর জিপসির মাথাটা নিজের কোলে রেখে মোবাইলে সদ্য ট্রান্সফার হওয়া ভিডিওটা দেখতে শুরু করলেন গর্ডন।

কিছুক্ষণ পর ভুরুটা কুঁচকে উঠল তাঁর। বিড়বিড় করে বললেন, 'কিলার লাভস কথাকলি!'

৩। হোরামাভু, বেঙ্গালুরু, দু'সপ্তাহ আগে...

হাতের কুকুরটাকে নিয়ে কোনওরকমে আন্ডার কনস্ট্রাকশন একটা অ্যাপার্টমেন্ট সাইটের চারতলার এক ফ্ল্যাটের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল শ্রীনিবাস।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওর প্রায় কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট।

রুদ্ধশ্বাসে একেবারে সাততলায় উঠে এল শ্রীনিবাস। হাঁপাতে হাঁপাতে একটা বড়সড় কংক্রিট স্ল্যাবের ঢিবির পেছনে বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে। চ্যাটে কিছু পাঠিয়ে ঝড়ের বেগে ডায়াল করল একটা নম্বর। বারতিনেক রিং হতেই ওপ্রান্ত থেকে শোনা গেল এক মহিলার গলা।

'হ্যালো শ্রীনিবাস, বলো।'

'সানভি, আমার হাতে সময় একদম নেই। এই মুহূর্তে বেশ কিছু বিস্ফোরক প্রমাণ আমার হাতে আছে। আমি চাই এই কেসটা আমার পর তুমি টেক আপ করো। একটা লোকেশন পাঠিয়েছি, ওখানে...'

ওর কথা শেষ হল না, পেছনে শোনা গেল পায়ের মৃদু শব্দ। ভয়ে ভয়ে মুখটা ফেরাল সে। মুখে মাস্ক পরা একটা বলশালী চেহারার লোক ক্রূর দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওর দিকে।

বন্দুকের ইশারায় শ্রীনিবাসকে এনে ফেলল সাততলার ফ্লোরের নেড়া ধারটায়।

'প্লিস ডোন্ট কিল মি!' হাতজোড় করে বলল শ্রীনিবাস আইয়ার, ভারত টাইমসের তরুণ ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্ট।

কিছু বোঝার আগেই পকেট থেকে ওর ফোনটা বের করে নিয়ে বুকে জোরদার ধাক্কা দিল লোকটা। হাওয়ায় ভেসে সোজা নীচের দিকে পড়তে শুরু করল শ্রীনিবাস।

ওর দেহ মাটি ছোঁবার আগেই ফোনের চালু কলটা তুলে নিল আততায়ী।

'হ্যালো, হ্যালো শ্রীনিবাস... আর ইউ দেয়ার?'

'হি ডায়েড' কুকুরটাকে তুলে ধরে ফ্যাসফ্যাসে গলায় উত্তর দিল আততায়ী, 'জাস্ট নাউ।'

৪। ১০ সেপ্টেম্বর, হারালুর লেক, বেঙ্গালুরু

আজ জিপসিকে নিয়ে সকাল সকাল মর্নিং ওয়াকে এসেছেন গর্ডনসাহেব। স্টেলাও ট্র্যাকসুট পরে সোজা চলে এসেছে এখানেই। অনেকদিন পর গর্ডনকে কাছে পেয়ে খুব খুশি ও।

'আঙ্কেল, তোমার ট্রেকের ভিডিওটা দেখলাম। এককথায় অসাম!'

'ভিডিও?'

'কেন, দ্য ইন্ডিয়ান নোমাড চ্যানেলে যেটা গত রাতে এসেছে!'

'ওহ, তাই নাকি! লিংকটা শেয়ার কর তো।'

'হিমাচলে তুমি থাকাকালীন একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, খবর পেয়েছ?'

'না তো, কোন ঘটনা?'

'ওই যে, হিমাচল পুলিশের ডিএসপি ভগবান প্রসাদের গাড়ি নাকি পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে খাদে।'

'আই সি...'

এই সময় লেকের গেটের দিকে নজর গেল গর্ডনের। দুজন লোক ওঁদের ফলো করে বেশ খানিকটা এগিয়ে এসেছে।

চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল গর্ডনের। জিপসির লিশটা স্টেলার হাতে চালান করে হনহনিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন উলটোদিকে। লোকদুটো ওঁকে দেখেই প্রায় দৌড়ে ঝটপট বেরিয়ে পড়ল লেকের গেট পেরিয়ে। একটা বাইকে চড়ে নিমেষে চলে গেল চোখের আড়ালে।

'এরা কারা আঙ্কেল? আমাদের ওপর নজর রাখছিল নাকি?' গর্ডনের কাছে এসে বলল স্টেলা।

'নিঃসন্দেহে।' জিপসির লিশটা নিজের হাতে নিয়ে বললেন গর্ডন, 'কিন্তু কেন, সেটা খুঁজে না বের করা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই। সাবধানে থাকতে হবে আমাদের।'

৫। ১২ সেপ্টেম্বর, বেঙ্গালুরু ইন্টারন্যাশনাল এক্সিবিশন সেন্টার, ইন্ডিয়া আনলিমিটেড সায়েন্স সামিট, প্রেস কর্ণার

'আপনি নিউরোমার্কেটিং নিয়ে কাজ করছেন, তাই না?'

প্রশ্নটা শুনে চমকে উঠলেন গর্ডন। জার্নালিস্টের মুখটা চোখে পড়তেই হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে।

মাইকটা মুখের কাছে নিয়ে বললেন, 'আপনার হোমওয়ার্কের প্রশংসা করতে হয়। হ্যাঁ, আমার নতুন কাজ নিউরোমার্কেটিংকে ঘিরেই। কোনও জিনিস কেনবার সময় আমরা কীভাবে ডিসিশন নিই সেটা বুঝে ফেললেই ব্যাপারটা সহজে বোঝা যাবে। ধরে নেওয়া যাক, আপনি কোনও বুকস্টোরে বই কিনতে গেছেন। গিয়ে দেখলেন আপনার প্রিয় বেস্টসেলিং লেখকের নতুন থ্রিলার বেরিয়েছে। এখানে কেনার ডিসিশনটা দুভাবে হতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যেটা হবে, আপনি লেখকের নাম দেখেই বইটা কিনে ফেলবেন। কিন্তু যদি দেখা যায়, লেখক এখানে ভিন্ন পথে হেঁটেছেন, আপনি হয়তো বইটা নিলেন না।

'প্রথম ক্ষেত্রে আপনার নন কনশাস বা ডুয়িং মাইন্ডই সিদ্ধান্তটা নিয়ে নিল এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নিল আপনার কনশাস বা থিংকিং মাইন্ড। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই নন কনশাস মাইন্ড আসল খেলাটা খেলে আমাদের মগজে, তাই একজন মার্কেটার হিসেবে আপনার উদ্দেশ্য হবে সেই নন কনশাস মাইন্ডকে প্রভাবিত করা।

'এই প্রসঙ্গে আলফা-বিটা হাইব্রিড ওয়েভের একটা থিওরি এনেছি আমি। এই নন কনশাস থিংকিং মাইন্ডের হঠাৎ ডিসিশন নেওয়ার মুহূর্তেই এই বিশেষ হাইব্রিড ওয়েভটার জন্ম হয়। মানুষের যত রকম ব্রেইন ওয়েভ আছে, তার মধ্যে গামার পর আসে বিটা যা মোটামুটি ব্যস্ত বা সক্রিয় একটা মেন্টাল স্টেটকে বোঝায়। এরও পরে আলফা যা ইন্ডিকেট করে বেশ রিল্যাক্সড একটা মেজাজ। আরও এগিয়ে থিটা ওয়েভ বোঝায় বেশি রিল্যাক্সড, ঝিমুনি ভাব এসে পড়া।

'যে হাইব্রিড ওয়েভটার কথা আমি বললাম, সেটা যদি কোনও বাহ্যিক কারণে বেশি জেনারেট করিয়ে দেওয়া যায়, পারচেজ ডিসিশন নন কনশাস মাইন্ডের সিদ্ধান্তকে ইনফ্লুয়েন্স করবে, অর্থাৎ ওই বিষয়ে পরোক্ষে যে পুরোনো ধারণা আমাদের মনে আছে, জিনিস কেনার সময় ধীরে ধীরে সেটার বদল হয়ে নতুনটাই সত্যি হয়ে উঠবে।'

'ব্রাভো। আপনি কি এর জন্য কোনও গ্যাজেট আনছেন?' সামনে দাঁড়ানো মেয়েটি বলল।

'সরি, প্রফেসনাল সিক্রেসির কারণে এর বেশি কিছু বলা যাবে না। এখন কিছু কোম্পানির সঙ্গে পাইলট প্রজেক্টে কাজ করব আমি। তবে যে-কোনও রিসার্চের অর্থই হল ট্রাই অ্যান্ড ট্রাই এগেইন, ভাবাটা থামিয়ে দেওয়া চলবে না।'

করতালির পর মিডিয়া সেশন শেষ হল কিছুক্ষণেই। হল থেকে বেরিয়ে একটু আগে নিউরোমার্কেটিং নিয়ে প্রশ্ন করা সুন্দরী মহিলা সাংবাদিককে দেখতে পেলেন গর্ডন। ইশারায় কাছে ডাকলেন তাঁকে।

'কেমন আছেন স্যার?'

'খুব ভালো। কিন্তু সানভি ধরের মতো দুঁদে ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্ট এখানে কী করছে?'

'ওয়েল, আপনার সেশনটা কভার করার লোভ সামলাতে পারিনি। এছাড়া একটা ব্যাপারে কথা ছিল। ব্যাপারটা সেন্সিটিভ।'

'একসঙ্গেই ফেরা যাক তাহলে। তুমি গাড়ি আনোনি তো?'

'উঁহু।'

'গুড। আমার গাড়িতে চলো।'

দুজনে পার্কিং-এর দিকে এগোচ্ছেন, এই সময় ওঁদের সামনে এসে দাঁড়াল একটা মার্সিডিজ গাড়ি। পেছনের কাচটা নামিয়ে বছর চল্লিশের যে ভদ্রলোক মুখ বাড়ালেন, তাঁকে সপ্তাহদুয়েক আগেই বিজনেস টুরের কভারে দেখেছেন গর্ডন।

সমর শেট্টি, বিখ্যাত রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার ধ্রুব শেট্টির ছেলে। পনের জন ইয়ং প্রমিসিং আন্ত্রেপ্রেনরের মধ্যে এঁরও ছবি ছিল। ভারতের কৃষিযোগ্য জমির খতিয়ান করতে ও ফলন বাড়াতে একটা চমৎকার সলিউশন বানিয়েছে এঁর কোম্পানি। অ্যাগ্রিটেক সলিউশনস।

সামনের সিটে বসা অন্য এক ভদ্রলোক নেমে এলেন। সম্ভবত সমরের সেক্রেটারি।

'হ্যালো মিস্টার গর্ডন। আপনার মিনিটদুয়েক সময় পাওয়া যাবে?'

'হ্যাঁ নিশ্চয়ই, বলুন কী ব্যাপার?'

'এখানে নয়, আপনার নম্বরটা পেলে ফোনে বলতে পারি। সমর স্যার পার্সোনালি কথা বলতে চান।'

ভিজিটিং কার্ড এগিয়ে দিলেন গর্ডন। মার্সিডিজটা বেরিয়ে যেতেই সানভিকে নিয়ে এগোলেন নিজের গাড়ির দিকে।

তিনি দেখলেন না, তাঁদের পেছন পেছন পার্কিং লটে ঢুকে পড়ল মাস্ক পরা একজন লোক। হাতে বাইকের চাবি। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্তও বাইনোকুলারে ওঁদের ওপর নজর রাখছিল সে।

৬। গর্ডনের গাড়িতে...

'কেমন আছ সানভি? অনেকদিন পর দেখা...' গাড়ি চালাতে চালাতে বললেন গর্ডন।

'হুম, মিশন আজাদ কে-এর পর...' মোবাইলে একটা ছবি বের করে গর্ডনকে দেখাল সানভি, 'চেনেন ছবির ভদ্রলোককে?'

মোবাইলের ছবিটা একঝলক দেখলেন গর্ডন। মাথা নেড়ে বললেন, 'ইনি তো "লেটস কফি"-র কর্ণধার ছিলেন। তথাগত রাও। অনলাইন দেখলাম, কয়েকদিন আগেই সুইসাইড করেছেন। সম্ভবত ডিপ্রেশন থেকে।'

'সেটা এখনই বলা যাচ্ছে না। এবার একটা কথা বলুন তো। ট্রাভেল চ্যানেলে আপনার ইন্টারভিউটা চোখে পড়েছে আমার। যে কুকুরটাকে নিয়ে আপনি ট্রেকিং করছিলেন, সেটা কি আপনার?'

'কেন বলো তো!'

'আপনাকে আরেকটা ছবি দেখাই। তথাগত রাও যেদিন সুইসাইড করেছিলেন, তার ঠিক তিনদিন আগেই তোলা।'

লং কোট জার্মান শেফার্ডের ছবিটা দেখলেন গর্ডন। তার পাশে দাড়িওয়ালা

একজন স্বাস্থ্যবান চেহারার লোক।

'ভদ্রলোক নিজের কফি এস্টেটের দিকে গাড়ি করে যাচ্ছিলেন সেদিন। গাড়িটা পার্ক করা ছিল ব্রিজ থেকে খানিকটা দূরে। ওঁর সঙ্গে গাড়িতে ড্রাইভার এবং আদরের কুকুর জিপসিও ছিল।'

'জিপসি?'

'হুম, ওঁর জার্মান শেফার্ড। ওর নামও জিপসি ছিল, আপনার কুকুরের মতোই।'

'আই সি। আমার কুকুর কিন্তু শর্ট কোট, লং নয়।'

আর কিছু বললেন না গর্ডন, ভুরু কুঁচকে উঠেছে তাঁর।

'আসলে তথাগতর মৃত্যুটা নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি।' বলে চলল সানভি, 'আমার হাতে কিছু প্রমাণ এসেছে, যাতে স্পষ্ট, ভদ্রলোক কোম্পানির ফান্ডের একটা বড় অংশ বেশ কিছু জায়গায় ট্রান্সফার করেছিলেন। মৃত্যুর আগে উনি শুধু একটা নোটে নিজের কাজের জন্য এমপ্লয়িদের থেকে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন এবং ব্যাপারটার প্রায়শ্চিত্ত করবেন বলেছেন। সেখানে উনি সুইসাইডের কথা কিন্তু বলেননি। আমার ধারণা, ভদ্রলোক আত্মহত্যা করলেও এর পেছনে অন্য কেউ রয়েছে। রিলায়েবল সোর্সে জেনেছি, উনি একটা সিক্রেট ডায়েরি মেইনটেইন করতেন। সেটা হাতে পেলে কিছু ব্যাপার জানা যেত বোধহয়। আমি আপনাকে একটা অন্য ব্যাপার জানাতে চাই।'

'বলো।' গর্ডনের মুখ বেশ গম্ভীর।

রহস্যজনকভাবে মৃত কলিগ শ্রীনিবাসের কথা বলে সানভি। জানায়, ওর দেহটা নাকি পড়েছিল একটা আন্ডার কনস্ট্রাকশন বহুতলের ব্যাকসাইডে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে রুটিনমাফিক কাজকর্ম সেরে চুপচাপ চলে আসে। কোনোরকম ইনভেস্টিগেশনের ধারকাছ মাড়ায়নি।

'স্ট্রেঞ্জ! ইনভেস্টিগেট করলে তোমাকেই আগে প্রশ্ন করবার কথা কারণ ভিকটিমের সঙ্গে শেষ কথা তোমারই হয়েছিল। সেটা তো কল রেকর্ডিং-এ পাওয়া যাবে।'

'না, ও আমাকে ডেটা কল করেছিল। কিন্তু সেই অ্যাপের সার্ভারে ওই কলের কোনও ডিটেল পাওয়া যায়নি। ওর ফোনটা অবশ্য নিখোঁজ, তবে আমি সিক্রেট কল রেকর্ডারের সাহায্যে কলের কিছুটা রেকর্ড করেছিলাম। এ ব্যাপারে পুলিশকে কিছু জানাইনি। নিজেই ব্যাপারটা ইনভেস্টিগেট করছি।'

'আই সি, কিন্তু তোমাকে এত টেনসড দেখাচ্ছে কেন? তাছাড়া যে লোকেশনটা ও তোমাকে পাঠিয়েছিল, সেটা কই?'

'সেটা চ্যাট হিস্ট্রি থেকে ডিলিট করে ফেলা হয়েছে। কিন্তু আমি লোকেশনটা এক ঝলক দেখেছিলাম, মাথায় ছিল। ওখানে আমি ঘুরে এসেছি, কিছু পাইনি। মজার ব্যাপার আমি শ্রীনিবাসের নোটস এবং মেইল ঘেঁটে কিছু ইনফরমেশন পেয়েছি, যার ভিত্তিতেই আমার আজ এখানে আসা। এ ব্যাপারে আপনার কাছে পরামর্শ চাই। এই ছবিগুলো দেখুন।'

গাড়িটা সাইড করে ছবিগুলো দেখলেন গর্ডন। শ্রীনিবাসের শেষ কলের রেকর্ডিংটাও শুনলেন। মোবাইলটা ফেরত দিয়ে বললেন, 'এগুলো তো এয়ারস্কি ইন্ডিয়া নামের একটা কোম্পানির বিভিন্ন রকম ড্রোনের ডিজাইন দেখছি। এদের সিঙ্গল এবং মাল্টি রোটর ড্রোন মডেলগুলোর কিছু টেকনিকাল স্পেসিফিকেশন বের করেছ দেখছি।'

'হ্যাঁ, ভালো করে দেখুন। এখানে এয়ারস্কি-র মিডিয়াম এবং স্মল বেশ কিছু ড্রোন মডেলের স্পেসিফিকেশন আছে। সঙ্গে এম কিউ বলে একটা চাইনিজ কোম্পানির। দুটো কোম্পানির ড্রোন মডেলগুলোর স্পেসিফিকেশন প্রায় একই। স্পিড কন্ট্রোলার, ট্রান্সমিটার, রিসিভার, জিপিএস মডিউল, কোর প্ল্যাটফর্ম ডিজাইন সেম। শুধু বাহ্যিক ফ্রেম ডিজাইনে কিছু ভ্যারিয়েশন আছে। ক্যামেরার মেক-টা আলাদা। মজার ব্যাপার এই এয়ারস্কি কোম্পানির ড্রোনই ভুটানে চীনের বর্ডারের কাছে নতুন গড়ে ওঠা চাইনিজ ভিলেজের ফুটেজ তুলে পাঠিয়েছিল মিডিয়ায়। তারপরই আমাদের সুরক্ষা দপ্তরের হুঁশিয়ারিতে চীনের বাড়বাড়ন্ত বন্ধ হয় ওদিকে। আজ এই এক্সিবিশনে এরা পার্টিসিপেট করেছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের স্টার্ট আপ প্রজেক্টে প্রোপোসাল পাঠিয়েছে এরা। এসব শুনে কী মনে হয় আপনার?'

'এ বছর ডিফেন্সে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার অর্থাৎ হার্ডওয়ার বা গ্যাজেট কেনার বাজেট বাড়ানো হয়েছে প্রায় ৩০%, এ খবর আমার কাছে আছে। ইনসাইড ইন্ডিয়া প্রজেক্টের অংশ হিসেবে করা হয়েছে এটা, যেখানে ছোটখাটো গ্যাজেট যেমন ড্রোন ইত্যাদিতে ভারতীয় স্টার্ট আপ কোম্পানিদের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। চীন বা যেকোনও বিদেশি কোম্পানিকে এখানে ঢুকতেই দেওয়া হবে না। কাজেই এখন দেখতে হবে, এই এয়ারস্কি কোম্পানিটা আমাদের ডিফেন্সে ঢোকবার চেষ্টা করছে কিনা।'

'মাই গড! যদি উত্তরটা হ্যাঁ বেরোয়?'

'তাহলে কোম্পানিকে বাজিয়ে দেখতে হবে। তুমি বরং চেষ্টা করো এই কোম্পানির ইনভেস্টর, মেজরিটি শেয়ার হোল্ডার, এদের খবর বের করতে। তাহলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। চীন থেকে কম্পোনেন্ট আমদানি করে একই ড্রোন খোল বদলে ভারতীয় ছাপ মেরে বিক্রি হচ্ছে কিনা দেখা দরকার। সেক্ষেত্রে ডিফেন্সে ঢুকে পড়লে আমাদের সেন্সিটিভ ডেটা চীনের হাতে পড়বার সমূহ সম্ভাবনা। তাছাড়া আমাদের সার্ভে ডেটাও ওদের হাতে পড়লে যথেষ্ট অসুবিধে আছে।'

এই সময় বেজে উঠল সানভির ফোন। মিনিটখানেক কথা বলার পর 'আসছি' বলে ফোনটা কেটে দিল ও।

'এনি প্রবলেম?'

'অ্যানোনিমাস কল। একজন মহিলা দেখা করতে চাইছে। গলা শুনে বেশ ডেস্পারেট মনে হল। শ্রীনিবাস নাকি তাকে বলেছিল, আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে।'

'উম, এটা একটা ট্র্যাপ হতেও পারে।

'কলটা রেকর্ডেড আছে?'

'হুম, আমার সব কলই অটো রেকর্ড হয়।'

কলটা শুনলেন গর্ডন। এরপর কানে নিজের ওয়্যারলেস হেডফোন লাগিয়ে আবার শুনলেন কলটা। সেইসঙ্গে শ্রীনিবাসের আগের কলটাও। ওঁর মুখে হাসি ফুটে উঠল।

'কী হল, হাসছেন যে?'

'দুটো কলের মধ্যে একটা আশ্চর্য মিল পেলাম যে! দুজনের ব্যাকগ্রাউন্ডেই এক বিশেষ ধরনের কুকুরের ডাক।'

'মানে?'

'বলছি। আমি দুজনের ব্যাকগ্রাউন্ডেই কুকুরের হাই পিচ হাউলিং ডাক শুনতে পেয়েছি। ব্রিডটা সম্ভবত বিগল। যে লোকেশন শ্রীনিবাস শেয়ার করেছিল সেখানে তুমি কী কী দেখেছিলে, ভালো করে মনে করে বল।'

'দেখুন এক্স্যাক্ট লোকেশনটা সেভ করার আগেই ডিলিট করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আমি রাস্তাটা দেখে নিয়েছিলাম, তাই চিনে যেতে পেরেছি। ওখানে একটা পুরোন বন্ধ হওয়া সিনেমা হল আছে। তার আশেপাশে কিছু ফ্যাক্টরি আছে, একটা কর্পোরেশন স্কুলও ছিল বোধহয়। আর...হ্যাঁ, একটা শেলটার ছিল।'

'অ্যানিম্যাল শেলটার?'

'হ্যাঁ, সম্ভবত। স্থানীয় একজন লোক বলছিল। আমি রাস্তাটা ন্যাভিগেশন ম্যাপে বের করছি। এই দেখুন।'

ম্যাপটা জুম করে দেখলেন গর্ডন। কিছুক্ষণ পর বললেন, 'এই তো, Resceagles of India. টেস্টিং ল্যাব থেকে রেস্কিউ করা বিগলদের এখানে রাখা হয়। ছোট আকার এবং বাধ্য টেম্পারামেন্টের জন্য বিভিন্ন ফুড বা ড্রাগের অ্যানিম্যাল টেস্টিং-এর কাজে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় এদের। যা দেখছি তাতে করে মনে হচ্ছে, শ্রীনিবাস সঙ্গে করে একটা কুকুর বা কুকুরছানা নিয়ে এসেছিল, সেইটেই ছিল ওর প্রমাণ।'

'কী বলছেন?'

'এটা আমার অনুমান। যাকগে, লোকেশনটা চালাও, আমাদের রঁদেভুর জায়গাটায় যাওয়া যাক। মনে রাখবে, আগে তুমি একা যাবে। ভয় নেই, আমি ঠিক জায়গায় থাকব।'

৭। কিছুক্ষণ আগেই...

'কাম অন জিপসি, চলে এসো। দুষ্টুমি করে না।' স্টেলার ডাক শুনে পেছন ফিরে তাকাল জিপসি। লেকে আজ হাঁটতে এসেছে ওরা।

এই সময় একটা বল গড়িয়ে এল জিপসির দিকে। জিপসি বলটা মুখে তুলতেই কে যেন ওর লিশটা টেনে ধরল। মুখ তুলে ঘড়ঘড় শব্দ শুরু করল সে। লোকটার পরনে পাঠান স্যুট।

ততক্ষণে সামনে চলে এসেছে স্টেলা।

'কী ব্যাপার? আপনি ওর লিশটা টেনে ধরেছেন কেন?'

'আসলে আমারও একটা জার্মান শেফার্ড ছিল। একই রকম দেখতে। তাই ভাবছিলাম, এটা আমার কুকুর নয় তো?'

'এটা আমার আঙ্কেলের ডগ। আপনি ওর লিশটা ছেড়ে দিন। রেগে গেলে জিপসি কিন্তু আপনাকে ছেড়ে দেবে না।'

'তাই নাকি? আমার তো সন্দেহ হচ্ছে এটা আমারই ডগ। আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি। দেখি তো তুমি কেমন করে আটকাও।'

জিপসির লিশটা ধরে জোরে টান দিল লোকটা। পালটা টান দিয়ে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল জিপসি। ভাবখানা এমন, বেশি বেয়াদপি কোরো না।

'বোঝাই যাচ্ছে এটা আপনার কুকুর নয়!' ঠান্ডা সুরে বলল স্টেলা, 'ছেড়ে দিন ওকে।'

লোকটা কিছু একটা করতে যাচ্ছিল, তার আগেই ওর সামনে এসে দাঁড়ালেন এক সুন্দরী বয়স্ক ভদ্রমহিলা। পরনে সাদা চুড়িদার, ফর্সা রঙ, চমৎকার ফিট চেহারা। বছর পঁয়ষট্টি বয়েস হবে।

লোকটার হাত আস্তে করে ধরে মহিলা বললেন, 'বেচারাকে শুধু শুধু কষ্ট দিচ্ছ কেন বাবা? ছেড়েই দাও না।'

'সরি আন্টি' বেয়াদপের মতো হেসে বলল লোকটা, 'দিস ইজ নান অফ ইয়োর বিজনেস। তাই ইন্টারফিয়ার না করলেই খুশি হব।'

অল্প হাসলেন ভদ্রমহিলা। লোকটার কবজিটা মুচড়ে ধরতেই হাতছাড়া হয়ে গেল লিশটা। এরপর ওর হাতটা ধরে ভালো করে চেপে হ্যান্ডশেক করতেই ব্যাথায় আঁতকে উঠে কোনওরকমে হাত ছাড়িয়ে নিল লোকটা।

'নান অফ মাই বিজনেস!' ততক্ষণে হেসে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছেন ভদ্রমহিলা, 'জেনে রেখো, আমি মিশেল বোস, গর্ডন বোসের মা। ভবিষ্যতে এই কুকুরটার ওপর নজর দিয়ো না। আমার ছেলে তোমার বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে।'

দুজন ভদ্রলোক ব্যাপারটা দেখতে পেয়ে এদিকে আসছিলেন, তড়িঘড়ি লেক থেকে বেরিয়ে গেল লোকটা।

হঠাৎই ডেকে উঠল জিপসি। মাটিতে পড়ে থাকা কিছুর দিকে ইশারা করে তাকাল স্টেলার দিকে। নীচু হয়ে জিনিসটা তুলে নিলেন মিশেল। উলটে পালটে দেখে স্টেলার হাতে দিয়ে বললেন, 'রাখো এটা। তোমার গর্ডন আঙ্কেলকে দিয়ো।'

'কী এটা?'

'একটা মোটা আংটি। আমি লোকটার হাত চেপে ধরায় আঙুল থেকে খুলে পড়েছে। জিনিসটার মধ্যে সেন্সর আছে, তাই সন্দেহজনক।'

৮। শহরের দক্ষিণে এক বন্ধ ফ্যাক্টরি...

'ঢুকে সোজা ডানদিকে, করিডর ধরে হেঁটে চলে আসুন, আমি ওদিকেই আছি।'

মহিলার কথা অনুযায়ী আধা-অন্ধকার ফ্যাক্টরির ভেতর ঢুকে পড়ল সানভি। বাতিল মেশিনারির পাশ ধরে চলে যাওয়া রাস্তাটা বরাবর চলতে লাগল সাবধানে।

'এদিকে' একটা ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শুনে ডানদিকে তাকাল সানভি। ক্রমশ এগিয়ে আসা চেহারাটা স্পষ্ট হতেই দেখা গেল জিনস এবং ব্লু টপ পরা এক ভদ্রমহিলাকে।

'বাঁচতে চাইলে এসব ইনভেস্টিগেশন বন্ধ করুন। নইলে আপনার অবস্থাও শ্রীনিবাসের মতোই হবে।'

আস্তে করে সরে গেলেন ভদ্রমহিলা। ওঁর পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে দুজন বেশ ডাকাবুকো চেহারার লোক, একজনের হাতের পিস্তল সোজা সানভির দিকেই তাক করা।

'শ্রীনিবাসের থেকে কী কী প্রমাণ পেয়েছেন, বলে ফেলুন চটপট।' ঠান্ডা গলায় বললেন মহিলা।

'ওকে', মনের নার্ভাস ভাবটা চেপে বলল সানভি, 'আপনি রেস্কিগলসের সঙ্গে যুক্ত, তাই না? রেস্কিউ করা বিগলগুলোকে নিয়ে কী খেলা চলছে গোপনে?'

'রেস্কিউ! বিগল?'

'আপনার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ আছে আমার কাছে।'

'শাট আপ!' বলে উঠল পেছনের লোকটা। খোনা গলাটা শুনেই চমকে উঠল সানভি।

লোকটার চোখে চোখ রেখে বলল, 'সেদিন তুমিই আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলে না? অ্যাম সিওর, শ্রীনিবাসকে তুমিই মেরেছ।'

অদ্ভুত পাশবিক হাসি ফুটে উঠল লোকটার মুখে, অটোমেটিক পিস্তলের ট্রিগার টেপার আগেই একটা ভাঙা মেশিনারি পার্টস এসে পড়ল ওর হাতে।

পিস্তলটা হাত থেকে পড়ে যেতেই আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন গর্ডন। তাঁর চোয়াল শক্ত, হাতদুটো মুঠো করা।

লোকদুটো এগিয়ে গেল গর্ডনের দিকে। দুজনেই বেশ বলশালী, সন্দেহ নেই।

চারপাশটা দেখে নিলেন গর্ডন। প্রথম লোকটা এগোতেই মাথার এক গুঁতোয় মাটিতে ফেলে দিলেন ওকে। এরপর কনুই দিয়ে হাঁটুতে আঘাত করলেন খুব জোরে। নীচু হয়ে চোয়ালে কষিয়ে দিলেন জোরদার পানচ। আর্তনাদ করে উঠল লোকটা। পরের লোকটা বন্দুক বের করবার আগেই জোরে এক কিক করলেন ওর পায়ের ফিমার বোনে। ও ঝুঁকে পড়তেই ওর পুরো দেহটা ধরে ঘূর্ণির মতো পাকিয়ে ছুড়ে ফেললেন মাটিতে। এরপর একলাফে ওর কাছে গিয়ে ঘাড় ধরে মাথাটা প্রচণ্ড জোরে মেঝেতে ঠুকে দিলেন দুবার। এলিয়ে পড়ল লোকটা।

প্রথম লোকটা পড়ে যাওয়া পিস্তলের কাছে যাবার আগেই সেটা কুড়িয়ে নিল সানভি। সোজা তাক করল সামনের দিকে। পুরো ব্যাপারটা ঘটতে লাগল মিনিট তিনেক।

একটা বড়সড় ছুরি বের করে প্রথম লোকটা গর্ডনের দিকে চালাতেই শূন্যে লাফ দিলেন গর্ডন। লোকটার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে মাটিতে পেড়ে ফেললেন ওকে। ওর মুখে কষিয়ে দিলেন একটানা বেশ কয়েকটা পানচ। নাক মুখ ফেটে রক্ত বেরিয়ে এল লোকটার। সে এলিয়ে পড়তেই এক লাফে উঠে দাঁড়ালেন গর্ডন। এগিয়ে অচেতন হয়ে যাওয়া অন্য লোকটার কোমর থেকে বের করে নিলেন পিস্তল।

মাটিতে পড়ে যাওয়া প্রথম লোকটার দিকে তাক করে বললেন, 'কে পাঠিয়েছে তোমাদের?'

'আরে বাপরে, আপনি সায়েন্টিস্ট না কমব্যাট স্পেশালিস্ট!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল লোকটা।

'ধরে নাও দুটোর সাংঘাতিক কম্বিনেশন, উত্তর না দিলে, গুলিটাও নির্দ্বিধায় চালাব।' পিস্তলের স্লাইডটা পেছনে টেনে বললেন গর্ডন।

সানভি এবার মহিলার দিকে বন্দুক তুলে বলল, 'এবার সত্যি কথাগুলো বলে ফেলুন।'

একটু নার্ভাস দেখাল মহিলাকে। আমতা আমতা করে বললেন, 'যোগশালা...ট্রেনিং...'

আর কিছু বলবার আগেই একটা গুলি এসে লাগল তাঁর ঘাড়ের পাশটায়। ধুপ করে পড়ে গেলেন মাটিতে। পরের গুলিটা লাগল মাটিতে পড়ে যাওয়া প্রথম লোকটার মাথার ডানপাশে।

ওপরে তাকাতেই গর্ডন দেখতে পেলেন স্নাইপার রাইফেল দিয়ে শুট করছে একজন। এক লাফ দিয়ে তিনি সরে যাওয়ায় তাঁর প্রায় কাঁধ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল একটা গুলি।

'গেট ডাউন সানভি!' চেঁচিয়ে উঠেই ওপরের লোকটাকে লক্ষ্য করে গুলি করলেন গর্ডন। বন্দুক তুলে দৌড়তে শুরু করল লোকটা। তড়িঘড়ি সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল নীচে। একটা গুলি করে সোজা বেরিয়ে গেল ফ্যাক্টরির বাইরে। থামের আড়ালে থাকায় বেঁচে গেলেন গর্ডনসাহেব।

ফাঁকা জানলা দিয়ে লোকটার পায়ে গুলি করলেন গর্ডন। অব্যর্থ শট, খোঁড়াতে শুরু করল লোকটা। লোকটার হাত এবং জুতোর দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলেন গর্ডন। চটজলদি মোবাইলে ছবি তুলে নিলেন একটা। এই সময় হঠাৎ করেই একটা বাইক এসে তুলে নিল লোকটাকে। বাইকে উঠে লোকটা তাকাল ওঁর দিকে। পুরো মুখটা ঢাকা, শুধু চোখদুটো দেখা যাচ্ছে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই চোখের নিমেষে মিলিয়ে গেল বাইকটা।

ভেতরে ফিরে এলেন গর্ডন। তুম্বোমুখে দাঁড়িয়ে সানভি। সামনে পড়ে আছে মহিলা এবং কন্ট্রাক্ট কিলারের দেহ। দুজনের কেউই বেঁচে নেই। ভালোভাবে দেখলেন গর্ডন। দুজনের হাতেই একটা করে মোটা আংটি।

আংটিদুটো চট করে খুলে নিয়ে পকেটে পুরে নিলেন গর্ডন। সানভি কিছু বলার আগেই বললেন, 'মহিলার থেকে কিছু জানতে পারলে?'

'নাথিং সিগনিফিক্যান্ট। গুলি লাগার আগে "যোগশালা" বলে কিছু একটা বলছিলেন।'

'যোগশালা...ইউ মিন নাম্মা যোগশালা যেটা কর্ণাটক সরকার চালু করেছে?'

'প্রথমে ঠিক বুঝিনি। এখন মনে হচ্ছে এটাই।'

এই সময় পায়ের শব্দে ঘুরে তাকালেন ওঁরা। ফ্যাক্টরির ভেতর এসে ঢুকেছেন জনাচারেক লোক। সকলের হাতেই পিস্তল। একজন গাট্টাগোট্টা চেহারার ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন গর্ডনের দিকে।

'ঠিক আছেন বোসসাহেব?'

'আমি ঠিক আছি।' ডিসিপি ক্রাইম ব্রাঞ্চ গাউডার দিকে চেয়ে হেসে বললেন গর্ডন, 'আসল লোক দুজনকে সাফ করে হাওয়া হয়ে গেছে। তিন নম্বর অবিশ্যি বেঁচে, তার থেকে কী ইনফরমেশন বের করা যায় দেখুন।'

শুনে হাসলেন গাউডা। সানভির দিকে নজর পড়তেই বললেন, 'আরে, ম্যাডামও এখানে আছেন!'

'হ্যাঁ, গর্ডন স্যারের সঙ্গে থ্রিলিং মোমেন্টেই আমার দেখা হয়।' হেসে বলল সানভি, 'কেমন আছেন? আপনাকে খবর দিল কে?'

'কে আর', গর্ডনের দিকে আড়চোখে চেয়ে হেসে বললেন গাউডা, 'ঘণ্টাখানেক আগেই খবর পেলাম, তড়িঘড়ি টিমের যে ক'জনকে পেয়েছি নিয়ে এসেছি।'

'থ্যাংক ইউ গাউডা সাহেব', গাউডার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বললেন গর্ডন, 'যা বুঝছি, একজন খুঁজে খুঁজে বিভিন্ন লোকেদের খুন করছে। বিচ্ছিন্ন কিছু ডটস পেলেও সেগুলোকে জোড়বার সূত্রগুলো পাওয়া যায়নি এখনও। সানভি আমাকে টিপ অফ-এর কথাটা বলায় সন্দেহ হল, তাই সঙ্গে এলাম। আর কিছু জানা গেলে বলবেন গাউডা সাহেব। ব্যাপারটা নিয়ে আমিও মাথা ঘামাব।'

'আপনি মাথা ঘামালেই আমার ব্লাডপ্রেসার বেড়ে যায়। আসুন সানভি ম্যাডাম, আপনাকে ছেড়ে দিই। কিছু জানতে পারলে জানাচ্ছি বোসসাহেব।'

উত্তর দিলেন না গর্ডন। তিনি তখন গভীর চিন্তায় মগ্ন।

৯

শেলফে রাখা একাধিক বাক্সের দিকে এগিয়ে গেল মানুষটা। এক মুহূর্ত তাকাল, কিছু না ভেবেই তুলে নিল একটা বাক্স। শপিং ট্রলির ভেতর সেটা রাখতেই তার দিকে এগিয়ে এল এক সেলসপার্সন।

'স্যার, আপনি কিন্তু এই নতুন ব্র্যান্ডটা ট্রাই করতে পারেন। স্যাম্পল টেস্ট করে দেখুন। স্ট্রেস কমে যাবে, এনার্জি পাবেন নতুন করে।'

'না ভাই, এটা অনেকদিন ব্যবহার করছি।'

ভদ্রলোক এগিয়ে গেলেন কাউন্টারের দিকে। বেশ টেনশনে আছেন বোঝা যায়।

এই সময় তাঁর মোবাইল স্ক্রিনে হঠাৎ ঢুকল একটা মেসেজ। তাতে ক্লিক করতেই খুলে গেল একটা ভিডিও। এক টায়ার্ড ভদ্রলোক পথ চলতে চলতে হট্টগোলের মাঝে ঢুকে পড়ছেন একটা পার্কে। সেখানে দেখেন এক সুন্দরী ভদ্রমহিলা বসে আছেন বেঞ্চে। হাস্যময় চেহারা। চোখদুটো বন্ধ। পায়ের আওয়াজ পেয়ে চোখ খুলে তাকালেন তিনি।

এবার ভদ্রলোক চিনলেন, ইনি ফিল্মস্টার চিত্রা।

'আরে চিত্রা ম্যাডাম না? কী সৌভাগ্য! এই অসময়ে এখানে বসে ধ্যান করছেন! আপনার শুটিং নেই?'

'ধ্যান না, আজ ব্রেক নিয়েছি। বসুন না। আপনাকে টেনসড দেখাচ্ছে কেন?'

'আর বলবেন না', ধপ করে বসে বললেন ভদ্রলোক, 'অফিসের চাপে দফারফা অবস্থা।'

'মনের ভেতরটায় ঢুকে পড়তে পারলে এসব কিছু নয়। আমি আওয়াজের মাঝেও নৈঃশব্দ্যকে অনুভব করি। একদিন রিল্যাক্স করুন, দেখবেন কাজে নতুন ভাবনার খোরাক জুটে যাবে।'

'বলছেন?'

'হ্যাঁ, নিজেকে দিয়েই দেখছি তো! অভিনয়, ফ্যামিলি, সব সামাল দিতে গিয়ে হাঁসফাঁস অবস্থা। কিন্তু এখন দেখুন...স্ট্রেস ফ্রি। চোখ বন্ধ করে নিজেকে একটা দ্বীপের মধ্যে ভাবুন দেখি। কেউ নেই, শুধু আপনি।'

ভদ্রলোক চোখটা বন্ধ করলেন, ধীরে ধীরে ব্যাকগ্রাউন্ডে শুরু হল ধীর লয়ে মন্ত্রপাঠ ও হাল্কা মিউজিক। ওওওমমম...বুদ্ধং শরণম গচ্ছামি...সঙ্গে কুলকুল করে বয়ে চলা ঝরনার জলের মৃদু শব্দ, সঙ্গে পাখির মিঠে ডাক।

ভদ্রলোকের মুখে ফুটে উঠল হাসি। চোখ খুলে চিত্রাকে বললেন, 'অদ্ভুত ব্যাপার। দিব্যি লাগছে। আপনার এই স্ট্রেস ফ্রি ভাবনার সিক্রেটটা জানা যায় ম্যাডাম?'

'নিশ্চয়ই, এইটে সঙ্গে রাখুন। খেলেই দেখবেন টেনশন দূর হয়ে মনে জোর পাচ্ছেন।'

একটা আয়তাকার বাক্স এগিয়ে দিলেন ভদ্রমহিলা। তাতে পদ্মাসনে বসা এক হাসিমুখ ভদ্রলোকের ছবি। ব্যাকগ্রাউন্ডে শহরের ব্যস্ত রাস্তা। ওঁর সামনে একটা কুকুর বসে অবাক চোখে তাকিয়ে।

এবার পর্দায় ফুটে উঠল কিছু অক্ষর—'Remove Stress, Feel Positive and Regain Energy. Let your feel good hormones rejuvenate you! Connect body with inner soul. Try CONNECTIVATE, the health drink of future India.'

বিজ্ঞাপনটা থেমে যেতেই স্টোরের বেশ কিছু টিভি স্ক্রিনে ফুটে উঠল একই ছবি।

ওটা থেমে যেতেই ভদ্রলোক ফিরে গেলেন শেলফের দিকে। একটু আগে দেখা সেলস পার্সনকে খুঁজে নিয়ে বললেন, 'আমাকে ওই নতুন হেলথ ড্রিংকের স্যাম্পলটা দিন না।'

'নিশ্চয়ই', দুটো স্যাশে এগিয়ে দিয়ে বলল সেলসের ছেলেটা, 'আমরা এখন প্রি-লঞ্চ ক্যাম্পেইন করছি, কমার্শিয়াল লঞ্চ কিছুদিন পর। আপনার নম্বরটা ছেড়ে যান, রিভিউ ফর্ম পাঠাব।'

একজোড়া খুদে ইয়ারপড এগিয়ে দিয়ে ছেলেটা বলল, 'এই ইয়ারফোনটাও আপনার জন্য। গিফট। যে থিম মিউজিকটা একটু আগে অ্যাডে শুনলেন, ওটা আবার শুনে দেখুন।'

কিছু বলার আগেই ভদ্রলোকের কানে ইয়ারপড গুঁজে দিল ছেলেটা। গান শুনতে শুনতে স্যাম্পল স্যাশে দুটোর দিকে দেখলেন ভদ্রলোক। একটু আগে শেলফ থেকে তুলে নেওয়া বাক্সটা রেখে দিয়ে গুনগুন করে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে বেরিয়ে গেলেন স্টোর ছেড়ে।

সিসিটিভি ফুটেজে সমস্তটা দেখে চমকে উঠলেন সমর শেট্টি। হাততালি দিয়ে বললেন, 'ব্রাভো! আমরা তো সাকসেসফুলি লোকটার মনে জায়গা করে নিয়েছি! ওই মিউজিকটা বার বার শুনতে শুনতে ও আরও ব্র্যান্ডের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে।'

'অ্যাবসোলিউটলি!' মাথা নেড়ে বললেন ওঁর পার্টনার রঙ্গিত রেড্ডি, 'মিস্টার গর্ডনের ইনসাইটের জবাব নেই! অ্যাগ্রিটেকের পর আমাদের নতুন কোম্পানি হেলদিয়ানসও নিঃসন্দেহে সফল হবে।'

'দাঁড়ান, আসল কথাটা তো বলাই হয়নি।' হাতের ট্যাবলেট প্রোজেক্টরে কানেক্ট করে বললেন গর্ডন, 'ভদ্রলোকের ব্রেইন ওয়েভ প্যাটার্নটা একটু দেখে নিন। প্রথমে আমরা দেখছি কমতে থাকা বিটা ওয়েভ, যা মোটামুটি ব্যস্ত বা সক্রিয় একটা মেন্টাল স্টেটকে বোঝায়। এরপর আলফা ওয়েভ অর্থাৎ রিল্যাক্সড একটা ভাব শুরু হয়েই প্যাটার্নটা বদলে ঢেউ খেয়েছে। ঠিক এই সময়েই ভদ্রলোক পুরোনো ব্র্যান্ডটা রাখবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

'এটাই হল আমার খুঁজে পাওয়া হাইব্রিড ওয়েভ, যার নাম দিয়েছি আলফাবি। এইটা বাড়িয়ে দিতে পারলেই পার্চেজ ডিসিশন নিশ্চিত। যে বিজ্ঞাপন এবং মিউজিকের আইডিয়া আমি দিয়েছিলাম, সেটা স্ট্রেস কমানোর আড়ালে ঠিক এটাই করেছে। এই খুদে ইয়ারফোনটার মধ্যে আছে চারটে খুদে ইলেকট্রোড যা কানের মাধ্যমে ব্রেইন সিগন্যাল ক্যাপচার করে। এছাড়া আছে হার্ট রেট সেন্সর, স্টেপস, ক্যালোরি, দেহের তাপমাত্রা মাপা ইত্যাদি।

'যে সময়টায় ওই হাইব্রিড ওয়েভ বেরোল, সেই সময় ওঁর হার্ট রেট স্টেবল, স্ট্রেস ইন্ডেক্স একেবারে তলার দিকে। ভদ্রলোক প্রথমে নন কনশাস মাইন্ডের বিশ্বাসে অভ্যেসবশত পুরোনো ব্র্যান্ডটা তুলে নিয়েছিলেন, নিউরোমার্কেটিংয়ের কারণে নতুনটাকে মনে জায়গা দিলেন। লার্জ স্কেলে এই প্রি-লঞ্চ প্রমোশন করলে নিউরোমার্কেটিংয়ের ম্যাজিক আপনাদের প্রোডাক্টকে লঞ্চের আগেই কোথায় নিয়ে যাবে, আশা করি বুঝতে পারছেন। আপনাদের প্রোডাক্টের মেডিক্যাল অ্যানালিসিস আমি দেখেছি। এটা ফিল গুড অর্থাৎ মন ভালো রাখা নিউরোট্রান্সমিটার সেরোটনিন এবং ডোপামিন ক্ষরণে বিশেষ ভূমিকা নেয়, কাজেই স্ট্রেস কমাতে কার্যকরী হবে বলেই আমার ধারণা।'

'আউটস্ট্যান্ডিং!' আঙুল মটকাতে মটকাতে বললেন সমর, 'আমাদের লঞ্চ হবে মেড ইন ইন্ডিয়া স্টার্ট আপ কনফারেন্সে। স্বয়ং সি এম আসবেন সেদিন। সেইসঙ্গে ইন্ডাস্ট্রি মিনিস্টার।

'চমৎকার! সমরের হাতের দিকে চেয়ে হেসে বললেন গর্ডন, 'আমার শুভেচ্ছা থাকবে। বাই দ্য ওয়ে, আপনার অন্য কোম্পানি অ্যাগ্রিটেক যে ড্রোন ব্যবহার করছে সেগুলো কতটা রিলায়েবল?'

'কেন বলুন তো?' ভুরুটা কুঁচকে উঠল সমরের।

'দেশের সার্ভে ডেটা এদিক-ওদিক লিক না হওয়াই ভালো, তাই না?'

'ওহ, তাই বলুন। না না, আমাদের ডেটা হাইলি সিকিওরড। ড্রোন আমরা যাদের থেকে নিই তারা খুবই রিলায়েবল।'

'তাহলে এই ভারতীয় কনজিউমারদের যে ডেটা আমরা সংগ্রহ করব, সেটা সুরক্ষিত থাকবে ধরে নিতে পারি।'

'হ্যাঁ নিশ্চয়ই। শুধু মার্কেটিং-এর জন্য যেটুকু লাগবে সেটুকুই নেব, আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন।'

'ধন্যবাদ, সেটা হলেই খুশি হব। আমি আবার কথার খেলাপ বিশেষ পছন্দ করি না।' মুচকি হেসে গটগটিয়ে বেরিয়ে গেলেন গর্ডন।

১০। দুদিন পর...

টেবিলে রাখা গর্ডন, সানভি, জিপসি, মিশেল, স্টেলা, সমর শেট্টি এবং আরও বেশ কয়েকজনের ছবির দিকে চুপচাপ দেখল লোকটা। পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে ফোন করল একটা নম্বরে।

'তোমরা আন্ডারগ্রাউন্ড তো?'

'হ্যাঁ, বেঙ্গালুরু শহরে গা ঢাকা দেওয়ার জায়গার অভাব নেই।'

'অ্যাটাকের কথাটা মনে আছে তো?'

'হ্যাঁ।'

'চীন আমাদের বন্ধু এটা ভুলে যেও না। ওদের খাতিরে এই কাজটা আমাদের নামাতে হবে। ওই প্রডাক্ট লঞ্চের দিনটাই হবে সঠিক দিন। মেড ইন ইন্ডিয়া স্টার্ট আপ কনফারেন্সের মাথাগুলোকে শেষ করাই আমাদের উদ্দেশ্য।'

'তা তো হবেই। ওই সায়েন্টিস্টও সেদিন আসবে, তাই না?'

'হুম, ওর রিসার্চের ওপর নির্ভর করেই তো সমর শেট্টির নতুন প্রডাক্ট লঞ্চ। লোকটা ডেঞ্জারাস।'

'হাই লেভেলের ট্রেনিং পাওয়া। ওকে শেষ না করা অবধি শান্তি নেই। মিশন আজাদ কে'র পুরো প্ল্যানটা ভেস্তে দিয়েছিল।'

'হ্যাঁ, ওই জার্নালিস্ট মেয়েটাও জুটেছে। ওকে আমি সামলে নেব। একটা লিস্ট পাঠাচ্ছি। কিছু নাম আছে। তাদের কীভাবে ইনভাইট করতে হবে তাও লেখা আছে। কাজটা যেন হয়ে যায়। আর হ্যাঁ, সায়েন্টিস্টকে কিছু করবে না, মনে রাখবে, ও আমার শিকার।'

ফোন কেটে দিয়ে নিজের মনেই হেসে উঠল লোকটা।

১১। নিমহ্যানস ক্যাম্পাস, গর্ডনের অফিসিয়াল প্রাইভেট কেবিন

'আংটিটায় কী আছে, কিছু বুঝলে আঙ্কেল?'

স্টেলার প্রশ্নে মুখ তুললেন গর্ডন। কফিতে হালকা চুমুক দিয়ে বললেন, 'ওর মধ্যেকার ডেটা আমার দেখা হয়ে গেছে। আরও দুটো আংটির ডেটাও দেখে নিয়েছি। এখন প্রশ্ন হল, তোমার হ্যাকার বন্ধু ড্যানের সাহায্য পাওয়া যাবে?'

'মানে?'

'মানেটা সিম্পল। আমার ধারণা এই ডেটা যে প্রাইভেট ক্লাউড সার্ভারে আছে, তাতে এমন আরও ডেটা আছে। সেগুলো কাদের এবং কী কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে আমার জানা দরকার। ওকে আজ বিকেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে বোলো। গত দুদিন মাথা ঘামিয়ে বেশ কিছু ইনফরমেশন বের করেছি আমি। সেসব শোনার আগে কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড তোমার জানা দরকার। সেজন্যেই ডেকেছি আজ।'

হিমাচলের ঘটনা থেকে সানভির সঙ্গে দেখা এবং আচমকা হামলা, এ সবের কিছুই বাদ দিলেন না গর্ডন। শুনে চমকে উঠল স্টেলা।

'বল কী আঙ্কেল? তোমার কাছে তথাগত রাওয়ের সিক্রেট ডায়েরি!'

'হ্যাঁ, সেখানে পাওয়া টুকরো টুকরো তথ্য এবং বিভিন্ন ঘটে যাওয়া ঘটনাকে জুড়ে কিছু লজিক আমি খাড়া করেছি। তবে লাইটারটা থেকে আমি কিছু পাইনি এখনও।

এক, তথাগত গত দু'বছরে কোম্পানির বেশ বড় অংকের টাকা কয়েকটা

বিদেশি অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করেছেন। আমার ধারণা এগুলো ওনার সিক্রেট ইনভেস্টমেন্ট ছিল। সেগুলো ব্যাকফায়ার করাতেই ভদ্রলোকের অকালমৃত্যু হল।

দুই, ভদ্রলোকের ডায়েরিতে বেশ কয়েকটা ড্রোন মডেলের উল্লেখ আছে যেগুলো চীনে কোম্পানি এম কিউ-এর মডেল। কাজেই এই এম কিউ-এর সঙ্গে কোনওভাবে ওঁর যোগাযোগ ছিল।

তিন, ডায়েরিতে কিছু অক্ষর পরপর লিখে একটা সার্কল বানান আছে। এটা কোনও সিক্রেট গ্রুপ মনে হচ্ছে। হয়তো এদের সঙ্গে ওঁর কোনও ডিলিংস ছিল।

চার, আমার ধারণা আমাদের জিপসি তথাগতরই পেট ডগ ছিল। জিপসি এবং তথাগতর ড্রাইভার গোবিন্দ ওঁর মৃত্যু সম্পর্কে কিছু জেনে ফেলে প্রাণ বাঁচাতে হিমাচলে পালায়। সেখানে এক খুনে শুটার ওদের পিছু নেয়, ড্রাইভারকে গুলি করে পাহাড়ি রাস্তায় নীচে ফেলে দেয় সে। কুকুরটা বেঁচে যায়। সেই খুনে শুটারই সেদিন হামলা করেছিল আমাদের ওপর। দেবরাজের তোলা একটা ভিডিওতে আমি ওকে এক ঝলক দেখেছি। ওর হাতে কথাকলি ড্যান্সারের ট্যাটু আছে। বোঝাই যাচ্ছে, তথাগতর মৃত্যুর জন্য যারা দায়ী, তারা আমাদের ওপর নজর রাখছে। এই কারণেই বারবার জিপসির ওপর নজর রাখছিল ওরা। দেবরাজের ভিডিও দেখে ওই খুনে শুটারের সন্দেহ হয়। গোবিন্দ ওর লং কোটটা কামিয়ে ছোট করে রাখলেও পেটের নীচের লোমে হাত দিয়ে আমি বুঝেছি জিপসি লং কোট জার্মান শেফার্ড।

পাঁচ, যে পুলিশ অফিসারের সঙ্গে ড্রাইভার গোবিন্দ যোগাযোগ করেছিল, তার নামের আদ্যক্ষর আমি ওই ডায়েরিতে পেয়েছি। এইচ পি পুলিশ, বি পি-র মানে নির্ঘাত ভগবান প্রসাদ। তার খাদ থেকে গড়িয়ে পড়ে মৃত্যু খুন বলেই আমার ধারণা।

ছয়, রেস্কিগলস। এই নামটা ওঁর ডায়েরিতেও আছে। এই বিগল রেস্কিউ সেন্টারের এক ভদ্রমহিলা সানভির সঙ্গে মিট করেছিলেন। শি ওয়াজ শট অ্যান্ড ডায়েড অন দ্য স্পট। নাম সঞ্জনা আয়াপ্পান। আয়াম শিওর, উনি এই টেস্টিং ল্যাব থেকে রেস্কিউ করা বিগলগুলোকে কোথাও পাচার করতেন।

সাত, মৃত্যুর আগে সানভিকে এক যোগশালার কথা বলেছিলেন সঞ্জনা। আমার ধারণা এটা কর্নাটক হেলথ মিনিস্ট্রির চালু করা যোগশালা। ইচ্ছুক কোনও গ্রুপ এদের হেল্পলাইনে ফোন করলেই এখান থেকে এদের ট্রেনার পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেদিন ধরা পড়া দু'নম্বর লোকটা খুব বেশি কিছু বলতে পারেনি। ও এটাই জানিয়েছে, মৃত কন্ট্রাক্ট কিলার পিটার ভালো যোগাসন জানত এবং এই যোগশালায় ট্রেনার হিসেবে কাজ করেছে।

আট, ক্রিপ্টিড নামে ক্রিপ্টোকারেন্সি ইনভেস্টমেন্টের একটা টেলিগ্রাম গ্রুপের উল্লেখ আছে ডায়েরিতে। এরা মূলত ইনভেস্টমেন্টের ফলাফল প্রেডিক্ট করে এবং প্রত্যেক ট্রেডিংয়ের পেছনে কমিশন নেয়। এই কমিশনের অ্যাকাউন্টের ব্যাপারে ডিটেলে জানতে হলে ড্যানের সাহায্য দরকার।

নয়, সবচেয়ে বিস্ফোরক তথ্য ছিল ওঁর ডায়েরির ভেতর ভাঁজ করা অবস্থায়। পরপর বেশ কয়েকদিনের ব্লাড রিপোর্ট স্যাম্পল এর ছেঁড়া অংশ। সেখানে অক্সিটোসিন এবং ভ্যাসিটোনিন এই দুটো হর্মোনের কথা লেখা আছে। অক্সিটোসিন বেড়ে যাওয়ার পর পরই ভ্যাসিটোনিন বেড়ে যাওয়ার উল্লেখ আছে সেখানে। এটা মূলত কুকুরদের ক্ষেত্রে টেস্ট করা হয়। অক্সিটোসিন বেড়ে যাওয়ার অর্থ তারা ভালো মুডে আছে। ভ্যাসিটোনিন বেড়ে গেলে কুকুরদের মধ্যে হিংস্র আচরণ লক্ষ করা যায়। মানুষের দেহেও কিন্তু এগুলো থাকে। এই রিপোর্ট দেখার পর আমি তোমাকে এক জায়গায় না পাঠিয়ে পারছি না। তুমি আর ড্যান ঘুরে এসো সেখান থেকে। আমি তোমাকে জানাব কী করতে হবে।

বিকেলে ড্যান এল গর্ডনের সঙ্গে দেখা করতে। কথাবার্তার পর ওর সিস্টেম নিয়ে বসে পড়ল ওঁর চেম্বারেই।

যে ইনফরমেশনটা বেরোল, তার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না গর্ডন। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল তাঁর।

১২। ভারত টাইমসের অফিস, রাত দুটো

'ম্যাডাম, বেশ বুঝতে পারছি আমার হাতে সময় বেশি নেই। রাতেই আপনার অফিসে দেখা করতে হল। এই পেন ড্রাইভটা রাখুন, এতে এমন কিছু প্রমাণ আছে, যেগুলো আপনার ইনভেস্টিগেশনে হেল্প করবে।'

আধা-অন্ধকার বিশাল ফ্লোরের এক কোণে নিজের ডেস্কে চুপচাপ বসেছিল সানভি। পাশের ডেস্কে মুখে চাদর জড়ানো অবস্থায় বসেছিল আরও একজন।

'আপনি এসবের মধ্যে পড়লেন কীভাবে?'

'অভাব মানুষকে দিয়ে অনেক রকম কাজ করিয়ে নেয়। আমি ওয়েডিং ফটোগ্রাফার, করোনা মহামারীর সময় বহুদিন কাজ ছিল না। তখনই এই অফারটা পাই। যেমন যেমন ফোন আসবে, ছবি তুলে পাঠিয়ে দিতে হবে। বিনিময়ে মাসে ষাট হাজার টাকা।'

'বুঝেছি।' লোকটাকে থামিয়ে দিয়ে বলল সানভি, 'আপনার হাতে এই আংটিটা কীসের?'

'এটা খোলা বারণ এটুকু বলতে পারি। এর বেশি বললে আমার লাইফ রিস্ক আছে।'

পেন ড্রাইভটা ল্যাপটপে লাগাল সানভি। এই সময় খুট করে শব্দ হল একটা। চমকে উঠে সানভি দেখে পাশে বসা লোকটা এলিয়ে পড়েছে কাত হয়ে। ওর কপালের ঠিক মাঝে একটা ফুটো, সেখান থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে চাপ চাপ রক্ত। শিউরে উঠল সানভি।

ভয়ে সামনে তাকাতেই রক্ত হিম হয়ে গেল ওর। অন্ধকারের মাঝে বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে এক ছায়ামূর্তি। সানভি চটপট পেন ড্রাইভটা পুরে ফেলল জিন্সের পকেটে।

'ড্রাইভটা দিয়ে দাও।' অদ্ভুত যান্ত্রিক কণ্ঠস্বরে বলল লোকটা।

সানভি দেখল ফ্লোরের দরজাটা খুব বেশি দূরে নয়। নিমেষে ওর ডেস্কের চায়ের মাগটা তুলে ছুড়ে মারল লোকটার দিকে। লোকটা একটু বেসামাল হয়ে যেতেই একটা ডেস্কের আড়ালে গিয়ে এক লাফে বেরিয়ে গেল ফ্লোরের বাইরে। এরপর সিঁড়ি বেয়ে সোজা নীচে। পার্কিং লটে পৌঁছেই সোজা ডায়াল করল গর্ডনের নম্বর।

১৩। স্টেলা এবং ড্যান, রেস্কিগলসের অফিসে

'আপনারা বসুন, আপনাদের জন্য স্যুটেবল কয়েকটা বিগল নিয়ে আসছি, পছন্দ হলে অ্যাডপ্ট করবেন।' স্টেলা এবং ড্যানকে বসিয়ে ভেতরে চলে গেল মনোহর। ও এখানকার কেয়ারটেকার।

ড্যানকে বসিয়ে চুপচাপ ভেতরের গোডাউনে ঢুকে পড়ল স্টেলা। বিভিন্ন খাঁচায় বেশ কিছু বিগল ঘুমোচ্ছে। আরও একটা কাচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল স্টেলা। এখানে কুকুরদের খাবার রাখা আছে। আর আছে একটা ল্যাব সেট আপ। এখানে ডগ ফুডের সঙ্গে একটা সাদাটে পাউডারের মতো কিছু নজরে এল স্টেলার। পকেট থেকে প্লাস্টিকের প্যাকেট বের করে তার কিছুটা স্যাম্পল নিয়ে নিল সে। সেখান থেকে বেরিয়ে গোডাউনের দরজার কাছাকাছি আসতেই একেবারে মুখোমুখি দেখা হল মনোহরের সঙ্গে।

'কী ব্যাপার, আপনি এখানে?'

'আরও বিগল আছে কিনা দেখছিলাম।'

'দেখেছেন তো, এবার অফিসে চলুন।'

'হ্যাঁ শিওর।'

কিছুক্ষণ এটা-সেটা কথার পর ওখান থেকে বেরিয়ে গেল দুজনে। স্টেলার মনে তখন চাপা উত্তেজনা।

১৪। ভেপার পাব, শারজাপুর রোড

'কাম অন, আপনি তো কিছুই নিচ্ছেন না।' সমর শেট্টির কথায় সামান্য হাসল সানভি। তারপর সামনের প্লেট থেকে তুলে নিল একটা স্পাইসি চিকেন উইং।

'মেজাজ ফুরফুরে রাখো সানভি, বেশি কাজ কোরো না তো।' চিকেন উইংয়ে কামড় বসিয়ে বললেন গর্ডনসাহেব।

'ইউ আর কারেক্ট গর্ডন।' হেসে বললেন সমর, 'আমাদের প্রোডাক্ট লঞ্চের এক্সক্লুসিভ মিডিয়া কভারেজ তো সানভিই করবেন। এনার্জিটা তখনকার জন্য জমিয়ে রাখলে ভালো হয় না?'

সমর আজ ওঁদের দুজনকে ইনভাইট করেছিলেন এখানে।

সানভি আড়ালে ডেকে নিল গর্ডনকে। রুফ টপের একধারে চলে এলেন দুজন।

'পেন ড্রাইভটা দেখেছেন স্যার?'

'দেখেছি। আমার অনুমানই ঠিক। কুকুরগুলোর কয়েকটাকে ল্যাব টেস্টিংয়ের জন্যই পাঠানো হয়েছিল। ভিডিওয় ওদের কয়েকজনের মধ্যে হঠাৎ করে অ্যাগ্রেসন এসে গেছিল দেখেছি। যে জিনিস ওদের খাওয়ানো হচ্ছিল, এটা তারই এফেক্ট আমার ধারণা। স্টেলা একটা স্যাম্পল এনেছে, ওটার টেস্টিং রেজাল্ট এলে বেটার বলতে পারব। আচ্ছা ওই ফটোগ্রাফারের বডি পরেরদিন অফিসে পাওয়া গেছে?'

'উঁহু, কোনও ট্রেস ছিল না।'

'সেটাই স্বাভাবিক। ওঁরা কোনও প্রমাণ ফেলে রাখবে না। এবার কিন্তু টিমওয়ার্ক না করলে আমাদের চলবে না।' এদিক-ওদিক দেখে গর্ডন বললেন, 'সেদিন অফিসে একটুর জন্য বেঁচে গেছ তুমি। পেন ড্রাইভে আর কী পেয়েছিলে বলে ফেলো।'

'ফেরার সময় বলছি। আপনিও আশাকরি আর কিছু লুকোবেন না।'

'সার্টেনলি। নিজেদের মধ্যে ট্রান্সপারেন্সি না থাকলে এই মন্দব্যূহের বাইরে বেরোনো অসম্ভব।'

১৫। হারালুর রোড, গর্ডনের ভিলায়

'থ্যাংকস ফর কামিং এভরিওয়ান'—বার্বিকিউ গ্রিলের ওপর রাখা চিকেন এবং প্রনগুলোয় অয়েল ব্রাশ দিয়ে মাখন লাগাতে লাগাতে বললেন গর্ডন। সামনে স্টেলা, ড্যান, সানভি, ডিসিপি গাউডা। এই মুহূর্তে তাঁর বাড়ির গার্ডেনে বসেছেন সবাই। জিপসি খেলা করে যাচ্ছে ওঁদের সঙ্গে।

'কী জানলেন বলুন বোসসাহেব।' হেসে বললেন গাউডা।

'জানাব। সেদিন যে লোকটাকে ফ্যাক্টরিতে ধরা হল, তার থেকে কিছু জানা গেল?'

'হুম। লোকটার নাম রাঘব। জিম ইনস্ট্রাকটর ছিল। করোনা প্যান্ডেমিকের সময় চাকরি যায়। এরপর হঠাৎ করেই যোগশালায় ডাক পেয়ে যায়। ভালো মাইনে। সেই সঙ্গে পিটার বা অন্য কেউ ডেকে পাঠালে সঙ্গে যাওয়া। তাতে এক্সট্রা ইনকাম। ওর থেকে আরও তিন জনের খোঁজ পাওয়া গেছে। মৃত মহিলার কথা তো আগেই বলেছি। তিনি রেক্সিগিলসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই যোগশালার ব্যাপারটাও খোঁজ নিয়ে দেখেছি। চিফ মিনিস্টার এটা চালু করলেও আসল আইডিয়া জিতেন কুমারের, যে আগে অপোজিশন পার্টির মাথাদের সঙ্গে কাজ করত। মিনিস্টার অফ স্টেট, হোম মিনিস্ট্রির সঙ্গেও কাজ করেছে। এখন আমাদের রুলিং পার্টিতে জয়েন করে এই রাজ্যে চিফ সেক্রেটারি। স্টার্ট আপ ইন্ডাস্ট্রির পোর্টফোলিও চিফ মিনিস্টারের কাছে, ওটা মূলত জিতেনই দেখেন। লোকটার দিল্লিতে যোগাযোগ ঈর্ষণীয়। সাত আটটা ভাষা অনর্গল বলে।'

'বুঝলাম। এটুকু জেনে রাখুন রাঘবের মতো আরও অনেকের ডিটেইলস আমি পেয়েছি। এরা কেউ ফটোগ্রাফার, কেউ জিম ইনস্ট্রাকটর, কেউ ড্রাইভার, কেউ মিস্ত্রী, কেউ ডেটা সায়েন্টিস্ট, কেউ প্রোগ্রামার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ টেকনোলজি জিনিয়াস, কেউ ডাক্তার, কেউ উকিল বা অন্য কিছু। এদের মধ্যে কমন ফ্যাক্টর একটাই, এরা প্রত্যেকেই করোনা প্যান্ডেমিকের সময় কাজ হারিয়েছিল। কাজেই অর্থের প্রয়োজনে এদের একটা নেটওয়ার্ক বানিয়ে ফেলে আড়ালে থাকা কিছু ক্ষমতাশীল লোকজন। এদেরই একজন সানভিকে দুটো ডেটা দিয়েছিল। এক, রেক্সিগিলসের বিগলদের ওপর কোনও একটা ফুড প্রডাক্টের এক্সপেরিমেন্ট। অন্যটা তাদের নেটওয়ার্কের ডিটেইলস। লেকের কাছে পাওয়া আংটির ডেটা যে সার্ভারে ছিল এদের প্রত্যেকের ফিটনেস ডেটাও ছিল সেখানেই। তাদের শরীরে পরা সেনসর লাগানো আংটির সমস্ত ডেটা চলে যেত ওদের ক্লাউড সার্ভারে। এমনকী ওদের লোকেশনও মনিটর করা হতো। একইভাবে যোগশালায় আসা অনেককে এই আংটি দেওয়া হতো কিছুদিনের জন্য। স্যাম্পল ডেটা পেয়ে যেত ওরা। এজ গ্রুপ অনুযায়ী স্ট্রেস, হার্ট রেট, স্লিপ ইন্ডেক্স ইত্যাদি।'

'মাই গুডনেস! কারা এরা?'

'বিগ মাইন্ডস যারা অর্থের প্রয়োজনে বিগ ডেটার অপব্যবহার করে থাকে। গাউডাসাহেব, পরশু একটা ইভেন্ট আছে। সানভিকে ওই মৃত ফটোগ্রাফার জানিয়েছে ওদের নেটওয়ার্কের অনেকেই সেদিন ইনভাইটেড। ওদের অনেকেই ফায়ার আর্মস চালাতে পারে, তাই সারভেইল্যান্স এবং চেকিং দুটোই জবরদস্ত হওয়া দরকার। ওই শার্প শুটারও ঢোকার চেষ্টা করবে বলে মনে হয়। মন বলছে, একটা গোলমাল হতে পারে। ড্যান, তোমাকে যা বলেছি, সেটাই করো। গাউডা সাহেব, আপনাকে প্ল্যানটা বলছি, সে অনুযায়ী আপনি যদি ফোর্স নিয়ে আসেন খুব ভালো হয়।'

'সিওর। লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট।'

১৬। হোটেল পার্ক ইন, বেঙ্গালুরু

ছয় নম্বর ফ্লোরের একপ্রান্তে থাকা ট্রলিটা নিয়ে ঠেলতে ঠেলতে লিফটে ঢুকে পড়ল একজন ক্লিনিং স্টাফ। সেখানে অলরেডি দাঁড়িয়ে ছিল একজন। লিফটটা চার নম্বর ফ্লোরে পৌঁছতেই ঢুকে পড়ল আরও দুজন। চারজন একসঙ্গে নেমে এল ফার্স্ট ফ্লোরে। প্রত্যেকের মুখেই মাস্ক লাগানো। ফ্লোরের ডান কোনায় ব্যাংকোয়েট হল, যেখানে মেড ইন ইন্ডিয়া স্টার্ট আপ কনফারেন্স হচ্ছে।

ট্রলির ভেতরে থাকা জিনিসগুলো হাত দিয়ে অনুভব করে নিল তারা। এরপর জোর কদমে এগিয়ে গেল ব্যাংকোয়েট হলের দিকে।

চিফ মিনিস্টারের স্পিচের পর সমর উঠলেন স্টেজে। কিছু কথার পর স্পেশাল হেলথ ড্রিংক কানেক্টিভেট-এর একটা অ্যাড ভিডিও চালানো হল। এই ড্রিংক কীভাবে স্ট্রেস কমায় সেই নিয়ে কিছুটা বলার পর সমর বললেন, 'এবার আমি অনুরোধ করব বিখ্যাত নিউরোসায়েন্টিস্ট গর্ডন বোসকে কিছু বলতে।'

কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

এই সময় স্ক্রিনে চলতে থাকা ভিডিওটা বদলে গেল হঠাৎই। সেখানে ফুটে উঠল রেক্সিগিলসের বিগলদের ভিডিও। তাতে একটা সাদা পাউডার জলে গুলে খাওয়ানো হচ্ছে তাদের। খাওয়ানোর কিছু পর সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেল হঠাৎ করে অ্যাগ্রেসিভ হয়ে উঠছে মিষ্টি স্বভাবের কুকুরগুলো।

ভিডিওটা শেষ হতেই নড়েচড়ে বসলেন ডেলিগেটসরা। স্ক্রিনে ফুটে উঠল একটা তালিকা।

চিফ সেক্রেটারি জিতেনের ইশারায় ভিডিওটা চেঞ্জ করতে চেষ্টা করলেন স্টেজের পাশে থাকা একজন, কিন্তু অদ্ভুত মন্ত্রবলে এই ভিডিও চালাবার কন্ট্রোল নিয়ে নিয়েছে অন্য কেউ।

এই সময় হঠাৎ করেই একটা গুলি এসে লাগল দর্শক আসনে বসা একজনের গায়ে। ক্লিনিং স্টাফেদের প্রত্যেকের হাতেই এ কে ৪৭। পুলিশ অফিসাররা কিছু করবার আগেই দর্শকদের দিকে বন্দুক তুলল ওরা।

চিফ মিনিস্টার এদিক-ওদিক চাইলেন। তাঁর জেড সিকিয়োরিটির লোকেদের একজন নড়াচড়া করতেই একটা গুলি এসে এফোঁড়-ওফোঁড়

করে দিল তার বুক।

দাঁতে দাঁত কামড়ে চুপচাপ বসে আছেন পুলিশ কমিশনার। পুলিশ কিছু করতে গেলেই ইনোসেন্ট দর্শকরা মারা পড়বে।

'স্টেজে বসা ডেলিগেটসরা চুপচাপ নেমে আসুন। চালাকি করলেই অভিয়েন্সরা এক এক করে মারা পড়বে।' কথাটি বলে স্টেজের দিকে এগোতে গেল এক টেররিস্ট। এই সময় কাঁধে গুলি লাগায় ধুপ করে পড়ে গেল সে। অন্য দুজন টেররিস্ট কিছু বুঝে ওঠবার আগেই পায়ে গুলি খেয়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল মাটিতে।

দর্শক আসনের আড়াল থেকে উঠে দাঁড়ালেন গর্ডনসাহেব। হাতে গাউডার দেওয়া অটোমেটিক পিস্তল। অন্য টেররিস্ট শুট করতে যেতেই অনেকগুলো গুলি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। দর্শক আসন থেকে কিছু বিশেষ লোকজনের পেছন থেকে উঠে দাঁড়ালেন সাদা পোশাকের বেশ কয়েকজন পুলিশ। প্রত্যেকের হাতেই বন্দুক। এদের মাঝেই ডিসিপি গাউডাকে দেখতে পেলেন কমিশনার সাহেব।

একলাফে স্টেজে উঠে পড়লেন গর্ডন। মাইক তুলে বললেন, 'এখন যে ছবিটা আপনারা স্ক্রিনে দেখছেন, সেটা একই হেলথ ড্রিংক কানেক্টিভেট-এর কুকুর এবং মানুষের ওপর প্রভাব। জিনিসটা স্ট্রেস কমালেও প্রায় তিরিশ শতাংশ লোকের মধ্যে অ্যান্টি সেরোটনিন একটা নিউরোপেপটাইডের জন্ম দিয়ে অ্যাগ্রেসন বাড়িয়ে দেয়। তাই অ্যাপটির মাধ্যমে এরা এর এফেক্ট মনিটরিং করেছে। যোগশালার সুযোগ নিয়ে আরও ডেটা পাওয়া সম্ভব হয়েছে। এতে করে সম্ভাব্য বেশ কিছু ক্রেতার হেলথ ডেটা আড়ালে মনিটর করেছে ওরা। অন্যের ব্যক্তিগত ডেটা ব্যবহার করেছে নিজের স্বার্থে। আসলে এটা চীনে অসফল হওয়া একটা হেলথ ড্রিংক যেটা ভারতের বাজারে ভারতীয় কোম্পানির মাধ্যমে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছে এরা। এতেই ইন্ধন জুগিয়েছেন তথাগত রাও বা সমরের মতো লোকেরা।'

'তথাগত রাও!' চমকে উঠে বললেন চিফ মিনিস্টার, 'কী বলছেন?'

'সরি টু সে স্যার, কথাটা সত্যিই। তথাগত সমরের সঙ্গে অনেকগুলো ভেঞ্চারে হাত মিলিয়েছিলেন, পরে বুঝতে পেরে তিনি সরে যেতে চান। তখন তাঁকে বাধ্য করা হয় আত্মহননের পথ বেছে নিতে। হেলথ ড্রিংক, ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিংয়ের কমিশন, এয়ারস্কি ড্রোন কোম্পানি এসবে একাধিক কমন বিদেশি অ্যাকাউন্টে মানি রোল করা হয়েছে। কৌশলে ডিফেন্সে ঢুকে চীনকে আমাদের সেন্সিটিভ ডেটা সাপ্লাই করাও ছিল এর মধ্যে একটা। আজকের হামলাটা কিন্তু টেররিস্ট হামলা নয়, যেই সাবজেক্টদের ওপর এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছিল তাদের ডেকে এনে টেররিস্ট হামলার অজুহাতে খতম করে প্রমাণ মেটানোই ছিল এর আসল উদ্দেশ্য।'

'আমার নাম বলছেন, কোনও প্রমাণ আছে?' বেশ রেগে বললেন সমর।

'আছে বইকি। একটা লাইভ ভিডিও কল করতে হবে।'

'একটা ভিডিও কল করে লার্জ স্ক্রিনে প্রোজেক্ট করলেন গর্ডন। স্ক্রিনে ফুটে উঠল কিরামি মঠ এর লামা গুয়াতোংয়ের ছবি। ওঁর পাশেই বসে তথাগতর ড্রাইভার গোবিন্দ। ওকে দেখেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন সমর।

'জি জিতেন ভাই' চিফ সেক্রেটারি জিতেন কুমারের দিকে সমর এগোতে যেতেই ইশারায় তাঁকে চুপ করতে বললেন জিতেনকে।

'কী অবাক লাগছে? পি সিং ছদ্মনামে হিমাচলে পালিয়ে যায় ও। ওকে খুন করতে সেখানে গিয়েছিল আপনার পাঠান স্নাইপার শুটার। কিন্তু এক অসামান্য সারমেয় সঙ্গীর জন্য প্রাণে বেঁচে যায় সে। গোবিন্দ নিজেই তথাগতর আত্মহত্যার দিন তার সঙ্গে দেখেছিল একজনকে। তোমার কাছে আর কোনও প্রমাণ আছে গোবিন্দ?'

'হ্যাঁ স্যার, সাহেবের লাইটার। আমি বলছি কী করতে হবে।'

কথামতো লাইটারটার পেছন দিক খুলে একটা বোতাম টিপতেই স্ক্রিনে প্রজেক্ট হল একটা ভিডিও। তাতে দেখা যাচ্ছে, নদীর ধার। সামনে একজনের বুক পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, অন্যজন যে তথাগত সেটা হাতের ঘড়ি দেখে বোঝা যায়। লাইটারটা হিডেন ক্যামেরা যেটা হাতে আছে। এই সময় হাতের আঙুল মটকালেন অন্যজন। আঙুলগুলো অদ্ভুত রকমের ফ্লেক্সিবল, ইলাস্টিকের মতো। উল্টোদিকে পুরো বেঁকে যায়।

'দেখুন, এই হচ্ছে তথাগতর শেষ দিনের ভিডিও। বিপরীতে বসা মানুষটির আঙুল দেখে অনুমান করা যায় ওটা আপনি। হাইপার মোবিলিটি অফ জয়েন্ট বলে একে। আর এতেও যদি বিশ্বাস না হয়, আরেকটা প্রমাণ তো আছেই। ওর মালিক এবং ভালোবাসার মানুষ গোবিন্দের প্রতি হওয়া অন্যায়ের প্রতিশোধ ও নেবেই।'

গাউডার ইশারায় একজন পুলিশ পার্সন এগিয়ে এলেন সামনে। তাঁর হাতে একটা লিশ, লিশটা যার গলায় বাঁধা যে সোজা চোখে তাকিয়ে আছে সমরের দিকে।

লিশ ছাড়তেই সে এক লম্বা লাফ দিয়ে পড়ল সমরের গায়ের ওপর। ওর চাপা গর্জন শুনে চুপ করে গেলেন সমর।

চিফ সেক্রেটারি জিতেন সরে যেতেই তার দিকে এগিয়ে গেল জিপসি।

'পার্টনারস ইন ক্রাইম, একটু আগেই আপনাকে ডেকেছিলেন সমর।' গর্ডনের কথা শুনে চমকে উঠলেন চিফ মিনিস্টার। চমকে উঠে বললেন, 'তুমি তাহলে অন্য পার্টি থেকে এই উদ্দেশে জয়েন করেছিলে জিতেন? চীন আর পাকিস্তানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দেশের বারোটা বাজাচ্ছ? ছিঃ, তোমার কড়া শাস্তি দরকার।'

গাউডার ইশারায় সমর এবং জিতেনকে নিয়ে গেল পুলিশ। ওদের প্রজেক্টে থাকা লোকজনকেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নেওয়া হল পুলিশি হেফাজতে। সানভি এতক্ষণ চুপচাপ ভিডিও তুলছিল। এবার এগিয়ে এল চিফ মিনিস্টারের বাইট নেওয়ার জন্য।

'ফ্যান্টাস্টিক!' ডিসিপি গাউডাকে ডেকে বললেন সেন্ট্রাল হোম মিনিস্ট্রির একজন, 'আপনার পদোন্নতির দিকটা আমি খেয়াল রাখব। কিন্তু এই অসামান্য সায়েন্টিস্ট ভদ্রলোকটি গেলেন কোথায়? ওঁকে তো কালটিভেট করতে হচ্ছে।'

এদিক ওদিক তাকিয়ে গর্ডনকে দেখতে পেলেন না গাউডা।

বাইরে গার্ডেনে এসে দেখেন সেখানে জিপসিকে নিয়ে বসে আছেন গর্ডন। তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে স্টেলা।

অনেক দূর থেকে বাইনোকুলারে সবটা দেখল স্নাইপার শুটার। রাইফেলের বাক্সটায় টোকা মেরে বলল, 'এ যাত্রা বেঁচে গেলে গর্ডন বোস। আমাদের যে এজেন্টকে তুমি ধরিয়ে দিয়েছিলে, তোমার মাধ্যমেই তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাব আমি।'

'কী ভাবছ আঙ্কেল?' স্টেলার কথায় মুখ তুলে তাকালেন গর্ডন।

'ভাবছি জিপসির কী হবে? ওকে তুমি রাখবে?'

'হ্যাঁ নিশ্চয়ই। ও আমার বাড়িতে খুব ভালো থাকবে।'

'গুড। চলো এগোন যাক।'

'আরে চললেন কোথায়? সি এম আপনাকে খুঁজছেন।' গাউডা এসে দাঁড়ালেন গর্ডনের সামনে।

'লজ্জায় মরে যাচ্ছি গাউডাসাহেব। দেশের লোকই যখন এমন কাজ করে, নিজের দিকে তাকালেও লজ্জা হয়। হাতে ক্ষমতা থাকলেই এত নীচে নামবে মানুষ?'

মাথা নেড়ে বললেন গাউডা, 'কী বলি বলুন তো! আইনের রক্ষক হিসেবে লজ্জা আমারও কম নয়। ওই স্নাইপার আজ এল না কেন সেটাই ভাবছি।'

'যথাসময়ে আসবে। আমি শিওর ওর অন্য উদ্দেশ্য আছে। আসি, ভালো থাকবেন।'

স্টেলাকে পাশে নিয়ে জিপসির লিশটা ধরে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন গর্ডন। মুগ্ধ হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন গাউডা। এই নির্লোভ কিন্তু অকুতোভয় মানুষটি তাঁর বন্ধু ভেবে গর্ববোধ করেন তিনি। এও জানেন কোনও কুচক্রী মন্দব্যূহ যখনই দেশকে ঘিরে ফেলতে চাইবে, ঢাল হয়ে দাঁড়াবেন গর্ডন। 'বোস' যে রুখে দাঁড়াবারই নাম।

'For the Powerful, Crimes are those, which others commit.'

অলংকরণ: ডিজী

যম দুয়ারে পড়ল কাঁটা

দীপান্বিতা রায়

মা, দুব্বো তুলে এনেছি। কোথায় রাখব?

মশলা বাটতে বাটতেই গলা তুলে কমলা বলল, ঠাকুরের সামনে পিতলের থালাটা মেজে রেখেছি। ওতেই গুছিয়ে রাখ।

বেলপাতাও কি পেড়ে আনব মা?

ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। বেলগাছে মোটা মোটা কাঁটা। কাল বিকেলেই আতর এক বোঝা পাতা পেড়ে রেখে গেছে। তুই বরং সাজিটা নিয়ে মণিপিসিদের বাগান থেকে চারটি ফুল তুলে নিয়ে আয়।

এক্ষুনি যাচ্ছি মা।

ঠাকুরের ফুল, তাই ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচাতে সাজি দেওয়ালের পেরেক ঝোলানো। তাই উঠতে যাচ্ছিল কমলা। কিন্তু ততক্ষণে ছোট জলচৌকিখানা ঠেলে এনে তার ওপর চড়ে সাজি পেড়ে ফেলেছে রুমকি। ছুট লাগানোর আগে মায়ের দিকে ফিরে বলল, আমি কিন্তু ভোরবেলায় উঠে ঘাস

থেকে শিশির নিয়ে বাটিতে রেখেছি। চান করে চন্দন বাটব।

মেয়ের পাকাবুড়ির মতো হাবভাব দেখে হেসে ফেলল কমলা। অন্যদিন সকালবেলা ডেকে ডেকে তুলতে হয়। ঘুমচোখে দাঁত মাজতে বসে যখন, দেখে মনে হয়, এই বুঝি ঢুলে পড়ে যাবে। এমন অকাতরে ঘুমোয় যে একেকদিন মায়াই লাগে, মনে হয় ডাকব না, আর একটু শুয়ে থাক। কিন্তু এদিকে আবার মর্নিং ইস্কুল। ভোরবেলা না উঠলে চলবে না। ক্লাস ফাইভ হলে তবে বেলায় যাওয়া। তার এখনও ঢের দেরি। আজ দ্যাখো, ডাকতেও হয়নি।

মশলা বাটা শেষ করে শিল ধুতে ধুতে কমলা ভাবছিল, মেয়েকে আর কী বলবে। সে নিজেও তো কদিন ধরে একটু একটু করে সব জোগাড়যন্ত্র করেছে। আয়োজন সামান্য। তাদের মতো ঘরে কী আর এমন ধুমধাম হবে। কিন্তু তবু খুঁত যেন না থাকে। ভরনের থালা-বাটি-গেলাস সব তেঁতুল দিয়ে মেজে ঝকঝকে করে রেখেছে। প্রদীপ, তেল, সলতে গুছিয়ে নিয়েছে। ট্রাঙ্ক থেকে রুমকির ঠাকমার হাতে বোনা দুখানা আসন বার করা হয়েছে। ফাট না ধরা কলাপাতায় নিজের হাতে কাজল পেড়ে, অল্প ঘি দিয়ে মেড়ে কাজললতায় তুলে রেখেছে। রুমকির বাবাকে দিয়ে কপ্পুর আর মধু আগেই আনিয়ে রেখেছিল। সেসবও গোছানো আছে। বাকি শুধু রান্না। তাও সকাল সকাল উঠে অনেকটাই এগিয়ে নিয়েছে কমলা। তোলা উনুনে পায়েসের দুধ ফুটছে। আতর আর রুমকি দুজনেই মাছের ভক্ত। তাছাড়া শুভদিনে বাড়িতে মাংস ঢোকাতে চায়ও না কমলা। এছাড়া ডাল, শুক্তো, ভাজা...ভাবতে গিয়েই কমলার মনে হল আরে পাঁচরকম ভাজা দিয়ে তো ভাতের থালা সাজাতে হবে।

লাগোয়া পটলের মাচা। পাতা ছিঁড়তে গিয়ে চোখে পড়ল ঠুকঠুক করে লাঠি ঠুকে মনসুর মিঞা আসছে। বুড়ো হয়েছে। চোখে ভালো দেখে না। তবু পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ পড়া চাই। কমলাকে দেখতে পেয়ে একগাল হাসল মনসুর মিঞা, ভালো আছিস বউ? সমুর শরীল-গতিক সব ঠিক আছে তো? কদিন যেন দ্যাখলাম না...

মনে মনে হাসে কমলা। এদিকে চোখে দেখতে পায় না। ওদিকে আবার সবদিকে নজর। রুমকির বাবা কদিন ছিল না। ঠিক খেয়াল করেছে।

শরীর ঠিক আছে গো চাচা। কাজে গেছিল।

ঘাড় নাড়ে মনসুর মিঞা, ভালো ভালো। কাম-কাজে থাকা ভালো। নাহলেই যত্ত সব বদ চিন্তা মাথায় ঘোরে। কটা কাঁচালঙ্কা দে দিকি বউ, মুড়ি দিয়ে খাব...।

গাছ থেকে তাজা সবুজ কয়েকটা লঙ্কা আর একটা শশাও পেড়ে দিতে, সেগুলো নিয়ে আবার রওনা দেয় মনসুর মিঞা। মসজিদ থেকে আজানের সুর শোনা যাচ্ছে। রোজই শোনা যায়। লা-ইলা-হা ইল্লাল্ললাহু- মুহম্মাদুর-রাসুলুল্লাহ...চেনা কথা, চেনা সুর। কিন্তু তাও যে কীভাবে অচেনা হয়ে উঠতে পারে জানে কমলা। জানে মনসুর মিঞাও।

ঘটনাটা শুরু হয়েছিল ওই আজান দেওয়া থেকেই। তবে সব শুরুরই তো একটা আগের গল্প থাকে। আঙুলের কর গুনে হিসেব করল কমলা। চার বছর হয়ে গেল। রুমকি তখন কোলে, দুই পোরেনি। সেবছর বর্ষা এসেছিল খুব দেরিতে। আষাঢ়ের মাঝামাঝি হয়ে গেল, আকাশে মেঘের দেখা নেই। ধানের বীজতলা মাঠেই শুকিয়ে কাঠ। রেডিওর খবরে নাকি বলে দিয়েছে এবছর অজন্মা হবেই। বর্ষার আসতে এখনও ঢের দেরি। সবার মন-মেজাজ খুবই খারাপ। এমন সময় শোনা গেল হরু ঠাকুর নাকি বিধান দিয়েছে বরুণ যজ্ঞ করলে বৃষ্টি হবেই। কথাটা অবশ্য হরুঠাকুর নিজে ঠিক বলেনি। বলেছে তাঁর শালা। শালা দু-তিনজন বন্ধু নিয়ে মাঝে-মধ্যে এসে হরু ঠাকুরের বাড়িতে থাকে। সে নাকি নানারকম মন্ত্রতন্ত্র জানে। শহরে ব্যবসা আছে। গ্রামে এলেই পাড়ার জোয়ান ছেলেপুলেরা তার সঙ্গে গিয়ে জোটে। নানারকম খাওয়া-দাওয়া হয়। শালার নাম প্রমোদ। সেই প্রমোদদা যজ্ঞের কথা বলেছে শুনেই লাফিয়ে উঠল সবাই। যোগাড়-যন্ত্র সব প্রমোদ আর তার শাকরেদরা মিলে করবে। তন্ত্রধারক হবে হারু ঠাকুর। কারণ এই যজ্ঞে যেখানে বৃষ্টি দরকার সেই এলাকায় জন্ম নিয়েছে এমন কাউকে তন্ত্রধারক হতে হয়। কিন্তু খুব কম করে হলেও অন্তত দশ হাজার টাকা লাগবে।

টাকার অঙ্কটা শুনে গ্রামের ছেলে-ছোকরারা প্রথমে একটু ঘাবড়ে গেলেও তারপর আলোচনা করে ঠিক হল, চাঁদা তুলে কাজটা করে ফেলা দরকার। গ্রামের সব ব্যাপারে যাঁদের মাথা দেওয়া স্বভাব তাঁদের মধ্যে পরাণ ঘড়াইয়ের জায়গা-জমির সঙ্গে একখানা মুদিখানার দোকানও আছে। তিনি নিজে থেকেই হাজার দুয়েক টাকা দেবেন বলে জানিয়ে দিলেন। কিন্তু ঝামেলা শুরু হল অন্যজায়গায়। বরুণযজ্ঞের কথা তুলতেই মুসলমান পাড়ার মোড়ল আলতাফ আলি সাফ বলে দিলেন যজ্ঞের জন্য টাকা তাঁরা দেবেন না। যজ্ঞ করে বৃষ্টি নামানো যায়, এরকম কথা তিনি বাপের জন্মে শোনেননি। এতগুলো টাকা খামোখা দিতে তিনি রাজি নন। দেখা গেল মুসলমান পাড়ার অধিকাংশ মানুষই আলতাফের সঙ্গে একমত। শুধু মুসলমান পাড়া নয়, হিন্দুপাড়ারও যারা গরিব চাষি, তাদেরও টাকা দেওয়ার মোটেই ইচ্ছে নেই। হরু ঠাকুরের রোয়াব খুব। তাকে সবাই একটু সমঝে চলে। তার শালাও হাট্টাকাট্টা জোয়ান। তাই প্রথমটায় অনেকেই মনে মনে আপত্তি থাকলেও বলতে সাহস পাচ্ছিল না। আলতাফ আপত্তি তোলায় তারাও সুর ধরল। তর্কাতর্কি, গন্ডগোলে মিটিং গেল ভেস্তে।

প্রমোদ রেগে আগুন হয়ে বলল,কিছু অবিশ্বাসী লোকের জন্য গোটা গ্রামের মানুষকে ভুগতে হবে। যজ্ঞ না করলে বর্ষা আসবে না।

তারপর থেকেই কেমন যেন একটা গুমোট পরিবেশ। কমলাদের এই ভানইপাড়া গ্রামে হিন্দু-মুসলমান দু'ধরনের মানুষই বাস করে। পাড়া অবশ্য আলাদা। তবে মিলমিশ আছে। নদীর ধারে গ্রাম। বেশিরভাগ মানুষই গরিব। চাষবাস করে খায়। যাদের নিজেদের জমি নেই, তারা অন্যের জমিতে জন খাটে। এছাড়া নদীতে মাছ ধরে কিংবা আরও নানারকম টুকটাক কাজকর্ম করেও কিছু রোজগার হয়। সদর শহর অনেকটা দূরে। একটা ইস্কুল আর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র গ্রামেই আছে। তাতেই চালিয়ে নেয় সবাই। এলাকায় দুগ্গাপুজো একটাই। পালপাড়ার অশ্বিনী পালের বাড়ির পুজো। তাদের অবস্থা একসময় ভালো ছিল। এখন পড়ে গেছে। কোনওরকমে টিমটিম করে পুজোর আয়োজন। গ্রামের লোকেরা নিজেদের উদ্যোগেই কিছু কিছু সাহায্য করে। মণ্ডলদের বড় ছেলে বাইরে ভালো চাকরি করে। মাসে মাসে টাকা পাঠায়। পুজোর চারদিন ভোগের চাল-ডাল, ভুজ্যি যা লাগে সব, তার বাবা মানিক মণ্ডল কিনে দেন। মনসুর মিঞার প্রতিবেশি হাসেম আলিও অবস্থাপন্ন। খামারে বড় ধানের গোলা। দুধেলা গরুও আছে গোটা দুয়েক। সেবছর পুজোর প্রসাদ এত কম ছিল যে ছেলেপুলে খেতে পায়নি। জানতে পেরে পরের বছর থেকে হাসেম আলি নিজেই ষষ্ঠীর সকালে বস্তা ভর্তি ফল এনে পালবাড়ির রোয়াকে নামিয়ে দিয়ে যায়। বাড়িতে অসুখ-বিসুখ হলে সবাই পীরের দরগায় ঢিল বাঁধে। ঈদের দিনে নমাজের পর

নদীতে বাইচ খেলা হয়।

এরকমই চলছিল। বিয়ে হয়ে এসে থেকে এমনটাই দেখে এসেছে কমলা। কিন্তু সেই মিটিংয়ের পরেই সব বদলে গেল। হঠাৎ মনে হতে লাগল গ্রামের মধ্যে যেন দুটো আলাদা দ্বীপ তৈরি হয়ে গেছে। ওপর ওপর কিছু বোঝা যায় না। কিন্তু কমলা বুঝতে পারত। তাদের তিনটে বাড়ি পরে পুতুলদের দু-চালার ঘর। বাড়িতে রাধাগোবিন্দের ছোট মূর্তি আছে। সকালের পুজোপাঠ সারা হলে পুতুলের ঠাকুমা ছোট নাতিটাকে কোলে নিয়ে গিয়ে বসত শান বাঁধানো বটতলায়। চারখানা বাতাসা আঁচলের খুঁটে বেঁধে নিয়ে যেত। রাবেয়ার নানিও আসত একবছরের নাতনিকে নিয়ে। বাচ্চাদুটোর হাতে বাতাসা ধরিয়ে দিয়ে দিব্যি বসে সুখ-দুঃখের গল্প করত দুই বুড়ি। দুই বুড়ির সেই গল্পের আসরটা ভেঙে গেছে। পুতুলের ঠাকুমা দুদিন গিয়ে বসেছিল। রাবেয়ার নানি আসেনি।

গ্রামের একপাশে একটা খেলার মাঠ আছে। তার গায়েই ইস্কুল বাড়ি। স্কুলের ছুটির পর হইহই করে ছেলেরা সেখানে বল খেলে। হায়দার খুব ভালো গোলকিপার। সে দাঁড়ালে নাকি গোলে ছুঁচ ঢুকতে পারে না। আবার নন্টা পায়ে পায়ে বল নিয়ে কোন ফাঁকে যে গোলে বল ঢোকায় কেউ টের পায় না। কমলাদের বাড়ির সামনে দিয়েই রাস্তা। ক'দিন ধরেই খেয়াল করছিল ছেলেদের খেলা যেন ঠিক জমছে না। চেঁচামেচি, হাসাহাসি কম। সকাল সকাল সবাই বাড়ি ঢুকে যাচ্ছে। কারণটা বোঝেনি। ক'দিন ধরেই কাশি হচ্ছিল কমলার। সারছে না। তাই গ্রামের একেবারে শেষ মাথায় খুন্তি বুড়ির বাড়িতে বাসক পাতা তুলতে গিয়ে অবাক। মুসলমান পাড়ার শেষে নদীর ধার দিয়ে কিছুটা খোলা জায়গা আছে। ঝোপ-ঝাপ, আগাছায় ভর্তি। সেই মাঠখানা সাফ-সুতরো করা হয়েছে। একদিকে একটা গোল পোস্ট। বেশ কয়েকটা ছেলে খেলছে। তাদের মধ্যে হায়দারও রয়েছে। কমলাকে দেখে হায়দার চোখ নামিয়ে চলে গেল।

বাসক পাতা পাড়তে পাড়তে খুন্তি বুড়ি বলল, কী যে আজকাল হয়েছে বউ, কিছুই বুঝি না। এজায়গা ভালো নয়। তিন-তিনটে বেল গাছ। নদীর ওপারে আবার শ্মশান। কখন কার হাওয়া লেগে যাবে কেউ বলতে পারে? মাঠ পরিষ্কার করাচ্ছিল কাশেম। তাকে বললাম, কিন্তু সে কানেই নিল না।

রুমকির বাবা ইস্কুলে পড়ায়। তার কাছে জানা গেল আলতাফ, হায়দারদের সঙ্গে আজকাল নাকি আর সমীর, তপনরা এক বেঞ্চে বসে না। রাবেয়াকে একদিন নিজেই দেখল শুকনো মুখে একা একা স্কুল থেকে ফিরছে। ঠিক পিছনেই পুতুলরা আসছে গল্প করতে করতে। কী যে হচ্ছে বুঝতে পারছিল না কমলা। শুধু অস্বস্তি হচ্ছিল সারাক্ষণ। প্রমোদ ক'দিনের জন্য শহরে গিয়ে আবার ফিরে এসেছে। হরু ঠাকুরের বাড়িতে আজকাল রোজই নাকি অনেক রাত পর্যন্ত দরজা বন্ধ করে গ্রামের ছেলেরা বসে মিটিং করে।

গন্ডগোলটা বাধল আষাঢ় মাসের সংক্রান্তির দিন। বৃষ্টি তখনও হচ্ছে না। রোদের তেজে চারদিক জ্বলেপুড়ে খাক। মসজিদে সেদিন বিশেষ নমাজের ব্যবস্থা হয়েছিল। বৃষ্টির জন্য আল্লার কাছে দোয়া চাইবেন মৌলবী সাহেব। কিন্তু সেই নমাজের সময় থেকেই শুরু হল গণ্ডগোল। নমাজ শুরু হতেই কারা নাকি চোঙাটা ঠিক মসজিদের দিকে ঘুরিয়ে খুব জোরে মাইকে হিন্দি গান বাজাতে শুরু করে দেয়। সেই রাগে, সেদিনই সন্ধের মুখে পাশের গ্রামে কাজ সেরে ফিরছিল জেলে পাড়ার পরাণ, আলের ধারে কাশেমরা তিন-চারজন মিলে তাকে মারধর করল। সে ফিরে এসে খবর

দেওয়ামাত্র শুরু হয়ে গেল সাংঘাতিক গণ্ডগোল। দু-পক্ষের ছেলেরাই লাঠি-সোঁটা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। দুম-দাম বোম পড়তে লাগল। কমলা তো ভয়ে কাঁটা। রুমকিকে কোলের মধ্যে চেপে ধরে ভয়ে কাঁপছিল। রুমকির বাবাকে কিছুতেই বেরোতে দেয়নি।

মাঝরাতে গন্ডগোলে ঘুম ভেঙে দেখল আকাশে আগুনের শিখা। গ্রামের পশ্চিমদিকে মিশির আলিদের কুঁড়েঘরগুলো জ্বলছে। পরের সারাদিনই শোনা গেল রণহুঙ্কার। রাতে পুড়ে ছাই হয়ে গেল কৈর্বতপাড়ার চার-পাঁচটা ঘর। পরদিন পুলিশ এল। দুপক্ষেরই বেশ কয়েকজনকে ধরে নিয়ে গেল। আশ্চর্যের ব্যাপার প্রমোদ ঠাকুর কিংবা হরু ঠাকুরের কিন্তু দেখা পাওয়া গেল না। মধ্যে তারা যে কোথায় হাওয়া হয়ে গেল কেউ জানে না।

কিন্তু পুলিশের ভয়ে চুপচাপ হলেও গন্ডগোল মিটল না। চাপা রাগ তুষের আগুনের মতো জ্বলতে লাগল। ইতিমধ্যে রেডিয়োর ভবিষ্যৎ বাণী অনুযায়ী সত্যি করে বর্ষা নেমেছে। মাঠে নতুন করে চারা বসিয়ে শুরু হয়েছে ধান রোয়ার কাজ। লোকের ব্যস্ততা বেড়েছে। কিন্তু গ্রামের পরিবেশ স্বাভাবিক হয়নি। দু-পাড়ারই মানুষ পরস্পরকে এড়িয়ে চলে। কমলার সঙ্গে কত সুখ-দুঃখের কথা বলত আমিনা। তার আম্মা যখন মরে গেল কমলার কাছে এসে কত কেঁদেছিল। সেই আমিনাই এখন রাস্তা-ঘাটে দেখা হলে চোখ নামিয়ে নেয়। কমলা নিজেও পারে না এগিয়ে গিয়ে কথা বলতে। সূয্যি ডুবলেই সেই ভয়-ভয় ভাবটা বাড়ে। গ্রামদেশে এমনিতেই সন্ধের পর মানুষজন আর বিশেষ বাইরে বেরোয় না। কিন্তু ইদানীং বড় তাড়াতাড়ি রাস্তাঘাট শুনশান হয়ে যায়।

সে বৃষ্টিও ছিল অদ্ভুত। শ্রাবণের গোড়ায় শুরু হল, আর থামেই না। মাঠ-ঘাট ভরে গেল। নদীর জল বাড়তে লাগল। নদীর ধারে যাদের বাড়ি বর্ষায় তাদের উদ্বেগ থাকেই। কিন্তু সেবছর আর সর্বনাশ আটকানো গেল না। সকাল থেকেই খবর আসছিল নদীর জল পাড় ছুঁয়ে ফেলেছে। কমলা উঁচু করে রাখা চৌকিতে জিনিসপত্র তুলে রাখছিল। রুমকির বাবা জরুরি কাজে শহরে গেছে। ফিরতে রাত হবে। বাড়িতে মেয়ে নিয়ে সে একা। বাগানের জল ইতিমধ্যেই চৌকাঠ ছুঁয়ে ফেলেছে। এমন সময় ছপছপ করে এসে হাজির মোতির মা। নীচু গলায় বলল, খবর শুনেছ তো বউ?

কী?

এবার আমাদের পঞ্চায়েতের আপিসে আর থাকার জায়গা হচ্ছে না। ইস্কুলবাড়িতে থাকব।

ফ্যালফ্যাল করে তাকায় কমলা। মোতির মা ঝাঁঝিয়ে ওঠে, বুঝলে না কিছু! ওপাড়ার লোকজন পঞ্চায়েত আপিসের দখল নিয়ে নিয়েছে। আমরা কেউ ওদিক পানে গেলে নাকি ঠেলে জলে ফেলে দেবে। সোজা গিয়ে ইস্কুল বাড়িতে উঠবে। রুমকির বাপকেও বলে দিও।

বৃষ্টি থামার কোনও লক্ষণ নেই। রাস্তা-ঘাট সব ডুবে গেছে। রুমকির বাবা ফিরতে পারেনি। সারারাত মেয়ে কোলে বসে আছে কমলা। বাইরে ভীষণ শব্দে বৃষ্টি। মাঝে মাঝে আকাশের বুক চিরে দিচ্ছে বিদ্যুতের আলো। একসময় বোধহয় একটু ঢুল এসে গেছিল। হঠাৎ শব্দে চমকে উঠে কমলা দেখল হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে আসছে জল। গোড়ালি ছুঁয়ে ফেলেছে। মেয়েকে আর দু-একটা জিনিস নিয়ে তালা লাগিয়ে বেরোতে-বেরোতেই জল হাঁটু ছুঁয়ে ফেলল। ভোর হচ্ছে সবে। বৃষ্টির পর্দা ভেদ করে ছানা ধোয়া জলের মতো খুব হালকা একটু আলো ফুটেছে। চারিদিক শুনশান। গ্রামে যে কোনও মানুষ আছে তাই বোঝা যাচ্ছে না। জল ঠেলে প্রাণপণে এগোয় কমলা। মুহূর্তে মুহূর্তে বাড়ছে জলের স্তর। বাড়ছে স্রোতের টান। পঞ্চায়েতের আপিসটা দেখা যাচ্ছে। একহাতে প্রাণপণে মেয়েকে আঁকড়ে কোনওরকমে সে পৌঁছায় সাদা বাড়িটার কাছে। দেওয়াল ধরে দাঁড়িয়ে হাঁফ ছাড়তে গিয়েই খেয়াল করে বসে থাকা মানুষগুলো কেমনভাবে যেন তাকিয়ে আছে তার দিকে। চমকে ওঠে কমলা। মনে পড়ে যায় মোতির মায়ের সাবধান বাণী। কী সর্বনাশ! তার তো ইস্কুল বাড়িতে যাওয়ার কথা। কিন্তু অতখানি রাস্তা এই জল ঠেলে সে যাবে কী করে? এরা যদি তাকে জলে ঠেলে ফেলে দেয়? ভাবতে গিয়েই মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে গেছিল কমলা।

ঝপাস করে একটা শব্দ। চমকে উঠে কমলা দেখল কোল থেকে রুমকি পড়ে গেছে জলে। প্রবল স্রোতে ভেসে যাচ্ছে তার একমাত্র সন্তান। আর্তনাদ করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল কমলা, কিন্তু কার যেন দুটো হাত শক্ত করে ধরে ফেলল। কমলা দেখল আর একটা মানুষও ঝাঁপিয়ে পড়ছে জলে। প্রবল স্রোতের টান উপেক্ষা করে এগিয়ে যাচ্ছে রুমকির দিকে। ওই যে ধরে ফেলেছে রুমকিকে। ছাদে-বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা সবাই একসঙ্গে চেঁচাচ্ছে। আরও বেশ কয়েকজন লাফিয়ে পড়েছে জলে। কমলার মাথাটা ঘুরে গেল। সে কোনোমতে দেওয়াল ধরে সামলে নিল নিজেকে।

রুমকিকে নিয়ে উঠে এল ওরা। মেয়েকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে পেটে চাপ দিতেই জল বেরিয়ে এল। মুখে মুখ দিয়ে শ্বাসবায়ু ভরে দিচ্ছে আরেকজন। কেঁদে উঠল রুমকি। সহর্ষ একটা চিৎকার। দৌড়ে এক গ্লাস দুধ নিয়ে এসেছে কেউ। গামছা দিয়ে মেয়েকে মুছিয়ে দিচ্ছে আর একজন। এমন সময় উঠে দাঁড়াল ছেলেটা। আপাদমস্তক ভেজা শরীর থেকে জল গড়িয়ে নামছে। হাসল কমলার দিকে তাকিয়ে। আতর, আতারউদ্দিন আলি।

কি গো বুন, তোমার রান্না হল?

ফতিমাবিবির গলা শুনে হেঁশেল থেকে বেরিয়ে এল কমলা।

হ্যাঁ গো দিদি, রান্না তো শেষ। শুধু বড়াগুলো ভাতের পাতে গরম গরম ভেজে দেব। ফল-মিষ্টি সব রুমকির বাবা কালই এনে রেখেছে। কিন্তু আতর তো এখনও এল না। বারোটায় দ্বিতীয়া ছেড়ে যাবে তো।

ও নিয়ে তুমি ভেবোনি। তোমার ছেলে ঠিক সময়ে চলে আসবে। সে বাপের সঙ্গে হাটে গেছে। বুনের জন্য পছন্দমতো একখানা ফরক কিনবে।

বলতে বলতেই হুড়মুড় করে সাইকেল নিয়ে এসে পড়ল আতর। ছেলেকে তাড়া দিল ফতিমাবিবি, যা-যা, চট্‌ করে পুকুর থেকে চান করে আয়। তোর কাচা জামা আমি নিয়ে এসেছি। চান না করে ফোঁটা নেওয়া চলবেনি।

স্নান সেরে, জামা-কাপড় পরে পরিপাটি আসনে বসল আতর। রুমকিকেও একখানা সুন্দর জামা পরিয়ে, চুলে ঝুঁটি বেঁধে সাজিয়ে দিয়েছে তার মা। বাটিতে চন্দন, কাজল, থালায় সাজানো আশীর্বাদের ধান-দুব্বো। ফল-মিষ্টি সাজানোর ফাঁকে প্রদীপ জ্বেলে দিল ফতিমাবিবি। দাদার সামনে বসে বাঁহাতের কড়ে আঙুল চন্দনে ডুবিয়ে ফোঁটা দিচ্ছে রুমকি। কচি গলায় বলছে মন্ত্র,

ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা
যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা...

ছায়া মানুষের আতঙ্ক

অনন্যা দাশ

জ্যাকই প্রথম আমাকে ছায়া মানুষের কথা বলেছিল। আমি তখন ওদের ক্লাসে নতুন। কাউকেই চিনি না। দারুণ হীনমন্যতায় ভুগছি। বাবার চাকরিসূত্রে মার্কিন মুলুকের এই জায়গাটাতে আসা আমাদের। স্কুলে কালো বা বাদামি চামড়ার কেউ নেই বললেই চলে। আমার নিজেকে কেমন যেন আলাদা জগতের মানুষ বলে মনে হতো।

ক্লাসে জ্যাক আমার পাশে বসত। জ্যাকই প্রথম আমার দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। আর জ্যাকের বন্ধু সাইমন, তাই সাইমনও আমার বন্ধু হয়ে গেল। একসঙ্গে দু-দুটো বন্ধু পেয়ে আমি এত খুশি হয়েছিলাম যে বলবার নয়। আর আমার খুশিতে মা-বাবাও খুশি হয়েছিল।

খুব তাড়াতাড়ি আমি বুঝে গেলাম যে, জ্যাক এবং সাইমন কেউই পড়াশোনায় খুব একটা ভালো নয়। ওদের যে বুদ্ধি কম তা নয়, পড়াশোনা করতে নাকি ওদের ভালো লাগে না। তা না লাগুক, সে সব নিয়ে তখন আমি মাথা ঘামাইনি। খেলাধুলোতেও ওদের মন নেই। তাতেও আমার কিছু যায় আসে না, কারণ আমি নিজেও খেলাধুলো খুব একটা করি না।

ছবিঃ কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল
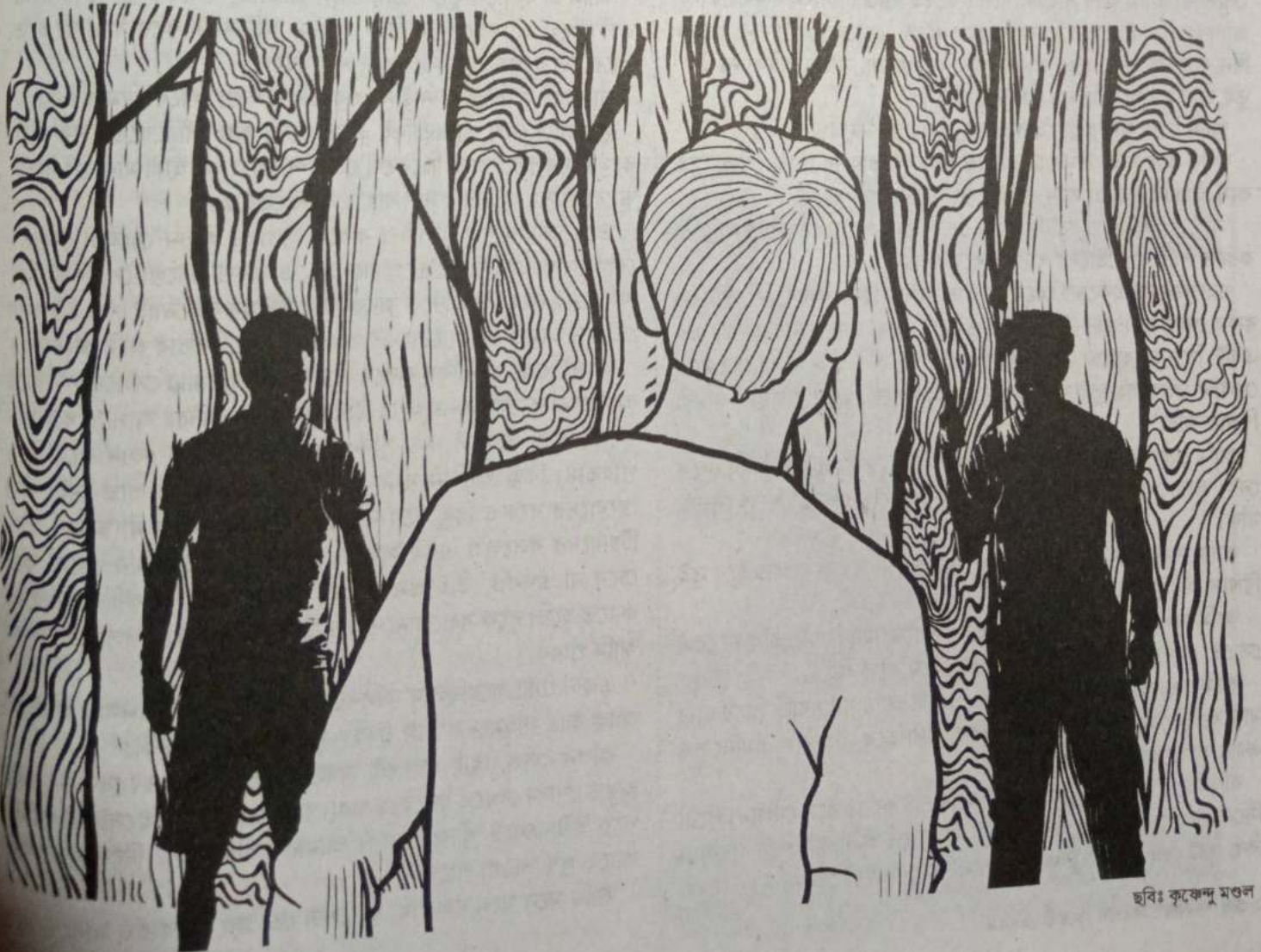
আসলে ছোটবেলায় একটা অপারেশানের জন্যে আমার একটা পা অন্য পায়ের চেয়ে একটু ছোট তাই আমার স্পেশাল জুতোগুলো না পরলে আমাকে একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই হাঁটতে হয়। অসুবিধা কিছু হয় না। আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। মাঝেসাঝে কেউ কেউ আমাকে লেংড়ু বলে ডাকে কিন্তু তাও আমার সয়ে গেছে। আমি আর কিছু মনে করি না। প্রথম প্রথম কষ্ট হতো কিন্তু এখন তাও হয় না। ওটাও আমার নামের মতন একটা নাম হয়ে গেছে।

তা ওই যা বলছিলাম, ছায়া মানুষ। আমি ছায়া মানুষ সম্পর্কে খুব একটা কিছুই জানতাম না। জ্যাক আর সাইমনের সঙ্গে আলাপ হওয়ার আগে আমি ভিডিও গেমটেম তেমন খেলতাম না। কমিকস বইও তেমন পড়তাম না। তাই ছায়ামানুষ সম্পর্কে আমার কোনও ধারণাই ছিল না। আমাদের বন্ধুত্ব হওয়ার পর একদিন জ্যাক বলল, 'আজ বিকেলে আমার বাড়িতে আসবি? তাহলে তোকে একটা জিনিস দেখাব।'

আমার মায়ের কড়া নির্দেশ—যেখানেই যাই না কেন বাবা অফিস থেকে ফেরার আগে আমার বাড়ি ফেরা চাই। বাবার ফিরতে ফিরতে সাড়ে ছ'টা-সাতটা হয়। আর আমি স্কুল থেকে ফিরি চারটে নাগাদ তাই কিছুটা সময়ের জন্যে জ্যাকের বাড়িতে যাওয়া যেতেই পারে। তাই অনেক ভেবেচিন্তে আমি বলে দিলাম, 'ঠিক আছে যাব, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারব না।'

স্কুলের পর সেদিন বাড়ি ফিরে খাওয়াদাওয়া সেরে গেলাম জ্যাকের বাড়ি। গিয়ে দেখি সাইমনও রয়েছে সেখানে। জ্যাকের মা-বাবা কেউ তখন বাড়িতে নেই। তাঁরা দুজনেই চাকরি করেন। রাত করে ফেরেন।

জ্যাক আমাকে ওর ঘরে নিয়ে গেল। ঘরে একটা সিঙ্গেল বেড, পড়ার টেবিল আর চেয়ার ছাড়া তেমন কিছু নেই। কিন্তু দেওয়াল জোড়া নানা পোস্টার। আমি আর সাইমন ঘরে ঢুকতেই দরজাটা সটান বন্ধ করে দিল জ্যাক। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোকে একটা কথা অনেক দিন ধরে জিগ্যেস করব ভাবছিলাম কিন্তু ক্লাসে সাহস হচ্ছিল না ঠিক। তুই ছায়া মানুষকে চিনিস? বিশ্বাস করিস?'

আমি বেশ অবাক হয়েই বললাম, 'কে ছায়া মানুষ?'

জ্যাক আর সাইমন মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তারপর জ্যাক বলল, 'তুই কার্স অফ দা শ্যাডো ম্যান খেলাটা খেলিসনি কখনও?'

'না তো। কী খেলা সেটা? আমি তো পায়ের জন্যে তেমন খেলাধুলো করতে পারি না, তোদের আগেই বলেছিলাম।'

ওরা দুজনেই একচোট হেসে নিল, তারপর সাইমন বলল, 'না, এটা সে রকম খেলা নয়। এটা একটা ভিডিও গেম। এতে ছায়া মানুষ আছে। ওর একটা সিনেমা আছে। সেটা দেখলে আর ওই কার্স অফ দা শ্যাডো ম্যান খেলাটা খেললেই তুই বুঝতে পারবি যে শ্যাডো ম্যান আছে। আমরা বিশ্বাস করি।'

আমি হেসে বললাম, 'তা বেশ তো। আমিও তাহলে সিনেমাটা দেখে নেব। আর খেলাটা নিশ্চয়ই তোর আছে, তাহলে এখনই খেলে নেওয়া যাক।'

জ্যাক বেশ জোর দিয়ে বলল, 'না, না। আগে তোকে বলতে হবে তুই বিশ্বাস করিস কিনা।'

আমি দেখলাম, এ তো মহা মুশকিল! শ্যাডো ম্যান যেই হোক না কেন সে তো এদের মাথাগুলো একেবারেই খেয়ে বসে আছে।

আমি বললাম, 'ঠিক আছে। আজ তাহলে আমি যাই। বাড়ি গিয়ে ছায়া মানুষের সিনেমাটা দেখি। কাল আবার কথা হবে, কেমন? এমনিতেও এবার আমাকে ফিরতে হবে।'

বাড়ি ফিরে ল্যাপটপ খুলে শ্যাডো ম্যান সার্চ করতে বসে গেলাম। পুরো সিনেমাটা পেলাম না, প্রচুর কপিরাইট সমস্যাতে আটকে দিচ্ছিল বারবার। কিন্তু ছোট ছোট অনেক টুকরো পেলাম বিভিন্ন সাইটে। গুগল সার্চ করেও পড়ে দেখলাম। তারপর যেটা বুঝলাম সেটাতে আমার গায়ের সব লোম খাড়া হয়ে গেল। শ্যাডো ম্যান একজন ভূত, আত্মা—না না, সে যে ঠিক কী কোথাও ভালো করে বলা নেই। হবেই বা কী করে, সেটা তো একজন কমিকস লেখক ও আর্টিস্ট যুগলের সৃষ্টি। তাঁরা বলে দেননি তাই কেউ জানেও না সে কে, সে কী। সব থেকে বড় ব্যাপার হল ছায়া মানুষ তাকে বা তাদেরকে শেষ করে দেয় যারা ওর কথা বিশ্বাস করে না। ছায়া মানুষ সব সময় বলে চলেছে, 'যারা আমার কথা বিশ্বাস করে না আমাকে মানতে পারে না তাদের আমি শেষ করে দিই।' ইংরেজিতে—'আই কিল দা ডিসবিলিভার্স'।

ওই টুকরো টুকরো গল্প পড়েই আমার গা-হাত-পা কাঁপছিল। কী ভয়ঙ্কর! জ্যাক আর সাইমন একে পুজো করে।

পরদিন স্কুলে এক ফাঁকে জ্যাক আমাকে জিগ্যেস করল, 'কী রে সিনেমাটা দেখলি?'

আমি অম্লানবদনে মিথ্যে কথা বলে দিলাম, 'হ্যাঁ রে, দেখেছি। দারুণ লেগেছে আমার।'

জ্যাক এবার আমাকে চাপা গলায় জিগ্যেস করল, 'তাহলে তুই ছায়া মানুষকে বিশ্বাস করিস?'

আমি ততক্ষণে বুঝে গেছি অবিশ্বাস করলে আমার কী পরিণতি হবে, তাই আমি আবার মিথ্যে কথা বলে দিলাম, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, একশোবার। কেন, তুই করিস না?'

জ্যাক হাসল, তৃপ্তির হাসি। বলল, 'হ্যাঁ, করি। খুবই করি। যাক তুইও করছিস জেনে খুশি হলাম। কিন্তু জানিস—কলিন করে না। কয়েকদিন আগেই ওর সঙ্গে কথা হয়েছিল। ওর এত বড় সাহস— ও বলে কিনা শ্যাডো ম্যান একটা জঘন্য চরিত্র! ভাবতে পারিস?'

আমি ভ্রূ কপালে তুলে চোখ গোল করলাম, 'সেকি!' কলিনের জন্যে ভয় হচ্ছিল আমার। আমি ঠিক করলাম অভিনয়টা করে যাব। কী হতে পারে ভেবে আমার বুকটা দুরু দুরু করছিল।

মা-বাবাকে কিছুই জানাইনি। শুধু শুধু দুশ্চিন্তা করবে আমার জন্য।

সুযোগটা বেশ তাড়াতাড়িই এসে গেল। অঙ্ক পিরিয়েডের পর জ্যাক আমাকে বলল, 'আজ বিকেলে তোর পরীক্ষা। তুই ছায়া মানুষকে কতটা ভালোবাসিস সেটাই প্রমাণ করতে হবে তোকে!'

ভয়ে আমার বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল। কলিন ছেলেটা নেহাতই রোগাসোগা একটা ছেলে। পড়াশোনাতে অবশ্য ভালো সে, কিন্তু গায়ে শক্তি নেই মোটেই। এদিকে জ্যাক আর সাইমন দুজনেরই বেশ হাট্টাকাট্টা চেহারা। আমার তো পায়ের ওই অবস্থা! কী করে বাঁচাব আমি কলিনকে?

আজই ওরা এমন কিছু করবে জানলে লুকিয়ে মার সেলফোনটা নিয়ে আসতাম। আগেও দু-একবার টিচার সেলফোন নিয়ে আসতে বলেছেন স্কুলে। আজ থাকলে কত সুবিধা হতো। পুলিশকে ফোন করে দিতে পারতাম। কিন্তু আনিনি যখন সেই সব নিয়ে ভেবে লাভ নেই। অন্য ছেলেদের বলেও কিছু হবে না। কেউ বিশ্বাস করবে না আমার কথা। টিচারদের বললেও একই সমস্যা। আমাকে কেউ তেমন ভালো করে চেনে না এখনও, তাই শুনবেও না আমার কথা। যা করার আমাকেই করতে হবে। বুকে বল আনতে সারাটা সময় মনে মনে বলতে লাগলাম আমি পারব।

একটা চেষ্টা করেছিলাম কলিনকে বলার, 'কলিন, শুনলাম আজ তুই জ্যাক আর সাইমনের সঙ্গে যাবি? খুব দরকার আছে কী?'

কলিন বলল, 'হ্যাঁ, ওরা ওই জঙ্গলের পথ দিয়ে যায়। সেখানে একটা অদ্ভুত পোকা দেখতে পেয়েছে ওরা। আমিও দেখতে চাই সেটা কী পোকা। পরে ইন্টারনেটে খুঁজে দেখব। আমার পোকামাকড় নিয়ে পড়াশোনা করতে খুব ভালো লাগে!'

আমি মনে মনে বললাম, হুঁ! সেটা তো ক্লাসের কারও জানতে বাকি

নেই। সেই জন্যেই তো ওরা দুজন ওই ফন্দি এঁটেছে তোকে জঙ্গলে নিয়ে যাওয়ার।

স্কুলের পর আমরা চারজন মিলে চললাম নেপালিস উডসের দিকে। ভয়ে আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছিল।

ঘন সবুজ জঙ্গল। চারিদিকে পাখি ডাকছে। গাছের পাতা ভেদ করে সূর্যের আলো ঢুকতে পারছে না প্রায়। কেমন একটা ঠান্ডা ছায়া ছায়া ভাব। ভাবতেও অবাক লাগে, শীতকালে এই জঙ্গলেই গাছগুলো সব ন্যাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে!

কিছু দূর যাওয়ার পরই কলিন বলল, 'আর কত দূর হাঁটতে হবে রে? কোথায় দেখেছিলি তোরা পোকাটাকে?'

জ্যাক আমার দিকে চেয়ে চোখ টিপে বলল, 'আর একটুখানি। মিনিট পাঁচেক হাঁটলেই দেখতে পেয়ে যাব।'

কলিন 'ঠিক আছে,' বলে আবার হাঁটতে লাগল।

আমি মনে মনে শুধু ভেবে চলেছি কী করে কলিনের প্রাণ বাঁচাব। মাথার মধ্যে কেবল ঘুরপাক খাচ্ছে, 'আই কিল দা ডিসবিলিভার্স'।

আরও মিনিট পাঁচেক হাঁটার পর থমকে দাঁড়াল জ্যাক আর সাইমন। ওদের চোখ মুখে কেমন একটা হিংস্র ভাব ফুটে উঠেছে। চোয়াল শক্ত হয়ে এসেছে। আমি মনে মনে প্রমাদ গুনলাম।

সাইমন কলিনকে জিগ্যেস করল, 'তুই ছায়া মানুষে বিশ্বাস করিস?'

কলিন এবার একটু ভয় পেল, বলল, 'এ সব কী বলছিস? তোরা তো আমাকে পোকা দেখাতে এখানে নিয়ে এসেছিস। এখানে ছায়া মানুষ কোত্থেকে এল?'

জ্যাক কঠিন স্বরে বলল, 'ওর কথার উত্তর দে, বিশ্বাস করিস, না করিস না?'

কলিন বোকার মতন উত্তর দিল, 'করি না, তাতে কী? সবাইকে ওই সব গাঁজাখুরিতে বিশ্বাস করতে হবে এমন কোনও মানে আছে?'

আমি মাথা নেড়ে কলিনকে ইশারা করার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু ও আমার দিকে তাকাচ্ছিলই না!

এবার জ্যাক তার পিঠের ব্যাগ থেকে একটা ছ'ইঞ্চি মতন লম্বা ফলার ছুরি বের করল। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল, মাথা কাজ করছিল না। আমি এত সাঙ্ঘাতিক কিছু আশা করিনি।

আমরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই জ্যাক কলিনকে লক্ষ্য করে ছুরিটা চালিয়ে দিল। কলিন একেবারেই তৈরি ছিল না ওই আঘাতের জন্যে। সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। নিজের রক্ত দেখে পড়ে গেল অজ্ঞান হয়ে! জ্যাক তারপর ছুরিটা সাইমনকে দিল। সেও এক ঘা মারল। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। আমার দিকে ছুরিটা বাড়িয়ে দিল সাইমন। বলল, 'এবার তুই মার! অবিশ্বাসীকে মেরে শেষ করে ফেল!'

আমি হাতে ছুরিটা নিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে সেটাকে দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে শান্ত গলায় বললাম, 'আমিও বিশ্বাস করি না ওই সবে। শ্যাডো ম্যান বলে আসলে কিছু নেই। সব বানানো গল্প। মানুষের কল্পনা!'

ওদের দুজনেরই তখন চোখে আগুন জ্বলছে। এবার সাইমনের ব্যাগ থেকেও বেরিয়ে এল আরও একটা ছুরি। চকিতে আমার গায়ে চালিয়ে দিল সে। আমি কিন্তু রক্ত দেখে ভয় পাই না। আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করতে লাগলাম, 'বাঁচাও, বাঁচাও, বাঁচাও' করে!

আরো বেশ কিছু আঘাত এল আমার ওপর। কী অসম্ভব যন্ত্রণা আমি বলে বোঝাতে পারব না কিন্তু আমি তাও থামলাম না, চিৎকার করেই চললাম।

ওইভাবে চিৎকার করতে করতে একটা সময় আমি প্রায় হাল ছেড়ে দিলাম। মনে হল এই জঙ্গলে আমার চিৎকার কেই বা শুনবে! এখানেই মরতে হবে আমাকে আর কলিনকে। কিন্তু তখনই হঠাৎ শুনতে পেলাম আমাদের দিকে কিছু একটা শব্দ এগিয়ে আসছে! কেউ নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছে আমার চিৎকার। শুকনো পাতার ওপর দিয়ে কেউ বা কারা দৌড়ে আসছে। আমি ঘোলাটে চোখে বেশ বুঝতে পারলাম, সেই শব্দ শুনে জ্যাক আর সাইমন পালিয়ে গেল। আমার সব ক্ষত দিয়ে তখন গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে। আর পারছি না আমি...।

জ্ঞান হারানোর আগের মুহূর্তে দেখলাম, দুজন লোক আমার সামনে এসে দাঁড়াল, তারা সম্ভবত জঙ্গলে গাছ কাটছিল। তারপরই আমার চোখের সামনে সব কিছু অন্ধকার হয়ে গেল।

জ্ঞান ফিরতেই দেখলাম আমি হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছি। মা-বাবা উদ্বিগ্ন হয়ে বসে আছে আমার পাশে। চোখ খুলে আমি প্রথম কলিনের কথাই জিগ্যেস করলাম।

বাবা বললেন, 'সে এখন ঠিক আছে। অনেকটাই আঘাত পেয়েছে তোমার মতন। স্টিচ হয়েছে। ভীষণ শকও পেয়েছে, কিন্তু ঠিক আছে। সেরে উঠবে। ওর মা-বাবা তোমার কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এই সব হাবিজাবি ভিডিও গেমগুলো যে কত ছেলেমেয়ের মাথা খাচ্ছে তার ঠিক নেই। যাদের ঠিক আর ভুল বোঝার ক্ষমতা নেই তাদের মনের অন্ধকার দিকগুলোকে কাজে লাগায় ওরা! ছোট্ট ছোট্ট প্রাণগুলোকে এইভাবে শেষ করে দিচ্ছে।'

আমি আর কলিন দুজনেই বেশ কিছুদিন ছিলাম হাসপাতালে, তারপর ছাড়া পেলাম। খবর পেলাম, জ্যাক আর সাইমনকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। ওদের শাস্তি হয়েছে। মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে নিজেদের দুই সহপাঠিকে খুন করতে যাওয়ার জন্যে ওদের জেল হয়েছে। অনেকদিন বেরোতে পারবে না সেখান থেকে।

আমার একটা পা অন্য পায়ের চেয়ে ছোট হলে কী হবে, আমাকে সবাই লেংড়ু বলে ডাকলে কী হবে, কোনটা ঠিক কোনটা ভুল সেটা বোঝার ক্ষমতা আমার আছে। সেই জোরেই আমি নিজের আর কলিনের প্রাণ বাঁচাতে পেরেছি। কোনও এক কাল্পনিক ছায়া মানুষ আর তার অন্ধ ভক্তরা অনেক চেষ্টা করেও আমার ক্ষতি করতে পারেনি।
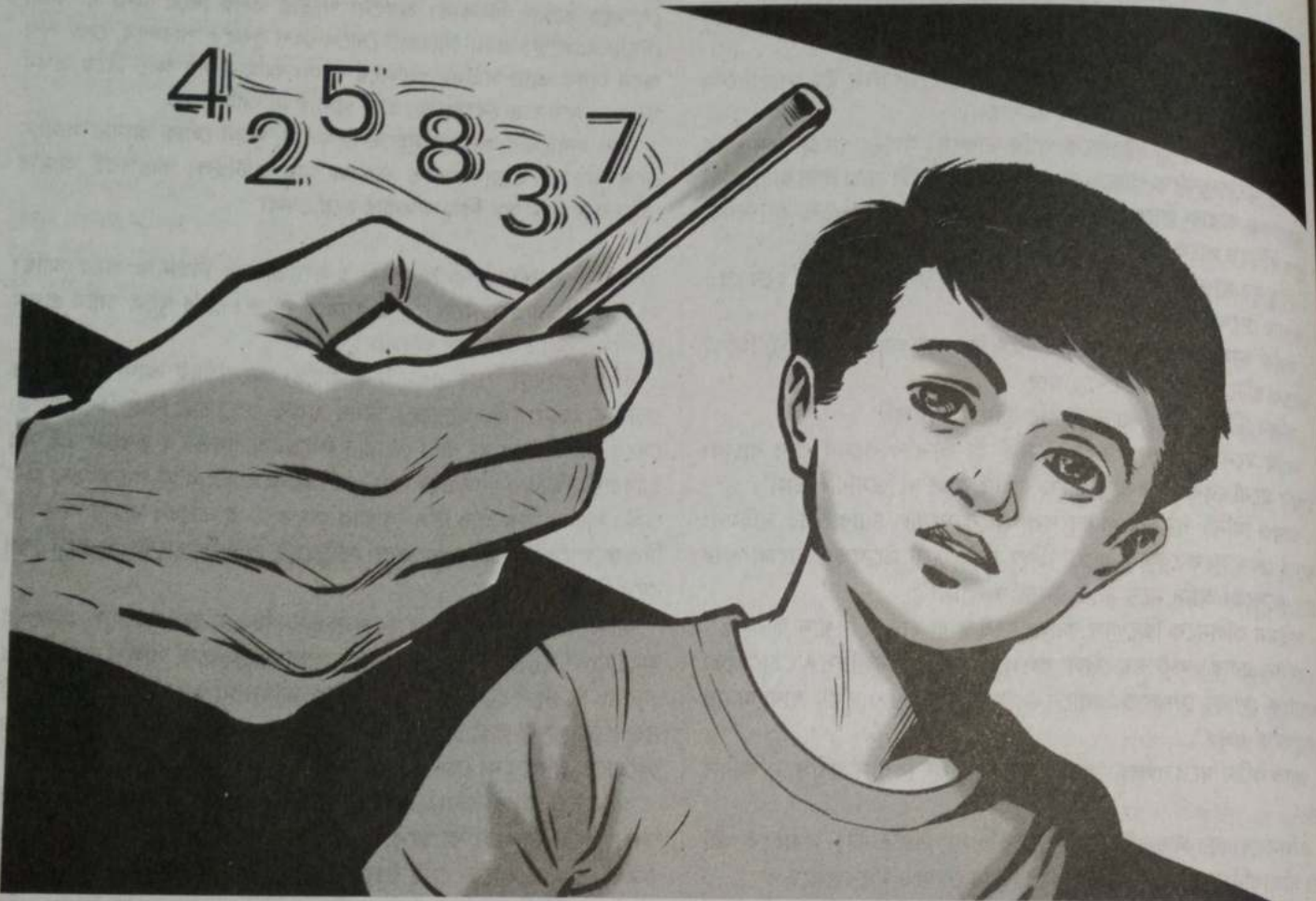
ছবিঃ প্রদীপ্ত মুখার্জী

মৌমিতা

পাসওয়ার্ড

আজকালকার পৃথিবীতে সবকিছুই প্রাইভেট, যার যার তার তার। কিন্তু ময়ূখ আর সৌমির ছেলের নাভাসের একটা অদ্ভুত ক্ষমতা গ্রো করেছে বিগত ছ'মাসে। অনেক দূর থেকেও ও আঙুল চালানো দেখলে বুঝে যায় মোবাইলের পাসওয়ার্ড কী। এভাবে দু-তিন দিন ও বাবা-মায়ের মোবাইল খুলে ফেলেছে।

প্রত্যেকের মোবাইলেই ব্যক্তিগত কিছু মেসেজ থাকে, তার থেকেও বেশি বড়দের সবকথা ছোটদের জন্য নয়। কিন্তু সেকথা নাভাসকে কে বোঝাবে? ওর একই কথা, বাবা-মা যেমন আমার সবকিছু দেখতে পারে, আমার রুমে আসার আগে একবারও নক করে না, তাহলে আমি বাবা-মার ঘরে ঢুকলে অসুবিধে কী আছে? আর মোবাইলও তো একটা ঘরই।

কিন্তু একথা ময়ূখ আর সৌমির পক্ষে মেনে নেওয়া শক্ত। তাদের দুজনের ব্যক্তিগত মেসেজ বুঝুক না বুঝুক, ছবি-চ্যাট-মেইল ছেলে দেখে ফেলছে, এ তো মহা সমস্যা। বেশ কয়েকবার তারা মোবাইলের পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করেছে, কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।

ময়ূখ পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, সে একবার ইঞ্জিনিয়ারিং-এর একটা ফর্মুলা দিয়ে নিজের পাসওয়ার্ড সেট করেছিল এবং ছেলেকে সামনে বসিয়েই। দুবার তাকে টাইপ করতে দেখে তৃতীয়বারের চেষ্টায় নাভাস খুলে ফেলল মোবাইলটা। পাসওয়ার্ডটা জিগ্যেস করলে বলতে পারছে না, কিন্তু দেখে ঠিক সে খুলে ফেলছে। ঠিক যেরকমভাবে জেরক্স একটা আসল পাতার লেখা নিজের মধ্যে তুলে নেয় তেমনিভাবে নাভাস যেন কাউকে টাইপ করতে দেখলে নিজের মাথার মধ্যে পুরো ব্যাপারটা তুলে নিচ্ছে।

তারা এটা নিয়ে কথা বলেছে তাদের দু-একজন বন্ধুর সঙ্গে। প্রথম প্রথম সবাই হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। তারপর অসুবিধাটা যে সত্যিই অসুবিধা এটা বুঝতে পারার পর কেউ কেউ একটু দুশ্চিন্তাও রয়েছে। কেউ পরামর্শ দিয়েছে—এই কর, ওই কর। কেউ বা বলেছে, চোখের ডাক্তার দেখা।

চোখের ডাক্তার দেখানোর কথা সৌমিও যে ভাবেনি তা নয়। কিন্তু চোখের ডাক্তার তো লোকে দেখাতে যায় দৃষ্টির অসুবিধে হলে। এখানে তো আরও ভালো দেখতে পাচ্ছে বা দৃষ্টিশক্তি আরও প্রখর হচ্ছে। এবার দৃষ্টিশক্তি আরও তীব্র হয়ে গেলে তাকে একটু কমিয়ে দেওয়া এমনটা তো কোনও ডাক্তারের হাতে নেই।

ময়ূখ বন্ধু প্রিয়াংশুর থেকে একজন ডাক্তারের খোঁজ পেল। অবাঙালি ডাক্তার। মিস্টার ভার্গব। তাঁর নাকি খুব নাম। দিল্লি না ব্যাঙ্গালোর এখন কোথায় থাকে। মাসে দু'দিন কলকাতার রাজারহাট অঞ্চলে

বসছেন। অনেক কষ্টে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে তাঁর কাছে যেতে হয়।

যাই হোক, তাঁর কাছে অবশেষে যখন যাওয়া হল এদিক-ওদিক চারদিক দেখে নাভাস ছটপট করছিল। সৌমি ভাবছিল কোথা থেকে শুরু করবে, কী বলবে। স্কুলের ব্ল্যাকবোর্ডের লেখা দেখতে পাওয়া থেকে শুরু করে আসবে ওই মোবাইলের ব্যাপারে। এমন ব্যাপার, যেটা নিয়ে তারা আন্টির কাছেও কিছু বলতে পারে না। একবার ওর আন্টির সঙ্গে সৌমির কথাবার্তা নাভাস মোবাইলে পড়ে নিয়ে স্কুলে গিয়ে বলে দিয়েছিল।

আন্টি সৌমিকে ডেকে একটু ধমকেছিলেন। 'ছেলের সঙ্গে এই বিষয়গুলো আলোচনা করেন কেন যেগুলো গার্জিয়ানদের ব্যাপার?' সৌমি বলতে পারেনি যে সে নিজে থেকে ছেলেকে বলতে যায়নি। তার ছেলে একজন জিনিয়াস, যে যেখান থেকে পারে, যা পারে, সমস্ত বুঝে যায়। ছেলের এই দূরদৃষ্টি তাদের অসুবিধার কারণ হয়ে উঠেছে, এটাই ডাক্তারকে বলতে হবে।

ডাক্তার ভার্গব খুব আপ-টু-ডেট চেহারার একজন মানুষ, তার পাশাপাশি তাঁর চোখদুটো একটু অদ্ভুত। মনে হয় যেন একটা চোখ ঘুমিয়ে আছে আর জেগে আছে আর একটা চোখ। একটা চোখ দিয়ে সবকিছু দেখছে আর অন্য চোখ দিয়ে দেখা যে যাচ্ছে, সেটা বোঝা যাচ্ছে না। অদ্ভুত ব্যাপার! ডাক্তার ভার্গব বেশ খানিকক্ষণ তাদের সমস্যাটার কথা শুনে ওর চোখের কতগুলো পরীক্ষা করাতে বললেন। থুতনি স্ট্যান্ডে রেখে একটা পরীক্ষা, চোখে ড্রপ দেওয়ার পরে আর একটা পরীক্ষা, দু-তিনটে পরীক্ষার পর ডাক্তার ভার্গব বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে এটা একটা ইনটিউশন থেকে ও করছে। চোখের তেমন কিছু অসুবিধা দেখলাম না।'

—কিন্তু ওর অসুবিধার জন্য তো আসিনি। ওর হয়তো চোখের ক্ষমতাটা বেড়ে গেছে, যতটা মানুষ দেখতে পায়, তার চেয়ে বেশি দেখতে পাচ্ছে।

—সেই ক্ষমতাটা সব সময় চোখের থেকে বাড়ে না। অনেক সময় মানুষের মধ্যে যদি একটা তীব্র ইচ্ছাশক্তি কাজ করতে থাকে, যে ইচ্ছাশক্তির জোরে বাইরের যা জিনিস বুঝতে পারা যাচ্ছে না, সেটা সে চাইছে, তাহলে দেখা যাবে সেই ইচ্ছাশক্তির জোরেও সে সেই দৃশ্যটা দেখতে পারে।

—কিন্তু তাতে তো ক্ষতির সম্ভাবনা রয়ে যায়। ময়ূখ বলল।

—সেটা ডিপেন্ড করছে তার ইচ্ছেটা কী নিয়ে হচ্ছে। যদি তার ইচ্ছে হয় কারও ভালো করবে, সমাজকে বদলাবে, কোথাও কারও কাজে লাগবে তাহলে সেই ইচ্ছাশক্তির জোরে সে এক জিনিস দেখবে। আর যদি তার মনে হয় কোথাও সে কোনও খারাপ করবে, কিছু ক্ষতি করবে বা ধ্বংস করবে তাহলে সে আর এক রকমভাবে জিনিসটাকে কাজে লাগাতে পারে।

এরকম কথাবার্তা যখন চলছে নাভাস তখন চুপ করে একটা দিকে বসে আছে। ওর চোখে তখন ড্রপ দেওয়া। ওর পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু তার মধ্যেও ও চুপ করে ডাক্তার ভার্গবের দিকে তাকিয়ে ছিল। ডাক্তার ভার্গব দুবার কল ধরলেন, একবার ফোনটা লক খুলে দেখলেনও। বললেন, 'এই যে আমি এখন দেখছি, আমারটা কি নাভাস বুঝতে পারবে? না। তো আপনাদেরও একটু সাবধানে থাকলে মনে হয় না এটা কোনও প্রবলেম হবে।'

সেদিনের মতো তারা চলে এল, ডাক্তার ভার্গবের দেড় হাজার টাকা ফিজ দিয়ে। মনে হল যে হয়তো ব্যাপারটা তেমন কিছুই নয়। কিন্তু অবস্থা যা ছিল তাই রইল। শুধু তাদের দুজনেরই নয়, তাদের বাড়িতে পার্টিতে আসা বন্ধুদেরও দু'তিনজন ব্যাপারটার কথা শুনে একটু দূর থেকে নাভাসের সামনে ফোনটা খোলার পর মজা করার জন্যই নাভাসের হাতে ফোনটা তুলে দিতে নাভাস নির্দিষ্ট কতগুলো অক্ষর বা সংখ্যা টাইপ করে সেটা খুলে ফেলল। ময়ূখের এক বন্ধু রাতুল বলে উঠল, 'বাবা! তোর

বাড়িতে তো আসাই রিস্কি হয়ে উঠছে। একেবারে সিক্রেট ক্যামেরার মতো তোর ছেলের সিক্রেট আই চতুর্দিকে খেয়াল রাখছে।'

রাত্রিবেলা ময়ূখও সৌমিকে বলল, 'এই সিক্রেট আইয়ের জ্বালায় তো অসুবিধেয় পড়লাম। কীভাবে ওর এই জিনিসটা কাটাতে পারে?'

এক শুভাকাঙ্ক্ষীর পরামর্শে তারা ওকে নিয়ে বেড়াতে গেল হিলস্টেশনে, শিমলায়। ওরা ম্যালে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। চারদিক কুয়াশায় ঢাকা। কুয়াশার এপার থেকে সৌমি তার ছেলেকে জিগ্যেস করত, 'আমাকে তুমি দেখতে পাচ্ছ নাভাস?' নাভাস বলত 'না'। আশ্চর্যের বিষয় যে ছেলে দূর থেকে মোবাইলের পাসওয়ার্ড দেখে ফেলতে পারে, সে কুয়াশার ওপার থেকে মাকে দেখতে পায় না কেন?

ধীরে ধীরে নাভাসের এই ব্যাপারটা ছড়িয়ে গেল। ও কোথাও গেলে পরে লোকজন মোবাইল লুকোতে শুরু করত। ওদের ফ্যামিলিকে নেমন্তন্ন করার ব্যাপারটাও আস্তে আস্তে কমে এল। খুব ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছিল সৌমি। আরও খারাপ লাগছিল ময়ূখের । তাকে অফিসেও একদিন জিগ্যেস করল, 'তোমার ছেলে নাকি দূর থেকে মোবাইল দেখে পাসওয়ার্ড বুঝে ফেলতে পারে?' সে কোনও কথা বলল না।

—বাবা! তাহলে তো খুব ডেঞ্জারাস ব্যাপার।

ময়ূখ তখন শুধু বলল, 'আমার ছেলের দ্বারা কারও কোনও ক্ষতি হবে না'। তার কথাটা কেউ খুব একটা বিশ্বাস করল বলে মনে হল না। তারা ঠিক করল, দরকার হলে তারা ওকে নিয়ে যেখানে যাওয়ার সেখানে যাবে। ভেলোরে যাবে, চেন্নাইতে যাবে, ব্যাঙ্গালোরে যাবে। চাই কী বিদেশেও যাবে।

কিন্তু ওর এই ক্ষমতাটার, এই দূর থেকে দেখে বুঝে ফেলার ব্যাপারটার, একটা অবসান চাই। ও সুস্থ জীবন যাপন করতে পারছে না। টিভিতে একবার একটা ছেলেকে দেখাচ্ছিল যার সাত বছর বয়সে ওজন হয়েছে দেড়শো কেজি। আবার আর একটা ছেলে আট বছর বয়সে যার উচ্চতা প্রায় ছ'ফিটের কাছাকাছি। এদের মতোই তার ছেলেও যেন অসুস্থ। ওর যতটুকু ক্ষমতা থাকা দরকার, তার চেয়ে অনেক বেশি আছে। তার ফলে যে-কোনও জায়গায় যেতে আসতে ময়ূখ-সৌমির অসুবিধে হচ্ছে।

অসুবিধে নাভাসেরও হচ্ছে। ও একেবারে একঘরে হয়ে যাচ্ছে। ওর সঙ্গে কথা বলতে লোকে ভয় পাচ্ছে। ওকে এড়িয়ে চলছে। ওর বন্ধুরা নাকি ওর নাম দিয়েছে, চোখে মোবাইল।

একদিন ময়ূখ নাভাসকে ডেকে বলল, 'তুই কেন এরকম করিস?'

—আমি তো ইচ্ছে করে করি না। কিন্তু আমি তাকালেই আমার চোখে নাম্বারগুলো ভেসে ওঠে । আমি কী করতে পারি?

থম মেরে গেল ময়ূখ। সৌমিকেও কথাটা বলল রাতে। সৌমির পক্ষেও কোনও উত্তর দেওয়া সম্ভব হল না। 'তাহলে অন্য কোনও ডাক্তারের কাছে যাই।'

সৌমি বলল, শেষ একবার ডাক্তার ভার্গবকে দেখাই। তখনই দেখল টিভিতে ডাক্তার ভার্গব কী একটা অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন। বেস্ট স্পেশালিস্টের জন্য। তাদের ভালো লাগল ব্যাপারটা দেখে। তারা তাহলে ভুল কোনও জায়গায় যায়নি।

—চলো, অন্য কোথাও যাওয়ার আগে ওনার কাছেই একবার যাই। তিনমাস তো হয়ে গেল। তিনি বলেছিলেন দু'মাসের পর একবার যোগাযোগ করতে। আমরা আর যাইনি।

চেষ্টা করে আরও পনেরো দিন পরে ভার্গবের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেল ওরা। সেদিন যখন ওখানে গেল, তখন খুব অল্প ভিড়। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। রাজারহাটের রাস্তাটা জল থইথই। ভেতরেও এক-দুজনের বাইরে বিশেষ কেউ নেই।

—আপনাদের আজকে ক্যানসেল করে দেয়নি? ডাক্তার ভার্গব অবাক গলায় জিগ্যেস করলেন।

—না তেমন কিছু তো বলেনি। আমাদের আগে থেকে বুকিং করা ছিল।

—আমার অফিস থেকে বলে দিয়েছিলাম ক্যানসেল করতে। আসলে আমার আজকে একটু তাড়া আছে, বেরিয়ে যেতে হবে। কিন্তু আপনারা যখন এসে পড়েছেন আমি দেখে দেব।

তারপর বললেন,—আপনাদের সেই কেসটা না? ছেলে বেশি দেখতে পায়। সেটা কি কিছু ঠিক হয়েছে?

—না। তবে এখন ব্যাপারটা একটু কম কারণ আমাদের এখন লোকে কম জায়গায় ডাকে। আমরাও কম জায়গায় যাই।

—তাতে তো ও পড়াশোনায় কনসেনট্রেট করতে পারে। আচ্ছা ও কি বইও ওরকম দূর থেকে দেখতে পায়?

—না। ব্যাপারটা শুধু মোবাইলের ক্ষেত্রে।

—আমি আগেরবারও বলেছিলাম, এবারও বলছি। ওর চোখ পারফেক্টলি ওকে। আমি আর একবার দেখে নিচ্ছি। ওর ব্যাপারটা পুরো সাইকোলজিক্যাল, আমি বুঝতে পারছি। ওর ভেতরে হয়তো কোনও জিনিস আছে, কোনও গোপন জিনিস, কোনও সুপ্ত জিনিস, যা দিয়ে ও যা দেখতে চায়, দেখে ফেলতে পারে কিন্তু সেটাও একটা আন্দাজের পরে,আঙুলের মুভমেন্ট দেখে। সেই আন্দাজের বাইরে বেশি কিছু হওয়া সম্ভব নয়। আপনারা সেই সিনেমাটা দেখেননি যে সিনেমায় একজন দাবি করত যে গান্ধীজির সঙ্গে তার নাকি কনভারসেশন হয়। তার পরে তাকে যখন দু'তিনটে প্রশ্ন করা হল তখন দেখা গেল সে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর জানে না। আসলে সে গান্ধীজি সম্বন্ধে সেই কথাগুলোই বলত, সেই প্রশ্নের উত্তরগুলোই দিতে পারত যেগুলো তার জানা। ওরও হয়তো সেরকম হচ্ছে। চেনাজানা কারও দিকে তাকালে সেই প্রশ্নগুলো দেখতে পাচ্ছে।

বলতে বলতে ডাক্তার ভার্গব বললেন, কিন্তু যেটা ওর অজানা সেটা ও বুঝবে কী করে? নাভাসকে একটা আপাত চেক করে ডাক্তার ভার্গব ওদের বাই বললেন। তারপর বললেন লাস্ট একবার একটা জিনিস দেখছি, ওকে বসান তো একটু দূরত্বে। আমারও কাজটার সময় হয়ে এল! বলে ডাক্তার ভার্গব নিজের মোবাইলে একটা টাইপ করতে লাগলেন। একবার টাইপ করে মোবাইলটা খুললেন, তারপর বন্ধ করে আবার টাইপ করে খুললেন। ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি কিছু বুঝতে পারছ নাকি?

নাভাস মাথা নাড়ল।

—বুঝতে পারবেও না। দেখলেন তো ওর চেনা লোকের ক্ষেত্রেই এই জিনিসটা কাজ করে। আমার ক্ষেত্রে নয়। বলতে বলতে ভার্গব উঠে দাঁড়ালেন মোবাইলটা হাতে। তখনই একটা আশ্চর্য জিনিস ঘটল। নাভাস বসেছিল যে সোফাতে সেখান থেকে একটা লাফ দিয়ে উঠে তাঁর ফোনটাতে একটা ধাক্কা মারল। ফোনটা ছিটকে গিয়ে লাগল সিলিং-এ। ডাক্তার ভার্গব স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে আছেন। সিলিং থেকে ফোনটা যখন নামছে তখনই নাভাস ফোনটা ক্যাচ করে ফেলল।

ডাক্তার ভার্গবের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ইউ কান্ট, ইউ কান্ট'। অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল ময়ূখ। কী কান্ট? কী করতে পারব না? ডাক্তার ভার্গবের চেহারাটা বদলে গেল মুহূর্তের মধ্যে। মনে হল যেন একটা আপাত ঘুমন্ত চোখের মধ্যে থেকে একটা হিংস্র নেকড়ে বাঘ বেরিয়ে এল।

ডাক্তার ভার্গব একটা রিভলভার বের করে, 'ইয়েস আই ক্যান, আই ক্যান' বলে শুট করতে যাবে, তখন ময়ূখ একটা প্রতিবর্তক্রিয়ায় নিজের ছেলেকে বাঁচানোর জন্য সবটুকু শক্তি দিয়ে, কনুই দিয়ে একটা গুঁতো মারল ডাক্তার ভার্গবের বুকে। ডাক্তার ভার্গব পড়ে যেতে যেতে সামলে নিচ্ছিলেন। সৌমি তাঁর কনুইয়ের কাছে একটা ঘা দেওয়াতে পিস্তলটা হাত থেকে পড়ে গেল। ময়ূখ পা দিয়ে পিস্তলটা সরিয়ে দিতে নাভাস পিস্তলটা তুলে নিল। ডাক্তার ভার্গব মুহূর্তের মধ্যে উঠে ময়ূখের চোয়ালে একটা ঘুসি মারলেন প্রচণ্ড জোরে। ময়ূখ পড়ে গেল। পড়ে যেতে যেতে আবার উঠে দাঁড়িয়ে ডাক্তার ভার্গবকে পাকড়াও করল, তাঁকে নাভাসের দিকে যেতে দিল না।

নাভাস ততক্ষণে দরজা খুলে বেরিয়ে গেছে। ওর পেছন পেছন ছুটে গেছে সৌমি। ওখান থেকে বেরিয়ে ওই ফোনটা থেকেই ওয়ান জিরো জিরোয় কল করে দিয়েছে নাভাস। ভেতরে তখন ধ্বস্তাধস্তি চলছে ডাক্তার ভার্গবের সঙ্গে ময়ূখের। ময়ূখকে একের পর এক ঘুসি মারছে ডাক্তার ভার্গব। ময়ূখ পারছে না সামলাতে। সে বুঝতে পারছে না, এই ডাক্তারের শরীরে এত জোর কোথা থেকে এল। ডাক্তার ভার্গব বলে যাচ্ছে, 'কী ভেবেছে তোমার ওই পুঁচকে ছেলে, আমাকে আটকাবে? হবে না! দেয়ার উইল বি এ ব্লাস্ট'।

ময়ূখ যখন প্রায় অবশ, আর আটকে রাখতে পারছে না ডাক্তার ভার্গবকে, তখনই একটা বিপ বিপ শব্দ এসে পৌঁছল! পুলিশ। ডাক্তার ভার্গব সেই অবস্থাতেও এমারজেন্সি এক্সিট দিয়ে পালিয়ে যেতে চাইছিলেন। ততক্ষণে পুলিশের এক স্পেশাল কম্যান্ডো ঢুকে পড়েছে ঘরে।

—ছদ্মনামে কাজ করার দিন আপনার শেষ মিস্টার নায়ার। হ্যান্ডস আপ।

দুটো পুলিশ গিয়ে ধরে ফেলল তাঁকে। ময়ূখ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওদিকে নাভাসও তখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। ময়ূখ জিগ্যেস করল পুলিশের কর্তাকে, 'ব্যাপারটা কী? কী এমন ছিল তাঁর মোবাইলের মধ্যে যে তিনি অতটা হিংস্র হয়ে উঠেছিলেন?'

—মোবাইলের মধ্যে বোমের কন্ট্রোল ছিল। আপনার ছেলে আজকে বিরাট একটা বিস্ফোরণের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে আমাদের। এই নায়ার কলকাতাতে এসেছিলই এই ব্লাস্টটা করানোর জন্য। তার ফোনের পাসওয়ার্ড ছিল ডেসট্রয় ইন্ডিয়া। সেটা বুঝতে পেরেই আপনার ছেলে ফোনটা কেড়ে নিয়েছিল ওর হাত থেকে।

হতভম্ব হয়ে ছেলের দিকে তাকাল তারা। তাদের ছেলে যাকে নিয়ে ওরা এত ব্যতিব্যস্ত তার এই দূরদৃষ্টির কারণে আজ একটা বড় বিস্ফোরণ থেকে বেঁচে গেল এই শহর! বেঁচে গেল দেশ! ওর ছেলের ভেতরে দেশের প্রতি এত ভালোবাসা!

সাতদিনের মাথায় কলকাতার পুলিশ কমিশনারের উদ্যোগে একটা সম্বর্ধনা দেওয়া হল নাভাসকে। ওর এই ক্ষমতার জন্য। পুলিশ কমিশনার ময়ূখকে ডেকে বললেন, 'পড়াশোনায় ভালো তো কত ছেলে আসে। খেলাধূলোয় ভালো কত ছেলে হয়। কিন্তু আমরা সেরকম ছেলে কোথায় পাই, যার জন্য একটা দেশ বেঁচে যেতে পারে। আপনার ছেলে সেরকম ছেলে। ওকে আপনারা যত্নে রাখবেন।' বলতে বলতে হেসে উঠলেন পুলিশ কমিশনার। নাভাসের মাথায় একবার হাত বোলালেন। তখনই ওনার একটা ফোন এল। পুলিশ কমিশনার ফোনটা ধরতে গিয়ে আবার রেখে দিলেন।

—তোমার সামনে বের করলেই তো তুমি বুঝে যাবে!

তারা সবাই হেসে উঠল।

সেদিন বাড়ি ফেরার পর তারা সেলিব্রেট করতে একটা রেস্টুরেন্টে খেতে গেল। রেস্টুরেন্ট থেকে ফেরার পথে ময়ূখ আর সৌমি দুজনে বলল, 'তোমাকে আমাদের একটা গিফট দেওয়ার আছে।'

—কী গিফট?

দুজনেই মোবাইল দুটো নাভাসের হাতে দিয়ে বলল, 'কখনও মনে করলে তুমি আমাদের মোবাইল থেকেও গেম খেলতে পারো। আমরা আমাদের মোবাইলে আর কোনও লক রাখিনি। বিকস উই ওয়ান্ট টু বিল্ড, নট টু ডেসট্রয়।' কিশোর ভারতী

ছবিঃ ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

প্রদীপ দে সরকার

জীবন্ত মমি

১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৯৫। দক্ষিণ-পূর্ব চীনের ফুজিয়ান প্রদেশের একটা ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম, জুকেঙ।

গভীর রাত। প্রায় আড়াইটে। ঠান্ডাটা বেশ ভালোই পড়েছে। পারদ বারো ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে। গ্রামের সব মানুষ অঘোরে ঘুমোচ্ছে। খানিক আগেও জেগে ছিল গ্রামের মন্দিরের পাহারাদার লিং। কিন্তু সেও এখন মন্দিরের বাঁধানো চাতালে বসে ঢুলছে। গ্রামে গত কয়েক বছরে একটাও চুরি হয়নি। আগামী দিনেও হবে বলে মনে হয় না। তবুও গ্রামের মাতব্বররা তাকে মাইনে দিয়ে পাহারা দিতে রেখেছে তাই পাহারা দেওয়া।

কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমীর আধখানা চাঁদ দক্ষিণ-পশ্চিম আকাশের এক কোণে ঝুলে আছে। সেই চাঁদের কুহকী আলোয় লম্বা গাছগুলোর ছায়া আরও লম্বা। নিথর নিঝুম দাঁড়িয়ে সেই ছায়ারা। হঠাৎই সেই ছায়াদের মধ্যে দুটি ছায়া নড়ে উঠল। ধীরে ধীরে স্পষ্ট হল দুটি মানুষের অবয়ব। নিশব্দে উঠে এল মন্দির চাতালে। তাদের মধ্যে একজন নিপুণ দক্ষতায় খুলে ফেলল মন্দিরের দরজার তালা। তারপর একটা মূর্তিকে ধরাধরি করে হেঁটে গেল দুজন। কিছুক্ষণ পরেই দূরে একটা গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। গাড়ির শব্দ এ গ্রামে খুব স্বাভাবিক নয়। নিস্তব্ধ রাতে ওই সামান্য শব্দটুকুই লিং-এর ঘুম ভাঙানোর পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু চারপাশে তাকিয়ে সব স্বাভাবিক দেখে সে আবার ওক গাছে ঠেস দিয়ে চোখ বন্ধ করল।

পরদিন সকালে মন্দিরের প্রধান পুরোহিত পুজো দিতে এসে দেখলেন মন্দিরের মূল দরজার তালা খোলা। দরজা খুলে দেখা গেল এ মন্দিরের আরাধ্য দেবতা নেই। গ্রামের মানুষের এতদিনকার সব পরিশ্রম বৃথা; মূর্তি চুরি হয়ে গিয়েছে। বিপ্লবের সময় মাও জে দঙ বলেছিলেন, 'পুরোনো রীতিনীতি, আচার, অভ্যেস আর ভাবনাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে'। শুরু হয়েছিল ঐতিহ্যের সংহার। সেই কঠিন সময়েও গ্রামের মানুষ এবাড়ি-ওবাড়ি লুকিয়ে রেখে নিজেদের জীবন সংশয় করেও বাঁচিয়েছিলেন এই মূর্তি। কারণ, এ তো শুধুই মূর্তি নয়, তাদের কাছে এই মূর্তিই মনে করিয়ে দিত ঝাঙ গঙের উপস্থিতি। তাদের প্রাণের মানুষ, যিনি দেবত্বে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। প্রায় হাজার বছর ধরে গ্রামের মানুষের কাছে তিনিই ছিলেন স্বয়ং বোধিসত্ত্ব, আরাধ্য দেবতা। সরকারি নিষেধ অমান্য করেও যাঁকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন, আজ এমন শান্ত

সময়ে সেই দেবতাকেই চুরি করে নিয়ে গেল।

২ এপ্রিল, ১৯৯৬। নেদারল্যান্ডের রাজধানী আমস্টারডাম।

রুবেন স্মিথ রাত ন'টায় ডিনার সেরে আবার ঢুকেছে তার স্টুডিয়োয়। এই কাজটার জন্য বেশ কিছুদিন ধরেই তাড়া দিচ্ছে লিয়াম ভ্যানডেনবার্গ। কিন্তু অন্যান্য কাজের ব্যস্ততার মধ্যে লিয়ামের কাজে হাত দিতে পারছিল না। সবে গত পরশু থেকে ধরেছে কাজটা এবং ধরার পর থেকে প্রায় পাগলের মতো এটার পিছনেই পড়ে আছে। যত খুঁটিয়ে দেখছে ততই অবাক হচ্ছে। কারণ, প্রথমে ভেবেছিল একটা কাঠের গুঁড়ি কেটে মূর্তিটা তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু খুব ভালো করে দেখে বুঝতে পেরেছে কয়েকটা টুকরো জোড়া লাগিয়ে মূর্তিটা তৈরি করা হয়েছে। আর নিচের পাটাতনটা খানিকটা সরিয়ে যা দেখল তাতে তো হতবাক। সে যা ভাবছে সেটা কি সত্যি? ঠিক এই সময় লিয়ামের ফোন।

'কতদূর এগোলে স্মিথ? আমার হাতে মাত্র এক মাস সময়। জানোই তো, এক্সিবিশনের ডেট ২রা মে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি। আমি কাজটা শুরুও করেছি। কিন্তু একটা কথা না বলে পারছি না।'

'কী?'

'এটা মূর্তি না কি মমি?'

'ভাই, তুমি নেশা-টেশা করছ নাকি আজকাল? দেখতেই তো পাচ্ছ প্রাচীন একটা মূর্তি। বোধহয় ওক কাঠের তৈরি। শুধু কিছু জায়গায় পোকায় কেটেছে। টানা হ্যাঁচড়ার জন্য বেসটা একটু নড়বড়ে হয়ে গেছে।'

রুবেনের একটু রাগই হয় লিয়ামের ওপর। প্রায় কুড়ি বছর ধরে সে প্রাচীন মূর্তি স্ট্যাচু ইত্যাদির সংরক্ষণের কাজ করছে। গোটা ইউরোপ তাকে চেনে। আর ঠিক এইজন্যই লিয়াম ভ্যানডেনবার্গের মতো প্রসিদ্ধ অ্যান্টিক কালেক্টরও তার কাছেই আসে। সে রাগত স্বরেই বলল, 'একটা কাজ কর। আমি আজ সারারাত আমার স্টুডিয়োয় কাজ করব। যদি আমার কথা বিশ্বাস না হয় তাহলে চলে আসতে পার।'

ও প্রান্তে, কেটে যাওয়া ফোনটা হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থাকল লিয়াম। মাসখানেক আগে পনেরো হাজার ডলার দিয়ে মূর্তিটা কিনেছিল ফিলিপিন্সের এক ব্যবসায়ী নাথানের কাছ থেকে। পাকা রসিদ ছাড়াই। তবে নাথান পূর্ব পরিচিত। নাথান বলেছিল আটশো থেকে হাজার বছরের পুরোনো মূর্তি। লিয়ামের অভিজ্ঞ চোখ বুঝেছিল নাথান খুব একটা মিথ্যে কথা বলছে না। কাগজপত্র থাকলে এত পুরোনো মূর্তি মাত্র পনেরো হাজার ডলারে পাওয়া যেত না। এখন রুবেন যা বলছে তা যদি সত্যি হয় তাহলে তো মিলিয়ন ডলারের ডিল। চকচক করে উঠল লিয়ামের চোখ দুটো।

৭ এপ্রিল, ১৯৯৬। আমস্টারডাম।

গাড়ির পিছনের সিটে মূর্তিটা কালো কাপড়ে ঢেকে বসানো আছে। অন্ধকার হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে লিয়াম, পাশে গম্ভীর মুখে রুবেন। বাইরে প্রচণ্ড ঠান্ডা। দু'ডিগ্রি সেলসিয়াস। ঝিরিঝিরি বৃষ্টিও হচ্ছে। রাস্তা জনশূন্য।

সেদিন মাঝরাতেই রুবেনের স্টুডিয়োয় পৌঁছে গিয়েছিল লিয়াম। মূর্তির নীচের পাটাতনটা সরানোর কাজ করছিল রুবেন। খুব সাবধানে পাটাতনটা খুলে ফেলার পর একটা কালচে লাল রঙের মখমলের আসন পাওয়া গিয়েছিল। সেই আসন সামান্য সরিয়ে রুবেন যা দেখতে পেয়েছিল সেই কালচে হলুদ রঙের শক্ত কাঠামো আর যাই হোক ওক কাঠ নয়। লিয়ামকে সেটা দেখানোর সঙ্গে-সঙ্গেই লিয়াম ঠিক করেছিল কাঠের মূর্তির ভিতরে কী আছে, আগে সেটা জানতে হবে। তারপরে সংরক্ষণের কাজ হোক।

সেটা জানার জন্যই অনেক হিসেব কষে আজকের অভিযান। শহরের বাইরের এক হাসপাতালে নিয়ে চলেছে মূর্তিটাকে। রবিবার রাতের দিকে হাসপাতাল সাধারণত বেশ ফাঁকা থাকে। সেসব হিসেব করেই আসা। বৃষ্টি আর এই ঠান্ডা ওদের জন্য আরও সুবিধেজনক পরিবেশ তৈরি করেছে। রুবেনের স্ত্রী সোফির বান্ধবী এমা আছে ওই হাসপাতালে। এমা সব ব্যবস্থা করে রাখবে। এম আর আই করা হবে এই মূর্তির। লিয়াম প্রায় এক হাজার ডলার খরচা করছে এই কাজটার জন্য। টাকার লোভ দেখিয়েই এমা আর ওর দুই সহকর্মীকে রাজি করানো গেছে।

সোফির কাছ থেকে এমার ফোন নম্বর নেওয়া হয়েছে বলে রুবেন একটু চিন্তায় আছে। কোনওভাবে সোফি না জড়িয়ে পড়ে। লিয়াম কথা দিয়েছে যাই হোক না কেন সোফির নাম আসবে না। তবুও রুবেন চিন্তিত। এই কাজটাতে ও নিজেও জড়াতে চাইছিল না। কারণ, কেন জানি ওর মনে কু ডাকছে। মনে হচ্ছে একটা অন্যায় কাজে জড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে শুধুমাত্র চরম কৌতূহল ওকে যেন এই মূর্তির সঙ্গে বেঁধে ফেলেছে।

এম আর আই রিপোর্ট দেখে প্রত্যেকেই চমকে গেল। রুবেনের আন্দাজ একেবারে নির্ভুল। কাঠের মূর্তি আসলে একটা মমির ঢাকনা। পদ্মাসনে বসে আছেন এক যোগীপুরুষ। লিয়াম তো উত্তেজনায় ফুটছে। সেই রাতেই ফোন করল ইউনিভার্সিটির এক কর্মচারীকে। রেডিয়ো-কার্বন টেস্ট করে জানতে হবে মূর্তি আর মমির আসল বয়স।

৯ এপ্রিল, ১৯৯৬। দাভাও, দক্ষিণ ফিলিপিন্স।

হাসপাতালের বেডে শুয়ে থাকা অবস্থায় লিয়ামের ফোনটা ধরল নাথান। কথা বলতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। ও প্রান্তে লিয়ামের উত্তেজিত গলা, 'নাথান, ওই মূর্তিটা কোত্থেকে পেয়েছিলে? মূর্তির ইতিহাস কী? আমাকে সব জানাও। এক্ষুনি।'

ক্ষীণ স্বরে নাথান উত্তর দিল, 'ফুজিয়ান প্রদেশের জুকেঙ গ্রামের মন্দির থেকে আনা হয়েছিল। শুধু জানি প্রায় আটশো থেকে হাজার বছরের প্রাচীন এক মূর্তি। হয়তো মিঙ রাজাদের সময়ের। এছাড়া বেশি কিছু জানি না।'

নাথানের গলার স্বর শুনে একটু বিচলিত হল লিয়াম। জিগ্যেস করল, 'নাথান, তোমার গলা এরকম শোনাচ্ছে কেন? কী হয়েছে তোমার? তুমি এখন কোথায়?'

নাথান খুব কষ্ট করে বলল, 'জানি না কী হয়েছে। হাসপাতালে, কিছুই খেতে পারছি না। ডাক্তার স্যালাইন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে, কিন্তু আজ থেকে শরীরে স্যালাইনও ঢুকছে না। আমি বোধহয় আর বাঁচব না।'

লিয়াম বিরক্ত হয়। নতুন কিছুই জানা গেল না। নাথান মরে গেলে ওর প্রশ্নের উত্তর দেবে কে? সে মরিয়া হয়ে জিগ্যেস করল, 'যে তোমাকে মূর্তিটা এনে দিয়েছিল তার ফোন নম্বর দাও। আমি যোগাযোগ করে নেব।'

নাথানের কাছ থেকে একটা ফোন নম্বর পাওয়া গেল। চিনের ফুজিয়ান প্রদেশের গাঙ জুয়েন। যার সাহায্যে এক শীতের রাতে মূর্তিটা চুরি হয়েছিল। নম্বরটা পেয়েই ফোন করল লিয়াম। বেশ কয়েকবার ফোন বেজে গেলেও কেউ ধরল না। শেষে এক মহিলা কণ্ঠ পাওয়া গেল, কিন্তু কথা শুনে বোঝা গেল তিনি চীনা ভাষা ছাড়া জানেন না।

আবার এগিয়ে এল রুবেন। তার এক বন্ধু আছে, জেডেন। বাবা নেদারল্যান্ডের মানুষ, মা চীনা। অতঃপর জেডেনের মা ফ্যাং ঝাওয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হল রুবেন আর লিয়ামকে। ফ্যাং-এর সঙ্গে ফোনে কথা হল গাঙ জুয়েনের স্ত্রী লি-এর। জানা গেল গাঙ গত দু'মাস ধরে অদ্ভুত অসুখে ভুগছে। কিছু খাচ্ছে না, এমনকী জল পান করাও বন্ধ এক মাস হল। এখন কথা বলা কিংবা হাত-পা নাড়াতে পারছে না। তার

জীবন্মৃত শরীরটা বিছানার সঙ্গে লেপটে। কোনও ডাক্তার তার রোগ ধরতে পারছে না।

লিয়াম তাড়া দেয় জেডেনকে, 'তোমার মাকে বলো, মূর্তির ব্যাপারটা জিগ্যেস করতে। ইতিহাসটা কী?'

লি ইতিহাসটা জানে না। সে গাঙের বাবাকে ফোন দিল। গাঙের বাবার সঙ্গে কথা বলে জুকেঙ গ্রামের একটা প্রচলিত লোককথা জানা গেল। প্রায় হাজার বছর আগে জুকেঙ গ্রামে এক মহাপুরুষ ছিলেন, ঝাঙ গঙ। গঙ শব্দের অর্থ দেবতা। সেই মহাপুরুষ নিজেই নিজেকে এক জীবন্ত মমিতে রূপান্তরিত করেছিলেন। তাঁরই শেষ ইচ্ছানুসারে সেই মমি রাখা ছিল মন্দিরে। পরে গ্রামের লোকেরা সেই মমির প্রতীক হিসেবে একটা ওক কাঠের মূর্তিকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে।

লিয়াম সব শুনে উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে। সেই মমিকেই যে কাঠের আবরণে ঢাকা হয়েছিল এ নিয়ে আর সন্দেহ নেই। রেডিও কার্বন টেস্ট বলছে মমিটা সঙ রাজত্বের শেষ দিকের সময়ের। আর কাঠের আবরণ প্রায় দুশো বছর পরের। মিলে যাচ্ছে হিসেব। ওই লোককথার মধ্যেই লুকিয়ে আছে ইতিহাস। আর ইতিহাস ঠিক হলে এই মমির দাম অন্তত দশ মিলিয়ন ডলার। জীবনে আর কাজ করতে হবে না তাকে। দশ পুরুষ বসে খেতে পারবে তার পয়সায়।

১০ এপ্রিল, ১৯৯৬। আমস্টারডাম।

গত কয়েকদিন ধরে মারাত্মক মানসিক এবং শারীরিক ধকল গেছে রুবেনের। তার ওপর ভালো করে ঘুমোতে পারছে না। স্ত্রী সোফিও তার অফিসের কাজে কয়েক দিনের জন্য লেইডেন গেছে। ফাঁকা বাড়িতে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল রুবেন।

কাচের জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়ছে ঘরের মেঝেয়। সেই আবছা আলোয় রুবেন দেখল এক লোলচর্মসার বৃদ্ধ এসে দাঁড়িয়েছেন তার বিছানার ঠিক পাশটিতে। রুবেন আতঙ্কে চিৎকার করতে চাইল, কিন্তু তার গলা দিয়ে কোনও শব্দ বের হল না। গঁ-গঁ করে অদ্ভুত কিছু আওয়াজ হল শুধু। রুবেন এবার বৃদ্ধের কিছু কথা শুনতে পাচ্ছে। না, মুখে কিছু বলছেন না সেই বৃদ্ধ, কিন্তু রুবেনের মস্তিষ্ক যেন ওঁর কথা শুনতে পাচ্ছে, উনি বাড়ি ফিরতে চাইছেন। বলছেন, 'হেল্প মি রুবেন, হেল্প মি টু হেল্প ইয়োরসেলফ।' কথাগুলো বলে সেই কঙ্কালসার বৃদ্ধ শুধুই অপলক তাকিয়ে আছেন তার দিকে। কোটরাগত সেই চোখ থেকে যেন এক অপার্থিব জ্যোতি বেরিয়ে আসছে। প্রাণপণে চিৎকার করার চেষ্টা করল রুবেন। আর ঠিক তক্ষুনি ঘুমটা ভেঙে গেল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসল বিছানায়।

এই শীতেও দরদর করে ঘামছে রুবেন। এভাবেই গত তিন রাত্তির একই স্বপ্ন ঘুরেফিরে দেখছে সে। এক লোলচর্মসার বৃদ্ধ বাড়ি ফিরতে চাইছেন।

পরদিন সকাল হতেই লিয়ামের কাছ থেকে পাওয়া নম্বর নিয়ে সে ফোন করল নাথানকে। নাথানের অবস্থা আরও খারাপ, ওজন দ্রুত কমে যাচ্ছে। অথচ কোনও রোগের লক্ষণ নেই। ব্লাড প্রেশার চল্লিশের নীচে, পালস রেট তিরিশ, ব্লাড সুগার পঁচিশে নেমেছে। নাথানের ফোন হাসপাতালের নার্স ধরেছিলেন।

রুবেন গাঙ জুয়েনের ঘটনাটাও জানে। এখন একমাত্র আশার আলো জেডেন আর তার মা ফ্যাং। রুবেন দেখা করল তাদের সঙ্গে। জানা গেল জেডেনের মায়ের পূর্বপুরুষরা ছিলেন ফুজিয়ান প্রদেশেরই মানুষ। গোটা ঘটনা শুনে তাঁর কপালে ভাঁজ পড়ল। রুবেনকে বললেন, 'সেদিন ফোনে কথা বলার পর থেকে আমি নিজেই খুব অস্বস্তির মধ্যে রয়েছি। তোমাদের এই কাজটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়া ঠিক হয়নি। অত্যন্ত অন্যায় কাজ করছ তোমরা।'

রুবেন জিগ্যেস করল, 'কেন এ কথা বলছেন?'

'তোমরা ইউরোপীয়নরা তো প্রাচ্যের অনেক কিছুই বিশ্বাস করতে চাও না। এই যে মূর্তি নিয়ে তোমরা ছেলেখেলা করছ, জানো তার ভিতরে কে আছেন?'

'এক বৃদ্ধের মমি। হাজার বছরের পুরোনো।'

'শোকুশিনবুৎসু কথাটা শুনেছ কখনও? জাপানে এই শব্দটার সঙ্গে অনেক শ্রদ্ধা জড়িয়ে আছে। জাপান ছাড়াও চিন আর থাইল্যান্ডের বহু বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নিজের জীবনের শেষ সময়ে জাগতিক সব কিছু ত্যাগ করে নিজেকে ধ্যান ও যোগের মাধ্যমে জীবন্ত মমিতে পরিণত করার চেষ্টা করেন। সবাই পারেন না, কিছু মহান সন্ন্যাসী এতে সফল হন। এভাবে তাঁরা বোধিসত্ত্ব লাভ করেন। বিশ্বাসীদের কাছে তখন তাঁরাই স্বয়ং ঈশ্বর। তোমরা যাঁকে নিয়ে এসেছ তিনিও তাই। যেভাবেই হোক ওই মূর্তি জুকেঙের মন্দিরে ফেরত পাঠানোর চেষ্টা করো।'

রুবেন বলল, 'কিন্তু সেটা কীভাবে সম্ভব? লিয়াম আমাকে খুন করে ফেলবে।'

ফ্যাং বললেন, 'তুমিই পারবে। আর লিয়াম? সব শুনেও বুঝতে পারছ না তার সঙ্গে কী হতে চলেছে? গাঙ, নাথান সবাই ধীরে ধীরে জীবন্ত মমিতে পরিণত হচ্ছে। দেবতাকে অপবিত্র করার চেষ্টা করলে তা-ই হয়। এরপর...!'

২ মে, ১৯৯৬। রেলিক মিউজিয়াম, আমস্টারডাম।

আজকের সন্ধের সেরা আকর্ষণ হাজার বছরের প্রাচীন এক মূর্তি। হলের ঠিক মাঝখানে একটা উঁচু প্ল্যাটফর্মে সেই মূর্তিকে মধ্যমণি করে এক্সিবিশন সাজানো হয়েছে। লিয়াম নিজের নাম ইউরোপের একজন অন্যতম সেরা কালেক্টর হিসেবে লিখে রাখতে চাইছে। লিয়ামের অন্তর গর্বে, আনন্দে ফেটে পড়ছে, ইচ্ছে করছে আনন্দে দু'হাত তুলে নাচে, কিন্তু শরীর দিচ্ছে না। ক'দিন ধরে একেবারেই খেতে পারছে না, বড্ড দুর্বল হয়ে পড়েছে। হাত-পা নাড়াতেও কষ্ট হচ্ছে। একজন নার্স তার সর্বক্ষণের সঙ্গী। একটা হুইল চেয়ারে বসে সে।

রুবেনও উপস্থিত। মূর্তির সংরক্ষণের কাজটা দুর্দান্ত হয়েছে। মূর্তির ভিতরে যে মমি আছে সেটা এখনই কাউকে বলতে বারণ করেছে রুবেন। কারণ, পাকা রসিদ ছাড়া মমি কেনার জন্য আইনি জটিলতা দেখা দিতে পারে। রুবেনের এই যুক্তি মেনে নিয়েছে লিয়াম।

রুবেন নিজের কাজে নিজেই পুলকিত। মাত্র কুড়ি দিনের মধ্যে এত বড় কাজটা শেষ করতে হয়েছে। লিয়ামের মতো অভিজ্ঞ অ্যান্টিক কালেক্টরও ধরতে পারেনি যে মূর্তির ওক কাঠের জোড়া গুলো একবার খুলে আবার লাগানো হয়েছে এবং মূর্তির ভিতরে আসল মমি সরিয়ে নকল মমি রাখা আছে।

ওদিকে, আসল মমির জন্য তৈরি নতুন মূর্তিটাও অবিকল একইরকম দেখতে হয়েছে। জেডেনের মা খুব খুশি হয়েছেন। প্ল্যানটা যে তাঁরই ছিল। আর রুবেনের দিক থেকে লিয়ামকেও সেভাবে ঠকানো হয়নি। কারণ, লিয়াম তো পনেরো হাজার ডলারের বিনিময়ে হাজার বছরের পুরোনো কাঠের মূর্তিটাই শুধু কিনেছিল। মমির কথা তো সে জানত না।

ঠিক সেই মুহূর্তে চিনের ফুজিয়ান প্রদেশের জিয়ামেন গাওকি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে একটা বড় বাক্স নামানো হচ্ছে। সঙ্গে রয়েছে জেডেন আর তার মা ফ্যাং ঝাও। বাক্সটা যাবে জুকেঙ গ্রামে। সেখানে আজ বহুদিন পর উৎসবের পরিবেশ, কারণ, জুকেঙ গ্রামের মন্দিরে আবার ফিরে আসছেন ঝাঙ গঙ। ঘটনাচক্রে আজকের রাত ফুরোলেই বুদ্ধপূর্ণিমা। জুকেঙ গ্রামের মানুষ জানে অন্ধকার পেরিয়ে আজ ভোরের আলো সঙ্গে করে স্বয়ং বুদ্ধ ফিরে আসছেন তাঁর নিজ গৃহে, তাদের গ্রামের মন্দিরে। কিশোর ভারতী

শিশির বিশ্বাস

নিশির ডাক

অদ্ভুত এই গল্প বসন্তদাদুর। তিনি নিজেই বলেছিলেন। গল্প শুরুর আগে মানুষটির কথা বলি। সেকালের পূর্ববাংলার এক প্রত্যন্ত গ্রামের নিরক্ষর চাষি পরিবারে জন্ম হলেও বসন্তদাদু স্বাধীনচেতা কৃতি পুরুষ ছিলেন। দেশভাগের পর একমাত্র পুত্রসন্তান চাকরি নিয়ে কলকাতায় চলে এলেও তিনি দেশ-গ্রাম ছাড়েননি।

আরও ভালো করে বললে, আশপাশের গোটা কয়েক গ্রামে তাঁর এতটাই প্রতিপত্তি আর সম্মান ছিল যে, ছেড়ে আসতে পারেননি। তবে বছরে এক-আধবার কলকাতায় পুত্রের কাছে আসতেন। তারপর ১৯৭১ সালে ওদেশে শুরু হল খানসেনার তাণ্ডব। শহরাঞ্চলে তারা হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ করেনি। তাদের নির্বিচার গুলি-গোলায় মৃত্যু হয়েছে দুই সম্প্রদায়ের মানুষেরই। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে তা হয়নি। সেখানে খানসেনাদের লক্ষ ছিল মূলত হিন্দু সম্প্রদায়। পুড়িয়ে দেওয়া হতে থাকল হিন্দুদের বাড়ি-ঘর আর নৃশংস হত্যালীলা চলেছিল।

তাঁর কথায়, তৎকালীন পাক সরকার হিন্দুদের দেশছাড়া করে ভারতের উপর বাড়তি চাপ তৈরি করতে চেয়েছিল। অল্প দিনের মধ্যে ভিটেমাটি ছাড়া কয়েক লক্ষ উদ্বাস্তু মানুষ চলে এসেছিল। অবর্ণনীয় অবস্থায় পড়তে হয়েছিল তাদের। ওই সময় নদীয়া জেলার করিমপুর-শিকারপুরের পথের পাশে একের পর এক মৃতদেহ পড়ে থাকতে

ছবিঃ সামন্তক চট্টোপাধ্যায়

আমি নিজের চোখেই দেখেছি। বুঝতে বাকি থাকেনি, সীমান্তের ওপারের অবস্থা আরও কত ভয়াবহ!

পাক সরকারের উদ্দেশ্য অবশ্য সফল হয়নি। তৎকালীন ভারত সরকার ব্যাপারটা সামাল দিতে পেরেছিল। পূর্ব পাকিস্তানের তিরানব্বই হাজার পাক সেনাকে আত্মসমর্পণ করতেও বাধ্য করেছিল। সৃষ্টি হয়েছিল নতুন বাংলাদেশ। তবে অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে পড়তে হয়েছিল বসন্তদাদুর মতো ওদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে।

এ গল্প যে সময়ের, বসন্তদাদুর বয়স তখন তিরিশের মতো। শরীরে যেমন শক্তি, তেমনই ধীশক্তি সম্পন্ন মানুষ। গ্রামের অলিখিত মাতব্বর। সমীহ করে সবাই। তিনি নিজেই বলেছিলেন, সম্মান সহজে মেলেনি। আদায় করে নিতে হয়েছিল। নিতান্ত চাষিবাড়ির মানুষ। গ্রামে তো নয়ই, দূরেও কোনো স্কুল ছিল না। ছেলেবেলায় লেখাপড়া শেখার সুযোগ হয়নি। দিনভর ছেলের দল নিয়ে হইহই করে বেড়াতেন। তারপর বাবা মারা যেতে দাদারা দিলেন আলাদা করে। খানিক দূরে নতুন পাড়ায় বাড়ি করে তিনিও চলে এসেছিলেন।

সমবয়স্কদের নিয়ে একটা দল আগেই ছিল। কিন্তু এবার টের পেলেন, উপরে উঠতে হলে শুধু লোকবল নয়, লেখাপড়াটাও দরকার। কিন্তু কোথায় লেখাপড়া শিখবেন? স্কুল বা পাঠশালায় পড়ার বয়স নেই। কোনোটিই তখন গ্রামের ধারেকাছে ছিল না। বসন্তদাদু খোঁজখবর করে হাট থেকে দু-পয়সা দিয়ে একখানা 'বাল্যশিক্ষা' কিনে ধাওয়া করলেন কাছেই অলঙ্কাপুর গ্রামের এক মৌলবির কাছে। সেই মৌলবি সামান্য লেখাপড়া জানতেন। প্রতি রাতে মাইল কয়েক হেঁটে সেই মৌলবির বাড়িতে যাওয়া-আসা শুরু করলেন তিনি। শুরু হল অ—আ—ক—খ শেখার পাঠ।

মানুষটির লেখাপড়া অবশ্য বাল্যশিক্ষার বেশি এগোয়নি। কারণ খোদ গুরুর বিদ্যা তার বেশি ছিল না। তবু এই সীমিত বিদ্যা নিয়েই অভীষ্ট লক্ষ্যে অনেকটাই পৌঁছে যেতে পেরেছিলেন। চমৎকার চিঠি লিখতে পারতেন। গ্রামের সালিশি সভায় লিখে দিতেন চুক্তিপত্র। থানা-পুলিশের মোকাবিলা করতে হত হামেশাই। ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, কোনো ব্যাপারে থানা থেকে দারোগা এলে সটান হাজির হতেন তাঁর কাছেই। মাইল সাতেক দূরে থানা। রওনা হয়েছেন সকালে। দুপুরে ভুরিভোজের ব্যবস্থা হত তাঁর বাড়িতেই। সেখানেই সালিশের সভা। বিকেলের মধ্যেই সব মিটিয়ে দারোগা ঘোড়া ছুটিয়ে থানার পথে।

ইতিমধ্যে ব্যবসায় মন দিয়েছেন। দূরের গঞ্জ থেকে বস্তা ভরতি লবণ, কেরোসিন আর কাপড় কিনে নৌকোয় বিভিন্ন হাটে ব্যাপারীদের কাছে পৌঁছে দিতেন। গ্রাম থেকে পাট আর জালা ভরতি আখের গুড় কিনে নিয়ে যেতেন গঞ্জের আড়তে। অগত্যা সামান্য জমি দিয়ে দাদারা আলাদা করে দিলেও অবস্থা ফেরাতে সময় লাগেনি। এই সময় একদিন দূরের এক জমি দেখতে গিয়ে অবাক হয়ে গেলেন। জমিতে খেসারি কলাই বোনা হয়েছিল। কিন্তু খেতের দিকে সামান্য তাকালেই বোঝা যায় দু'একদিনের মধ্যে কেউ তাতে গরু ছেড়ে দিয়েছিল। বেড়ে ওঠা খেসারি শাকের অনেক স্থানই মুড়িয়ে খাওয়া।

খেসারি কলাই থেকে যে ডাল হয়, তা একেবারেই পুষ্টিকর নয়। বর্তমানে চাষ প্রায় উঠেই গেছে। তখন যে ছিল, তা পূর্ববাংলা জলের দেশ হবার কারণে। বর্ষায় ওদেশের মাঠঘাট মাসকয়েক জলে ভরতি থাকে। তারপর যখন শুকোতে শুরু করে, দিন কয়েক মাঠ জুড়ে শুধুই কাদা। সেই কাদার উপর তখন ছড়িয়ে দেওয়া হয় খেসারি কলাইয়ের বীজ। লাঙল দেবার দরকার হয় না। কাদার উপর সেই খেসারি কলাই অঙ্কুরিত হয়ে বেড়ে উঠলে বেশিটাই হয় বাড়ির গরু খাদ্য। তারপর মাঠে যেটুকু অবশিষ্ট থাকে, জমির উর্বরতা বাড়াতে লাঙল দিয়ে মিশিয়ে দেওয়া হত মাটিতে। সেকালে রাসায়নিক সার ছিল না। সহজ প্রাপ্য এসব জৈব সারেই কাজ চলত। তাই যে পরিমাণ খেতে খেসারি কলাই বোনা হত, ডাল করা হত তার সামান্যই।

অগত্যা জমির খেসারি শাক গরু ছেড়ে খাইয়ে দেওয়ার কাজ চলত হামেশাই। তবে সে নিজের জমির খেসারি। শয়তানি করে কেউ লুকিয়ে-চুরিয়ে অন্যের খেসারি খেতেও ছেড়ে দিত গরু। ব্যাপারটা অল্পের উপর দিয়ে হলে তেমন মাথা ঘামাত না কেউ। কিন্তু বসন্তদাদু ব্যাপারটা সহ্য করেননি। আসলে তাঁর জমিতে এমন কখনো হয়নি। কেউ সাহস পায়নি। দাদু কাছের মানুষ হরিনাথকে সেই দিনই ডেকে পাঠালেন।

হরিনাথের বাস পাশের পাড়ায়। অনুগতদের একজন। ভালো বুদ্ধি রাখে। কাজটা কার, খুঁজে বের করতে তাকেই ভার দিলেন।

সেকালের গ্রামে প্রত্যেকে প্রত্যেকের চেনা। দিন দুয়েকের মধ্যেই হরিনাথ খবর নিয়ে এল, কাজটা খালপাড়ার রসময় হালদারের।

বসন্তদাদু ইতিমধ্যে যাদের সন্দেহের মধ্যে রেখেছেন রসময় তাদের একজন। গ্রামে উঠতিদের মধ্যে রসময়ের প্রতিপত্তিও যথেষ্ট। দুজনের মধ্যে বরাবর রেষারেষি। দিন কয়েক আগে এক ব্যাপার নিয়ে দু'জনের মধ্যে বড় এক ঝামেলাও হয়ে গেছে। সন্দেহ নেই, সেই রাগেরই বহিঃপ্রকাশ। তবে এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে ঝামেলা করা যাবে না। দাদু বললেন, 'এবছর রসময়ের কোন জমির খেসারি কলাই সবচেয়ে ভালো হয়েছে রে?'

'উত্তরপাড়ার জমিতে মাতুব্বরদা। দারুণ খেসারি। রসময়ের মতলব, ওই জমির খেসারি এবছর ডালের জন্য রাখবে।'

'বাঃ! আজ রাতে তুই আর আমি গরু নিয়ে জমির শাক খাইয়ে আনব। কেমন?'

শুনে হরিনাথের চোখদুটো জ্বলজ্বল করে উঠল, 'তাহলে গোয়ালের সব গরু নিয়ে যাব মাতুব্বরদা?'

'না-না, অতটা দরকার নেই। গোয়ালের দুধেল গাইটা নিয়ে যাব আমি। তোর গোয়ালেও তো দুধেল গাই আছে, সেটাই নিয়ে আসিস। ও আমার জমির যে ক্ষতি করেছে, তাতে ওর জমিতে দুটো গাইগরু খানিক সময় ছেড়ে দিলেই যথেষ্ট। মালুম পাবে।'

দু'জনের পরামর্শ হয়ে গেল বটে, কিন্তু সেদিন যে অমাবস্যার রাত, একেবারেই খেয়াল ছিল না। অবশ্য থাকলেও পরোয়া করতেন না। রসময়ের শয়তানির কারণে মাথা গরম হয়ে রয়েছে। রসময় যেমন শয়তানি করেছে, সমান মাপের শয়তানি করবেন তিনিও।

কথা ছিল, রাতে যথাসময়ে এসে হরিনাথ ডাক দেবে। বসন্তদাদু তৈরি হয়েই ছিলেন। শুয়েছেনও বাইরের কাছারিঘরে। নিশুতি রাতে সমানে ঝিঁঝির কোরাস তখন। দূর থেকে হুক্কা-হুয়া। তক্তপোষে শুয়ে দাদু এপাশ-ওপাশ করছেন। বাইরে থেকে হরিনাথের ডাক, 'মাতুব্বরদা, ও মাতুব্বরদা।'

ডাক শুনে দাদু উঠে বসেছিলেন। কিন্তু বাইরে বের হয়ে দেখতে পেলেন না কাউকেই। কাছারিঘরের সামনে মস্ত উঠোন। যদিও অমাবস্যার রাত। কিন্তু মেঘমুক্ত আকাশে তারার অভাব নেই। বিশাল আকাশের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত দুধ সাদা ছায়াপথ। সবাই বলে আকাশগঙ্গা। সেই আলোয় মস্ত উঠোন দৃশ্যমান। গ্রামের মানুষ রাতে এমন আলোয় অভ্যস্ত। বার কয়েক চোখ ঘুরিয়েও বসন্তদাদু কোথাও হরিনাথ বা তার গাই দেখতে পেলেন না। অথচ ডাক শুনেছেন পরিষ্কার। হরিনাথের গাই একটু বেয়াড়া গোছের। ভাবলেন, গরুর তাগাদায় হরিনাথ হয়তো তাকে ডাক দিয়ে এগিয়ে গেছে।

অগত্যা বসন্তদাদুও গোয়াল থেকে গরু নিয়ে পথে নেমে পড়লেন। ভেবেছিলেন, পথে নেমে হরিনাথের দেখা পেয়ে যাবেন। কিন্তু কোথায় কী! এতক্ষণে সামান্য টনক নড়ল। তবে কী তন্দ্রার ঘোরে ভুল শুনেছেন? হরিনাথ আদপেই আসেনি? দাদু এবার আকাশের দিকে তাকালেন।

তারার দিকে সামান্য নজর করে মালুম পেলেন, গভীর রাত।

অমাবস্যার নিশুতি রাত। অন্য কেউ হলে হয়তো ফিরেই যেতেন। কিন্তু তিনি অন্য ধাতুতে গড়া মানুষ। পরোয়া করলেন না। এতটা পথ যখন এসেই পড়েছেন, ফিরে যাওয়া বোকামি। গরুর দড়ি হাতে মেঠো পথ ধরে আগের মতোই এগিয়ে চললেন।

রসময় হালদারের উত্তরপাড়ার জমি পৌঁছতে সময় লাগল না। কিন্তু জমির কাছে আসতে আচমকাই গরু কেমন বেয়াড়া আচরণ শুরু করল। হরিনাথের গরুর মতো তাঁর গরু বেয়াড়া নয়, নিতান্তই শান্ত। কখনই টানাহ্যাঁচড়া করতে হয় না। সেই গরু ছেড়ে দেওয়া হয়েছে লকলক করে বেড়ে ওঠা বিঘে তিনেকের মতো খেসারি শাকের খেতে। সামনে এমন লোভনীয় খাবার পেলে গরু কোনো দিকে তাকায় না। মুখ ডুবিয়ে খায়। অথচ সেদিকে লক্ষই নেই! খেতে থাকতেও চাইছে না। সমানে দড়ি টানছে। রেগে হাতের মুঠো পাকিয়ে দাদু গরুর পিঠে কিলও মারলেন গোটা কয়েক। কাজ হল না। ওই সময় খুব কাছে কে যেন খিঁক-খিঁক করে হেসে উঠল।

হঠাৎ সেই আওয়াজে বসন্তদাদু চমকে তাকিয়েছিলেন। হাত থেকে গরুর দড়ি ছুটে গেল। মুহূর্তে তাঁর সারা শরীর হিম হয়ে গেল। সাহসী মানুষ, জীবনে এত ভয় পাননি কখনো। শুধু ভয় নয়, দাদু বুঝতে পারলেন, তিনি হঠাৎ দিকও হারিয়ে ফেলেছেন। পুব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ সব গুলিয়ে একাকার। সারারাত হেঁটে মরলেও তিনি চিনে বাড়ি ফিরতে পারবেন না।

বলতে যতটা সময় লাগল, আসল ঘটনা ঘটতে তার এক শতাংশও লাগেনি। দড়ি ছুটে গরুটা ততক্ষণে খানিক এগিয়ে গেছে। বসন্তদাদু পড়ি কী মরি করে ছুটে গিয়ে গরুর লেজ টেনে ধরলেন। আশ্চর্য, গরুর লেজ ধরতেই তিনি অনেকটাই যেন নিজের মধ্যে ফিরে আসতে পারলেন। একটা ব্যাপার বুঝে ফেলেছিলেন, গরুর লেজ ছেড়ে দিলে বিপদ বাড়বে।

বসন্তদাদু গরুর লেজ আর ছাড়েননি। এক হাতে নয়, চেপে ধরেছিলেন দুই হাতে। তারই মধ্যে পিছনে বার কয়েক সেই খিঁক-খিঁক হাসি। সঙ্গে মনে হচ্ছিল চাপা গলায় কারা যেন ডাকছে তাঁকে। অনেক পুরুষ আর নারী কণ্ঠ।

'আয়—আয়, এদিকে আয়, আয়—আয়।'

সেই ডাকে অদ্ভুত এক মোহ ছিল। বসন্তদাদুর কেবলই মনে হচ্ছিল, পিছন ফিরে তাকাতে। তবে ভাবনাটা মাথায় উঁকি দিতেই মগজের অন্য কিছু কোষও সচল হয়ে উঠছিল, একদম নয় রে, একদম নয়।

কোনো দিকেই তাকাননি তারপর। গরু তাঁকে কোথায় নিয়ে চলেছে বুঝতে না পারলেও লেজ ছাড়েননি। ওইভাবে অনেকটা সময় হেঁটে দাদু যখন সাড় ফিরে স্বাভাবিক হতে পারলেন, তাকিয়ে দেখেন, নিজের বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে আছেন। গরু তাঁকে বাড়িতেই নিয়ে এসেছে। ওই তো কাছারিঘর! পাশে গোয়াল! উঠোনের প্রান্তে কাঠের দু'তলা বাড়ি। শোবার ঘর। বাড়িতে পৌঁছে গরুটাও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। একদম স্বাভাবিক। এবার বুঝলেন ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখেননি। শুনেছিলেন নিশির ডাক।

গভীর রাতে এভাবেই নাকি নিশি ডাক দেয়। সেই ডাক শুনে যে ঘর ছেড়ে বের হয়, আর ফিরে আসতে পারে না। আজ সঙ্গে গরুটা থাকায়, আর সময়মতো গরুর লেজ চেপে ধরার কারণেই প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছেন। ভাবতে গিয়ে অগ্রহায়ণ মাসের রাতেও তিনি দরদর করে ঘামতে শুরু করলেন।

হরিনাথের শেষ রাতে ডাকতে আসার কথা। বেচারা আবার তাঁকে ডাকতে বের হয়ে পড়ে কিনা ভিতরে সেই আশঙ্কা ছিল। হরিনাথ কিন্তু ডাকতে আসেনি। তবে ভোরের আলো ফুটতে মানুষটা প্রায় ছুটতে ছুটতে হাজির। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'মাতুব্বরদা, গত রাত্তিরে এক ভয়ানক ব্যাপার হয়ে গেছে।'

হরিনাথের মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে বসন্তদাদু বুঝলেন রাতে ভয়ানক কিছু ঘটে গেছে হরিনাথেরও। 'কী হয়েছে রে?'

'সে এক ভয়ানক ব্যাপার মাতুব্বরদা! শেষ রাতে ঘুম ভাঙেনি তখনো। হঠাৎই বাইরে তোমার ডাক শুনে ঘুমটা ভেঙে গেল। জানলা দিয়ে তাকিয়ে বুঝলাম ঘুম ভাঙতে দেরিই হয়ে গেছে। আমি যাইনি দেখে তুমি নিজেই ডাকতে এসেছ। তাড়াতাড়ি বের হতে যাব, পাশের ঘর থেকে মা বলল, হরি, এই রাতে যাচ্ছিস কোথায়?

'আসল কথা মাকে তো আর বলা যায় না। তাই তোমার কথা বললাম, মাতুব্বরদা ডাকতে এসেছে।

'শুনে মা বলল, মাতুব্বর ডাকতে এসেছে! কোথায়? আমি তো শুনলাম না!

'জানোই তো, মার অনিদ্রা রোগ আছে। অনেক রাতে ঘুমই হয় না। এপাশ-ওপাশ করে কাটে। অবাক হয়ে বললাম, জেগে ছিলে তুমি! শোননি কিছু?

'উত্তরে মাথা নাড়ল মা, কই কিছু শুনলাম না।

'মায়ের কথা বিশ্বাস হয়নি তবু। এদিকে দুবার ডাক দিয়ে তোমার সাড়া নেই আর। গলা খাঁকারি দিয়ে ডাকলাম। কোনো উত্তর এল না। তবু দরজা ফাঁক করে বাইরে তাকালাম। কেউ নেই কোথাও। ওধার থেকে মা বলল, কীরে, দেখলি কাউকে?

'উত্তরে মাথা নাড়তে মা বলল, খবদ্দার হরিনাথ। একদম বের হবিনে। ও নিশির ডাক। রাতের বেলা ওইভাবে ভুলিয়ে ডেকে নিয়ে মেরে ফেলে। এরপর আর ঘর থেকে বের হওয়া যায়?'

খানিক থম হয়ে থেকে দাদু বললেন, 'বের না হয়ে ভালোই করেছিস।'

এরপর একে একে সব কথাই খুলে বললেন। সব শুনে খানিক থম হয়ে থেকে হরিনাথ চলে গিয়েছিল তারপর।

বড় খবরটা এল তারপরেই। ভয়ানক খবর। খালপাড়ার রসময় হালদারের অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে। সুস্থ মানুষ শুয়ে ছিল ঘরে। সকালে বেলা হতেও কোনো সাড়া নেই দেখে বাড়ির অন্যরা ডেকে তুলতে গিয়ে দেখে মানুষটা বিছানায় মরে পড়ে আছে। ঘাড় মটকে ভাঙা। মুখে রক্ত। রসময় গ্রামের লাঠিয়াল দলের সর্দার। শক্তসমর্থ শরীর। সেই মানুষের ঘাড় এভাবে ভেঙে দেওয়া সহজ কথা নয়। পরে পুলিশ এসেও কিনারা করতে পারেনি। রসময়ের মৃত্যু রহস্যই থেকে গেছে।

শুনে হরিনাথের মা অবশ্য অন্য কথা বলেছিলেন। গ্রামে ক্ষমতা দখল নিয়ে দাদুর সঙ্গে রসময় হালদারের বিবাদ অনেক দিনের। রসময় এই দফায় একটা বিহিতের জন্য বড় মাপের কোনো গুণিনের কাছে গিয়েছিল। সেই গুণিনই তুকতাক করে রাতে নিশি নামিয়েছিল। গভীর রাতে বসন্তদাদুকে ডাকতে এসেছিল সেই নিশি। উপস্থিত বুদ্ধির জোরে রক্ষা পেয়ে যান তিনি। কিন্তু নিশিকে একবার ডেকে আনলে কারো প্রাণ না নিয়ে সে ফেরে না। এরপর সে নজর দিয়েছিল হরিনাথের দিকে। কিন্তু সেখানেও সফল হতে পারেনি। অগত্যা, যার ইচ্ছায় নিশিকে ডেকে আনা, ফিরে যাবার আগে সেই রসময়ের প্রাণ নিয়ে গেছে।

কথা শেষ করে হরিনাথ আরও বলেছিল, 'মাতুব্বরদা, মা কিন্তু আরও একটা কথা বলেছে।'

'কী?'

'বলেছে, এসব ব্যাপারে নিশি কিন্তু গোড়া ধরেও টান মারে কখনো-কখনো। মার তাই ধারণা, ছাড় পাবে না সেই গুণিনও।'

হরিনাথের মায়ের সেই অনুমান মিথ্যে হয়নি। দিন সাতেক পার হয়নি, কাছের বালিচর গ্রামের গুণিন ব্রহ্মপদ দাস ডাক পেয়ে গ্রামেই এক বাড়িতে গিয়েছিল ঝাড়ফুঁকের কাজে। সেখানে সেই কাজের সময় আচমকাই রক্তবমি। মৃত্যু অল্প সময়ের মধ্যেই। **কিশোর ভারতী**
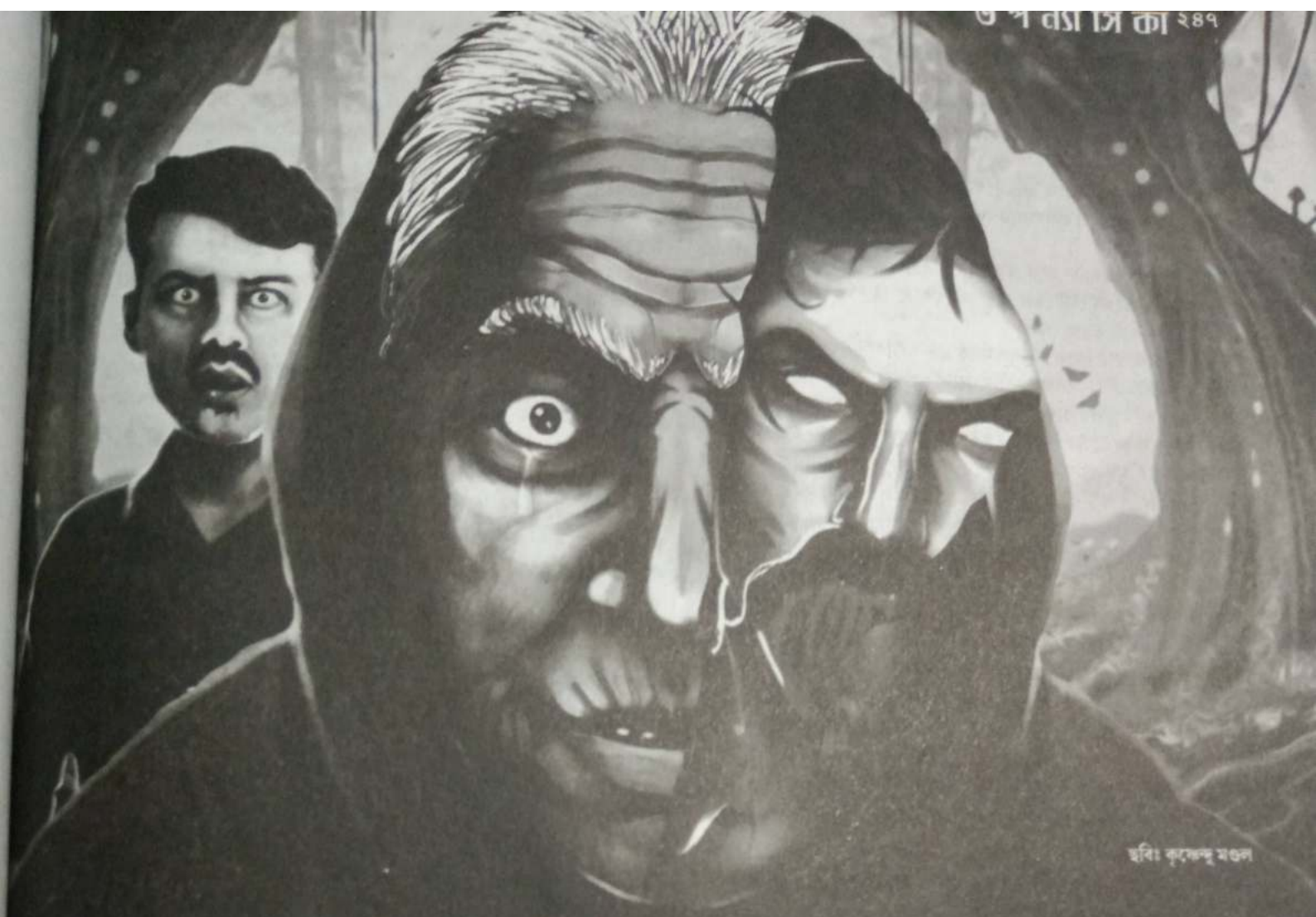
ছবি: কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল

ভবতারণ চাটুজ্জে ক্লাবঘরে ঢুকেই থমকে গেলেন।

চাটুজ্জেমশাই এই পাড়ায় এসেছেন প্রায় বছর দেড়েক হল। এই ক্লাবে তাঁর আড্ডা জমে নিত্যই। কিন্তু আজকের মতো এত থমথমে আবহাওয়া আগে দেখেননি তিনি। যে ক্লাবঘরে আড্ডা জমলে দূর দূর থেকে হই হই শোনা যায়, আজ সেখানে শ্মশানের স্তব্ধতা।

চট্টুজ্জেমশাই তক্তপোশে বসে একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার হে? আজ সবাই এত চুপচাপ কেন?'

ভজা মুখ ভেটকে বলল, 'কী আর করি বলুন, কেউ যদি ক্লাবে আসা ইস্তক গোটা সন্ধে ধরে কাঁদুনি গায়, হইহল্লা করার মেজাজ থাকে, আপনিই বলুন না?'

'সে কী! তা কার জীবনে এত দুঃখ শুনি?'

উত্তর দিল বিশুই। সে ধরা গলায় বলল, 'চাকরিটা ছেড়ে দেব চট্টুজ্জেমশাই। আর সহ্য হচ্ছে না।'

চট্টুজ্জেমশাই অবাক স্বরে বললেন, 'অ্যাঁ! এই তো ক'দিন আগেই মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভের চাকরিটা পেলে হে। মাস চারেকও হয়নি, এখনই ছাড়ার কথা ভাবছ কেন?'

গদাই খিঁচিয়ে উঠে বলল, 'বাবুর নাকি এত খাটাখাটনি পোষাচ্ছে না! রোদ বৃষ্টিতে এত দৌড়দৌড়ি, রেগুলার টার্গেটের প্রেশার, এসব নাকি উনি নিতে পারছেন না। তার ওপর বাবুর নাকি হাসপাতাল নার্সিং হোমে ঢুকলেই মনে হচ্ছে ডিসইনফেকটেন্টের গন্ধে নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়বেন। যত্ত সব ঢং!'

চট্টুজ্জেমশাই মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, 'শোনো বিশু, চাকরিটা অমন বিনা কারণে ঝট করে ছেড়ো না। মেডিক্যাল লাইনে কাজ করা কিন্তু মহা পুণ্যের কাজ হে। কত লোকের রোগশান্তি নিবারণ করো। কত লোকের প্রাণ বাঁচাও। কত লোকের আশীর্বাদ কুড়োও বলো তো। এসব কি কম পাওয়া হে?'

বিশু গোঁজ হয়ে বসে রইল। সেই দেখে কথা ঘোরানোর জন্য ভজা বলল, 'আচ্ছা চট্টুজ্জেমশাই আপনিও তো শুনি এককালে সেলসে কাজ করেছেন কিছুদিন। তা এই মেডিক্যাল লাইনেও ছিলেন নাকি কখনও?'

'না হে। দু-এক জায়গায় সেলসের চাকরি করে বুঝে গেছিলাম যে ওই লাইন আমার জন্য নয়। তারপর তো সরকারি চাকরির পরীক্ষা দিয়ে জঙ্গল দেখভালের চাকরিতে ঢুকে পড়লাম। সে চাকরি এত ভালো লেগে গেল যে আর ফিরে তাকাইনি। তবে আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু মেডিক্যাল লাইনে ছিল। আর তার সঙ্গে আমার একটা আশ্চর্য গা ছমছমে অভিজ্ঞতা হয়েছিল একবার। শুনবে নাকি?

নেকি অওর পুছপুছ? ভজা ঝট করে চা আর ফুলুরির অর্ডার দিয়ে এল। বিশু নিজেই গিয়ে জানালা টানালা বন্ধ করে একটা কচ্ছুয়া মার্কা কয়েল জ্বালিয়ে দিয়ে এল। আমরা ঘিরে বসলাম চট্টুজ্জেমশাইকে। গলা খাঁকারি দিয়ে শুরু করলেন চট্টুজ্জেমশাই।

'তখন আমার জোয়ান বয়েস। সবে চাকরি পেয়েছি। পোস্টিং বাঁকুড়া-বর্ধমান রেঞ্জে। অফিস দুর্গাপুরে। অফিসে অবশ্য কমই হাজিরা দিতে হয়, জঙ্গলে জঙ্গলেই কেটে যায় বেশিরভাগ সময়। একটা দোতলা বাড়ির একতলাটা ভাড়া নিয়ে থাকি। একটা ছোকরা গোছের ছেলে সঙ্গে থাকে, রান্না বান্না করে, ফাইফরমাশ খাটে, এটা ওটা এনে দেয়। ঠিকে-ঝি এসে দুবেলা বাসন মেজে দেয় আর ঘর ঝাট দিয়ে যায়। আমি চাকরি করি, জঙ্গলের সৌন্দর্যে ডুবে যাই, আর শহরে ফিরে এসে আড্ডা মেরে বেড়াই।

এমন সময় আলাপ হল সংগ্রামের সঙ্গে।

সংগ্রাম শ্যামবাজারের বনেদি রায়চৌধুরী বাড়ির ছেলে। পড়াশোনা মিত্র ইনস্টিটিউশন আর সিটি কলেজে। চাকরি করে একটি নামী ফার্মা কম্পানিতে, অ্যাজমা ডিভিশনের মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ, অর্থাৎ এম আর হিসেবে। এরিয়া ছিল বাঁকুড়া, পুরুলিয়া আর বর্ধমান। হেড কোয়ার্টার দুর্গাপুর। মাস দুয়েক আগে ওই এলাকায় কাজে ঢুকেছে। বয়সে আমার থেকে পাঁচ ছ'বছরের ছোট হলে কী হবে, বিলক্ষণ চতুর আর বলিয়ে কইয়ে বলে দুদিনেই আলাপ জমে গেল।

দুজনেরই ঘোরাঘুরির নেশা। সারা সপ্তাহ কাজে কম্মে ব্যস্ত থাকি। আর উইকেন্ড হলেই আশেপাশের জায়গাগুলোতে ঘুরে বেড়াই। এই করে পুরো জঙ্গলমহল, মায় ঝাড়খণ্ডের আদ্ধেকটা ঘোরা হয়ে গেল। তখন অবশ্য ঝাড়খণ্ড হয়নি, জায়গাটা বিহারের অংশ ছিল।

একবার এরকমই ঘুরতে বেরিয়েছি। শীতকাল। আমাদের গন্তব্য পাঞ্চেত ড্যাম আর সংলগ্ন বন জঙ্গল।

গাড়ি চলছে আশির ওপর। জানালার কাচ নামানো। জানালা দিয়ে দিব্যি ফুরফুরে হাওয়া আসছে, অথচ সংগ্রামের মুখ দেখি ভার। হুঁ হাঁ ছাড়া কথাই বলছে না। কপালে চিন্তার ভ্রুকুটি। অন্যমনস্ক হয়ে আছে। দু-একবার জিগ্যেস করলাম কী হয়েছে। কিন্তু চাপাচাপিই সার, কিছুতেই কিছু বলে না।

অবশেষে একজায়গায় চা খেতে বসে ছোকরাকে চেপে ধরলুম। অনেক পীড়াপীড়ির পর মুখ খুলল। তারপরেই জানতে পারলাম তার ভ্রুকুটির কারণ।

কোম্পানি নাকি ছোকরার ওপর হঠাৎ করেই বিপুল টার্গেট চাপিয়ে দিয়েছে। সে নাকি দুশো পার্সেন্ট গ্রোথ ডেলিভার করার মতো ভয়াবহ ব্যাপার। সপ্তাহ ধরে পাগলের মতো ডাক্তার, হাসপাতাল, নার্সিং হোম করেও কিছু সুবিধে হচ্ছে না। এদিকে মাস্থ এন্ড সামনেই। টার্গেট না করতে পারলে চোখে সর্ষেফুল দেখা নিশ্চিত।

ওর অবস্থা দেখে আমিই ওকে একটা পথ বাতলালাম।

সেই সময় একটা সরকারি স্কিম ছিল। সরকার থেকে গ্রামেগঞ্জে ওষুধ সাপ্লাই করার জন্য এলাকাভিত্তিক মেডিসিনের হোলসেলার বানান হতো। শুধু তাই নয়, সেই হোলসেলাররা রীতিমতো সাবসিডিও পেত সরকার থেকে। তার জন্য একটা আলাদা লাইসেন্স করাতে হতো। তবে তখন সরকারের সঙ্গে এম আর'দের ইউনিয়নের হেবি দোস্তি। ঘাঁতঘোঁত জানা থাকলে অনেক এম আর'ই ওই চ্যানেল ধরে রুরাল মেডিসিন স্টকিস্ট বানিয়ে টার্গেট করে নিত। লাইসেন্স টাইসেন্স কোনও ব্যাপারই না। ইউনিয়ন বললেই লাইসেন্স। ইউনিয়ন বললেই ব্যবসা।

তবে চাপ ছিল একটাই। সেক্ষেত্রে এম আর মশাইদের নিজেদের এরিয়ার গ্রামীণ এলাকা একেবারে নখদর্পণে রাখতে হতো। নইলে অডিট হলে চাকরি নট হতে বেশি সময় লাগত না।

আমার বাতলানো রাস্তাটা শুনে ঘাড় নাড়ল সংগ্রাম, 'কথাটা কি আমার মাথায় আসেনি চট্টুজ্জেদা? কিন্তু সবে দুমাস হল এখানে ট্রান্সফার হয়ে এসেছি। এখনও দুর্গাপুর বর্ধমানই ঠিকঠাক চিনে উঠতে পারলাম না। গ্রামগঞ্জের তো কথাই নেই! এই ক'দিনে তিন-তিনখানা জেলার কোথায় কোথায় কোন বনে-বাদাড়ে ঘুরব আর স্টকিস্ট অ্যাপয়েন্ট করব বলো তো?'

ততদিনে কাজের সুবাদে জঙ্গলমহলের অনেক গ্রামগঞ্জই চিনে ফেলেছিলাম। ভাবলাম ছেলেটাকে একটু হেল্প করি। বেশি কিছু না, চেনাজানা জায়গায় নিয়ে যাওয়া, আলাপ করিয়ে দেওয়া, এই তো। আমি মৃদু হেসে অভয় দিলাম ওকে।

আগেই বলেছি, তখন সবে শীতকাল শুরু হয়েছে। বর্ষার শুরু আর শীতকাল, এইসময়েই শ্বাসকষ্ট বাড়ে। বছরের এই দুটো সময়ই অ্যাজমা পেশেন্টদের জন্য অত্যন্ত প্রাণঘাতী। আমার ঠাকুর্দা ছিলেন ক্রনিক অ্যাজমার পেশেন্ট। প্রায়শই শ্বাসকষ্টে ভুগতেন। মাঝে মাঝে অবস্থা এমনই গুরুতর হতো যে অ্যাস্থালিনের ইনহেলারেও শানাত না, ডেরিফাইলিন ইনজেকশনও দিতে হতো। তাই অ্যাজমা পেশেন্টদের কষ্টের ব্যাপারটা বুঝি।

পাঞ্চেত ড্যাম থেকে ফিরে আসার পরের সপ্তাহেই সংগ্রামকে নিয়ে চললাম রুরাল স্টকিস্টের খোঁজে। সঙ্গী আমার অনেকদিনের সুখ-দুঃখের ল্যামব্রেটা স্কুটারটা। এই বুড়ি স্কুটারটা যে আমাকে কত সার্ভিস দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

এখনও দুর্গাপুর থেকে বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর যাওয়ার সেই রাস্তাটার কথা মনে আছে। জঙ্গল ছাওয়া মায়ামেদুর রাস্তা। বড়জোড়া থেকে বেলিয়াতোড় হয়ে সোজা রাধানগরে ওঠে। সেখান থেকে জয়কৃষ্ণপুর হয়ে সোজা বিষ্ণুপুর। রাস্তায় একের পর এক ছায়ানিবিড় বাংলার গ্রাম। তাদের নামগুলোও বড় চমৎকার—কারসানি, হাসিগ্রাম, পাঞ্চাল ইত্যাদি।

প্রথম থামলাম কারসানিতে। একটানা গাড়ি চালিয়ে গলাটা শুকিয়ে গেছিল। তাই একটা ঝুপড়ি আর তার সামনে মাটির উনুনে বসানো কেটলি নজরে আসামাত্র স্কুটারটা দাঁড় করালাম। দোকানের সামনে একটা নড়বড়ে বেঞ্চ। সেখানে কয়েকজন স্থানীয় লোক বসে রাজা উজির আওড়াচ্ছিল। আমাদের দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আসুন বাবু, বসুন।'

আমরাও যথেষ্ট শহুরে গাম্ভীর্যের সঙ্গে ভাঙা বেঞ্চিতে গিয়ে বসলাম।

চা আর লেড়ো বিস্কুট খেতে খেতে এদিক ওদিক তাকিয়ে মন প্রসন্ন হয়ে গেল। চারিদিকে উঁচু উঁচু শাল সেগুন গাছের সমারোহ। যতদূর চোখ যায় মাটি ছেয়ে আছে শুকনো পাতায়। বাতাসে একটা শিরশিরানি ভাব। রাস্তা দিয়ে আদিবাসী মেয়েদের দল মাথায় শুকনো কাঠকুটো চাপিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

চায়ের দাম দিয়ে উঠে আসছি, এমন সময় একটা বুড়ি কাছে এসে দাঁড়াল। মাথার শন পাকানো চুল, সারা গায়ে কুঁকড়ে যাওয়া চামড়া, পরনে নোংরা শতছিন্ন শাড়ি। বুড়ি ফোকলা মুখে একগাল হেসে বলল, 'ও ছেইলারা, একলাই যে খাইয়ে লিলি, বুড়িটাকে কিছু দিবি নাই?'

বুড়িকে দেখেই সংগ্রাম নাক কুঁচকোল। ও একটু পিটপিটে গোছের, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালোবাসে। অমন শনের দড়ির মতো চুল, নোংরা হাত-পা আর পিচুটিভরা চোখ নিয়ে সামনে যদি কেউ এসে দাঁড়ায়, তাহলে এমনিতেই অভক্তি আসতে বাধ্য। সংগ্রাম 'হেই বুড়ি হ্যাট হ্যাট' করে তাড়িয়ে দিতে চাইল মহিলাকে। আমি চাপা গলায় বললাম, 'এসব কী অসভ্যতা হচ্ছে সংগ্রাম? এইভাবে কেউ কাউকে বলে?'

সংগ্রাম মুখটা বিচ্ছিরিভাবে বেঁকিয়ে বলল, 'তুমি চুপ করো। এইসব ডাটি ফিলদি ভিখিরি-টিকিরি দেখলেই আমার ঘেন্না করে।'

আমি আর কিছু বললাম না। কারও পছন্দ অপছন্দ তো আমি বদলাতে পারব না। দশটা টাকা দোকানিকে দিয়ে বললাম, 'বুড়িমাকে কিছু খেতে দিও।'

সংগ্রাম হ্যা হ্যা করে হাসতে হাসতে বলল, 'দেখো কাকা, টাকাটা আবার মেরে দিও না যেন—।'

দোকানি যেন কথাটা শুনে শিউরে উঠল। বিড়বিড় করে বলল, 'বাপ রি বাপ, ওই ডানবুড়ির টাকা মাইরে কি নিজের মরণ ডাইকে আনব ন কি গ?' তারপর আমাকে উদ্দেশ্য করে ফিসফিসিয়ে বলল, 'আপনার বন্ধুটাকে সাবধানে থাইকতে বলবেন বাবু। উ বুঢ়ি সিধা লোক লয়!'

কথাটায় তেমন আমল দিলাম না। গ্রাম্য লোকেদের অনেক কিছু ফালতু কুসংস্কার থাকে। সবকিছুতে কান দিতে নেই।

স্কুটারে স্টার্ট দিয়েছি কি দিইনি, এমন সময় দেখি বুড়ি একটু দূরে এসে দাঁড়িয়ে রইল। আমি কিছু বলার আগেই থুতু ফেলে বলল, 'তুঁই ভালো ছেইলা বঠিস। তবে উ ভালো লয়। উয়ার কপালে দুঃখ আছে!'

বুড়ির কথাটা যে এত তাড়াতাড়ি ফলে যাবে কে ভেবেছিল?

হাসিগ্রাম আসতে আসতে বুঝলাম সত্যিই কপালে দুঃখ আছে। অনেকক্ষণ ধরেই দেখছিলাম যে আকাশের মুখ ভার। এবার জঙ্গল ছাড়িয়ে খানিকটা খোলা রাস্তা পেতেই দেখলাম যে শীতের আকাশে অকালে জলভরা মেঘ। বৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। গাড়ির গতিবেগ বাড়াতেই হল। এদিকে সন্ধেও নেমে আসছে দ্রুত। আর মাঝে মাঝেই যে এ রাস্তায় হাতির দল নেমে আসে, সেটাও বড় চিন্তার কারণ।

গাড়ি চালাচ্ছি জোরেই। একটু এগোলেই জয়কৃষ্ণপুরের জঙ্গল, তারপরেই বিষ্ণুপুর। বৃষ্টি, সন্ধে আর হাতি, তিনটের যে-কোনও একটা নেমে আসার আগেই বিষ্ণুপুর পৌঁছতে হবে, এই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য।

কিন্তু এত করেও শেষরক্ষা হল না। ঠিক সন্ধের মুখে নামল প্রবল বৃষ্টি। আমরা তখন মাঝরাস্তায়। শীতের বৃষ্টি যে কী মারাত্মক তা নিশ্চয়ই সবার জানা। আমরা তড়িঘড়ি করে আশ্রয় নিতে একটা মস্ত বড় নিমগাছের নীচে দাঁড়ালাম।

এখনও দিব্যি মনে আছে দৃশ্যটা। স্কুটার বন্ধ করে দুই বন্ধু ভূতের মতো ভিজে চুপচুপে হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। নিমগাছটা মস্ত বড়, অত বড় নিমগাছ এই অঞ্চলে চট করে দেখা যায় না। গোড়াটা বেড় দিয়ে কোমরসমান উঁচু করে পাথরে বাঁধানো। সেখানে উঠে জবুথবু হয়ে বসলাম।

অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে, তাতে দশহাতের দূরের কিছু দেখা যায় না। আমার যে খুব অসুবিধা হচ্ছে তা নয়। তবে সংগ্রামের অবস্থা ইতিমধ্যেই বেহাল। সে জন্মে গ্রামগঞ্জ দেখেনি। জঙ্গল দেখার তো প্রশ্নই ওঠে না। তাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন সাহারায় একলা আটকে পড়েছে, অথচ হাতে কম্পাস নেই।

শীতে ঠকঠক করে কাঁপছি আর ভাবছি এখন বুনো হাতি চলে এলেই চিত্তির, এমন সময় কানে এল সাইকেলের বেলের ক্রিং ক্রিং আওয়াজ।

ডাইনে ঘাড় ঘোরাতেই দেখি শুঁড়ি পথ বেয়ে একটা লোক সাইকেল চড়ে এদিকেই আসছে। তোমরা অনেকেই হয়তো জানো না, তখন সাইকেলের পেছনের চাকার সঙ্গে ছোট্ট একটা ডায়নামো লাগান থাকত আর সামনে হ্যান্ডেলে লাগান থাকত একটা ছোট হেডলাইট। চাকা ঘুরলেই হেডলাইট জ্বলত। গ্রামেগঞ্জের অন্ধকার রাস্তায় চলতে খুব কাজের জিনিস ছিল সেটা।

বর্ষার অবিরল বারিধারার মধ্যে সেরকমই একটা ক্ষীণ আলো হেলতে দুলতে আমাদের সামনে এসে থামল। লোকটা বাঁকড়োর উচ্চারণে জিগ্যেস করল, 'কী বাবুরা এখানে আটক হই গেছেন ন কী?'

সংগ্রামকে দেখে মনে হল যেন হাতে চাঁদ পেয়েছে। সে তড়বড় করে পুরো ব্যাপারটাই খুলে বলল। এমনকী কীসের খোঁজে এসে আটকে পড়েছে সেটাও জানাল সাতকাহন করে।

লোকটার চোখদুটো অন্ধকারের মধ্যেই জ্বলজ্বল করে উঠল। সাগ্রহে জিগ্যেস করল, 'ওষুধ বিকেন বাবু? শ্বাসের ওষুধ? তাহলে আমার সঙ্গে আসেন।'

আমি তো অবাক। অ্যাজমার ওষুধ বেচি শুনে লোকটার এত আনন্দিত হওয়ার কী হল? তবে ভাবনাচিন্তার আর সময় পেলাম না। লোকটা সামনের দিকে হাঁটা শুরু করতেই সংগ্রাম আমার পেটে একটা কনুইয়ের গুঁতো মেরে এগোতে লাগল। আমি চাপা গলায় বললাম, 'এ কী, কোথায় যাচ্ছিস? জানা নেই, শোনা নেই, একটা লোকের কথা শুনে...'

সংগ্রাম চাপা গলায় বলল, 'আহ, চুপ করো তো। কোথায় আর যাবে। নিশ্চয়ই ওর বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেজার থেকে কারো বাড়িতে গিয়ে উঠলে ক্ষতি কি?'

অগত্যা আমিও পেছন পেছন চললাম। লোকটা এমন রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল যার মাথায় বড় বড় শালগাছের দল শাখাপ্রশাখা বিছিয়ে চাঁদোয়া বানিয়ে রেখেছে। ফলে অবিরাম ধারাপাত থেকে কিছুটা হলেও গা বাঁচিয়ে হাঁটতে থাকলাম। স্কুটারটা ওই নিমগাছের তলাতেই রয়ে গেল।

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কিছুটা হাঁটার পর হঠাৎ করেই সামনেটা পরিষ্কার হয়ে এল। ততক্ষণে বৃষ্টি প্রায় ধরে এসেছে। সন্ধের নিভে আসা অন্ধকারে সামনে ফুটে উঠল একটা ছোট্ট গ্রাম। বড়জোর দশ-বিশ ঘর বাসিন্দা। আর গ্রামের একদম সামনে একটা সাজানো গোছানো মাটির দোতলা বাড়ি, মাথায় টিনের ছাউনি। এরকম বাড়ি বাঁকুড়ার গ্রামেগঞ্জে হরবখত দেখা যায়।

লোকটা সেই বাড়ির দাওয়ায় উঠে একটা হাঁকার পাড়ল, 'ও বুন্টির মা, দ্যাখ কারা আইসেছেন!'

একটু পরেই এক মহিলার অবয়ব দেখা গেল ঘরের দাওয়ায়। গলা অবধি ঘোমটা টানা। পেছনে পেছনে একটি বাচ্চা মেয়ে, বছর দশেকের হবে। দাওয়ায় একটা হ্যাজাক জ্বলছিল। তার আলোয় দেখলাম ভারি মিষ্টি দেখতে বাচ্চাটি।

নিকোনো উঠোনের এক ধারে মস্ত ধানের গোলা। বাড়ির পাঁচিল ঘিরে ফণীমনসা আর নয়নতারার ঝোপ। এক কোনায় একটা করবী গাছ, তার গা বেয়ে হাসনুহানার লতা উঠেছে। বাড়ির সামনে একটা ট্র্যাক্টর রাখা। সব মিলিয়ে একটা বেশ সম্পন্ন গৃহস্থের চিহ্ন। বাড়িটার সর্বত্র গ্রামবাংলার চিরপরিচিত লক্ষ্মীশ্রী ছড়িয়ে আছে।

গৃহস্বামীর আদেশে শুকনো গামছা এল। তাতে গা মাথা মুছে উঠতেই দেখি আমাদের সামনে দুই গ্লাস গরম ধোঁওয়া ওঠা চা হাজির। আমি চা খাই না, তাই সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলাম। সংগ্রাম আমাকে অবাক করে দিয়ে দু-দু'গ্লাস চা একাই খেয়ে নিল।

চা শেষ হতেই লোকটা কাজের কথা পাড়ল। ও এই এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। টাকাপয়সার কমতি নেই। এখন চাষবাস ছাড়াও অন্য কিছু ধান্দাপানির ফন্দিফিকির খুঁজছে। এই এলাকায় ওষুধ-বিষুধের দোকানপত্তর বিশেষ নেই। বিপদে-আপদে বিষ্ণুপুর বা বাঁকুড়াই ভরসা। আমরা কি ওকে কোনও ওষুধের সাপ্লাইয়ের ব্যবসা দিতে পারি?

এ তো দেখি মেঘ না চাইতেই জল! সংগ্রাম তো পারলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে তড়বড় করে নিজের কোম্পানি, কোম্পানির ওষুধ, কী কাজে লাগে—

বিস্তারিত জানাল। তারপর এই ব্যবসায় নামতে গেলে কত ইনভেস্টমেন্ট প্রয়োজন এসবও বোঝাল লোকটাকে। লোকটা তুড়ি মেরে বলল, 'টাকার লাইগে চিন্তা করবেননি বাবু। যে টাকা বইলছেন তার তিনগুণা টাকা সোবসময় আমার কোঁচড়ে গুঁজা থাকে। বলেন, এখনি বের কৈরে দিব?'

সংগ্রাম ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলার আগেই ভেতর থেকে গরম গরম লুচি তরকারি এল। আমার যদিও বিশেষ ইচ্ছে ছিল না খাওয়ার। জানি না কেন অনেকক্ষণ থেকেই আমার কেমন যেন গা গুলোচ্ছিল। তবে আশ্চর্য হলাম সংগ্রামকে দেখে। শ্যামবাজারের বনেদি রায়চৌধুরীবাড়ির একমাত্র শিবরাত্রির সলতে শ্রীমান সংগ্রামকুমার, যে নাকি 'প্রপার প্লেস অ্যান্ড অ্যামবিয়েন্স' না হলে কিছু খেতেই পারে না, সে দেখলাম দিব্যি হাত না ধুয়েই মাটির দাওয়ায় বাবু হয়ে বসে গোগ্রাসে লুচি তরকারি খাচ্ছে। আমার সঙ্গে একবার চোখাচোখি হতে একগাল হেসে বলল, 'তুমিও কিন্তু একবার টেস্ট করে দেখতে পারতে চাটুজ্জেদা। দুর্দান্ত টেস্ট।'

সংগ্রামের লুচি-তরকারি খাওয়া শেষ হলে আমরা উঠে পড়লাম। ততক্ষণে লোকটা রেশন কার্ড ইত্যাদি নিয়ে এসেছে। সংগ্রাম সেসব দেখে জানাল দুদিনের মধ্যেই সব পেপার টেপার নিয়ে চলে আসবে ও।

লোকটা সেই নিমগাছ অবধি আমাদের পৌঁছে দিল। পুরো রাস্তাটা সংগ্রাম আর লোকটা ব্যবসার ব্যাপারে বকবক করতে করতে এল। কী কী কাগজপত্তর লাগবে, কবে কত টাকা দিয়ে প্রথম স্টকের লট কিনতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

বৃষ্টি থেমে গিয়ে আকাশ এখন পরিষ্কার। আমার বহু সুখ দুঃখের সঙ্গী ল্যামব্রেটাটা এক কিকেই মৃদু গর্জন করে উঠল। আমরা লোকটাকে বিদায় জানিয়ে বিষ্ণুপুরের দিকে রওনা দিলাম।

এই ঘটনার পর প্রায় হপ্তা দুয়েক কেটেছে। ইতিমধ্যে অফিসের চৌহদ্দির মধ্যে আবির্ভূত হয়েছে কালান্তক সেকেন্ড কোয়ার্টার অডিটের দুন্দুভিধ্বনি। সেই বজ্রনির্ঘোষে আমাদের কান পাতা দায়। সবাই চাকরি বাঁচানোর তাগিদে ঊর্ধ্বশ্বাস ছোটাছুটি করছি, এমন সময় হঠাৎ একদিন অফিসের পিওন রমজান এসে বলল, আমার নামে নাকি আর্জেন্ট ফোন কল। রিসেপশনে কে যেন ফোন করে বলেছে ভবতারণ চট্টোপাধ্যায়কে এক্ষুনি চাই, যে করেই হোক।

বিরক্ত যে বেহদ্দ হলাম সে বলাই বাহুল্য। একে অফিসের কাজের চাপ, তার ওপর এই উটকো উৎপাত। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ফোনের রিসিভার কানে তুলে বললাম, 'হু ইজ দিজ?'

ওপার থেকে ভেসে এল, 'আমি অ্যাজমাটেক কোম্পানির দুর্গাপুরের ডিস্ট্রিবিউটর সুশীল আগরওয়াল বলছি। আপনি সংগ্রাম রায়চৌধুরীর বন্ধু ভবতারণ চট্টোপাধ্যায় বলছেন কি?'

'হ্যাঁ, কেন বলুন তো?'

ওপার থেকে কিছুক্ষণ সতর্ক নৈঃশব্দ্যের পর সুশীল আগরওয়াল বললেন, 'দাদা, আজ একবার আমার অফিসে আসতে পারবেন? আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে। খুব জরুরি।'

বিরস স্বরে বললাম, 'কেন?'

সুশীলবাবু একটু ইতস্তত করে বললেন, 'আপনার সঙ্গে সংগ্রামের লাস্ট কবে দেখা হয়েছে দাদা?'

খানিক ভেবে বললাম, 'এই তো হপ্তা দুয়েক আগেই। একসঙ্গে বিষ্ণুপুর গেছিলাম। সেখান থেকে নতুন একটা রুরাল স্টকিস্টের খোঁজ নিয়ে এলাম। তারপর থেকে আমি অফিসের কাজে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছি যে... কেন? কী হয়েছে?'

ফোনের ওপার থেকে খানিক ইতস্তত অস্বাচ্ছন্দ্যের পর ভেসে এল এই ক'টা কথা, 'সংগ্রাম ভালো নেই দাদা, একদম ভালো নেই। আপনি একবার আমার অফিসে আসবেন প্লিস?'

সুশীল আগরওয়ালের গলায় এমন একটা চাপা ভয় ছিল যেটা আমার কান এড়াল না। বলতে নেই, অজান্তেই আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল। আমি গলা নামিয়ে বললাম, 'কেন বলুন তো? এনি প্রবলেম?'

'আপনি আসুন না। ব্যাপারটা খুব কমপ্লিকেটেড। ওর বাড়িতেও বলতে ভরসা পাচ্ছি না। এদিক ওদিক খোঁজখবর করে আপনার খোঁজ পেলাম। তাই ফোনটা করেই ফেললাম।'

কিছুক্ষণ দোনোমনা করে সিদ্ধান্তটা নিয়েই ফেললাম। সুশীল আগরওয়ালের স্টক পয়েন্ট বেনাচিতিতে। আমার অফিস থেকে খুব বেশি দূর নয়। আমার স্কুটারে করে যেতে লাগবে ঠিক কুড়ি মিনিট।

'সংগ্রাম কোথায় এখন?'

আমার প্রশ্ন শুনে নড়েচড়ে বসলেন সুশীল আগরওয়াল।

সুশীলজির গোডাউনটা মেন রোড ছেড়ে একটু ভিতরের দিকে, একটা গলির মধ্যে। একটা বিল্ডিংয়ের একতলা আর বেসমেন্ট নিয়ে।

বসেছিলাম একতলার অফিসঘরেই। প্রায়ান্ধকার ঘরটার অর্ধেক জুড়ে আছে দুটো টেবিল আর তিনটে চেয়ার। একপাশে একটা মানুষ সমান উঁচু লোহার ক্যাবিনেট। তার ওপর ধুলোটে কাগজের ফাইল ডাই হয়ে আছে। ঘরের কোণে একটা নীচু প্লাস্টিকের টুলের ওপর জলের কুঁজো রাখা।

আমি আর সুশীলবাবু ছাড়া ঘরের মধ্যে আছে আরও দুটো ছেলে। বোঝা যায় যে এরা এই ডিস্ট্রিবিউশন হাউসের কর্মচারী। দেওয়ালে কালো রঙের হোল্ডারে লাগানো একটা হলুদ বাল্ব ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। সেদিকে তাকিয়ে শীতের মিঠে রোদটাও কেমন যেন শিরশির করে উঠল।

খানিক পর সুশীল আগরওয়াল বললেন, 'সেটাই তো সবচেয়ে বড় রহস্য দাদা। সংগ্রাম যে কোথায় সেটাই কেউ জানে না।'

আশ্চর্য হলাম, 'কেউ জানে না মানে? ওর ভাড়াবাড়িতে খোঁজ নেননি?'

'নিয়েছিলাম দাদা,' শুকনো গলায় বললেন সুশীলবাবু, 'ওখানেও নেই।'

'তার মানে?' অজান্তেই আমার ভুরু কুঁচকে গেল, 'লাস্ট কবে দেখেছেন ওকে?'

'এই দিন দশ-বারো আগে। আমার অফিসেই।'

'তারপর আর দেখা পাননি?'

'না।'

'বিষ্ণুপুর থেকে ফিরে আসার পর ওর সঙ্গে আমারও যোগাযোগ হয়নি। দেখুন হয়তো কোনও আর্জেন্ট মেসেজ পেয়ে কলকাতা চলে গেছে। ফ্যামিলি ম্যাটার হতে পারে, বা অফিসের কাজেও যেতে পারে।'

সুশীলবাবু মাথা নাড়লেন, 'না দাদা। সংগ্রাম অফিসের কাজে কলকাতা যায়নি। কলকাতার অফিসে খোঁজ নিয়েছি আমি।' সুশীলবাবু এবার গলা নামিয়ে বললেন, 'সংগ্রাম ওর কলকাতার বাড়িতেও যায়নি। ওর বাড়ির ঠিকানা ফোন নাম্বার আমি জানি। ওর বাড়িতে কল করে জানলাম যে গত দেড় মাস ধরে সংগ্রাম বাড়িতেই যায়নি। আর গত দু-হপ্তা ধরে যোগাযোগও করেনি।'

আলোটা একটু নিভু নিভু হয়ে এল। বাইরে মরা শীতের হাওয়া। জানি না কেন, আমার গায়ে একটু কাঁটা দিয়ে উঠল।

সুশীল আগরওয়াল আরও একটু ঝুঁকে এলেন। 'আপনাকে আরও কয়েকটা কথা বলা খুব জরুরি দাদা। তাই আপনাকে এখানে ডেকে আনা।'

সপ্রশ্ন চোখে চেয়ে রইলাম।

'যেদিন আপনি আর সংগ্রাম ফিরে এলেন বিষ্ণুপুর থেকে, তার পরের দিনের ঘটনা। সংগ্রাম সকাল সকাল অফিস এসে হাজির। দিনের টার্গেট একবার দেখে নিয়ে বেরোবে। স্টকিস্টের খোঁজ পেয়েছে কিনা জিগ্যেস করতেই সংগ্রাম ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, একজনের খোঁজ পেয়েছি। খুব ভালো পার্টি, পয়সাওয়ালা লোক। কাল যাব কাগজপত্তর আনতে। কথা বলার সময় দেখলাম সংগ্রাম সামান্য হাঁপাচ্ছে। জিগ্যেস করলাম, কী হে, হাঁপাচ্ছ কেন? দৌড়ে এলে নাকি? সংগ্রাম বলল, আরে তেমন কিছু না। কাল বৃষ্টিতে ভিজে বুকে একটু সর্দি বসেছে, আর কিছু না।

'তার পরের দিন শুনলাম সংগ্রামের জ্বর এসেছে। আমি শুনে ঝটপট করে একটা ছেলেকে দিয়ে কয়েকটা ওষুধ পাঠিয়ে দিলাম। একা থাকে, বাড়ি থেকে খাবার দাবারও রান্না করে পাঠালাম।'

শুনে আমার নিজেকে একটু অপরাধী মনে হল। সেদিনের পর থেকে

কাজের চাপে ছোকরার আর বিশেষ খবর নেওয়া হয়নি। অথচ বন্ধু হিসেবে এসব আমারই করার কথা।

বললাম, 'তারপর?'

'সংগ্রাম সেরে উঠতে সময় নিল দিন পাঁচ ছয়। এই ক'দিন আমার অফিসের একটা ছেলে, মানসের হাত দিয়ে নিয়মিত ওকে ওষুধ খাবার এসব পাঠিয়ে গেছি।

'শেষের দিন মানস এসে একটা অদ্ভুত কথা বলল। এই ক'দিন সংগ্রাম নাকি ওষুধ বা খাবার ওর হাত থেকে নেয়নি। দরজার আড়াল থেকে বলেছে বাইরে রেখে যেতে। এমনকী কথাটথাও বিশেষ বলেনি। আমি ভাবলাম, সর্দিকাশি ভয়ানক ছোঁয়াচে রোগ তাই হয়তো এই সতর্কতা।

'সংগ্রাম কাজে জয়েন করল আজ থেকে ঠিক এক সপ্তাহ আগে। দেখলাম একদম ফিট। অসুখ থেকে ফিরে ছোকরা একেবারে চনমনে ঝরঝরে হয়ে উঠেছে। আমারও দেখে ভালো লাগল। আমি পরের দিনই মানস আর সংগ্রামকে ওই লোকটার খোঁজে পাঠিয়ে দিলাম।

'দুজনে যখন ফিরে এল তখন মানসের ধুম জ্বর। আর ওরা নাকি দুজনে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও লোকটার কোনও হদিশ পায়নি। শুধু পড়ে আছে ফাঁকা বাড়ি তারও ভগ্নপ্রায় দশা। আমার মেজাজ গেল বিগড়ে। মানস হচ্ছে আমার ডান হাত। ও বসে যাওয়া মানে আমার কাজকর্মের ভয়ানক ক্ষতি। রাগের মাথায় দুটো কথা শুনিয়ে দিলাম সংগ্রামকে। একে তো টার্গেট মিট কীভাবে হবে কোনও কুলকিনারা পাচ্ছি না। তারপর এমন এক স্টকিস্টের খোঁজ নিয়ে এল, যার নাকি কোনও খোঁজই নেই।

সংগ্রাম আমার কথার একটাও উত্তর করল না। শুধু একবার ঘসঘসে স্বরে বলল, 'ওষুধ দাও সুশীলদা। ওষুধ চাই।'

'আমার মেজাজ গেল আরও খাপ্পা হয়ে। বললাম, একগাদা ওষুধ পথ্য বারদাবার দিয়ে ঠিক করলাম, তার জন্য একটা শুকনো ধন্যবাদ জানানো তো দূরস্থান, এখন ওষুধ চাই, ওষুধ চাই বলে চোটপাট করছিস? যা দেব না তোকে কোনও ওষুধ!'

শুনে মাথা নাড়লাম, বটেই তো। সুশীল আগরওয়াল ব্যবসায়ী মানুষ। ব্যবসার ক্ষতি হলে তাঁর রাগ করার হক আছে বইকি। প্রশ্ন করলাম, 'সংগ্রাম কী বলল?'

সুশীলবাবু একটু এগিয়ে এলেন, 'সেটাই তো সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা চ্যাটার্জিসাহেব। আগেই বলেছি আমার বকাবকি করার সময় সংগ্রাম একটি শব্দও করেনি। একটা কথাও বলেনি। আপনি যে চেয়ারটায় বসে আছেন, ঠিক ওই চেয়ারটাতেই বসে ছিল ও। মাথা নীচু করে। যেভাবে হেডমাস্টারের বকা শুনে বাধ্য ছাত্র মাথা নীচু করে বসে থাকে, ঠিক সেরকম। আমার শেষ কথাগুলো শুনে শুধু চোখ তুলল একবার। আর আমি চমকে গেলাম।'

ঘরের আলোটা ঠিক এইসময়েই ভোল্টেজ কমে একটু নিভু নিভু হয়ে এল। হঠাৎ করে শীতটাও একটু বেড়ে উঠল যেন।

সুশীলবাবু একটু ঝুঁকে এসে চাপা গলায় বললেন, 'কী বলব দাদা, সংগ্রামকে আমি ওই অবস্থায় কখনও দেখিনি। চোখ দুটো টকটকে লাল, নাকদুটো বুনো মোষের মতো ফুলে উঠেছে, ঠোঁটের কোণে ফেনা। ছেলেটার গলাটা হঠাৎই যেন পালটে গেল। একটা অজানা ঘষা ঘষা গলায় বলল, ওষুধ চাই আমার, ওষুধ দে!

'কী বলব দাদা, ধক করে বুকের মধ্যে একটা ভয়ের ঝাপটা এসে লাগল। মনে হল সংগ্রামের মধ্যে কী যেন একটা ভর করেছে। খুব ভয়ের কিছু একটা। খুব খারাপ কিছু একটা।

'তবুও তার মধ্যেই সাহস জুটিয়ে বললাম, কীসের ওষুধ চাইছিস? যা, দেব না তোকে কোনও ওষুধ।

'সংগ্রাম সেই রক্তলাল চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর সেই একই ঘষঘষে গলায় বলল, আমাকে ওষুধ দিবি না তুই? দেখ তাহলে তোর কী করি—'

জানি না সুশীলবাবুর বলা কথাটার মধ্যে কী ছিল, স্পষ্ট বুঝলাম আমার ঘাড়ের রোঁয়া দাঁড়িয়ে গেছে। শুকনো গলায় বললাম, 'তারপর?'

'ছেলেটা দুড়দাড় করে চেয়ার উলটে সেই যে বেরিয়ে গেল তারপর থেকে আর তার পাত্তা নেই।'

'ওর কলকাতার বসকে কিছু জানাননি?'

'ওর বস মুখার্জি সাহেবকে আমি ভালো করে চিনি। খুব কড়া লোক। তাঁকে তো কিছু খুলে বলাই যায় না। সংগ্রামের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না শুনে হয়তো ওর চাকরিটাই খেয়ে নিলেন। বেকার বেকার কেন সেই পাপের ভাগীদার হই?'

'আর ফ্যামিলি?' প্রশ্নটা করেই বুঝলাম ভুল করেছি। কারণ ওর পরিবার সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। অথচ ওর বন্ধু হিসেবে আমারই জানা উচিত ছিল। এবং এই প্রথম অনুভব করলাম যে আমাদের সম্পর্কটা কতটা অগভীর ছিল। আমরা পরস্পরের সঙ্গে আলাপ করেছি, হাসি ঠাট্টা করেছি, একসঙ্গে ঘুরতে গেছি, কিন্তু একে অন্যের জীবন সম্পর্কে জানার চেষ্টাই করিনি।

সুশীল আগরওয়াল আনমনে বলতে লাগলেন, 'আপনি নিশ্চয়ই জানেন, সংগ্রামের তিনকুলে আত্মীয় বলতে একমাত্র ওর মা। বাবা মারা গেছেন অনেকদিন। ভাই বোন কেউ নেই। ওরা অনেক পুরোনো বনেদি পরিবার। এককালে নদীয়া চব্বিশ পরগনা জুড়ে বিশাল জমিদারি ছিল। এখনও শ্যামবাজারের মোড়ে ওদের মস্ত বড় বাড়ি।

'আমার কাছে সংগ্রামের মায়ের ফোন নাম্বার ছিল। কিন্তু সত্যি বলতে কী, ওঁকে ফোন করার সাহস হয়নি। বয়স্ক মহিলাকে উতলা করে কী লাভ? সংগ্রাম কোথায় আছে তার উত্তর তো আমার নিজের কাছেও নেই।'

'পুলিশে খবর দেননি কেন?'

প্রশ্নটা শুনে সুশীল আগরওয়ালের মুখে অস্বস্তি আর ভয়ের ছায়া খেলে বেড়াতে লাগল। আর আমি এই প্রথম অনুভব করলাম যে সুশীলবাবুর গল্পের মধ্যে একটা মস্ত ফাঁক থেকে গেছে। আর সেই ফাঁকে অত্যন্ত অস্বস্তিকর কিছু একটা আছে যা লোকটা বলতে চাইছে না।

আমি আবারও জিগ্যেস করলাম, 'পুলিশে খবর দেননি কেন?'

সুশীল আগরওয়াল কিছু বললেন না। উঠে আমার হাত টেনে বললেন, 'আসুন একবার।'

বিষ্ণুপুরের দিকে গাড়িতে যেতে যেতে অনেকগুলো চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। বাইরে অলস দুপুর। আকাশে অকাল মেঘ। অ্যাম্বাসাডারের খোলা জানলা দিয়ে ঢুকে আসছে শিরশিরে বাতাস। বাইরে জনমানুষ নেই।

পেছনের সিটে বসেছিলাম আমি আর সুশীল আগরওয়াল। গাড়ি চালাচ্ছিল মানস। হ্যাঁ, মানসকেই ওষুধ খাইয়ে চাঙ্গা করে আনা হয়েছে আমাদের সঙ্গে। কারণ জঙ্গলের মধ্যে ওই বাড়িটা কোথায় সেটা একমাত্র ওই-ই নির্ভুলভাবে বলতে পারবে। আমিও সে রাতে দেখেছি বটে, কিন্তু সে ছিল ঘনঘোর বর্ষার রাত। সব কিছুই ঝাপসা অন্ধকারের মধ্যে দেখেছিলাম। আমার পক্ষে ও জায়গায় চিনে যাওয়া সম্ভব না।

আবার সেই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রাস্তা। এখন আকাশ পরিষ্কার। বাতাসে শীতের কামড়। মাঝে মাঝেই একটা লাল ধুলোর ঝড় পাকিয়ে উঠছে রাস্তার পাশে। তাতে মিশে যাচ্ছে শুকনো পাতা কুটো, আর একটা অজানা ভয়। জানি না কেন বুকের ভেতরটা থমথম করছিল।

যেতে যেতে ফের কারসানির সেই চায়ের দোকানের সামনে এলাম। সেই একই দোকান, একই বেঞ্চ, তবে এবার দেখলাম দোকানের সামনেটা ফাঁকা। লোকজন নেই। দোকানি উনুনের সামনে গালে হাত দিয়ে বসে আছে। তিনজনে নেমে এগিয়ে গেলাম। দোকানি বেজার মুখে বলল, 'কী দিব?'

বললাম, 'তিনটে চা দাও আপাতত। আর দুটো করে লেড়ো। তা আজ লোকজন নেই যে বড়?'

দোকানি বোধহয় এর অপেক্ষাতেই ছিল। ফ্লাডগেট খোলার মতো হুড়মুড় করে বলে গেল, 'আর বৈলবেন নাই বাবু। লোকের আক্কেল দেইখলে গা জ্বইলে যায়। বলি বুড়ি মইরবেক ন মইরবেক নাই তার ঠিক নাই ইদিকে লোকজন রাস্তায় বেইরানো বন্ধ কৈরে দিল। কী ভয়, ন বুড়ি সমর্থ লোক দেইখলেই উয়ার জান হাফটাই লিয়ে ফির বাঁইচে উঠবেক। এখন বুড়ি কবে মইরবেক তার লাইগে হা কৈরে বইসে থাকা যায়? বলি তদের একটা আক্কেল নাই? বুড়ি না মরা তক্ক সোব কাজ কম্ম বন্ধ

কৈরে বইসে থাকবি নাকি?'

প্রথমে ঠিক বুঝলাম না। দোকানির পো খুব উত্তেজনায় মনের ভাব ঘেঁটে ফেলেছে। কথার পারম্পর্য নেই। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে সুশীলদা বলল, 'কী কেস কাকা? খুলে বলো তো।'

'আমাদের গাঁয়ে একটা বুড়ি আছেন বাবু। উয়ার নকি লজর ভালো লয়। কবে যেন উয়ার আসেপাশের ঘরগিলায় গরু ছাগল মাইনষের মড়ক লাইগে গেইছল। তখন জানগুরু আইসে কড়ি চাইলে বৈলে দিয়ে গেইছিল উ ডাইন বঠে। সেদিন থাইকেই বুড়ি একঘইরা। কারো ঘর যাইতে পারে নাই, কারো বথুইল এ উইঠতে পারে নাই। পেটের জ্বলনে আমার দকানের কাছে ঘুইরে মরে, খৈদ্দেরের কাছে মাইগে খায়। বাবুরা কেউ দয়া কইরে কিছু মিছু কিনে দেই বা দুটা পইসা দেই। নাইলে রাইতে দকান বন্ধ করার সময় আমিয়েই একটা পাউরুটি নাইলে দুটা বিস্কুট দি।'

আমার হঠাৎ আগের দিনের কথাটা মনে পড়ে গেল। জিগ্যেস করলাম, 'কী হয়েছে বুড়ির?'

'চাইর পাঁচ দিন হইল বুড়ির অবস্তা ভালো লয়। মর মর প্রায়। আর ইদিকে প্রায়ই লোকের ঘরে মুরগি ছাগল হাপিস হৈ যাচ্ছে। জানগুরু বৈলছে ইটা পারা ওই বুড়িরই কাজ।'

আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'যে বুড়ি মরো মরো সে রাতের বেলা ছাগল মুরগি চুরি করছে? লোকে কী পাগল?'

দোকানি খানিক চুপ করে বসে রইল। তারপর গলা নামিয়ে বলল, 'কী বৈলব দাদা, গত কদিন হইল বিষ্টুপুর থিইকে ইদিকে সাতটা গাঁয়ের লোক ডরে কাটা হইয়ে আছে। রাইত হইলেই ন কী গাঁয়ের পাশের জঙ্গল দিকের থিকে অদ্ভুত অদ্ভুত আওয়াজ আসছে। কখনু ছুটু বিটিছানার কাঁদার শব্দ, কখনু মরদ মায়া মানুষের বুক চাপড়াই কাঁদার শব্দ, কখনু চিৎকার। কুথা থিইকে এই আওয়াজ আইসছে কেউ জানে নাই। জুয়ান ছেইলা পেইলারা মিলে দিনের বেলায় যাইয়ে দেইখেছে কাঁচা হাড়-মাংস ছইড়াই আছে বনের ভিত্রে।

দুদিন আগে হাসিগিরামের নয়ন সরেনের লাতি রাতের বেলা বাজার থিইকে গাঁ আসছিল। সে ন কি দেখছে বনের ভিত্রে কে জানি আতিপাতি কইরে কী একটা খুঁইজছে। সে ছকরা ত মারাংবুরুহুর নাম লিয়ে কাঁইপতে কাঁইপতে ঘর ঢুইকে বেহুঁশ। সেই থাইকে রটনা হই গেছে ওই ডাইন বুড়িই রাইতের বেলা শাল গাছে চাইপে আসেপাশের গাঁয়ে সমর্থ মরদ বা মাইয়া মানুষ খুঁইজে বুইলছে। জান হাফটাই লিয়ে ফের বাইছে উঠবেক বইলে।'

চা খেতে খেতে পুরো গল্পটা শুনলাম। বলতে নেই এসব গল্পগাছায় আমার কোনওদিনই আস্থা ছিল না। তবে সংগ্রামের কথাটা শুনে ইস্তক মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি খচখচ করছিল। দোকানিকে জিগ্যেস করলাম, 'বুড়ি যে মরতে বসেছে সে জানলে কী করে?'

'গত সম মঙ্গল দুদিন আইসেনাই দেইখে বুড়ির ঘরে যাইয়ে দেখি বুড়ি বেদম জ্বরে পইড়ে আছে। কাঁথা-লাতা গু মুতে একাকার। পাড়ার একটা মায়ামানুষকে দিয়ে সব সাফ করালাম। সেই গায়ে হাত দিয়ে বৈল্ল গা পুইড়ে যাইচ্ছে একদম। আমি ওঝাকে ডাকতে গেলম, ওঝা সিধা বলে দিল ডাইনের লাইগে কোনও ওষুদ দিবেক নাই। সেই থিকে বুড়ি ওমনি পইড়ে আছে। ডাইকলে রা দেয় নাই। আমি যাই রুটি ফল পাকুড় দিয়ে আসি, কোনদিন খায় কোনদিন খায় ন।'

বুঝলাম, দোকানির মনের মধ্যে খানিকটা মনুষ্যত্ব এখনও বেঁচে আছে। নইলে ডাইনিবুড়ির জন্য কেউ এত করে? মানস ঠাট্টার সুরে বলল, 'তা কাকা, তোমার তো দেখছি বুড়ির জন্য খুব দরদ?'

দোকানি ম্লান হেসে বলল, 'দকানের সামনে কুকুর বিড়াল ঘুরে বুইল্লেও মায়াজাল হই যায় বাবু। আর ইটা ত দেখুত মানুষ।'

কথাটা বুকের মধ্যে ধক করে লাগল। তাই তো, কথাটা তো এভাবে ভেবে দেখিনি। মানুষের জন্য এটুকু না করলে আর নিজেকে মানুষ বলি কেন? উঠে পড়ে বললাম, 'বুড়ির কাছে নিয়ে চলো তো কাকা।'

বুড়ির কপালে হাত দিয়েই সুশীলদা আঁতকে উঠল, 'এর তো সাঙ্ঘাতিক অবস্থা, বেঁচে আছে কী করে?'

সুশীলদার কথাটা যে নেহাত ফেলনা নয় সেটা বুড়ির অবস্থা দেখলেই বোঝা যায়। ভাঙা কুঁড়েঘরের মেঝেয় একটা শতচ্ছিন্ন নোংরা গদির ওপর বুড়ির শীর্ণ দেহটা মড়ার মতো পড়ে আছে। গায়ে একটা জীর্ণ মলিন কাঁথা। চোখ দুটো উলটে দেখল সুশীলদা, করমচার মতো লাল।

সুশীলদা মেডিকেল লাইনের লোক বলে কিনা জানি না, দেখলাম যে ওর গাড়িতে একটা ফার্স্ট এইড বক্স আছে। তাতে অনেক কাটাছেঁড়ার ওষুধের সঙ্গে বেশ কিছু জ্বরজারির ওষুধপত্তরও আছে। সুশীলদা প্রথমেই বুড়ির মুখের মধ্যে সযত্নে একটা থার্মোমিটার ঢুকিয়ে দিল। ততক্ষণ আমি ঘরের চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম।

ঘরের মধ্যে ওই গদি ছাড়া আসবাবপত্র বলতে একটা পুরোনো কুঁজো আর দু-চারটে আধভাঙা বাসনকোসন। এক কোণে ডাঁই করে রাখা একটা সানকির থালা, একটা নোংরা স্টিলের গ্লাস, দুটো পোড়ামাটির হাঁড়ি, আরও দু-চারটে ধূলিমলিন সাংসারিক জিনিসপত্র। আরও এক কোণে একটা কেলেকুষ্টি চৌপায়ার ওপর একটা ফাটা ফ্রেমে আটকানো ছবি। তার ওপর এত তেল সিঁদুর আর নোংরার পুরু আস্তরণ যে কোন দেবতা বা দেবীর ছবি বোঝাই দায়।

আমি, মানস, সুশীলদা ছাড়া সেখানে তখন উপস্থিত দোকানি, আর বুড়িকে দেখাশোনা করার জন্য এক মহিলা।

কিছুক্ষণ পর বুড়ির মুখ থেকে থার্মোমিটারটা বার করেই আর্তনাদ করে উঠল সুশীলদা, 'আরে বাপরে, এ তো ১০৩ ডিগ্রি জ্বর দেখাচ্ছে! নির্ঘাত অ্যাকিউট নিউমোনিয়া। এক্ষুনি হাসপাতালে ভর্তি না করলে আজকের রাত্তিরটা কাটবে না।'

মানস আর আমি কাজে লেগে গেলাম। মানসের তত্ত্বাবধানে সঙ্গে মহিলাটি ঝটপট ঘর পরিষ্কার করা শুরু করে দিল। গাড়িতে কিছু খাবার রাখা ছিল। আমি সেখান থেকেই বুড়িকে একটু কিছু খাইয়ে দিলাম। খাওয়ানো শেষ হলে সুশীলদা দুটো ট্যাবলেট গুঁড়ো করে অল্প জলে মিশিয়ে চামচে দিয়ে অল্প অল্প করে বুড়িকে খাইয়ে দিল।

তারপর সুশীলদা মানসকে দিয়ে গাড়ি থেকে একটা ব্যাগ আনালো। সেখান থেকে বেরোল একটা সিরিঞ্জ আর অ্যাম্পুল। তারপর টোকা দিয়ে অ্যাম্পুলের মাথা ভেঙে সিরিঞ্জে ওষুধ ভরে বুড়ির হাতে পুশ করতে টাইম লাগলো ঠিক দু'মিনিট।

আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'তুমি ইঞ্জেকশন দিতে জানো নাকি?'

'না জানার কী আছে। এই লাইনে আছি পনেরো বছর। প্রেশার মাপা, ইঞ্জেকশন দেওয়া অনেক কাজই পারি। সবই ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে সঙ্গে থেকে শেখা।'

'কী ওষুধ দিলে সুশীলদা?'

সুশীলদা ওষুধের ব্যাগ গুছোতে গুছোতে বলল, 'জ্বরের ট্যাবলেট দিলাম আর অ্যাজমার ইঞ্জেকশন। তবে এতে শানাবে না। এখন বুড়ির দরকার অ্যান্টিবায়োটিকের কড়া ডোজ, ঠিকঠাক বিশ্রাম আর নিয়মিত নজরদারি।'

কথাটা শুনে দোকানি ম্লান হাসল, 'সেসব ইখেনে কুথায় পাব বাবু? এই বন ধারে ডাক্তার হাসপাতাল কুথায়? ছোটমোট কিছু হইলে বনের পাতা শিকড় দিয়ে কাজ চালাই। আরটুকু বেশি হইলে ওঝা জানগুরু এরাই ভরসা।'

'পার্টির লোকেদের বলো না কেন?'

দোকানির ঠোঁটের কোণে একটা ম্লান বাঁকা হাসি দেখা গেল, 'পার্টির লোক আসে শুদু ভোটের আগটয়। হাসপাতাল ডাক্তারঘর এইসব লিয়ে অনেক কথা বইলে যায়। কিন্তুক অবস্তা যেই কে সেই। কাউকে সাপে কাইটলে সেই বিষ্টুপুর সদরে ছুট। বেশিরভাগ রোগী ত পৌঁছাতে পৌঁছাতেই মইরে যায়।'

কথাটা যে মিথ্যে নয় সে আমিও জানি। তাই আর কথা বাড়ালাম না। মানসদা কয়েকটা ওষুধ দোকানিকে বুঝিয়ে দিল। সঙ্গে থাকা মহিলাটি সেই তেল সিঁদুর মাখা পটের দিকে তাকিয়ে একবার নমো করে নিল। অস্ফুটে বলল, 'ডাইনবুড়ি মরার আগে ওষুধ পাচ্ছে গো মা, সবই তুমার ইচ্ছা।'

বেরিয়ে আসার আগে কী মনে হতে নীচু হয়ে একবার বুড়ির কপালে হাত

ছোঁয়ালাম। আর তখনই একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। সঙ্গে সঙ্গে বুড়ির চোখ খুলে গেল, আর তার ডান হাতটা হঠাৎ করে উঠে এসে আমার হাতটা চেপে ধরল। আর দুর্বল ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, 'বুধন কই? বনে কুথায় দিয়ে আলি উয়াকে?'

কেঁপে উঠলাম আমি। মহিলার গলা দিয়ে একটা চাপা আর্তনাদ বেরিয়ে এল। বাকিরাও চমকালো বিলক্ষণ। দোকানি অবশ্য সামলে উঠল দ্রুত। তাড়াতাড়ি এসে বুড়ির হাত ধরে বলল, 'এ বুড়ি, কার সঙ্গে কথা কইছুস? বুধন আইসবেক কুথা থাইকে? ই ত কৈলকাতার বাবু রে! দেখ তোর লাইগে ওষুধ আইনেছে। তোর ত কপাল ভালো রে বুড়ি।'

বুড়ি সেসব কথায় কান দিল না। আমার দিকে লাল টকটকে চোখে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, 'বুধন সেদিন তোর সঙ্গে ছিল ন? কুথায় উ? কুথায় দিয়ে আলি উয়াকে? বনের ভিতর থাইকে বুধন ডাকে কেনে আমাকে? উয়ার ডাক শুইনে আমার জ্বর আসে কেনে?'

দোকানি আরও ঝুঁকে এল বুড়ির ওপর, বলল, 'ও বুড়ি মা, চিনতে লারছুস? ই তোর বুধন লয় রে! শহরের বাবু বটে। খুব ভালো মানুষ। তুই যাতে সাইরে যাস তার লাইগে ওষুধ নিয়ে আইছে।'

বুড়ি সেসব কথায় কান দিল না। আমার চোখে চোখ রেখে বলল, 'দুখের ছানাটাকে সেইদিন ভোকের জ্বালায় শাপশাপান্ত কইরেছিলম। তার লাইগেই আমার আইজ এই অবস্তা। বুধন কে আইনে দে, উয়ার মাথায় হাত না বলাই যে মইরতে পাইরব নাই রে! ভোকের জ্বলনে আমার বুধনকে শাপ দিয়েছি, তাই ত ছানাটার উপরে ডাইন ভর হইছে। ছানাটা আমার বনে বনে ঘুইরে মলে, আর কষ্ট পায়। বুধন কে আইনে দে বাছা, তোর ভালো হবেক। আমি ডাইনবুড়ি বলছি, আমার ছানাটাকে আইনে দে। বাছা আমার কত কষ্ট পাইচ্ছে। এরে, উয়াকে না দেইখে আমার শান্তি নাই রে, আমার মরণ নাই...' বলতে বলতে বুড়ির হাত নিস্তেজ হয়ে এল। চোখ দুটো ফের বুজে গেল।

সাবধানে বুড়ির হাত ছাড়িয়ে কুঁড়েঘরের বাইরে এলাম। গাড়ির দিকে যেতে যেতে দোকানিকে জিগ্যেস করলাম, 'বুধনটা কে?'

দোকানি খানিক চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'বুধন ছিল এই বুড়ির ব্যাটা। বিধবা মায়ের একটিই ব্যাটা। পাশের ঘরের ছেইলাদের সঙ্গে জমি লিয়ে বুড়ি আর উয়ার ব্যাটার সঙ্গে গন্ডগোল ছিল। উয়ারাই এক পরবের দিনে বুধনকে ভুলাই ভালাই ভাঁড় খাওয়াই জঙ্গলে লিয়ে যাইয়ে মাইরে পুঁতে দিয়েছিল। বুধন তখন পনর বছরের জুয়ান ছানা। সেই শোকেই বুড়ি খেপে গেছে। আইজউ সে মাঝে মধ্যেই বনে যাইয়ে বুধনকে ডাকে।'

শুনে চুপচাপ হাটতে লাগলাম। এরকম কত ঘটনাই যে বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জে ঘটে তার কোনও ইয়ত্তা নেই।

দোকানি আরও একটু থেমে বলে, 'তবে একটা কথা বাবু, উই ঘটনার পর থিকেই পাশের ঘরে সব গরু বাছুর মইরতে শুরু করে। এক এক কইরে উয়াদের ছানাপানাগুলাও মইরে যায়। কেউ সাপে কাইটে, কেউ ওলাউঠায়, কেউ বা হাঁতিঠাকুরের পায়ের তলে। আর একটা ছিল্যা তো হাইরিয়েই যায়। সেই থাইকে বুড়িকে ডাইন বলে সব্বাই।'

শুনে থেমকে গেলাম। তারপর প্রশ্ন করলাম, 'এ কবেকার ঘটনা?'

'ধরেন আইজ থাইকে তিরিশ বছর আগের।'

'তারপর থেকে এই গাঁয়ে বুড়ির সঙ্গে শত্রুতা করে কেউ মরেছে?'

মাথা নাড়ল দোকানি, 'না বাবু।'

'তাহলে লোকে বুড়িকে ডাইনি বলে কেন? পড়শির ছেলে বা গরু-ছাগল তো স্বাভাবিক ভাবেই মরতে পারে।'

ম্লান হাসল দোকানি, 'ইটা কইলকাতা শহর লয় বাবু। ইটা সামতাল গাঁ। ইখেনে জানগুরুই সব। একবার যাকে উ ডাইন বইলে দিবেক তার গা থিকে সেই দাগ তুলার ক্ষমতা কারুর নাই।'

মানস আর সুশীলদা গাড়িতে গিয়ে বসল। আমি দোকানিকে দু-একটা কথা বলে গাড়ির দিকে হাঁটা লাগলাম। মন শুধু বলতে লাগল, ও বুড়ি ডাইনি নয়। হতে পারে না।

গাড়ি চালাতে চালাতে এক জায়গায় এসে হঠাৎ ব্রেক কষল মানস।

তারপর গাড়িটা সাবধানে সাইড করে বলল, 'আপনারা নামুন। গাড়িটা পার্ক করে আসছি।'

গাড়ি থেকে নেমে গা-হাত-পা ছাড়িয়ে নিলাম একটু। সুশীলদা মানসকে জিগ্যেস করল, 'এইটাই কি সেই জায়গা? তুই ঠিক জানিস তো?'

মানস কিছু বলল না, শুধু ঘাড় নাড়ল। তারপর রুকস্যাকটা পিঠে নিয়ে আঙুল তুলে একটা গাছের মাথার দিকে তাকিয়ে আমাকে জিগ্যেস করল, 'চাটুজ্জেদা, চিনতে পারছেন?' এই বলে একটা মস্ত বড় নিমগাছের মাথার দিকে দেখাল। এবার আমিও দেখে চিনতে পারলাম। এই সেই নিমগাছ যার নীচে আমি আর সংগ্রাম আশ্রয় নিয়েছিলাম।

যেখানে মানস গাড়ি পার্ক করল সেখান থেকে জঙ্গলের মধ্যে হেঁটে নিমগাছটার গোড়ায় পৌঁছতে সময় লাগল এক মিনিট। যদিও আকাশে আলো আছে এখনও, তবুও সন্ধে নামার মুখে অত বড় নিমগাছটা দেখে গা ছমছম করছিল।

সুশীলদা বলল, 'হুম। এবার ওই লোকটার বাড়ি যাওয়া যাক।'

মানস একটা সরু জঙ্গুলে রাস্তা ধরে এগোতে লাগল। দুপাশে মস্ত মস্ত পলাশ, সেগুন আর শালগাছের দল। তাদের শুকনো পাতায় জঙ্গলের মাটি ছেয়ে আছে। কয়েকদিন আগেই বৃষ্টি হয়ে গেছে। তাই বাতাসে একটা ভ্যাপসা ভিজে গন্ধ। ঘরে ফিরে আসা পাখিদের ডাকে কান পাতা দায়। ইতিমধ্যেই ঝিঁঝি ডাকতে শুরু করেছে।

পাঁচ মিনিট হাঁটার পরেই ঝুপ করে অন্ধকারটা নেমে এল। গ্রামদেশে শীতের রাত নাকি তাড়াতাড়ি নামে। কিন্তু এমন হঠাৎ করে নামে বলে জানা ছিল না। ঝিঁঝির ডাক শতগুণে বেড়ে উঠল। সুশীলদা হতাশ সুরে বলল, 'যাহ, এবার কী হবে? সামনে তো পুরো অন্ধকার, রাস্তাই দেখতে পাচ্ছি না যে!'

যেন সুশীলদার কথার জবাব দিতেই সামনে একটা জোরালো টর্চের আলো জ্বলে উঠল। মানস ওর রুকস্যাক থেকে একটা মিলিটারি গ্রেডের টর্চ বার করে জ্বালিয়ে দিয়েছে।

টর্চের আলোয় সামনেটা দিনের মতোই পরিষ্কার। আমরা এগোতে লাগলাম। মানস বলল, 'বেশি না, মিনিট পাঁচেকের রাস্তা। আশা করছি এবার লোকটাকে ঘরেই পাওয়া যাবে।'

যেতে যেতে একবার পেছন ফিরে তাকালাম। কেন জানি না মনে হল আমরা যেমন একটু একটু করে আলোর স্রোত বেয়ে এগোচ্ছি, তেমনই আমাদের ছেড়ে আসা রাস্তাটা একটু একটু করে তরল অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। ঘাড় ঘুরিয়ে নিলাম। একটা অস্বস্তিতে গা'টা শিরশির করে উঠল।

কিছুক্ষণ হাঁটার পর টর্চের আলোয় দূর অন্ধকারের স্লেটে একটা খোড়ো বাড়ির অবয়ব ফুটে উঠল। মানস টর্চ নিভিয়ে দিল। আমাদের চাপা গলায় বলল, 'আসুন।'

আমরা অন্ধকারের মধ্যেই ধীরে ধীরে বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ালাম। নিঝুম নিষ্প্রাণ একটা বাড়ি। কোথাও কোনও আলোর আভাস নেই। মনে হল বাড়িটা যেন একগলা নিঝুম অন্ধকারের মধ্যে ডুবে আছে।

আমি এদিক ওদিক তাকালাম। সেদিন যে ধানের মরাই, ট্র্যাক্টর দেখেছিলাম, একটু দূরে তাদের অবয়ব দেখা যাচ্ছে বটে। কিন্তু এই তারার আলোয় তাদের কেমন যেন ভূতুড়ে দেখাচ্ছে।

মানস পায়ে পায়ে এগিয়ে কোমরসমান উঁচু বেড়ার দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও। সবার শেষে ছিলাম আমি। কেন জানি না মনে হল আমি ভেতরে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে যেন বেড়ার দরজাটা সজোরে বন্ধ হয়ে গেল।

মানস অবশ্য ওসব দেখছিল না। ও একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছিল দাওয়ার দিকে। আমরা তিনজনে দাওয়ার সামনে এসে দাঁড়ালাম। সুশীলদা একবার বলল, 'টর্চটা জ্বাল মানস।'

মানসের ডান হাতের তর্জনীটা সাপের ছোবলের মতো ওর ঠোঁটে উঠে এল। সঙ্গে একটা শিসের মতো আওয়াজ। আমাদের চুপ করতে বলছে মানস।

মনে পড়ে গেল কালকের কথাটা।

সুশীল আগরওয়ালকে কাল যখন প্রশ্ন করেছিলাম, 'পুলিশে খবর দেননি কেন?' সুশীলদা কিছু বলেনি। শুধু আমার হাত ধরে নিয়ে গেছিল তার গোডাউনে।

দেখেছিলাম গোডাউনের দেওয়ালে এবড়োখেবড়ো ভাবে লেখা আছে একটা কথা।

'ওসুদ দে, আমার বিটির ওসুদ দে। নাইত তোদিক্কে জীয়ন্ত ছিঁড়ে খাব।'

ওই প্রায়ান্ধকার গোডাউনের দেওয়ালে এই কথা লেখা দেখে যতটা না ভয় লেগেছিল, তার দ্বিগুণ আতঙ্কিত হয়েছিলাম ওটা কী দিয়ে লেখা সেটা বুঝতে পেরে।

রক্ত। শুকিয়ে যাওয়া রক্ত। আর মনের ভেতরে কে যেন ফিসফিস করে বলছিল, 'ওটা তোমার বন্ধুর রক্ত। সংগ্রামের রক্ত। ও বিপদে আছে, ভীষণ বিপদে আছে। যাও, ওকে বাঁচাও।'

হুঁশ ফিরে এল একটা ক্যাঁচ শব্দে। মানস ঘরের দরজাটা ঠেলে ঘরের ভিতরে ঢুকল। তারপর সুশীলদা। সুশীলদা ঢোকার পর দরজাটা ফিরে এসে বন্ধ হয়ে গেল।

আমি এগোতে যাব, এমন সময় মেঘ সরিয়ে ক্ষীণ চাঁদের আলো বারান্দায় এসে পড়ল। আর মেঝের দিকে তাকিয়ে আমি থমকে গেলাম।

কোথায় সেই নিকোনো তকতকে বারান্দা, যেখানে বসে সংগ্রাম চা, লুচি তরকারি খেয়েছিল? এ তো ফুটিফাটা ভাঙা দাওয়া। এখানে ওখানে গর্ত। মাটি থেকে দাওয়ার ওপর অবধি বেয়ে উঠেছে লতানে গাছের জঙ্গল। বাঁশে ঘুণ ধরেছে, তার ফুটিফাটা গা থেকে ঝুর ঝুর করে খসে পড়ছে গুঁড়ো।

পিছন ফিরে তাকালাম। কোথায় সে গোলাভরা ধানের মরাই? যেন একটা ভূতুড়ে কাঠামো প্রকাণ্ড হাঁ করে অট্টহাসি হাসছে। আর তার পাশে হাড় পাঁজর বার করে দাঁড়িয়ে থাকা ওটা কী? সেই ট্র্যাক্টরটা? দেখে শিউরে উঠলাম। মনে হল যেন একটা প্রাগৈতিহাসিক বৃদ্ধ যন্ত্রদানবকে একটু একটু করে পিষে ফেলেছে এই সর্বগ্রাসী বুভুক্ষু জঙ্গল।

ঘরের দরজার দিকে তাকালাম। আর ঠিক তখনই জঙ্গলের দিক থেকে একটা হাহাকার ভেসে এল, পথ নাই, পথ নাই, ঘুইরবার পথ নাই!

মাথাটা একবার ঝাঁকিয়ে নিলাম। হ্যালুসিনেশন হচ্ছে নাকি?

ঘরের ভেতর থেকে কোনও আওয়াজ আসছে না। সেদিন বৃষ্টিস্নাত সন্ধেবেলা যে মায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় দেখে মন তৃপ্ত হয়েছিল, তার সঙ্গে এই সর্বগ্রাসী রিক্ত কুঁড়েঘরের কোনও মিলই নেই। সব যেন মিলিয়ে গেছে ভোজবাজির মতো। যেন একটা মহামারী এসে শুষে নিয়ে গেছে একটা মস্ত জনপদ। তার হাসি নেই, শ্বাস নেই, প্রাণ নেই, বেঁচে থাকা নেই, এমনকী শান্তিতে মরে যাওয়াও নেই!

দরজাটা খুলে সাবধানে ভেতরে বাঁ পা-টা রাখলাম। পায়ে একটা এবড়োখেবড়ো মেঝে ঠেকল। সামনে ঘন নিঃসীম অন্ধকার। নিকষ, জমাট, পাথুরে অন্ধকার। তার গায়ে যেন আঁচড়ও কাটা যাবে না, এত কঠিন সেই তমসা। চাঁদের আলো এই ঘরের চৌকাঠে এসে থেমে গেছে। ভেতরে উঁকি দিতে তারও যেন বড় ভয়।

একবার মৃদুস্বরে ডাকলাম, 'সুশীলদা, সুশীলদা— মানস—'

কোনও উত্তর এল না। কোনও প্রতিধ্বনিও ফিরে এল না। মনে হল নিঃসাড় গাঢ় অন্ধকারের সমুদ্রের মধ্যে আমার উচ্চারিত শব্দগুলো ভারী পাথরের মতোই নিঃশব্দে ডুবে গেল।

ধীরে ধীরে ডান পা'টাও ভেতরে রাখলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে আমাকে চমকে দিয়ে পেছনের দরজাটা সজোরে বন্ধ হয়ে গেল। আমি চকিতে পিছনে ফিরে একবার ঠেললাম। কিন্তু কোনও ফল হল না।

এবার ওই শীতের মধ্যেই আমি দরদর করে ঘামতে লাগলাম। জোরে চেঁচালাম, 'সুশীলদা! মানস!' কিন্তু কোনও উত্তর নেই। আরও গলা চড়ালাম। কিন্তু প্রতিটা অক্ষর, শব্দ, বাক্য যেন গলে গেল, মিশে গেল, ডুবে গেল সেই অন্তহীন অন্ধকারের মধ্যে।

একটু একটু করে পা বাড়াতে লাগলাম। ঘর যখন, কিছু না কিছু তো হাতে ঠেকবেই।

কিন্তু না, কিচ্ছু না। থরথর কাঁপতে থাকা দুটো হাত শূন্যে ধাক্কা খেয়ে ফিরে

আসতে লাগল বার বার।

পায়ে পায়ে এগোতে এগোতে হঠাৎই মনে হল পায়ের নীচে মাটিটা যেন একটু দুলে উঠল। থেমে গেলাম।

ঠিক তখনই কানে এল একটা আওয়াজ। একটা ক্ষীণ বালিকাকণ্ঠ বলছে, 'বাবা, বেদম কষ্ট হইচ্ছে গ। ওষুদ আইনেছ, ওষুদ?'

কোথা থেকে আসছে আওয়াজটা? বুঝতে পারলাম না।

আর এক-পা এগোতেই সেই আর্তি, 'ও বাবা, বড় কষ্ট হইচ্ছে গ। দম আটকাই আইসছে। ওষুদ দাও না বাবা, একটু ওষুদ দাও না।'

কোথা থেকে আসছে এই আওয়াজ? আমি এবার মৃদুস্বরে ডাকলাম, 'সংগ্রাম—'

মনে হল পাথুরে অন্ধকার যেন একটু সচল হল। এবার একটা অন্য আওয়াজ পেলাম। প্রথমে বুঝলাম না কীসের আওয়াজ।

তারপর শব্দটা বাড়তে লাগল। প্রথমে ধীরে। তারপর আরও একটু উচ্চকিত।

নিঃশ্বাসের শব্দ। কেউ যেন ধীরে ধীরে শ্বাস নিচ্ছে। ধীরে, অতি ধীরে। নিঃশ্বাস নিতেও যেন কত কষ্ট। আর প্রতি শ্বাসের সঙ্গে ভেসে আসছে সেই করুণ আর্তনাদ, 'বাবা, ও বাবা, দাও একটু ওষুদ। আর যে পাচ্ছি নাই।'

কে এই মেয়ে? কোথায় আছে সে? আমি উঁচু গলায় বললাম, 'কে! কে! কে তুমি?'

কেউ উত্তর দিল না। শুধু সেই অন্ধকারে মাথা কুটতে লাগল একটা গাঢ় শ্বাস জড়ানো কষ্টের ডাক, 'ও বাবা, বড় কষ্ট গো বাবা, বড় কষ্ট।' মনে হল সেই ঘরটাই যেন একটা মরণাপন্ন মেয়ের ফুসফুস। একটুখানি বাতাসের জন্য সেই আকুতি যেন ঘুরে মরছে ঘরের ভেতর, পাক খাচ্ছে, গুমরে মরছে।

আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'কে তুমি, সাড়া দাও। ওষুধ এনেছি আমি। আমার কাছে ওষুধ আছে।'

সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসের শব্দটা অনেক কমে গেল। এবার ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে একটা আবছা আলো জেগে উঠল। কোথা থেকে আসছে আলোটা? ওপরে তাকালাম। কুঁড়েঘরের ছাদ। সেখানে ফুটিফাটা হয়ে অল্প আলো আসছে। সূর্যের আলো নয়, ম্লান নিভু নিভু প্রদীপের আলো যেমন হয়, তেমন। বিষণ্ণ, মৃদু, অস্তপ্রায়।

সেই আলোয় ঘরের অবস্থা দেখে শিউরে উঠলাম। সে ঘর আর ঘর নেই। দেওয়াল খসে পড়েছে জায়গায় জায়গায়। সারা ঘরে ঝুলে, নোংরায় ভর্তি। ওপাশের জানালা দিয়ে উঁকি মারছে জংলি লতা। কেউ নেই। কিচ্ছু নেই। সুশীলদাও নেই। মানসও নেই।

আমার মাথার মধ্যে যেন জট পাকিয়ে গেল। এই তো ওরা ঘরের মধ্যে ঢুকল আমার চোখের সামনে। ওদিকে দরজা নেই। লোকদুটো কি ঘরের মধ্যে থেকে উবে গেল?

মেঝের দিকে আরেকবার চোখ গেল আমার। মেঝেতে ওগুলো কী? কী পড়ে আছে ওগুলো?

একটু পর চোখ সয়ে এলে বুঝতে পারলাম ওগুলো হাড়— মুরগি আর ছাগলের হাড়।

'ওষুদ আইন্যেছু? আমার বেটির ওষুদ আইন্যেছু তুঁই?'

কথাগুলো এমন হঠাৎ ভেসে এল যে আমি চমকে গেলাম। চোখ গেল জানালার দিকে। আর আমার হৃৎপিণ্ডটা এক লাফে গলার কাছে উঠে এল।

জানালায় একটা মুখ। একটা জংলি মুখ। ঘন জট পাকানো চুলে, নোংরা দাড়িতে তাকে সভ্য মানুষ মনে হয় না। আর তার জ্বলজ্বলে চোখে কীসের যেন একটা উদগ্র বুভুক্ষু খিদে।

একটু তাকিয়ে থাকার পর চিনলাম ওকে। কিন্তু নিজের চোখকে বিশ্বাস হল না। দ্বিধার সঙ্গে জিগ্যেস করলাম, 'সংগ্রাম! তুই?'

সংগ্রামের চোখ দুটো আরও জ্বলজ্বল করে উঠল। ঠোঁটের কোণে একটা দুর্বোধ্য হাসি। একটা সম্পূর্ণ অচেনা স্বরে সে বলে উঠল, 'ওষুদ দে রে, আমার বিটির ওষুদ দে।'

আমি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এ তো সেই লোকটার স্বর যে সেই বর্ষার রাতে আমাদের এখানে নিয়ে এসেছিল। তারই তো বাড়ি, ঘর, সংসার ছিল এটা। সংগ্রামের গলায় তার স্বর এল কোথা থেকে?

আমার মাথার মধ্যে সব জট পাকিয়ে গেল। কী হচ্ছে এসব? আমি কি জেগে আছি না স্বপ্ন দেখছি?

আবার সাগ্রহে জিগ্যেস করলাম, 'সংগ্রাম, এ কী হয়েছে তোর! কোথায় ছিলিস এতদিন?'

এবার ঘরের মধ্য থেকে নয়, জঙ্গলের মধ্য থেকে ভেসে এল এক রমণীকণ্ঠের বিলাপ, 'এ গো তুমার পায়ে পড়ি। মেইয়েটোকে একটুকু ওষুদ আইন্যে দাও। আর যে দেইখতে পাচ্ছি না। দোহাই তুমার...'

সংগ্রামের চোখ ঘোলাটে হয়ে এল। আবার সেই অচেনা স্বরে বলে উঠল, 'ওষুদ দে রে, ওষুদ দে। আমার বিটিটা যে মইরে যাইচ্ছে। ওষুদ দে, ওষুদ দে...'

বলতে বলতে সংগ্রাম জানালার ওপর ভর দিয়ে উঠে দেহটা ঢুকিয়ে দিল ঘরের ভেতর। গোবরাটে পেট ঠেকিয়ে শরীরের উর্ধ্বাংশ নামিয়ে দিল জানালার নীচের দেওয়ালে। তারপর চার হাতে পায়ে দেওয়াল বেয়ে নামার চেষ্টা করতে লাগল মেঝেতে। দেখে মনে হল যেন একটা মস্ত বড় অজগর সাপ জানালা দিয়ে ঘরে ঢোকার চেষ্টা করছে।

সেই ভয়াবহ বীভৎস দৃশ্য দেখে আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। আমি পেছতে থাকলাম। পেছতে পেছতে ঠেকলাম দরজায়। ঘুরে দরজাটা খোলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সেই পোড়ো কুঁড়েঘরের দরজা তখন শক্ত হয়ে এঁটে বসেছে। আমি পাগলের মতো দরজায় ধাক্কা মারতে লাগলাম। তখন আমার হাত পা থরথর করে কাঁপছে। বুকটা খালি খালি লাগছে। দরদর ঘামে ভেসে যাচ্ছে আমার সারা দেহ। আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'কে আছ, বাঁচাও!'

পেছন থেকে সেই অচেনা ঘড়ঘড়ে স্বর ফের ভেসে এল, 'ওষুধ দে রে...

আমার বিটিটা যে মইরে যাইচ্ছে। ওষুদ নাই...কুথাও কুনও ওষুদ নাই...কত ঘুইরলম, কত মাথা কুইটলম, কত লোকের হাতে পায়ে ধইরলম...কেউ কিছু কৈরতে পাইল্ল নাই রে...একটুকু ওষুদের লিগে ফুলের মতো বিটিটা আমার মইরে গেল রে...'

আমার বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ি পিটছে। কোনোমতে পেছনে তাকালাম। সংগ্রামের অর্ধউলঙ্গ দেহটা ততক্ষণে ঘরের মধ্যে নেমে এসেছে। জন্তুর মতো সে চার হাত পায়ে এগোচ্ছে আমার দিকে।

এবার নিঃশ্বাসের শব্দটা যেন আরও জোর হয়ে উঠল। তার সঙ্গে মিশল একটা কান্নার রোল। আকাশ পেরিয়ে, জঙ্গল পেরিয়ে, সমস্ত বিশ্বচরাচর জুড়ে বাজতে লাগল সেই অশরীরী আর্তস্বর, 'ওষুদ দাও ন বাবা, আর তো পাচ্ছি নাই...বুকটা ফাইটে যাইচ্ছে...এগো আমার বিটিটা যে মইরে যাবেক... দোহাই তুমার, যেখেন থিকে পার একটুকু ওষুদ আইনে দাও না...'

সেই প্রথম অনুভব করলাম তীব্র আতঙ্কের মধ্যেও মানুষের ঘুম পায়। প্রবল ঘুম। আমার সমস্ত চৈতন্য যেন অসাড় হয়ে এল। হাতে পায়ে আর কোনও শক্তি অবশিষ্ট নেই। শরীরে বিষ ক্লান্তি। আমি কোনওক্রমে জানালার পাশে দেওয়াল ঘেঁষে বসে পড়লাম। একটু দূরে একটা শীর্ণ উলঙ্গ দেহ। সে ক্ষুধার্ত কুকুরের মতো আমার দিকে এগিয়ে আসছে। জ্বলজ্বলে উন্মত্ত দুটো চোখে যেন কীসের ইশারা। আমি জানি না...আমি জানি না আমার কী হবে!

চোখটা সম্পূর্ণ বুজে আসার ঠিক মুখে আমার কেমন যেন মনে হল আরও একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আমি কি ঠিক শুনলাম? ওই তো, আবার! কে যেন দরজায় ঠক ঠক করছে। হ্যাঁ, আমি নির্ভুল শুনেছি। কে যেন জোরে জোরে ধাক্কা মারছে দরজায়।

আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল। শুধু আমি নয়। ও-ও শুনেছে। ওর দুচোখে এখন বিভ্রান্তি।

আমার হাতে পায়ে সামান্য হলেও সাড় ফিরে এল। কেউ এসেছে, দরজার ওপারে দাঁড়িয়ে আছে সে। কে যেন আমার মাথার মধ্যে গেঁথে দিল, ওর কাছেই আছে আমার মুক্তির চাবিকাঠি।

চারিদিক নিঃস্তব্ধ। থেমে গেছে সেই বালিকার আর্তস্বর, সেই নারীকণ্ঠের ত্রস্ত আর্তচিৎকার। সেই আলো অন্ধকারের মধ্যে, স্তব্ধ শ্বাসশব্দের মধ্য দিয়ে ভেসে এল ক্ষীণ স্বর, 'বুধন, বাপ আমার, কুথায় আছু বাপ?'

এসেছে! দোকানি তার কথা রেখেছে! আমার বুকটা আশায় আনন্দে ধক করে উঠল। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'বুড়িমা, এসেছ? তুমি এসেছ?'

এবার আরও জোরে ধাক্কা দিচ্ছে কেউ। দোকানির স্বর শোনা গেল, 'হেই বুড়ি, কপাট থাইকে সইরাই দাঁড়া। ইটা না ভাঙলে খুইলবেক নাই।'

ফের সেই ডাইনিবুড়ির স্বর, 'না না বাপ আমার, কিচ্ছু কইত্তে হবেক নাই। কপাট আপসেই খুইল্লে যাবেক। বুধন, এ বুধন, বুকে আয় বাপ আমার। শাপ দিঁয়েছি বলে রাগ কৈরেছু বাছা? আয় বাপ, বুকে আয় দিকি। গায়ে মাথায় হাত বুলাই দি। অনেক কষ্ট পাঁয়েছু বাপ আমার। মায়ের কাছে আয় দেখি...'

সংগ্রামের দিকে তাকিয়ে দেখি হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে দিয়েছে। তার রুগ্ন পিঠটা ফুলে ফুলে উঠছে। সংগ্রাম কাঁদছে!

আস্তে করে দরজাটা খুলে গেল নিজে থেকেই। প্রথমে ঢুকল সেই ডাইনিবুড়ি আর দোকানি। তারপর হুড়মুড় করে ঢুকল সুশীলদা আর মানস! দুজনে এসে আমাকে একেবারে জড়িয়ে ধরল।

সুশীলদা বলল, 'উফ, চিন্তায় পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম আমরা। আরেকটু হলে পুলিশে খবর দিতে যাচ্ছিলাম। তোমাকে ওভাবে আচ্ছন্নের মতো ঘরে ঢুকতে দেখেই বুঝেছিলাম কিছু একটা গড়বড় আছে। তারপর যত ধাক্কা দিই কিছুতেই দরজা খোলে না।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'মানে? এসব কী বলছ কী? তুমি আর মানস তো আমার আগে ঢুকলে ঘরে!'

একে অন্যের দিকে তাকাল। তারপর মাথা নাড়ল মানস, 'না চ্যাটার্জিদা। আমরা দাওয়াতে উঠিইনি। তোমাকে দেখলাম কেমন আচ্ছন্নের মতো দাওয়াতে উঠলে। তারপর এদিক ওদিক তাকালে তারপর ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লে। আমাদের উচিত ছিল তোমাকে বাধা দেওয়া। সেটা কেন দিইনি নিজেরাই বুঝতে পারছি না।'

সুশীলদা বলল, 'তুমি ঢুকে যাওয়ার পরেই দেখি দরজাটা নিজে নিজে বন্ধ হয়ে গেল। তখন আমাদের টনক নড়েছে। আমরা দৌড়ে গেলাম। কিন্তু গেলে কী হবে, ধাক্কাধাক্কি করেও দেখি খোলে না। লাথি মেরেও দেখলাম, যে কে সেই।'

চুপ করে রইলাম। কীসের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলাম নিজেই জানি না।

সুশীলদা বলল, 'ভাবছি থানায় যাব কি না, দেখি একটু পরে সাইকেল নিয়ে দোকানি এসে হাজির। দেখে ধড়ে প্রাণ এল। শুনলাম তুমিই নাকি ওকে বলে এসেছিলে এমন কিছু একটা হতে পারে। দোকানি তাই ভাবছিল একবার দেখে যাবে কি না। সাইকেল নিয়ে বেরোবে, এমন সময় বুড়ি এসে হাজির। তার নাকি জ্বর একেবারে সেরে গেছে। বুড়ির মন বলছে শাপমনির প্রায়শ্চিত্ত না করলে নাকি তার বুধনের আত্মা শান্তি পাবে না। জোরজার করে বুড়ি এসে হাজির। তারপর তো খেল দেখলেই। যে দরজা এতক্ষণ গায়ের জোরে খুলছিল না, বুড়ির দুই টোকাতেই কেমন অনায়াসে খুলে গেল!'

ওদিকে তাকিয়ে দেখি বুড়ি সংগ্রামকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে, আর বলছে, 'আহা রে, ভোকের জ্বলনে দুধের ছানাটাকে কত কিছুই বৈলেছি। বাপ আমার, সনা আমার, জাদু আমার, ঘরে চ বাপ।' তাকিয়ে দেখি বুড়ির চোখেও জল।

চোখ মুছলাম। এক মেয়ে হারানো বাপের দুঃখ ধুয়ে যাচ্ছে মরা ছেলেকে ফিরে পাওয়া এক ডাইনিবুড়ির ভালোবাসায়। ভালোবাসার কাছে আর কেই বা জিতেছে বলো। ভালোবাসাও তো একরকমের হেরে যাওয়াই।

হঠাৎ খেয়াল হল, কী ভাবছি আমি! ধুস, ডাইনি ফাইনি আবার কী? মা তো মা'ই হয়।'

চাটুজ্জেমশাই থামতেই আমরা হইহই করে উঠলাম। 'এটা কেমন হল? পুরো গল্পটা তো বললেন না!'

চাটুজ্জেমশাই তো অবাক, 'এই তো বললাম। আর বাকিটা রাখলাম কী?'

'ওই লোকটা কে? মানে যার কাছে গিয়ে আপনারা বিপদে পড়েছিলেন?'

চাটুজ্জেমশাই চুপ করে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, 'পরে জেনেছিলাম বছর বিশেক আগে সত্যিই ওখানে একটা পরিবার ছিল। তাদের মেয়েটির বোধহয় হার্টের কিছু একটা গন্ডগোল ছিল। আর ছিল ভয়ানক শ্বাসকষ্ট, ক্রনিক অ্যাজমার পেশেন্ট। ওদিকে তখন ডাক্তার হাসপাতাল কিছুই ঠিকঠাক পাওয়া যেত না। এমন সময়ে এক শীতকালের বৃষ্টির রাতে মেয়েটি প্রবল শ্বাসকষ্টে হার্টফেল করে মারা যায়। মেয়ের মা সেই শোকে গলায় দড়ি দেয়। শোকে তাপে বাপের মাথা খারাপ হয়ে যায়। সে তার ভিটে মাটি ছেড়ে কোথায় যেন চলে যায়। কিন্তু তারপর থেকে অনেকেই শীতের রাতে ওখানে বাপকে দেখেছে মেয়ের জন্য একটু ওষুধ চেয়ে বেড়াতে।'

বিশু একটা ফোঁৎ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। গদাই বলল, 'আর আপনার সেই বন্ধু, সংগ্রাম? সে একেবারে ঠিক হয়ে গেল? তার হয়েছিলটা কী?'

চাটুজ্জেমশাই বললেন, 'আমাকে পরে বলেছিল যে রাতে ও লুচি তরকারি খেয়ে ফিরে আসে, সেই রাত থেকেই ও নাকি শুনতে পায় মাথার মধ্যে কে যেন সর্বক্ষণ একটানা কেঁদে চলেছে, 'বাবা, ওষুধ এনে দে, ওষুধ এনে দে' করে। তারপর জ্বরের সময় একদিন টানা অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল। তারপর ওর আর কিছু মনে নেই। আমাদের অবশ্য দুইয়ে দুইয়ে চার করতে অসুবিধা হয়নি। খিদের জ্বালায় গ্রামের ছাগল মুরগি চুরি যে ওরই কাণ্ড সেটা বলাই বাহুল্য। সেটা অবশ্য আর চাউর হতে দিইনি। নইলে গ্রামের লোকেরা ওকে আস্ত রাখত না। ডাইনের কালাজাদুতে এসব করেছে, এসব বললে শুনতই না কেউ।'

ভজা জিগ্যেস করল, 'তিনি করেন কী এখন?'

'এই ঘটনার পরপরই সে চাকরি বাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় ফিরে আসে। তবে সে তার কুড়িয়ে পাওয়া মাকে ভোলেনি। বুড়ি যদ্দিন বেঁচে ছিল, নিয়মিত দেখা করে আসত। টাকাপয়সা, চাল-ডাল দিয়ে আসত। বলতে কয়েক দিনের কষ্ট গেছে বটে। কিন্তু তার বদলে একটা আস্ত মা কুড়িয়ে পেলাম, সেটাই না কম কী!' কিশোর ভারতী

ছবিঃ কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল

দোলনচাঁপা দাশগুপ্ত

ইরাবতীর ইয়ার্কি

সমস্যাটা হচ্ছে, গত ছ'মাস ধরে কোনও ম্যাচ জিততে পারছে না অর্ক। জেতা তো দূর অস্ত, নিজের খেলাটাও ঠিকঠাক খেলতে পারছে না। যখনই ব্যাট করতে যায়, সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

স্টান্স নিয়ে দাঁড়াবার পর, যেই সে মনঃসংযোগ করে বোলারের দিকে, আম্পায়ারের পিছনে ভুস করে দেখা দেয় ইরাবতী। সেই ইরাবতী, যে ছ'মাস আগে মারা গিয়েছে। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা যার মারা যাওয়ার খবরে কেঁদেছিলেন। আর অর্কর মতো বন্ধুরা নিঝুম হয়ে গিয়েছিল! তিনদিন মুখে খাবার তুলতে পারেনি।

ইরাবতীর মতো প্রাণচঞ্চল মেয়ে এইভাবে চলে যাবে কেউ ভাবেনি। মাথায় হেলমেট না পরার খেসারত দিতে হল নিজের জীবনটাকেই।

ইরাবতী ছিল বরাবর ডানপিটে। মাস্তান টাইপ। ক্লাস ওয়ানের স্মৃতি জ্বলজ্বল করছে অর্কর। টিফিনে মা যা ভালো খাবার দিত, কতগুলো দস্যি ছেলে কেড়েকুড়ে খেয়ে নিত। অর্ক মুখচোরা, শান্তশিষ্ট। প্রতিবাদ করতে পারত না। ইরাবতী পাল্টা তাদের মেরেধরে টিফিনবাক্স ছিনিয়ে আনত। নিরীহ গোবেচারা ছেলেমেয়েদের শেষ ভরসা ছিল ইরাবতী।

চুপ করে একজায়গায় বসার মেয়ে ছিল না সে মোটেই। সবসময়ই দৌড়চ্ছে, লাফাচ্ছে। যারা ওর ঘুষি খেয়ে কুপোকাত হতো, তারা আড়ালে ইরাবতীকে ডাকত 'মিস অকুতোভয়' নামে।

সেই দুরন্ত মেয়ে যে এভাবে দুম করে চলে যাবে ভাবতেই পারেনি কেউ। দুঃসংবাদটা পেয়ে চমকে উঠেছিল অর্ক। অবশ্য দুর্ঘটনা হলে কার কীই বা করার আছে। আর ইরাবতীকেও বলিহারি! মাথায় হেলমেট না পরে তুই স্কুটি চালাবিই বা কেন! রাগে, দুঃখে কানমাথা ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠেছিল অর্কর।

একরোখা মেয়ে ইরাবতী যা ভাবত, তাই করত। কারও পরামর্শ শুনত না। কতবার ইরাবতীর বাড়ি যেতে চেয়েছে অর্ক, সুযোগই মেলেনি। বন্ধুদের কাউকেই বাড়িতে নিয়ে যেত না ও। রুদ্র বলেছিল, ওরা ভীষণ গরিব। তাই ও আমাদের বাড়ি নিয়ে যেতে লজ্জা পায়! সত্যিমিথ্যে জানে না অর্ক, তবে বন্ধুদের কাছে ঘরের কথা কিচ্ছুটি বলত না ইরাবতী।

এখন যদি সামনে পেত ঠাঁই ঠাঁই করে ইরাবতীর গালে দুটো চড় কষাত অর্ক। হেলমেট ছাড়া কেন বল্গাহীন জীবন বেছে নিয়েছিল ও?

খেলাধুলোতে ছোট থেকেই ওস্তাদ ইরাবতী। স্কুলে দুদুটো বিরাট মাঠ। একটা ক্রিকেট আর একটা ফুটবলের। বালি দিয়ে লং জাম্পের ব্যবস্থাও আছে। ওদের মফস্বলে বরাবর খেলাধুলোয় উৎসাহ দেওয়া হয়। প্রতি বছর তিন-চারটে মেডেল জিতত ইরাবতী। স্কুটিটাও ডিসট্রিক্ট স্পোর্টস চ্যাম্পিয়ন হয়ে জিতেছিল। খুব ভালো দৌড়োত।

অর্কর ব্যাটসম্যান হওয়ার স্বপ্ন। ক্রিকেটটা খেলেও ভালো। ব্যাট হাতে নিলেই ও অন্য জগতে! ইন্টারস্কুল কম্পিটিশনে পরপর তিনবার নিজের স্কুলকে জিতিয়েছে অর্ক। ক্যাপ্টেন মানে গুরুদায়িত্ব। সবাইকে উৎসাহিত করলেই হবে না, নিজেকেও ভালো খেলতে হবে।

তর্ক হতো ইরাবতীর সঙ্গে।

তুই যতই বলিস ইরা, মেয়েরা ছেলেদের মতো খেলতে পারে না।

বাজে বকিস না অর্ক, এভাবে তুলনা হয় না।

আলবাত হয়। মাঠে দাঁড়িয়ে মাথা ঠান্ডা রেখে প্রেস হ্যান্ডেল করাটা মেয়েদের কম্ম নয়।

ইরাবতী হেসে উঠত।

মিতালি রাজ, ঝুলন গোস্বামী, এদের ক'টা ম্যাচ দেখেছিস তুই?

ঢোঁক গিলে অর্ক বলত, ওঁরা তো স্টার ক্রিকেটার। আমি গড়পড়তা মেয়েদের কথা বললাম।

ইরাবতী রেগে গেলে মুখচোখ লাল হয়ে যেত। চোখ বড় করে বলত, হাতের কাছে মুগুর থাকলে আজ তোকে দিতাম কষিয়ে!

অর্ক আর ইরাবতীর সারাদিনই এমন ঝগড়া চলত। কখনও একমত হয়নি তা নয়, তবে সেটা একশো বছরে একবার পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের মতো বিরল ঘটনা।

তবে ইরাবতী মারা যাওয়ার ক'দিন আগের একটা ঘটনা অর্কর মনে গভীর দাগ কেটেছিল। কেন যে ঝোঁকের মাথায় এতবড় ভুলটা করল ও!

সেই ভুলের কথা ইরাবতী ছাড়া আর কেউ জানে না। এবং কেউ কোনোদিন জানবেও না! ইরার মৃত্যুর সঙ্গে সেই ভুলটাও চাপা পড়ে গেল চিরদিনের মতো।

অর্কর কিন্তু বিবেক দংশন হয় এখন। ইরাকে সেদিন ওভাবে বকাবকি করাটা উচিত হয়নি।

ও মারা যাওয়ার পর অনেকবার ভেবেছে অর্ক। যদি ইরাবতী কাউকে বলে দিত, চিরদিনের মতো ক্রিকেট খেলা বন্ধ হয়ে যেত অর্কর। সাসপেনশন নেমে আসত।

আশ্চর্যের ব্যাপারটা হল, ইরাবতী প্রতিটা ম্যাচের দিনে তাকে স্পষ্টভাবে দেখা দেয়! মোক্ষম সময়ে। অবিকল সেই গোলাপি টি-শার্ট আর ফেডেড জিনস। মুচকি হাসে। কখনও চেঁচিয়ে বলে, মার ছক্কা, অর্ক।

অদ্ভুত কাণ্ড, কেউই নাকি ইরাবতীকে দেখতে পায় না। ফিল্ডার থেকে উইকেটকিপার— সবাইকে জিজ্ঞাসা করেছে অর্ক। সবাই এমনভাবে তাকিয়েছে যেন ওরই মাথা খারাপ।

সেদিন ক্লাস টুয়েলভের সঙ্গে ম্যাচ। অর্কর সেঞ্চুরি নিশ্চিত। নিরানব্বই রানের পর ছক্কা হাঁকাবে বলে যেই ব্যাট তুলেছে, চারতলা স্কুলবাড়ির ছাদের আলসেতে দেখতে পেল ইরাবতীকে। বিপজ্জনকভাবে দাঁড়িয়ে। গা ছমছম করে উঠল। চোখ বুজে ব্যাট চালাল। বল ফিল্ডারের হাতে। আউট হয়ে ফিরে আসার সময় অর্ক আঁতিপাঁতি করে খুঁজল ইরাকে।

কিন্তু নাহ, কিচ্ছু নেই! ইরাবতী এখন অতীত।

ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করে না অর্ক। এটা কী হচ্ছে তাহলে?

গেমস স্যার নিখিলবাবু বলেই ফেললেন, তোর মন আজকাল কোথায় থাকে রে?

বলি বলি করেও চুপ করে গেল অর্ক।

রুদ্রকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তুই আত্মায় বিশ্বাস করিস?

রুদ্র ঘাড় কাত করে বলেছিল, করি তো। তেনারা আছেন। সে তুই নাও মানতে পারিস। কেন রে?

অর্ক শুকনো ঠোঁট চেটে বলেছিল, নাহ, কিছু না।

২

ফাইনাল ম্যাচের আগের দিনটা আজও মনে আছে অর্কর। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়! তার গোঁয়ার্তুমি! ডানপায়ের পেশিতে খিঁচ ধরেছিল। সেটা লুকিয়েই খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কী করবে! ঘাড়ের কাছে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নিঃশ্বাস ফেলছিল সুদীপ। অর্ক বসে গেলেই সুদীপকে ক্যাপ্টেন করে দেওয়া হতো। ব্যথার ওষুধ খেয়ে, ম্যাচে নেমে, হাত চালিয়ে ব্যাট করার পরিকল্পনা ছিল অর্কর।

ইন্টারস্কুল ম্যাচ। প্রতিপক্ষ কিশোরগঞ্জ হাই স্কুল। দাঁতে দাঁত চেপে অর্ক প্রতিজ্ঞা করেছিল যেমন করেই হোক ট্রফিটা স্কুলে আনতেই হবে।

প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন। প্রচুর দর্শক। শীতটাও পড়েছিল জব্বর। কিশোরগঞ্জ হাই স্কুল আটানব্বই রান তুলে অল আউট। ভালো বোলিং করেছিল অর্কর টিম। কিন্তু ব্যাট করতে নেমে অর্কর টিমও পরপর উইকেট খোয়াতে লাগল। জেতার জন্য দরকার মাত্র সাত রান। হাতে চার ওভার। কিন্তু উইকেট মোটে দুটো। শেষ ব্যাটসম্যান হয়ে টিমটিম করে জ্বলছিল অর্ক। উল্টোদিকে ব্যাট করছিল রুদ্র। সে বেচারা নিজে বোলার। পেসবোলারদের সামলাতে না পেরে দু'চারবার আনতাবড়ি ব্যাট চালিয়েও সুবিধা করতে পারেনি। একবার তো উইকেটের কোণ ঘেঁষে বল বেরিয়ে গেল তাই রক্ষে।

হেই বাডি। রুদ্রকে চেঁচিয়ে ডেকেছিল অর্ক। উল্টোপাল্টা চালাস না, জাস্ট ঠুকে ঠুকে টিকে থাক উইকেটে। আমি রান তুলে নেব।

ঝিরঝিরে বৃষ্টি নেমেছিল তারপর। ম্যাচ বন্ধ ছিল মিনিট দশেক।

অর্কর কাফ মাসলের খিঁচে হঠাৎ প্রচণ্ড টান ধরল। পা নাড়াতে পারছিল না ও। ড্রেসিংরুমের পিছনে স্কুটিতে চক্কর কাটছিল ইরাবতী। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে জানলার কাছে গিয়ে অর্ক ফিসফিস করে ডাকল, ইরা, একবার আসবি? হ্যামস্ট্রিং পুল। পা নাড়াতে পারছি না মোটে।

তো?

ম্যাচ হারা যাবে না। সাত রান তুলে দিয়ে আয়।

নিজের কিটব্যাগ থেকে জার্সি, ট্রাউজার বার করে ছুড়ে দিল অর্ক। পরে ফেল চটপট।

মানে? ইরাবতী হতভম্ব।

সাতটা রান তুলে দিয়ে আয় ইরা। কুইক! টয়লেটের কথা বলে ড্রেসিংরুমে এসেছি। কেউ দেখে ফেললে মুশকিল!

কী বলছিস! আমি তোর জায়গায়? ধরা পড়লে?

আহ, বাজে তর্কে টাইম ওয়েস্ট করিস না। তোর আমার হাইট অলমোস্ট এক। জার্সি, সোয়েটার, ফুটপ্যাড। এমনকী চশমার ফ্রেমও এক। মাথায় হেলমেট থাকলে কেউ চিনবে না। আর তোর চুলটাও তো বয়েজকাট। মিচকে হেসেছিল অর্ক।

ইরা মাথা নেড়ে তীব্র আপত্তি জানিয়েছিল। দিস ইজ করাপশন অর্ক!

অর্ক ভেংচিয়ে উঠল, ভারি আমার সত্যবাদী যুধিষ্ঠির! বিপদে হেল্প না করলে কীসের বন্ধু রে তুই! এইজন্যই বলে মেয়েরা ওয়র্থলেস!

ইরাবতী ফিরে যাচ্ছিল। তার মন সায় দিচ্ছিল না।

থমকে দাঁড়াল। অর্কর শেষ লাইনটা ইরাবতীর কানে গিয়েছে। ইচ্ছে করেই বোধহয় এইসব হুল ফোটানো কথা বলে অর্ক।

জানতাম রাজি হবি না। তোরা মেয়েই থেকে গেলি। ভীতুর ডিম সব। ঘরে গিয়ে চুড়ি পরেই বসে থাক।

ইরাবতী ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। ঠান্ডা, নিঃস্পৃহ গলায় বলেছিল, কী করতে হবে?

চুপ, চুপ! আস্তে। আমি তোর স্কুটি নিয়ে পেট্রল পাম্পে দাঁড়াচ্ছি। জাস্ট সাতটা রান তুলে জিতিয়ে আয়। হেলমেট খুলবি না কিন্তু। চিনে ফেলবে পাবলিক। ধরা পড়ে যাবি!

বৃষ্টি শেষ!

মুখঢাকা হেলমেট, জার্সি, সোয়েটার পরে ইরাবতী যখন পিচে গিয়েছিল, বোঝাই যাচ্ছিল না যে চুপিসারে বদলে গিয়েছে জার্সির ভিতরের খেলোয়াড়।

তবে সে যাত্রা রক্ষা পায়নি ম্যাচ। অর্কর ভারী ব্যাট সামলাতে পারেনি ইরাবতী। কিংবা খেলায় মন ছিল না। তিন রান করেই আউট! খেলাধুলোয় ব্যুৎপত্তি থাকলেও অন্যায়ে সায় ছিল না ইরাবতীর।

হেরে যাওয়ার জন্য অর্কর কাপ্তানি চলে গেল সুদীপের হাতে। প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিল অর্ক। পুরো ঝালটাই ঝেড়েছিল ইরাবতীর উপর।

দেখলি তো, প্রমাণটা তুই নিজেই দিলি! মেয়েরা খেলার মাঠে স্ট্রেস হ্যান্ডল করতে পারে না!

ইরাবতী দমে গিয়েছিল। বলেছিল, তুই আমার বন্ধু বলেই তর্ক করলাম না। এটা ছেলে বা মেয়ের ব্যাপার নয়। একটা বেআইনি কাজ করতে পাঠিয়েছিলি। শুধু তোর ইনজুরির জন্য রাজি হয়েছিলাম।

যাই হোক, ম্যাচ তো ফিনিশ করে এলি। তোর থেকে রুদ্র বেটার ব্যাট করছিল। ব্যাটিংও পারিস না।

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিস না। কী প্রচণ্ড টেনশন নিয়ে আমি মাঠে নেমেছিলাম সেটা ভেবেছিস অর্ক? ধরা পড়লে লজ্জার শেষ থাকত না।

আমার ভাবার দরকার নেই। তোদের মেয়েদের তো পেটে কথা থাকে না। দয়া করে কথাটা পাঁচকান করিস না।

ইরাবতীর সঙ্গে সেই শেষ কথা। দু'সপ্তাহ পরেই ইরাবতীর স্কুটিটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল।

সেদিনের ঘটনাটা অনেকবার ভেবেছে অর্ক। ইরাবতীকে অতটা ব্যঙ্গ করা উচিত হয়নি। ও তো সত্যিই বিরাট ঝুঁকি নিয়ে কাজটা করেছিল সেদিন।

৩

জেলার ক্রিকেট টিমে ঢোকার খুব ইচ্ছে অর্কর। সিলেকশন ম্যাচের দিন ঠিক করল ব্যাট করার সময় কিছুতেই বোলার ছাড়া অন্য কোনও দিকে তাকাবে না।

ফুল টস বল আসছে। অর্ক ঠিক করল ছয় মারবে।

মারল। বল গিয়ে পড়ল গ্যালারিতে। খুশি হয়ে ঘাড় ঘোরাতেই দেখল অর্ক, গ্যালারি থেকে ইরাবতী বলটা ছুড়ে দিল। তারপর চোখ মটকে খিলখিল করে হাসল।

থতমত খেয়ে চোখ কচলালো অর্ক।

পরের বার বলের আগে চোখ চলে গেল গ্যালারিতে। এবং অবধারিত বোল্ড আউট অর্ক।

এত সহজ বলটা খেলতে পারলি না? গেমসস্যার চেঁচিয়ে উঠলেন।

অর্ক মুহ্যমান। গ্যালারির কোথাও আর দেখা গেল না ইরাবতীকে।

এবারেও সেই এক ব্যাপার। কেউ দেখেনি ইরাবতীকে।

সেদিন রাতেই গেমসস্যার নিখিলবাবু অর্কর বাড়ি গেলেন।

স্যার, আমার দ্বারা কিসসু হবে না। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল অর্ক।

তোর অবচেতন মন এসব দেখছে। ইরাবতী নেই। একজন সায়কায়াট্রিস্টকে দেখা।

অর্কর বাবা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিলেন মনোবিদের। তিনি বললেন, হ্যালুসিনেশন। কাউন্সেলিং লাগবে।

কেটে গেল একটি বছর। এই এক বছরে একদম মনঃসংযোগ করতে পারেনি অর্ক। ওষুধপত্র, মেডিটেশন, কাউন্সেলিং কিছুই তার ভয় দূর করতে পারেনি। বড় ম্যাচ থাকলেই অর্ক নিজের উইকেট ছুড়ে দিয়ে চলে আসে। ইরাবতী দেখা দেবেই। অর্ক বুঝতে পারছে, এজীবনে ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন হয়তো সফল হবে না।

বর্ষশেষে, ডে নাইট ম্যাচে কলকাতায় খেলার আমন্ত্রণ পেল অর্ক। বাবার মুখে উৎকণ্ঠা।

কী রে, পারবি তো? এটাই লাস্ট চান্স। তোর চশমার পাওয়ারটা চেক করাতে হবে।

জেঠিমা কোত্থেকে দুটো মাদুলি এনে পরিয়েছে। বলল, পূর্ণিমায় তোকে বরং ঝাড়িয়ে আনব।

আগে প্রতিবাদ করত অর্ক। এখন সেই জোরই নেই।

অর্কর মাসি বললেন, মেয়েটির অপঘাতে মৃত্যু বলেই বার বার ফিরে আসছে। যজ্ঞ করা দরকার।

সমস্যা হল, কাউকেই অর্ক সেদিনের ঘটনাটা খুলে বলতে পারেনি। বন্ধুরা যারা ইরাবতীকে চিনত, তাদের কাছে বলি বলি করেও থমকে গেছে অর্ক। মরে গিয়ে সবটুকু সহানুভূতি পেয়ে গিয়েছে ইরাবতী। উল্টে অর্ককেই দোষী ঠাউরাবে সবাই।

ধুমধাম করে হোমারতি করল মা। কোচও বদল করাল বাবা। ইনি কলকাতা থেকে এসে কোচিং করাচ্ছেন।

অর্ক আগের থেকে বদলেছে অনেকটা। এখন আর কথায় কথায় মেয়ে খেলোয়াড়দের ছোট করে না। বলা যায় না, ইরাবতীর আত্মা হয়তো সেদিনের অপমানটাকে গায়ে মেখেছে। আর সত্যিই তো, আজকাল মেয়েরা যত পদক আনছে অলিম্পিকে, সেই তুলনায় ছেলেরা অনেক পিছিয়ে। মেরি কম, সাইনা নেহওয়াল, সিন্ধু, সাক্ষী, মালেশ্বরী। সুযোগ থাকলে আরও কত কত মেয়ে উঠে আসত। তার মা'ই তো দারুণ বল করে বাড়ির নেট প্র্যাকটিসের সময়। কিন্তু দাদু তো মা'কে খেলতেই দেননি কোনওদিন।

কলকাতায় ইডেনে ম্যাচ।

অর্ক মনে মনে ইরাবতীর কাছে ক্ষমা চাইল— সরি ইরা।

খেলা যখন শুরু হল, কুয়াশায় ছেয়ে গিয়েছে কলকাতা মহানগরী। ফ্লাড লাইটের আলোয় অর্ক দেখল, স্টেডিয়াম কানায় কানায় ভর্তি।

ওপেনিং ব্যাটসম্যান অর্ক। নামার আগে নতুন কোচ ডেকে পাঠালেন।

কনসেন্ট্রেট এন্ড কনসেন্ট্রেট! একজন পেশাদার ব্যাটসম্যান পাখির চোখ করবে বোলারের হাতের উপর। আর কিছু দেখবে না।

ওই মেয়েটিকে দেখেছ? তোমাদের জুনিয়র। কিন্তু দারুণ খেলছে। জাস্ট সতেরো বছর বয়স। আইসিসির টি-টুয়েন্টির আন্ডার নাইন্টিন স্কোয়াডে সিলেক্টেড। প্রমিসিং!

অর্কর চোখে ধাঁধা লেগে গেল। ইরাবতী! ইরা বেঁচে আছে! তবে কি এতদিন অর্কর সঙ্গে...

অর্ককে হতবাক করে ইরাবতী উঠে এসে হাত বাড়াল।

হ্যালো, আমি অরুন্ধতী। তোমার সব ম্যাচ দেখি।

অর্ক কী বলবে বুঝতে পারল না। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

অবিকল ইরাবতী। সেই পিংক টি-শার্ট। ফেডেড জিনস। বয়েজ কাট চুল। শুধু চশমাটাই নেই চোখে।

হাঁ করে কী দেখছ? আসল স্পোর্টসম্যান স্পিরিটটা হল মানুষের নিজের। ছেলে না মেয়ে খেলোয়াড় সেটা ম্যাটার করে না। যেমন তুমি, ছেলে হয়েও এক বছর ধরে স্ট্রেস হ্যান্ডেল করতে পারছ না। অ্যাম আই রাইট?

অরুন্ধতী দুই ভুরু নাচাল।

অর্ক এখনও হতবুদ্ধির মতো তাকিয়ে। আমতা আমতা করে বলল, না মানে, আমি তো মজা করে বলেছিলাম। ইরাবতী ওয়াজ আ পারফেক্ট স্পোর্টস পার্সন।

অরুন্ধতীর কোঁচকানো ভ্রূ সোজা হল। ধরা গলায় বলল, ঠিক আছে, যাও। হাত খুলে ব্যাট করো। আর ভবিষ্যতে ইরাবতীর মতো খেলোয়াড়ের সঙ্গে এমন ইয়ার্কি কোরো না।

স্টেডিয়ামের কুয়াশা কেটে গিয়ে নিমেষে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে উঠল অর্কর কাছে। সে কোনওরকমে বলল, কিন্তু তুমি এসব কথা জানলে কীভাবে?

ইরাবতীর থেকে তোমার সব ফিডব্যাক পেতাম। অরুন্ধতী মুচকি হাসল। ভূতেদের পেটে কথা থাকে না। কিন্তু মেয়ে খেলোয়াড়দের থাকে। বিশেষত যদি তারা যমজ হয়। তুমি সেরেনা উইলিয়ামস আর ভেনাস উইলিয়ামসের কেমিস্ট্রি জানো নিশ্চয়?

নিজের উপর এই মুহূর্তে ভয়ঙ্কর রাগ হচ্ছে অর্কর। কিন্তু কাউকে তো বলার উপায় নেই! সে হাতের ব্যাটটা ছুড়ে দিয়ে চিৎকার করে উঠল।
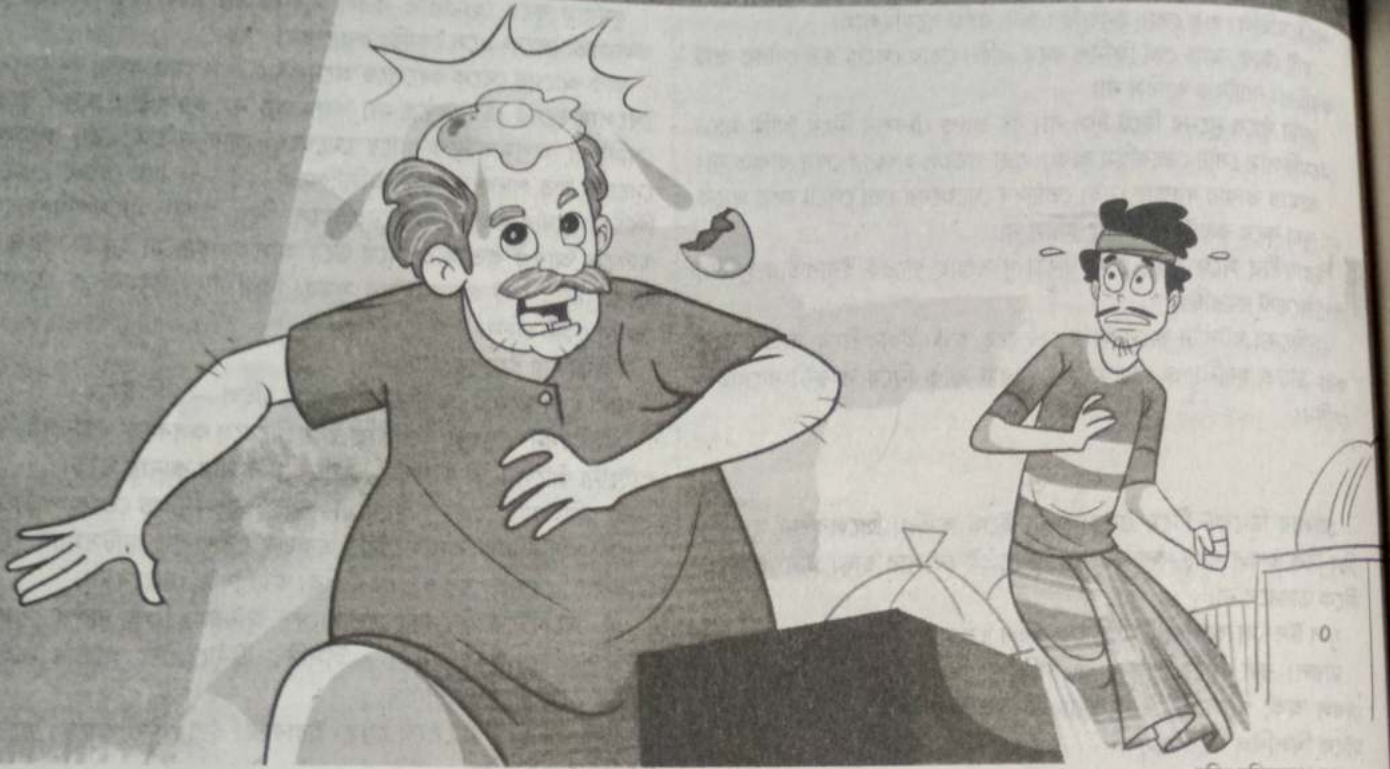
ছবিঃ নচিকেতা মাহাত

শান্তনু বসু

তিল থেকে তাল

তালা খুলে চিলেকোঠার ঘরে ঢুকে ভববাবু দেখলেন, চারিদিক ভয়ানক অগোছালো হয়ে আছে। ঘরের আনাচেকানাচে জাল বিস্তার করেছে মাকড়সা। কড়িবরগা থেকে ঝুলতে থাকা পেল্লায় পাখাটার ব্লেডগুলো ঝুলকালিতে প্রায় কালো হয়ে গিয়েছে।

বাড়ির কাজের ছেলে হরিমাধবেরই ঘরদোর, পাখাটাখা সব ঝেড়েপুছে রাখার কথা। ছোকরা আজকাল দেদার ফাঁকি দিচ্ছে। ফাঁকিবাজি ভববাবু মোটেই বরদাস্ত করতে পারেন না। কোমরে হাত রেখে পাখার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে তাঁর মেজাজটা তিরিক্ষি হয়ে উঠল।

চোখ নামিয়ে ঘরের মাঝে রাখা ঠাকুরদার আমলের লোহার মস্ত তোরঙ্গটার দিকে চেয়েই ভববাবুর মাথাটা জ্বলে গেল। গাদাখানেক শিশি বোতল, অকেজো টিউব লাইট, লোহালক্কড়, ভাঙাচোরা একটা ট্রাই-সাইকেল, গোছাগোছা ইলেকট্রিকের তার ও হরেকরকমের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ডাই করে রাখা তোরঙ্গখানার ওপর। এসবই হরিমাধবের সম্পত্তি। অকেজো জিনিসপত্র কাজে লাগিয়ে নানারকম উদ্ভট যন্ত্রপাতি তৈরি করাই হল তার কাজ। ব্যাটা এই চিলেকোঠার ঘরখানাকে একেবারে গুদামঘর বানিয়ে ফেলেছে!

ভববাবুর কলিগ-কাম-বন্ধু, রায়বাহাদুর নৃপতিদেব হাই স্কুলের বিজ্ঞানের শিক্ষক নন্দবাবুর মতে হরির মধ্যে দিব্যি একটা বিজ্ঞানীসুলভ অনুসন্ধিৎসা রয়েছে। অবস্থার ফেরে তেমন লেখাপড়া করার সুযোগ না পেলেও হাতেকলমে কাজ করতে করতে হরি একদিন মস্ত একটা কিছু করে ফেলবে। ভববাবুর গিন্নিও তাই মনে করেন। বিজ্ঞানচর্চায় হরিকে তিনি বেশ উৎসাহই দেন।

ভববাবুর ধারণা, তাঁর গিন্নি ও নন্দবাবু লাই দিয়ে দিয়ে হরির মাথাটি খাচ্ছেন। বেশ কয়েকবার হরিকে সতর্ক করে তিনি বলেছেন, 'তোরঙ্গের উপরে খবরদার কিচ্ছু রাখবি না, ওর ভিতরে মেলা দরকারি জিনিস আছে।' হরি সেসবে কানই দেয়নি।

এই তো দিন কয়েক আগে পদ্য লিখতে লিখতে ভববাবুর ফাউন্টেন পেনের কালি ফুরিয়ে গেল। কালি ভরে দেওয়ার জন্য হরিকে ডেকে ডেকে তিনি হয়রান। ছোকরার কোনও সাড়াশব্দ নেই। বেশ কিছুক্ষণ পর হরি এসে শুধোল, 'ডাকছিলেন কর্তাবাবু?'

'কোথায় থাকিস? এই বলে খাতার পাতা থেকে মুখ তুলে হরির দিকে চেয়ে আঁতকে উঠেছিলেন ভববাবু। হরির হাতে একটা ট্রাই-সাইকেলের চাকা। তার গায়ে বৃত্তাকারে রবারের টুকরো দিয়ে বাঁধা গোটা আটেক সবজি কাটার ছুরি।'

চোখ গোল্লা করে ভববাবু শুধোন, 'হাতে ওটা কী রে? সুদর্শন চক্র নাকি?'

'সুদর্শন চক্র মানে গলা কাটার ম্যাশিনের কথা বলছেন তো?

মেশিনকে বলে কিনা ম্যাশিন! হরির কথার ছিরি দেখে ভববাবুর গা পিত্তি

জ্বলে গেল। সুদর্শন চক্রের কী মানে করে ছেড়েছে!

ভববাবু ধমক দেন, 'আহাম্মক কোথাকার! সুদর্শন চক্র মানে গলা কাটার মেশিন?'

হরি মাথা চুলকে বলে, 'তাই তো গিন্নিমা বলছিলেন।'

'কী বলছিলেন?'

'ওই যে রেগে গেলে কেষ্টঠাকুর ওই ম্যাশিন ছুড়ে দিয়ে ঘ্যাঁচঘোঁচ গলা কেটে দেন। তবে এ অন্য জিনিস। গিন্নিমা চেয়েছিলেন। তাই বানাচ্ছি। সবজি-কর্তন ম্যাশিন।' হাতে ধরা ট্রাই-সাইকেলের চাকাটাকে দেখিয়ে বলল হরি।

ভববাবু অবাক হন, 'অ্যাঁ? সে আবার কী?'

'ম্যাশিনের ওই নাম গিন্নিমাই দিয়েছেন। এই চাকাটা মোটরের সঙ্গে ফিট করে ঘোরালেই সবজিপাতি সব ঘ্যাঁচঘোঁচ করে কেটে দেবে।'

'যতসব অশৈলী কাণ্ড! এইসব ছুরিছোরা নিয়ে ঘাটাঘাটি বন্ধ কর। নিজেই কোনদিন খুন-জখম হয়ে যাবি।'

তখন সদ্য একটা পদ্য লিখে শেষ করেছেন ভববাবু। পদ্য লিখলেই কাউকে পড়ে শোনাতে ইচ্ছে করে তাঁর। সেই সঙ্গে অবশ্য একটু লজ্জাও করে।

ভববাবু লাজুক হেসে হরিমাধবের উদ্দেশে বললেন, 'হ্যাঁ রে এইমাত্র একখানা ইয়ে লিখে শেষ করলাম। একটু শুনবি নাকি?'

পাশের ঘর থেকে গিন্নি হেঁকে উঠলেন, 'হরি কাজে ব্যস্ত। ওকে এখন বিরক্ত কোরো না।'

'বুঝলেন তো? ম্যাশিনের কাজটা আগে সেরেনি, তারপর বসে আপনার ইয়েটা শুনব।' এই বলে ধাঁ করে ঘর থেকে হাওয়া হয়ে গেল হরি।

হতাশ হয়ে ভববাবু নিজেই পদ্যখানা বারবার পড়তে লাগলেন।

চিলেকোঠার ঘরে দাঁড়িয়ে ভববাবুর মনে হচ্ছিল, হরিমাধবকে ডেকে আচ্ছাসে এক ধ্যাতাঁনি লাগান। কিন্তু তাঁর হাতে এখন হরির পিছনে ব্যয় করার মতো সময় নেই। একটা জরুরি প্রয়োজনে তোরঙ্গটা খুলতে হবে। অগত্যা তিনি নিজেই তোরঙ্গের উপর থেকে জিনিসপত্র সরানোর কাজে লেগে পড়লেন।

ইস্কুলের অ্যানুয়াল ফাংশানে ছাত্রেরা নাটক করবে। ভববাবুর লেখা নাটক। তিনিই পরিচালক। সেই নাটকের প্রপ হিসেবে একটা ট্যাঁকঘড়ি দরকার। সেখানা উদ্ধারের উদ্দেশেই সাতসকালে ভববাবুর চিলেকোঠা অভিযান। ঠাকুরদার ট্যাঁকঘড়ি আছে তোরঙ্গটার মধ্যে একখানা।

তোরঙ্গের উপরটা খালি করতে গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ভববাবু ঝুলকালি মেখে ঘেমেনেয়ে একসা হয়ে হ্যা হ্যা করে হাঁপাতে লাগলেন। এখনও মেলা জিনিস বাকি। নাঃ! এই ধকল পোহানো তাঁর কম্ম নয়। অগত্যা হরিকেই ডাকলেন ভববাবু। 'হরি! হরি! অ্যাই হরি—'

কর্তাবাবুর হাঁকডাক শুনে হরিমাধব ছুটে এল।

ভববাবু বেশ মেজাজের সঙ্গে বললেন, 'কী করছিলি?'

'ঘুমোচ্ছিলাম।'

ভববাবুর গা-পিত্তি জ্বলে গেল। 'ঘুমোচ্ছিলি? এই বেলা পর্যন্ত?'

'আজ্ঞে গিন্নিমার জন্য ওই সবজি-কর্তন ম্যাশিন বানানোর কাজটা শেষ করতে গিয়ে কাল অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল তো তাই।'

ভববাবু ফোঁস করে উঠলেন, 'অকালকুষ্মাণ্ড কোথাকার। তোকেই আজ ওই মেশিনে কেটে দু'টুকরো করব।'

হরিমাধব ঘাড় চুলকে হাই তুলে বলে, 'ও ম্যাশিন দিয়ে বড়ি কাটা যাবে না। বড়ি কাটার ম্যাশিন পরে একখানা বানাব।'

'চোপ! বাচাল ছোকরা। ঘরটার কী হাল হয়েছে দেখেছিস? সাফসুতরো করতে পারিস না?'

হরিমাধব জবাব দেয়, 'ম্যাশিনটা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম তাই এদিকটায় নজর দিতে পারিনি। তা আপনিই বা সাতসকালে এসব ঘাটাঘাটি করছেন কেন? গিন্নিমা জানতে পারলে কিন্তু মহা অনর্থ হবে।'

গিন্নিকে ভববাবু বেশ সমীহ করে চলেন। বললেন, 'অ্যাই চুপ চুপ। খবরদার তোর গিন্নিমা যেন এসব কিছু জানতে না পারেন।'

'আপনি খুঁজছেন কী?'

'ঠাকুরদার ট্যাঁকঘড়ি। তোরঙ্গে আছে।'

'সে তো অচল।'

'ঘড়ি সচল না অচল, সে আমি বুঝব। তোকে পাকামো করতে হবে না। এক কাজ কর দেখি— তোরঙ্গের উপর থেকে জিনিসগুলো সরা। তার আগে পাখাটা ছেড়ে দে। গরমে একেবারে সেদ্ধ হয়ে গেলাম।'

হরিমাধব সুইচ টিপতেই ঘড়াং ঘড়াং করে বিদঘুটে শব্দ তুলে পাখাটা শম্বুক গতিতে ঘুরতে শুরু করল।

হরি কোমরে হাত দিয়ে উপরের দিকে চেয়ে বিজ্ঞের মতো বলল, 'অয়েলিং করা দরকার।'

ভববাবুও মুখ তুলে উপরের দিকে চেয়ে পাখার ঘোরাঘুরি দেখছিলেন। হঠাৎই ফ্যানের ডানা থেকে ঝুলতে থাকা একদলা ঝুল এসে পড়ল তাঁর নাকের ডগায়। ভয়ানক একটা বোটকা গন্ধে ভববাবুর গা গুলিয়ে উঠল। হাত দিয়ে এক ঝটকায় নাকের উপর এসে পড়া ঝুল সরাতে না সরাতেই অন্য এক বিপত্তি।

উপর থেকে ঝপাং করে ভববাবুর মাথায় এসে পড়ল পায়রার বাসা। সে খানা একেবারে উষ্ণীষের মতো জেঁকে বসে গেল ভববাবুর চকচকে টাকের উপরে।

'উরিব্বাপ! কী পড়ল রে মাথায়?'

'পাখির বাসা।'

'অ্যাঃ! কী বিচ্ছিরি গন্ধ!'

জুলজুলে চোখে হরিমাধব দেখল, কী একটা হলদেটে তরল পদার্থ ভববাবুর কপাল ও নাক বেয়ে নেমে আসছে।

আসলে ফ্যানের ডানার উপরে নিজের বাসায় বসে নিশ্চিন্ত মনে ডিমে তা দিচ্ছিল একটা পায়রা। একখানা নয় তিন-তিনখানা ডিমের সবক'টাই ভববাবুর টাকের উপরে ফেটেছে।

আবিষ্কারের আনন্দে হরিমাধব চেঁচিয়ে উঠল, 'ডিম! ডিম! ডিম! কর্তাবাবু আপনার মাথায় ডিম ফেটেছে। পায়রার ডিম!'

'অ্যাঁ? পায়রার ডিম?' ভববাবু লাফিয়ে উঠে এক ঝটকায় মাথা থেকে পাখির বাসা ফেলে ওয়াক তুলতে তুলতে এক ছুটে ছাতে গিয়ে ট্যাপকল চালিয়ে তার নীচে মাথা পেতে দিলেন।

'তোর জন্যেই আমার আজ এই হেনস্থা। কতবার বলেছি ঘরদোর সবসময় সাফসুতরো রাখবি।'

'ও ঘরে তো কেউ যায় না।' কাঁচুমাচু মুখ করে সাফাই গায় হরিমাধব।

'থাক থাক। তোকে আর কিচ্ছু করতে হবে না। ওই পাখাটাখা, ঘরদোর আজ আমি নিজেই সাফসুতরো করব। শুধু একটা কাজ করে আমায় উদ্ধার কর দেখি। নন্দবাবুর বাড়ি থেকে চটপট ওটা নিয়ে আয়...আঃ কী মুশকিল! দাঁড়িয়ে রইলি কেন?'

'কী আনব সেটা বলবেন তো?'

'ম্যাগো এখনও উৎকট গন্ধ বেরোচ্ছে।' টবের মাটি টাকে ঘষতে ঘষতে ভববাবু বললেন, 'আরে ওই তো। ওইটা। কী যেন বলে? আগেও তো একবার এনেছিলি।'

হরিমাধব এক গাল হেসে বিজ্ঞের মতো বলে, 'বুঝেছি।'

'যা যা! শিগগির যা। আসার পথে ভালো গন্ধওয়ালা সাবান নিয়ে আসবি।'

'যে আজ্ঞে।'

'আর শোন।'

চলে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় হরিমাধব।

রুমাল দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে ভববাবু বললেন, 'গিন্নিমা খোঁজ করলে বলবি বাবু একটু বেরিয়েছেন।'

'তার মানে আপনি আপাতত ছাতেই আত্মগোপন করে থাকবেন? তাই তো?'

'তোর অত খতেনে দরকার কী? যা বললাম তাই করবি। ডেঁপো কোথাকার!'

সকালে উঠে মুগুর ভাজা, ডনবৈঠক দেওয়া নন্দবাবুর বহুদিনের অভ্যেস। সকালে শরীরচর্চা না করলে মাথাটা তার আবার ঠিক খোলে না। অঙ্কের

হিসেবনিকেশে মেলা ভুলচুক হয়। বিজ্ঞানের তত্ত্ব, তথ্য সব ঘুলিয়ে যায়।

ইয়া বুকের ছাতি, লম্বাচওড়া চেহারা, মাথায় কদমছাঁট চুল নন্দবাবুকে দেখলে যে কেউ অবশ্য মিলিটারি অফিসার বলে ভুল করবে। তিনি বিজ্ঞানের শিক্ষক। রোজকার মতো আজও বাড়ির সামনের উঠোনে মুগুরটুগুর ভেজে, হাইহুই করে শতখানেক ডনবৈঠক দিয়ে ঘেমেনেয়ে ধপ করে বেতের চেয়ারে বসতেই নন্দবাবু দেখলেন, ছোকরা হরিমাধব রাংচিতার বেড়ার আগল ঠেলে হুড়মুড়িয়ে তার বাড়ির চৌহদ্দিতে ঢুকে পড়ল।

নন্দবাবুর খুব ভালো লাগে হরিমাধবকে। বেশ সোজাসাপ্টা ছেলে। লেখাপড়া করার তেমন সুযোগ পায়নি বেচারা, কিন্তু বিজ্ঞানে খুব আগ্রহ। মাঝে মধ্যেই নন্দবাবুর কাছে এসে বিজ্ঞানের টুকিটাকি জিনিসপত্র জেনে যায়। নানারকম মেশিনপত্র তৈরির চেষ্টা করে। তার সবজি-কর্তন মেশিন তৈরির কথা নন্দবাবুর অজানা নয়।

একখানা কাঠের পিঁড়ির গায়ে লাগানো থাকবে একটা বাতিল ট্রাইসাইকেলের চাকা। তার গায়ে পরপর বৃত্তাকারে লাগানো থাকবে গোটা আটেক ছুরি। চাকাটা ঘুরবে বিয়ারিং আর মোটরের সাহায্যে। মোটর চালালেই চাকা ঘুরবে। সেই সঙ্গে ছুরির ঘুরন্ত ফলাগুলো ঘুরতে ঘুরতে পিঁড়ির উপর রাখা সবজি ঘ্যাঁচঘ্যাঁচ করে কেটে ফেলবে।

সব শুনে নন্দবাবু বলেছিলেন, 'বেড়ে ভেবেছ! শুধু সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সের কথাটা একটু মাথায় রেখো। সফল হলে, অমন একখানা মেশিন আমার বাড়ির জন্যেও বানিয়ে দিও। গৃহিণী খুশি হবেন।

'হ্যাঁ হ্যাঁ। একখানা বানিয়ে ফেললে আর পাঁচখানা বানানো কী আর এমন মেহনতের কাজ।' এই বলে নন্দবাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে সেদিন বিদায় নিয়েছিল হরিমাধব।

আজ ব্যস্তসমস্ত ভাবে তাকে আসতে দেখে নন্দবাবু ভাবলেন নিশ্চয়ই সে মেশিনখানা বানিয়ে ফেলেছে। সৃষ্টির আনন্দই তার মনের উত্তেজনার কারণ।

ঠিকে কাজের মেয়েটি এসে চায়ের কাপটা দিয়ে গেল। সেটা হাতে নিয়ে নন্দবাবু শুধোলেন, 'কী ব্যাপার হে? এত হুড়োতাড়া কীসের? সবজি-কর্তন যন্ত্র বানিয়ে ফেলেছ নিশ্চয়ই!'

'সে তো বানিয়েছি।' খানিকটা বেজার মুখ করে হরিমাধব জবাব দেয়।

'তা যন্ত্রখানা কেমন চলছে? সব কেটেকুটে সাফ করে দিচ্ছে তো?'

'তা আর পরখ করার সময় পেলাম কোথায় মাস্টারবাবু? ম্যাশিনটা গিন্নিমার জিম্মায় দিয়ে দিয়েছি। উনিই পরখ করে দেখে নেবেন। এদিকে সকাল থেকে বাড়িতে তো একেবারে হুলুস্থুলুস কাণ্ড!'

চোখ গোল্লা করে নন্দবাবু শুধোলেন, 'কেন কী হল?'

'কর্তাবাবুর মাথায় ঝুলকালি, ডিম পড়েছে।'

নন্দবাবুর হাত কেঁপে কাপ থেকে চা ছলকে পড়ল। 'অ্যাঁ? কী যা তা বলছ? ভব আবার ডিম পাড়বে কী করে? ভব কি পাখি নাকি অ্যাঁ?'

'আহা তা নয়। বাবু কেন ডিম পাড়তে যাবেন? বাবুর মাথায় ডিম পড়েছে। সেই সঙ্গে গাদাখানেক ঝুলকালি। বাবু একেবারে ডিমে-ঝুলে মাখামাখি।'

এরপর রুদ্ধশ্বাসে হরিমাধব সব ঘটনার অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়ে গেল। সব শুনে বেশ আমোদ পেয়ে নন্দবাবু হ্যা হ্যা হ্যা করে হেসে উঠলেন।

'হাসছেন? ওদিকে ডিমের কুসুমে মাখামাখি হয়ে বাবুর বিচ্ছিরি অবস্থা। দুর্গন্ধে কাছে যাওয়া দায়!'

নন্দবাবু বললেন, 'ভবর মাথায় চুল কম বলে বড় আফশোস ছিল ওর। কলেজের বেড়া ডিঙোতে না ডিঙোতেই মাথাজোড়া টাক পড়ে গেল। তবে বুঝলে কি না, এ মনে হচ্ছে শুভলক্ষণ। মাথার উপরে পায়রার ডিম যখন ফেটেছে, এবারে নির্ঘাত ভবর মাথায় চুল গজাবে। সুখা জমি একেবারে ধানক্ষেত হয়ে যাবে। হে হে হে হে।'

হরিমাধব বলে, 'এসব হাসিঠাট্টার বিষয় নয় মাস্টারবাবু। কর্তাবাবুর মাথা ভয়ানক গরম হয়ে গেছে। ঘরদোর, ফ্যানট্যান পরিষ্কার না করে তিনি নাকি আজ জলগ্রহণ করবেন না। তা বলছিলাম কি ফ্যান পরিষ্কার করার ম্যাশিনটা একটু দিন তো। বাবুর কাজ হয়ে গেলেই ফেরত দিয়ে যাব।'

নন্দবাবু ভারি অবাক হয়ে বললেন, 'ফ্যান পরিষ্কার করার মেশিন? সে আবার কী?'

'কেন? আপনার বাড়িতেই তো আছে।'

'কী যা তা বলছ? অমন কোনও মেশিন ভূ-ভারতে আছে বলে তো বাপু শুনিনি।'

'সে কী? ক'দিন আগেই তো আপনার বাড়ি থেকে ম্যাশিনখানা নিয়ে গেলাম। কিছুই আপনার খেয়াল থাকে না।'

নন্দবাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন। 'বলছ কী? আমার বাড়ি থেকে নিয়ে গেলে? ফ্যান পরিষ্কার করার মেশিন?'

'হুঁ।'

'না হে তোমার কোথাও ভুল হচ্ছে।'

'ভুল আমার হচ্ছে না, আপনার হচ্ছে। যাক গে, ওটা বের করে রাখুন। আমি চট করে সাবান কিনে আনি। ফিরতি পথে নিয়ে যাব।'

এই বলে হরিমাধব ঝড়ের গতিতে যেমন এসেছিল তেমনই চলে গেল।

নন্দবাবু বেশ ফ্যাসাদে পড়ে গেলেন। ফ্যান পরিষ্কার করার মেশিন! এমন কোনও যন্ত্রের কথা কখনও তিনি শুনেছেন বলে তো মনে পড়ছে না। হরিমাধব নাকি বাড়ি থেকে এর আগেও মেশিনখানা নিয়ে গিয়েছিল। আস্ত একখানা মেশিনের কথা তিনি বেমালুম ভুলে মেরে দিলেন? এ কী সম্ভব? অবশ্য নিজের স্মৃতিশক্তির উপরে নন্দবাবুর বড় একটা ভরসা নেই। অনেক কিছু হামেশাই তিনি ভুলে যান।

এই তো সেদিন মাঝরাতে আঁক কষতে কষতে তাঁর হঠাৎ মনে হল, এই যাঃ! ডিনার করা হয়নি। পেটের মধ্যে ছুঁচোয় ডন দিচ্ছে। গিন্নিকে খুঁচিয়ে ঘুম থেকে তুলে বললেন, 'বুঝলে রাতে যে খেতেই ভুলে গিয়েছি।'

গিন্নি ভয়ানক হাউমাউ জুড়ে দিয়ে বললেন, 'মরণদশা আমার! ভীমরতিতে ধরল নাকি?'

গিন্নির ধ্যাতানি খেয়ে নন্দবাবু ধাতে এলেন। তখনই তাঁর মনে পড়ে গেল, রাতে সেদিন তিনি ভরপেট লুচি, মাংস, পায়েস খেয়েছিলেন। এখন তাঁর মোটেই খিদে নেই। পেট একেবারে আইঢাই করছে।

চোখ বুজে বেশ কিছুক্ষণ ভাবলেন নন্দবাবু। নাঃ! ফ্যান পরিষ্কার করার মেশিনের কথা তার মনে পড়ছে না। হরিমাধব যাই বলুক না কেন, এ মেশিন মোটেই তাঁর বাড়িতে নেই। হরিমাধবেরই নির্ঘাত ভুল হয়েছে।

নন্দবাবুর বাড়ির পাশেই চণ্ডী ঘোষের বিরাট কোঠাবাড়ি। দুই বাড়ির সীমানায় রয়েছে কোমর সমান উঁচু রাংচিতার বেড়া। সুদের কারবারি চণ্ডী ঘোষ অঢেল টাকার মালিক। তাঁর বিদ্যের দৌড় ক্লাস এইট পর্যন্ত। মা লক্ষ্মী ও মা সরস্বতীর মধ্যে যে মোটেই বনিবনা নেই, সেটা লেখাপড়ায় অষ্টরম্ভা চণ্ডী ঘোষের ঝাঁ চকচকে তেতলা বাড়ি ও তার পাশে রায়বাহাদুর নৃপতিদেব হাইস্কুলের বিজ্ঞানের শিক্ষক, মেকানিকসের মস্ত পণ্ডিত নন্দবাবুর ম্যাড়ম্যাড়ে একতলা বাড়িখানা দেখলেই দিব্যি বোঝা যায়।

মা লক্ষ্মীর অনুগ্রহ পেলেও চণ্ডী ঘোষের মনে কিন্তু সুখ নেই। কারণ, অঢেল টাকার মালিক হলেও গাঁয়ের লোক তাঁকে তেমন পোঁছে না। ওদিকে সকলের কাছে তাঁর প্রতিবেশী নন্দবাবুর বেজায় খাতির। ইস্কুলে পড়ান। বাংলায় পদ্য লেখেন, শখের থিয়েটারে অভিনয়-টভিনয় করেন বলে ভববাবুর খাতিরও কম নয়। স্থানীয় ক্লাবগুলো বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নন্দবাবু বা ভববাবুকেই সভাপতির চেয়ারে বসায়। ফুলের স্তবক দেয়, মানপত্র দেয়, গদাধর মোদকের দোকানের মিষ্টির প্যাকেট দেয়। এসব চণ্ডী ঘোষের কপালে জোটে না। আহাম্মক লোকেদের কাছে টাকার চেয়ে লেখাপড়ার কদর বেশি—এ কথা ভেবে চণ্ডী ঘোষ মনে মনে বড্ড দুঃখ পান আর নন্দবাবু ও ভববাবুকে ঈর্ষা করেন।

সকালে নিজের বাড়ির বাগানে ঘুরে ঘুরে বাগানের মালি গজাননের কাজকম্ম পরিদর্শন করার ফাঁকে আড়ি পেতে হরিমাধব ও নন্দবাবুর কথাবার্তা সবই শুনেছেন চণ্ডী ঘোষ। ভববাবু সাতসকালে পায়রার ডিমে মাখামাখি হয়েছেন শুনে তাঁর বেজায় আমোদ হয়েছে। খুশি হয়ে গজাননকে দু'টাকা বখশিস দিয়েছেন। গজাননের তো চোখ উলটে অজ্ঞান হওয়ার জোগাড়। কারণ সকলেই জানে চণ্ডী ঘোষ ভারি কিপটে লোক। তাঁর হাত থেকে একটা বাড়তি পয়সাও গলে না।

এক আনন্দের রেশ কাটতে না কাটতেই ফের আনন্দ। চণ্ডী ঘোষের মনে

আজ ডবল আনন্দ! ফ্যান পরিষ্কার করার মেশিনের কথা শুনে নন্দবাবুকে তিনি বোমকে যেতে দেখেছেন। নন্দবাবুর জ্ঞানের ফানুস চুপসে গিয়েছে। সেই হেতু চণ্ডী ঘোষের মনে এখন খুশির তুফান।

যাই হোক, ফ্যান পরিষ্কার করার মেশিনের বিষয়ে ভাবতে ভাবতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই ভববাবুর সঙ্গে চণ্ডী ঘোষের চোখাচোখি হয়ে গেল।

'এই যে নন্দবাবু? ভালো আছেন তো?' বেড়ার ওপাশ থেকে একগাল হেসে শুধোলেন চণ্ডী ঘোষ।

অন্যমনস্ক ভাবে নন্দবাবু জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ ভালোই। মানে ভালো আছি। তা আপনি?'

'ওই আছি একরকম। ভালো কি আর বলা যায়? দেশটাতো একেবারে ভেজালে ভরে গেল।'

'তা অবিশ্যি ঠিক। হারু গয়লা আজকাল রোজই দুধে জল মেশাচ্ছে। আর মাছের বাজারের কানাই ওজনে ফাঁকি দিচ্ছে। ওর বাটখারাতে গোলমাল।'

চোখ নাচিয়ে চণ্ডী ঘোষ বললেন, 'হারু-কানাই তো নিমিত্তমাত্র। ন্যাপাছ্যাপা লোক মশায়। কিন্তু ওদিকে কত রাঘব-বোয়াল যে ভালো মানুষটি সেজে নিত্য ভেজালের কারবার করে যাচ্ছে, সেই বেলা?'

চণ্ডী ঘোষের কথায় কেমন যেন একটা ঠেস দেওয়ার সুর রয়েছে। আঁতকে উঠলেন নন্দবাবু। তার সঙ্গে হরিমাধবের কথোপকথন শুনে ফেলেননি তো চণ্ডী ঘোষ? তাই কি তিনি ভেজাল নিয়ে সাতকাহন শুরু করেছেন? বলতে চাইছেন, ও মশায় আপনি নাকি মস্ত বিদ্বান? ওদিকে ফ্যান পরিষ্কার করার মেশিনের নামই শোনেননি? আপনার জ্ঞানভাণ্ডারেও দেখছি বিস্তর ভেজাল।

চণ্ডী ঘোষ ঘোড়েল লোক। নন্দবাবু সতর্ক হলেন। আমতা আমতা করে বললেন, 'তা দেশের কেষ্টবিষ্টুরা যদি ভেজালের কারবার শুরু করে থাকেন তো তা মোটেই ভালো কথা নয়।'

চণ্ডী ঘোষ প্রায় বাঘের মতো লাফিয়ে উঠে ডানহাতের মুঠি বাঁ-হাতের তালুতে ঠুকে বললেন, 'যদি করে থাকেন কী মশায়? করেছেন। করে চলেছেন। এমন কী শোনা যাচ্ছে, লেখাপড়ার জগতেও রীতিমতো ভেজাল ঢুকে পড়েছে।'

নন্দবাবুর হাঁটু কাঁপতে লাগল। চণ্ডী ঘোষের কথার ইঙ্গিতটা মনে হচ্ছে তাঁরই দিকে যাচ্ছে। নির্ঘাত হরিমাধবের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা শুনেছেন চণ্ডী ঘোষ। ছুটে পালাতে ইচ্ছে করছে নন্দবাবুর।

চণ্ডী ঘোষ মুচকি হেসে বললেন, 'আজকাল অনেকেই নিজেকে সবজান্তা বলে জাহির করে থাকেন। কিন্তু আদপে তারা কিসসু জানেন না। ভেজালের কারবারি ছাড়া এদের আপনি কী বলবেন?'

ফাঁদে পড়া বকের মতো, নন্দবাবুর প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা।

সব ভনিতা ছেড়ে চণ্ডী ঘোষ এবারে ঝেড়ে কাশলেন। 'এই যেমন আপনি? মশায়, কথায় কথায় তো বিজ্ঞান নিয়ে খুব বড়াই করেন, লোকে বলে আপনি নাকি বিজ্ঞাননিধি। অথচ সামান্য ফ্যান পরিষ্কার করার মেশিনের নাম শোনেননি? আরে মশায়, ফ্যান পরিষ্কার করার মেশিন তো আমার বাড়িতেই দু-দু'খানা আছে। ফ্যান পরিষ্কার করার মেশিনকে এক কথায় কী বলে জানেন?'

নন্দবাবুর মনে হল চিৎকার করে বলেন, হে ধরণী দ্বিধা হও। যে মেশিনের কথা হরিমাধব জানে, যে মেশিন চণ্ডী ঘোষ দু-দু'খানা কিনে রেখেছেন, সেই মেশিনের কথা তিনি শোনেনইনি? জ্ঞানার্জনে এত অপূর্ণতা? এই অজ্ঞতা ক্ষমার যোগ্য নয়। ছি ছি ছি।

যাই হোক, ঢোঁক গিলে নন্দবাবু প্রশ্ন করলেন, 'কী বলে?'

চণ্ডী ঘোষ খ্যাঁচ করে একটা বিশ্রীরকমের হাসি হেসে বললেন, 'ফ্যান পরিষ্কার করার মেশিনকে এককথায় বলে ফ্যাশিন।'

নন্দবাবুর আক্কেল একেবারে গুড়ুম হয়ে গেল। হরিমাধবের মতো আরও কেউ কেউ মেশিনকে বলে ম্যাশিন। কথার পিঠে কথা জোড়ার জন্য অনেক সময় বলে থাকে ম্যাশিন-ফ্যাশিন। নন্দবাবুর ধারণা ছিল ফ্যাশিন একটা অর্থহীন শব্দ। যেমন আমরা বলে থাকি জলটল, গাছটাছ, বাড়িটাড়ি ইত্যাদি। টল, টাছ, টাড়ি এসবের কোনও অর্থ হয় না। এখন দেখা যাচ্ছে ফ্যাশিন কোনও অর্থহীন শব্দ নয়। ফ্যাশিন হল রীতিমতো একখানা মেশিন।

বেড়ার ওপাশ থেকে সেই ফিচেল হাসি গোঁফের ফাঁকে ঝুলিয়ে চণ্ডী ঘোষ বললেন, 'আপনি বিজ্ঞানের শিক্ষক, অথচ ফ্যাশিন কী, তা জানেন না। ইস্কুলের ছেলেরা আপনার কাছ থেকে কী শিখবে বলতে পারেন? তাদের বিদ্যেবুদ্ধিতে কি নিত্যদিন চোনা পড়ছে না? এ থেকে কি প্রমাণ হয় না যে, আপনার মতো রাঘব-বোয়ালরাও ভেজালের কারবারি? এতে কি দেশ উচ্ছন্নে যাচ্ছে না? শুধু হারু-কানাইয়ের উপর দোষারোপ করলে হবে?'

একগাদা প্রশ্নবাণে নন্দবাবুকে বিদ্ধ করে ঘরমুখো হাঁটা দিলেন চণ্ডী ঘোষ।

তিরস্কৃত মানুষের মনে অনেক সময় খুব জেদ চেপে যায়। দুবলা লোক তখন পাথর টিপে জল বের করে। পঙ্গু পাহাড় ডিঙোয়। নন্দবাবুর এখন সেই দশা। মনে মনে শপথ নিলেন, আজ তিনি ফ্যাশিনের আদ্যপ্রান্ত জেনে ছাড়বেন। তার গড়ন, কার্যপ্রণালী ইত্যাদি ঘেঁটে দেখবেন। শুধু তাই নয়, বাজার থেকে একখানা ফ্যাশিন কিনে আনবেন। তারপরে চণ্ডী ঘোষের বাড়ি গিয়ে আচ্ছা করে দু'কথা শুনিয়ে আসবেন। বলবেন, মশায় আপনার অঢেল টাকা থাকতে পারে। একখানার জায়গায় পাঁচখানা ফ্যাশিন আপনি কিনতে পারেন, কিন্তু এর কার্যকারিতা বোঝেন কী? ফ্যাশিনের মেকানিক্সটা বোঝেন? ফ্যাশিনের এফিসিয়েন্সি আঁক কষে বার করতে পারবেন? এইট পাশ বিদ্যে নিয়ে আপনি কি না আমাকে তাচ্ছিল্য করেন? রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মতো ফুঁসতে লাগলেন নন্দবাবু।

ব্যস্তসমস্ত হয়ে পড়ার ঘরে ঢুকে ঘড়াঞ্চিতে উঠে প্রায় ছাত সমান উঁচু বইয়ের আলমারির উপরের তাক থেকে চার-পাঁচখানা বিজ্ঞানের এনসাইক্লোপিডিয়া টেনে বের করলেন নন্দবাবু। ঝপাস করে বইগুলো এনে ফেললেন পড়ার টেবিলের উপরে। তারপর একখানা আতশকাঁচ বাগিয়ে ধরে এনসাইক্লোপিডিয়ার পাতা উলটে উলটে ফ্যাশিন খোঁজায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু অচিরেই ছেদ পড়ল তাঁর সাধনায়।

ঝুপ করে বাজারের থলে এনসাইক্লোপিডিয়ার পাতার উপরে ফেলে গিন্নি বললেন, 'বলি আজ বাজারটাজার যাবে না, না কি?'

'ও হ্যাঁ বাজার!' বেজার মুখ করে কথাটা বলে ফের এনসাইক্লোপিডিয়ার পাতায় ডুব দিলেন নন্দবাবু।

'মরণদশা আমার! সাতসকালে উপুড় হয়ে খুঁজছ কী শুনি?' গিন্নি ঝনঝনিয়ে উঠলেন।

বইয়ের পাতায় চোখ রেখেই ফ্যাসফ্যাসে গলায় নন্দবাবু বললেন, 'ফ্যাশিন।'

গিন্নি শুনলেন ফ্যাশান। রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে তিনি বললেন, 'ভীমরতি ধরল নাকি? তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। এই বয়সে ফ্যাশানের শখ?'

'ফ্যাশান নয় গো ফ্যাশিন।'

চোখ পাকিয়ে গিন্নি শুধোলেন, 'সে আবার কী?'

'ফ্যাশিন হল গিয়ে ফ্যান পরিষ্কার করার মেশিন। আচ্ছা অমন একখানা মেশিন কি আমাদের বাড়িতে আছে? হরিমাধব বলছিল।'

কোমরে আঁচল জড়িয়ে রণংদেহী মেজাজে গিন্নি বললেন, 'দ্যাখো কথা ঘোরাবার চেষ্টা কোরো না।'

'ধুত্তেরি।'

বিরক্ত হয়ে বই বন্ধ করে থলে হাতে বাজারের পথে বেরিয়ে পড়লেন নন্দবাবু।

বাজারের পথে হাঁটতে হাঁটতে নানান কথা নন্দবাবুর মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল। কত রকমের মেশিনই না বিজ্ঞানীরা মাথা খাটিয়ে বের করেছে। জামাকাপড় কাচার মেশিন, থালাবাসন ধোয়ার মেশিন, উলবোনার মেশিন, জল ঠান্ডা করার মেশিন, জল গরম করার মেশিন, ধান ঝাড়ার মেশিন, রুটি বানানোর মেশিন, আরও কত কী? ফ্যান পরিষ্কার করার মেশিন—সে থাকতেই পারে। জ্ঞানীগুণী মানুষেরা মনের জানলা-দরজা সব হাট করে খুলে রাখতে বলে গিয়েছেন। তিনি কী জানলা, দরজায় আগল তুলে নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন? আত্মতুষ্টি কি তাঁর পদস্খলন ঘটালো? ছি ছি ছি! মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলেন নন্দবাবু।

এই অজ্ঞতা নিয়ে তিনি কিনা মহকুমাশাসকের হাত থেকে পুরস্কার নিয়েছেন? সেই অনুষ্ঠানে একগাদা লোকের সামনে বিজ্ঞাননিধি পুরস্কারের মেডেলটা চাঁদমালার মতো গলায় ঝুলিয়ে লম্বা চওড়া বক্তৃতা দিয়েছেন! এ যে মানুষের সঙ্গে একরকমের তঞ্চকতা। ভেজালের কারবার। ভারি অন্যায়!

সত্যিই তিনি বিজ্ঞাননিধি মেডেলের যোগ্য নন। নন্দবাবু ঠিক করলেন, কালই তিনি ওই মেডেল পদত্যাগ করবেন। ঠিক তখনই তিনি খন্দে পা পড়ায় হোঁচট খেয়ে ধাতে এলেন। ফ্যাশিনের চাপে ভাষাজ্ঞানও তারি ঘুলিয়ে যাচ্ছে। মেডেল পদত্যাগ করা যায় না, ত্যাগ করা যায়।

হঠাৎই নন্দবাবুর চোখে পড়ল দোকানটা। বাজারে ঢোকার মুখে কয়েকমাস হল সদ্য খুলেছে। সাজানোগোছানো ঝকঝকে দোকান। ফ্রিজ, টিভি, ওয়াশিং মেশিনসহ হরেকরকমের মেশিনপত্র পাওয়া যায় ওই দোকানে। নিশ্চয়ই একখানা ফ্যাশিনও পাওয়া যাবে। এই মনে করে দোকানের মধ্যে পা রাখতেই নন্দবাবুকে দেখে হাসিমুখে এগিয়ে এল সেলসম্যান।

'চিনতে পারছেন স্যার?'

'না তোমাকে তো ঠিক...'

'আমি পাঁচুগোপাল। এককালে আপনার ছাত্র ছিলাম।' এই বলে পাঁচুগোপাল টিপ করে নন্দবাবুকে একটা পেন্নাম ঠুকে দিল।

পাঁচুর মাথায় হাত রেখে নন্দবাবু বললেন, 'আহা বাবা, থাক থাক।'

পাঁচু বলল, 'আপনার বিজ্ঞান পড়ানো কিন্তু এখনও মনে আছে স্যার! এই দোকানে চাকরি নেওয়ার সময় মেশিনের বিষয়ে অনেক বেয়াড়া প্রশ্ন করেছিল। আপনার ক্লাস যে করেছে, সেসব প্রশ্ন করে তাকে ঠকায় কার সাধ্য? সব পটাপট উত্তর দিয়ে দিলাম। চাকরিটা সহজেই হয়ে গেল।'

নন্দবাবুর মনে হল, স্থানকাল ভুলে তিনি ডুকরে কেঁদে ওঠেন। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বলেন, ভুল লোকের কাছে বিজ্ঞান শিখেছ পাঁচু। আমার বিজ্ঞান সাধনায় ভেজাল আছে। ফ্যাশিন কী আমি জানি না। তবে আবেগটাকে শেষ মুহূর্তে দমন করে নিলেন তিনি।

পাঁচু শুধোল, 'কী কিনবেন স্যার? ভালো অফার চলছে। মোটা ডিসকাউন্ট পাবেন।'

'তা বাপু একখানা ফ্যাশিন দাও তো দেখি।'

'ফ্যাশিন?' পাঁচু অবাক হয়ে শুধোয়।

নন্দবাবু একটু বিরক্তির সঙ্গেই বললেন, 'একেবারে আকাশ থেকে পড়লে যে। তোমরা দোকানে ফ্যাশিন রাখো না?'

ছানাবড়া চোখ করে পাঁচু শুধোল, 'ফ্যাশিন কী স্যার?'

নন্দবাবুর মনে হল, কেউ যেন তাঁকে হামানদিস্তায় থেঁতো করে দিল। ভেজাল ভেজাল। তস্য ভেজাল। নিজের মান রাখতে গিয়ে ছাত্রের সঙ্গেও তঞ্চকতা করতে হচ্ছে। কী করে তিনি বলেন যে, 'ওহে বাপু ফ্যাশিন কী? আমিও জানি না।'

নন্দবাবু গম্ভীর মুখ করে বললেন, 'ফ্যাশিন জানো না? আরে ওই যে ফ্যান পরিষ্কার করার মেশিন!'

'ফ্যান পরিষ্কার করার মেশিন! নতুন বেরিয়েছে বুঝি?' মাথা চুলকে পাঁচু বলে, 'কাল একবার আসুন স্যার। শহর থেকে আনিয়ে রাখব।'

হতাশ হয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এসে বাজার অভিমুখে হাঁটতে লাগলেন নন্দবাবু। কিন্তু কিছুদূর এগিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল তাঁকে। কথায় বলে যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধে হয়।

নন্দবাবু দেখলেন, পথের মাঝে দাঁড়িয়ে তাদের ইস্কুলের প্রেসিডেন্ট নিত্যগোপালবাবুর সঙ্গে কথা বলছেন চণ্ডী ঘোষ। চণ্ডীবাবুর গোঁফের ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে সেই বিশ্রি ফিচেল হাসি। নন্দবাবুর বুঝতে কোনও অসুবিধা হল না যে আলোচনার বিষয়বস্তু তিনি। এখন এদের মুখোমুখি না হওয়াই ভালো এই মনে করে একগাদা আলুর বস্তার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ফেললেন নন্দবাবু। চণ্ডী ঘোষ ও নিত্যগোপালবাবুর কথাবার্তা তাঁর কানে ভেসে আসতে লাগল।

চণ্ডী ঘোষ বললেন, 'নিত্যবাবু, কেলেঙ্কারির কথাটা শুনেছেন তো?'

'কেলেঙ্কারি তো বটেই। সব জিনিসেরই আগুন দাম। কোনও কিছুতে হাত দিতে গেলেই ছ্যাঁকা মারছে। তার উপরে সব জিনিসেই আবার ভেজাল।'

চণ্ডী ঘোষ এক গাল হেসে বললেন, 'এই তো মোক্ষম ধরেছেন।'

নিত্যগোপালবাবু খুশি হয়ে বললেন, 'এ সব নিয়ে একখানা আর্টিকেল লিখে ভাবছি চারিদিকে একেবারে আগুন ধরিয়ে দেব।'

'সে না হয় দিলেন, কিন্তু তার আগে নিজের ঘরের আগুনটা সামলান।'

নিত্যবাবু ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, 'অ্যাঁ নিজের ঘরে আগুন মানে?'

'না না, আগুন আপনার ভদ্রাসনে নয়, ইস্কুলে।'

নিত্যগোপালবাবুর স্কুল অন্ত প্রাণ। তিনি আঁতকে উঠে বললেন, 'অ্যাঁ? ইস্কুলে আগুন? তাহলে যে অবিলম্বে দমকলে খবর দিতে হয়!'

লম্বা ভনিতা করতে গিয়ে প্রসঙ্গটাই ঘুলিয়ে যাচ্ছে দেখে ব্যস্ত হয়ে চণ্ডী ঘোষ বলে উঠলেন, 'আরে না না, এসব দমকলের বিষয় নয়, কথাটি হচ্ছে লেখাপড়ার জগতে ভেজালের কারবার নিয়ে। আপনার ইস্কুলের ছেলেরা কী শিখছে মশায়?'

নিত্যগোপালবাবু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে হাঁ হয়ে গেলেন।

চণ্ডী ঘোষ বললেন, 'আপনাদের ইস্কুলের বিজ্ঞাননিধি নন্দবাবু, মানে নন্দ সরকার, ফ্যাশিন কী, তা জানেন না। এমন লোকের কাছে বিজ্ঞান শিখলে ছেলেদের শিক্ষায় যে চোনা পড়বে না, সেটা কি আপনি হলফ করে বলতে পারেন?'

নিত্যগোপালবাবু একেবারে বোমকে গেলেন। 'অ্যাঁ? ফ্যাশিন? সে আবার কী মশায়?'

'ফ্যাশিন হল গিয়ে ফ্যান পরিষ্কার করার মেশিন।'

নিত্যবাবু বললেন, 'অমন কোনও মেশিন আছে বলে তো শুনিনি।'

'কেন থাকবে না? আলবাত আছে। ভববাবুর বাড়ির চাকর হরিমাধবকে ডেকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখুন না?'

'বলছেন কী মশায়? হরিমাধব যা জানে, তা বিজ্ঞাননিধি নন্দবাবু জানেন না?'

খুব বেশি দুশ্চিন্তায় ভুগলে অনেক সময় মানুষের কাণ্ডজ্ঞান, আক্কেলজ্ঞান, বাহ্যজ্ঞান সবই লোপ পায়। মানুষ তখন নানারকম তালগোল পাকিয়ে বসে। নন্দবাবুর ক্ষেত্রেও তাই হল। চণ্ডী ঘোষ ও নিত্যগোপালবাবুর কথোপকথন তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন ঠিকই, তবে বাজারের কোলাহলের সঙ্গে মিশে গিয়ে কথাগুলো কেমন যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। মাথাটা বাড়িয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কথাগুলো শুনতে গিয়ে তাঁর নিজের মুন্ডুখানা যে কখন আলুর ঝুড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে বেআব্রু হয়ে পড়েছে, নন্দবাবুর সে খেয়াল নেই। ব্যস! তিনি নিত্যগোপালবাবুর নজরে পড়ে গেলেন।

হাঁটু ভাজ করে দুহাত দিয়ে মাটিতে ভর রেখে অনেকটা হামা দেওয়ার ভঙ্গিতে বসে থাকা নন্দবাবুকে দেখে চরম বিস্মিত হয়ে নিত্যগোপালবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ও নন্দবাবু, ও মশায় খামাখা ওভাবে হামাগুড়ি দিচ্ছেন কেন?'

ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে লাফিয়ে উঠে একে-ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে নন্দবাবু ছুটতে শুরু করলেন।

চণ্ডী ঘোষ বলে উঠলেন, 'বুঝলেন তো, ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। নইলে কেউ কখনও ওভাবে পালায়?'

নিত্যগোপালবাবু চিন্তিত গলায় বললেন, 'না বিষয়টা মোটেই হালকা বলে বোধ হচ্ছে না। আসুন তো দেখি।'

নন্দবাবুর পিছু পিছু ছুটতে লাগলেন নিত্যগোপালবাবু ও চণ্ডী ঘোষ।

তিনটি লোককে ওভাবে ছুটতে দেখে বাজারের বাকি লোকেরাও গুরুতর কিছু ঘটেছে অনুমান করে করে তাদের পিছন পিছন ছুটতে শুরু করল। গাদা খানেক লোক তাঁর পিছনে ছুটে আসছে দেখে নন্দবাবু ছোটার বেগ আরও বাড়িয়ে দিলেন। সে এক হুলুস্থুল কাণ্ড!

একেই বোধ হয় বলে তিল থেকে তাল হওয়া।

ছুটতে ছুটতে নন্দবাবু প্রায় বেদম হয়ে পড়ে সামনে একটা বাড়ির খিড়কির দরজা গলে সুড়ুৎ করে অন্দরে ঢুকে পড়লেন। পরে বুঝলেন তিনি ভববাবুর বাড়িতে এসে পড়েছেন।

গন্ধ সাবান মেখে সাফসুতরো হয়ে নীচে নেমে হরিমাধবের উপরে তম্বি করছিলেন ভববাবু। বিদ্যুৎগতিতে ছুটে এসে ভববাবুকে মাটিতে ধাক্কা মেরে

মাটিতে ফেলে দিয়ে নিজেও হুমড়ি খেয়ে পড়ে হ্যা হ্যা করে হাঁপাতে লাগলেন নন্দবাবু।

প্রাথমিক ধাক্কা সামলে উঠে দাঁড়িয়ে নন্দবাবুকে দেখে ভারি অবাক হয়ে ভববাবু বলে উঠলেন, 'আরে নন্দ, কী ব্যাপার? কোত্থেকে এমন উল্কার মতো ছুটে এলে?'

হাঁপাতে হাঁপাতে কোনওরকমে নন্দবাবু বললেন, 'ফ্যাসাদে পড়েছি ভাই। ফ্যাশিন!'

চোখ ছানাবড়া করে ভববাবু শুধোলেন, 'ফ্যাশিন? সে আবার কী?'

'ও তো তোমার জানার কথা। তুমিই তো ভাই ওই মেশিনটা আনার জন্য হরিকে আমার বাড়িতে পাঠিয়েছিলে।'

ভববাবু হাঁ হয়ে গেলেন। ফ্যাশিন, মেশিন—এসবের ধড়মুড়ো কিছু বুঝতে পারছেন না।

নন্দবাবুর খোঁজে বেশ কিছু লোকজনসহ নিত্যগোপালবাবু ও চণ্ডী ঘোষ এই সময় শোরগোল তুলে ভববাবুর বাড়িতে ঢুকে পড়লেন। ছুটোছুটির ধকলে তারাও সবাই তখন বেজায় হাঁপাচ্ছেন।

তাজ্জব হয়ে ভববাবু শুধোলেন, 'কী ব্যাপার বলুন তো মশাই? সকলে মিলে এমন হুটোপুটি বাঁধিয়েছেন কেন?'

নন্দবাবুর দিকে আঙুল তুলে চণ্ডী ঘোষ বললেন, 'গোল পাকিয়েছেন তো উনি। নিজেও ছুটেছেন। এত লোককে ছুটিয়ে মেরেছেন।'

ঘটনাবলীর কোনও আন্দাজ পাচ্ছেন না ভববাবু। নন্দবাবুর উদ্দেশ্যে ফের শুধোলেন, 'ব্যাপার কী হে নন্দ?'

নন্দবাবু কথার জবাব না দিয়ে মাথা হেঁট করে বসে হাঁটুতে হাত বুলোতে লাগলেন। মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে তার হাঁটুর নুনছাল উঠে গিয়েছে।

চণ্ডী ঘোষ বললেন, 'বিষয়টা আপনার চাকর হরিমাধবকে জিগ্যেস করুন না?'

ক্রুদ্ধ বাঘের মতো চোখ পাকিয়ে হরিমাধবের মুখপানে চেয়ে ভববাবু বললেন, 'কী ব্যাপার রে হরি? কোথায় কী গোল পাকিয়ে এসেছিস তুই?'

'আজ্ঞে আমি তো কিছুই গোলমাল করিনি কর্তা। আপনার কথামতো সকালে মাস্টারবাবুর বাড়ি থেকে ফ্যান পরিষ্কার করার ম্যাশিনটা আনতে গিয়েছিলাম। উনি তো ম্যাশিনখানার কথা মনেই করতে পারলেন না। আবার বললেন কিনা অমন ম্যাশিনের কথা কস্মিনকালেও তিনি শোনেননি!'

চণ্ডী ঘোষ তুড়ি বাজিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ! গোলমাল তো এখানেই। সামান্য একটা ফ্যান পরিষ্কার করার মেশিনের কথা হরিমাধব জানে, অথচ নন্দবাবু জানেন না। ওদিকে নন্দবাবু হলেন বিজ্ঞাননিধি। এই যদি তাঁর জ্ঞানের বহর হয়, তবে তাঁর কাছ থেকে ইস্কুলের ছেলেরা কী বিজ্ঞান শিখবে?

নন্দবাবু নিশ্চুপ। তার মনে হচ্ছে হাটের মাঝে এমন অপমানিত হওয়ার চেয়ে বুকে শেল বেঁধাই শ্রেয় ছিল।

চণ্ডী ঘোষের কথা শুনে উপস্থিত অনেকেই মুখ চাওয়াচাওয়ি করে বলল—'ফ্যান পরিষ্কার করার মেশিন? এমন কোনও মেশিন আছে বলে তো শুনিনি কখনও।'

ভববাবু বললেন, 'আমিও শুনিনি।'

চণ্ডী ঘোষ ঠেস দিয়ে বললেন, 'তেলা মাথায় তেল দেওয়ার চেষ্টা করবেন না ভববাবু। আপনিই তো মেশিনটা নন্দবাবুর বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার চাকরকে পাঠিয়েছিলেন।'

ভববাবু বিরক্তির সঙ্গে বললেন, 'আমি উদ্ভট রসের পদ্য লিখি ঠিকই। তবে এমন উদ্ভট কথা বলতেই পারি না। আমি বলেছিলাম নন্দবাবুর বাড়ি থেকে ঘড়াঞ্চিটা নিয়ে আসতে। নির্ঘাত বাচাল হরিমাধব আলপটকা কোনও কথা বলে গোল পাকিয়েছে।'

সব গোলমালের দায় তার ঘাড়ে এসে পড়ছে দেখে কাঁচুমাচু মুখ করে হরিমাধব বলল, 'আমি তো ওই ঘড়াঞ্চিখানাই মাস্টারবাবুর বাড়ি থেকে আনতে গিয়েছিলাম।'

চণ্ডী ঘোষ অবাক হয়ে বললেন, 'ঘড়াঞ্চি?'

'আজ্ঞে ওটাই তো ফ্যান পরিষ্কার করার ম্যাশিন।' মুচকি হেসে বলল হরিমাধব।

নন্দবাবু উঠে দাঁড়িয়ে গর্জন করে হরিমাধবের উদ্দেশে বললেন, 'ঘড়াঞ্চি কী করে মেশিন হয় রে হতভাগা?'

থতমত খেয়ে হরিমাধব বলল, 'মাস্টারবাবু আপনিই তো বলেছিলেন, যে বস্তু কোনও কাজকে সহজ করে তাকে মেশিন বলে। ঝুলঝাড়া হাতে ডিঙি মেরে মেরে সিলিং ফ্যান পরিষ্কার করা বড় ঝকমারির ব্যাপার। তার চেয়ে ঘড়াঞ্চির উপরে উঠে দাঁড়ালেই পাখাখানা নাগালের মধ্যে চলে আসে। তারপর একখানা ন্যাকড়া দিয়ে জুত করে মুছে দিলেই হল। কাজটা সহজ হল কিনা। তাহলে ঘড়াঞ্চিকে কেন ফ্যান পরিষ্কার করার মেশিন বলা যাবে না?'

নন্দবাবু এবারে প্রাণ খুলে অট্টহাস্য করে উঠে বললেন, 'ওরে গর্দভ! মেশিনের কার্যকারিতার পিছনে একটা শক্তি লাগে। বৈদ্যুতিক, রাসায়নিক, তাপ বা যান্ত্রিক। সেই শক্তির রূপান্তরই মেশিনের কার্যকারিতার কারণ। এখানে শক্তির উৎস কোথায় রে? ঘড়াঞ্চি যদি মেশিন হয় তো তেলাপোকাও পাখি।'

হরিমাধব জিভ কেটে বলল, 'বড্ড ভুল হয়ে গেছে মাস্টারবাবু। এই কথাগুলো ভুলে গিয়েছিলাম।'

'ওঃ কী বিভ্রাট! একেবারে তিল থেকে তাল!' এই বলে নন্দবাবু ফের উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন।

নিত্যগোপালবাবু, ভববাবুসহ আরও অনেকে সেই হাসিতে যোগ দিল। বোকার মতো হাসতে লাগল হরিমাধবও।

শুধু চণ্ডী ঘোষ বিমর্ষ হয়ে মাথা চুলকাতে লাগলেন।

এবারে পাঞ্জাবির হাতা গুটিয়ে বুক চিতিয়ে বাঘের মতো চণ্ডী ঘোষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নন্দবাবু বললেন, 'কী মশায়? বুঝলেন তো তাহলে ব্যাপারটা? ফ্যান পরিষ্কার করার মেশিনকে বলে কিনা ফ্যাশিন! ও জিনিস আপনার বাড়িতে তো দু-দুখানা আছে তাই না?'

নন্দবাবুর গলার আওয়াজে চণ্ডী ঘোষ যেন বাঘের গর্জন শুনতে পেলেন। নন্দবাবুর দশাসই চেহারা। চণ্ডী ঘোষ খাটো চেহারার রোগাপাতলা মানুষ। তাঁকে শূন্যে তুলে মাটিতে আছড়ে ফেলা নন্দবাবুর পক্ষে কোনও কঠিন কাজ নয়। চণ্ডী ঘোষ ভয় পেয়ে পিছোতে লাগলেন।

'গুল মেরে আমাকে হয়রান করা?' নন্দবাবু ফের গর্জন করে উঠলেন।

নন্দবাবুর মারমুখী মেজাজ দেখে সকলেই তখন ত্রস্ত। চণ্ডী ঘোষের গলা শুকিয়ে কাঠ। শুকনো গলায় চোখ গোল্লা করে তিনি বললেন, সাবধান মশায়। ফৌজদারি কেস হয়ে যাবে কিন্তু!

এমন সময় ভববাবুর বাড়ির ভিতর থেকে শোনা গেল রান্নার ঠাকুর নিধিরামের ভয়ার্ত আর্তনাদ। 'এইব্বাপ! খুন হয়ে গেলাম গো। বাঁচাও! বাঁচাও!'

এই চিৎকার চেঁচামেচি শুনে সকলেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তড়িৎগতিতে হরিমাধব ছুটল রান্নাঘরের দিকে। আর ঠিক তখনই বাড়ির ভিতর থেকে মিসাইলের মতো ছুটে এল গোটা দুয়েক ছুরি। তার একখানা চণ্ডী ঘোষের নাকের ডগা দিয়ে উড়ে গিয়ে পেঁপে গাছে বিঁধল। আরেকখানা ভববাবুর টাক ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। ভববাবু ঝাঁপ খেয়ে মাটির উপরে পড়ে নিজেকে বাঁচালেন।

'ছুরি! ছুরি! উড়ন্ত ছুরি! উরিব্বাপ রে!' এই বলে নিমেষের মধ্যে ভববাবুর বাড়ির দরজা গলে চণ্ডী ঘোষ হাওয়া হয়ে গেলেন। নিত্যগোপালবাবুসহ বাকি লোকজনও ছুটে পালাল।

নন্দবাবু ছুরি ওড়াওড়ির পিছনে বৈজ্ঞানিক কারণটা কী, সেটা ভাবতে ভাবতে মাথা চুলকোতে লাগলেন। ভববাবু স্তম্ভিত।

খানিক বাদে দাঁত বের করে হাসতে হাসতে হরিমাধব ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। হাতে তার সেই সবজি-কর্তন মেশিন। কিন্তু চাকার গায়ে একখানা ছুরিও নেই।

হরিমাধব বলল, 'চাকার গায়ে ছুরিগুলো ঠিকমতো লাগানো হয়নি বোধ হয়। আমি তো আর পরখ করে দেখার সময় পাইনি। গিন্নিমার হুকুমে রামনিধি মেশিনটা চালাতেই ছুরিগুলো চারিদিকে সব ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছে।'

নন্দবাবু হেসে বললেন, 'ঠিক আন্দাজ করেছি। সেন্ট্রিফিউগাল ফো-ও-র্স!' অলংকরণ: ঊর্মি
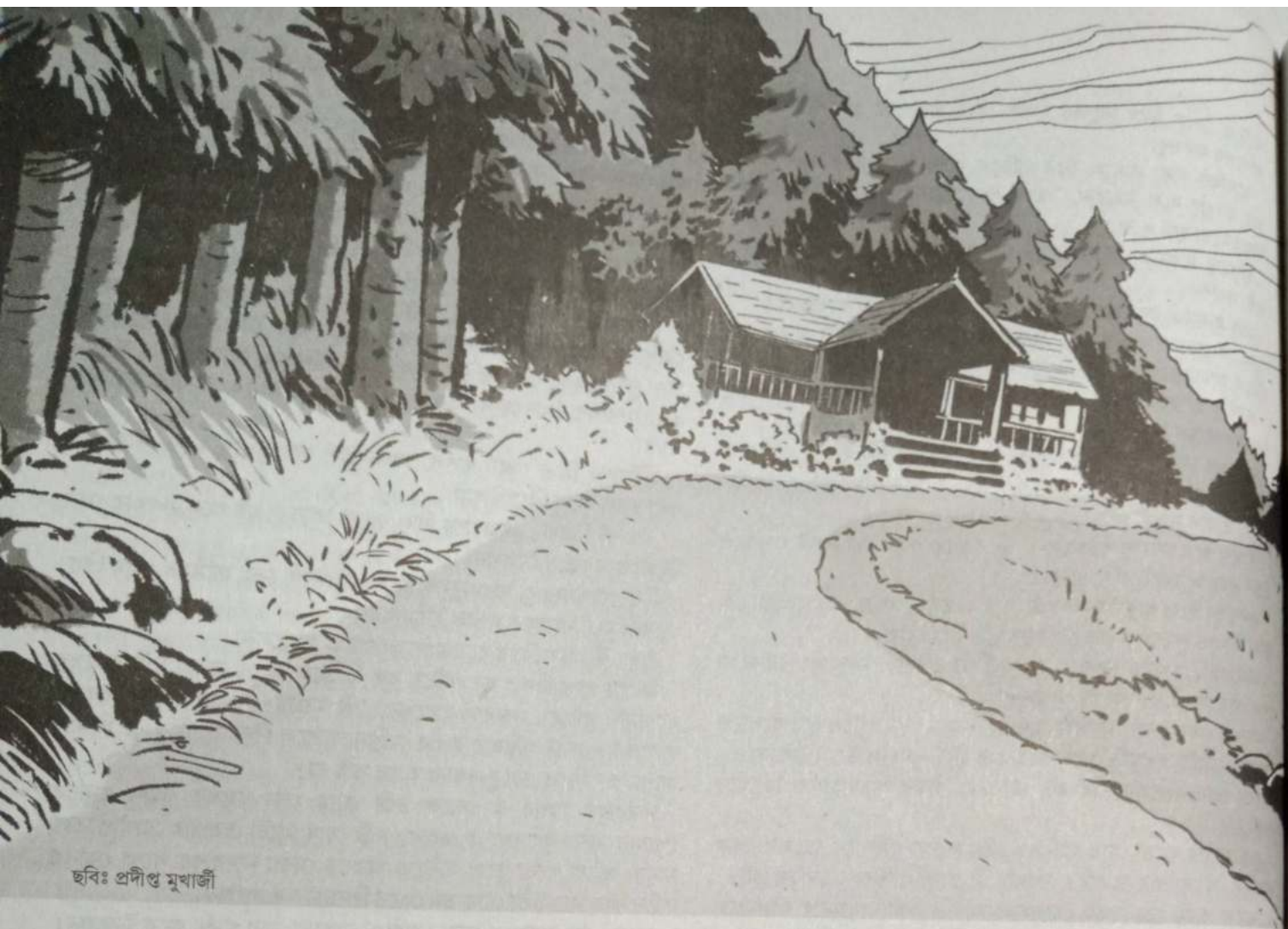
ছবিঃ প্রদীপ্ত মুখার্জী

রম্যাণী গোস্বামী

রতনবাবু আর সেই ভূতটা

প্রায় বছর পঞ্চাশেক আগেকার কথা। আমাদের রতনবাবু অর্থাৎ রতন মুখুটি, বয়স তাঁর তখন চল্লিশের কোঠায়। গালে কাঁচাপাকা দাঁড়ি। বিয়ে থা করেননি। অমিশুকে প্রকৃতির মানুষ। ভারতীয় পোস্টে চাকরি করছেন তা প্রায় বছর পনেরো হবে। নির্ঝঞ্ঝাট কাজ। কিন্তু হঠাৎ উপরওলার কী মর্জি হল, পৃথিবীতে এত জায়গা থাকতে তিনি এই নির্জন পাহাড়ি গ্রামের পোস্ট অফিসে পোস্ট মাস্টারের পদে বদলি হয়ে চলে এলেন।

ফুগুরি জায়গাটার নাম এর আগে কখনও শোনেননি রতনবাবু। ফারাক্কা সেতু তখন সবে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয়েছে। আজিমগঞ্জ, কাটোয়া লুপ, মালদা হয়ে দার্জিলিং মেলে চেপে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন। তারপর বাকি পথ অফিসের গাড়িতে চড়ে এসে এখানে পৌঁছেছেন। কালিম্পং ছাড়িয়ে ছোট্ট জনপদ ফুগুরি। দূরে দূরে যেদিকে তাকানো যায় ঘন নীল আকাশের তলায় পাহাড়ের উঁচু-নীচু ঢালে সবুজ চা বাগানের কার্পেট। পাইন বনের মধ্য দিয়ে সরু রাস্তা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে এসে ঠেকেছে পোস্ট অফিসের গায়ে। স্টাফেরা সকলেই স্থানীয় লোক।

অফিসঘরের পাশেই এক চিলতে জায়গায় রতনবাবুর থাকার ব্যবস্থা। ফাইফরমায়েশ খাটা আর রান্নাবান্না করে দেওয়ার জন্য কাছের ব[illegible] একটা বছর বারো তেরোর ছেলে ঠিক হয়েছে। তার নাম রোশন [illegible] স্কুল শেষে বেলাবেলি আসবে। তবে প্রথম সাক্ষাতেই রোশন [illegible] জানিয়ে দিয়েছে যে সন্ধে ছ'টার পর একটা মিনিটও ও এখানে থাক[illegible] পারবে না। কারণ এই পোস্ট অফিসে নাকি ভূত আছে।

ভূত! শব্দটা শুনেই চমকে উঠেছিলেন রতনবাবু। বলে কী ছেল[illegible] গাঁজাটাজা খায় নাকি? নাহ্‌, ছেলেটার দিব্যি ঝকঝকে নীল চোখ। [illegible] বুদ্ধির ঝিলিক খেলা করছে।

সারাদিনের কাজের ফাঁকে ফাঁকে বাকিদের কাছ থেকেও অ[illegible] শুনলেন ব্যাপারটা। রাত ঘনালে পুরোপুরি নিস্তব্ধ হয়ে যায় চার[illegible] এখানে রাত ন'টা গভীর রাত। তখনই সমতল থেকে মেঘ পা[illegible] পাকিয়ে উঠে আসে পাহাড়ের গায়ের ওই পাইনবনের মাথায়। তার[illegible] ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে গপ করে গিলে নেয় পোস্ট অফিসের [illegible] বাড়িটাকে। সেই সময় অফিসঘর থেকে নাকি অবিরাম শোনা যায় কা[illegible] টেবিলের উপরে রাবার স্ট্যাম্প মারার একরকমের ভোঁতা আওয়াজ[illegible] হল নিত্যদিনের ঘটনা। রাতের দিকে পোস্ট অফিসের পাশ দিয়ে যাও[illegible]

করতে গিয়ে শব্দটা অনেকেই শুনেছে। আবার চাঁদনি রাতের ফটফটে আলোয় কেউ কেউ নাকি এক দীর্ঘ আবছায়া মূর্তিকে বসে থাকতে দেখেছে অফিসঘরে।

কলিগদের কাছ থেকে সেই ভোঁতা শব্দের ইতিহাসটাও শোনা হল রতনবাবুর।

বছর পাঁচেক আগে একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সাহেব ঝগুরিতে পোস্টমাস্টার পদে বহাল ছিলেন। হ্যামলেট সাহেব নামেই চিনত সকলে তাঁকে। তখন জায়গাটা ছিল আরও নির্জন। সপ্তাহে একটাই গাড়ি আসত আনাজ নিয়ে। ডাক নিয়েও আসত সেই গাড়ি। ওদিনই যা একটু শোরগোল। বাদবাকি দিনগুলোয় পাইনবনের মধ্যে দিয়ে হু হু বয়ে যাওয়া বাতাসের একটানা তীক্ষ্ণ শিসের ওঠানামার শব্দ শুনতে শুনতে কেটে যেত অনন্ত সময়।

সাহেবের কোনও ছেলেপুলে ছিল না। শুধু তাঁর জাঁদরেল মোটাসোটা বউ। সেই মেমসাহেব নাকি বিস্তর অভিযোগ করত সাহেবকে। সে কারণে সাহেব মোটে ঘরে তিষ্ঠোতে পারত না। ছুটির পরেও সন্ধে সাতটা নাগাদ ডিনার সেরে বউয়ের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে লোকটা এসে বসত অফিসঘরে। খটখট শব্দে যান্ত্রিকভাবে স্ট্যাম্প মেরে চলত ফেলে দেওয়া কাগজপত্র আর বাতিল খামের উপরে।

একদিন সাহেব মরল এই অফিসঘরের ভিতরেই। মানুষটার স্ট্রোক হয়েছিল। সামান্য চিকিৎসার সুযোগও মিলল না। যাই হোক কাজকর্ম মিটিয়ে এখানকার পাট চুকিয়ে তাঁর বউ ফিরে যাবে সিকিমে। সেখানেই তাঁদের দেশের বাড়ি। সে কারণে মেমসাহেব চোখ মুছতে মুছতে জিনিসপত্র গোছগাছ করেছে দিনভর। পরদিন সকালে গাড়িও বলা হয়ে গেছে। সব ঠিকঠাক। যত ঝগড়াই করুক, এতদিনের সঙ্গী মরেছে, শোক তো হবেই। বিছানায় শুয়ে আর ঘুম আসে না। জেগে কিছুক্ষণ ছটফট করতে করতে গভীর রাতের দিকে খানিক চোখ লেগে গিয়েছে মেমসাহেবের।

হঠাৎ কী একটা শব্দে তন্দ্রা ছুটে গেল তার। উঠে বসে কান খাড়া করে শুনল। ঢোঁক গিলল। হ্যাঁ, নির্ভুল শুনেছে সে। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকের ভিতরটা। কাঁপা কাঁপা হাতে সে তুলে নিল জলের বোতল। ছিপি খুলে ঢকঢক করে জল খেল। আহ্, গলাটা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। জল খেয়ে মনে খানিক জোর ফিরে এল। মোম জ্বেলে মোমদানিটা নিয়ে নিজের ঘরের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল মেমসাহেব।

সামনেই অফিসঘর। ভূতুড়ে কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে বসে আছে। খালি দরজাটার পাল্লা একটু ফাঁক হয়ে আছে। ভিতর থেকে এখন আরও জোরে জোরে ভেসে আসছে ধাতব স্ট্যাম্প পেটানোর একটানা শব্দ। অতি সাহসী মেমসাহেবেরও বুক শুকিয়ে গেছে। দরদর করে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে কপালের দু'পাশের রগ দিয়ে। তবুও অমোঘ আকর্ষণে সে এক-পা এক-পা করে এগিয়ে যাচ্ছে ওই আধভেজানো দরজার দিকে। তার এক হাতে ধরা মোমদানিটা কাঁপছে। অন্য হাতে বুকের উপরে সে ক্রস আঁকছে আর মুখে বিড়বিড় করে বলছে, ওহ্ লর্ড! ওহ্ লর্ড! সেভ ইওর চাইল্ড।

পরদিন ভোরে মেমসাহেবের মোটাসোটা দেহটা দুমড়ে মুচড়ে পড়ে থাকতে দেখা যায় অফিসঘরের পিছনের খাদের গভীরে। একটা লিকলিকে বেতের বেড়া ছিল খাদটাকে গার্ড করে। সেটার একটা অংশও ছিন্নভিন্ন হয়ে আছে।

এই পর্যন্ত শুনেই রতনবাবু টের পেলেন যে তাঁর খুব শীত করছে। যেমন তেমন শীত নয়। যাকে বলে ভয়ানক শীত। এমনিতেই পাহাড়ি এলাকা শীতপ্রবণ। সুতরাং শরীরে ভালোমতোই গরম জামাকাপড় চাপিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ভিতরের কটস উলের ইনার, তার উপরে সোয়েটার আর পুরু চামড়ার জ্যাকেট ভেদ করে ধারালো নখের মতো শৈত্য যেন ফালা ফালা করে চিরে দিচ্ছে হৃদপিণ্ড। এ কোথায় এসে পড়লেন? হে কপাল!

তাঁর আগের পোস্টিং ছিল মুর্শিদাবাদে। পোস্ট অফিসের পাশেই কচুরীপানায় ঢাকা প্রাচীন এক চৌকো শেপের দিঘি। সেই দিঘি নিয়ে কত গল্পকথা শুনেছেন রতনবাবু স্থানীয় লোকজনের কাছে। সেই জলাশয়ে নাকি এককালে গলায় ইয়া বড় বড় পাথর বেঁধে জ্যান্ত ডুবিয়ে মারা হয়েছে কর দিতে না পারা প্রজাদের। রাতে দিঘিতে কান পাতলে এখনও শোনা যায় দীর্ঘশ্বাস আর কাতর হা-হুতাশ। ওসব শুনেও রতনবাবু এতটুকু ভয় পাননি। ভূত প্রেত অলৌকিক গালগল্পে তাঁর বিশ্বাস নেই। তাহলে আজ এমন ভয় লাগছে কেন?

মনে জোর আনার জন্য রতনবাবু নতুন জায়গায় কাজে মন দেওয়ার চেষ্টা করেন। হাড় কাঁপিয়ে শীত নামল বিকেল পাঁচটা বাজতে না বাজতেই। একে একে অফিসঘর জনশূন্য হয়ে গেল। সবশেষে বেরোলেন রতনবাবু। অফিসঘরের একটাই দরজা। দরজার পাল্লাদুটো এঁটে তিনি ভালো করে তালাচাবি লাগালেন। চাবিটা পকেটে ভরে ফিরলেন নিজের আস্তানায়।

এখন কুয়াশায় ডুবে গিয়েছে চারপাশ। থমথমে নীরবতা। একটু আগেই রোশনের হাতে গড়া রুটি আর কষা মুরগি দিয়ে ডিনার সেরেছেন রতন মুখুটি। ছোকরা রাঁধে ভালো। বেশ চটপটে আর হাসিখুশি ছেলে। ভদ্র, বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা। খালি ভীষণ ভূতের ভয়। রুটিগুলো করে পালাতে পারলে বাঁচে। পড়াশোনার তেমন সুযোগ নেই এখানে, থাকলে অনেক দূর যেত ও। মা বাবা ছোটবেলাতেই মারা গিয়েছে।

শ্বাস ফেললেন রতনবাবু। মুর্শিদাবাদে থাকাকালীন ডিনারের পর রোজ একটা করে রহস্য রোমাঞ্চের বই হাতে নিয়ে বিছানায় যাওয়ার অভ্যেস তাঁর। ব্যাগে করে কয়েকটা বইপত্র সঙ্গে এনেছেন বটে। কিন্তু আজ আর

সেসব বের করতে ইচ্ছে করছে না। একে তো কিছুক্ষণ আগেই পাওয়ার কাট হয়েছে। তার উপরে বলাই বাহুল্য যে জাঁকিয়ে শীত নেমেছে। পাহাড়ের ধারালো শীত। হ্যারিকেনের আলোয় মুখ ধুয়ে এসে মোটা কম্বলে আপাদমস্তক মুড়ে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে বিছানায় আশ্রয় নিলেন তিনি। হ্যারিকেন নিভিয়ে রেখে দিলেন চৌকির এক কোণে। ঘুম ঘুম ভাব আসছে, পরক্ষণেই ছিঁড়ে যাচ্ছে। কান খাড়া করে রেখেছেন রতনবাবু। কোথাও কি কোনও অদ্ভুত শব্দ হল? একটা প্যাঁচা জাতীয় কিছু ডেকে উঠল না ওই দূরের জঙ্গলে? নাকি প্যাঁচা নয়, ময়ূর ডাকছে? ভালুকও নেমে আসে আকছার।

তন্দ্রা এসেই গিয়েছিল। আচমকাই রতনবাবুর অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে একটা বিজাতীয় শব্দ তাঁর কানে ভেসে এল। একটা ভোঁতা ধাতব শব্দ, একটানা বেজে চলেছে—ঠক ঠক ঠক। নাহ্‌। এই শব্দের কথাই সারাদিন ধরে শুনেছেন। এসেছে, হ্যামলেট সাহেবের বিদেহী আত্মা আজও এসেছে!

লাফিয়ে বিছানার উপরে উঠে বসলেন রতনবাবু। চৌকি থেকে কম্বলখানা ছুঁড়ে ফেললেন। বালিশের তলা থেকে বের করলেন সরু পেনসিল টর্চটা। হাপরের মত ওঠানামা করছে তাঁর বুক। এত রাতে টেম্পারেচার সাত আট ডিগ্রিতে নেমেছেই। কিন্তু তাঁর শীত করছে না। টর্চ জ্বেলে রাতপোশাক পরেই পায়ে পায়ে দরজা খুলে তিনি বেরিয়ে এলেন বাইরে। মনের মধ্যে প্রচণ্ড একটা রোখ চেপে গিয়েছে তাঁর। হ্যামলেট সাহেবের আত্মা রহস্য ভেদ করবেন আজই।

অফিসঘরের দরজায় তালা নিজের জায়গাতেই ঝুলছে। চাবি সঙ্গেই এনেছেন। তালা খুলে ভিতরে গিয়ে দাঁড়াতেই ঘরের ভিতরের অন্ধকার যেন এক মুহূর্তের জন্য গিলে নিল। ঠক ঠক করে স্ট্যাম্প মারার শব্দটা এখন আরও জোরালো হয়ে কানে বাজছে। দুরুদুরু বুকে কয়েক পা এগিয়ে গেলেন রতনবাবু। পোস্ট মাস্টারের টেবিলটা ঘরের কোন দিকটায় যেন? ডান দিকের দেওয়াল বরাবর না? সত্যিই কি তিনি এখন সেখানে বসে থাকতে দেখবেন হ্যামলেট সাহেবকে?

কিন্তু না। এগোতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়লেন রতনবাবু। ডানদিক নয়, শব্দটা আসছে তাঁর বাঁ দিকের কোনও একটা জায়গা থেকে। তেমন উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই। পুরনো ফাইলপত্রে বোঝাই একটা দেরাজ দেওয়া ওক কাঠের বক্স আলমারি। ধুলো পড়ে বেহাল অবস্থা। জায়গায় জায়গায় ভেঙ্গেচুরে খোঁদল তৈরি হয়েছে আলমারির গায়ে। ঝুলছে পাল্লাগুলো। তবুও আছে। সরকারি জিনিস বলে ফেলে দেওয়া হয়নি। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন রতনবাবু। একটা খোপের ভিতর থেকেই তো আসছে শব্দটা। যত সাহস অবশিষ্ট আছে তাদের একত্রিত করে নিলেন তিনি। তারপরই হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেললেন। অমনি ভিতর থেকে প্রচণ্ড ঝটাপটির আওয়াজ তুলে ছিটকে বেরিয়ে এল এক বড়সড় লম্বা বাঁকানো চকচকে নীল ঠোঁটের কালোর উপরে সাদা ছিটছিট মোটাসোটা পাখি। পিলে চমকে দেওয়া ডাক ছাড়তে ছাড়তে হুস করে উড়ে পালাল।

রতনবাবু প্রথমটা এক-পা পিছিয়ে গিয়েছিলেন। এবার গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে এসে দেখলেন যে দেরাজের ভিতরটা কাঠকুটো ও শুকনো ঘাসপাতার পুরু গদিতে ভর্তি হয়ে আছে। ওহ্‌, তাহলে এই হল গিয়ে সাহেবের ভূত! শাবাশ! তিনিই এতদিন পরে পেরেছেন ভূত রহস্যের সমাধান করতে। এই মক্কেলরাই তবে বছরের পর বছর এসে জুটে বাসা বাঁধে এখানে। বজ্জাত পাখি! রাতের বেলায় নিজের খেয়ালেই কাঠের কবজায় ঠোঁটের আঘাতে ঠক ঠক শব্দ তুলত যা নির্জনতার কারণে হয়ে উঠত দ্বিগুণ অথবা তিনগুণ জোরালো। আর সেটা শুনেই লোকজন উলটো পাল্টা ভেবে ভয় খেয়ে অস্থির। কী কাণ্ড! উফ্‌, একটু হলে তিনি নিজেও হার্ট ফেইল করে সাধের প্রাণটা খোয়াচ্ছিলেন। কপালের ঘাম মুছতে গিয়ে রতনবাবু টর্চ সমেত ডান হাতটা উপরে তুললেন আর টর্চটাও তেরছা হয়ে আলো ফেলল লম্বা দেরাজের ছাদে। আরে! ওটা কী? পলিথিনের মোড়কে ভরা একটা খাম না?

টর্চের সঙ্গে নিজের মাথাটাও দেরাজের ভিতরে গলিয়ে দিলেন রতনবাবু। পুরু পলিথিনের মোড়কের চারটে কোণা দেরাজের ছাদের সঙ্গে শক্ত করে আটকে রাখা হয়েছে পেরেক দিয়ে। সেলোটেপ দিয়ে আটকানো মুখটা ছিঁড়তেই একটা লম্বাটে সাদা খাম বেরিয়ে এল। খামের মুখ আঠা দিয়ে জোড়া।

প্রবল কৌতূহল রতনবাবুকে এক মুহূর্ত স্থির থাকতে দিচ্ছিল না। বগলে টর্চ চেপে ধরে দু'হাতের টানে ছিঁড়ে ফেললেন। ভিতর থেকে একতাড়া কাগজ বেরিয়ে এল। এক ঝলক দেখলেই বোঝা যায় সবই জরুরি আইনি ডকুমেন্টস। উইল টুইল জাতীয় কীসব। রয়েছে হ্যামলেট সাহেবের হস্তাক্ষর এবং পরিষ্কার হাতের লেখায় একটা চিঠি। সেটা পড়তে পড়তে কপালে আবারও ঘাম জমল রতনবাবুর। সাহেবের লুকিয়ে রাখা কোনও এক অগাধ বিষয় সম্পত্তির কথা লেখা আছে। সঙ্গে আছে একটি ছেলের নাম ধাম ইত্যাদি। যাকে সাহেব নিজের সন্তানস্নেহে ভালোবাসতেন। কিন্তু দারুণ ইচ্ছে থাকলেও স্ত্রীর ভয়ে কোনওদিন তা প্রকাশ করতে পারেননি। সে যদি আজ বেঁচে থাকে তাহলে এই লুকোনো কাগজের জোরে বিশাল সম্পত্তির মালিকানা পাবে।

ছেলেটির নামটাও কাগজে বড় বড় করে লেখা আছে। সেটা দেখেই রতনবাবুর চোখের মণিদুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল। রোশন! রোশন লিম্বু! সেই অনাথ বাচ্চাটা! বাঃ—অবশেষে গতি হল। কালকেই উকিলের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা নিতে হবে।

উত্তেজনায় ফিরতে গিয়ে একটা ভাঙা প্যাকিং বাক্সের সঙ্গে ঠোক্কর খেলেন রতনবাবু। সঙ্গে সঙ্গে বগল থেকে টর্চটা গড়িয়ে গিয়ে পড়ল মেঝেতে। টর্চের ক্ষীণ আলোর রেখাটা জ্বলতে থাকল। সেই নিভু নিভু আলোয় প্রথমেই রতনবাবুর যেটা চোখে পড়ল তা হল খানিক দূরে মেঝের উপরে এক জোড়া পালিশ করা চকচকে স্যু! কিন্তু শুধু জুতো নয়, জুতোর মালিকও বসে রয়েছে ডানদিকের চেয়ারটায়! সারাদিন ওখানে বসেই তো রতনবাবু কাজ করেছেন।

আবছায়া লম্বা মূর্তিটার হ্যাট পরা মাথাটা যেন একটু কাত হল। চোখের অংশে দুটো গর্ত। সেখানে জ্বলে উঠল দুটো সবুজ আলোর ফুলকি। খসখসে স্বরে সাহেব বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ।

ফুগুরি পোস্ট অফিসে তাঁর চাকরির বাকি দিনগুলো রতনবাবু আনন্দেই কাটিয়েছিলেন। তাঁর এই জায়গাটা পছন্দ হয়ে গিয়েছে। রকমারি ফ্রেশ সবজি আর ছাগলের ঘন দুধ খেয়ে রতনবাবুর খিটখিটে চেহারাটাও ফিরেছে। ফুগুরি পোস্ট অফিসে আর কখনও রাতের বেলায় সেই স্ট্যাম্পের শব্দটা শোনা যায়নি। স্থানীয় মানুষ মেনে নিয়েছে যে ওটা বেপরোয়া হিমালয়ান উডপেকারদেরই কাণ্ড ছিল। যদিও অন্যরা কেউ কেউ অন্যরকম বলে থাকে। রতনবাবুকে নাকি প্রতিদিনই ডিনার সেরে রাতের দিকে দাবার বোর্ড বগলে ওই অফিসঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকতে দেখা যায়।

রোশন এখন দার্জিলিংয়ের এক বিখ্যাত বোর্ডিং স্কুলে পড়ছে। দুর্দান্ত রেজাল্ট করছে। বোর্ডিং স্কুলটা ভারি সুন্দর। তার বিশাল ছাদ থেকে দূরের পাহাড় স্পষ্ট দেখা যায়। অসীম অনন্ত আকাশ চাঁদোয়ার মতো ছড়িয়ে থাকে মাথার উপরে। রহস্যময় ওই আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে রোশন। আরও রাত ঘনালে জেগে ওঠে ছায়াপথ। ভবিষ্যতে অ্যাস্ট্রোফিজিক্স নিয়েই পড়ার ইচ্ছে তার। মাঝে মাঝে ছুটিতে দেশের বাড়িতে যায় বটে, কিন্তু লোকজনের পোস্ট অফিসের ভূত সংক্রান্ত গুজবের কথায় মোটেও কান দেয় না। ভূত প্রেত অলৌকিকে তার আর কোনও বিশ্বাস নেই! কিশোর ভারতী

হারানো সময়

সৌভিক চক্রবর্তী

ছুটির ঘণ্টা পড়েছে অনেকক্ষণ, কিন্তু সায়নের সেদিকে খেয়াল নেই। পুকুরের ধারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতেই ভালো লাগছে ওর। হেমন্ত শেষের বিকেল, রোদের তেজ কমে এসেছে। ফুরফুরে হাওয়া বইছে, গাছের পাতায় কাঁপন ধরাচ্ছে। মাঝেমধ্যে হাওয়ার দমক এসে ওর চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে যাচ্ছে।

পুকুরটা সায়নের স্কুল থেকে কাছেই, বড়রাস্তা পেরিয়ে মিনিট পাঁচেক। জল সেরকম গভীর নয়, তবু সাবধানতার খাতিরে চারপাশটা উঁচু করে শান দিয়ে বাঁধানো। এককালে এখানে মাছ চাষ হতো, শুনেছে ও। এখন আর তেমন কেউ আসেই না এদিকটায়, অন্তত বিকেলবেলায় তো নয়ই। তাই জায়গাটা বেশ নিরিবিলি।

'স্কুল ছুটির পরেও বাড়ি যাওনি, সেই তখন থেকে দেখছি একা দাঁড়িয়ে আছ। মনখারাপ নাকি?'

মুখ ফেরাল সায়ন। কখন যেন একটা লোক ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। লম্বা, সুঠাম চেহারা, পরিষ্কার গায়ের রঙ, চোখে সরু ফ্রেমের চশমা। বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হবে। পরনের শার্ট আর জিনস দেখেই মনে হয় বেশ দামি। হাতের ঘড়িটাও।

'মনখারাপের দারুণ ওষুধ জানা আছে আমার। ম্যাজিক দেখবে?'

একদিকে অচেনা, অজানা লোকের সঙ্গে কথা বলাটা ঠিক হবে কি হবে না তা নিয়ে দ্বিধা, অন্যদিকে ম্যাজিক দেখার কৌতূহল। কিছুক্ষণ টানাপোড়েনের পর অবশ্য ম্যাজিকের টানই জিতল। 'কই আঙ্কল, দেখি কী ম্যাজিক?'

পকেট থেকে সোনালি একটা কয়েন বের করে লোকটা ডানহাতের মুঠোয় ধরল। 'এবার আমি মন্ত্র বলব, আর কয়েনটা ভ্যানিশ হয়ে যাবে! হোকাস-পোকাস ছু মন্তর!'

লোকটা মুঠো খুলে দেখাল সায়নকে। সত্যিই কয়েনটা উধাও হয়ে গেছে!

'এবার কয়েনটাকে ফিরিয়ে আনব, তোমার কানের ভেতর থেকে,' সায়ন কিছু বোঝার আগেই ওর কানের পাশে হাত ঘোরালো লোকটা! কী আশ্চর্য, তার দু-আঙুলের ফাঁকে আবার ফিরে এসেছে কয়েন! না, এবার একটা না, দুটো কয়েন!

'আমার কয়েন আমার কাছেই রয়ে গেল, আর এটা এক্সট্রা। নাও, তোমাকে দিলাম।' একটা কয়েন সায়নের হাতে গুঁজে দিল সে।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কয়েনটা দেখল সায়ন। পাঁচ ডলারের কয়েন, একদিকে ঈগলের ছবি খোদাই করা। এক ডলার মানে ভারতের হিসেবে আটাত্তর টাকারও বেশি। তার মানে এই কয়েনটার দাম প্রায় চারশো টাকা। সোনালি কয়েনটা পছন্দ হলেও অপরিচিত কারোর কাছ থেকে কিছু নেওয়াটা উচিত হবে না ভেবে ইতস্তত করতে লাগল।

'আরে গিফট তো। আপত্তি কোরো না, নিয়ে নাও। কিন্তু বললে না তো তোমার মন কেন খারাপ?'

লোকটার কথার কোনও উত্তর দিল না সায়ন, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

'বলবে না বুঝি? আচ্ছা আমি তোমার মনখারাপের কারণটা আন্দাজ করার চেষ্টা করছি। উমম...হোমওয়ার্ক ভুল করার জন্য টিচার বকেছেন, তাই তো?'

চমকে উঠল সায়ন! লোকটা সত্যি ম্যাজিক জানে নাকি! কীভাবে বুঝে ফেলল? অ্যালজেব্রার দুটো অঙ্ক ভুল করেছিল ও...সিলি মিসটেক। খাতা চেক করার সময় দয়াময় স্যার-এর চোখে পড়ে যায়। তারপর ক্লাসভরতি ছেলেমেয়ের সামনে ওর ওপর সে কী তর্জন! নেহাত ক্লাস শেষের বেল পড়ে গিয়েছিল, না-হলে হয়তো স্যার ওকে বেঞ্চের ওপরেই দাঁড় করিয়ে দিতেন।

ঘটনাটার কথা ভাবতেই চোখের কোণ জ্বালা করে উঠল সায়নের। চটপট মুখ নামিয়ে নিল ও। অচেনা একজন যদি ওকে এভাবে কাঁদতে দেখে, লজ্জার একশেষ!

'আবার মনখারাপ করে!' আলতো স্বরে বলল লোকটা। 'টিচারের বকুনিতে কেউ এমন দুঃখ পায় নাকি? আজ হোমওয়ার্ক ভুল হয়েছে, কালই ঠিক হবে। শুধু একটু কন্সেন্ট্রেট করতে হবে।'

সায়নের বুকের বাঁ-দিকটা চিনচিন করছিল। পড়াশোনায় ভালো নয় বলে সবাই ওকে কথা শোনায়। গতবার ফাইনাল রেজাল্ট ভালো হয়নি বলে বাবা মা কত বকাবকিই না করেছিল। যেদিন ও ভালো স্টুডেন্ট হবে, চমৎকার রেজাল্ট করবে, সেদিন সবাইকে দেখিয়ে দেবে...

'আমরা ছোট ছোট না পাওয়াগুলো নিয়ে দুঃখ করি। বুঝি না, সবকিছু পেয়ে যাওয়ার পর জীবনে একটাই জিনিস পড়ে থাকে। শূন্যতা। সেটা দেখা যায় না, অনুভব করা যায় শুধু। সে অনুভূতি মোটেই সুখের নয়।'

লোকটার গলায় এমন একটা কিছু ছিল, যে সায়ন মুখ তুলতে বাধ্য হল। আর তখনই ওর মনে হল, লোকটার মুখটা কেমন চেনা চেনা। যদিও তাকে আগে কোথাও দেখেছে বলে ও মনে করতে পারল না।

আর...সায়ন অবাক হয়ে দেখল, লোকটার চোখে জল। বড়রা যে আদৌ কাঁদতে পারে, সেটাই ওর ধারণার বাইরে ছিল। তাও আবার বয়সে এত ছোট একজনের সামনে!

সায়ন খেয়াল করেছে বুঝতে পেরেই চটপট নিজেকে সামলে নিল লোকটা, পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছল। 'কিছু মনে কোরো না, একটু সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়েছিলাম। যে গল্পটা তোমাকে বলব, সেটা একটু দুঃখের। তাই...'

'গল্প বলবে? আমাকে?' সায়নের অবাক হওয়ার পালা যেন এখনও শেষ হয়নি।

'হ্যাঁ। তোমাকে গল্প বলতেই তো এখানে আসা। আর সত্যি বলতে আমার হাতে সময় বেশি নেই। তুমি মন দিয়ে শুনবে তো?'

সাতপাঁচ না ভেবেই ঘাড় কাত করল সায়ন। ওর মনের মধ্যে এই আশ্চর্য লোকটা সম্বন্ধে আগ্রহ মাথাচাড়া দিচ্ছিল।

'গল্পটা আমাকে নিয়ে। ছেলেবেলায় মোটেই ভালো ছাত্র ছিলাম না আমি। ক্লাস সেভেন থেকেই পড়াশোনায় ফাঁকি দিতে শুরু করেছিলাম। অঙ্ক মাথায় ঢুকত না, ইতিহাসে সাল তারিখ ভুলে যেতাম, ভূগোলে ম্যাপ পয়েন্টিং-এ মার্কস কম পেতাম। বাবা রাগারাগি করত, মা বকত। আমি অত গুরুত্ব দিতাম না।

'ক্লাস এইটের হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষার রেজাল্ট খুব খারাপ হল আমার। দুটো সাবজেক্টে ফেল করলাম। বাড়ির পরিবেশ পালটে গেল। বাবা স্পষ্ট বলে দিল, আমাকে আর বাড়িতে রেখে পড়াবে না, বোর্ডিং স্কুলে দিয়ে দেবে। মা একটু আপত্তি করেছিল, কিন্তু বাবা শুনল না। দেরাদুনে পাঠিয়ে দিল আমাকে।

'নামী বোর্ডিং স্কুল। যেমন পড়ার চাপ, তেমন কড়া ডিসিপ্লিন। প্রথম প্রথম মানিয়ে নিতে খুব কষ্ট হয়েছিল। সব কাজ নিজেকে করতে হতো—বিছানা পাতা, জামাকাপড় কাচা, থালাবাসন ধোয়া। এর আগে কখনও বাবা মাকে ছেড়ে বাইরে থাকিনি। বাড়ির কথা প্রায়ই মনে পড়ত। আমার পড়ার ঘরটাকে, পাড়ার বন্ধুদের মিস করতাম। এক-একসময় খুব কান্না পেত। প্রচণ্ড অভিমানও হতো বাবা-মা'র ওপর।

'আস্তে আস্তে অভিমানটা রাগে বদলে গেল। সঙ্গে চাপল জেদ, পড়াশোনায় ভালো হওয়ার জেদ, সবাইকে দেখিয়ে দেওয়ার জেদ। দিনে বারো ঘন্টা করে পড়াশোনা শুরু করলাম। ফলও পেলাম হাতেনাতে। পরপর পরীক্ষায় ফার্স্ট হলাম। জেদ আরও বাড়ল। পাল্লা দিয়ে বাড়ল বাড়ির ওপর রাগ।

'বাবা দেখা করতে এলে দেখা করতে চাইতাম না, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতাম। মা ফোন করলে একটা দুটো কথা বলেই ফোন রেখে দিতাম। ছুটিতে বাড়ি গিয়েও কারোর সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলতাম না, নিজের ঘরেই থাকতাম। আমার তখন একটাই লক্ষ্য—পড়াশোনায় ভালো হয়ে লোকজনকে তাক লাগিয়ে দেওয়া, বাবা-মাকে মুখের মতো জবাব দেওয়া।

'বোর্ডিঙের সবাই আমাকে ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট বলতে শুরু করল। ভালো ছেলে। ওরা তো আর বুঝত না, ভালো হতে গিয়ে আসলে কতটা খারাপ হয়ে উঠেছিলাম আমি।'

'খারাপ হয়ে উঠেছিলে?'

'খারাপ বলতে বাউন্ডুলে নয়, খারাপ বলতে স্বার্থপর। শুধু নিজের কথা ভাবতাম। কারোর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতাম না, করলেও নিজের স্বার্থের কথা ভেবে। কাউকে নোটস দিতাম না, পড়ায় হেল্প করতাম না। একা থাকাটা শিখে নিয়েছিলাম আমি, ষোলো বছর বয়সেই।'

'কোনও বন্ধু ছিল না? একদম একা?'

'হ্যাঁ। তবে আমি একেবারে একা হইনি, একটা সঙ্গী জুটিয়ে নিয়েছিলাম। ম্যাজিক। হোস্টেলের লাইব্রেরিতে ম্যাজিকের একটা বই পড়ে এত ভালো লেগেছিল যে স্থির করে নিয়েছিলাম, ম্যাজিক শিখবই। ক্লাস নাইন থেকে স্কলারশিপ পেতাম। সামান্য কিছু টাকা, তার থেকেই জমিয়ে ম্যাজিকের সরঞ্জাম কিনতাম। অবসর সময়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হাতসাফাই, তাসের খেলা, কয়েনের ম্যাজিক প্র্যাকটিস করতাম। কিন্তু কেউ জানত না, কাউকে দেখাতামও না।

'আইসিএসই পরীক্ষায় খুব ভালো রেজাল্ট করলাম। মা বলল বাড়ি ফিরে আসতে। বাবাও সায় দিল। কিন্তু আমি বেঁকে বসলাম। আমাকে যে জবাব দিতে হবে! পড়াশোনার মধ্যে আরও ডুবিয়ে দিলাম নিজেকে,

স্কুল-সিলেবাস-টেস্ট-প্র্যাকটিক্যাল-মার্কশিট-এর বাইরেও যে একটা জগৎ আছে ভুলেই গেলাম।

'আইএসসি-তে আরও ভালো ফল হল। ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ট্রান্স পরীক্ষায় র‍্যাঙ্ক করলাম, রাজ্যের যে-কোনও ভালো কলেজে চান্স পেয়ে যেতাম। কিন্তু না, কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে চলে গেলাম দিল্লি। কোর্স শেষ করার আগেই ক্যাম্পাসিং-এ চাকরি হয়ে গেল। ব্যাঙ্গালোরের বড় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি। মন দিয়ে কাজ করলাম। দু'বছরের মধ্যেই ইউএস যাওয়ার সুযোগ এল। মা-বাবা কাউকে কিছু জিগ্যেস করার প্রয়োজনও মনে করলাম না। একবার শুধু ফোন করে খবরটা দিলাম। মা ফোন ধরেছিল... কোনও কথা বলেনি, ওপার থেকে শুধু ফোঁপানোর আওয়াজ শুনেছিলাম।

'স্বাবলম্বী হওয়ার পর বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক এমনিতেই কমে এসেছিল, বিদেশে পৌঁছে ভুলেই গেলাম সব। ঝাঁ চকচকে ম্যানহাটন শহর, হাইরাইজ বিল্ডিঙে অ্যাপার্টমেন্ট, উইকেন্ড আসলেই লং ড্রাইভ, নতুন নতুন জায়গা ঘোরা—এসব নিয়েই দিন কাটতে লাগল। চাকরিতে নামডাক, প্রোমোশন হল। একসময় সংসার পাতলাম। আজ আমার তোমার বয়সি এক ছেলে আছে। ওর নাম বুকান।'

'আঙ্কল, তাও তোমার এত দুঃখ! কেন?' সায়ন জিগ্যেস না করে পারল না।

'গল্পের শেষদিকে চলে এসেছি, এবার বুঝতে পারবে।' ম্লান হাসল লোকটা, 'জীবন ঠিকই চলছিল...কিন্তু হঠাৎ একটা ধাক্কায় সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল। মাস দুয়েক আগের কথা। অফিসে পরপর কতগুলো মিটিং ছিল। রাত ন'টা নাগাদ কেবিন লক করে বেরোনোর তোড়জোড় করছি, এমন সময় সেলফোন বেজে উঠল। অচেনা নম্বর, ইন্ডিয়া থেকে। ধরলাম। ভেসে এল রঞ্জনকাকুর গলা। বাবার বন্ধু ছিলেন, আমাদের দুটো বাড়ির পরেই থাকতেন। থমথমে গলায় যে খবরটা দিলেন, তার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। দক্ষিণেশ্বরে পুজো দিতে বেরিয়েছিল মা-বাবা। মাঝরাস্তায় গাড়ি ব্রেক ফেল করে কালভার্টে ধাক্কা মারে। ড্রাইভারসহ তিনজনেই...

'মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করে উঠেছিল। বাকি কথাগুলো কানেই ঢোকেনি। যাদের কথা এই কবছরে যত সম্ভব কম ভাবা যায় সেই চেষ্টা করেছি তাদের আর কখনও চোখের সামনে দেখতে পাব না, যাদের নিজের জীবন থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছি তাদের গলার স্বর আর কোনোদিনই আমার কানে বাজবে না—উপলব্ধি করামাত্র শরীরটা অবশ হয়ে এসেছিল। এরকমটা তো হওয়ার কথা ছিল না। একবার ভুল স্বীকার করার, একবার ফিরে যাওয়ার সুযোগটুকু অন্তত পাওয়া উচিত ছিল আমার। সন্তান যতই খারাপ, যতই অবাধ্য হোক, মা-বাবা তো তাকে এভাবে ছেড়ে চলে যায় না!

'এসবের মধ্যে আচমকাই সেদিনের তারিখটা খেয়াল হয়েছিল। ২৮ জুলাই, মানে ভারতের হিসেবে ২৯ জুলাই। আমার জন্মদিন। প্রতিবারের মতো সেবারও ভোরবেলা দক্ষিণেশ্বরে আমার জন্যই পুজো দিতে বেরিয়েছিল মা-বাবা। যে সন্তান তাদের পরিত্যাগ করেছে, তার মঙ্গলকামনায় মায়ের মন্দিরে মানত করতে যাচ্ছিল...

'কোনোরকমে ফ্লাইটের টিকিট জোগাড় করে দেশে ফেরা, শেষকৃত্য সারা—সবকিছু ঘোরের মধ্যে কেটেছিল। আমাদের পুরোনো বাড়িটায় একদিনের বেশি থাকতে পারিনি, হোটেলে গিয়ে উঠতে বাধ্য হয়েছিলাম। ফাঁকা ঘরগুলো গিলতে এসেছিল আমাকে। দোতলায় আমার ঘরটায় ঢুকতেই প্রচণ্ড একটা কান্না গলার কাছে দলা পাকিয়ে উঠেছিল। মনে হয়েছিল তাকজোড়া বই, কপিল দেবের মুখ আঁকা ক্রিকেট ব্যাট, বাতিল খেলনাগুলো অপরাধীর নজরে দেখছে। যেন ওদের সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছি আমি।

'আমেরিকা ফিরলাম, মনে তবু শান্তি এল না। আমার সব সুখ কেউ যেন কেড়ে নিয়েছিল। মানুষদুটোর অভাব বোধ করতাম সর্বক্ষণ। বিশাল খালিভাব বুকের ভেতর মোচড় দিত। অফিস থেকে ফিরে চুপচাপ বসে থাকতাম। খেতে ইচ্ছে করত না, রাতে ঘুম আসত না, এমনকী পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতেও ভালো লাগত না। যে কথাগুলো বলা হয়নি, কর্তব্যগুলো পালন করা হয়নি সেগুলোর কথা ভাবতাম শুধু। এভাবে চলতে চলতেই একদিন ঘড়িটার কথা মাথায় এল।

'ম্যাজিকের সরঞ্জামের নেশা আগে থেকেই ছিল, আমেরিকায় যোগ হয়েছিল কিউরিও-র শখ। বিশেষ করে যেসব প্রাচীন জিনিসপত্রের সঙ্গে ম্যাজিকের সম্পর্ক রয়েছে বলে কিংবদন্তি ছিল, সেগুলো সংগ্রহ করতাম। ইরানের ম্যাজিক কার্পেট, রেড ইন্ডিয়ান-দের তৈরি মন্ত্রপূত হাড়ের মূর্তি—এইসব। এভাবেই একদিন আরব দেশের বালিঘড়িটা কিনেছিলাম, নেভাদার একটা কিউরিও শপ থেকে। স্বচ্ছ স্ফটিকের বালিঘড়ি, ওপর-নীচ রুপো দিয়ে বাঁধানো। দেখেই পছন্দ হয়ে গেছিল, তারপর দোকানের মালিক যখন সেটার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা কাহিনি শোনালেন, না কিনে থাকতে পারিনি।

ভদ্রলোক বলেছিলেন, ঘড়িটা প্রাচীন আরবের একজন জাদুকরের সৃষ্টি, হারানো সময়কে ধরে রাখার আধার। মানুষের জীবনের প্রতিটা বছর থেকে অল্প একটু করে সময় নাকি স্রেফ হারিয়ে যায়। আজকের দিনের হিসেব মতো বছরপিছু নব্বই সেকেন্ড। সেই হারানো সময় নাকি জাদুর প্রভাবে বালিঘড়িটায় এসে জমা হয়। ঘড়ির মালিক চাইলে জমা হওয়া সময়কে কাজে লাগাতে পারে, নির্দিষ্ট ওইটুকু সময়ের জন্য অতীতের যে-কোনও মুহূর্তে, যে-কোনও স্থানে গিয়ে উপস্থিত হতে পারে। হাতে ধরে তিনবার বালিঘড়িটাকে ওপর-নীচ ঘোরানো, আর মন্ত্র উচ্চারণ করা—বাস, এতেই কাজ হয়। উৎসাহ দেখিয়ে কাগজে মন্ত্রটা লিখেও দিয়েছিলেন তিনি। গল্পটা পুরোপুরি বিশ্বাস না করলেও একেবারে ফেলে

দিতে পারিনি, তাই মন্ত্রলেখা কাগজটা নিয়ে নিয়েছিলাম। তারপর অনেকগুলো বছর ভুলেই গেছিলাম ওটার কথা। বাবা-মা'র অ্যাক্সিডেন্ট সেই স্মৃতি ফিরিয়ে আনল।

প্রথমে বিষয়টা মন থেকে বের করে দিয়েছিলাম। কিন্তু তারপর মনে হল, একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী? জগৎসংসারে কত আশ্চর্য ঘটনাই তো ঘটে। যদি সত্যি একবার পেছনে ফিরে যেতে পারি, কয়েক মিনিট কাটিয়ে আসতে পারি বাবা-মা'র সঙ্গে, যা যা পাপ করেছি তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিতে পারি যদি, তাহলে আমাকে ভেতর থেকে কুরে কুরে খাওয়া অনুশোচনার জ্বালাটা অন্তত জুড়োবে।

'দেরাজ থেকে বের করে আনলাম বালিঘড়িটাকে। হিসেব করে দেখলাম, বয়স অনুযায়ী একষট্টি মিনিটের সামান্য বেশি সময় বরাদ্দ রয়েছে আমার জন্য। তিরিশ বছর আগে, আমার বাড়িতে ফিরতে চাই—মনে মনে ভেবে নিয়ে তিনবার ঘোরালাম ওটা, কাগজ দেখে মন্ত্র পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে আলোর একটা বৃত্ত আমাকে ঘিরে ফেলল। পরক্ষণেই নিজেকে আবিষ্কার করলাম আমাদের বাড়ির বাইরে। যেমনটা আমার ছেলেবেলায় ছিল, চারপাশ একেবারে তেমনটাই মনে হচ্ছিল। বাড়ির ভেতর থেকে চেনা গলার আওয়াজ পেলাম। মা'র। কিন্তু...এরপর কী করব বুঝে উঠতে পারলাম না। পা দুটো যেন নড়তেই চাইল না।

'হাতে সময় এমনিতেই কম, তার মধ্যে পাঁচ মিনিট খরচ হয়ে গেছিল। মনের মধ্যে ঝড় চলছিল। বিকেলবেলা, বাবা অফিস থেকে ফেরেনি তখনও। মা'র সঙ্গে কথা বলেই ফিরে যাব কি? তাহলে তো বাবার সঙ্গে দেখা হবে না। সময় বাঁচাতে পারলে পরে আরেকবার আসা যেতে পারে, কিন্তু তখনও যদি দুজনকে একসঙ্গে না পাই? তাছাড়া আরেকটা আশঙ্কাও ছিল। মা-বাবা যদি আমার কথা আদৌ বিশ্বাস না করে? কোনও সুস্থ মানুষ কি অচেনা, অজানা একজন লোককে তার ভবিষ্যৎ থেকে আসা সন্তান বলে মেনে নেবে? দূরদূর করে তাড়িয়েই দেবে হয়তো। তখন তো আমার উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

'তখনই দেখলাম, বাড়ির গেট খুলে ব্যাট হাতে বেরিয়ে এল একটা বাচ্চা ছেলে। তুমি...মানে আমি, বাচ্চাবেলার আমি। এগারো বছরের সায়ন, মাঠে খেলতে যাচ্ছে। এক লহমায় বুঝে গেলাম, আমাকে কী করতে হবে। সব ভুল শুধরে নেওয়ার একটাই উপায়—অতীতের সায়নকে বোঝাতে হবে, যাতে সেই ভুলগুলোর পুনরাবৃত্তি না হয়। আমার জীবনটাকে নতুন করে গড়তে একমাত্র সে-ই পারবে। কিন্তু তার জন্য তাকে সবকিছু খুলে বলতে হবে। মনে পড়ে গেল, ছোটবেলায় প্রায়ই স্কুল ছুটির পর পুকুরপাড়ে যেতাম আমি। মনে মনে ক্লাস সিক্সের সময়কার একটা দিন ভেবে নিলাম, তারপর আরেকবার হারানো সময়ের ঘড়িকে ব্যবহার করলাম...'

সায়নের সব গুলিয়ে যাচ্ছিল। লোকটার শেষের দিকের কথাগুলো এতটাই অবিশ্বাস্য যে মেনে নেওয়া কঠিন। আবার সে যে পাগল, অথবা অকারণে মিথ্যে বলছে এমনটাও মনে হচ্ছিল না। তার বলা কথাগুলোর মধ্যে অদ্ভুত এক সততা ছিল।

'তুমি আমার শৈশব, সায়ন। তাই তোমার কাছেই সাহায্য চাইতে এসেছি আমি। আমার সব অপরাধ ধুয়েমুছে ফেলার একটা সুযোগ ঈশ্বর আমাকে দিয়েছেন। ছোটদের মন বড়দের মতো সংকীর্ণ হয় না। তারা ম্যাজিকে বিশ্বাস করে, অসম্ভবকে মেনে নেয় স্বাভাবিকভাবেই। আমার মন বলছে, তুমি আমার কথা বিশ্বাস করেছ।'

কী বলবে এবারও ভেবে পেল না সায়ন। ওর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা সত্যিই আগামী থেকে আসা কেউ? সে কি সায়নেরই ভবিষ্যৎ রূপ? সেই সায়ন, যার জন্মদিন ২৯ জুলাই। সেই সায়ন, যার প্রতিটা জন্মদিনে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পুজো দিয়ে আসে বাবা-মা। সেই সায়ন, যে অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোলকে যমের মতো ভয় পায়।

'জীবনে ভালো স্টুডেন্ট হওয়া, ভালো কেরিয়ার করাটাই সব নয়। এগিয়ে যাওয়ার দৌড়ে নেমে পেছন ফিরে তাকাতে ভুলে যাই আমরা, খেয়ালই করি না কখন ফেলে আসি কৈশোর, পরিবার, শিকড়ের টান। বৃষ্টিভেজা বিকেল, খেলার মাঠে ঘাসের গন্ধ, মায়ের হাতের পুলিপিঠে—হারিয়ে যায়। তারপর একদিন হুঁশ ফেরে। তখন পাগলের মতো ফিরতে চাই সেই দিনগুলোতে, কিন্তু সময় কথা শোনে না। আমার হাতেও আর সময় নেই, সায়ন। প্লিজ বলো, আমার কথা বিশ্বাস করেছ?'

লোকটার গলায় আকুতিতে হুঁশ ফিরল সায়নের। বলল, 'হ্যাঁ, আমি তোমার কথা বিশ্বাস করেছি।'

'তাহলে যদি তোমাকে একটা প্রমিস করতে বলি, করবে?'

'কী প্রমিস?'

'কথা দাও, আমি যে ভুলগুলো করেছি সেগুলো তুমি করবে না। বাবা-মা'র কথা শুনবে, তাদের কখনও ভুল বুঝবে না। বড়রা যদি বকে, মনে রাখবে তোমার মঙ্গলের জন্যই। মন দিয়ে পড়াশোনা অবশ্যই করবে, কিন্তু পরিবার, আত্মীয় বা বন্ধুবান্ধবদের ভুলে গিয়ে নয়। প্রমিস করো, সায়ন, তুমি স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক জীবন বেছে নেবে না। সকলকে নিয়ে বাঁচবে। যে ভালোবাসা মা-বাবাকে আমি কোনোদিন দিতে পারিনি, তুমি তার দ্বিগুণ ভালোবাসা দিয়ে তাদের আগলে রাখবে। প্রমিস করো।'

'প্রমিস করলাম।,' ভেতর থেকে বলল সায়ন।

লোকটার মুখে স্বস্তির হাসি ফুটল, 'থ্যাংক ইয়ু, সায়ন! আমাকে নিশ্চিন্ত করলে তুমি। অতীত বদলালে ভবিষ্যৎও বদলে যাবে, এই খারাপ আমি-টার আর কোনও অস্তিত্ব থাকবে না। বছরের পর বছর মনমরা হয়ে, দুঃখে গুমরে কাটাতে হবে না আমাকে...' বলতে বলতে তার গলা ক্ষীণ হয়ে এল।

'আমার হারানো সময়ের মেয়াদ প্রায় শেষ। যাওয়ার আগে আরেকটা জিনিস তোমাকে দিয়ে যেতে চাই, আজকের এই দিনটার স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে। যখনই এটা দেখবে, তোমার আমাকে মনে পড়বে, আর মনে পড়বে তোমার প্রমিস...।'

হিপ পকেট থেকে ব্রাউন পেপারে মোড়া একটা জিনিস বের করে এগিয়ে দিল লোকটা। মোড়ক খুলে সায়ন দেখল, একটা জ্যামিতি বাক্স। বেশ পুরোনো, একপাশ তোবড়ানো। ভেতরে কম্পাসে জং ধরেছে, চাঁদার গায়ে ডিগ্রি মিনিটের হিসেব মুছে গেছে। আর বাক্সের ডালার ভেতরের দিকে কম্পাসের কাঁটা দিয়ে আঁকাবাঁকা অক্ষরে খোদাই করা রয়েছে কতগুলো শব্দ। 'সায়ন ব্যানার্জি, ক্লাস সিক্স, সেকশন সি'।

এক সেকেন্ড স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল সায়ন, তারপর পিঠের ব্যাগ থেকে বের করে আনল হুবহু এক দেখতে আরেকটা জ্যামিতি বাক্স। মাস তিনেক আগে, হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষার সময় বাবা কিনে দিয়েছিল। যেদিন হাতে পেয়েছিল, সেদিনই ডালার ভেতরের দিকে কম্পাস দিয়ে নিজের নাম, ক্লাস, সেকশন খোদাই করেছিল ও।

সায়ন ব্যানার্জি, ক্লাস সিক্স, সেকশন সি। হারানো সময়ের উপহার, অতীত ও ভবিষ্যতের মুখোমুখি সাক্ষাতের অকাট্য প্রমাণ।

'এবার আমাকে আসতে হবে। ভালো থেকো সায়ন, বাবা-মাকে ভালো রেখ। তোমার আগামী দিনগুলো সুখের হোক।'

হাসিমুখে হাত নাড়তে নাড়তে পিছিয়ে গেল লোকটা। এক-পা, দু'পা, তারপরই যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল সে। রয়ে গেল নিস্তরঙ্গ পুকুর, হাওয়ার তালে তালে মাথা নাড়ানো গাছেদের দল, আর দু'হাতে দুটো জ্যামিতি বাক্স ধরে দাঁড়িয়ে থাকা ক্লাস সিক্সের একটা ছেলে।

তাড়াতাড়ি বাড়ির পথে হাঁটা দিল সায়ন। বেশি দেরি হলে মা আবার চিন্তা করবে যে। কিশোর ভারতী

পাতালপুরী

ইমদাদুল হক মিলন বাংলাদেশ

সোনাতলার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীটির নাম ইছামতি। গ্রীষ্মে অতিশীর্ণ চেহারা থাকে নদীর। গলাজল ভেঙে এপার ওপার করা যায়। বর্ষায়ও নদী বলে মনে হয় না। দুপুরের পর শিউলি গিয়েছিল ইছামতিতে স্নান করতে। আর তখনই ঘটল সেই অঘটন...।

মা-বাবা গত হয়েছেন অনেকদিন। শিউলি থাকে দাদার সংসারে। দাদা গৌতম সাহা রামকৃষ্ণপুর বাজারে পাইকারি মালের দোকান চালায়।

গৌতমের যখন বিয়ে হয় শিউলি তখন ক্লাস ফাইভের ছাত্রী। গৌতমের বউ প্রতিমা মানুষটা বেশ রাগী আর দজ্জাল। এসেই ওইটুকু মেয়েকে দিয়েই সংসারের সব কাজ করাতে লাগল। গৌতম তার কথায় ওঠে বসে। ছোট বোনটির দিকে তাকিয়েও দেখে না।

ক্লাস সিক্সে ওঠার পর আর স্কুলে যাওয়া হল না শিউলির। দাদার সংসারে একপ্রকার ঝি হয়ে গেল সে। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি। সব কাজ সেরে শুতে শুতেও বেশ রাত হয়। এত কিছুর পরেও শিউলির চোখে ঘুম আসে না। চোখের জলে বালিশ ভেজে। বহুবার ইচ্ছে হয়েছে সংসার ছেড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু কোথায় যাবে?

দাদার ছেলে অর্জুন এবার পাঁচ বছরে পড়েছে। প্রতিমা ছেলেকে নিয়েই ব্যস্ত। অন্য কোনও দিকে তাকিয়ে দেখে না। তবে অর্জুনটা পিসির নেওটা। সময় সুযোগ পেলেই পিসিমণির কাছে আসে। গল্প শুনতে চায়। তাতে অবশ্য প্রতিমা কিছু বলে না। ছেলে যা চাইবে তাই হবে।

পাতালপুরীর গল্প বলতে শিউলির খুব ভালো লাগে। অর্জুনও শুনতে পছন্দ করে। একই গল্প ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অর্জুনকে শোনায় সে। পিসিমণির মুখোমুখি শুয়ে বা কোলে বসে মুগ্ধ হয়ে সেসব গল্প শোনে অর্জুন।

সংসারের কাজ সেরে স্নানে যেতে শিউলির দুপুর পার হয়ে যায়। পাড়ার বউঝিরা অনেক আগেই স্নান সেরে যে যার বাড়িতে ফেরে।

ছবিঃ মৃণাল শীল

শিউলি একা একাই যায়। তবে আজ তার সঙ্গে মৃধাবাড়ির ছোটবউ আরতি আর হরিপদ স্যারের মেয়ে সন্ধ্যা ছিল। গলাজলে নেমে স্নান করছিল তিনজন। হঠাৎ এক অদ্ভুত কাণ্ড হল। ওইটুকু জলেই ডুবে গেল শিউলি। গেল তো গেলই! কোনও হদিস নেই।

আরতি আর সন্ধ্যা ভেবেছিল শিউলি বুঝি ডুব দিয়ে অন্য কোনও দিকে চলে গেছে। ওদের সঙ্গে মজা করছে। ওরা দুজন অনেক খুঁজল। ডুব দিয়ে দিয়ে খুঁজল। না, নেই। কোথাও নেই শিউলি।

ওরা চিৎকার করতে করতে পাড়ে উঠল। ওদের চিৎকারে পাড়ার লোকজন জড়ো হল। জাল ফেলে, ডুব দিয়ে দিয়ে পনেরো-বিশজন লোক সন্ধ্যা পর্যন্ত খুঁজল শিউলিকে।

খবর পেয়ে দোকান ফেলে ছুটে এল গৌতম। সেও নেমে পড়েছে নদীতে। পাগলের মতো বোনকে খুঁজে চলেছে। গলাজলের ইছামতিতে এভাবে কেউ ডুবে যেতে পারে? তার ওপর যে মেয়ে এত ভালো সাঁতার জানে!

গৌতম তার বোনের জন্য খুব কান্নাকাটি করল। এই ক'বছরে বোনের দিকে ফিরেও তাকায়নি সে। কিন্তু এখন যেন হঠাৎ করে বোনের জন্য স্নেহ মমতা উথলে উঠল তার। পিসিমণির জন্য কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলল অর্জুন। লোক দেখানো কান্না কাঁদছিল প্রতিমাও। শিউলি ডুবে মরেছে শুনে সে ভিতরে ভিতরে খুশি। যাক, সংসারের একটা ঝামেলা গেছে। মনের ভাব চেপে সে আরও জোরে কান্না জুড়ল। 'শিউলি রে...এ তুই কী করলি রে বোন? এভাবে আমাদের ছেড়ে চলে গেলি?

প্রতিমার বিলাপ শুনে বোনের জন্য কাঁদতে কাঁদতে জীবনে এই প্রথম স্ত্রীর ওপর রাগে ফেটে পড়ল গৌতম। 'তুমি চুপ করো! ডাইনি কোথাকার! তুমি আমার বোনের জীবনটা ধ্বংস করে দিয়েছ। এখন আবার তার জন্য আহ্লাদ দেখাচ্ছ? চুপ করো বলছি। তুমি একটা ডাইনি!'

পাড়ার লোক গৌতমকে দেখে বিস্মিত। পাশের বাড়ির নিতাই তপাদারের বুড়িমা লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। খুবই ঠোঁটকাটা বুড়ি। ফোকলা মুখে বলল, 'এখন এত বাহাদুরি দেখাচ্ছিস কেন রে, গৌতম? আগে এই কাজটা করতে পারিসনি? তা হলে তো বোনটা বাঁচত। ও ইচ্ছা করে মরেছে, আত্মহত্যা করেছে। এই জন্য তোর ওই বউটাই দায়ী। তুইও দায়ী। কান্নাকাটি করে এখন আর লোক হাসিয়ে কী হবে?'

বুড়ির কথা শুনে ভিড় করা প্রতিবেশীরা সবাই মুখ চেপে হাসতে শুরু করেছে। গৌতম থেমে গেছে। প্রতিমাও হতভম্ব।

এদিকে অর্জুন কেঁদেই চলেছে, 'পিসিমণি মরে গেছে। আমি কার কাছে পাতালপুরীর গল্প শুনব...পিসিমণি ও পিসিমণি, তুমি মরে গেলে কেন?'

নিজেকে আড়াল করতে প্রতিমা উঠে গিয়ে ছেলেকে জড়িয়ে ধরল। সেই লোক দেখানো কান্না জুড়ে বলল, 'আমি শোনাব বাবা। আমি তোমাকে পাতালপুরীর গল্প শোনাব।'

অর্জুন তার মাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। 'তোমার গল্প আমি শুনব না। তুমি পচা! পিসিমণিকে একদিন চুলের মুঠি ধরে মেরেছ। আমি দেখেছি। তুমি পচা, খারাপ!' বলেই কাঁদতে কাঁদতে নদীর দিকে ছুটে গেল অর্জুন।

এলাকার লোকজন ভেবেছিল যেহেতু জলে ডুবে মারা গেছে শিউলি, দু-একদিনের মধ্যে নিশ্চয়ই তার লাশ ভেসে উঠবে। তাদের গ্রামে না হোক পাশের গ্রামের কেউ না কেউ শিউলির লাশ পাবে।

না, শিউলির লাশ ভেসে উঠল না। গৌতমের সঙ্গে গ্রামের আরও কেউ কেউ প্রতিদিন দু'বেলা খবর নিল। শিউলির লাশ পাওয়াই গেল না। একদিন দু'দিন করে এভাবে অনেকগুলো দিন কেটে গেল।

জগৎ সংসারে কে কার কথা মনে রাখে? ধীরে ধীরে শিউলির কথা সবাই ভুলে গেল। ভুলল না শুধু ছোট্ট অর্জুন। রোজই পিসিমণির জন্য সে নির্জন দুপুরে কিংবা শেষ বিকেলের দিকে বাড়ির পাশের নদীতীরে গিয়ে দাঁড়ায়। 'পিসিমণি, পিসিমণি' বলে ডাকে আর নিঃশব্দে কাঁদে। রাতে মাঝে মাঝে পিসিমণিকে সে স্বপ্নেও দেখে। একটাই স্বপ্ন। সে শুয়ে আছে পিসিমণির বুকের কাছে আর পিসিমণি তাকে পাতালপুরীর গল্প বলছে।

দুই

গভীর রাত। শুক্লপক্ষ। বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে কে যেন তিনবার ডাকল। 'অর্জুন, অর্জুন রে, ও অর্জুন।'

পিসিমণি হারিয়ে যাওয়ার পর থেকে অর্জুন মা'র কাছে ঘুমায়। বড়ঘরে পাশাপাশি দুটো খাট। একটায় শোয় গৌতম। অন্যটায় প্রতিমা আর অর্জুন।

কেউ ডাকটা শুনতে পেল না। শুনল শুধু অর্জুন। সেই ডাকে ঘুম ভাঙল তার। দিশেহারা হয়ে উঠে বসল সে। মাকে ধাক্কা দিল। 'মা, ওমা, ওঠো! পিসিমণি এসেছে!'

অর্জুনের ডাকাডাকি আর ধাক্কাধাক্কিতে ঘুম ভাঙল প্রতিমার। বিরক্ত গলায় বলল, 'কী হয়েছে? এমন করছিস কেন?'

'পিসিমণি এসেছে মা। পিসিমণি এসেছে! আমাকে ডাকছে।'

গৌতমের ঘুম পাতলা। সেও ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে।

ছেলেকে ধমক দিল প্রতিমা। 'কী বলছিস তুই! পিসিমণি আসবে কোত্থেকে? সে তো দু'আড়াই বছর আগে নদীতে ডুবে মরেছে।'

'কিন্তু পিসিমণি আমাকে এইমাত্র ডেকেছে। একবার না, তিনবার।'

গৌতম পাশের খাট থেকে বলল, 'তুমি স্বপ্ন দেখেছ, বাবা। পিসিমণির কথা ভাবো তো, এজন্য স্বপ্ন দেখেছ। স্বপ্নে তার ডাকও শুনেছ। ও কিছু না। শুয়ে পড়ো বাবা, শুয়ে পড়ো।'

ঠিক এসময় আবার সেই ডাক। 'অর্জুন, অর্জুন রে, দরজা খোল বাবা।'

এবার তিনজনেই শুনতে পেল শিউলির ডাক। গলা চিনতে কারওই ভুল হল না। অর্জুন উত্তেজিত গলায় বলল, 'ওই শোনো, পিসিমণি আমাকে ডাকছে! বাবা, বাবা তুমি শুনেছ?'

অর্জুন লাফ দিয়ে খাট থেকে নামল। গৌতমও নামল।

ঘরের দরজায় তখন টুক টুক করে শব্দ হচ্ছে। 'অর্জুন, অর্জুন!'

অর্জুন ছটফটিয়ে দরজা খুলতে গেল। সঙ্গে গৌতমও। প্রতিমা বিছানা থেকে নেমে ওদের বাধা দিয়ে বলল, 'খুলো না, খুলো না। অনেক সময় তেনারা এসে নাম ধরে ডাকেন। ঘরের বাইরে ডেকে নিয়ে...।'

আবার বাইরে থেকে ডাক এল, 'অর্জুন, ভয় পাসনে। আমি তোর পিসিমণিই। দরজা খোল, বাবা।'

অর্জুন দরজার কাছে যেতেই প্রতিমা তার হাত চেপে ধরল। 'দাঁড়া, দাঁড়া। একটু পরীক্ষা করে নে।' তার পর শিউলির উদ্দেশ্য বলল, 'তোমার সঙ্গে আর কেউ আছে? থাকলে তাকে কথা বলতে বলো।'

শিউলি প্রতিমার কথার জবাব দিল অর্জুনের মাধ্যমে। 'শোন অর্জুন, আমি একা এসেছি। তবে তুই ছাড়া কারও সঙ্গে আমি কথা বলব না। দরজা খোল বাবা। নয়তো আমি এখনই ফিরে যাব।'

'না, না, পিসিমণি। তুমি দাঁড়াও, আমি দরজা খুলছি।'

অর্জুনের বয়েস এখন সাড়ে সাত। এই বয়সেই বেশ লম্বা হয়েছে। শরীরে শক্তি অন্য শিশুদের তুলনায় বেশি। সাহসও। সে আর কোনও কিছুর তোয়াক্কা করল না। দরজা খুলে দিল।

ঘরে ততক্ষণে আলো জ্বেলেছে প্রতিমা। সেই আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে শিউলি। ঘরের আলো আর চাঁদের আলো দুটোই পড়ছে তার ওপর। সেই আলোয় রাজকন্যার মতো লাগছে তাকে। কী সুন্দর চেহারা হয়েছে! চাঁদের আলোর মতো গায়ের রং। পরনের শাড়িটাও বেশ দামি। গা ভর্তি গহনা। পায়ে চুমকি বসানো জুতো। আর গা থেকে ভেসে আসছে অপূর্ব সুগন্ধ।

এ তো সেই শিউলি নয়! এ তো রাজকন্যা! যেমন রূপ তেমন গহনা আর পোশাক। কোথায় সেই গরমে ঘামে আর সংসারের কাজে ম্লান হয়ে যাওয়া শিউলি আর কোথায় এই মেয়ে!

ওরা তিনজনেই হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল শিউলির দিকে।

কয়েক মুহূর্ত মাত্র সময়, অর্জুন ছুটে এসে শিউলিকে জড়িয়ে ধরল। 'পিসিমণি তুমি, সত্যি তুমি?'

শিউলিও জড়িয়ে ধরল অর্জুনকে। 'হ্যাঁ রে বাবা, সত্যি আমি। কেন, আমাকে তুই চিনতে পারছিস না?'

'পারছি তো! তবে তুমি অনেক বদলে গেছ।'

শিউলি হাসল। 'কেমন বদলেছি, বল তো?'

'পাতালপুরীর রাজকন্যার মতো দেখাচ্ছে তোমাকে। যে রাজকন্যার গল্প তুমি আমাকে বলেছিলে।'

গভীর আবেগে বোনের দিকে এগিয়ে গেল গৌতম। শিউলি ছিটকে সরে গেল। 'অর্জুন, তোর বাবাকে বলে দে, আমার সামনে যেন না আসে। তোর মাকেও বল। নাহলে আমি এক্ষুনি চলে যাব...।'

গৌতম থতমত খেয়ে থেমে গেল।

প্রতিমা কাতর গলায় বলল, 'কেন, আমরা কি তোমার কেউ না?'

'অর্জুন, তুই ছাড়া এই বাড়িতে আমার আর কেউ নেই। ছোটবেলায় মা-বাবা গত হওয়ার পর আমার দিকে কেউ ফিরেও তাকায়নি। শুধু তুই আমাকে ভালোবেসেছিস। আমার জন্য কেঁদেছিস। তাই আজ আমি তোর কাছে এসেছি।'

পিসিমণিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে গভীর আবেগে অর্জুন বলল, 'আমার খুব ভালো লাগছে, পিসিমণি। তুমি কোথায় চলে গিয়েছিলে? কোথা থেকে এতদিন পরে এলে? তুমি তো জলে ডুবে...।'

প্রতিমা বলল, 'শুধু আমরা না, পাড়ার সবাই, গ্রামের সবাই তাই জানে। আরতি আর সন্ধ্যার চোখের সামনে তুই নদীতে ডুবে গিয়েছিলি।'

গৌতম বলল, 'শুধু আমাদের পাড়া নয়, এলাকার সবাই তাই জানে।'

এসব কথায় কানই দিল না শিউলি। অর্জুনের হাত ধরে বলল, 'চল, উঠোনের নিমগাছ তলায় বসে তোকে আমি সব বলব।'

এই বাড়িটা দক্ষিণমুখী। বাড়িতে তিনটে ঘর আর রান্নাচালা। বাড়ির সামনের দিকটা টিনের বেড়া দিয়ে ঘেরা। তার মাঝখানে টিনের একটা দরজা। ওই দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকতে হয়। রাতেরবেলা সেই দরজা ভিতর থেকে বন্ধ থাকে। আজ কি খোলা ছিল? নাহলে শিউলি ঢুকল কী করে? প্রশ্নটা এল গৌতমের মাথায়।

অর্জুনকে নিয়ে শিউলি উঠোনে নেমে যাওয়ার সময় সে বলল। 'তুই ঢুকলি কী করে? দরজা তো ভিতর থেকে বন্ধ ছিল!'

অর্জুনকে নিয়ে নিমতলার দিকে হাঁটতে হাঁটতে শিউলি বলল, 'শোন অর্জুন, এখনই একটা কাণ্ড হবে। তোর মা-বাবা দু'জনেই এখন বড়ঘরের বারান্দায় বসে পড়বে, তার পর থেকে একটাও কথা বলবে না। একদম চুপচাপ বসে থাকবে।'

'কেন?'

'আমি সেই ব্যবস্থা করছি। নয়তো তোর আমার কথার মাঝখানে ওরা বিরক্ত করতে পারে।'

'সেটা কী ভাবে করবে?'

'আমি এসব পারি। ওই দেখ, দুজনেই বারান্দায় বসে পড়েছে আর আমাদের দিকে চেয়ে আছে।'

অর্জুন মুখ ঘুরিয়ে দেখল, পিসিমণি যা বলেছে ঠিক তাই। বাবা-মা বারান্দায় বসে বোবার মতো তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। বোঝা যাচ্ছে চেষ্টা করেও তারা কথা বলতে পারছে না।

শিউলি বলল, 'আমি অনেক কিছু পারি। বাইরে থেকে বন্ধ দরজা খুলে ভিতরে ঢুকেছি। আমি মনে মনে শুধু বলেছি, দরজা খুলে যাক। দরজা খুলে গেছে। তোর বাবা-মাকে বলেছি, বসে পড়ো আর বোবা হয়ে যাও। তাই হয়েছে।'

অর্জুন ভয় পেল। 'মা-বাবা কি তাহলে আর কথা বলতে পারবে না? উঠে দাঁড়াতে পারবে না?'

'সবই পারবে। আমি চলে যাওয়ার পর।'

'তুমি কি চলে যাবে?'

'হ্যাঁ, যেতে তো আমাকে হবেই। রাত ভোর হওয়ার আগেই আমি চলে যাব। শুকতারা ওঠার আগেই।'

'কেন চলে যাবে পিসিমণি?'

'না গিয়ে যে উপায় নেই বাবা।'

উঠোনের দক্ষিণে জোড়া নিমগাছ। পাশাপাশি যমজ শিশুর মতো বহুদিন ধরে দাঁড়িয়ে আছে। নিমতলায় কাঠের একটা পুরনো বেঞ্চ পাতা আছে। তার দু'পাশে বেশ কিছু ফুলের ঝাড়—হাসনুহেনা, গন্ধরাজ, বেলি, কামিনী, জবা। বড় একটা শিউলি ঝাড়ও আছে। গাছ ভর্তি ফুল ফুটে আছে। নিশিরাতের হাওয়ায় ফুলের গন্ধ ভাসছে। মন মাতাল করা গন্ধ। চাঁদের আলোয় ফকফক করছে চারদিক।

'তোর মনে আছে অর্জুন, এরকম জ্যোৎস্না রাতে তোকে নিয়ে আমি নিমতলার বেঞ্চটায় এসে বসতাম। তুই আমার কোলে মাথা দিয়ে পাতালপুরীর গল্প শুনতে চাইতি।'

'সব মনে আছে পিসিমণি। আমি তোমার একটা কথাও ভুলিনি। রোজ তোমার কথা ভাবি। নদীর দিকে তাকিয়ে, ওদিকটায় গেলে রোজ তোমার জন্য আমার কান্না পায়।'

'আমি জানি বাবা। আয়, আমি বেঞ্চটায় বসি আর তুই আমার কোলে মাথা দিয়ে শো। আজ আমি তোকে খুব সুন্দর একটা পাতালপুরীর গল্প বলব।'

মাটির উঠোন চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে। বড়ঘরের বারান্দায় গৌতম আর প্রতিমা পাথরের মূর্তি হয়ে বসে আছে। তবে শিউলির সবকথা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে তারা।

নিমের পাতায় ঝিরঝিরে হাওয়া আর চাঁদের আলো গলে গলে পড়ছে পাতার ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে। নিঝুম রাত। শুধু ঝিঁঝিপোকারা নিজেদের নিয়মে ডেকে যাচ্ছে।

অর্জুন পিসিমণির কোলে মাথা রেখে বলল, 'গল্প বলার আগে তুমি নিজের কথা বলছ না কেন পিসিমণি? তুমি জলে ডুবে গেলে। কেউ তোমাকে খুঁজে পেল না। সবাই জানল তুমি মারা গেছ। তাহলে এতদিন পর তুমি কোত্থেকে এলে? ছিলে কোথায়? আবার বলছ ভোর হওয়ার আগে চলে যাবে। কোথায় চলে যাবে, পিসিমণি?'

'সেই গল্পটাই তোকে বলব। এও পাতালপুরীরই গল্প। আমি পাতালপুরীতে চলে গেছি রে। সেখানেই থাকি। সেখানেই ফিরে যাব। শুধু গল্পটা তোকে বলবার জন্য এভাবে এতরাতে এসেছি।'

'গল্পটা তা হলে বলো।'

বড়ঘরের বারান্দায় বসা গৌতম আর প্রতিমা শিউলির কথা সবই শুনতে পাচ্ছে।

'সেদিন স্নানে নামার কিছুক্ষণ পর গলাজলে ডুব দিয়েছি। দিয়ে দেখি অদ্ভুত এক দৃশ্য। আমার চারপাশে কুড়ি-পঁচিশটি ফুটফুটে মেয়ে। আর প্রত্যেকের চেহারাই যেন একরকম। গায়ের রং চাঁদের আলোর মতো। টানা টানা চোখ। খাড়া নাক। লাল টুকটুকে ঠোঁট। মাথা ভর্তি ঘন নীলচে চুল। কিন্তু আকৃতিতে সবাই ছোট। একই মাপের। আমার কোমর সমান হবে। তারা সবাই আমাকে ঘিরে ধরেছে। তাদের গলার স্বর অতি মৃদু। প্রত্যেকেই নিজেদের মধ্যে হাসিমুখে কথা বলছে। কিন্তু তাদের ভাষা কিছুই আমি বুঝতে পারছি না।

তারপরেই দেখলাম, তারা কয়েকজন মিলে আমার দু'হাত ধরে আছে আর অন্যরা চারপাশে ঘিরে আছে। আমাকে যেন ঠেলে ঠেলে তারা কোথাও একটা নিয়ে যেতে চাইছে। নিজের অজান্তে আমিও যেন তাদের সঙ্গে চলতে শুরু করেছি। তারপর হঠাৎ আমার খুব ঘুম পেল। কিছুতেই চোখ খোলা রাখতে পারলাম না।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না। চোখ খুলে দেখি রূপকথার গল্পের

মতো বিশাল এক রাজপ্রাসাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। আমার চারপাশে তখন সেই ছোট ছোট ফুটফুটে মেয়েগুলোর সংখ্যা আরও বেড়েছে। ওরা আমার হাত ধরছে। আমাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছে।

এমন সময় প্রাসাদের ভিতর থেকে ওরকম আরও পাঁচটি মেয়ে এল। আমাকে ওরা প্রাসাদের ভিতরে নিয়ে গেল। বিশাল এক রাজদরবার। সিংহাসনে বসে আছেন ওরকমই একজন। তবে তিনি অন্যদের তুলনায় লম্বা। আমার গলা সমান হবেন। তাঁর মাথার রাজমুকুট। বোঝা যায়, তিনি এই রাজ্যের প্রধান। পরে জেনেছি তিনিই রানিমা। তবে এই রাজ্যে কারও বয়স বাড়ে না। রানিমার বয়স কত কেউ জানে না।

আমাকে দেখে তিনি অপলকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। পারিষদদের সঙ্গে কিছু আলোচনা করলেন। যে পাঁচজন আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল তাদেরকে ইশারা করলেন। তারা আমাকে নিয়ে গেল ছবির মতো সুন্দর একটা ঘরে। রূপকথার রাজকন্যারা যেমন ঘরে থাকে ঠিক তেমন। তারপর খাবার আর সুন্দর বিছানা পেতেই আমি গভীর ঘুমে ডুবে গেলাম।'

একটু থামল শিউলি। কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে সেই আগের রাতগুলোর মতো অর্জুনের মাথায় হাত বুলাচ্ছিল সে। অর্জুন মন্ত্রমুগ্ধের মতো পিসিমণির কথা শুনছে।

শিউলি আবার বলতে লাগল তাঁর কথা। 'আমার ঘুম ভাঙল পরদিন সকালে। ঘুম ভাঙার পর দেখি আমার পালঙ্কের পাশে সাত-আটজন মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অপলক চোখে আমাকে দেখছে।

বিছানায় উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গে ওরা কেউ কেউ আমার হাত ধরল। কেউ রাজকীয় স্নানঘর দেখিয়ে দিল। নতুন পোশাক, জুতো, যা যা লাগে সব এনে দিল।

স্নানঘর থেকে আমি বেরোলাম সম্পূর্ণ নতুন মানুষ হয়ে। একেবারে রূপকথার রাজকন্যার রূপে।

ওরা আমাকে বিশাল একটা আয়নার সামনে নিয়ে গেল। আয়নায় নিজের চেহারা দেখে আমি অবাক! মাত্র একরাতেই আমি অনেকখানি বদলে গেছি। গায়ের রং যেন অনেকটা ফর্সা হয়ে গেছে। শরীরেও বাড়ির ঝিয়ের সেই রূপটা নেই। সবই বদলে গেছে।

তারপর ওরা আমাকে নিয়ে গেল প্রাসাদ দেখাতে। ঘুরে ঘুরে সব দেখলাম আমি। তবে বিশাল ওই প্রাসাদ একদিনে দেখা সম্ভব নয়, পুরো চিনে উঠতে আমার একমাস লেগে গেল।

আশ্চর্য ব্যাপার, ততদিনে ওদের ভাষাটা আমি শিখে ফেলেছি। ওদের মতো করে কথা বলতে পারি। তাতে রানিমা যেমন খুশি, প্রাসাদের সবাই তেমন খুশি। আর ততদিনে আমার চেহারা আরও বদলে গেছে।

প্রাসাদে সব মিলিয়ে আড়াইশোর মতো মেয়ে। কোনও পাহারাদার নেই, কোনও অস্ত্র নেই। কোথাও কোনও অনিয়ম নেই, কোলাহল নেই। ঝগড়াঝাটি মারামারি নেই, হিংসা অহংকার নেই, দুঃখ বেদনা নেই। দুর্ব্যবহার নেই, গালাগাল নেই। অর্থাৎ এই পৃথিবীর কোনও কলুষতা সেখানে নেই। সবাই সবাইকে ভালোবেসে বেঁচে আছে। লোভ কাকে বলে জানে না, মিথ্যা কাকে বলে জানে না। ঈর্ষা নেই। এ যেন এক স্বর্গরাজ্য। চারদিকে শুধুই আনন্দ আর আনন্দ। উৎসব আর উৎসব। মেয়েরা হাসছে, খেলছে। রানিমাও যোগ দিচ্ছেন তাদের সঙ্গে।

আমিও নিজের অজান্তে ওদের সঙ্গে মিশে গেছি ততদিনে। এই বাড়ির কথা আমার মনে নেই। মা-বাবার কথা মনে নেই। দাদা-বউদির কথা মনে নেই। মনে আছে শুধু তোর কথা। তোর কথা খুব মনে পড়ত আমার।

পাতালপুরীতে এমনভাবেই আমার দিন কাটতে লাগল। কিছুদিন পর জানতে পারলাম রানিমা বলেছেন, তাঁর রাজত্বের সময় শেষ হয়েছে। তাঁর জায়গায় আমাকে বসানো হবে সিংহাসনে। আমি হব পাতালপুরীর পরবর্তী রানিমা। শুনে রাজ্যের মেয়েরা আনন্দে ফেটে পড়ল। তারা নাকি আগেই জানত এই ঘটনা ঘটতে চলেছে। এবং সেই কারণেই তারা আমাকে এই রাজ্যে নিয়ে এসেছে।'

আবার একটু থামল শিউলি। একবার অর্জুনের মুখের দিকে তাকাল। নিমপাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদের এক টুকরো আলো এসে পড়েছে তার মুখে। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে ছেলেটাকে।

একবার দাদা-বউদির দিকেও তাকাল সে। আগের মতোই অবস্থা তাদের।

শিউলি বলল, 'তখন আমার শুধু তোর কথা মনে পড়ত, অর্জুন। তুই প্রতিদিন আমার কথা ভাবিস, নদীতীরে দাঁড়িয়ে আমার জন্য কাঁদিস। আমাকে স্বপ্ন দেখিস, সব আমি টের পাই। এখান থেকে ফিরে গিয়েই আমি পাতালপুরীর রানিমা হয়ে যাব। তাই ভাবলাম তোর সঙ্গে এসে কয়েকঘণ্টা সময় কাটিয়ে যাই। তোকে আমার জীবনের এই আশ্চর্য ঘটনাটা বলে যাই। আর কোনওদিন তোর কাছে আসা হবে না আমার। তবে প্রতিদিনই মনে মনে তোর সঙ্গে আমি কথা বলব। তুইও বলতে পারবি আমার সঙ্গে। পাতালপুরী থেকে আমি তোর সব কথা শুনতে পাব। তুইও শুনতে পাবি আমার সব কথা। রাত শেষ হয়ে আসছে। এখনই দেখা যাবে শুকতারা। আমাকে চলে যেতে হবে। আমি জানি, তুই আমার জন্য খুব কাঁদবি। কাঁদিস না বাবা। তোর পিসিমণি পাতালপুরীর রানিমা। কত সুখে আছে সে, একথা ভেবে আনন্দে থাকবি।'

অর্জুনের দু' চোখ বেয়ে তখন জলের ধারা নামছে। গভীর মমতায় তার চোখ মুছিয়ে দিল শিউলি। 'কাঁদিস না বাবা, কাঁদিস না। ওই দেখ তোর মা-বাবাও কাঁদছে। তারা কাঁদছে অপরাধবোধ থেকে। তবে তাদের দুর্ব্যবহারের কথা আমি মনে রাখিনি। আমি সব ভুলে গেছি। পাতালপুরীর মানুষ কোনও খারাপ স্মৃতি মনে রাখে না। ওঠ বাবা। আমাকে যেতে হবে।'

অর্জুন উঠে বসল। বলল, 'চলো, আমি তোমাকে তা হলে একটু এগিয়ে দিই।'

'আয়।'

অর্জুনের হাত ধরে নদীর দিকে হাঁটতে লাগল শিউলি। নদীতীরে এসে বলল, 'আমি যে এভাবে তোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম, একথা কাউকে বলিস না বাবা।'

'না, বলব না পিসিমণি। বললে কেউ বিশ্বাসও করবে না।'

শিউলি হাসল। 'ঠিক, একদম ঠিক। তুই খুব বুদ্ধিমান ছেলে। জীবনে তুই অনেক বড় হবি। মনে রাখবি, আমি তোর সঙ্গে সবসময় আছি।'

'কিন্তু তুমি এখন পাতালপুরীতে যাবে কীভাবে?'

'যেভাবে এসেছিলাম। ওই দেখ, ওরা আমার জন্য অপেক্ষা করছে।'

অর্জুন নদীর দিকে তাকাল। চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখতে পেল হাঁটুজলে কুড়ি-পঁচিশটি ছোট ছোট মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শিউলিকে দেখেই আনন্দে ফেটে পড়ল তারা। নিজেদের ভাষায় সেই আনন্দ প্রকাশ করল। অর্জুনকে আদর করে, তার কপালে চুমু খেয়ে নদীতে নামল শিউলি। ছোট মেয়েগুলো চারপাশ থেকে তাকে ঘিরে ধরল। ধীরে ধীরে গলাজলে চলে গেল শিউলি। অর্জুনের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল। তার পর ডুব দিল।

পিসিমণি চলে যাওয়ার পরও খানিকক্ষণ নদীতীরে দাঁড়িয়ে রইল অর্জুন। চোখ মুছে বাড়ির দিকে ঘুরল, দেখে বাবা-মা এসে দাঁড়িয়েছে তার পিছনে। তাদের চোখেও জল।

পরদিন সকালে গৌতম আর প্রতিমা অনেককেই শিউলির ফিরে আসার ঘটনা বলতে চাইল। আশ্চর্য ব্যাপার, যখনই বলতে চায়, তখনই তাদের গলা বন্ধ হয়ে যায়। কোনও শব্দ বেরোয় না। ব্যাপারটা খেয়াল করে অর্জুন মিটিমিটি হাসে। সে জানে এসবই পাতালপুরীর নতুন রানিমা শিউলি পিসিমণির কাজ। **কিশোর ভারতী**

সাদাত হোসাইন বাংলাদেশ

সবার সেরা

একটা ঘড়ির খুব শখ।

কেসিও ঘড়ি। স্টিলের সরু চেইনওয়ালা ডিজিটাল ঘড়ি। হাতের কব্জির ওপর ফুলের মতন ফুটে থাকে। দেখতে কী যে সুন্দর লাগে!

রতনের আব্বা বিদেশ থেকে রতনের জন্য এই ঘড়ি পাঠিয়েছে। রতন টাইম দেখতে জানে না, কিন্তু সেই ঘড়ি হাতে ফুলবাবু সেজে ঘুরে বেড়ায়। আমাকে দেখলেই বলে, এই ঘড়ির দাম সবচেয়ে বেশি, বুঝছস?

আমি বলি, ক্যান? বেশি ক্যান? ঘড়ি তো ইট্টুহানি। দাম বেশি হইব ক্যান?

রতন বলে, এহ, আইছে! এইডা কি বাংলা ঘড়ি পাইছ? এইডা হইল ইংরাজি ঘড়ি।

আমি বলি, ঘড়ির আবার বাংলা-ইংরাজি কী?

রতন বলে, যেই ঘড়িতে কাটা ঘোরে, সেই ঘড়ি হইল বাংলা ঘড়ি। দাম কম। আর যেই ঘড়িতে ইংরাজি অক্ষর ওঠে, সেই ঘড়ি হইল

ছবিঃ সামন্তক চট্টোপাধ্যায়

মঞ্জিস রায়

অন্য ঋতু

শীতেই যদি কদম ফোটে
জল জমে যায় রাস্তা জুড়ে,
বর্ষাকালে আকাশ থেকে
মেঘগুলো সব পালায় উড়ে

শরৎ শেষে হিমেল সুরে
হয় না যে আর পদ্য লেখা
জ্যৈষ্ঠমাসে হঠাৎ কেন
শিউলিফুলের পেলাম দেখা?

এমনভাবে নিয়ম ভুলে
যাচ্ছে সবই উল্টো দিকে
সৃষ্টিছাড়া ঝড়ের খেলা
আঘাত করে পৃথিবীকে

এসব নিয়ে অনেক ভেবে
প্রশ্ন করি, পাই না সাড়া
নেই যে সময় জবাব দেওয়ার
সবার আছে কাজের তাড়া।

নুরজামান শাহ

স্বপ্নমালার নতুন দেশে

শহরতলির চোখ ধাঁধানো রঙবেরঙের আলো,
চতুর্দিকের চেনা ছবি লাগে যে জমকালো।
ফ্ল্যাটবাড়িটার চার দেওয়ালে বন্দি ঘরের মাঝে,
দূরের আকাশ স্বপ্ন হয়ে মনের কোণে বাজে।
ইচ্ছে করে এক টুকরো আসমানি রঙ মেখে,
মেঘের গায়ে পাহাড়তলির দিই ছবিটা এঁকে।
ব্যালকনির ওই জানলা খুলে অনেকখানি দূরে,
ইচ্ছেজাহাজ চেপে আমি যাই নিমেষে উড়ে।
স্বপ্নমালার নতুন দেশে রঙ ছড়ানো নীলে,
মেঘের ফাঁকে হারিয়ে যাব বন্ধু দুজন মিলে।

ছবিঃ সৌজন্য চক্রবর্তী

ইংরাজি ঘড়ি। দাম বেশি।

আমি রতনের জ্ঞান-গরিমায় মুগ্ধ। প্রবল মুগ্ধতা নিয়ে জিগ্যেস করি, এখন কয়টা বাজে?

রতন হাতের উল্টোপিঠে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থেকে ঘড়ি দেখল। তারপর ভাব গম্ভীর মুখে বলল, এগারো তিরিশ।

আনোয়ার চাচা ইশকুলে যাচ্ছেন, আমি দৌড়ে গিয়ে তাকে বললাম, ও মাস্টার চাচা, এখন কয়টা বাজে?

তিনি বললেন, প্রায় দশটা বাজে রে ব্যাটা। মানে, দশটা বাজতে ইট্টু বাকি আছে। ১৫ মিনিট। ১৫ মিনিট পরেই ১০টা বাজব!

আমি ভুরু উঁচিয়ে রতনের দিকে তাকাই, 'কী রে, দেখলি? তুই তো টাইমই চিনস না। আবার ঘড়িও হাতে দেস!

রতন দীর্ঘক্ষণ কোনো কথা বলল না। চুপচাপ নীচের দিকে তাকিয়ে বসে রইল। তারপর হঠাৎ মুখ তুলে রাশভারী গলায় বলল, তোর কোনোদিন জ্ঞান-বুদ্ধি হইব না। ইংরাজি আর বাংলা ঘড়ির টাইম কি সমান হইব কোনোদিন? দামি জিনিস আর সস্তা জিনিসের দাম কি সমান হয়? এই জন্য ইংরাজি ঘড়িতে বাংলা ঘড়ির চেয়ে সবসময় বেশি টাইম বাজে!

অকাট্য যুক্তি!

এই যুক্তি ফেলে দেওয়ার কোনো সুযোগই নেই। একটা বেশি দামি ইংরাজি ঘড়ির আফসোস বুকে চেপে আমি রতনের দিকে তাকিয়ে থাকি।

বাড়ি ফিরে আম্মাকে বললাম ঘড়ির কথা। আম্মা আমাকে বুকের সঙ্গে জাপটে ধরে ফিসফিস করে বললেন, আমার আব্বুর কাছে সবচেয়ে বেশি দামি কী?

এই প্রশ্ন এবং উত্তরের খেলা আমরা মাতা-পুত্র অসংখ্যবার খেলেছি। আবারও খেললাম। আমি গাল ফুলিয়ে বললাম, তুমি।

আম্মা বললেন, তাইলে আমি আমার আব্বুকে যা দিব, সেইটা কি সবচেয়ে বেশি দামি না?

আমি কিছুক্ষণ বিভ্রান্ত চোখে তাকিয়ে থেকে উপর-নীচ মাথা দোলালাম। আম্মা তার আঁচলের তলা থেকে নারকেল পাতা দিয়ে বানানো এক ঘড়ি বের করলেন। তারপর আমার হাতে পরিয়ে দিতে দিতে বললেন, তাইলে, এইটা এখন কী? সবচেয়ে দামি ঘড়ি না?

আমি কোনো কথা বললাম না। সেই ছোট্ট আমি কী বুঝেছিলাম, জানি না। তবে চুপ করে বসে ছিলাম আম্মার কোলে। পরদিন রতনের সঙ্গে দেখা হতেই রতনকে জিগ্যেস করলাম, তোর ঘড়িতে কয়টা বাজে?

রতন আগেরদিনের মতোই বলল, এগারো তিরিশ।

আমি বললাম, মাত্র এগারো তিরিশ? আমারটায় কয়টা বাজে জানস?

রতন অবাক চোখে আমার হাতের দিকে তাকাল। আমার হাতে কী এটা! তারপর মুখভর্তি তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, ঘ...ড়ি? এইডা ঘ... ড়ি? হুহ! তোর এই ঘড়িতে আবার বাজেও, কয়টা বাজে?

আমি অনেকক্ষণ সেই নারকেল পাতার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রইলাম, তারপর বললাম, একলক্ষ এগারো তিরিশ বাজে।

রতন চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, যাঃ! এত কোনোদিন বাজে নাকি!

আমি বললাম, বাজে। দামি ঘড়ি হইলে বাজে! এইটা তো পৃথিবীর সবচেয়ে দামি ঘড়ি।

ছবিঃ রঞ্জন দত্ত

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বাংলাদেশ

ওলট পালট একটা দিন

আজ অনেকদিন পর রাফিকে গাড়ি চালিয়ে স্কুলে পৌঁছে দিলেন তার বাবা। অন্য দিন যখন সে স্কুলে রওনা হয়, বাবা তখন বেঘোর ঘুমে। আজ ভোরে ড্রাইভার মা'কে ফোন করে জানিয়েছে, তার স্ত্রীকে নিয়ে সে হাসপাতালে যাচ্ছে। ফোনটা পেয়ে মা'র কপালে চিন্তার ভাঁজ। রাফিকে তাহলে কে স্কুলে নিয়ে যাবে? শেষ পর্যন্ত রাফির বাবাকে ডেকে তুলতেই হল। তিনি মহাবিরক্ত। বললেন, 'অপুকে বলো, স্ত্রীকে কারো জিম্মায় রেখে এসে সকালের ডিউটি করুক।'

এ আবার বলা যায় নাকি! 'রাফি বরং দেরিতেই যাক,' তিনি বললেন, 'তুমি যখন অফিসে যাবে, ওকে নামিয়ে দিও।'

রাফির বাবা ব্যবসায়ী। নয়টায় তার গাড়ি আসে। সাড়ে ন'টায় বেরিয়ে যান। মানুষটা খুব কড়া। স্কুলে দেরি করা, পছন্দ করেন না। দুনিয়ার বিরক্তি নিয়ে তিনি উঠলেন। রাফিকে তাড়া দিলেন, 'অনেকদিন পর গাড়ি চালাব। হাতে সময় নিয়ে রওনা হতে হবে।'

যত ঘুম মাখা চোখে রাফি তার সকালটা শুরু করুক না কেন, তাতে বেশ একটা ছন্দ থাকে। ছন্দটা তৈরি করে দেন মা। তিনি ভোরে উঠে গলা সাধতে বসেন। তার ঘুমের মধ্যে সেই গলার সুর আর তানপুরার তান পৌঁছে যায়। আজ সুরের জায়গাটা বাবার রাগ দখল করে নিয়েছে।

গাড়িতে বসে রাফি দেখল, বাবার মেজাজটা চড়েই আছে। কোথাও জ্যামে পড়লে বিরক্ত হচ্ছেন, বিরক্তিটা আবার প্রকাশ করছেন ইংরেজি ভাষায়। ইংরেজি বলাতেই তিনি স্বস্তি পান। রাফিকে একটা ইংরেজি মাধ্যমের বনেদি স্কুলে পড়াচ্ছেন, যে স্কুলে তিনিও পড়েছেন।

পুরোনো ঢাকার রাস্তাগুলি একটু সরু, কিন্তু সেগুলোতে সকাল থেকেই যানবাহন আর পায়ে চলা মানুষজনের কাফেলা শুরু হয়ে যায়। ড্রাইভার অপু ভাই এই ভিড়টাকে পছন্দ করে। পায়ে চলা লোকদের সঙ্গে কৌতুক করে। কিন্তু রাফির বাবার এসবের সময় নেই। লোকজনকে, যানবাহনের চালক-যাত্রী সবাইকে ইংরেজিতে শাপান্ত করছেন। একসময় রাফিদের গাড়িকে পাশ কাটিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ি চলে গেলে তিনি নিজেকে আর সামলে রাখতে পারলেন না। রেগেমেগে বললেন, 'এই

পোড়ার শহরে মানুষ কী করে থাকে, বল? এই রাস্তায় ইলেকট্রিক হাইব্রিড গাড়ি চলে, আবার তিনশো বছর আগের লক্কর-ঝক্কর ঘোড়ার গাড়িও চলে। এটা একটা সার্কাস।'

বাবা ইংরেজিতেই বললেন। রাফি নিজের মতো অনুবাদ করে নিল। এটি তার একটা অভ্যাস। বাড়িতে বাবা প্রায়ই ইংরেজি বলেন, মা বলেন বাংলা। সে বাবার কথাগুলি বাংলায় তর্জমা করে, মায়ের কথাগুলি ইংরেজিতে। বাবা-মা যখন কথা বলেন, তাদের কথার মাঝখানে ঢুকে পড়া তার এবং বোন টুম্পার বারণ।

তবে রাফির কানে বাবার কথা ঢুকল না। কারণ তার চোখ গেল তার বয়সি একটা ছেলের দিকে, যার দুই হাতে চার-পাঁচটা ছোট পানির বোতল। এই ছেলেটাকে সে আগেও দেখেছে। মাথাভর্তি কোকড়ানো চুল। রংটা ফর্সা। চোখ দু'টি উজ্জ্বল, যেন সকালের আলোটা সেখানে আটকে গেছে।

ছেলেটা এগিয়ে আসছে রাফিদের গাড়ির দিকে। 'লাগব পানি, পানি, ঠান্ডা পানি?'

গাড়িতে এসি চলছে। হঠাৎ রাফির তেষ্টা পেল। বাবাকে বলল, 'বাবা, একটা পানি কিনতে পারি?'

বাবা অবাক হলেন, 'কেন বাসা থেকে খেয়ে আসোনি?'

'তেষ্টা পেয়েছে বাবা।'

'কোন ডোবা থেকে বোতলে পানি ভরে বিক্রি করছে। স্কুলে গিয়ে খেও।'

ছেলেটা বোধহয় বুঝতে পারল, গাড়িতে বসা দুজন মানুষ তাকে নিয়েই কথা বলছে। সে রাফির দিকে তাকিয়ে হাসল। রাফি বুঝল, বাবা বিষয়টা অপছন্দ করছেন। সে ইশারা করল, পানি লাগবে না।

স্কুলে নেমে ব্যাগটাকে তার অনেক ভারী মনে হল।

দিন দশেক পর ছেলেটাকে আবার দেখল রাফি। এবার গাড়ি চালাচ্ছে অপু ভাই। সে জানালা খুলে ছেলেটাকে ডাকল।

'পানি কিনবে? কেন?' অপু জিগ্যেস করল।

'তোমার জন্য।' রাফি বলল, 'আজ ভীষণ গরম।'

অপু কিছু বলার আগে ছেলেটি এসে উপস্থিত হল। 'এক বোতল পানি দাওতো,' রাফি কুড়ি টাকার একটা নোট এগিয়ে দিল।ছেলেটা পানির বোতল দিয়ে পাঁচ টাকা ফেরত দিল। 'টাকাটা তুমি রেখে দাও,' রাফি বলল। ছেলেটি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'না।'

রাফি দেখল, তার ব্যাগের দিকে ছেলেটি তাকিয়ে আছে। 'ব্যাগটা তোমার পছন্দ হয়েছে? তুমি চাইলে তোমার জন্য কাল একটা ব্যাগ নিয়ে আসতে পারি?'

'না-না,' ছেলেটি বলল। 'ব্যাগ দিয়া কি করমু? আমি ইশকুলয়ে পড়ি না।'

স্কুলে নেমে ব্যাগটাকে আজ একমণ ভারী মনে হল রাফির।

ভাদ্র শেষ, আশ্বিনের অর্ধেক গেল। আরও তিনবার ছেলেটির সঙ্গে দেখা হল। এতদিনে তাদের কথা এগিয়েছে। ছেলেটির নাম জানা হল রাফির। চুপ্পু।

'আমি বউত দিন কথা কইবার পারতাম না। এই জন্য মায় আমারে চুপ্পু ডাকত।'

'মা কোথায় থাকেন?'

'কইতারমু না। চইল্যা গেছে।'

'তুমি কোথায় থাকো?'

বাহাদুর শাহ পার্কের দিকে দেখাল চুপ্পু, 'ওইহানে।'

মা দেখেছেন, মাস দুয়েক থেকে রাফি বদলে যাচ্ছে। এমনকী সাত বছরের টুম্পাও বলেছে, 'ভাইয়া কীসব যেন চিন্তা করে, মা।'

একদিন রাফি মাকে জিগ্যেস করল, 'তুমি ইংরেজি গান গাও না কেন, মা?'

'সেকিরে! ইংরেজি গান কেন গাইব?'

'তাহলে এতো এতো ইংরেজি শেখা কেন?'

'ইংরেজি না শিখলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দুনিয়াতে কীভাবে ঢুকবে বাবা।'

কলেজে ক্লাস নেওয়ার ফাঁকে রাফির মা একটা ফোন পেলেন অপুর থেকে। আজ জেলা আদালতে একটা বিরাট ঝামেলা হয়েছে। একটা কঠিন জট সৃষ্টি হয়েছে। তারপরও অপু বলল, 'ম্যানেজ হয়ে যাবে।'

অপু ভাইয়ের মুখে এই কথাটা শুনে রাফি খুব আমোদ পায়। মা বলেন, 'অপুর সঙ্গে পাঁচ মিনিট কথা বললে মনে হয় পৃথিবীতে সব ম্যানেজ হয়ে গেছে।'

তবে ম্যানেজ ঠিকই হল, কারণ এর মধ্যে হাজির হল চুপ্পু। রাফি অপুকে বলল, 'আজ একটু নামি গাড়ি থেকে, অপু ভাই।'

'নামতে পারো।' অপু বলল, 'কিন্তু এইখানেই থাকো।

অপু দেখল, রাফি আর চুপ্পু পাশাপাশি বসেছে, সিমেন্টের নীচু একটা বেঞ্চে। দু'জনে কথা বলছে, হাসছে। কিছুক্ষণ পর রাফি পকেট থেকে টাকা বের করে বাদাম কিনল।

এদিকে পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে। একদল ছাত্র লাঠিসোটা হাতে হইচই করতে করতে এগিয়ে গেল।

অপু জানল, সোয়ারি ঘাটের এক তেল ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। আজ তাকে আদালতে তোলা হয়েছিল। চার-পাঁচজন পুলিশের হাত থেকে তাকে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল। তা সম্ভব না হওয়ায় তারা পুলিশের দিকে ইটপাটকেল ছুড়তে থাকে। এদের ছোঁড়া ইটে এক কলেজ ছাত্রের মাথা ফেটে যায়। সে খবর শুনে দলে দলে কলেজের ছাত্ররা এসেছে।

অপু জানে, মারামারিটা তাণ্ডবে রূপ নিলে তার গাড়িটা আস্ত থাকবে না। সে রাফিকে ডাকল, কিন্তু তার ডাক রাফির কানে পৌঁছাল না।

'মা'র কোনো খোঁজ পাওনি, না?' রাফি জিগ্যেস করল।

'আমার মন কয় মা কাওরান বাজার আছে। কিন্তু বাজারটা ঝামেলার, কেউ কথা শুনবার চায় না।'

'মাকে দেখলে চিনতে পারবে?'

'হ। এইডা হইতে পারে নাও হইতে পারে।'

'তোমার মন খারাপ হয় না?'

'মন থাকলে না খারাপ হইব। আমাগো মতো পুলাপানের শুধু শইলডা থাহে।'

এই সময় কয়েকটা গুলির শব্দ সব শব্দকে ছাপিয়ে গেল।

'চুপ্পু, শব্দটা কীসের?'

'পুলিশ গুলি মারতাছে। তয় এইগুলা ফাঁকা গুলি। ডর দেখাইবার লাইগা।'

চুপ্পুর নির্লিপ্ত ভাব রাফির আতঙ্কটা তরল করে দিল। সে জানতে চাইল বাহাদুর শাহ পার্কের কোথায় সে থাকে। চুপ্পু যা বলল, তাতে রাফি যেন অবাক হতেও ভুলে গেল। পার্কের একদিকে সিমেন্টের তৈরি তিন-চারটি বড় ড্রেন-পাইপ রাখা। তার একটিতে সে থাকে।

'পাইপের ভিতরে থাকা যায়?'

'থাহন যায়। তুমি পারবা না, কিন্তু আমার লাইগা পাইপটা হইল সুনারগা হোটেল।'

'তুমি সাঁতার জানো?' রাফি জিগ্যেস করল।

'সাতার?' চুপ্পু জিগ্যেস করল, কিছুটা অবাক হয়েই, 'মাছের লাহান।'

অপুকে রাফির বাবা ফোন করেছেন। তিনি আতঙ্কিত! কোন টিভি চ্যানেলে গন্ডগোলের খবরটা দেখেছেন। 'অপু পড়ল বিপদে। কী করে সে বলে, গাড়ির দরজা খুলতে পারছে না, আর রাফি আছে বাইরে। হঠাৎ প্রচণ্ড একটা শব্দ, সঙ্গে প্রচুর ধোঁয়া। কে একজন চিৎকার দিয়ে বলল, 'টিয়ারগ্যাস!'

টিয়ারগ্যাস পড়া শুরু হলে রাফির মনে হল, চোখ ফেটে যাবে। সে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করল। চুপ্পু তার হাত ধরে পার্কের পেছনের দিকে নিয়ে গেল। পার্কের পেছনে তার সেই পাইপঘর। পাইপের মুখটা একটা কাপড় দিয়ে ঢাকা। পাশেই একটা ড্রামে পানি রাখা। রাফির মাথাটা সেই পানিতে ডুবিয়ে সে বলল, 'খবরদার, চউখ ডলবানা।'

চোখে পানি যাওয়ায় রাফির কষ্ট কমল। কিছুক্ষণ মাটিতে বসে ধাতস্থ হল রাফি। তার পাশে চুপ্পুও বসল।

রাফির মনে পড়ল, তার ব্যাগে টিস্যু পেপার আছে। কিছু চকলেটও আছে। সে ব্যাগ থেকে টিস্যু পেপার বের করে চোখ মুছল। চুপ্পুকে চকলেট দিল। কিটক্যাট। নিজেও র‍্যাপার খুলে একটাতে কামড় দিল।

'এইগুলা তুমি ডেইলি খাও?'

উত্তর দিতে গিয়ে খুব লজ্জা লাগল রাফির।

বিপদ কিন্তু কাটল না। আরেক প্রস্ত টিয়ারগ্যাস ছোঁড়া শুরু করল পুলিশ।

এবার দাঁড়িয়ে রাফির ব্যাগটা হাতে নিল চুপ্পু। ব্যাগটা কাঁধে ফেলে হাঁটতে তার ভারি আরাম হচ্ছে। রাফি যখন ব্যাগটা খোলে, সে দেখেছে ভেতরে বই। বই দেখে তার চোখের সামনে যেন একটা কুয়াশার আস্তরণের ভেতর দিয়ে ভেসে উঠল বাদামি রঙের দু'-তিনটি বই আর এক-পা ভাঙা একটা টেবিলের ছবি। কোন সে দিনের? কার জীবনের?

'কোথায় যাব চুপ্পু?'

'চল, নদীত যাই। যাইবা?'

আত্মহারা হল রাফি। কতদিন সে ভেবেছে স্কুল থেকে ফেরার পথে বুড়িগঙ্গাকে একবার ছুঁয়ে যাবে। এত কাছে, অথচ এত দূরে!

অপু সিদ্ধান্ত নিল, সত্যি কথাটাই রাফির বাবাকে বলবে, তবে সবটা না। সে বলল, গাড়িতে বসে বসে রাফি বিরক্ত হচ্ছিল, হঠাৎ নেমে গেছে। তারপর পার্কের গেইটে সে চুপ্পু নামে যে ছেলেটা পানির বোতল বিক্রি করে, তার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছে। কিন্তু টিয়ারগ্যাস মারা শুরু হলে সে পার্কের ভেতরে চলে গেছে।

অপুর কথা শুনে রাফির বাবা যেন এক আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটালেন। সেই বোমা অপুকে শুইয়ে দিল। সে শুধু শুনল, 'কী? কী? কী?' তার হাত থেকে ফোনটাও যেন ছিটকে পড়ল। তার নির্ঘাৎ মনে হল সত্যের পথে সে শহিদ হতে চলেছে।

হাঁটতে হাঁটতে চুপ্পু আর রাফি বুড়িগঙ্গায় পৌঁছে গেল। এত হাঁটা রাফি জীবনে হাঁটেনি। তার মনে হল, দুই পায়ের গোড়ালিতে নিশ্চয় ফোসকা পড়ে যাবে। সদরঘাট থেকে সামান্য দূরে একটা জায়গায় তারা নদীতে নামল। নামার আগে রাফি তার টাই খুলল, তারপর নদীর উপর ঝুঁকে পড়া একটা গাছের ডালের সঙ্গে সেটি বেঁধে দিল। 'দেখলে চুপ্পু, গাছের গলায় টাইটা কি সুন্দর লাগছে?' বলে সে হাসল। চুপ্পুও। নদীতে নামার আগে রাফি ঝালমুড়ির দুটি বড় ঠোঙ্গা কিনল। তারপর জুতা মোজা খুলে নদীর পানিতে হাঁটু পর্যন্ত ডুবিয়ে তারা ঝালমুড়ি খেল। একসময় সে চুপ্পুকে বলল, 'তুমি কি ব্যাগটা নেবে না?' না নিলে ব্যাগটা আমি বুড়িগঙ্গায় ভাসিয়ে দেব।'

'না, বই পানিত ফালাইবার জিনিস না। ব্যাগটা অবশ্য ফালাইতে পারো।'

'ঠিক আছে, তাই হবে। ব্যাগটা ফেলে দেব। আর বইগুলি এখানে রেখে যাব।' রাফি বলল। আজ সারা বিকেল একটাই বোধ তাকে তাড়িয়ে নিচ্ছে। তা হল, বইখাতা সুদ্ধ ব্যাগটা, গলায় প্যাঁচানো টাইটা ছুঁড়ে দিতে পারলে যেন সে বেঁচে যাবে।

একসময় চুপ্পু বলল, 'চল'।

বাড়ি যাওয়ার কথায় কেন জানি টুম্পার চেহারা মনে এল রাফির। সন্ধ্যার মধ্যে না ফিরলে টুম্পা অস্থির হবে, কাঁদতে শুরু করবে।

ব্যাগটা হাতে নিয়ে বইগুলি বের করতে যাচ্ছিল রাফি। চুপ্পু রেগে গেল, 'কইছি না বইগুলান ব্যাগত থাকব, ব্যাগও থাকব। দেও, আমারে দেও।'

রাফি কিছু বলার আগেই ব্যাগটা নিল চুপ্পু। সেটি কাঁধে ফেলে সে হাঁটা দিল। তার কেন জানি মনে হল, এর ভেতরে বাদামি রঙের বইগুলি আছে, দু'-এক খাতা পেন্সিল আছে। এমনকী এক-পা হারানো টেবিলটাও। বইগুলি কার ছিল? সেগুলি ঘিরে একটা মায়াবী মুখ কেন সে দেখতে পায়? মুখটা কার?

কাঁধে ফেলা ব্যাগটাকে পাখির পালকের মতো হালকা মনে হচ্ছে। এই ব্যাগটা তাকে বইতেই হবে।

বাহাদুর শাহ পার্ক তন্নতন্ন করে খুঁজল অপু। তার রক্ত হিম হয়েই ছিল, এখন যেন জমে গেছে। সারাক্ষণ পিঠের মাঝখান দিয়ে ভয়ের একটা ঠান্ডা স্রোত নামছে। না, তার চাকরি হারানোর চিন্তা না, এমনকী এতবড় অবহেলার জন্য তাকে যে শাস্তি পেতে হবে, তা ভেবেও না, তার ভয় হচ্ছে রাফিকে নিয়ে। অনেক লোককে জিগ্যেস করেছে সে, চুপ্পুর বয়সি ছেলেদেরও। বেশিরভাগ উত্তর এসেছে, 'কইতে পারমু না ভাই।' দু-একটা ছেলে বলেছে রাফির বর্ণনার একজনকে দেখা গেছে চুপ্পুর সঙ্গে ওই দিকে চলে যেতে। একটি ছেলে বলল, যে ব্যাগটার কথা অপু বলছে, তা সে দেখেছে চুপ্পুর কাঁধে। এতে অপুর সন্দেহ হল, রাফি নির্ঘাত ছেলেধরা চক্রের হাতে পড়েছে। চুপ্পু তাদের এজেন্ট। সে রাফির মা'কে ফোন করে বলল। তিনি বললেন, পুলিশকে খবর দেয়া হয়েছে।

সন্ধ্যা নামার আগেই পুলিশ খবর পেয়ে গেল, চুপ্পু রাফিকে নিয়ে সদরঘাটের দিকে গেছে।

বুড়িগঙ্গার পার দিয়ে কিছুক্ষণ হাঁটার পর চুপ্পু বলল, 'তিন-চাইর মাইল হাঁটতে অইব, পারবা?'

'পারব না কেন?' তুমি পারলে আমিও পারব।' রাফির উত্তর।

হঠাৎ চুপ্পুর চোখ গেল নদীর দিকে। চোখ যাওয়ার কারণ তাকে কেউ ডাকছেন। ডাকটা শুনেই সে বুঝতে পেরেছে লক্ষণ কাকা। বয়স হয়েছে। কিন্তু এখনও নৌকা চালান। যারা বিকেল-সন্ধ্যায় বেড়াতে আসে, তাদের নিয়ে নদীতে চক্কর দেন। 'কাকায় ডাকতাছে,' বলে সে দৌড়ে নামল। রাফি গেল পিছু পিছু। 'কেমন আছইন কাকা?' চুপ্পু জিগ্যেস করল। উত্তর দেয়ার আগে লক্ষণ দেখলেন ব্যাগটাকে, তার পেছনে আসা রাফিকে। 'কী ব্যাপার চুপ্পু? কী করতাছ এইহানে?' 'এইডা আমার বন্ধু, কাকা। নওয়াবপুরে গন্ডগোল হইতাছে, পুলিশ টিয়ার মারতাছে। হে আটকা পড়ছিল। ওরে বাসা পৌঁছাই দিতে যাইতাছি।'

'তোমার বাসা কই বাবা?' লক্ষণ জিগ্যেস করলেন রাফিকে।

'জিগাতলা মোড়।' উত্তর দিল রাফি।

লক্ষণ হাসলেন। বললেন 'আয় চুপ্পু। নাওয়ে উইঠা বস, তোগোরে হাজারিবাগ পৌঁছাই দিমু। ওইহান থাইকা অল্পখানি পথ জিগাতলা মোড়। আয়।'

রাফি নৌকায় উঠতে উঠতে পকেট হাতড়ে দেখল পঞ্চাশ টাকার একটা নোট। নোটটা সে লক্ষণ কাকার দিকে এগিয়ে দিল। লক্ষণ কাকা হাসলেন, 'টেকাটা রাখো।এখন হাত-পা ছড়াইয়া বস। তুমরা দুইজন আইজ আমার প্যাসেঞ্জার।'

হাজারিবাগ নেমে চুপ্পু আর রাফি হাঁটা দিল। তাদের দু'জনের জানার কথা নয়, কী তুলকালাম হচ্ছে। রাফির বাবা থানা-পুলিশে দৌড়াদৌড়ি করছেন, অন্তত কুড়িজনকে লাগিয়েছেন রাফিকে খুঁজতে। এমনকী পুরোনো ঢাকার এক কাউন্সিলরকে মাঠে নামিয়েছেন।

ঠিক যখন ভাবছেন নিজেই বেরুবেন ছেলেকে খুঁজতে, চিৎকার ভেসে এল। এক সিকিউরিটি গার্ড তাদের ফ্ল্যাটের দিকে তাকিয়ে বলছে, 'ভাইয়া আইছে। ভাইয়া আয়া পড়ছে।' আরেক গার্ড ইন্টারকমে সেই সংবাদ দিচ্ছে। রাফির মা লিফটের জন্য অপেক্ষা না করে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নীচে নামলেন। টুম্পা গেল পিছু পিছু। গার্ডটা ঠিকই বলেছে, রাফি ফিরে এসেছে। সঙ্গে সেই চুপ্পু, যাকে তিনি প্রথম দেখলেন। চুপ্পুকে ধরে রেখেছে এক গার্ড। রাফি চিৎকার করে বলছে, 'ও আমার বন্ধু, ও কিছু করেনি। ওর হাত ছেড়ে দিন।'

রাফির মা প্রথমেই রাফিকে বুকে টেনে নিলেন। টুম্পা তাকে পেছন থেকে জাপ্টে ধরল, যেন একটা দুঃস্বপ্নের ইতি হল। রাফি বলল, 'এই আমার বন্ধু চুপ্পু, মা। ও আমাকে টিয়ারগ্যাস থেকে বাঁচিয়েছে।'

রাফির মা বুঝলেন। বললেন, 'চল, উপরে চল। ছেলেটাকে দেখে মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ কিছু খায়নি। তুমিও।'

লিফটের সামনে দাঁড়িয়ে রাফির মা ফোন করলেন রাফির বাবাকে। তারপর লিফটে উঠলেন।

রাফির মা ফ্রিজ থেকে নানান খাবার বের করলেন, সেগুলি গরম করে চুপ্পুকে খেতে দিলেন। রাফিকেও।

রাফি বলল, 'ওর মা হারিয়ে গেছে।'

'হারিয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ মা।'

'কোথায়?'

'চুপ্পু বলছে, সে জানে না।'

মা কিছুক্ষণ ভাবলেন। বললেন, 'একটা কিছু হবে বাবা, আমি কথা দিচ্ছি।'

চুপ্পুর কোনো ভাবান্তর হল না। সে উঠে দাঁড়াল, রাফিকে বলল 'যাই।'

রাফির মা ড্রয়ার থেকে একশো টাকার কিছু নোট চুপ্পুর হাতে দিলেন। চুপ্পু অবাক হল, কিন্তু টাকাটা ফিরিয়ে দিল। রাফি তার ব্যাগ থেকে বইখাতা বের করে খালি ব্যাগটা চুপ্পুর দিকে এগিয়ে দিল। 'এটা নিশ্চয়ই নেবে, নেবে না?'

'না-না। এইটা তোমার, আমি এইটা দিয়া কি করমু?'

রাফি দেখল, মা ইশারা করছেন চুপ্পুকে যেতে না দিতে। 'চুপ্পু, একটু দাঁড়াও, মা ফোন সেরে আসছেন।'

টুম্পাকে দেখা গেল এগিয়ে আসতে। বলল, 'তোমার নামটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। তুমি ভাইয়ার নতুন বন্ধু। তুমি কি জানো, তারও একটা ডাক নাম আছে?'

চুপ্পু আমোদ পেল, 'আইচ্ছা?'

'হ্যাঁ, ওর নাম উচ্চু। নামটা আজ আমি তাকে দিলাম। খালি উঁচা গলায় আমার সঙ্গে কথা বলে সেজন্য।'

চুপ্পু হাসল, 'ঠিক আছে। ওরে আমি তাইলে উচ্চু ডাকমু।'

মা এসে চুপ্পুর সামনে দাঁড়ালেন। হেসে বললেন, 'ব্যাগটা তুমি নাও। এটা তোমার লাগবে।'

'হ্যাঁ, চুপ্পু। তোমার মা'কে পাওয়া গেছে। তোমার মা ফিরবেন। তুমি স্কুলে যাবে।'

চুপ্পু অবাক তাকিয়ে থাকল।

মা তাকে তার মা'কে খুঁজে পাওয়ার বিষয়টা খুলে বললেন। চুপ্পুর খোঁজ করতে গিয়ে পুলিশের গোয়েন্দা তার মা'র খোঁজ পেয়েছে। নদীভাঙনে ঘর-বাড়ি হারিয়ে, ঘরবাড়ি সহ স্বামী এবং মেয়েটাকে নদীতে হারিয়ে তিনি ঢাকা এসেছিলেন। কাওরান বাজারে তার গ্রামের এক লোকের কাছে তার স্বামী বেশ কিছু টাকা পেতেন। সেই টাকা আনতে গেলে উল্টে তাকে ছুরি হাতে শাসাতে এল সেই লোক। চুপ্পুর মা ক্ষিপ্ত হয়ে ছুরিটা নিয়ে লোকটার পেটে বসিয়ে দিলেন। আদালত তাকে দীর্ঘ মেয়াদে জেলে পাঠাল। রাফির মা বললেন, একটু আগে রাফির বাবা ফোন করেছিলেন। তিনিই জানিয়েছেন ঘটনাটা। এখন জেল থেকে বেরিয়ে আসতে চুপ্পুর মা'র যে কয় মাস লাগে।

রাফির মা বললেন, 'আমাদের সঙ্গে এই ক'টা মাস থেকে যাও?'

একটা ঘোরের মধ্যে ছিল চুপ্পু। বলল, 'আমার সুনারগা হোটেলটা তাইলে মন খারাপ করব।'

কেউ কিছু বলার আগে রাফির ব্যাগটা নিয়ে কাঁধে ফেলল চুপ্পু। তারপর বেরিয়ে গেল।

একটা দিন সবকিছু এমন ওলট-পালট করে দিতে পারে!

ছবি: রঞ্জন দত্ত

জয়তী রায়

নাগরাজ বাসুকি

এক

পুরাণ মানেই কি প্রাচীন? তা কেন? বদল ঘটছে ওইসব ধারণার, এখন পুরাণ মানে প্রাণ। প্রাণ কখনো পুরোনো হয়? বরং, দিনে দিনে নতুন রঙে রঙিন হয়ে যুগের সঙ্গে মিলেমিশে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। আমাদের এই গল্পের নায়ক, হাজার বছর পেরিয়েও অমর হয়ে আছেন ভারতবর্ষের হৃদয়ে। তাহলে আর দেরি কেন? শুরু হোক যাত্রা—প্রাচীনকালের ম্যাজিক দুনিয়ায়।

সর্পলোকের রাজা বাসুকি। কী বা তাঁর ক্ষমতা, কী বা তাঁর প্রতাপ! প্রবল শক্তিমান বাসুকি, হাজার যোজন লম্বা শরীর নিয়ে লকলক ফণা তুলে দাঁড়ালে তিনভুবন মাথা নত করে তাঁর সামনে। স্বভাবে তেমনই উদার তিনি। রাজা বাসুকির মতো পরোপকারী তিনভুবনে আর দুটি নেই। মুশকিল হল, ভালো আর উপকারিদের শেষ পর্যন্ত প্যাঁচে পড়তে হয়। যে দেবতারা এতদিন মাথায় তুলে নেচেছেন, যে মুনি ঋষিরা ফুল জল দুধ দিয়ে বাসুকি পুজো করেছেন, তাঁরাই আজ অদ্ভুত এক প্রস্তাব নিয়ে হাজির হল তাঁর দরবারে। ইনিয়ে বিনিয়ে আসল প্রস্তাব পেশ করতে আঁতকে উঠল রাজসভার সকলে।

আট জন নাগ তখন সভাঘরে বসে আছে। হাঁকে ডাকে জগৎ থরহরি কাঁপে। বাসুকি ছাড়াও আছেন—অনন্ত, তক্ষক, কর্কটক, পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ ও কুলিক। এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শেষনাগ অনন্ত। বাসুকির বড়ভাই। নারায়ণ বিষ্ণুর প্রিয় ভক্ত অনন্ত নাগ, ক্ষীরসাগরে ঘুরে বেড়ায় নারায়ণকে বুকের উপর নিয়ে। জগতের লোক ভক্তি করে তাঁকে। দেবতা-ঋষিদের প্রস্তাব শুনে শান্ত গলায় অনন্তনাগ বলে ওঠেন, এমন কথা আপনারা বলছেন কী করে? এই কাজে সমূহ বিপদ। এতে প্রাণের আশঙ্কা আছে।

কিলবিল করে চেঁচিয়ে উঠল বিষাক্ত জীব তথা সাপ-বিছের দল—এরা নাগেদের তুতোভাই। সকলে হইহই করে বলে উঠল, এ কী অসৈরন কাজ? এমন কাজ করলে অকালে প্রাণ হারাবেন সর্পরাজ! আপনাদের কোনো বিবেচনা নেই?

তাদের ফোঁসফাঁস হিসহাস শুনে দেবতারা প্রথমে একটু ঘাবড়ে গেলেন। তারপর হাসি হাসি মুখে বললেন, আহাহা, চটেন কেন? পুরো ব্যাপারটা শুনেই না হয় উত্তর দেবেন।

শঙ্খচূড় ল্যাজ আছড়ে বলে উঠল, দেবতাদের আমরা মোটেই বিশ্বাস করি না। বিনা মতলবে এখানে আসেননি আপনারা।

আবার হাসলেন দেবতারা। নিজেদের জীবন বাঁচাতে ছুটে এসেছেন, না হলে...ওই নীচ সাপেদের এমন আস্পর্ধা, লেজ ঝাপটিয়ে ভয় দেখায়? এক অগ্নিবাণ ছুড়ে মারলে গোটা নাগলোকসুদ্ধ উড়ে গিয়ে পড়বে সাতসাগরের জলে! কিন্তু না, এখন চটে গেলে চলবে না। স্বয়ং নারায়ণ বুদ্ধি দিয়েছেন, কাজ হাসিল করতে গেলে দুটো জাতের সাহায্য নিতেই হবে। একটি অসুর, অপরটি নাগ। সুতরাং, দেবত্বের গর্ব ভুলে তোষামোদি করে যেতে হবে, কাজ উদ্ধার করা পর্যন্ত।

কাজটা কী? কীসের জন্য অহংকারী দেবতারা আজ পায়ে ধরে সাধতে এসেছে তাদের? কী ঘটেছিল সেদিন?

নেপথ্য কাহিনি

স্বর্গরাজ্যে আজ জরুরি সভা বসেছে। তাবড় তাবড় দেবতারা সব হাজির সেখানে। সভাপতি অবশ্যই শ্রীবিষ্ণু। আছেন দেবরাজ ইন্দ্র। দেবসেনাপতি কার্তিক। বরুণ অগ্নি সকলেই নিজ নিজ আসনে বসে আছেন, সকলের মুখ গম্ভীর। হবে না কেন? গত কয়েকবছর ধরে যুদ্ধে গো-হারান হারছেন

অসুরদের কাছে। গলা খাঁকারি দিয়ে দেবর্ষি নারদ বলে উঠলেন, সব্বাই এমন চুপ করে গেলেন যে? শুনুন, একটা উপদেশ দিচ্ছি, দেবতাদের এবার অসুর রাজত্ব মেনে নেওয়া উচিত। আর কত মার খাবেন আপনারা? লজ্জায় তো আর মুখ দেখানো যাচ্ছে না!

অগ্নিদেবতা বলে উঠলেন, আমি কিন্তু রোজ হুমকি শুনছি, আমাকে নাকি তুলে নিয়ে যাবে ওরা। অগ্নিপ্রতিষ্ঠা করবে ওদের রাজ্যে।

দেবরাজ ইন্দ্র মুখ চুন করে বসে বললেন, আমার তো গদি যায় যায়। তুমি কিছু বলো হে দেবসেনাপতি? গোলমাল ঠিক কোথায়?

কার্তিক জানতেন এবার তাঁর দিকেই ধেয়ে আসবে প্রশ্ন। দেব সেনাপতি বলে কথা, বিশাল সৈন্যদল আছে তার অধীনে। আছে প্রচুর আধুনিক অস্ত্র। এত সব কাণ্ড করে শেষে কিনা তাড়না খেতে হচ্ছে রোজ!

কার্তিক থেমে থেমে বললেন, একটা কথা পরিষ্কার করতে চাই, যুদ্ধে আমরা প্রাণপণ লড়ছি, কিন্তু, ওদের সৈন্য মারতে পারছি না। এই রহস্য কী? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

মহা চটে ইন্দ্র বলে উঠলেন, তুমি বুঝবে না তো কে বুঝবে হে? বলি, ধন রত্ন তো কম দেওয়া হয় না তোমায়!

রেগে কাঁই হয়ে নিজের ময়ূর বাহনে চেপে কার্তিক বললেন, রইল আপনার সেনাপতি পদ। চললাম আমি। তবে, শুনে রাখুন, আপনাদের ওই আদ্যিকালের ধ্যান ধারণায় আর চলবে না। অসুররা অনেক এগিয়ে আছে। তাঁরা মরা সৈন্য বাঁচাতে পারে। আপনাদের আছে শুধু ফুটো অহংকার। হুঁ!

কার্তিক তো চলে গেলেন। কিন্তু সভায় ছুঁড়ে দিয়ে গেলেন জব্বর এক তথ্য। মরা সৈন্য বাঁচে ওদের। এটা কি ব্যাপার?

সভাপতি নারায়ণ এবার উঠে দাঁড়ালেন। হাত তুলে সবাইকে শান্ত হয়ে বসতে বলে শুরু করলেন, দেখো, এইটাই আমাদের শেষ সুযোগ। এই নিয়ে তেরোবার যুদ্ধ হল, মাত্র দুটোয় আমরা জিতেছি। স্বর্গ এখন দখল হলে ক্ষমতা নেই ছাড়িয়ে নেবার।

নারায়ণ, আপনি বলুন, কেন এমন হচ্ছে? কোনদিকে ওরা শ্রেষ্ঠ?

—মৃত অসুরের দল বেঁচে উঠছে!

—মানে?

—অসুরদের গুরু, শুক্রাচার্য কাণ্ডটা ঘটাচ্ছেন। এমন এক ওষুধ আবিষ্কার করেছেন, অর্ধমৃত এমনকী মৃতদের উপরও প্রয়োগ করলে তারা বেঁচে উঠছে।

এই কথা শুনে মুখ চুন হয়ে গেল দেবতাদের। এ সমস্যার কোনো সমাধান জানা নেই তাঁদের। কারণ, জ্ঞানী শুক্রাচার্যকে যাচ্ছেতাই অপমান করে দেবলোক থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, আজ তিনি অসুর পক্ষের মহা ভরসা। আবিষ্কার করেছেন মৃতসঞ্জীবনী ঔষধ। সেই ওষুধের গুণেই তো ঘটছে যত অঘটন। সত্যিই, দেবলোকের এমন দুর্দিন আগে কখনো আসেনি। এখন যদি নারায়ণ কিছু উপায় আবিষ্কার করেন...সমস্ত সভা আকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সেই মহান বুদ্ধিমান পুরুষের দিকে।

কপালে ভাঁজ ফেলে দেবরাজ ইন্দ্রের দিকে তাকিয়ে নারায়ণ বললেন, প্রশ্ন জাগছে হে দেবরাজ, কিছু প্রশ্নের সমাধান চাই।

—বলুন প্রভু।

—মনে হচ্ছে, শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সাহায্য নিতে হবে।

—তাঁরা কারা প্রভু?

—আর কারা? সেই অসুর।

—অসুর! আর্তনাদ করে উঠলেন ইন্দ্র, বলছেন কি প্রভু? শেষমেশ অসুরলোকের দ্বারে গিয়ে দাঁড়াতে হবে?

করুণার চোখে দেবরাজের দিকে তাকিয়ে নারায়ণ বললেন, শুধু অসুর নয় হে, আরও আছে, যাদের তোমরা গুরুত্ব মোটেই দাও না, সেই নাগজাতির কাছেও সাহায্য ভিক্ষা করতে হবে।

—বলছেন কি প্রভু, আমরা দেবতা, আমরা ভিক্ষা চাইব?

—প্রয়োজন অনুযায়ী স্বভাব পরিবর্তন করতে হয় বইকি। সিংহাসনে বসে আছ, আর রাজনীতি শিখলে না? তুমি কেমন দেবরাজ হে? এসব অহঙ্কার ছাড়ো, মন দিয়ে শোনো এখন কী করণীয়।

অমৃতের সন্ধানে

নারায়ণ বললেন, দেখো, আবিষ্কার অনেক করেছি আমরা। বায়ু যান, আধুনিক মারণ অস্ত্র, উন্নত বাসস্থান, অত্যাধুনিক বিলাসী উপকরণে সজ্জিত স্বর্গরাজ্য। এত কিছু আছে, তবু, দেবতারা মরণশীল। সাধারণ জীবের থেকে প্রভেদ নেই কোনো। অমর হবার কোনো ঔষধি আবিষ্কার হয়নি দেবলোকে।

দেবতারা ব্যাজার মুখে চুপ করে রইলেন, অমর হলে এমন দুর্দশা হয়? পাজির পাঝাড়া অসুরগুলোকে চার ধাতানি দিয়ে পগার পার করে দেওয়া কি এমন কাজ?

নারায়ণ বললেন, এতদিনে সেই অমৃত ঔষধির খোঁজ মিলেছে।

লাফিয়ে উঠলেন দেবতার দল, উরেব্বাস! অমৃত! এখুনি গিয়ে নিয়ে আসলেই তো হয়!

উৎসাহে জল ঢেলে নারায়ণ বললেন, এখুনি এত লাফালাফি কোরো না। ক্ষীরসাগরের অতলে সঞ্চিত আছে সেই অমৃত। সমুদ্র মন্থন করে তুলে আনতে হবে, বুঝলে কিছু?

—সাগর মন্থন! সে তো একটা সাংঘাতিক ইয়ে ব্যাপার!

—বারো যোজন লম্বা মন্দার পর্বত হবে মন্থন দণ্ড। বিশাল রজ্জু দিয়ে পর্বত টেনে টেনে মন্থন করলে উঠে আসবে অনেক অনেক বস্তু এবং অমৃত। সৃষ্টির ইতিহাসে এমন কাজ আজ পর্যন্ত হয়নি।

বারো যোজন পর্বত টেনে এনে সাগরে ফেলতে হবে—শুনেই দেবতাদের মুখ তোম্বা। সুখী শরীরে ঝামেলার কাজ পোষায় না। অসুরগুলো পারবে, পাহাড় পর্বত যাই হোক না কেন, এক টানে উপড়ে নিয়ে চলে আসবে। সে না হয়, বাবা বাছা বলে ভুলিয়ে ভালিয়ে ডাকা হল কিন্তু ওরা করবে কেন?

—অমৃতের লোভ দেখাতে হবে।

—বলছেন কি প্রভু? অসুরদের অমৃত দিলে কচুকাটা করবে আমাদের।

নারদ ঋষির কুচুটে স্বভাব। চুপ করে থাকা ধাঁচে নেই। ফস করে বলে বসলেন, সাহায্য নিয়ে পরে ঝেড়ে ফেলে দিলেই ল্যাঠা গেল চুকে। তাই না প্রভু?

নারদের কথা গায়ে না মেখে নারায়ণ বললেন, একদল দেবতা যাও অসুর রাজ্যে। তারা রাজি হবে সহজেই। কারণ, তারা স্বার্থ বোঝে। বলবে, সব আধাআধি ভাগ হবে। যত ধন রত্ন সম্পত্তি অপ্সরা এবং অমৃত—সবকিছুর অর্ধেক—বুঝলে কিছু?

দেবতারা প্যাঁচ ভালোই বোঝেন, প্রতিশ্রুতি দিতে হবে কিন্তু রাখতে হবে—এমন মাথার দিব্যি কে দিয়েছে? সুতরাং, অসুর সমস্যা মোটামুটি সমাধা হল। এইবার এল মন্থনের রজ্জু, মানে ওই দড়ি, যা দিয়ে টানাটানি করতে হবে মন্দার পর্বত।

নারায়ণ বললেন, নাগরাজ বাসুকি রজ্জু হতে রাজি হলে আর চিন্তা নেই, ওই রকম শক্ত বাঁধন আর কেউ দিতে পারবে না। একদল প্রতিনিধি যাও নাগলোক। স্বার্থহীন পরোপকারী বাসুকি সহজেই রাজি হবেন।

দেবতাদের প্রস্তাব ও নাগ বিদ্রোহ

একদল দেবতা এলেন। হাত জোড় করে সাহায্য চাইলেন, বাসুকি এরমধ্যে খারাপ কিছু খুঁজে পেলেন না। কিন্তু, হিংস্র ফণা দুলিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন মনসা, সম্পর্কে বাসুকির বোন। একটু ঝগড়ুটে, একটু মারকুটে, কিন্তু চালাকি বজ্জাতি মোটে সহ্য করবেন না। চেঁচিয়ে উঠে বললেন, ভাই, তুমি কিছুতেই ওদের কথা শুনবে না। তোমাকে আমি চিনি। নিজের শত কষ্ট হলেও মানা করতে পারবে না।

—আরে, ওনারা বিপদে পড়েছেন।

রেগে গেলেন মনসা। পাহাড়ের কর্কশ শরীর জড়িয়ে ধরতে হবে তোমায়। ছাল চামড়া সব উঠে যাবে শরীর থেকে। রক্ত পড়বে। না না ভাই কিছুতেই যেও না—। বলতে বলতে চোখে জল এল মনসার।

মনসার কথা শেষ হতে না হতেই গর্জে উঠল, নাগ, সাপ, বিছের দল। না। কিছুতেই না। মহারাজ বাসুকি যাবেন না কিছুতেই। আবার যদি দেবতারা এখানে আসে, এক এক ছোবলে যমালয় পাঠিয়ে দেব!

মনসা বললেন, ঠিক বলেছ। অমর হবার লোভ থেকে আমাদের কাছে এসে হাত জোড় করে দাঁড়িয়েছে ওরা। নাগ দেবতার পুজো হয় কখনো স্বর্গলোকে?

—ঢুকতেই দেয় না তো পুজো!

মনসা হিসহিস করে বলেন, আমরা অচ্ছুত সর্পজাত, এখন তবে কেন এসেছে? আমাদের রাজাকে বলি দেবে বলে?

মাথায় চক্র নিয়ে ফোঁস করে উঠল পদ্ম গোখরো।

—মনসা ঠিক বলেছে মহারাজ। আজ দরকার পড়েছে, তাই মাথা নীচু করে এসেছে। সকলে শুনে রাখো, ওই সাগর মন্থন আমরা মানি না। যাই হোক না কেন, রাজা বাসুকি যাবেন না।

সমুদ্রমন্থন প্রস্তুতি ও প্রতিক্রিয়া

চারিদিক জুড়ে একটা হইহই পড়ে গেল। এমন একটা কাজ হতে চলেছে যা কেউ কখনো শোনেনি। অসুররাজ্যে দেবতার প্রতিনিধি হাজির হয়ে খোলাখুলি প্রস্তাব দিল, দেখো ভাই, যদিও তোমরা বিরোধীপক্ষ, কিন্তু এই কাজ তোমাদের সাহায্য ছাড়া হবে না।

অসুররাজ বললেন, তোমাদের সাহায্য করে আমাদের লাভ কী?

—কেন? অমৃতের অর্ধেক তোমাদের হবে। সঞ্জীবনী ওষুধ মাত্র, প্রয়োগ করতে হয়। অমৃত একবার খেলেই অমর হয়ে যাবে।

অসুররাজ খুশি হলেন। মন্দ বলেনি দেবতারা। সঞ্জীবনী মন্ত্র পুরোটাই গুরুদেব শুক্রাচার্যের মর্জি মাফিক চলে। আজকাল ওনার বয়স হয়েছে, কখন বিগড়ে যান কে জানে! এটা তো একেবারে চিরকালের জন্য নিশ্চিন্তি!

অসুরপক্ষ রাজি হয়ে গেল বটে কিন্তু দেশ জুড়ে চলতে লাগল নাগ আর সাপেদের আন্দোলন। সমাজের খেটে খাওয়া শ্রেণীর মধ্যে ঘনিয়ে উঠল অসন্তোষ। মনসা চারিদিক ঘুরে ঘুরে প্রচার চালাতে লাগলেন। দেবতারা নিজেদের স্বার্থের জন্য ব্যবহার করতে চায় সর্পরাজ বাসুকিকে। এই অন্যায় চলবে না, চলতে পারে না!

সব মিলিয়ে ভারি গোল বেধে গেল। এদিকে ঋষি মুনিরা গণনা করে বলছেন, আগামী এক মাসের মধ্যে মন্থন শুরু না হলে, সৃষ্টি হবে ভয়ঙ্কর প্রলয়। মন্দার পাহাড় তো দূরের কথা, ক্ষীরসাগরের ধারে পাশে কেউ যেতে পারবে না।

অবশেষে বাসুকি

নাগলোক এমন বিগড়ে যাবে স্বপ্নে ভাবেননি দেবতারা। এত সাহস পেল কী করে? দেবতারা মান্য করে নাগরাজ বাসুকিকে, কিন্তু, তাঁর চ্যালা চামুণ্ডাদের তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। বংশগৌরব, জাতের কুল মান উচ্চ হলে তবেই দেবসমাজে স্থান পাওয়া যায়। মনসা চেষ্টা করেও স্বর্গে ঢুকতে পারেননি। সেই থেকেই কি রাগ জন্মাচ্ছে? সেই রাগ থেকেই পণ্ড করে দিতে চাইছে অমৃত অভিযান? নিছক ভ্রাতৃপ্রেমের বশে দেশ জুড়ে আন্দোলন চালাবে—মনসা সে বান্দা নয়।

এদিকে সময় নষ্ট হচ্ছে তার উপরে আবার লাগাতার হাসি হাসি মুখে সকলের কাছে হাতজোড় করে সাহায্য চাইতে হচ্ছে! একদিকে নির্বোধ অসুর অন্যদিকে কিলবিলিয়ে চলা জীব! আর কাঁহাতক পারা যায়? তাই বলে ফট করে রেগে গেলে মোটেই চলবে না। অনেক অনেক ফন্দি এঁটে দেবতারা ঠিক করল সাপেদের মূল পাণ্ডা মনসাকে বশ করা যাক। স্বর্গরাজ্যে ঢুকতে পারবে, বিখ্যাত দেবতাদের সঙ্গে এক আসনে বসতে পারবে—এই সব কথা শুনে মনসা হতবাক। তাঁর স্বপ্ন সত্যি হবে! মনসা আর দেরি করল না, সব আন্দোলন তুলে নিল মহা আনন্দে।

নাগরাজ বাসুকি শুনে স্নেহের সুরে বললেন, ওরে ও মনসা, অপরের সুখের জন্য কাজ করতে পারলে তাকে বলে ধর্ম। ভালো করেছিস রাজি হয়ে। তুচ্ছ জীবন, থাকলেই বা কি গেলেই বা কি। স্বয়ং নারায়ণ যুক্ত আছেন এমন কাজে থাকতে পারা পরম সৌভাগ্য।

মনসা আর কথা বাড়ান না, সরল ধর্মপ্রাণ বাসুকি—রাজনীতি বুঝে তাঁর কাজ নেই।

বাসুকি প্রস্তুত হয়ে নিলেন। প্রাণ সংশয় হতে পারে, কিন্তু যে কাজে সকলের কল্যাণ সে কাজে শিবভক্ত বাসুকি যাবেনই। রাজাপাট ছেড়ে মন্থনের কাজে চললেন নাগরাজ।

মন্থন শুরু

স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল জুড়ে শুধু একটাই আলোচনা—সমুদ্রমন্থন। সবচেয়ে বড় কথা, দেবতা অসুর একসঙ্গে মিলে কাজ করছে—এমন অদ্ভুত ঘটনা তিনলোকে ঘটেইনি কখনো। লোকের কৌতূহলের আর শেষ নেই! ঋষি মুনির দল আশ্রম ফেলে পাকাপাকি ডেরা বেঁধেছেন ক্ষীরসাগরের কূলে। অসুরলোক থেকে এসেছে মেলা দানব-দানবী, ভূত-পেত্নীর দল পিছনে পড়ে নেই। এসেছে স্বর্গ লোকের দেব-দেবী। গোমড়া মুখে এসেছে নাগলোকের অধিবাসীগণ। রাজা বাসুকি নিজেই রাজি হয়ে গেলেন, আর কী করবে তারা? মনসা কেমন যেন পাল্টি খেয়ে গেল শেষে। যাই হোক, দেখা যাক, কী হয়?

হাজার হাজার লোকের জমায়েত দেখে নারায়ণ বললেন, ব্যাপারটা গোলমেলে হতে পারে, মন্থন শুরু আর শেষের মধ্যে অনেক বাধা বিপত্তি থাকবে। সাধারণ মানুষ এখানে না থাকাই ভালো। আদেশ মাত্র দেবসৈন্য-অসুরসৈন্য মিলে লোক হঠিয়ে দিতে লাগল। সমুদ্রের তীরে লম্বা করে বেড়া বেঁধে দেওয়া হল। লোকজন অবশ্য দূরে দাঁড়িয়ে রইল। কাউকেই পুরোপুরি সরানো গেল না।

প্রকৃতিও আজ সমান উত্তেজিত। মাথার উপর দপদপ করছে সূর্য। প্রখর গ্রীষ্মের তেজ। ঢেউ ভেঙে পড়ছে চকচক বালির উপর, টানটান শরীর মেলে প্রস্তুত সমুদ্র।

হঠাৎ জনতা উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, ওই এল, ওই এল মন্দার পর্বত। বারো যোজন উচ্চতার পর্বত তুলে নিয়ে এল অসুরদের সুশিক্ষিত হস্তিবাহিনী। সে এক দেখবার মতো দৃশ্য! গাছপালাসহ আস্ত পর্বত আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে হস্তিবাহিনীর মাথার উপরে। কিন্তু, উত্তাল জলের মধ্যে পর্বত বসবে কী করে? জলের নীচে একটা পাত্র তো চাই! দেবতা-অসুর দুই দলের দক্ষ কর্মীদের কাছে পুরো কাজটাই যেন চ্যালেঞ্জ। বিশালকায় কচ্ছপের খোলের মধ্যে মন্দারপর্বত বসলে ঠিকমতো কাজ হবে বোঝা গেল। তখন, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর বজ্র অস্ত্র দিয়ে পর্বতের এবড়োখেবড়ো তলার দিকটা সমান করে কেটে দিলেন। এইবার নামতে লাগল পর্বত। চাপের চোটে ছিটকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল জলরাশি।

যাক, পর্বতের অর্ধেক বসে গেল ঠিকঠাক। ঘর্মাক্ত নারায়ণ আদেশ দিলেন, সর্পরাজ বাসুকি, ধীরে ধীরে পর্বতকে জড়িয়ে ধরুন। আপনার মুখের দিক ধরে রাখবে দেবতা, পুচ্ছের দিক অসুর।

—কেনওও? হুংকার দিয়ে উঠল অসুরের দল, তোমরা কেন মাথার দিক ধরবে? পুচ্ছ অপমান, মস্তক সম্মান। আমরা ধরব মাথার দিক।

মৃদু হাসলেন নারায়ণ। এইটাই কাম্য ছিল তাঁর, রাজনীতির খেলায় অসুরের মতো এমন নির্বোধ প্রতিপক্ষ থাকলে দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব রুখতে পারবে না কেউ।

সুমধুর বেদমন্ত্র, উচ্চকিত শঙ্খধ্বনির মধ্যে দিয়ে টান পড়ল বাসুকি শরীরে। প্রথম টানেই অনেক খানি ঘুরে গেল মন্দারপর্বত। শুরু হল, সমুদ্রমন্থন...

সাগরের অতলে

উথালপাথাল সাগর জলের মাঝে উঁচু পর্বত পেঁচিয়ে বাসুকি, দুই দিক থেকে টান পড়ছে, পর্বত ঘুরছে, জনতা উত্তেজিত। সাগরের অতলে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে? কী কী উঠে আসবে?

ঘরঘর ঘরঘর শব্দে ঘুরে চলছে পাহাড়। চারদিক আলোময় করে উঠে এল কৌস্তভ মণি, দিব্য ধনুক, পাঞ্চজন্য শঙ্খ, ক্রমাগত উঠছে মূল্যবান ধন রত্ন।

ঘুরছে পর্বত...সমুদ্রের জল-ফুলে ফেঁপে উঠে এল তিনটি দিব্যপশু—কামধেনু, ঐরাবত ও উচ্চৈঃশ্রবা।

জনগণ মহা উত্তেজিত। কে কোনটা পেল—সেই নিয়ে আলোচনা চলছে, দেখা গেল বেশির ভাগ জিনিস চলে যাচ্ছে দেবতাদের দিকে। কেউ একজন বললে, অসুর ধনীদেশ। এইসব জিনিস আছে প্রচুর। ওরা এইসব চায় না।

অবাক কাণ্ড বটে। মন্থন করে সমুদ্র থেকে মূল্যবান এত বস্তু আসবে এমন কথা কে ভেবেছিল! আরও অবাক লাগছে, জিনিসগুলি গুটি গুটি দেবতাদের কাছেই যাচ্ছে! এ যেন দিনে দুপুরে ডাকাতি! কৌতূহল বাড়ছে। এবার কী ওঠে, কী ওঠে?

জয় জয়কার চলছে দেবতা অসুরের নামে। বাসুকির নামে কেউ কি দিল জয়ধ্বনি? নাহ্। দানবরাজ বলি, বাম হাতে চেপে ধরেছেন নাগরাজের মাথা, আর ডান হাতে টান দিচ্ছেন তাঁর অগ্র শরীরে, আর পুচ্ছদেশ ধরে টান দিচ্ছেন দেবতারা।

আবার উঠছে, উঠে আসছে কত শত বস্তু। উঠে এল চাঁদ। শিবের জটায় নিজেই শোভা পেল। এবার উঠে এল অপরূপা লক্ষ্মী। এমন রূপসী নারী দেখে হইহই করে উঠল দেবতা আর দানব। মারামারি বেঁধে গেল প্রায়। ব্রহ্মা তখন তাড়াতাড়ি লক্ষ্মী তুলে দিলেন নারায়ণের হাতে। উঠে এল বারুণী মদ্য, মন্থন দণ্ড ঘুরিয়ে ক্লান্ত দেবতা দানব পান করলেন মদ্য। উত্তেজনায় উল্লাসে মত্ত সকলে, আরও জোরে, আরও জোরে—ক্লান্ত বিধ্বস্ত বাসুকি তখন টলছে। কেউ ফিরে তাকায় না। পর্বত ঘুরছে আর সাগর থেকে উঠে আসছে একের পর এক অতি সুন্দর পারিজাত, কল্পতরু বৃক্ষ, কামধেনু। এইবার...এইবার কী উঠে আসবে? অমৃত?

হলাহল

ফোঁস ফোঁস হিস হিস...ভয়ঙ্কর শব্দ ছড়িয়ে পড়ছে দিগ থেকে দিগন্তের দিকে। এ কীসের শব্দ? যেন গলা ছিঁড়ে উঠে আসা আর্তনাদ! যেন অসহায় প্রাণের চরম কষ্ট, যেন মুক্তি চাইছে কেউ, যেন চেষ্টা করছে পালিয়ে যাওয়ার...

শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে বাসুকির। কোনো রকমে তাকিয়ে দেখে, সাগরজল ঘূর্ণিত হচ্ছে প্রবল বেগে। বাসুকির শরীর যতই শক্ত কঠিন হোক, যতই মনের জোর থাকুক, তবু তাঁর গলার দিকে চেপে রেখেছে অসুরদের শক্তিশালী হাত, লেজের দিকে দেবতাদের হাত। ঘুরছে ঘুরছে...ডান দিক হতে বাম দিক ক্রমাগত ঘুরে চলেছে। প্রাণপণ নিজেকে ঠিক রাখছেন বাসুকি, একবার যদি বিষ বমন শুরু হয়, ভেসে যাবে পৃথিবী।

মনে পড়ে স্ত্রী তুষ্টির কথা, মনে পড়ে বোন মনসার কথা। মনে পড়ে সমুদ্রমন্থনের জন্য এমন ভয়ানক কাজ করতে রাজি হওয়ায় আঁতকে উঠে নিষেধ করেছিলেন অনন্তনাগ। বলেছিলেন, ভাই রে ভাই, এমন কাজ করো না। পৃথিবীর মধ্যে তুমি সবচেয়ে দীর্ঘদেহী, তেমনি সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী। তোমাকে নিয়ে ওরা ছিনিমিনি খেলবে। কেন বুঝতে পারছ না?

বোন মনসা ছুটে এসেছিল খবর পেয়ে। নাগলোকের সক্কলে এককাট্টা হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল।

নারায়ণ স্বয়ং নেমে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তখন, সোনার বরণ শরীরে রোদ্দুর ঝলকে উঠছিল। বিশাল চোখ দুটিতে, হাঁটা চলার ভঙ্গিমায় এমন নায়কোচিত রূপ দেখে থমকে গিয়েছিল প্রতিবাদ। নারায়ণ যেন সম্মোহিত করে ফেললেন সকলকে। আলতো স্নেহের সুরে বললেন, সর্পজাত আরও অনেক সম্মান পাবে, তোমরা চাও না? মনসাকে দেবী মানবে, তোমাদের আদর করে দুধ কলা দেবে...তোমরা চাও না? এখন তোমরা অন্ত্যজ, কেউ পছন্দ করে না। সমুদ্রমন্থনে জড়িয়ে গেলে বাসুকির নাম, সম্মান বৃদ্ধি পাবে একশ গুণ। চাও না?

নারায়ণ যেন ছড়িয়ে দিলেন আশার আলো। সত্যি তো! দেবতা সাহায্য চাইছে, কম কথা নাকি? আর বাসুকির নিরাপত্তা? অভয় দিলেন নারায়ণ, কথা দিচ্ছি, প্রাণ রক্ষা হবে নাগরাজের। আমি দায়িত্ব নিলাম।

যন্ত্রণা কাতর বাসুকির চোখ দিয়ে জল পড়ে। প্রাণ রক্ষার দায়িত্ব নিলেন প্রভু কিন্তু এমন ক্ষতবিক্ষত হতে হবে, সে কথা তো একবারও বলেননি! ইচ্ছে করছে ঝটকা মেরে উড়িয়ে দেন সব কিছু। ভেঙে চুরমার করে দিয়ে বেরিয়ে চলে আসেন। তারপর মনে পড়ে, সৃষ্টির ইতিহাসে এমন কাজ একবার মাত্র সম্ভব, সেই কাজে জড়িয়ে যাচ্ছে সর্পজাতের নাম। নিজের জাতির প্রতি প্রাণ দিয়ে হলেও কর্তব্য করবেন বাসুকি। মনে মনে নিজের আরাধ্য দেবতা মহাদেবকে স্মরণ করেন তিনি।

আর কত দেরি? জ্বলে যায় সমস্ত শরীর। এখনো অমৃত ওঠেনি? আর কত দেরি? এত মূল্যবান মণি রত্ন উঠে আসছে, সুন্দরী অপ্সরার দল এল, পারিজাত ফুলের গাছ...অথচ...অমৃত এখনো আসছে না? না পাওয়ার ক্ষোভে বাসুকি যে জ্যান্ত প্রাণী, সেকথা মনে আর নেই কারুর, যত জোরে পারে ঘুরিয়ে চলেছে। অমৃত তুলতে হবে, অমৃত!

হেঁকে ওঠে অধৈর্য অসুরদল। আরে, ল্যাজের দিকের দেবতারা, হাত চালা ভালো করে! এই কথা বলেই টান মারে জোরে।

বাসুকি আর পারেন না, এইবার শুরু হয় বমন। হড়হড় গড়গড় বমনের সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসতে থাকে বিষ। ঘন নীল কালকূট বিষ। ভলকে ভলকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল বিষ। ঢেউ উঠতে লাগল। ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে যেতে লাগল চারিদিক। সাগর থেকে উঠে আসতে লাগল জলজ প্রাণী। মরে যাচ্ছে তারা। আকাশে উড়ন্ত পাখির দল ঝপঝপ করে নীচে পড়তে লাগল মৃত শরীর নিয়ে। দুপুরের সূর্য ঢেকে গেল বিষের ধোঁয়ায়। কালো হয়ে গেল চারিদিক। বহু দূরে দর্শক যারা ছিল, প্রাণ ভয়ে পালাতে লাগল।

অসুরদের শরীর জুড়ে বড় বড় ফোস্কা পড়ে যেতে লাগল। পুচ্ছ ধরে থাকায় দেবতাদের পলায়ন করতে সুবিধা হল। প্রাণপণ ভয়ে মন্থন ফেলে ছুটে পালাতে লাগল সবাই। কোথায় পালাবে? বাসুকি নিজেকে থামাতে পারছেন না। নীলরঙের জ্বলন্ত বিষ ছড়িয়ে পড়ছে সমানে।

নারায়ণ ছুটে এলেন, আবির্ভূত হলেন ব্রহ্মা। বিষের প্রচণ্ড তেজে এই প্রথম দিশেহারা বোধ করলেন নারায়ণ। রসাতলে যাচ্ছে জীব জগৎ। অমৃত কি তবে মৃত্যুর কারণ হবে? পরিণতি এমন হতে পারে ভাবেননি তিনি। এখন উপায়? চারিদিকের আর্তনাদে কান পাতা দায়। নিজেকে ভীষণ দোষী মনে হচ্ছে নারায়ণের। বিষের নীল স্রোতে ভেসে যাওয়া জীব জগতের মাঝে দাঁড়িয়ে শ্রীবিষ্ণু নারায়ণ, একান্ত অসহায় ভাবে স্মরণ করতে বাধ্য হলেন দেবাদিদেব মহাদেবকে। তিনি ছাড়া আর কেউ রক্ষা করতে পারবেন না এই বিপদ থেকে।

মহাদেবের আবির্ভাব

ত্রাস আতঙ্ক ভয়ে দিশেহারা সকলে দোষারোপ করতে লাগল নারায়ণকে। অমৃত লাভের অর্থ সাফল্য। সাম্রাজ্যবাদের কুটিল নীতি প্রয়োগে নারায়ণ ভুল কিছু করেননি। দেবতাদের সেই পথের দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন যেখানে কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে চতুর রাজনীতির কৌশল মিলেমিশে লাভ হবে ক্ষমতার অমৃত। পুরো পরিকল্পনা করেই এই পথে পা বাড়িয়েছেন তিনি। সমুদ্রমন্থন নিয়ে প্রচুর সন্দেহ ছিল, ভয় ছিল সকলের মনে। নারায়ণ ভরসা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সমস্ত অবিশ্বাস আর ভয়ের মাঝখানে। কিন্তু এরকমটি যে ঘটতে পারে সেকথা তাঁর মতো দূরদর্শী দেবতা বুঝতে পারলেন না—। এখন আর সময় নেই। মহাদেব ছাড়া আর কেউ এমন শক্তিশালী দেবতা নেই যিনি হলাহলের সামনে দাঁড়াতে পারবেন!

ঘটনার গুরুত্ব বুঝে মহাদেব দেরি করলেন না। দ্রুত চলে এলেন ঘটনাস্থলে। চারদিকের ভয়ানক দৃশ্য দেখে মহাদেব হতবাক। আগুনের মতো তীব্র বিষ, অসহায় প্রাণীদের আর্ত চিৎকার, ভক্ত বাসুকি মৃতপ্রায়। শ্বাস চলছে না।

ক্রোধে আরক্ত চক্ষু মহাদেব ফিরে তাকালেন নারায়ণের দিকে। হে নারায়ণ, নিয়তির অমোঘ নিয়মে মৃত্যু পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম সত্য। অমৃত আবিষ্কার করে অমরত্ব লাভের চাহিদা জীবকুলের প্রাণ সংশয়ের কারণ হয়ে উঠবে কেন? আমার ভক্ত বাসুকি তোমাদের রাজনীতির শিকার হয় কোন সাহসে?

নারায়ণ ঠান্ডা মাথায় বললেন, দেবদিদেব, জগতের কল্যাণের জন্য...

কথা শেষ করার আগেই মহাদেব বললেন, জগতের নয়, দেবতাদের কল্যাণ চেয়েছ, দেবতাদের শ্রেষ্ঠ করতে চেয়েছ—সৃষ্টির দেবতা হয়ে ধ্বংস করছ?

ক্রুদ্ধ ব্যথিত মহাদেবের মনে হল বন্ধ হোক মন্থন। ব্যক্তি-স্বার্থ পূরণ করতে গিয়ে সমষ্টি বিপদে পড়ছে! তিনি হুঙ্কার দিলেন—বন্ধ হোক অকারণ

উৎপাদন! ভক্ত বাসুকি অসুস্থ, তাঁকে মুক্ত করে নিয়ে চলে যাচ্ছি আমি।

অবস্থা বেগতিক। চতুর্দিকে থইথই করছে বিষ। মহাদেব রুষ্ট, আসল বস্তু এখনো জলের তলায়! যত রকম বেগতিক অবস্থায় ঋষি নারদের বুদ্ধি কাজে লাগে। তিনি টুক করে নারায়ণের কানে কানে বললেন, প্রভু, বাসুকি যদি অনুরোধ করে, তবে হয়তো শান্ত হবেন মহাদেব।

—কিন্তু, বাসুকির অবস্থা তো শোচনীয়! কথা বলতেই পারছে না।

—প্রভু, দয়া দেখালে চলবে না, মৃতপ্রায় নাগরাজকে দিয়েই কাজ উদ্ধার করতে হবে, না হলে ছেড়ে দিন অমৃতের আশা। যেমন তেমন দেবতা নন ইনি, প্রলয়ের দেবতা—আমার কিন্তু ভয় করছে।

উপায় না দেখে বাসুকির দিকে তাকিয়ে নারায়ণ বললেন, নাগরাজ, দয়া করে আপনি কিছু বলুন। এখন যদি মন্থন বন্ধ করে দিতে হয়...। প্রচুর ক্ষতি হয়ে যাবে আমাদের।

মহাদেব ততক্ষণে তুলে নিয়েছেন ত্রিশূল। এটাই শেষ আদেশ...এরপর যা হবে তার জন্য দায়ী থাকবেন নারায়ণ।

ক্লান্ত বাসুকির প্রার্থনায় কাজ হল। ভক্তের কাছে ভগবান সবসময় নত হয়ে থাকেন। নিজেকে শান্ত করে মহাদেব প্রয়োগ করলেন বিশেষ যোগ ক্ষমতা। সমস্ত শক্তি একত্র করে পান করতে শুরু করলেন হলাহল। ধীরে ধীরে দূর হতে লাগল কালো ছায়া, একটু একটু করে বিষ ঢুকে যেতে লাগল মহাদেবের মুখের ভিতর, ঢুকল বটে কিন্তু অলৌকিক ক্ষমতায় বিষ থমকে গেল কণ্ঠ পর্যন্ত। নীল হতে গাঢ় নীল কণ্ঠ নিয়ে অবিচল দাঁড়িয়ে রইলেন মহাদেব।

আবার স্বাভাবিক হতে থাকল বাতাবরণ। সূর্য আলো ছড়িয়ে হেসে উঠল, সতেজ বাতাস বয়ে যেতে লাগল, গান গেয়ে উঠল বনের পাখি, ক্ষীর সমুদ্রের ঢেউ ঝাঁপিয়ে পড়ল চকচকে বালুতটে। ঋষি-মুনির দল নতুন করে শুরু করল মন্ত্রপাঠ।

ভক্ত বাসুকির মৃতপ্রায় শরীর দুই হাতে জড়িয়ে আবেগ থরথর কণ্ঠে মহাদেব বললেন, চোখ মেলে তাকাও নাগরাজ, আর ভয় নেই, আশীর্বাদ করি, যতদিন নীলকণ্ঠ মহাদেবের আরাধনা করবে জগৎ, ততদিন ভক্ত বাসুকির পূজা হবে ধরাধামে। একাকার হয়ে থাকবে ভক্ত ও ভগবান।

নায়ক বাসুকি

ঘড় ঘড় ঘড় ঘড়...ঘুরছে পর্বত। নাগ বাসুকির শরীরে এখন নতুন উদ্যম। নিজেই যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছেন পর্বত। বাসুকি চোখ তুলে চারিদিক দেখেন। শেষ বিকেলের রোদ্দুর ঝিলমিলিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আদর করে নাগরাজের বিশাল ফণায়। ঋষি মুনিরা দূর থেকে প্রণাম জানায়। স্বর্গ থেকে ঝরে পড়ে ফুল। সকলের চোখে বাসুকি আজ শুধু নাগলোকের অধিপতি নন, ঐতিহাসিক সমুদ্রমন্থনের তিনিই নায়ক।

আকাশ থেকে দৈববাণী ভেসে এল—সবাই প্রস্তুত হও, এবার উঠে আসছে অমৃত। আর দেরি নেই।

অমৃত উদ্ধার হল তাহলে? উফফ! এতদিনের পরিশ্রম এতদিনের ঝক্কি এতদিনের চিন্তা—সব আজ সার্থক। অমৃত আসছে...আসছে। অস্ত সূর্যের রক্ত লাল আভা ক্ষীরসাগরের ঢেউয়ের উপর পড়ে সৃষ্টি করেছে অপরূপ শোভা, মন্দার পর্বতের ঘূর্ণন ধীরে ধীরে কমে আসছে, থেমে গেছে মন্থন। সেই জায়গায় জেগে উঠছে বুদ্বুদ। আর কিছুক্ষণ মাত্র—সরে দাঁড়িয়েছে সবাই, স্বয়ং বাসুকি নিজের হাজার যোজন দীর্ঘ শরীর কুণ্ডলী পাকিয়ে প্রতীক্ষায়...।

নারায়ণ দাঁড়িয়ে আছেন সাগরের কাছে, সোনালি রঙের উজ্জ্বল উত্তরীয় উড়ছে বাতাসে। বিশালদেহী অসুররাজ পাশে। অমৃত লাভের আশায় সকলেই উৎকণ্ঠিত, কেবল দেবর্ষি নারদ মুচকি হেসে বাসুকির কানে কানে বললেন, নাগরাজ, আপনার কাজ তো শেষ। এবার দেখবেন আসল খেলা।

—আবার খেলা? এতক্ষণ কম কী হল?

—এবার চমক যা আসছে তার কাছে বাকি সব শিশু।

—ঋষিবর, আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না।

—একটা কথা বলি?

—বলুন।

—আপনি বরং ফিরে যান নাগলোকে।

—অমৃত উত্থান দেখব না?

—সরল সোজা ধার্মিক নাগ আপনি, সকলের শ্রদ্ধার পাত্র, অমৃত উত্থানের পরে যা হবে, মেনে নিতে পারবেন না। ফিরে যান।

—আপনি এত কথা জানেন কী করে?

—নারদ আমি, খবর সংগ্রহ করা কাজ। সেজন্যেই বলছি, অমৃত দেখে আর কী করবেন? কপালে তো জুটবে না।

—অমৃত-লোভ আমার নেই মহর্ষি। আমি বরং ফিরেই যাই।

বিষণ্ণ হেসে ঋষি নারদ বললেন, আপনি লোভী নন সেকথা সকলে জানে। তবে জেনে রাখুন, সমুদ্রমন্থন থেকে প্রাপ্ত অমৃতের ভাগ এক ফোঁটা কেউ পাবে না—আপনি বা আপনারা তো অনেক দূরের।

যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়ালেন বাসুকি। সে কি! তবে যে এত পরিশ্রম করল অসুরেরা? ওরা তো ছেড়ে দেবে না, আবার যুদ্ধ হবে? আবার ধ্বংস?

নারদ বললেন, একদল ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হবে, আর একদল বঞ্চনা করবে—এইটাই নিয়তি। আপনি নিজেকেই দেখুন না, কী পেলেন শেষ পর্যন্ত?

নারদের কথা শেষ হল না, তুমুল জয়ধ্বনির মধ্যে উঠে এল অমৃত ভাণ্ডার। ব্যস! দেখামাত্র উন্মত্ত দেবতা-অসুর শুরু করল ঝগড়া। সেই ঝগড়ার মধ্যেই নারায়ণ চট করে ধারণ করে নিলেন মোহিনী রমণী রূপ। এইটাই ছিল তাঁর শেষ চাল। সঙ্গে সঙ্গে পাল্টি খেয়ে অমৃত ছেড়ে অসুরের দল মোহিনী রূপে মত্ত হয়ে গেল, দেবতারা আর দেরি করে? অমৃত ভাণ্ড নিয়ে সেই যে ছুট দিল আর তাঁদের টিকি দেখা গেল না।

শ্লথ রাজকীয় ভঙ্গিমায় দূরে সরে যেতে যেতে বাসুকি শ্বাস নেন মুক্ত বাতাসে। হাজার যোজন দীর্ঘ শরীরের উপর লকলকে ফণা স্পর্শ করে আকাশ। মন পূর্ণ আনন্দে। কী পেল না পেল, হিসেব করে কাজ নেই। ভালো কাজ করলে লোকের হৃদয়ে এমনিই অমর হয়ে থাকা যায়, বাইরে থেকে অমৃত তুলে আনতে হয় না। ❧

সৌম্যকান্তি দত্ত

করবেট সাহেবের শেষ ক'বছর

সালটা ১৯৪৭। সবে মাত্র দেশ স্বাধীন হয়েছে। চারিদিকে একটা হইহই রব। দেশের নানা শ্রেণীর মানুষের চোখে-মুখে আনন্দের ছাপ। সবাই যেন একটা নতুন জীবন পেয়েছে। কিন্তু, আজ আমি তোমাদের যাঁর কথা বলতে বসেছি, তাঁর মনে তখন একেবারেই সুখ-শান্তি নেই। বেঁচে থাকার আনন্দটাই আর নেই। কিছুদিন হল, ম্যালিগনেন্ট ম্যালেরিয়ার হাত থেকে কোনওরকমে বেঁচে উঠেছেন। তবে, তাঁর হার্টের অবস্থা মোটেই ভালো নয়। তিনি বুঝতে পারছেন ভারতে তিনি আর বেশিদিন থাকতে পারবেন না।

এ-দেশে তাঁদের তিন পুরুষের বাস। তাঁর পূর্বপুরুষেরা আয়ারল্যান্ড থেকে কোনও কারণে এ-দেশে আস্তানা গাড়েন। ১৮৫৭-এ সেই সিপাহি বিদ্রোহের সময় করবেট সাহেবের মা মেরি জেন-এর প্রথম স্বামী আগরার চার্লস জেমস ডয়েলের মৃত্যু হয়। মাত্র একুশ বছরের মেরি জেন তখন তাঁর তিনটি শিশু সন্তান নিয়ে পড়লেন একেবারে অকূলপাথারে! এমন সময় মুসৌরিতে মেরি জেনের সঙ্গে পরিচয় হল উইলিয়াম ক্রিস্টোফার করবেট নামক এক সাহেবের। তিনিও তখন তাঁর স্ত্রীকে হারিয়ে তিনটি শিশু সন্তান নিয়ে একেবারে দিশেহারা! বছর খানেক বাদে, উইলিয়াম ক্রিস্টোফার করবেট ও মেরি জেন তাঁদের দু'জনেরই প্রথম পক্ষের মোট ছ'জন সন্তান নিয়ে নতুন সংসার গুছিয়ে বসলেন। বছর কয়েক মুসৌরি, মথুরা নানা জায়গায় কাটিয়ে ১৮৬২ সাল নাগাদ শেষমেশ নৈনিতালে এসে থিতু হন করবেট পরিবার।

এর বছর তেরো বাদে ১৮৭৫ সালের ২৫ জুলাই জন্ম হয় এডওয়ার্ড জেমস করবেটের। যাঁকে আমরা সবাই জিম করবেট নামেই চিনি। কুমায়ুন-গাড়োয়াল-এর মানুষদের কাছে যিনি 'কার্পেট সাহিব' নামেই পরিচিত। ১৯০৭ থেকে ১৯৩৮ সাল—টানা একত্রিশ বছর ধরে জিম করবেট শিকার করেছেন। এই তিন দশকের শিকার জীবনে করবেট সাহেব মোট তেত্রিশটি মানুষখেকো বাঘকে গুলিবিদ্ধ করেন। করবেট সাহেবের প্রথম শিকার ছিল চম্পাবতের মানুষখেকো বাঘ। সরকারি নথি অনুযায়ী এই মানুষখেকোটি প্রায় ৪৩৬টি প্রাণ কেড়ে নেয়। যাই হোক, আমি আজ তোমাদের জিম করবেটের শিকার জীবনের কাহিনি শোনাতে তো বসিনি। আজ বলব, করবেট সাহেবের শেষ জীবনের গল্প।

গোড়াতেই বলছিলাম দেশ স্বাধীনের পর এক নিদারুণ অবস্থার মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন করবেট সাহেব আর তাঁর বোন ম্যাগী। করবেট সাহেবের মনে ভয় ধরে গিয়েছে, ভারতবর্ষ ইংরেজ শাসনের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে, স্বাধীনতা লাভ করলেই এ-দেশে তাঁদের আর কোনও জায়গা থাকবে না। এমনকী নৈনিতাল, কালাধুঙ্গি অঞ্চলের প্রিয় মানুষগুলোও বুঝি করবেট সাহেবদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। কাছের কয়েকজন বন্ধুদের কাছে করবেট সাহেব একদিন বলেই বসলেন— 'জানো, এ-দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমাদের দেখার আর কেউ থাকবে না!

আমরা মরে গেলে কবর দেবার লোকও আর কেউ থাকবে না।'

করবেট সাহেব ভারতকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন। দেশের মানুষদের প্রতি, বিশেষ করে কুমায়ুনের সহজ-সরল মানুষগুলোর প্রতি করবেট সাহেবের যে আত্মিক টান—তাকে কেমন করে মুছে ফেলবেন তিনি! রাত-দিন এই চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে! বোন ম্যাগীও একই রকম মানসিক অশান্তিতে ভুগছেন। তাঁরা জাতে সাহেব তো কী? মনে-প্রাণে তাঁরা তো ভারতীয়। তাঁদের জন্ম-কর্ম সবই এদেশে। এত বছর ভারতে কাটিয়ে শেষ জীবনে দেশ-ছাড়া কি চাট্টিখানি কথা! অথচ, এমন অনিশ্চিত জীবনই-বা কদ্দিন কাটানো যায়? একে-একে সব সাহেব বন্ধুবান্ধবরা এ-দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, বিপদে-আপদে কাকেই-বা পাশে পাবেন তাঁরা?

১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাস। কড়া শীত নৈনিতালে। দিনের বেলা সূর্যের ঔজ্জ্বল্যে নৈনিতাল শহরটা ঝলমল করে ওঠে। আশেপাশের জঙ্গলের গাছপালাগুলোর সবুজ রঙ যেন ঠিকরে বেরোয়। ওক, অ্যাকাশিয়া, বার্চ ইত্যাদি গাছের আড়ালে-আবডালে ঘিরে থাকা কালাধুঙ্গি গ্রাম, ছোটি হলদেয়ানি গ্রাম আর ওই দূরে নন্দা, ত্রিশূল, পঞ্চচুল্লির অপরূপ সৌন্দর্যে ঘেরা কুমায়ুনের শৈল শহর নৈনিতাল ছেড়ে সারা জীবনের মতো বিদায় নিতে হবে করবেট সাহেব ও তাঁর বোন ম্যাগীকে।

২১ নভেম্বর ১৯৪৭—মিসেস কলাবতী ভার্মা নামে এক মহিলার কাছে করবেট সাহেব তাঁর সাধের 'গারনে হাউস' বাড়িটিকে বিক্রি করে দিলেন নাম মাত্র টাকার বিনিময়ে। ওদিকে তাঁর কালাধুঙ্গির অমন সুন্দর বাড়িটাও কিছুদিন পর মাত্র দু'হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রি হয়ে গেল। করবেট সাহেব ঠিক করে ফেলেছেন তাঁর বোনকে নিয়ে তিনি আফ্রিকা মহাদেশের কেনিয়াতে চলে যাবেন। সেখানেই তিনি তাঁর শেষ জীবনের বাকি সময়টুকু কাটাবেন।

রাত্রি তখন গভীর হয়েছে। ঠান্ডায় ঘরের বাইরে টেকা দায়। চারিদিক নিশ্চুপ, জনমানবের চিহ্ন নেই আশেপাশে। মাঝেমধ্যে নিশাচর প্রাণীদের ইতিউতি ডাক শোনা যাচ্ছে কেবল। ঘন অন্ধকারের মধ্যেই করবেট সাহেব পায়চারি করছেন তাঁর সাধের বাংলো-বাড়ি 'গারনে হাউস'-এর বারান্দায়। তাঁর শেষ বেয়ারা রাম সিংকে আগে থেকেই সময় দিয়ে রেখেছিলেন তিনি। রাম সিংও তাঁর মালিকের নির্দেশমতো ঠিক সময়ে উপস্থিত হলেন। করবেট সাহেব প্রথমে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বারান্দার এক কোণে রাখা একটি বস্তার দিকে আঙুল দিয়ে নির্দেশ করলেন রাম সিংকে। বললেন, 'ওটা কাঁধে তুলে নাও।' রাম সিং সেটা কাঁধে তুলতেই বুঝলেন বস্তাটা বেশ ভারী। কিন্তু তিনি তার মালিককে কোনও প্রশ্ন করলেন না। তারপর করবেট সাহেব একটা সিগারেট ধরিয়ে টর্চ হাতে বাংলোর সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এসে হাঁটা লাগালেন জঙ্গলের উদ্দেশ্যে। রাম সিংও চললেন তাঁর পেছন-পেছন।

জঙ্গলের মাটিতে শিশির-ভেজা ঘাসের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছেন করবেট সাহেব। জঙ্গল ক্রমশ গভীর হচ্ছে। বেশ খানিকক্ষণ হেঁটে কিছু ঝোপঝাড়ের আড়ালে গিয়ে থামলেন তিনি। রাম সিংও করবেট সাহেবের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না কী করতে চাইছেন তার মালিক। এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটি নির্দিষ্ট জায়গার উপর টর্চের আলো ফেললেন করবেট সাহেব। রাম সিং দেখলেন সেখানে দু'টো বড় পাথর দিয়ে জায়গাটা চিহ্নিত করা রয়েছে। এরপর সাহেবের নির্দেশে বস্তাটা ঘাড় থেকে নামিয়ে সেটা খুলে রাম সিং দেখলেন তাতে রয়েছে শাবল, কোদাল, দুটো শটগান আর তিনটে রাইফেল। রাম সিংয়ের এবার বুঝতে এতটুকুও অসুবিধে হল না যে তাঁর মালিক ঠিক কী করতে চাইছেন!

করবেট সাহেব নির্দেশ দিলেন শাবল-কোদাল সহযোগে চিহ্নিত জায়গাটিকে খুঁড়ে ফেলতে। রাম সিং-ও মালিকের হুকুম পালন করলেন। বেশ কিছুটা গভীর গর্ত হওয়ার পর করবেট সাহেব থামতে বললেন রাম সিংকে। নিজে এগিয়ে এসে একবার দেখে নিয়ে বস্তার দিকে হাত বাড়ালেন। তারপর একে-একে রাইফেল, শটগানগুলোকে হাতে নিয়ে একবার চুমো খেয়ে নামিয়ে দিলেন গর্তের মধ্যে। এই রাইফেলগুলোর মধ্যেই হয়তো কোনও একটা দিয়ে তিনি রুদ্রপ্রয়াগের সেই মানুষখেকো চিতাবাঘকে ঘায়েল করেছিলেন।

রাম সিং দূরে দাঁড়িয়েছিলেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাবে। এবার তিনি আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। হাউহাউ করে কেঁদে ফেললেন। সাহেব এগিয়ে এসে রাম সিং-এর মাথায় তাঁর হাত দু'টোকে রেখে সান্ত্বনা দিলেন। খানিক বাদে করবেট সাহেব রাম সিংকে বললেন, মাটি ফেলে গর্তটা বুজিয়ে দিতে। তারপর ধীর পায়ে আবার বাংলোয় ফিরে এলেন।

৩০ নভেম্বর ১৯৪৭ সালে জিম করবেট তাঁর বোন ম্যাগীকে নিয়ে রওনা দিলেন আফ্রিকার উদ্দেশে। ম্যাগী পরবর্তীকালে বিদায়-বেলার স্মৃতিরোমন্থন করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'যেদিন সকালে আমরা চলে যাব, লেকের জলের দিকে তাকিয়ে ছিলাম এক দৃষ্টিতে। সকালের সূর্যের আলোকরশ্মি লেকের জলে পড়ে লেকটা ভারি অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। আমাদের পুরানো চাকর-বাকরের দল খুব সহজে আমাদের বিদায় দেয়নি। একপাশে সারিবদ্ধভাবে ওরা দাঁড়িয়েছিল। প্রত্যেকের চোখেই জল। পাহাড় থেকে নামার সময় আমাদের বুক ভেঙে যাচ্ছিল, কারণ জানতাম যে আর কোনওদিনই আমরা এই অপূর্ব সুন্দর পাহাড়টাকে দেখতে পাব না।'

কালাধুঙ্গি, ছোটি হলদেয়ানির গ্রামের মানুষগুলোর কাছে করবেট সাহেব তাঁদের চলে যাবার দিনটা গোপনই রেখেছিলেন। কারণ, আজীবন জড়িত মানুষগুলোও তাঁদেরকে ছেড়ে দিতে চাইবে না সহজে। চলে যাবার মুহূর্তে তাঁদের করুণ মুখগুলো দেখতে মন চায়নি করবেট সাহেবের।

কুমায়ুন ছেড়ে সেখান থেকে প্রথমে তাঁরা লক্ষ্ণৌর উদ্দেশে রওনা দেন। তখনও তাঁদের সঙ্গে ছিল করবেট সাহেবের খাস বেয়ারা রাম সিং। তারপর লক্ষ্ণৌ থেকে বোম্বাইয়ের ট্রেন। ট্রেন ছাড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে রাম সিং ভেঙে পড়লেন। করবেট সাহেব ও তাঁর বোন ম্যাগীও চোখের জলে বিদায় জানালেন তাঁদের খাস বেয়ারা রাম সিংকে।

দেশ ছাড়ার আগে অবিশ্যি করবেট সাহেব রাম সিংয়ের জন্য কালাধুঙ্গিতে এক প্রস্থ জমি দেন আর ব্যাংকে মাসিক দশটাকা মাসোহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করে যান। তবে, রাম সিং কালাধুঙ্গিতে ফিরে তাঁর মালিকের দেওয়া সেই জমি বিক্রি করে গাড়োয়ালে ফিরে যান।

যাই হোক, বোম্বাইয়ে পৌঁছে সেখান থেকে 'এস এস অ্যারোন্দা' জাহাজে চেপে করবেট সাহেব ও তাঁর বোন ম্যাগী রওনা দিলেন মোম্বাসার উদ্দেশে। প্রায় সপ্তাহ দুয়েকের জাহাজযাত্রায় করবেট সাহেব সী-সিকনেসে ভুগলেন ক'টা দিন। তারপর ১৫ ডিসেম্বর তারিখে জাহাজ মোম্বাসা বন্দরে থামলে পর করবেট সাহেব ও ম্যাগী সোজা চেপে বসলেন নাইরোবির ট্রেনে।

নাইরোবি পৌঁছে সেখানে স্যার উইলিয়াম ইবট্‌সনের বাড়িতে দিন কয়েক কাটিয়ে কারেন হয়ে তাঁরা চললেন কিপ্‌কারনে নামে একটি জায়গায়। সেখানে দু'শো চল্লিশ একর জমির উপর কফি ফার্ম গড়ে তুলেছেন রে নেসস্টার ও তাঁর স্ত্রী। সেখানেই করবেট সাহেব ও ম্যাগীর জন্য একটি কটেজ তৈরি করে রাখেন রে নেসস্টার। কিছুদিন সেখানে কাটানোর পর ম্যাগী ভীষণ রকমের বিরক্ত হয়ে ওঠেন। তাঁর বক্তব্য, এমন অনুন্নত জায়গায় তাঁর পক্ষে বাস করা অসম্ভব। তাঁর চাই কিছুটা বিলাসবহুল জীবন।

অগত্যা, করবেট সাহেব তাঁর বোন ম্যাগীকে নিয়ে চললেন টম করবেটের বাসস্থানে। কিছুদিন থাকার পর সে জায়গাটিকেও মানিয়ে নিতে পারলেন না ম্যাগী। শেষমেশ নিয়েরের আউটস্পান হোটেলে এসে তাঁরা থিতু হলেন। এ-জায়গাটি ম্যাগীর মনে ধরল বটে।

অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়
এমনি কপাল

হাড়কেপ্পন ইন্দু বসাক
একলা থাকেন গড়িয়ায়,
এক বেলাতেই আহার সারেন
বউ-ছেলে তার ঝরিয়ায়।

ইন্দু বসাক লোকটি এমন
মুঠোয় টাকা গলে না,
এক পোশাকেই হপ্তা চালান
নইলে যে তার চলে না।

তিনকেলে তার জীর্ণ ডেরায়
বিষ্টি হলেই কম্ম শেষ,
সাততালি তার মলিন ছাতায়
বলেন, আছি এইতো বেশ।

মেঝের মাটি খুঁড়ছে ইঁদুর
গর্তে বোঝাই বিলক্ষণ,
এমনি কপাল, এক রাতে সেই
গর্তে মেলে গুপ্তধন।

রাখী নাথ কর্মকার
ভাবী শিল্পীর ভাবনারা

এই দেখো তারা ফোটে টুপটাপ আলো রাতে
ভ্যান গগ তেলরঙে মগ্ন সে জলসাতে!

ওই দেখো গিটারিস্ট, সুরভাসি নীল ডুব
পিকাসোর তুলি যেন কথা বলে অনুরূপ।

ওই দেখো মাতা মেরি 'পিয়েতা'য় ভাস্বর
মাইকেল এঞ্জেলো...পাথরের মায়া স্বর!

যদি দেখো মোনালিসা, রহস্য অবিচল
শাশ্বত ভিঞ্চি, যুগে যুগে অণু পল।

যামিনী, নন্দলাল, অবন ঠাকুর বুকে
রামকিঙ্কর জাগে ইচ্ছেরঙের সুখে...

ওই দেখো আমিও রাঙিয়েছি মন-তুলি
রংভরা ক্যানভাসে...বেরঙা কষ্ট ভুলি!

এই হোটেলের ভেতরে বাগান ঘেরা একটি কটেজ ভাড়া নিলেন তাঁরা। ভারি সুন্দর সেই কটেজ। মাউন্ট কেনিয়া পাহাড়টিকেও স্পষ্ট দেখা যায় কটেজ থেকে। এখানে এসে ম্যাগী যেন তাঁদের প্রিয় 'গারনে হাউস'-এর স্বাদ কিছুটা ফিরে পেয়েছেন।

করবেটও নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন নতুন জায়গায় এসে। ইদানীং লেখালিখির দিকে সময় দিচ্ছেন বেশি করে। আর বাদবাকি সময়টা পাখিদের খাইয়ে, গাছপালা দেখেই কাটিয়ে দেন তিনি। মাঝেমধ্যেই কুমায়ুনের মানুষগুলোর কথা, সেখানকার জায়গার কথা, তাঁর শিকার জীবনের দিনগুলো চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মনে পড়ে তাঁর প্রথম জীবনের কথা। মাত্র চার বছর বয়েসে বাবাকে হারানোর পর বড় দাদা টম তাঁর বাবার পোস্টমাস্টারির চাকরি পান। সংসারে অতজন সদস্য। কিন্তু উপার্জনের লোক কম। কাজেই অভাবের জেরে স্কুলের পর পড়াশুনোটা আর এগোতে পারেননি তিনি। একসময়ে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার শখও ছিল তাঁর। কিন্তু সেসব পূরণ হল কই? রোজগারের তাগিদে টানা একুশ বছর বিহারের মোকামাঘাটে রেল কোম্পানির হয়ে কুলির ঠিকাদারির কাজ করতে হয় তাঁকে। তারপর তো সেখান থেকে ফিরে এসে শুরু হয় তাঁর শিকার জীবন।

যাই হোক, সেসব গল্প আজ আর নাই-বা বললাম। এখানে তো বলতে বসেছি করবেট সাহেবের শেষ জীবনের গল্প। আফ্রিকায় এসে নিয়রে পাকাপাকি ভাবে বসবাস শুরু করার কিছুদিন পর তিনি ব্যবসার দিকে ঝুঁকলেন। সেখানকার তিন বন্ধুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে তিনি একটি সাফারি কোম্পানিতে বিনিয়োগ করলেন। কোম্পানিটির নাম—সাফারিল্যান্ড। কিছুদিনের মধ্যেই সেই কোম্পানি ফুলে-ফেঁপে উঠল। সারা পৃথিবী থেকে লোকেরা আসতে শুরু করলেন। হলিউড থেকে ফিল্ম কোম্পানির লোকেরা এলেন করবেট সাহেবের লেখা বইয়ের চিত্র-স্বত্ব কিনতে। এমনকী এই সময়ে করবেট সাহেব বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ার, নানান জাতের পাখির রঙিন ছবিও তুলতে শুরু করলেন। চুপচাপ বসে থাকার লোক তো তিনি নন। নিজেকে নানান কাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন।

ক'বছর সুখে-শান্তিতে দিব্যি কেটে গেল। মাঝে মধ্যে অবশ্য অসুস্থ হয়ে তাঁকে হাসপাতালেও যেতে হয়েছে বেশ কয়েকবার। ব্রংকাইটিসে ভুগে জর্জরিত করবেট সাহেব নিজেকে সামলেও নিয়েছিলেন। তবে এবার আর শরীর সায় দিল না। ১৯৫৫ সালের ১৯ এপ্রিল ওঁর প্রথম হার্ট অ্যাটাক হল। বুকে প্রবল যন্ত্রণা নিয়ে নিয়রের একটি হাসপাতালে তিনি ভর্তি হলেন। সেদিনই বিকেলে তিনি চোখ বুজলেন। কাছেই সেন্ট পিটার্স অ্যাংকলিকান চার্চের প্রাঙ্গণে তাঁকে কবর দেওয়া হল।

আজীবন ভারতকে ভালোবেসেছিলেন করবেট সাহেব। দেশ ছাড়ার মাস খানেক আগে বন্ধু ব্র্যান্ডারকে চিঠিতে লিখেছিলেন তিনি—'The India that you and I loved has been sacrificed on the altars of ambition and greed.'

মৃত্যুর আগে করবেট সাহেব তাঁর বোন ম্যাগীকে বলেছিলেন, 'সাহসী হও। চেষ্টা করো আগামীদের জন্য পৃথিবীটা যেন আরও সুন্দর হয়ে ওঠে।'

তাঁর প্রিয়তম জানোয়ার বাঘ সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, 'বাঘ উদারহৃদয় ভদ্রলোক। সীমাহীন তার সাহস...যদি বাঘের সপক্ষে জনমত গড়ে না ওঠে বাঘ লোপ পাবেই, তা হলে ভারতের শ্রেষ্ঠতম প্রাণীর বিলোপে ভারত দরিদ্রতরই হবে।'

কথাগুলো আজ বড় সার্থক হয়ে উঠেছে।

সহায়ক গ্রন্থ :

Carpet Sahib : Martin Booth
Jim Corbett of Kumaon : D. C. Kala
জিম করবেট-এর কথা : মহাশ্বেতা দেবী
কার্পেট সাহেব : অরণি বন্দ্যোপাধ্যায়
অন্য চোখে : বুদ্ধদেব গুহ

সমুদ্র বসু

ব্যতিক্রমী দুর্গাদের খোঁজে

একই দেবী, অথচ এই বাংলাতেই তাঁর কত না রূপবৈচিত্র্য। আঞ্চলিকতা ভেদে এই সব প্রাচীন পুজোগুলিতে দেখা যায় ব্যতিক্রমী আচার ও পুজো পদ্ধতি। নানা রূপে তাঁর পুজো হয়। কোথাও তাঁর দশ হাত, কোথাও আঠেরো, কোথাও চার। কোথাও আবার তিনি শিবের কোলে আসীন, দ্বিভুজা, সিংহ বা অসুর নেই। দুর্গার ধ্যানমন্ত্র অনুযায়ী, দেবী তপ্তকাঞ্চনবর্ণা বা অতসীপুষ্পবর্ণা। কিন্তু বহু জায়গায় তাঁর গায়ের রঙেও এসেছে বৈচিত্র। দেখে নেওয়া যাক সেই সব ব্যতিক্রমী দুর্গামূর্তির কয়েকটিকে।

আটটি লুক্কায়িত হাতের দুর্গা

দেবীর সামনের দুটো হাত শুধু দেখা যায়। বাকি আটটা হাত, যা আঙুলের মতো, চুলে ঢাকা থাকে। এখানে দেবীর গায়ের রং শিউলি ফুলের বোঁটার মতো। সাবেক বাংলার ডাকের সাজে সজ্জিত প্রতিমার চোখ বাঁশপাতার মতো। দেবীর ডানদিকে থাকে কার্তিক, বাঁদিকে গণেশ। আর বাহন পৌরাণিক সিংহ।

হুগলি জেলার বলাগড়ের পাটুলিতে দীর্ঘ কয়েকশো বছর ধরে ব্যতিক্রমী এই দুর্গাপুজো হয়ে আসছে। পাটুলির মঠবাড়ির সেই দ্বিভুজা দুর্গার প্রচলিত নাম 'মঠের মা'।

পাটুলির মঠবাড়ির পুজো নিয়ে একাধিক কাহিনি শোনা যায়। কোনও কোনও গবেষকের মতে, বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয়ের ফলে বহু বৌদ্ধতান্ত্রিক দেব-দেবী হিন্দু লৌকিক দেব-দেবীতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন।

কিছু কিছু বৌদ্ধতান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠান আজও রয়ে গিয়েছে মঠবাড়ির দুর্গাপুজোয়। এই পুজোয় সন্ধিপুজো হয় না। জনশ্রুতি বলে, অতীতে অর্ধরাত্রি পুজোয় দেবীর উদ্দেশে নরবলি দেওয়া হতো। বলির মানুষটি নাকি স্বেচ্ছায় আসতেন। সময়ের সঙ্গে এই প্রথা বন্ধ হয়ে যায়। পরিবর্তে চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি নরমূর্তি বলি দেওয়া হয়। আগে পাঁঠা বলি হতো। বলির পরে সেই পাঁঠার ছাল ছাড়িয়ে টুকরো টুকরো মাংসের সঙ্গে মাসকলাই ও দূর্বা দিয়ে চৌষট্টি যোগিনীর উদ্দেশে নিবেদন করা হতো। এখন পশুবলি হয় না। তবে চালের গুঁড়োর তৈরি নরমূর্তি বলির পরে একই উপায়ে নিবেদন করা হয়।

ত্রিভুজা দুর্গা

হুগলি জেলার বলাগড় ব্লকের সোমড়াবাজারের সেন পরিবারে দেবী পূজিতা হন ত্রিভুজা রূপে। বাংলা তো বটেই, দিল্লির ইতিহাসেরও নানা উত্থান পতনের চিহ্ন বয়ে নিয়ে চলেছে এই সেন পরিবার।

১৭৬০ সালে রাজা রামচন্দ্র সেনের হাত ধরেই এই পুজো শুরু হয়েছিল। সেই থেকেই চলে আসছে পুজো। কিন্তু, এই বাড়ির দেবী ত্রিভুজা রূপে পূজিতা হন কেন? জানা যায়, এই রূপ আসলে স্বপ্নাদিষ্ট। স্বপ্নে এই অবয়বেই দেবীকে পুজো করার নির্দেশ পেয়েছিলেন রামচন্দ্র সেন। তবে, পুজো যাতে নিখুঁত হয়, সে জন্য প্রথম থেকেই দেবীর দুই

কাঁধেই আরও ছোট ছোট সাতটা হাত থাকে। সেগুলি অবশ্য প্রকাশ্যে নয়। দেবীর দুটি দক্ষিণ অর্থাৎ ডান হাত। আরেকটি বাম হাত। সমবেত ভাবে দেবী দশভুজা। দেবীর উত্তোলিত দক্ষিণ হস্তে থাকে খড়্গ। দ্বিতীয় দক্ষিণ হস্তে থাকে শূল। বাম হস্তে দেবী অসুরের কেশ ও নাগপাশ ধারণ করেছেন।

চতুর্ভুজা দুর্গা

হুগলির জনাইয়ের বাকসার চৌধুরী পরিবারের শতাব্দী প্রাচীন দুর্গাপুজো দালান মূলত এলাকার লোকজনের মিলনক্ষেত্র। পুজোর

কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের বাড়ি, কার্তিক-গণেশের স্থান বদল, কুমোরটুলি, কলকাতা

চারটে দিন এ বাড়িতেই হইহই করে কাটান তারা। এ পরিবারের দুর্গা চতুর্ভুজা। কথিত আছে, এ পরিবারের এক সদস্যকে মা স্বপ্নাদেশে জানিয়েছিলেন চার হাতের কথা। একইসঙ্গে মুখমণ্ডলে যেন অসুর বধের পর তৃপ্তির হাসি থাকে, তাও বলে দেন।

আবার নদীয়ার কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জমিদারিতে নায়েব ছিলেন মুর্শিদাবাদের কান্দির খড়গ্রাম থানার বালিয়া গ্রামের বাসিন্দা প্রয়াত বৈকুণ্ঠ নারায়ণ সিংহ। তিনি ছিলেন খুবই ঠাকুর ভক্ত। পরবর্তীকালে এক সময় গ্রামের মানুষের মঙ্গল কামনায় উমার স্বপ্নাদেশ পেয়ে চার হাতের দুর্গার পুজো শুরু করেন তিনি মুর্শিদাবাদের খড়গ্রামে।

হরিপাল থানার নালিকুল বড়গাছিয়া সিংহরায় বাড়ির চার হাতের দুর্গা পুজো ২৫০ বছরেরও পুরোনো। একচালা চার হাতের অভয়া দুর্গা প্রতিমা, সবুজ রঙের মহিষাসুর দেখতে দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসেন বহু মানুষ। হরিপালের বন্দিপুরে এই দুর্গাপুজোর সূচনা হয়।

এগরা শহরের দীঘা মোড়ের মাইতিবাড়ির চতুর্ভুজা দুর্গার চারটি হাতের একটিতে চক্র, এক হাতে শঙ্খ, এক হাতে ত্রিশূল ও আর অপর হাতে থাকে কৃপাণ। তাই অন্যান্য পুজোমণ্ডপের পাশাপাশি মাইতি পরিবারের চতুর্ভুজা দুর্গার মণ্ডপেও দর্শনার্থীদের ভিড় জমে যায়। কথিত আছে, মা দুর্গা মাইতি বাড়িতে এসেছিলেন পুতুল রূপে। ১৯২৫ সালে পুজোর সূচনা হয়। সেই হিসেবে পুজোর বয়স প্রায় একশো ছুঁই ছুঁই।

অষ্টাদশভুজা দুর্গা

হুগলি জেলার কোন্নগরে গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে সাধুরঘাটে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীকালী মাতা আনন্দ আশ্রমে প্রতিবছর নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে ১৮ হাত দুর্গার পুজো হয়ে থাকে। শ্রীশ্রীচণ্ডী অনুযায়ী, এটি মহাদুর্গার ১০ হাত, মহালক্ষ্মীর ৪ হাত ও মহাসরস্বতীর ৪ হাতের সমন্বয়ে সৃষ্ট। ১৩২৮ বঙ্গাব্দে তান্ত্রিক সূর্য নারায়ণ সরস্বতী মহারাজ কালীমাতা আনন্দ আশ্রমে এই পুজোর প্রচলন করেন।

অর্ধকালী-দুর্গা

দেবী দুর্গা ও দেবী কালী, শক্তির দুই রূপ। মায়ের এই দুই রূপই এক বিগ্রহে পূজিতা হয়ে আসছে বাংলার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুভাষগ্রামের দুর্গাবাড়িতে। শারদলক্ষ্মী এখানে অর্ধকালী-অর্ধদুর্গা।

১৫৮ বছরের প্রাচীন এই পুজোর পিছনে রয়েছে একটি আশ্চর্য ইতিহাস। সময়টা ১৮৬৪ সাল। স্থান, পূর্ববঙ্গের ঢাকা জেলার বিক্রমপুর। সেখানকার মেদিনীমণ্ডলের দারোগা হরিকিশোর ঘোষ এক রাতে স্বপ্নাদেশ পেলেন জগজ্জননী মায়ের। পরদিন থেকে শুরু হল পুজোর তোড়জোড়। শুভ তিথিতে সূচনা হল প্রতিমা নির্মাণ। চিন্ময়ী দেবী রূপ পেতে লাগলেন মৃন্ময়ী প্রতিমায়। কিন্তু শেষ পর্যায়ে পটুয়ারা হলুদ রং করতেই মূর্তির ডান দিকের অংশে রং বদলে যায় কালোতে। এই সঙ্কটের মুহূর্তে কুলপুরোহিত উপদেশ দিলেন দেবীকে অর্ধকালী-অর্ধদুর্গা রূপ দিতে। সেই থেকে আজও দেবী এই নতুন রূপে সুভাষগ্রামের ঘোষেদের বসতবাটিতে আসেন।

দেশভাগের পর ঘোষ বংশের উত্তরপুরুষরা চলে এসেছেন এপার বাংলায়, সঙ্গে এনেছেন পুজোর কিছু বাসনপত্র ও বলিদানের খড়্গ। এনেছেন ওপার বাংলার পুজো-বেদির এক মুঠো মাটি, যা মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে এখনকার পুজো-দালানের মাটিতে। দুর্গাপুজোর ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়েনি কখনও।

একচালার প্রতিমা ঠিক মাঝ বরাবর চুলচেরা ভাগ—এক দিকে

অর্ধকালী-অর্ধদুর্গা, সুভাষগ্রাম, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

অমানিশারূপী দেবী কালিকা এবং অন্য দিকে তপ্তকাঞ্চনবর্ণা দেবী দুর্গা। দশভুজা দেবীর ডান পা সিংহের পিঠে আর বাম পা অসুরের কাঁধে। মহিষাসুর দেবী কালিকার হাতের শূলে বিদ্ধ। ডান দিকে লক্ষ্মী এবং কার্তিক, বাম দিকে সরস্বতী এবং গণেশ, একটু অন্য রকম এঁদের অবস্থিতি।

বিশেষ এই রূপের মতো পুজোর আচার-বিধিও একটু আলাদা। 'বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণ' মতে পুজো হয়। ভাদ্র মাসের শুক্লা সপ্তমী, অর্থাৎ ললিতাসপ্তমী তিথিতে হয় কাঠামোপুজো। সপ্তমীর সকালে চক্ষুদান ও প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর হয় মহাস্নান। দর্পণে প্রতিফলিত দেবীর প্রতিবিম্বকে স্নান করানোর রীতি এখানে। মহাস্নানের জন্য তিন সমুদ্রের জল, গঙ্গার জল, দুধ, শিশির, মধু ইত্যাদি ১০৮ রকমের জল প্রয়োজন হয়। পুজোর তিন দিনই একটি করে আখ, চালকুমড়ো বলি হয়। নবমীর দিন হয় শত্রুবলি—চালের পিটুলি দিয়ে মানুষের আকৃতি গড়ে কচুপাতায় মুড়ে বলি হয়। এটি ষড়রিপু নাশের প্রতীকী অনুষ্ঠান। অন্নভোগ দেওয়ার রীতি নেই, পরিবর্তে সাড়ে বারো কেজি চালের নৈবেদ্য হয়। দশমীর দিন বিদায়ের আগে মেয়েকে একেবারে গ্রামবাংলার নিজস্ব আহার্য দেওয়া হয়। সেই নৈবেদ্যে থাকে বোরোধানের চাল, কচুর লতি, শালুক, শাপলা, শাক, আমড়া। দশমীর সকালে দর্পণ বিসর্জন হয়।

রক্তবর্ণ দুর্গা

সাড়ে তিনশো বছরের বেশি পুরোনো রক্তবর্ণ দুর্গাপ্রতিমার পুজো হয়ে আসছে নবদ্বীপের যোগনাথতলার ভট্টাচার্য পরিবারে। এঁদের আদি নিবাস পূর্ববঙ্গের ঢাকার মিতরায় গ্রামে।

আগে এরা অতসীবর্ণা দুর্গারই আরাধনা করতেন। একবার বংশের আদিপুরুষ রাঘবরাম ভট্টাচার্য চণ্ডীপাঠ করছিলেন। হঠাৎ বিঘ্ন ঘটে, পুত্র রামেশ্বর পিতার মন্ত্র উচ্চারণের ভুল ধরিয়ে দেন সর্বসমক্ষে। একটি মতানুসারে, এর ফলে দেবী বিশেষ আনন্দিত হন এবং কাঠামো সমেত ঘুরে গিয়ে পশ্চিমমুখী অর্থাৎ রামেশ্বরের মুখোমুখি হন। আনন্দে তাঁর মুখের বর্ণ হয়ে ওঠে লাল।

আবার অন্য মতে, পুত্রের আচরণে ক্ষুব্ধ পিতা পুত্রকে মৃত্যুর অভিশাপ দেন। তখনই রাগে ও অপমানে দেবী রক্তবর্ণ ধারণ করেন। পিতার অভিশাপে দশমীর দিনই রামেশ্বরের মৃত্যু হয়। সেই থেকে এই পরিবারে লাল দুর্গারই পুজো হয়। দেবীকে পশ্চিমমুখীই রাখা হয় এবং চণ্ডীপাঠ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। ভট্টাচার্য পরিবার বাংলাদেশ থেকে চলে এসেছেন একশো বছর আগে। নবমীতে দেবীর ভোগে খোড় ও বোয়াল মাছ দেওয়ার প্রাচীন প্রথা চলে আসছে নিয়মনিষ্ঠা মেনে।

সন্তানহীন দুর্গামূর্তি, পরিবর্তে জয়া-বিজয়া

দেবীপক্ষের সূচনাতেই দুর্গাপুজো হয় পশ্চিম বর্ধমানের বার্নপুরের ধেনুয়া গ্রামে। দামোদরের তীরে অবস্থিত এই গ্রামে প্রতি বছরই দুর্গাপুজো হয় মহালয়ার দিনে। সমস্ত নিয়ম মেনে এক দিনেই শেষ হয় পুজো। ধেনুয়া গ্রামের পাশেই দামোদরের তীরে রয়েছে কালীকৃষ্ণ আশ্রম। সেখানেই হয় এক দিনের দুর্গাপুজো।

কথিত আছে, স্বপ্নাদেশ পেয়ে ১৯৭৮ সালে তেজানন্দ ব্রহ্মচারী এই পুজোর সূচনা করেছিলেন। তার পর থেকেই মহালয়ার দিন এই আশ্রমে পূজিতা হন দুর্গা। তবে এই পুজোয় মা দুর্গার সঙ্গে থাকেন না গণেশ, কার্তিক, লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং অসুর। বদলে মায়ের দু'পাশে থাকেন দুই সখী—জয়া এবং বিজয়া। ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এবং দশমীর পুজো একসঙ্গেই করা হয় ধেনুয়ায়।

নীলদুর্গা

আজকের কৃষ্ণনগর, নাজিরাপাড়ার চট্টোপাধ্যায় বাড়ির আদি বাসস্থান পূর্ব বাংলা। রথের দিনে কাঠামো পুজো করে প্রতিমা নির্মাণ শুরু হয়। মা দুর্গার গায়ের রং অপরাজিতা ফুলের মতো নীল। অনেক বছর আগে কুপির আলোয় মূর্তি গড়তে গড়তে পটুয়ারা ভুলে দুর্গাকে নীল রং করে ফেলে। কী ভাবে ঠিক হবে রং—ভাবতে ভাবতেই দেবীর স্বপ্নাদেশ—নীলমূর্তিই পুজো হবে এ ভিটেতে। সেই থেকে নীলদুর্গা মূর্তিতেই মা পূজিতা হচ্ছেন চট্টোপাধ্যায় বাড়িতে।

১৯৪৯ সাল থেকে কৃষ্ণনগরে পুজো শুরু হলেও এ পুজোর সূচনা বাংলাদেশের বরিশাল জেলার বামরাইল গ্রাম। ২৫০ বছরের বেশি সময়

হালদার বাড়ির দুর্গা, জৌগ্রাম, বর্ধমান পূর্ব

ধরে পুজো চলে আসছিল, এরই মধ্যে কোনও এক বছর নীলদুর্গার আবির্ভাব। দেশভাগের সময় চট্টোপাধ্যায় পরিবার এপারে এসে বসতি স্থাপন করেন কৃষ্ণনগরে। একচালার অনিন্দ্যসুন্দর প্রতিমা। নীলমূর্তির গায়ে লাল শাড়ি, জরির সাজ। অনেকের মতো পূর্ববঙ্গীয় রীতি অনুযায়ী এখানেও কার্তিক ডান দিকে এবং গণপতি দেবীর বাম দিকে। পুজো হয় তন্ত্রমতে। অষ্টমীতে কুমারীপুজো হয়। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, বামরাইলে এক সময় নরবলি হতো। আজও বলির প্রতীক স্বরূপ চালের পিটুলি দিয়ে মানুষ গড়ে বলি হয়। নবমীতে কুমড়ো, শশা বলি হয়। অন্নভোগের সঙ্গে থাকে মাছ। নবমীতে দেওয়া হয় সরলপিঠে, কলার বড়া ইত্যাদি। দশমীর বিদায়বেলায় মাকে দেওয়া হয় পান্তাভাত, কচু শাক, ডালের বড়া, সঙ্গে গন্ধলেবু।

ছেলেধরা দুর্গা

মা দুর্গা এখানে দুই হাতের। এক হাতে ধরে আছেন এক বালককে। বৈঁচির এই পুজো শুরু করেন ব্যবসায়ী বিনোদ দাঁ। শোনা যায়, তাঁর পূর্বপুরুষ চাঁদ সওদাগরের আমল থেকেই ব্যবসা করে আসছেন।

পুজোর পিছনে দারুণ এক গল্প আছে। জানা যায়, বাণিজ্যে যাওয়ার পথে চাঁদ সওদাগর নদীতে মায়ের এক বিশেষ রূপ দেখেছিলেন।

বাণিজ্যস্থলে পৌঁছে সেই দেশের রাজাকে বিশেষ রূপের কথা বলেন তিনি। রাজা তা দেখতে চান। কিন্তু চাঁদ সওদাগর সেই রূপ রাজাকে দেখাতে পারেন না। তখন রেগে গিয়ে ওই রাজা চাঁদ সওদাগরকে বন্দি করেন তাঁর বন্দিশালায়।

এরপর তাঁর পুত্র শ্রীমন্ত সওদাগর বাবাকে ওই রাজার বন্দিশালা থেকে উদ্ধার করতে রওনা হন। তিনিও যাত্রাপথে এই রূপেরই দেবীমূর্তি দর্শন করেন। তিনিও রাজাকে জানান, বাবা যে দেবীরূপের কথা বলেছিলেন, সেটি যথার্থ, কারণ তিনিও একই রূপের দেবীকে সমুদ্রে দেখেছেন। এবার রাজা শ্রীমন্তকে সঙ্গে নিয়ে সেই দেবীকে দেখতে আসেন। কিন্তু শ্রীমন্তও রাজাকে সেই দেবী মূর্তি দেখাতে পারেন না। রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে শ্রীমন্তকে

মঠবাড়ির দ্বিভুজা দুর্গা, বলাগড়, হুগলী

জলে নিক্ষেপ করেন। আর তখনই দেবী স্বয়ং জল হতে উঠে শ্রীমন্তের হাত ধরে তাঁকে রক্ষা করেন। তা দেখে চাঁদকে মুক্তি দেন রাজা। বাবাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে পরবর্তীকালে এই দেবীরূপই মূর্তি-আকারে প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীমন্ত সওদাগর। বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলেন বলে এই মূর্তির নাম হয় 'অভয়ারূপী দেবী'। ঘটনাচক্রে সেই মূর্তিই আজও পূজিত হচ্ছে বৈচির দাঁ পরিবারে।

কাটামুণ্ড দুর্গা

সাড়ে চারশো বছর ধরে 'কাটামুণ্ড'রূপে দেবী দুর্গার পুজো হয় বর্ধমান জেলার গোমাইয়ের রায় বাড়িতে। দেবীর এমন রূপ চোখে পড়া ভার। মাথা থেকে গলা পর্যন্ত মূর্তি বানিয়েই ফি-বছর দুর্গার আরাধনা করে রায় পরিবার।

গোমাইয়ের রায়েরা আগে ছিলেন মেমারির বাসিন্দা। ৪৫০ বছর আগে সেখান থেকে কাটোয়া মহকুমার কেতুগ্রামে চলে আসেন বংশের আদিপুরুষ গোবিন্দ রায়। গোবিন্দ রায়ের শর্ত ছিল, তিনি যেখানে বাস করবেন তার চারদিকে ব্রাহ্মণদের বাস হতে হবে। সেইমতো কেতুগ্রামের গোমাই গ্রামেই বসবাস শুরু করেন তিনি। তখন থেকেই দুর্গা পুজোর শুরু।

গোবিন্দ রায় ছিলেন ধনী বণিক। ধুমধাম করেই তাই পুজো শুরু করেন তিনি। তবে শুরু থেকেই কাটামুণ্ড রূপে দেবীর পুজো হতো কি না, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, প্রথম যে বার দুর্গা পুজোর আয়োজন করেন গোবিন্দ রায়, নিয়ম মেনে তখন দশভুজা মূর্তিই তৈরি হয়েছিল। কিন্তু পুজো শুরু হতেই ভেঙে পড়ে সেই মূর্তি। মাথা থেকে গলা পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে শুধু। জনশ্রুতি, এর পরেই স্বপ্নাদেশে ওই রূপেই দেবী তাঁর পুজোর নির্দেশ দেন। সেই থেকে কাটামুণ্ড দুর্গার পুজো হয়ে আসছে গোমাইয়ের রায় বাড়িতে।

পুজো ঘিরে আর একটি মতও প্রচলিত আছে। শোনা যায়, গ্রামের বাইরে ঠাকরুন পুকুরে একবার স্নানে গিয়েছিলেন গোবিন্দ রায়। সে সময়ে তিনি দেখেন, পুকুরে স্নান করছেন অপরূপা এক নারী। তাঁর মাথা আর গলাটুকু ছিল জলের বাইরে। নজর পড়তেই নিমেষে অদৃশ্য হয়ে যান ওই নারী। তার পরেই গোবিন্দ রায় স্বপ্নাদেশ পান। মাথা থেকে গলা পর্যন্ত মূর্তি বানিয়ে তা আরাধনার নির্দেশ দেন দেবী দুর্গা।

অভয়া দুর্গা—শিবক্রোড়ে

সাধারণত বেনে বাড়ির দুর্গাপূজায় এই মূর্তি দেখা যায়। ষাঁড়ের উপর শিব বসে রয়েছেন। তাঁর বাঁ কোলে দ্বিভুজা অভয়দাত্রী দুর্গা। লক্ষ্মী সরস্বতী গণেশ কার্তিক—সব নিজেদের জায়গায় বিরাজমান।

এমন মূর্তির কারণ খুঁজতে গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা সূত্র দিয়েছিলেন বিডন স্ট্রিটের বিখ্যাত 'ভোলানাথ ধাম'-এর শ্রী অজয় দত্ত। তিনি বলেছিলেন, তাঁরা ধনপতি সওদাগরের বংশধর। চুলচেরা ঐতিহাসিক বিচারে না গিয়েও মঙ্গলকাব্যের গল্প থেকেই আমরা জানতে পারি যে বণিক পরিবারগুলি সাধারণত ছিলেন শিবভক্ত। দেবীরা নিজেদের পূজা সমাজে প্রচলন করার জন্য তাঁদের নির্দেশ দেন। কিন্তু গোড়ায় সেই আদেশ তাঁরা পালন করতে চাননি। পরে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে যখন দেবীপূজা চালু হল, তখনও এমন মূর্তি তাঁরা কল্পনা করলেন, যেখানে শিবের জন্য নির্দিষ্ট হল উঁচু স্থান। শিব-দুর্গা প্রতিমাতেও শিবের মূর্তি বড় করে গড়া হয়, যাঁর কোলে বসানো হয় দুর্গাকে।

বনেদি এই বাড়িগুলির অধিবাসীরা মূলত বণিক সম্প্রদায়ের মানুষ। নিজেদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য তাঁরা বজায় রেখে চলেছেন পারিবারিক দুর্গোৎসবের মাধ্যমে। দুর্গাপ্রতিমার এই ভিন্ন রূপের সঙ্গে তাঁদের বাড়ির পুজোর ব্যবহৃত উপচার ও বিভিন্ন প্রথা-পদ্ধতি বার বার সে কথা মনে করিয়ে দেয়। এই সব বাড়িতে পুজোর সময় কিছু বিশেষ আচার অনুষ্ঠান লক্ষ করা যায়। যেমন অষ্টমী-নবমীর দিন ধুনো পোড়ানো। মহিলারা এক সঙ্গে বা এক-এক করে ঠাকুরের সামনে বসেন। তাঁদের দুই হাতে এবং মাথায় নতুন গামছা দিয়ে বিড়ে বানিয়ে তার উপর নতুন মালসা বসানো হয়। তার পর সেই মালসায় পোড়ানো হয় ধুনো। সন্তান ও পরিবারের মঙ্গলকামনায় এই অনুষ্ঠান পালন করেন বাড়ির মহিলারা।

আবার বিসর্জনের দিন ঠাকুর বরণ হয়ে যাওয়ার পর উঠোনে প্রতিমা নামিয়ে তার চারদিকে মহিলারা ঘুরে ঘুরে অঞ্জলি দেন। এই প্রথাকে বলা হয় 'বেড়া অঞ্জলি'। এ ছাড়াও বণিক বাড়ির প্রথা হিসাবে পুজোর দিনগুলিতে নাকে বড় বড় নথ ও পায়ে মল পরে থাকা অবশ্য কর্তব্য মনে করেন এই সব বাড়ির মহিলারা।

কলকাতার বেশ কয়েকটি পুরনো বাড়ির পুজোয় এই শিব-দুর্গা মূর্তি দেখা যায়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু বাড়ি হল বড়বাজারের বৈষ্ণবদাস মল্লিকের বাড়ি, বৌবাজারের গোবিন্দলাল দত্তের বাড়ি (বেলু বাড়ি), ঠনঠনিয়ার (দ্বারিকা) দত্ত বাড়ি, ঠনঠনিয়ার দুর্গাচরণ লাহার বাড়ি, বিডন স্ট্রিটের ভোলানাথ ধাম, ঝামাপুকুরের চন্দ্র বাড়ি, কাশীপুরের বংশীধর দত্তের বাড়ি, বেনিয়াটোলার দত্ত বাড়ি, চুঁচুড়ার শীলবাড়ি ও আঢ্যবাড়ি, আন্দুলের কুন্ডু বাড়ি ইত্যাদি।

অভয়া দুর্গা—শিবহীন, অসুরহীন ও সিংহযুক্ত

কলকাতা ও বঙ্গের আরও কয়েকটি বণিক বাড়িতে আর এক ধরনের অভয়া দুর্গাপ্রতিমা পুজো হয় এই শারদোৎসবের সময়। যেখানে দুর্গা দ্বিভুজা, শিব নেই, মহিষাসুরও নেই।

কলকাতার বৈঠকখানার নীলমণি সেনের বাড়ির পুজোতে এইরকম মূর্তি দেখা যায়। যশোরের বাসিন্দা সুবর্ণ বণিক নীলমণি সেন কলকাতায় এসে প্রথম জাকারিয়া স্ট্রিট অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। সেখানেই শুরু হয় দুর্গোৎসব। তিন খিলান বিশিষ্ট ঠাকুরদালান-সহ বৈঠকখানা রোডের এই বাড়ি তৈরি করেন নীলমণির পৌত্র কানাইলাল সেন। ১৯১৩ সাল থেকে পারিবারিক ঐতিহ্য মেনে এখানে দুর্গা 'অভয়া' রূপে পূজিতা হয়ে আসছেন। এই মূর্তিতে অসুর নেই, রক্তপাত নেই। দ্বিভুজা দেবীর এক হাতে অভয় মুদ্রা, অন্য হাতে বরদা মুদ্রা। পায়ের কাছে বসে আছে সিংহ, ঠিক যেন পোষা বেড়াল।

অভয়া দুর্গা—শিবহীন, অসুরবিহীন, সিংহবিহীন

আনুমানিক ১৭৩৪ সালে বাঁকুড়ার কোতুলপুর থেকে দয়ারাম দাঁ কলকাতার দর্জিপাড়ায় এসে বসতি স্থাপন করেন। গন্ধবণিক কৌলিক পরিচয়ের সঙ্গে বড়বাজারে শুরু করেন মশলার কারবার। ধীরে ধীরে ব্যবসা বাড়তে থাকে। পুত্র রামনারায়ণের সময় সেই বিত্ত-সম্পত্তি আরও বিস্তার লাভ করে। খুব কম বয়সে আদরের মেয়ে দুর্গারানির বিয়ে দিয়েছিলেন রামনারায়ণ দাঁ। খুব জাঁকজমক করে। বিয়ের পর ধুলোপায়ের দিন বাপের বাড়ি ফিরল দুর্গা। সেখানেই আক্রান্ত হল কলেরায়, আর রাত না পোহাতেই দাঁ বাড়ির সব উৎসবের আলো নিভে যায়।

মেয়ের কথা ভুলতে পারেন না রামনারায়ণ। সব সময় তাঁর মনে হতো, দুই বেণীতে লাল ফিতে লাগিয়ে বাড়িময় ঘুরে বেড়াচ্ছে ছোট মেয়েটি। এই স্মৃতিকে স্থায়ী করতে ১৭৬০ সালে বাড়িতে অভয়া দুর্গার পুজো প্রচলন করেন রামনারায়ণ দাঁ। কমলাসনে বসে যেন দুর্গারূপী সেই বারো বছরের মেয়েটি। মাথায় দুই বেণী আর তাতে লাল ফিতে। দ্বিভুজা মা, অনুপস্থিত সিংহ, অনুপস্থিত অসুর। বাম হাতে আশীর্বাদ করছেন দেবী। অনেকটা একই মূর্তি দেখা যায় বর্ধমান জেলার জৌগ্রামে হালদারবাড়ির পুজোয়।

কৃষ্ণবর্ণ দুর্গা

শোনা যায়, হিমালয়ের পাদদেশের কোথাও কোথাও নাকি কৃষ্ণবর্ণের অতসীপুষ্পও ফোটে, যা অতি দুষ্প্রাপ্য। দেবীর হয়তো কখনও সাধ জেগেছিল এমন কৃষ্ণবর্ণা রূপে আবির্ভূতা হতে। তাই তিনি কাউকে স্বপ্নাদেশ দিয়েছিলেন, কারও হাত দিয়ে বিশেষ পুঁথি পাঠিয়েছিলেন পূজার মূল উপকরণ হিসেবে।

বাংলাদেশের ঢাকা-বিক্রমপুরের বানিখাড়া গ্রাম। জমিদার রামরাজা ভট্টাচার্যের বাড়িতে মহা সমারোহে দুর্গাপুজো হচ্ছে। মুহূর্তের অসতর্কতায় ঘটে চরম দুর্ঘটনা। প্রদীপ থেকে আগুন ধরে যায় শনের ছাউনি দেওয়া দুর্গামণ্ডপে, ভস্মীভূত হয় গোটা মণ্ডপ। পুড়ে কালো হয়ে যায় প্রতিমা। এ অবস্থায় ভট্টাচার্য পরিবার পুজো নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত। তখনই স্বপ্নাদেশ পান, দেবীর বাসন্তী রং নয়, গাত্রবর্ণ তাম্রাভ আর মুখ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ—এমন বিচিত্র রূপেই পুজো করতে হবে দুর্গার।

দেশভাগের পর ভট্টাচার্য পরিবার চলে এসেছেন পশ্চিম বাংলার ক্যানিং-এ। কিন্তু ৪২৮ বছর ধরে চলা কৃষ্ণবর্ণের দুর্গাপুজোর ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়েনি কখনও। মূর্তি তৈরির পর পটুয়াদের এই প্রতিমার মুখ দেখা নিষিদ্ধ। একবার একজন কুমোর জোর করে দেবীর মুখ দেখায় তাঁর বাকশক্তি চলে যায়। সেই থেকে কোনও পোটো কখনও পুজোর সময় প্রতিমা দর্শন করেন না। এই দুর্গাপুজো নিয়ে শোনা যায় নানা অলৌকিক ঘটনা।

কলকাতার বেলেঘাটা এলাকার কৃষ্ণবর্ণ দুর্গাও বেশ পুরোনো। পুজোর ইতিহাস ২৮৯ বছরের। ওপার বাংলার হরিদেব ভট্টাচার্য ছিলেন পাবনা জেলার স্থলবসন্তপুরের জমিদার। জমিদারবাড়িতেই কৃষ্ণবর্ণা মা দুর্গার আবির্ভাব ঘটে প্রথম। নাটোরের রানি ভবানী হরিদেব ভট্টাচার্যকে স্থলবসন্তপুরের জমি-জায়গা প্রদান করেন। রানি ভবানীর আমলেই দুর্গাপুজো শুরু হল। কারণ কৃষ্ণবর্ণা মা বার বার স্বপ্নে দেখা দিচ্ছেন হরিদেবকে। কিন্তু মায়ের বর্ণ এমন বিচিত্র কেন? উত্তর খুঁজতে ভাটপাড়া, কাশীর পণ্ডিতদের সঙ্গে কথা বললেন তিনি। কোনও মতই মনঃপূত হল না তাঁর। একদিন আনমনা হয়ে কাশীর গঙ্গার ঘাটে বসে আছেন, এক সাধু এসে বিষণ্ণতার কারণ জিগ্যেস করলেন। সব শুনে সেই সাধু মাকে ভদ্রকালীরূপে পুজো করতে বললেন। দিলেন তালপত্রে লেখা এক প্রাচীন পুঁথি, যা অনুসরণ করে আজও পুজো হয় দেবীর।

ভট্টাচার্য বাড়ির কৃষ্ণবর্ণ দুর্গা, ক্যানিং, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

দেশভাগের পর এপার বাংলার বেলেঘাটায় চলে এসে ভট্টাচার্য পরিবার পুজো করে আসছে নিরবিচ্ছিন্নভাবে। শাক্তমতে পুজো হয়। আগে বলিদান প্রথা থাকলেও এখন সেই প্রথা বন্ধ। চালকুমড়ো বলি হয় নবমী ও সন্ধিপুজোতে। সকালে নিরামিষ আর রাতে আমিষ ভোগ দেওয়া হয় দেবীকে। সন্ধিপুজোয় থাকে মাছভাজা, দশমীতে পান্তাভাত, দই, কলা।

দুর্গা চালায় শ্রীকৃষ্ণ

বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব কিছু কিছু দুর্গাপুজোয় এতটাই ছিল যে এক চালার সাবেকি দুর্গাপ্রতিমার মাঝে সরস্বতীর স্থানে শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি দেখা যায় হুগলি জেলার বৈদ্যবাটি শহরের গোবিন্দনগরে শিবরাম সার্বভৌম প্রতিষ্ঠিত দুর্গামন্দিরে। এক চালার দিকে তাকালে মা দুর্গার ডানপাশে শ্রীকৃষ্ণ মূর্তিটি দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই।

বঙ্গের ব্যতিক্রমী দুর্গা সন্ধানের কোনো শেষ নেই। আরও অনেক অনেক ব্যতিক্রমী দুর্গার দেখা মিলবে। বৈচিত্রময় বঙ্গে কি শুধু থিমের পুজোর বৈচিত্রই শেষ কথা? বনেদি পুজোগুলোর পরতে পরতে লুকিয়ে আছে অনেক অভিনবত্ব, অনেক ব্যতিক্রমী রূপ। এর অনুসন্ধান বারবার মনে করিয়ে দেয় সাবেকি দুর্গাপুজোর অহঙ্কারকে।

তথ্যঋণ ও কৃতজ্ঞতা : সায়নী জোয়ারদার, দেবযানী বসু, অভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতাভ পুরকায়স্থ, বিভূতিসুন্দর ভট্টাচার্য, কণাদ মুখোপাধ্যায়, সায়ন্তনী সেনগুপ্ত।

চণ্ডী মুখোপাধ্যায়

ফিল্ম ছাড়া চলচ্চিত্র

সিনেমা ইজ ডেড, লং লিভ সিনেমা! সিনেমার মৃত্যু হয়েছে, সিনেমা দীর্ঘজীবী হোক!

সিনেমা নিয়ে এই কথাটা ইদানীং খুব শোনা যাচ্ছে। কথাটা প্রথম বলেন ফরাসি দেশের এক অতি-বিতর্কিত, একাধারে নন্দিত ও নিন্দিত পরিচালক জঁ লুক গোদার। কথাটার মধ্যে একধরনের ফ্যালাসি আছে। সিনেমার যদি মৃত্যু হয়ে থাকে তাহলে সে কী করে আবার দীর্ঘজীবী হয়? কিন্তু বাস্তবে এটা মোটেই ফ্যালাসি বা কোনও ধাঁধা নয়। কথাটা এখন পুরোপুরি সত্যি।

আজ থেকে প্রায় ১২৭ বছর আগে যে সিনেমার বা চলচ্চিত্রের জন্ম হয়েছিল ১০০ বছরে পা দিতে না দিতেই সেই সিনেমার মৃত্যুঘণ্টা বেজেছিল। এতদিন ভেন্টিলেশনেই ছিল বলা যায়। কিন্তু এখন সে মৃতই।

সিনেমা মানেই ছিল ফিল্ম। আমরা অনেকেই এখনও বলি 'ফিল্ম' দেখতে যাচ্ছি। বইয়ের যেমন কাগজ, সিনেমার তেমন ফিল্ম। বইয়ের ক্ষেত্রে যেমন কলম, ফিল্মের ক্ষেত্রে তেমনই হল ক্যামেরা। চলচ্চিত্রের জন্মের অনেক আগেই জন্ম নিয়েছে ফিল্ম। যাকে চলচ্চিত্রের পরিভাষায় সেলুলয়েডও বলা হয়। চলচ্চিত্রের আগে এই ফিল্ম ব্যবহার করা হত স্টিল ক্যামেরায়। যেখানে ছবি নড়ে চড়ে না। স্থির থাকে। সিনেমা বা চলচ্চিত্র হল সেই বিস্ময় যেখানে ছবির মানুষ নড়ে চড়ে, আবার কথাও বলে। শুরুতেই, মানে ১৮৯৫ সালে অবশ্য ছবির মানুষ কথা বলেনি। শুধু নড়াচড়াই করত। কথা বলতে সে সময় নিয়েছে আরও ৩২ বছর।

চলচ্চিত্রের ১০০ বছর বয়স হতে না হতেই কিন্তু ফিল্ম ছাড়াই সিনেমা তৈরি হওয়া শুরু হল। অর্থাৎ এতদিনকার চেনাজানা সিনেমার শেষদিন যেন এসে গেল। আর বছর কুড়ির মধ্যেই মৃত্যু হল আমাদের চেনা জানা সিনেমার। যে সিনেমা দেখানো হত বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে। ছবি দেখানোর জন্যে হলে আসত ফিল্ম জড়ানো অনেক রিল। সেই রিল প্রজেক্টরে লাগিয়ে ফিল্মের ভেতর দিয়ে আলো চালিয়ে ফেলা হত প্রেক্ষাগৃহের পর্দায়। একেবারে বাস্তবের মতো আমাদের জীবনের গল্পকে আরও বড় করে দেখতাম আমরা।

এখন আর চলচ্চিত্র প্রদর্শনের জন্যে কোনও ফিল্ম জড়ানো রিল আসে না। এখন আসে ছোট একটা চিপ—অনেকটা মোবাইলের সিম কার্ডের মতো। আর তার ভেতরেই ভরা থাকে আস্ত সিনেমাটা। তখন এক একটা রিলে চলচ্চিত্র থাকত দশ মিনিটের। একটা রিল শেষ হলেই পাশের প্রজেক্টরে আর একটা রিল চালু হয়ে যেত। এই ভাবেই চলত। যত রিলের ছবি, ততবার পালটে পালটে যেত প্রজেক্টর। এক একটা রিল মানে দশ মিনিটের ছবি। দু-ঘণ্টার ছবি মানে বারো-রিল।

এখন আর এসব ঝামেলা নেই। ডিজিটাল প্রজেক্টরে চিপটা লাগিয়ে চুপচাপ বসে থাকা। আপনা আপনি দেখানো হয়ে যাবে পুরো ছবি। অনেক ক্ষেত্রে আবার এই চিপেরও দরকার নেই, আকাশ পথে ভায়া স্যাটেলাইট হলে পৌঁছে যাবে ছবি। যেমন আমাদের টি ভি-তে আসে। হলিউড থেকে নিমেষে পৌঁছে যায় ছবি কলকাতার নন্দনে। শুধু হলিউড বা নন্দন কেন পৃথিবীর যে-কোনও প্রান্ত থেকে যে-কোনও প্রান্ত এই ভাবেই পৌঁছে যাচ্ছে ছবি, প্রায় চোখের পলকেই। এমনকী যে পাঠাচ্ছে তার হাতেই সমস্ত কলকাঠি। সেই ঠিক করবে কতক্ষণ দেখানো হবে
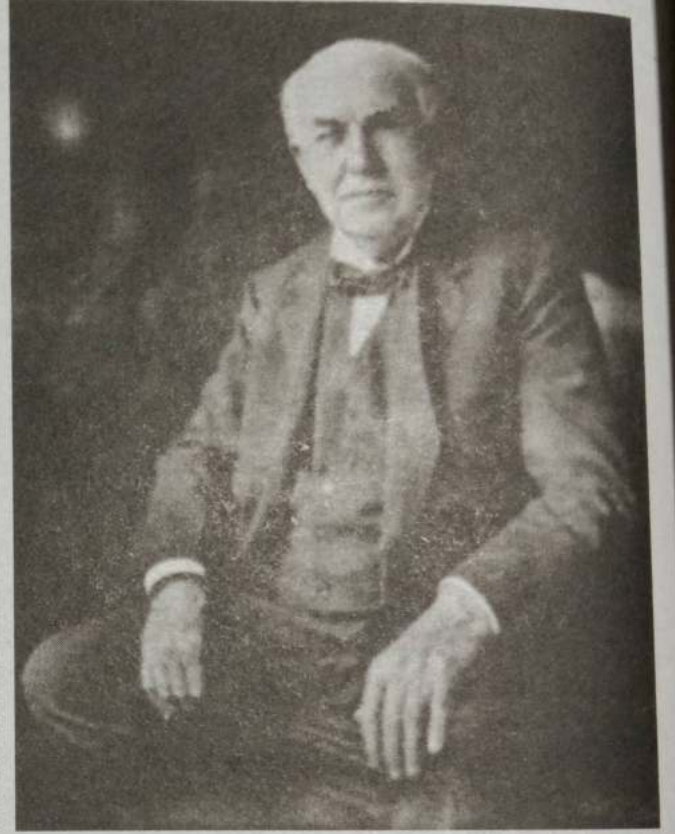
এডিসন

ছবিটা, আর কখন বন্ধ করা হবে। এই ভাবেই ফিল্ম-সিনেমার মৃত্যু হল, জন্মাল চিপ-সিনেমা বা ডিজিটাল সিনেমা। যেখানে কোনও ফিল্ম নেই। ফিল্ম ছাড়া চলচ্চিত্র। সিনেমায় ফিল্ম-যুগের শেষ। সিনেমা ইজ ডেড, লং লিভ সিনেমা।

২

বিংশ শতাব্দীর শেষের আবিষ্কার সিনেমা বা চলচ্চিত্র। স্টেশনে ট্রেন ঢুকছে এই ছিল প্রথম সিনেমা। বাস্তব দৃশ্যকে ক্যামেরায় ধরে সেটা আবার প্রজেক্টর দিয়ে পর্দায় ফেলে দেখানো হয়েছিল। কিন্তু ছবিতে ট্রেন নড়ল কী করে? স্থির ছবি তোলার যন্ত্র তথা স্টিল ক্যামেরা তো আগেই আবিষ্কার হয়েছিল। যাতে ফিল্ম লাগিয়ে ছবি তোলা হত। তবে স্টিল ক্যামেরা আবিষ্কার একদিনে হয়নি। ১৬৪৬ সালে জার্মান বিজ্ঞানী অ্যাফনসিউস আবিষ্কার করলেন—'ম্যাজিক লণ্ঠন'। ম্যাজিক লণ্ঠন আর কিছুই নয়, স্বচ্ছ মাধ্যমের ওপর ছবি এঁকে সেটাকে লেন্সের ভেতর দিয়ে পর্দায় ফেলা হল। তখনও ফিল্ম আবিষ্কার হয়নি।

ফিল্ম আর কিছুই নয়, সেলুলয়েডের ওপর লাগানো এক রাসায়নিক প্রলেপ যাতে আলো পড়লে রাসায়নিকটি গলে যায়। এবং যা ডেভলপ করলে বাস্তবের প্রতিরূপ পাওয়া যায়। এই ভাবেই স্থির ছবি তোলা

জে এফ ম্যাডান

হতো। ১৮১৬ সালে ফরাসি রসায়নবিদ নিপসে ফিল্ম দিয়ে প্রথম স্টিল ছবি তুললেন।

১৯৩০ সালে জেমস এডোয়ার্ড ম্যুবিজ অনেকগুলো স্টিল ক্যামেরা পাশাপাশি বসিয়ে একটা ছুটন্ত ঘোড়ার ছবি তুললেন। সেই ছবিগুলো মানে ঘোড়া ছোটার বিভিন্ন মুহূর্তগুলো একটা গোল চাকতিতে লাগিয়ে ঘোরালেন, মনে হল ঘোড়া যেন ছুটছে। আবার মর্কিন দেশে টমাস আলভা এডিসন, যাকে আমরা বেশি চিনি 'লাইট বাল্ব'-এর আবিষ্কারক হিসিবে, তিনিই কিনেটোস্কোপ নামে এক যন্ত্র তৈরি করলেন। যার ভেতর দিয়ে ফিল্মকে একটা নির্দিষ্ট গতিতে চালানো হতো। আর সেই যন্ত্রের একটা ছোট ছিদ্রে চোখ লাগালে চলমান ছবি দেখা যেত।

সিনেমার ক্যামেরা এবং প্রজেক্টর আবিষ্কারের আগে এডিসনের এই কিনেটোস্কোপ দারুণ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। অনেকেই এই ক্যামেরা ও প্রজেক্টর তৈরি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এই ব্যাপারে প্রথম হয়ে যান অগস্ট ল্যুমিয়র ও লুই ল্যুমিয়র-নামের দুই ভাই। তারাই প্রথম এমন এক ক্যামেরা তৈরি করলেন যাতে তোলার সময় ফিল্ম এক নির্দিষ্ট গতিতে গতিশীল হয়। এই ধরনের ক্যামেরাকে বলা হল মুভি ক্যামেরা।

এমন কিছু বই আছে যেখানে একই বস্তুর অনেক ছবি থাকে। সেই বইয়ের পাতাগুলো যদি তাড়াতাড়ি উলটে যাওয়া যায় তাহলে ছবিটাও নড়াচড়া করে। ঠিক এই তত্ত্ব কাজে লাগিয়েই তৈরি হল চলচ্চিত্র। এক নির্দিষ্ট গতিতে ক্যামেরায় ফিল্ম চালিয়ে ছবি তোলা হল। আবার সেই একই গতিতে ওই ফিল্মকে প্রজেক্টর দিয়ে চালিয়ে পর্দায় ফেলা হল।

নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এই গতিটা এসে দাঁড়াল সেকেন্ডে ২৪ টা ফ্রেম। ৩৫ মিমি ফিল্মের এক একটা ছোট ছোট ঘর ফিল্মকে এক একটা ফ্রেম বলা হয়।

কিন্তু আগে সিনেমার মূল তত্ত্বটা কী এক ঝলক দেখে নেওয়া যাক। চলচ্চিত্র তৈরির পেছনে মূলত কাজ করছে আমাদের চোখের এক বিশেষ চরিত্র। আমাদের চোখ কিছু দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মস্তিষ্ক তার রেশ ১ সেকেন্ডের ১৬ ভাগ সময় ধরে রাখে। এই সময়ের মধ্যে যদি আরেকটি ছবি চলে আসে, এবং এইরকম পরপর চলতে থাকে তাহলে আমাদের ব্রেন তথা মস্তিষ্কে চলমান ছবির অনুভূতি হবে। চোখের এই চরিত্র, যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে, 'পারসিসটেন্স অব ভিশন', তার জোরে স্থির ছবি চলমান হয়ে ওঠে। তাই স্থির ছবিকে যদি সেকেন্ডে ১৬ বার বা তার বেশি গতিতে চালানো যায় তাহলেই তা স্থিরচিত্র থেকে চলচ্চিত্র হয়ে উঠবে। ছবিতে যখন শব্দ ছিল না অর্থাৎ নির্বাক চলচ্চিত্রে সেকেন্ডে ১৬টি ফ্রেম চলত, শব্দ আসার পর তা হল সেকেন্ডে ২৪টি ফ্রেম।

তাহলে দেখা গেল, ১৮৯৫ সালে চলচ্চিত্র যখন জন্ম নিল, তাকে মূলত নির্ভর করতে হল তিনটে জিনিসের ওপর—(১) ক্যামেরা—যা দিয়ে ছবি তোলা হয়, (২) ফিল্ম—যার ওপর ছবি তোলা হবে এবং (৩) প্রক্ষেপণযন্ত্র বা প্রজেক্টর—যা দিয়ে ছবি পর্দায় ফেলা হবে। সেকেন্ডে ১৬/২৪ ফ্রেমে তোলা ছবি ফিল্মে তোলা হয় মুভি ক্যামেরা দিয়ে এবং সেকেন্ডে ১৬/২৪ ফ্রেমে রসায়নাগারে ডেভলপ করা ফিল্ম পর্দায় ফেলা হবে প্রজেক্টরের সাহায্যে। এইভাবেই ছবি বাস্তবের মতো চলাফেরা করল।

ল্যুমিয়রের ভ্রাতৃদ্বয় ছবি দেখানোর জন্যে যে যন্ত্রটা তৈরি করলেন তার নাম হল সিনেমাস্কোপ। ১৮৯৫ সালের এক বড়দিনের পরেই ২৮ ডিসেম্বর তারা ফ্রান্সের লিও শহরে প্রথম চলচ্চিত্র দেখালেন। প্রথম বায়োস্কোপটা ছিল একটা ট্রেন স্টেশনে ঢুকছে। পর্দার ট্রেন ঘাড়ে এসে পড়তে পারে এই ভেবে প্রথম দিন দর্শকেরা হল ছেড়ে পালিয়েছিল। মানুষ দেখল ছবির মানুষ নড়ে চড়ে। সিনেমার ইতিহাসে এই দিনটি এক স্মরণীয় দিন। এর পর পৃথিবীর নানা প্রান্তে অনেকেই সিনেমা দেখানোর কলাকৌশল আবিষ্কার করে ফেললেন। ভারতে প্রথম বায়োস্কোপ দেখানো হল বোম্বাইয়ের ওয়াটসন হোটেলে ১৮৯৬ সালে। এরপর আর দু'একদিনের মধ্যে কলকাতায় এসে গেল বায়োস্কোপ।

তখন তো সিনেমা হল তৈরি হয়নি। বিভিন্ন পরিত্যক্ত গ্যারাজ ঘর অন্ধকার করে সিনেমা দেখানো হতো। বায়োস্কোপ বা সিনেমা আস্তে আস্তে যত জনপ্রিয় হল ততই সিনেমা-হল তৈরি শুরু হল। তখন কলকাতায় ময়দানে তাঁবু ফেলে বায়োস্কোপ দেখাতেন এক পার্সি—জে এফ ম্যাডান। তিনিই পরে কলকাতায় সিনেমা হল তৈরি করলেন। এখন যেখানে চ্যাপলিন বা মিনার্ভা সেখানেই ছিল কলকাতার প্রথম সিনেমা-হল—এলফিনস্টোন পিকচার্স।

১৮৯৫ সালের বাস্তবের ছবি তোলার মধ্যেই আটকে রইল না সিনেমা। সিনেমায় এবার গল্প বলা শুরু হল। লেখার গল্পের ক্ষেত্রে যেমন বাক্যের পর বাক্য সাজিয়ে গল্প বলা হয়, সেই রকম শটের পর শট সাজিয়ে গল্প বলা শুরু হল। লিখিত গল্পকে যেমন অনুচ্ছেদ বা পরিচ্ছেদে ভাগ করি সেইরকমই আবার সিনেমায় আছে মিক্স বা ফেড জাতীয় কিছু যান্ত্রিক ও রাসায়নিক উপায়। এই সব মিলেই তৈরি হল চলচ্চিত্রের ভাষা। একেক জন পরিচালকের একেক রকম ভাষা। যেমন বঙ্কিমের থেকে রবীন্দ্রনাথের ভাষা আলাদা তেমনই ওজু বা আন্তনিয়নির ভাষা। এই তফাত তৈরি হয় চলচ্চিত্রের নানা টেকনিককে কে কীভাবে প্রয়োগ করছেন তার ওপর। আর সিনেমায় শব্দ আসার পর এই চলচ্চিত্রের ভাষাও পালটেছে। এইভাবেই সিনেমার ভাষায় এসেছে নানা পরিবর্তন। প্রথম থেকে পুরো শতাব্দীতেই সিনেমা তোলা হতো ফিল্মেই অর্থাৎ প্রক্রিয়াটা ছিল রাসায়নিক। কিন্তু ১০০ বছর পেরোতে না পেরোতেই ফিল্ম দিয়ে তৈরি সিনেমার মৃত্যু হল। ফিল্ম বাদ দিয়েই সিনেমা নির্মাণ শুরু হল।

৩

১০০ বছর পেরোতেই সিনেমা আর সেলুলয়েড ফিল্ম নয়, বরং ডিজিটাল চিপ। কিন্তু ডিজিটাল চিপ ব্যাপারটা কী? ডিজিটাল চিপ অনেকটা মোবাইল সিম-কার্ডের মতো। মোবাইল সিমের চেয়ে সামান্য বড়। ২.৫৪ সেমি বাই ২.৫৪-এর মতো। সিনেমা তোলার ক্যামেরার ধরনধারণও এখন আমূল বদলে গেছে। এখন আর তাতে সেলুলয়েড ফিল্ম লাগানো বিরাট বিরাট রিল লাগানো হয় না। লাগানো হয় ওই ছোট চিপটা। ক্যামেরার ভেতরে ওখানেই ছবি সংরক্ষণ হয়। তবে এই কার্ডে ২০ মিনিটের বেশি ছবি ধরে রাখা যায় না। কুড়ি মিনিট ছবি তোলার পর ওই কার্ড থেকে ছবি অন্য একটা বড় হার্ড ডিস্কে ট্রান্সফার করে নেওয়া

হয়। এবার ওই চিপস থেকে পুরনো ছবি মুছে আবার ক্যামেরায় ব্যবহার করা হয়। এইভাবে পর্যায়ক্রমে চলে। পুরো শুটিং শেষ হলে হার্ড ডিস্কের ছবির কারেকশন করা হয়। যাকে কারিগরি ভাষায় বলা হয় ডি.আই বা ডিজিটাল ইন্টারভেনশন। এরপর, আরেকটা হার্ড ডিস্কে ভরে হলে দেখাবার উপযোগী করে তোলা হয়।

হলে দেখনোর জন্যে সিনেমা-হলগুলোও ডিজিটাল হয়েছে। এখন আর সিনেমা-হলগুলোতে বড় বড় জাম্বো রিল পৌঁছে দিতে হয় না। একজায়গায় বসে পৃথিবীর সব প্রান্তে পৌঁছে যায় ছবির প্রিন্ট। আমাদের এখানে এই কাজটি করার জন্যে মূলত দুটো কোম্পানি রয়েছে—'কিউব' এবং 'ইউফো'। এরা হলে হলে ছবিটা পৌঁছে দেয় স্যাটেলাইটের মাধ্যমে। অথবা হার্ড ডিস্কে। সিনেমা হলে দেখানোর জন্যে ২k বা ৪k-তে রূপান্তরিত করা হয়। ডিজিটাল পদ্ধতিতে এক বিশেষ প্রোজেকশন ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে আমরা ছবি তথা সিনেমাটা দেখতে পাই। ছবিকে অসংখ্য বিন্দুতে ভেঙে দেয়া হয়। প্রোজেকশনের সময় রেজোলিউশন-এর মধ্যে দিয়ে পর্দায় বিন্দু বা ডট থেকেই ছবিটি পুনর্গঠিত হয়। প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে যত বিন্দু বা ডট থাকে তাকে বলা হয় এক পিক্সেল। ১০০০ পিক্সেল মিলে তৈরি হয় ১K।

সিনেমা হলের এখন সব নতুন নতুন নামকরণ হয়েছে—সিঙ্গেল স্ক্রিন, মাল্টি-স্ক্রিন। অর্থাৎ যেখানে মাত্র একটা পর্দায় সিনেমা দেখানো হয় সেগুলো সিঙ্গেল স্ক্রিন। আর যেখানে একাধিক পর্দায় সিনেমা চলে সেগুলো মাল্টি স্ক্রিন। পশ্চিমবঙ্গে এখন ক্রমশই সিঙ্গেল স্ক্রিন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৯০০ হলের মধ্যে এখন টিকে আছে মাত্র ২৫০টি। ভারবর্ষের সব জায়গাতেই এখন একই অবস্থা। মাল্টি স্ক্রিনে তো হয়েছেই আর সব সিঙ্গেল স্ক্রিনও এখন কিউব বা ইউফোর দখলে। ফলে সিনেমা তৈরি এবং দেখানোর সমস্ত প্রক্রিয়াতেই এখন আমূল পরিবর্তন।

একবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই জন্ম নিল ডিজিটাল সিনেমা। হলিউডেই। ডিজিটালে তোলা প্রথম ছবি—ওয়ান্স আপন এ টাইম ইন মেক্সিকো। পরিচালক—রবার্ট রডিগিজ। এর আগে অবশ্য আংশিকভাবে ডিজিটাল টেকনোলজি প্রয়োগ করেন জর্জ লুকাস, ১৯৯৯ সালে তাঁর 'স্টার ওয়ার্স-এপিসোড ওয়ান' ছবিতে।

আমাদের বাংলা সিনেমা এখন এই কারিগরি বিদ্যাকেই কাজে লাগাচ্ছে। গ্রামে-গ্রামান্তরে এখন সিনেমা দেখানো হচ্ছে এই প্রক্রিয়াতেই। ডিজিটাল

রবার্ট রডিগিজ
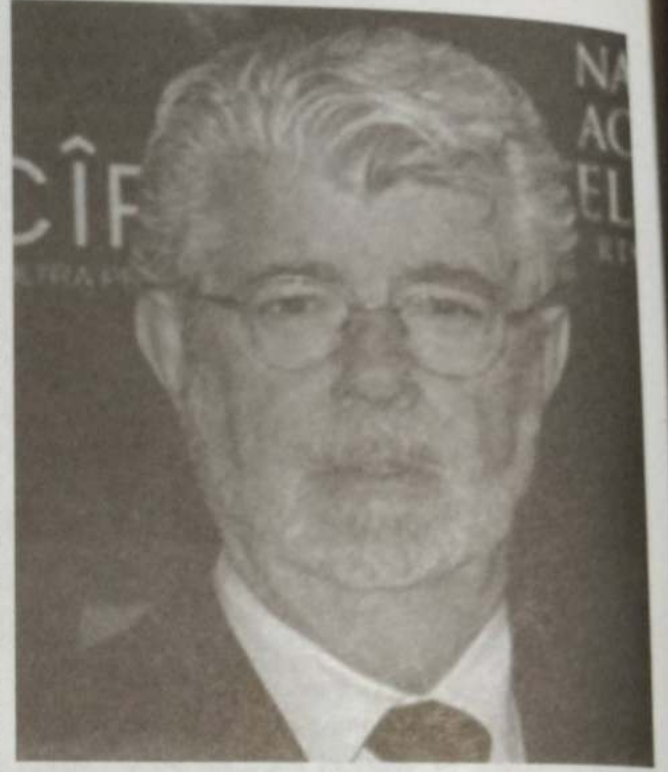
জর্জ লুকাস

টেকনোলজি আসার ফলে ছবি নির্মাণের ক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তন হয়েছে। ছবিতে স্পেশাল এফেক্ট আনা যায় ঘরে বসেই। সিনেমার নানা ম্যাজিক এখন হাতের মুঠোয়। ভারতীয় ছবির স্পেশাল এফেক্ট এখন প্রায় সমানে-সমানে পাল্লা দিচ্ছে হলিউডের ছবির সঙ্গে।

চলচ্চিত্র নির্মাণ এক সৃজনশীল প্রক্রিয়া। যার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে অর্থনীতি ও কারিগরি—এই দুই নিয়ামক শক্তি। এই দুই শক্তিই মূলত নিয়ন্ত্রণ করে চলচ্চিত্র ব্যবসাকে। চাকাকে যদি বলা যায় মানুষের পায়ের গতি সঞ্চালন, তাহলে নির্মাতার জন্য ক্যামেরা চোখের সম্প্রসারণ। সারা পৃথিবীকে চোখের নাগালে নিয়ে আসে সিনেমাই। গত শতাব্দীতে ব্যবহৃত ক্যামেরার অতিরিক্ত ওজনের পাশাপাশি, জটিলতার কারণে এটি চালাতে যে পরিমাণ যান্ত্রিক জ্ঞানসম্পন্ন জনবল দরকার হতো, তাতে করে চলচ্চিত্র-নির্মাতার আবেগ ও চিন্তার জন্য এ একটা বোঝা ছিল। সেটা থেকে মুক্ত করেছে এই ডিজিটাল কারিগরি। ক্যামেরা এখানে অত্যন্ত হালকা। প্রায় স্টিল ক্যামেরার মতোই। এরপর হয়তো, হয়তো কেন সেদিনের বোধহয় বেশি দেরি নেই যে ডিজিটাল ক্যামেরা হয়ে উঠবে একজোড়া সরু কাচের চশমা কিংবা একজোড়া লেন্সের মতো, যা চোখের কর্নিয়ায় বসিয়ে নিলেই ক্যামেরার কাজ করবে অথচ বোঝাই যাবে না।

ডিজিটাল কারিগরি ভিস্যুয়াল দুনিয়ায় জ্ঞানের সর্বশেষ অর্জন। এক বিপ্লব। তবে এই বিপ্লব সিনেমার বিরুদ্ধে নয়। বরং সিনেমা-ইন্ডাস্ট্রির কিছু পেশাদারি কাঠামো ও চরিত্রের বিরুদ্ধে। ডিজিটাল সিনেমার কারণে আমরা চলচ্চিত্রের কেন্দ্রবিন্দু—চিত্রনাট্য, দৃশ্যায়ন, সৃজনশীল সম্পাদনা, অভিনয়সহ কোনো কিছুই হারাব না। ডিজিটাল ছবি যা বদলে দেয়, তা হল চিত্রগ্রহণের ধরন, আলোর আয়োজন, পোস্ট-প্রোডাকশন ল্যাবের কাজ ইত্যাদি। চলচ্চিত্র উৎপাদন যন্ত্রের এই কারিগরি বিপ্লবের ফলে ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে হয়তো চলচ্চিত্রের মৃত্যু হবে, তবে এই বিপ্লবই চলচ্চিত্রকে সৃজনশীল শিল্প হিসেবে বাঁচিয়ে রাখবে। সিনেমা নির্মাণ ক্রমশ আরও সহজ থেকে সহজতর হবে। কিশোর ভারতী

ডাঃ অমিতাভ ভট্টাচার্য

মোৎজার্টের জন্মভিটে

বছর তিনেক আগের কথা। অবশেষে ফাইনাল হল। সবাই মিলে একদিন মিটিংয়ে বসে গেলাম। কোন কোন দেশে যাওয়া হবে, কোন কোন শহর দেখতেই হবে, সবের একটা তালিকা তৈরী করে আয়োজক সংস্থার অপারেটরের হাতে তুলে দিলাম। তিনি দেখে বলে উঠলেন, মোৎজার্টের জন্মভিটে আর সাউন্ড অফ মিউজিকের শহর আপনারা যে না দেখে ছাড়বেন না, সেটা আমি আগেই বুঝেছিলাম।

সাউন্ড অফ মিউজিক। ছোটবেলায় দেখা সেই সাড়া জাগানো সিনেমা! মিষ্টি মিষ্টি পাঁচটি অনাথ বাচ্চা আর তাদের গভর্নেসকে নিয়ে গল্প।

বেশ কয়েকটি দেশ ঘুরে আমরা এলাম অস্ট্রিয়ায়। প্রথমে লন্ডন, তারপর হল্যান্ড-প্যারিস-সুইৎজারল্যান্ড-লিচেনস্টাইন হয়ে অস্ট্রিয়ায়। সুইৎজারল্যান্ডে তিন রাত কাটিয়ে আমরা জুরিখ থেকে যাত্রা শুরু করে জার্মানি ছুঁয়ে পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম দেশ লিচেনস্টাইনে কাটিয়ে ঢুকে পড়লাম অস্ট্রিয়াতে। দেশটির পুরো নাম রিপাবলিক অফ অস্ট্রিয়া, যেটি সেন্ট্রাল ইউরোপের দক্ষিণ অংশের একটি দেশ, যার রাজধানীর নাম ভিয়েনা।

অস্ট্রিয়ায় আমাদের প্রথম ব্রেক ছোট্ট জনপদ ওয়াটেন্সে। বিশ্বখ্যাত সোয়ার্ভস্কি ক্রিস্টাল ওয়ার্ল্ড এখানেই রয়েছে। ১৯৯৫-এ তৈরি এই ক্রিস্টাল জগতে রয়েছে মিউজিয়াম, শো-রুম, ক্রিস্টাল আর্ট প্রদর্শনী। চোখ ধাঁধানো আলোয় মিউজিয়ামে সারি সারি সাজানো মূর্তিগুলোকে দেখে মনে হল যেন হীরক সাম্রাজ্যে এসে পড়েছি।

ইউরোপে এই সময়ে গরমকাল, অথচ তাপমাত্রা ১০ থেকে ১৫ ডিগ্রির মধ্যে। আমাদের এই ১৬ দিনের জার্নিতে বৃষ্টি কিন্তু কমবেশি আমাদের পিছনে লেগেই ছিল। বেরিয়েই দেখলাম মুষলধারে বৃষ্টি, সঙ্গে হাড় কাঁপানো ঠান্ডা। কোনওমতে দৌড়ে এসে বাসে উঠলাম। আধ ঘণ্টা বাদে ডিনার, ইন্সব্রুক শহরে। ঘড়িতে সবে সন্ধে সাতটা। কিন্তু এখানে ডিনার সন্ধে সাতটা থেকে আটটার মধ্যে। ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলোতেও একই ব্যাপার। আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল একটি ইন্ডিয়ান হোটেলে। ফলে পছন্দসই খাবার পেতে কোনও অসুবিধা হল না। ভাত, ডাল, ঝুরোঝুরো আলু ভাজা, মাছের কালিয়া, চিকেন।

ডিনার সেরে আবার শুরু বাস যাত্রা। ৭০ কিলোমিটার দূরে রাতের আস্তানা। পাহাড় বেয়ে বাস উঠছে, বাইরে কিন্তু অবিরাম বৃষ্টি। হঠাৎ বাসের ডিসপ্লে বোর্ডের দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম! ৫ ডিগ্রি থেকে ৪-৩-২ হয়ে ১। পর্দা সরিয়ে জানলার কাচে চোখ রেখে দেখি, বাইরে বরফে ঢাকা পড়েছে গাছপালা, প্রত্যন্ত পাহাড়ি জনপদ।

আমাদের রাত্রিবাসের হোটেলটি বড় সুন্দর। কাঠের তৈরি। অ্যান্টিক অ্যান্টিক গন্ধ। আমার প্রথম কাজ মোবাইলে ওয়াইফাই সংযোগ নিয়ে নেওয়া। তারপর চাবি নিয়ে হোটেলের ঘরে ঢুকে সোজা বাথরুমে গিয়ে ফ্রেশ হওয়া। বাইরের তাপমাত্রা ১ ডিগ্রি হলেও হোটেলে কিন্তু ১৮ ডিগ্রি। মিষ্টি ঠান্ডা। এক কাপ কফি নিয়ে বিছানায় বসে মোবাইল ঘাটতে শুরু করলাম। সারাদিনের তোলা ছবি থেকে বাছাই কিছু ছবি প্রিয়জনদের পাঠাতে হবে!

সকালে ঘুম ভাঙল দরজায় নক শুনে। বাইরে আমাদের সহযাত্রী লাবুদা-র উত্তেজিত কণ্ঠস্বর, বাইরে বেরিয়ে দ্যাখো কি কান্ড! হেভি স্নো

ফটো : ডাঃ অর্কমিতা ভট্টাচার্য
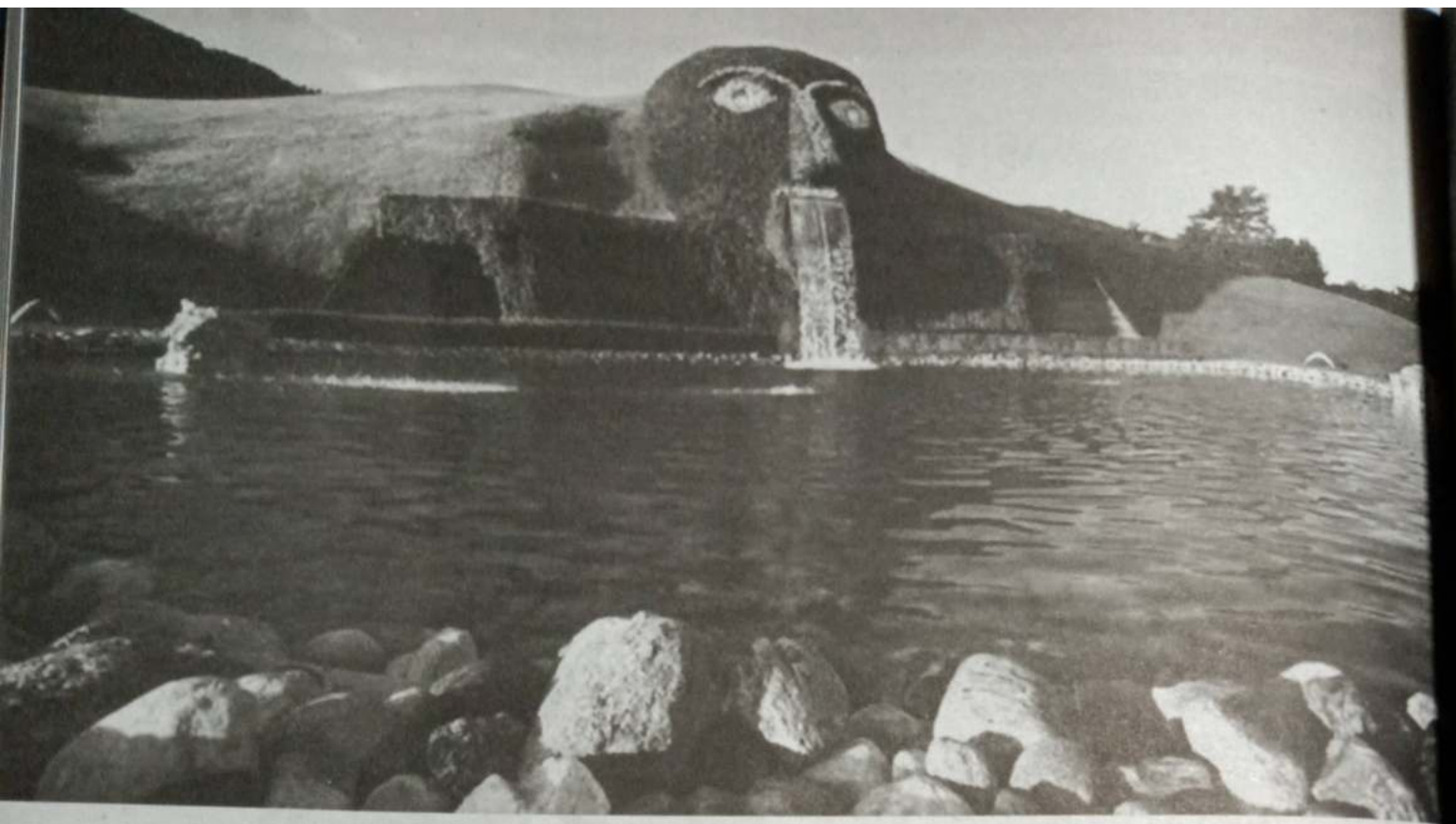
ফল। তড়িঘড়ি হোটেলের বাইরে বেরিয়ে এলাম সবাই। হোটেলের লন,রাস্তাঘাট, গাছপালা সব সাদা। একদল জাপানি বরফ ছোড়াছুড়ির খেলায় মেতেছে। মুহূর্তে আমরাও বয়স ভুলে সেই খেলায় মেতে উঠলাম। আমাদের বাসের মাথায় শুধু বরফ আর বরফ। মেপেল গাছের পাতা থেকে ঝুরঝুর করে বরফ ঝরে পড়ছে। আশেপাশের বাড়িগুলোও বরফে ঢেকে গেছে। এদিকে আবার ঝকঝকে রোদ। আমাদের বাসের সদাগম্ভীর ড্রাইভার ডেভিড সাহেবকেও দেখলাম গাম্ভীর্য সরিয়ে দলের খুদেদের সঙ্গে বরফ খেলায় মেতেছেন।

কিন্তু সময় মেপে এগিয়ে চলতে হবে। তাই ব্রেকফাস্ট সেরে বাসের পেটে লাগেজে ঢুকিয়ে আবারো যাত্রা। প্রথম ব্রেক ইন্সব্রুকে। পাহাড় ঘেরা নদী উপত্যকার মাঝে প্রাচীন ঐতিহ্যের অহংকার এই শহরের রাস্তাঘাট বাড়ি চার্চ অট্টালিকা। ৫০০ বছরের পুরনো শহর এই আধুনিক সময়েও আগের মতো করেই সাজানো রয়েছে। পুরোটা হেঁটে দেখতে হয়। সঙ্গে এক জার্মান গাইড ছিলেন। দেখলাম ১৪২০ সালে তৈরি গোল্ডেন রুফ প্রাসাদ, ১৭ শতকের সেন্ট জেমস ক্যাথিড্রাল, ইম্পেরিয়াল প্যালেস— আরও কত কী!

অবশেষে সালসবুর্গ। সুর আর সৌন্দর্যের শহর। সকাল আটটায় যাত্রা শুরু করে বেলা দুটোয় পৌঁছলাম এখানে। বহু প্রাচীন এই শহর ১৫ শতকে রোমের সম্রাটের অধীনে আসে, নাম হয় জুভাভাম। অষ্টম শতকে একে নতুন করে গড়ে তোলেন খ্রিস্টান ধর্মযাজক সেন্ট রুপার্ট। তখন এর নতুন নাম হয় সালসবুর্গ। ১৩৭৭ সালে পাহাড়ের মাথায় তৈরি হয়েছিল হোহেন সালসবুর্গ দুর্গ।

আমাদের পথ পরিক্রমা এই দুর্গের পাদদেশ থেকেই শুরু হল। এই যাত্রায় আমরা এক মজার জার্মান গাইডকে আমাদের সঙ্গে পেলাম। বেশ হাসিখুশি মানুষ, রঙচঙে পোশাক। হাতে বিশাল এক অ্যালবাম। সেটার পাতা উল্টে উল্টে তিনি সাউন্ড অফ মিউজিক সিনেমার মারিয়ার জীবন, ক্যাথিড্রাল নেনারি-সহ এই এলাকার পুরো ইতিহাস বলতে থাকেন নেচে নেচে। দলের তিন তরুণী অর্কমিতা, চিরশ্রী এবং সুবর্ণার সব উৎসাহ মারিয়াকে নিয়েই। আর আমরা যারা পঞ্চাশোর্ধ, তারা ব্যস্ত সুরকার মোৎজার্টকে নিয়ে। মারিয়া পর্ব মিটলে গাইডকে নিয়ে আমরা এগোলাম মোৎজার্ট দর্শনে। ১৭৫৬ সালে ২৭ জানুয়ারি এই সুরসাধকের জন্ম এই শহরে। পুরো নাম উলফগ্যাং এমাডিউস মোৎজার্ট। বাবার নাম ছিল লিওপোল্ড মোৎজার্ট। মা-বাবার সপ্তম সন্তান ছিলেন তিনি।

গাইড প্রথমে নিয়ে গেলেন সুরস্রষ্টার বিশাল স্ট্যাচুর সামনে। বহু পর্যটকের ভিড়। সবাই হুড়োহুড়ি করে ফটো তুলতে ব্যস্ত। কিছুটা সময় সেখানে কাটিয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম সিটি হলের পাশে এক শপিং কমপ্লেক্সের দিকে। সেখানে বিশাল এক ছ'তলা অট্টালিকা দেখিয়ে গাইড বললেন, এটি মোৎজার্টের বার্থ প্লেস। বাড়ির নীচে দোকানপাট। উপরে চারতলায় ১৭৪৭ থেকে ১৭৭৩ পর্যন্ত মোৎজার্ট পরিবার বাস করতেন। ১৭ বছর পর্যন্ত উনি এখানেই ছিলেন। তারপরে আরেকটি বাড়িতে এই পরিবার চলে যায়। সেটিও বর্তমানে একটি দর্শনীয় স্থান, সেখানেও একটি বিরাট মিউজিয়াম আছে। এই অট্টালিকার তিনতলায় যে মিউজিয়ামটি রয়েছে তাতে সুরসম্রাটের ব্যবহার করা পিয়ানো, গিটার ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র রয়েছে। সুন্দর করে সাজানো রয়েছে তাদের ডাইনিং টেবিল, চেয়ার এবং অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র, যেগুলোর বয়স আড়াইশো বছর পেরিয়ে গেছে। বেশ কয়েকটা অয়েল পেইন্টিংও চোখে পড়ল।

সালসবুর্গ শহর বেশ পুরোনো। এই শহরের বুক চিরে বয়ে গিয়েছে সালজাক নদী। নদীর উত্তর দিকে নতুন শহর, আর দক্ষিণ দিকে ঐতিহ্যমন্ডিত বারোক স্থাপত্যশৈলীতে গড়ে ওঠা পুরোনো শহর। এখানে রয়েছে মিরাবেল প্রাসাদ,হোলি টিনিট্রি চার্চ, প্রচুর চকোলেট, বাদ্যযন্ত্র এবং খাওয়ার দোকান। শহরটায় বেশ কয়েকটি বড় চত্বর বা প্লাৎজ রয়েছে। ডোমপ্লাৎজ, ক্যাপিটাল প্লাৎজ, রেসিডেন্ট প্লাৎজ, মোৎজার্ট প্লাৎজ ইত্যাদি। মোৎজার্ট আর সাউন্ড অফ মিউজিকে আচ্ছন্ন অস্ট্রিয়ার সালসবুর্গকে বিদায় জানিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হল ইতালির দিকে।

বাসে উঠে বারবার মনে হচ্ছিল, এই শহরটায় যদি একটা রাতও থাকতে পারতাম তাহলে আরও কিছু দর্শনীয় স্থান দেখার সুযোগ পেতাম!

সবচেয়ে বেশি আফসোস রয়ে গেল, সাউন্ড অফ মিউজিকের শুটিং স্থানগুলো দেখতে না পারার।

বীথি চট্টোপাধ্যায়

পালমপুরের সেনাপতি

হিমাচল প্রদেশের ছোট একটা শহর। চারদিকে পাহাড়। পাহাড়ের ওপর মেঘ। পাহাড়ের ঢাল নেমে এসেছে সবুজ চা-বাগানে। অজস্র পাখি। মাঝে মাঝে দেখা যায় বন বেড়াল। পাইথন বেরোয়। দলে দলে হরিণ হেঁটে বেড়ায়। ঠান্ডা হাওয়া শরীর জুড়িয়ে দেয়।

হোটেলের ডেকে বসেছিলাম। কফির গন্ধ। একটা পুরোনো বিলিতি গান বাজছে।

আমাদের যাবার কথা ছিল ধর্মশালায় একটা সাহিত্য উৎসবে। কিন্তু ধর্মশালায় ওই সাহিত্য কর্মশালায় আর যোগ দেওয়া হল না। ধর্মশালা যাবার রাস্তায় বিরাট ধস নেমেছে। কাছাকাছি মাঝারিমাপের শহর এই পালমপুর। আপাতত আমরা এখানে আশ্রয় নিয়েছি।

আমাদের দলে রয়েছেন পাহাড় বিশেষজ্ঞ সব্যসাচী মজুমদার। সারা বছর উনি পাহাড়েই ঘুরে বেড়ান। আর্মিতে ছিলেন। সেইসময় তাঁর পোস্টিং ছিল কখনও সিয়াচেন হিমবাহে, কখনও কাশ্মীরে। সেই থেকে পাহাড়ের ওপর টান। অবসরের পর কলকাতার বাড়িতে উনি থাকেন হাতে গোনা দিন। আমাদের কবি-লেখকদের দলটা ধর্মশালা আসছে শুনে উনি নিজেই বলেছিলেন উনিও সেইসময় হিমাচলে থাকবেন।

নবীন কবি দুজন এসেছে কলকাতা থেকে। সময়িতা আর দীপ। ওরা বেশ মুষড়ে রয়েছে। শ্রীময়ী মিত্র নামকরা অধ্যাপক অনুবাদক। উনিও রয়েছেন সঙ্গে। সারাক্ষণ ক্যামেরা নিয়ে ঘুরছেন চারপাশে।

দলটির মধ্যে সবচেয়ে কম ঘোরাঘুরি করি আমি। পাহাড়ি পথ। পায়ের অবস্থা ভালো নয়। আমি যেখানেই যাই একটা চেয়ারে বসে পড়ি টুক করে। দূরে পাহাড়ের ওপর গির্জা, তার ওপর একটা প্রাচীন গাছের ডালপালা, তার ওপর দিয়ে নেমে আসছে মেঘ।

ট্রেকিং ছাড়া এ যাত্রায় ধর্মশালা পৌঁছনো হবে না সময়িতা। সব্যসাচী মজুমদার হাসতে হাসতে বললেন।

দীপ বলল, কেন স্যার? ফ্লাইট যদি পাওয়া যায়?

সব্যসাচী দূরে আঙুল তুলে দেখালেন, কী দেখছ? ঘন মেঘ আর গভীর কুয়াশা পুরো হিমাচল প্রদেশের আকাশে। এখন কুলু থেকে কোনও এইট সিটার ফ্লাইট আর উড়বে না। ট্রেকিং করে যেতে পারো। কিন্তু তাতে তো ছ-সাত দিন লেগে যাবে কম করে।

শ্রীময়ী মিত্র বললেন, ট্রেকিং করবে কে? আমরা সবাই কি মিলিটারিতে চাকরি করতাম নাকি?

সময়িতা কাঁদো কাঁদো মুখে বলল, তার মানে এখানেই আমাদের থাকতে হবে। কবিতাও পড়া হবে না, শুধু শুধু এতদূর এলাম!

সব্যসাচী বললেন, এত সুন্দর একটা পাহাড়ি শহর, মেঘ নেমে যায় সকালবেলায়। এরকম একটা জায়গা তোমাদের ভালো লাগছে না?

সময়িতা বলল, একে তো কবিতা পড়া হবে না বলে মন খারাপ তারওপর জায়গাটা কেমন গা ছমছমে ভূতুড়ে। মানুষজন খুব কম। একেবারে রিমোট জায়গা।

সব্যসাচী বললেন, হ্যাঁ, মানুষজন এখানে খুবই কম। তাই জীবজন্তু, গাছপালারা এখানে বেশ শান্তিতে আছে। আর ভূতেরা তো আছেই। তবে তারা রাতে আসবেন, এখন তো দিন।

সময়িতা প্রায় কেঁদে ফেলল, ভালো হবে না কিন্তু সব্যসাচীদা। কাল রাতে আমার ঘরে ঠিকমতো ঘুম আসছিল না। আলোটা একবার জ্বলছিল, একবার নিভছিল।

দীপ বলল, শুনলাম মিলিটারি নেমেছে। ধস সরানো হচ্ছে।

সব্যসাচী বললেন, কমপক্ষে সাতদিন লাগবে এই আবহাওয়ায় কাজটা শেষ করতে।

দূর থেকে দৌড়োতে দৌড়তে একদল খাকি উর্দি পরা জওয়ান এগিয়ে আসছে আমাদের রিসর্টের দিকে। সব্যসাচী বললেন, মনে হয় ওরা এই হোটেলেই আসছে।

সকলে যেন একটু থমকে গেল। দেখতে দেখতে দশ-বারোজন সেনা ঢুকে এল আমাদের রিসর্টে। সব্যসাচী মজুমদার এগিয়ে গিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁরা এসেছেন সব্যসাচী মজুমদারের একটি মেল পেয়ে। এখান থেকে ধর্মশালা যাবার কোনও উপায় আছে কিনা জানতে চেয়ে সেনাবাহিনীকে মেল করেছিলেন সব্যসাচী। সেনা বাহিনীর পক্ষ থেকে আমাদের জানানো হল যে খুব জরুরি কিছু ক্ষেত্রে তাদের হেলিকপ্টার ব্যবহার করতে দেওয়া যেতে পারে। আমরা যদি একটা চিঠি লিখে প্রত্যেকে সই করে চিঠিটি তাঁদের দিতে পারি, তাহলে তাঁরা আমাদের ধর্মশালা পৌঁছে দেবার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারেন।

সকলে হাতে যেন চাঁদ পেল। তাহলে তো আর কোনও সমস্যাই রইল না। কিন্তু একটা সমস্যা রয়েছে। রাস্তার এখন যা অবস্থা তাতে ধর্মশালার দিকের রাস্তায় সেনাবাহিনীর জিপও চলবে না। ফলে ধর্মশালার কাছে হেলিপ্যাড থেকে নেমে বাকি পাহাড়ি পথ হেঁটে যেতে হবে আমাদের। সেই পথের দূরত্ব প্রায় দু-কিলোমিটার। বাকি সকলেই ওই রাস্তা হেঁটে পার হতে পারবে, কিন্তু আমার পক্ষে অসম্ভব। ঘোড়ার চড়তে একেবারেই পারদর্শী নই। ফলে আমার ধর্মশালা যাওয়া হবে না। আমি যেতে পারব না শুনে অন্যরাও যাওয়া বাতিল করতে চাইল। আমি তখন কঠোর প্রতিবাদ করলাম। ঘোষণা করলাম, ওরা যদি না—যায় আমি কালই কলকাতার টিকিট কেটে ফিরে যাব। একথা শুনে ওরা দুপুরের খাওয়া সেরে উঠে পড়ল সেনাবাহিনীর জিপে। ওদের জিপ দূরে পাহাড়ি পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল।

ঝোড়ো বাতাস বইতে শুরু করেছে একটু আগে থেকে। এখানে অনেক পাখি, তারা সকলে নিশ্চুপ। আমার সামনে একটা সোজা চড়াই রাস্তা চলে গিয়েছে। রাস্তাটি সম্পূর্ণ জনশূন্য। রাস্তার দু-ধারে ফুটে আছে অজস্র ফুল, একটা কমলালেবু গাছ রাস্তার ধারে কিন্তু এখন কমলালেবু হবার সময় নয়। সকাল থেকে এই রাস্তাটার দিকে চোখ গেলেই আমার মনে হচ্ছে এই রাস্তায় একটা গল্প লুকিয়ে আছে।

ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে গায়ে লাগছে ঠান্ডা বৃষ্টি বিন্দু। আর ডেকে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। এখন বৃষ্টিতে ভিজলে আমার যত অসুখ আছে সবগুলো ফিরে আসতে পারে।

রুম সার্ভিসে ফোন করে এক গ্লাস লেমন আইসড টি আর ভেজিটেবল কাটলেট অর্ডার করলাম। আমি শীতের মধ্যে ঠান্ডা খাই। বাইরে বরফ পড়লে বরফ চা খাওয়ার শখ হয়।

পাহাড়ের ওপর থেকে দলে দলে মেঘ নেমে আসছে নীচের চা-বাগানে। রাস্তার ওপর ঝরছে মুষলধারে বৃষ্টি। দুপুর ঢলে পড়ছে বিকেলের দিকে। সামনের রাস্তা দিয়ে একটা মানুষও হাঁটছে না। একটু ঝিমুনি এসেছিল। কিন্তু দুপুরে কিছুতেই ঘুমোব না। এখানে বই নেই, টিভি নেই। ফলে সারা রাত ঘুম না-এলে মহা সমস্যা।

জোর করে চোখ মেলে বাইরে তাকালাম। এতক্ষণে একটা মানুষ দেখতে পেলাম সামনের রাস্তায়। কমলালেবু গাছটা থেকে একটু দূরে একটা ঝাউ গাছের নীচে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে। গায়ে একটা লম্বা খয়েরি কোট। মাথায় টুপি। বেশ লম্বা। এভাবে মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে কেন ওখানে! ভাবামাত্র ছেলেটা আমার দিকে ঘুরল। তার মুখ দেখা গেল না। কিন্তু সে হাতের আঙুল দিয়ে তার পায়ের কাছে রাস্তাটা দেখাতে লাগল। যেন প্রাণপণে কিছু দেখিয়ে দিতে চাইছে আমায়। ঘরে একটা বাইনোকুলার ছিল। দূরবিনটা নিয়ে ছেলেটা যেখানটা দেখাচ্ছে সেই জায়গাটা দেখলাম, কয়েকটা পাখির বাচ্চা নড়ছে রাস্তার ওপর পড়ে। ইস্, ঝড়ে পড়ে গিয়েছে। এবার কী হবে!

ছেলেটাকে হাতের ইঙ্গিতে বললাম তুলে দিতে, কিন্তু সে তুলে দিল না। ওইভাবে দাঁড়িয়ে রইল। এ তো মহাসমস্যা হল! এবার আমি কী করব! ছেলেটা এবার আঙুল তুলে দেখাল গাছের মগডালে। সেখানে ভিজে একসা দুটো বড় পাখি ওড়াউড়ি করছে। এবার বেরোতে হয়, ছাতাটা নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম। রিসর্টের দরোয়ানকে বললাম, পাখির বাচ্চা পড়ে গেছে সামনে রাস্তায়। ওদের গাছে তুলে দিতে হবে। দরোয়ান মাথায় হাত দিয়ে হা হুতাশ করতে লাগলেন, ইতনে বারিশ পে ক্যায়সে পেড় পে চড়েগা? হাম ভি তো গির জায়গা? আমি অবিচল, আপলোগ পাহাড় কি হো, কুচ নেহি হোগা। এখানে রিসর্টে আর একটা ছেলে আছে তাকে ওরা ডেকে দিল। সে নাকি গাছে ওঠায় পারদর্শী। লকসমন বলে সেই ছেলেটা আর আমি গেলাম গাছের নীচে। পাখির দুটো বাচ্চা চিল-চিৎকার করছে। তাদের বাবা-মা ওপরে বসে করুণ

স্বরে ডাকছে। সেই টুপি পরা ছেলেটা নেই কোথাও। অদ্ভুত ছেলে তো। বাচ্চাগুলোকে এভাবে ফেলে চলে গেল।

আমি পাখির বাচ্চগুলোকে তুলে মাফলার দিয়ে যতটা পারলাম শুকনো করে দিলাম। লকসমনের হাতে তারপর দিলাম পাখি দুটোকে। সে একহাতে পাখি নিয়ে অতি সাবলীলভাবে তরতর করে গাছে উঠে গেল। তার মাথার ওপর তখন উড়ছে পাখির বাবা-মা। সে এদিক-ওদিক দেখে চেঁচিয়ে বলল, মিল গয়ি। বলে একটা কোটরের মধ্যে হাতের পাখিগুলোকে নামিয়ে দিল। তারপর পকেট থেকে ফোন বার করে কোটরের ছবি তুলল চার-পাঁচটা। বৃষ্টির মধ্যে গাছে ওঠাটা তার কাছে কোনও ব্যাপারই নয়।

গাছ থেকে তরতর করে নেমে খুব হাস্যোজ্জ্বল মুখে সে বলল, দেখিয়ে, আওর ভি বাচ্চি থি। ওর ফোনের ছবি দেখে আমি বললাম, ও বাবা। এ তো আরও তিনটে বাচ্চা রয়েছে।

মনটা অদ্ভুত আনন্দে ভরে উঠেছিল। লকসমনকে কিছু টাকা দিলাম। নিতে চাইছিল না, জোর করে দিলাম। লবিতে এসে ভয়ানক শীত করল। সোফায় বসে রিসেপশনের মেয়েটিকে হাত নেড়ে ডাকলাম। মেয়েটি দৌড়ে এসে বলল, আর ইউ ওকে ম্যাম? আর ইউ ফিলিং সিক? আমি তাকে বললাম, আমি ঠিক আছি। কিন্তু এই কাঠের সিঁড়ি দিয়ে তিনতলার ঘরে যেতে অসুবিধে হবে। রিসর্টে একটা লিফট আছে যেটা সবসময় চালানো হয় না। যদি এখন লিফট-টা একবার চালানো হয় তাহলে ঘরে যেতে কোনও কষ্ট থাকে না। মেয়েটি ম্যানেজারকে ডেকে পাঠাল। বৃদ্ধ ম্যানেজার এসে বললেন, তিনি লিফট চালিয়ে দেবেন। আসলে এখানে বিদ্যুতের ঘাটতি প্রচণ্ড। তাই সবসময় লিফট চলে না। কিন্তু তিনি আমাকে বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন, ডাক্তার ডাকার জন্যে। আমার ধরনধারণ তাঁর ভালো লাগছে না। এরপর রাত হয়ে গেলে ডাক্তার পাওয়া মুশকিল হবে। আমাকে ঘর অব্দি এগিয়ে দিলেন ম্যানেজার আর রিসেপশনের মেয়েটা।

ঘরে বিছানায় শুয়ে শুয়েও রাস্তাটা দেখা যাচ্ছিল। ভাবছিলাম উঠে গিয়ে পর্দা টেনে দেব জানলার। অল্প জ্বর ভাব। পর্দা টানতে যাব, হঠাৎ যেন অন্ধকারে দেখলাম একটা টিলার ওপর কেউ বসে আছে, যেন একটা টুপি তার মাথায়।

জ্বর বাড়ছে। রাতে কিছু খাব না। চোখে কেমন একটা ঘোর আসছে নেমে। দরজার দিকে তাকাতেই দেখি, পেছন দিক ঘুরে কেউ একটা দাঁড়িয়ে! সেই লম্বা ছেলেটা! মাথায় টুপি! গায়ে খয়েরি কোট! কী করে ঢুকল আমার ঘরে? কৌন হ্যায়? হু ইজ দেয়ার? আমার ফোনটা কোথায়? জ্বরের ঘোরে হাত-পা নাড়ার ক্ষমতা ততক্ষণে চলে গিয়েছে। আমি জ্বরের ঘোরে ভুল দেখছি না তো? ওই ছেলেটা গাছতলায় ছিল দুপুরে। দরজার দিকে তাকালাম। ফাঁকা ঘর হু হু করছে। চোখ বুজতেই ভেসে উঠল সেই ছেলেটার টুপি, পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকা অবয়ব। কখনও চোখ বুঝে, কখনও চোখ খুলে দেখতে লাগলাম ছেলেটির টুপি, কোট। এটাতো আর্মি হ্যাট। ছেলেটি কি সেনাবাহিনীর কেউ? কিছু বলতে চাইছে আমাকে? কে তুমি? আমি বাংলায় বলতে লাগলাম।

সামনে ফেরো! পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছ কেন? ছেলেটি আমার দিকে ঘুরল। একি! খুবলে মাংস তুলে নেওয়া, চোয়াল ভাঙা, ঠোঁট, মাড়ি কেটে

নেওয়া একি বীভৎস মুখ। দুটি চোখের কোটর ফাঁকা। সেখান থেকে শুকনো রক্ত কালো হয়ে বেরিয়ে এসেছে।

প্রবল জ্বরের মধ্যেই আমি খাটের ওপর ছিটকে উঠে বসলাম। সারা ঘর শূন্য। কেউ নেই ঘরে।

পরদিন ঘুম ভাঙল বেশ দেরিতে। বৃষ্টি পড়ছে না আর। অল্প রোদ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে ডেকে গিয়ে কফি দিতে বললাম। সময়িতা ফোন করেছে। ওরা কাল সন্ধেবেলা কবিতা পড়েছে। আমার জন্যেই ওরা ফিরে আসছে আজকেই। এইমাত্র হেলিকপ্টার থেকে নেমেছে ওরা। আর আধঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে।

ওরা আসার পর, সকলে একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট করছি। তিন-চারজন সেনা অফিসার আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। সব্যসাচী মজুমদার ওদের সকলকে নৈশভোজে নিমন্ত্রণ করলেন। ওঁরা আসতে পারবেন না। আজ ওঁরা সৌরভ নগরে থাকবেন। সেখানে অনুষ্ঠান আছে। সব্যসাচীবাবু হঠাৎ মনে পড়ার ভঙ্গিতে বললেন, ওহো! আজ তো সৌরভ কালিয়ার স্মরণসভা। সেনা অফিসার সব্যসাচীবাবুকে বললেন, নো ইস্যু। আজ আমাদের যেতে হবে। আপনারা সন্ধেবেলা একবার আসুন না সৌরভের বাড়িতে। নতুন লোকজন গেলে ওর বাবা-মা তবু একটু বাঁচার শক্তি পায়।

আমরা সন্ধেবেলা যাব শুনে বারবার আমাদের ধন্যবাদ দিয়ে গেলেন সেনাবাহিনীর অফিসাররা।

আমি জিগ্যেস করলাম, সৌরভ কালিয়া নামটা শোনা শোনা লাগছে? কোথায় যেন পড়েছি।

শ্রীময়ী মিত্র বললেন, ইনি জাঠ রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন সৌরভ কালিয়া। কার্গিল যুদ্ধের শহীদ। অ্যাম আই রাইট?

সব্যসাচীবাবু বললেন, হুঁ। আমিও ছিলাম কাগিল যুদ্ধের ফ্রন্টে। সৌরভ কালিয়া আর তার পাঁচজন সঙ্গী জওয়ানের কথা ভাবলে এখনও মাথার ঠিক রাখতে পারি না।

সময়িতা জিগ্যেস করল, কেন? কী হয়েছিল?

সব্যসাচী বললেন, এই সৌরভ কালিয়া ছিল খুব সুন্দর, মেধাবী একটা ছেলে। পড়াশোনায় খুব ভালো ছিল বলে সবাই ভাবত ও গবেষক বা বিজ্ঞানী হবে। কিন্তু গ্রাজুয়েশন শেষ করে কী ভূত সেই ছেলের মাথায় চাপল কে জানে, সে ডিফেন্স সার্ভিস পরীক্ষায় বসে পড়ল। ভালোভাবে পাশও করে গেল। মাত্র একুশ বছর বয়েসে সেই ছেলে জাঠ রেজিমেন্টের লেফটেন্যান্ট পদে যোগ দিয়ে কার্গিল চলে গেল।

সব্যসাচীবাবু বললেন, কার্গিল যুদ্ধ শুরুর ঠিক আগের দিন। সেটা ১৫ মে। ১৯৯৯। সৌরভ আর তার পাঁচ সঙ্গী—সিপাই ভিখা রাম, অর্জুন রাম, ভনওয়র লাল বাগারিয়া, মূলা রাম ও নরেশ সিং আঠেরো হাজার ফুট উঁচু থেকে পাকিস্তানের ওপর নজর রাখছিল। ওরা ছিল কাকসার লাংপা হিমবাহের বজরং পোস্টে। ওদের কাছে বাইনোকুলার ছিল। হঠাৎ সৌরভ কালিয়ার নজরে আসে দূরে কিছু একটা নড়াচড়া করছে। আরও ভালোভাবে দ্যাখে সৌরভ। বুঝতে পারে পাকিস্তানি সেনা ভারতের চৌহদ্দির মধ্যে পুরোপুরি ঢুকে পড়েছে। অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তারা এসেছে। যখন তখন তারা আক্রমণ করতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে সৌরভ ওয়াকিটকিতে ফোন করে বেসক্যাম্পে খবর দেয়, পাকিস্তানি সেনা ঘিরে ফেলছে ভারতীয় ভূখণ্ডের একাংশ। ব্যাক আপ টিম চেয়ে পাঠায়।

এদিকে পাকিস্তানের সৈন্যরা বুঝতে পারে বজরং পোস্ট থেকে কেউ তাদের দেখছে। দ্রুত শুয়ে শুয়ে পাকসেনা ঘিরে ফ্যালে বজরং পোস্ট। সৌরভ কালিয়া ও তার পাঁচ সঙ্গী প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ চালায়। কিন্তু শুয়ে শুয়ে বুলেট ধেয়ে আসতে থাকে তাদের দিকে। তাদের গুলি ফুরিয়ে যায়। সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় পাক সেনা তাদের যুদ্ধ বন্দী করে ধরে নিয়ে যায়। ব্যাক আপ টিম বজরং পোস্টে পৌঁছে সৌরভ আর তার সঙ্গীদের খুঁজে পায় না। কিন্তু পাকিস্তান ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকে পড়েছে জেনে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভারতীয় আর্মি। কার্গিল যুদ্ধে হেরে যায় পাকিস্তান।

সময়িতা বলে, আর সৌরভদের ওরা মেরে ফেলল? ওদের উদ্ধার করা গেল না?

সব্যসাচীবাবু বলেন, ১৫ মে পাকিস্তানের হাতে সৌরভরা বন্দি হয়। তারপর ৭ জুন অব্দি চলে এমন অত্যাচার যা হিটলারও হয়তো করেননি। পৈশাচিক অত্যাচার করা হয় ওদের ওপর।

১৫ মে ওদের পাক অধিকৃত কাশ্মীরের গোপন ডেরায় নিয়ে যায় পাকিস্তানী সেনা। স্কার্দু টেলিভিশনে স্বীকার করা হয় সৌরভ সহ ছ-জন যুদ্ধ বন্দী ধরা পড়েছে পাকিস্তানের হাতে। কিন্তু জেনেভা কনভেনশনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পাকিস্তান এই ভারতীয় যুদ্ধ-বন্দিদের ওপর চালায় অমানুষিক অত্যাচার। তাদের চোখ তুলে নেয়, দাঁত ভেঙে দেয়। গরম লোহা দিয়ে কানের পর্দা ফুটো করে দেয়।

সময়িতা শিউরে ওঠে।

শ্রীময়ী মিত্র বলেন, অথচ জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী যুদ্ধ-বন্দিদের একটা চড় মারলেও সেই দেশের কঠিন শাস্তি হবার কথা।

সব্যসাচীবাবু বলেন, হ্যাঁ। সারাদেশ থেকে আওয়াজ ওঠে জাস্টিস চেয়ে। সুপ্রিম কোর্ট জানায় জীবন্ত অবস্থায় অবর্ণনীয় অত্যাচার করা হয়েছে সৌরভদের ওপর। পাকিস্তান অস্বীকার করেছে পুরো ঘটনা। তারা বলেছে সৌরভ কালিয়া মারা গেছে ঠান্ডা লেগে। আমাদের ইনটেলিজেন্স আজও চেষ্টা করছে যদি এই কাজের কোনও প্রমাণ, উদ্ধার করা যায়। কিন্তু তেইশ বছর হয়ে গেল, কিছু পাওয়া গেল না।

বিরাট প্রাসাদের মতো একটা বাড়ি। চারপাশে অনেক গাছ। সারা বাড়িতে আজ সেনাবাহিনীর লোক। আজ ৯ জুন। আজই কফিন বন্দি হয়ে ফিরেছিল সৌরভের ছিন্নভিন্ন শরীর। বাড়ির ভেতরে যেন মর্গের শূন্যতা। অথচ তেইশ বছর কেটে গিয়েছে। সৌরভের বাবা ঘুরে ঘুরে ওর টুপি, মেডেল কোট সব দেখাচ্ছিলেন। অল্প কাঁপছিল তাঁর স্বর। বলছিলেন তাঁর ছেলে ভালো মানুষও ছিল। দুনিয়ার এমন কোনও বিষয় নেই যা সে জানত না, তাঁর বাবা আশা করেন, কোনও না কোনওদিন তাঁর ছেলে আর ছেলের সঙ্গীদের হত্যাকারীরা ধরা পড়বে। তাঁরা বিচার পাবেন। কিন্তু কোথা থেকে পাবেন তাঁরা বিচার? পাকিস্তান তো মুছে ফেলেছে সব প্রমাণ!

সারা বাড়িতে সৌরভের ছবি, ব্যবহৃত জিনিস। বাড়ির ছাদে একটা বড় গম রাখার গামলা। সৌরভ খুব পাখি ভালোবাসত। বাড়িতে থাকলে রোজ নিজে খাওয়াত পাখিদের। তাই এখনও রোজ কয়েক কেজি গম খাওয়ানো হয় পাখিদের।

ফিরবার সময় সৌরভের বাবা বললেন, জানেন, আমি পাকিস্তানের কোনও ছেলেকেও মেরে ফেলা হোক চাই না। আমি শুধু চাই ওরা একবার স্বীকার করুক। একবার অনুতপ্ত হোক।

সৌরভের দাদা বলছিলেন, কারুর আর মনে নেই তাঁর ভাইয়ের কথা। রাস্তাঘাটে কেউ চেনে না তাঁর ভাইকে। কেউ মনে রাখেনা।

আমি সৌরভের দাদাকে বললাম, সৌরভের একটা ছবি দেখেছিলাম খয়েরি কোট পরা। ওর এত পোশাক দেখলাম! খয়েরি কোটটা দেখলাম না তো!

দাদা বললেন, হ্যাঁ, ওই কোটটা ওর খুব প্রিয় ছিল। কিন্তু ওটা তো আমাদের কাছে নেই। ও ওটা নিয়ে ফ্রন্টে গিয়েছিল।

পতাকা তোলা হল। জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হল। ফিরবার সময় পিছন ফিরে দেখলাম, বাড়ির গেটে সৌরভের একটি মূর্তি। চারপাশে গাছ, পাহাড়, মনোরম পরিবেশ। কিন্তু মূর্তিটি একেবারেই জীবন্ত নয়। রিসর্টের সামনে খয়েরি কোট আর টুপি পরা মূর্তিটি কিন্তু দারুণ জীবন্ত ছিল! আমি নিশ্চিত, সৌরভই এসেছিল পাখির ছানা বাঁচাতে। **কিশোর ভারতী**

ছবিঃ রঞ্জন দত্ত

বিনোদ ঘোষাল

তড়িৎবাবুর বাড়ি

অবশেষে বাড়িটা পেয়েই গেলেন তড়িৎ সমাদ্দার। এত কম দামে এত বড় জমি সমেত বাড়ি পেয়ে যাবেন তা কল্পনার অতীত ছিল। চিরকালের স্বপ্ন ছিল এমন একটা বাড়ি যার সামনে বেশ মাঠ থাকবে, গাছ থাকবে, পুকুর থাকবে। প্রকৃতির মাঝে জীবনের শেষ বয়সটা কাটাবেন। যদিও ছোটবেলায় শখ ছিল অন্য। সেই শখ জন্মের মতো ঘুচে গেছে। সে গল্প পরে হবে।

আপাতত তড়িৎবাবু ও তার বাড়ির সম্পর্কে আরও দু'চার কথা বলে নেওয়া যাক। তড়িৎ সমাদ্দারের পৈত্রিক ভিটে হল পানিহাটি। তার পিতৃদেব ছিলেন রেলের মস্ত অফিসার। তড়িৎ-এর যখন একুশ বছর বয়স তখন পিতৃদেব হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ডিউটিরত অবস্থাতেই ইহলোক ত্যাগ করলেন। সংসারের দায়িত্ব পড়ল তড়িৎ-এর ওপর। জীবনে পড়াশোনা ছাড়া আর একটি বিষয়েই আগ্রহ ছিল। তা হল ফুটবল খেলা। তাই দেখে পিতৃদেব তড়িৎকে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। ক্লাস টেন পাশ করার পর তড়িৎ ব্যারাকপুরে ফুটবলের কোচিং ক্লাসে ভর্তি হলেন। সপ্তাহে শনি-রবি বিকেলে প্র্যাকটিসে যেত। অনেক দূর পর্যন্ত স্বপ্ন ছিল তড়িৎ-এর।

কিন্তু মাঝে বাবার মৃত্যু সেই স্বপ্নকে থামিয়ে দিল। কমপ্যাশনেট গ্রাউন্ডে তড়িৎ বাবার চাকরিটি পেলেন। ক্লারিকাল পোস্ট। সারাদিন ফাইলে মুখ ডুবিয়ে রাখলেও মন পড়ে থাকত খেলায়। সংসারটা একটু গুছিয়ে নেওয়ার পর আবার ইচ্ছা হল খেলায় ফেরার। কিন্তু সময় কোথায়?

অবশেষে একদিন সুযোগ এসে গেল। অফিসের ডিপার্টমেন্টের অ্যানুয়াল পিকনিকে অনেক কলিগই ফুটবল খেলছিলেন। একটা সময় তড়িৎও পায়ে বল নিলেন। সকলের তাক লেগে গেল তড়িৎ-এর স্কিল দেখে। কয়েকজন সিনিয়র অফিসারও ছিলেন সেদিন। জিজ্ঞাসাবাদের পর জানা গেল ওঁর পুরোনো ইতিহাস। তড়িৎ-এর শুভানুধ্যায়ী সেই সিনিয়ররা সেদিনই স্থির করে ফেললেন তড়িৎকে অবিলম্বে অফিসের স্পোর্টস বিভাগে ট্রান্সফার করতে হবে।

খেলার জীবনে আবার ফিরল তড়িৎ। প্রাণ ঢেলে আবার প্র্যাকটিস শুরু। রেলের ডিপার্টমেন্টের হয়ে খেলা। মা চাইছিলেন ছেলেটা এবার বিয়ে থা করে সংসার করুক। কিন্তু তড়িৎ-এর সংসার করার দিকে কোনও মন ছিল না। ডিপার্টমেন্টের হয়ে খেলে অনেক টুর্নামেন্টে দলকে

জিতিয়েছিলেন তড়িৎ।

ওই সময়েই একদিন ঘটে গেল এক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। সেদিন খুব ঝড়-জলের দিন ছিল। অফিস সেরে আর প্র্যাকটিসে যাননি। ট্রেন থেকে নেমে সাইকেল নিয়ে বাড়ি ফিরছেন। অন্ধকার রাস্তা তায় লোডশেডিং। আচমকা উল্টোদিক থেকে ঝড়ের গতিতে একটা টেম্পো চলে এল। সাইড দিতে গিয়ে টাল সামলাতে পারলেন না তড়িৎ। রাস্তায় সাইকেল সমেত হুমড়ি খেয়ে পড়লেন আর টেম্পোর পিছনের চাকা তড়িৎ-এর ডান পায়ের গোড়ালির ওপর দিয়ে চলে গেল। গোড়ালির হাড় গুঁড়োগুঁড়ো।

অনেক চিকিৎসার পরে তড়িৎ হাঁটাচলা করা শুরু করতে পারলেন ঠিকই, কিন্তু খেলা জীবনের মতো বন্ধ হয়ে গেল। তড়িৎ একেবারে ভেঙে পড়লেন। জীবনটা শূন্য মনে হতো। শেষ পর্যন্ত দশটা-পাঁচটার জীবনই যে ভবিতব্য, সেটা নিজের মনকে একসময়ে জোর করে বুঝিয়েছিলেন।

তড়িৎবাবুর বয়স যখন ছাপ্পান্ন তখন তাঁর মা চলে গেলেন। পুরোপুরি একা হয়ে গেলেন তিনি। মনে মনে একটা ব্যাপার ঠিক করে ফেলছিলেন। রিটায়ার করার পর আর পানিহাটি নয়, অন্য কোথাও বাকি জীবনটা কাটাবেন। আর সেই অন্য কোথাওটা হবে সবুজে ঘেরা কোনও গ্রাম।

রিটায়ারমেন্টের কিছুদিন আগে থেকেই এমন একটা জায়গার খোঁজখবর করছিলেন তিনি। কয়েকটা জায়গা দেখেও এসেছিলেন। কিন্তু মনে মনে যেমনটি চাইছিলেন, তেমনটি পাচ্ছিলেন না। একদিন গ্রুপ-ডির শিবু বলল, স্যার, আপনি একটা জায়গা দেখতে পারেন। মনে হয় আপনার পছন্দ হবে।

শিবুর কাছে বর্ণনা শুনে একদিন সেই জায়গাটা দেখতে গেলেন তড়িৎ। দেখামাত্র তাঁর মনে হয়েছিল, হ্যাঁ, ঠিক এমনটাই খুঁজছিলেন। একতলা একটি বাড়ি। বাড়ির সামনে মাঠ, তারপর পুকুর। আর বাড়ির খানিক পিছনে বিশাল বাঁশবন। বাঁশবন পার করলে ধানখেত। মাথার ওপর মস্ত আকাশ। সামনের জমি সমেত বাড়িটি একবারে বিক্রি করে দিতে চান মালিক। দাম নিতান্তই কম। আর জায়গাটা নামও ভারি সুন্দর। চন্দ্রপুর।

তড়িৎবাবু সঙ্গে সঙ্গে রাজি। ডিল ফাইনাল করে ফেললেন। তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে এলেন। বাড়িটি অনেকদিন ধরেই পড়ে ছিল। তাই বাড়ির মালিক সেটাকে সাফসুতরো করিয়ে দিয়েছিলেন। তড়িৎবাবু অনুরোধ করেছিলেন, তার একজন লোক লাগবে যে, রান্নাবান্না-ঘরদোর দেখাশোনার কাজ জানে। মালিক রবি নামের একটি ছেলেকে ব্যবস্থা করে দিলেন। ছেলেটির বয়স একুশ-বাইশ। দিব্বি ছেলে। স্বভাব যেমন হাসিখুশি কাজেও করিৎকর্মা।

রবি একটিই শর্ত রেখেছিল তড়িৎ-এর কাছে, আমি রোজ থাকব স্যার। কিন্তু যেদিন বৃষ্টি-বাদলা থাকবে সেদিন আমি এই বাড়িতে থাকব না।

কেন রে? বৃষ্টিতে কী অসুবিধা?

সে অসুবিধা আছে স্যার। অনেক অসুবিধা। আপনি রাজি থাকলে বলুন।

আচ্ছা বেশ। তাই-ই হবে।

আর একটা কথা স্যার। ঝড়-বৃষ্টি হলে আপনিও ঘরের বাইরে বেরোবেন না।

কেন?

ইয়ে...মানে এখানে খুব বাজ পড়ে। তাই-ই আর কী।

মাস খানেক বেড়ে কাটল। কোনও অসুবিধা নেই। প্রকৃতির মাঝে মন সত্যিই ভালো থাকে। একদিন সন্ধেবেলা টিভিতে খবর শুনছিলেন। রবিও এই সময়টা বাবুর সঙ্গে বসে টিভি দেখে এবং চা খায়। টিভিতে জানানো হল আগামী কাল থেকে গভীর নিম্নচাপ শুরু হবে। কয়েকদিন বজ্রবিদ্যুৎসহ ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা।

খবরটা শোনামাত্র রবি যেন শিউরে উঠল। তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আগামীকাল থেকে কয়েকদিনের ছুটি নেব স্যার।

তোর ভয় কীসের? আমি তো রয়েছি।

না স্যার, আপনাকে আগেই বলেছিলাম, ঝড়-বাদলার দিনে এখানে থাকব না।

বেশ।

পরদিন অনেক সকালে রবি এসে কয়েকদিনের বাজার-হাট ইত্যাদি দরকারি কিছু জিনিস রেখে দিয়ে উধাও। ওর চোখ মুখে বেশ ভয়। যাওয়ার আগে বারবার তড়িৎকে বলে গেল, স্যার, একটা অনুরোধ। ঝড়-বাদলায় দয়া করে ঘরের বাইরে যাবেন না, নিজের বিপদ ডাকবেন না।

কী বিপদ সেটা তো বলবি?

রবি কিছু বলতে গিয়েও থমকে গেল। শুধু বলল, সে আমি জানি না। তবে এ বাড়ির দোষ আছে শুনেছি।

কী দোষ রবি?

আমি জানি না স্যার, কিছু জানি না। রবি উধাও।

বিকেলের পর আকাশ কালো। তারপর শুরু হল আকাশ ভেঙে বৃষ্টি। সঙ্গে মুহুর্মুহু বাজ। উফ, কানে তালা ধরে যায়। ঝড়-বৃষ্টি খুব উপভোগ্য কিন্তু বাজ পড়ায় সত্যিই ভয় লাগে। লোডশেডিং হয়ে গেছে। এই তাণ্ডবে ইলেকট্রিসিটি আসার কোনও চান্সই নেই। দরজা বন্ধ করে ঘরের ভেতরেই ছিলেন তড়িৎ। শুধু বারান্দার দিকের একটা জানলা খুলে রেখেছিলেন। হ্যারিকেন জ্বালিয়ে বই পড়ছিলেন আর মাঝে মাঝে জানলা থেকে বাইরে তাকাচ্ছিলেন। বিদ্যুতের ঝলকানিতে বাড়ির সামনের মাঠটা আলোকিত হয়ে উঠছিল। সম্ভবত সন্ধে সাড়ে ছয় কি সাতটা বাজতে প্রবল শব্দে বাজ পড়ল! চারদিক দিনের আলোর মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আর সেই আলোতে তড়িৎ দেখতে পেলেন কয়েকটা ছেলে সামনের মাঠটায় খেলছে।

কী করে হয়? এই মাঠে তো কেউ আসে না। একেবারেই পরিত্যক্ত। সেখানে এই ঝড়জলে কারা আবার খেলতে আসবে? চোখের ভুল, আবার বইয়ে মনোনিবেশ করলেন তড়িৎ। কিছুক্ষণ পর আবারও বিদ্যুৎ চমকাল! এবং আবারও একই দৃশ্য। কয়েকটি কিশোর মাঠের মাঝখানে দৌড়চ্ছে। দুবার ভুল দেখা সম্ভব নয়। নিশ্চয়ই বাচ্চাগুলো খেলছে।

এই বয়সে বৃষ্টিতে খেলার একটা মজা রয়েছে। কিশোর বয়সে তড়িৎ নিজেও বন্ধুদের সঙ্গে অনেক মাঠঘাটে খেলেছেন। কিন্তু এত ঘনঘন বাজ পড়ছে। এরমধ্যে ওদের মাঠে খেলা উচিত নয়। ভাবামাত্র তড়িৎবাবু উঠে ঘরের দরজা খুললেন। চোখ-মুখে বৃষ্টি আর হাওয়া ঝাপটা মারল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে জোর গলায় তড়িৎবাবু বললেন, এই যে ছেলেরা, এখন ঘরে যাও। বজ্রপাত হচ্ছে। কিন্তু ছেলেগুলোর কানেই ঢুকল না।

বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বাজের বিকট শব্দ। বাচ্চাগুলোকে খেলা থেকে নিরস্ত করতেই হবে। যে-কোনও সময়ে বিপদ ঘটে যেতে পারে। তড়িৎ অস্থির হয়ে উঠলেন। বাইরে ঘন অন্ধকার। শুধু বিদ্যুতের আলোতেই মাঝে মাঝে ছেলেগুলোর অবয়ব স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

তড়িৎ ঘর থেকে ছাতা বার করে বৃষ্টির মধ্যেই নেমে পড়লেন। কোনওমতে পৌঁছলেন সামনের মাঠটায়। চিৎকার করে বললেন, ওই ছেলেরা, তোমরা এবার ঘরে যাও। দেখছ না বাজ পড়ছে!

এবার ওদের মধ্যে একটি ছেলে তড়িৎ-এর দিকে তাকাল। তড়িৎ এই অন্ধকারেও স্পষ্ট বাচ্চাগুলোকে দেখতে পাচ্ছেন। চার-ছয়টি ছেলে। ওদের বয়স দশ থেকে বারোর মধ্যে।

একজন তড়িৎ-এর দিকে আচমকা বলটা এগিয়ে দিল। বহুবছর পর বলটা পায়ের সামনে আসতেই তড়িৎবাবুর যে কী হল! তিনি ভুলে

গেলেন তার একটি পা অকেজো। তিনি বলে শট মারলেন। বলটা শাঁই-ই করে ছুটে গেল মাঠের মাঝখানে। দুটো ছেলে তড়িৎকে ইশারা করে ডাকল, খেলায় যোগ দেওয়ার জন্য। এত অন্ধকারের মধ্যেও তড়িৎবাবু ওদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। স্বপ্নে যেমন কুয়াশার মতো ঝাপসা আলো থাকে ঠিক তেমনই হয়ে রয়েছে মাঠের চারিপাশে। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু সেই বৃষ্টি যেন গায়ে লাগছে না।

তড়িৎবাবুর মাথায় আর কোনও যুক্তিবোধ কাজ করছে না। তিনি ফুটবলের নেশায় মেতে উঠলেন। সেই পুরনো দিনের মতো খেলতে শুরু করলেন। মাঝের অতীত স্মৃতি থেকে বেবাক মুছে গেছে। তুমুল খেলতে লাগলেন তিনি ওই বাচ্চাগুলোর সঙ্গে। আহ, কী আনন্দ। অফুরন্ত শক্তি যা এতদিন শরীরের ভেতরে ঝিমিয়েছিল তা যেন আজ বাইরে আসার সুযোগ পেয়েছে। মাঠের মধ্যে ছেলেদের সঙ্গে খেলতে থাকলেন তড়িৎবাবু জগৎসংসার ভুলে।

সহসাই গোটা পৃথিবী ঝলসে উঠল তীব্র আলোয়, পরক্ষণেই কানে তালা ধরানো বিকট শব্দ! চোখের সামনে তড়িৎবাবু দেখলেন সেই ছেলেগুলোর শরীর দপ দপ করে জ্বলে উঠে কাঠের মতো স্থির হয়ে গেল। তড়িৎবাবু আতঙ্কে চিৎকার করে উঠতে গেলেন, পারলেন না। জ্ঞান হারিয়ে মাঠের মধ্যেই পড়ে গেলেন।

জ্ঞান যখন ফিরল অতিকষ্টে তাকিয়ে দেখলেন তিনি ঘরে শুয়ে। দিনের আলো। সামনের চেয়ারে বসে রয়েছেন একজন ডাক্তার। পাশে রবি ও গ্রামের আরও কয়েকজন। সকলের চোখ-মুখেই উৎকণ্ঠা। তড়িৎবাবুকে চোখ মেলতে দেখে রবি ঝুঁকে বলল, স্যার, দেখতে পাচ্ছেন?

তড়িৎবাবু মাথা নাড়লেন। ফিসফিস করে বললেন, জল...জল।

ডাক্তারবাবু বললেন, যাক জ্ঞান ফিরেছে। আর চিন্তা নেই। দুটো দিন রেস্ট নিন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

তড়িৎবাবুর মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা। ধীরে ধীরে গতরাতের কথা মনে পড়ল। উঠে বসতে গেলেন।

রবি ছুটে এসে বলল, আহা স্যার করেন কী! আস্তে আস্তে।

রবি রে...ছেলেগুলো মাঠে খেলছিল...প্রচণ্ড বাজ পড়ল...উফ ভগবান...কেমন আছে ওরা?

স্যার, শান্ত হোন। সব ভুল দেখেছেন।

কী বলছিস রে রবি। রবির হাতদুটো ধরলেন, বললেন, তুই নিশ্চয়ই সব জানিস রবি। আমার সঙ্গে কী ঘটেছে বল।

রবি কয়েক মুহূর্ত তার স্যারের দিকে অপলক তাকিয়ে রইল। তারপর শোনাল এক মর্মান্তিক ঘটনার কথা।

আজ থেকে বছর সাতেক আগে এই বাড়ির সামনের মাঠে প্রতিদিন গ্রামের ছেলেরা খেলাধুলো করত। একদিন ভাদ্রমাসের বিকেলে ছয়টা ছেলে মিলে ফুটবল খেলছিল। তখন শুরু হল বৃষ্টি। বৃষ্টি মাথায় নিয়েই খুব মজায় খেলছিল ছেলেগুলো। অন্ধকার নেমে আসায় ওরা খেলা থামিয়ে সবে একজোট হয়েছে, এই সময় পৃথিবী ফাটিয়ে আচমকা বাজ পড়ল। এক সেকেন্ডের মধ্যে ফুটফুটে ছেলেগুলো ঝলসে শেষ।

গ্রামের মানুষ শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। ধীরে ধীরে গ্রাম শোক কাটিয়ে উঠল বটে, কিন্তু একদিন আবার এক ঝড়-জলের রাতে বাড়ির মালিক দেখতে পেলেন, সেই বাচ্চাগুলো মাঠে খেলছে। প্রথমদিন তিনি ভেবেছিলেন চোখের ভুল। কিন্তু বেশ কয়েকবার বৃষ্টিবাদলার রাতে একই দৃশ্য। তিনি শুধু একা নয় বাড়ির সদস্যরাও দেখেছিল। আমি তখন সেই মালিকের বাড়িতে কাজ করতাম। আমিও দেখেছি। সেই বাচ্চাগুলো স্যার, বৃষ্টি হলেই ফিরে আসে, খেলে। কারও কোনও ক্ষতি করে না, কিন্তু...।

বলতে বলতে চোখের জল মুছল রবি। তারপর আবার বলল,

মালিক ঠিক করলেন, এই বাড়িতে তিনি আর থাকবেন না। অন্য জায়গায় জমি কিনে বাড়ি বানালেন। এই বাড়িটা পড়েই ছিল। তারপর মালিকের এক পরিচিতের মাধ্যমে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ হল। আপনি কিনলেন। তারপর তো...

আপনাকে আজ সকালে ঘরে না পেয়ে ছুটে গেছিলাম মাঠে। মাঠের মাঝে জলে কাদায় মাখামাখি হয়ে আপনি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে ছিলেন। মা মনসার কৃপায় কোনও সাপখোপ বা কিছুতেই কামড়ায়নি। আপনাকে একটা কথা বলি স্যার। এই বাড়ি ছেড়ে চলে যান।

এইটুকু বলে চুপ করল রবি। দুজনে অনেকক্ষণ চুপ। তড়িৎবাবুর বার বার মনে পড়ছিল গতরাতের দৃশ্য। ওইভাবে বলে শট মারা, ওদের সঙ্গে হই-হই করে খেলা। সব মিথ্যে? সব চোখের ভুল? হয়তো... হয়তো...সবটাই হ্যালুসিনেশন।

বাথরুমে যাবেন বলে তড়িৎবাবু বিছানা ছেড়ে উঠতে গিয়ে টের পেলেন, দুই পায়ের গোড়ালি এবং চেটোতে বেশ ব্যথা। তাকিয়ে দেখলেন পায়ের পাতাদুটো লাল হয়ে রয়েছে। খালিপায়ে ফুটবল খেললে যেমন হয়।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাথরুমের দিকে যেতে যেতে তড়িৎবাবু বললেন, আমি কোথাও যাব না রে রবি। বাকি জীবনটা এখানেই থাকব। আজও মনে হয় রাতে বৃষ্টি হবে।

চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

ঢেঙ্কানলের খুনি দাঁতাল

বহুদিন রঞ্জিতদার কোনও খবর নেই। আসলে এই কোভিড অতিমারির সময়ে আর যোগাযোগ হয়ে ওঠেনি। ফোনেই কথা সারতাম। রঞ্জিতদা এখন নিউটাউনে শিফট করেছে। অনেক মাস পর গেলাম। আর যাওয়া মানেই তো গল্প—শিকারের গল্প। চা-টা খাওয়ার পরে একটু আমতা আমতা করেই বলে ফেললাম, দাদা, শারদীয়ার জন্য এবারে কিন্তু একটা জবরদস্ত গল্প চাই!

একটু আড়মোড়া ভেঙে রঞ্জিতদা বলল, ঠিক আছে, তবে আজ তোকে আমি এমন একটা গল্প বলব যেখানে আমি নই; নায়ক আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু প্রয়াত চঞ্চল সরকার। চঞ্চলের জীবনের প্রথম গুন্ডা হাতি মারার গল্পটাই আজ তোকে শোনাব।

নতুন গল্পের প্লট পেয়েই নড়েচড়ে বসলাম। রঞ্জিতদা বলে চলল।

প্রাত্যহিকতার বাইরে জীবন নিজের নিয়মেই বয়ে যায়। কারো জন্য অপেক্ষা করে না। গত পঞ্চাশ বছরের ওপর এই জঙ্গলই আমাদের সেই প্রাত্যহিকতার বাইরের জীবন। কত বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শে এসেছি—বুনো শিকারি, সাপুড়িয়া, ওঝা, বেদে আরও কত মানুষ! একেক সময় জঙ্গলের একেক রূপ। কাঁধে বন্দুক নিয়ে কত জ্যোৎস্না রাতে ঘন জঙ্গলে মাইলের পর মাইল হেঁটেছি। সঙ্গী রাতজাগা পাখিদের ডাক। ঝিঁঝি পোকার কনসার্ট। একটা মোহময়তা ঘিরে ধরত আমাদের। সে রূপ বর্ণনা করা যায় না...

রঞ্জিতদা, চঞ্চলদার গল্পটা শুনি—আমি মাঝখানে বলে উঠলাম।

হ্যাঁ, হ্যাঁ বলি শোন। সেটা ১৯৬৯ সালের ঘটনা। চঞ্চল তখন যুবক। তার আগের বছরই চঞ্চলের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে এবং সে আলাপ গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছে। ততদিনে সে হাতি মারবার উপযুক্ত রাইফেল কিনে নিয়েছে। আমার কাছে রাইফেল না থাকায় সেবার চঞ্চলকেই হাতিটা মারতে যেতে হয়েছিল।

ওই বয়েসেই তোমরা পাগলা হাতি মারবে ঠিক করেছিলে?

আমাকে থামিয়ে দিয়ে রঞ্জিতদা বলে চলল, শোন, পাগলা হাতি মারতে হলে সব থেকে আগে যেটা চাই সেটা হল একাগ্রতা। যোগাভ্যাসের মতো স্থানু থাকতে হবে। আর নার্ভ হবে ইস্পাতের মতো কঠিন। থাকতে হবে মার্কসম্যানশিপ যা লক্ষ্যভেদে পারদর্শী করে তুলবে। অবিচল রাখবে।

১৯৬৯ সালের ডিসেম্বর মাস। তখন চঞ্চলের সঙ্গে উড়িষ্যার

ঢেঙ্কানলের রাজার ভাই কুমার আর. পি. সিং দেওর বন্ধুত্ব হয়েছে। ওই অঞ্চলে হাতির খুব উপদ্রব। আর. পি. সিং দেও নিজে শিকারি হলেও হাতি মারার ব্যাপারে তাঁর একটা কুসংস্কার ছিল। তিনি স্থির করেছিলেন, তিনি নিজে কখনোই হাতি মারবেন না, বা সঙ্গেও যাবেন না। চঞ্চল সেটা জানত। তাই আর. পি. সিং-কে চঞ্চল বলে রেখেছিল কোনও পাগলা হাতির খবর পেলেই ওকে জানাতে।

কাকতালীয়ভাবে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আর. পি. সিং দেও চঞ্চলকে টেলিগ্রাম করলেন, কাম শার্প কর রোগ্ এ্যালিফেন্ট হান্টিং।

ঘটনাটা কামাখ্যানগরের। রাজা কামাখ্যানারায়ণ সিং দেওর নামেই এই স্থানের নামকরণ।

ডিসেম্বর মাস, জাঁকিয়ে শীত পড়েছে কলকাতায়। এবার স্বয়ং রাজা কে. পি. সিং দেও-র কাছ থেকে টেলিগ্রাম এল—তুমি যত তাড়াতাড়ি পারো চলে এসো। সরকার থেকে হাতিটাকে পাগলা ঘোষণা করা হয়েছে এবং মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তুমি এলে তোমায় নিয়ে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যাব। ওনার থেকে পারমিট নিয়ে তারপর তুমি হাতি মারতে যেও। চঞ্চল একাই রওনা দিল ঢেঙ্কানলের উদ্দেশে।

পরদিন কটক শহরে পৌঁছে চঞ্চল একটা ভাড়াগাড়ি নিয়ে সোজা পৌঁছাল রাজার বাড়ি। সকালবেলার প্রাতঃরাশ সেরে দুজনে গেল ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডেলা-র কাছে। ডেলা সাহেব নাগাল্যান্ডের অধিবাসী। সাহেব চঞ্চলকে দেখে অবাক হয়ে বললেন, আরে ইয়ং ম্যান! হাতি মারার কোনও অভিজ্ঞতা আছে তোমার?

চঞ্চল বলল, না স্যার, হাতি মারার কোনও অভিজ্ঞতা আমার নেই। তবে বাঘ ও লেপার্ড মারার অভিজ্ঞতা আমার আছে।

মিঃ ডেলা বললেন, কিন্তু তার সঙ্গে তো হাতির কোনও তুলনা চলে না!

চঞ্চল উত্তর দিল, হ্যাঁ স্যার, চলে না। কিন্তু শিকারের লক্ষ্যভেদে আমি পারদর্শী। অনুগ্রহ করে আমাকে পারমিট দিয়েই দেখুন, আমি কিছু করতে পারি কিনা।

ডেলা সাহেব উত্তর দিলেন, শোনো, তোমাকে আমি পারমিট দিতাম না, কিন্তু কুমার সাহেব যখন তোমার সঙ্গে এসেছেন তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি পারমিট দিচ্ছি। উইশ ইউ এ ভেরি গুড লাক্।

২

লক্ষ্মীর ছেলেটার সবে পাঁচ মাস বয়স। ওর মরদ গেছে শহরে মাটি কোপাতে, সেই সকাল বেলায়। আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে। বৃষ্টি আসছে দেখে ছেলেটাকে খাটিয়ায় শুইয়ে দৌড়ে বাইরে যায়। শুকনো কাঁথাগুলো ভিজে গেলে মুশকিল হবে। খেয়ালই করেনি যে দাঁতালটা বাইরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। হাতিটার শুঁড়ের ঝাপটায় দূরে ছিটকে পড়ে লক্ষ্মী। তারপর তার ডান পা-টা নেমে আসে লক্ষ্মীর মাথা লক্ষ্য করে। দাঁতালটার সেই প্রথম মানুষ মারা।

লক্ষ্মীর মৃতদেহ নিয়ে গ্রামের লোকেরা জড়ো হয় রেঞ্জারের বাংলোর সামনে। অনেক চিৎকার, চেঁচামেচির পর কোনওভাবে রেঞ্জার সাহেব তাদের শান্ত করে। এরপর থেকে গ্রামের লোকেরা পালা করে পাহারা দিতে লাগল। বেশ কয়েকদিন চুপচাপ ছিল দাঁতালটা। শুধু কারোর ধানের গোলা ভেঙে ধান খেয়ে যাচ্ছে তো কারোর চাষের জমি তছনছ করে দিচ্ছে।

সেদিন রাতে গিরিধারী আর শশধরের দায়িত্ব ছিল রাত জেগে পাহারা দেবার। হাতে জ্বলন্ত মশাল আর ক্যানাস্তারা। হাতি দেখলেই ক্যানেস্তারা বাজাতে হবে যাতে গ্রামের লোকেরা বোঝে হাতি এসেছে। শরৎকাল শেষ হয়ে আসছে। রাতের দিকে ঠান্ডা ঠান্ডা। মেঘহীন আকাশ। গিরিধারী কোমর থেকে বোতল বার করে। ভাগ করে দুজনে হাঁড়িয়া খায়। নেশাটা বেশ হয়েছে। এবার গ্রামের দিকে ঘুরতে বার হবে। গিরিধারীর হাতে জ্বলন্ত মশাল। শশধর তার পেছনে। দুজনে যাচ্ছে। হঠাৎ মশালের আলোয় গিরিধারী দেখে যে সামনে দাঁতালটা দাঁড়িয়ে। নেশার ঘোরে হাতের জ্বলন্ত মশালটা গিরিধারী ছুড়ে মারে দাঁতালের দিকে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে মশালটা হাতিটার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে মাটিতে পড়ে। হাতিটা সোজা এসে গিরিধারীকে পিষে দেয়। শশধর কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাকে শুঁড়ে জড়িয়ে সটান আছাড় মারে। দুজনকে একসঙ্গে মেরে হাতিটা ক্রমশ জেদেই চলে। কী উল্লাস তার।

গ্রামের সবাই এবার সোজা এসে দরবার করল কুমার সাহেবের কাছে। হয় তিনি কিছু করুন নয়তো তারা সবাই মিলে ধর্না দেবে। কুমার সাহেব তাদের বোঝানোর পর তারা শান্ত হয়ে গ্রামের ফিরে যায়। এরপরও হাতিটা তিনটে মানুষ মারে। শেষেরটা খুবই মর্মান্তিক।

গ্রামের গাঁওবুড়োর বাবা মারা গেছে। তাকে দাহ করতে নিয়ে যাচ্ছে সবাই। সেইখানে সেই দাঁতাল ছুটে এসে আক্রমণ করে। গাঁওবুড়োর ভাইপোকে পিষে মারে। আর মৃতদেহটাকে শুঁড়ে পেঁচিয়ে দূরে ফেলে দেয়। এরপরই সরকার থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় হাতিটাকে মেরে ফেলবার।

৩

দ্বিতীয় রাউন্ডের চা খেয়ে রঞ্জিতদা আবার বলতে শুরু করে।

বুঝলি, এরপর চঞ্চল সোজা চলে যায় বেশ খানিকটা দূরে। কে. পি. সিং চঞ্চলের সঙ্গে দুজন গাইড দিয়েছিলেন। একজনের নাম মঙ্গু, অন্যজনের নাম চনিয়া। এর মধ্যে চনিয়া খুব তৎপর হলেও ব্যাটা আফিম খোর। যাই হোক, এদের দুজনকে নিয়ে চঞ্চল জঙ্গলের মধ্যে ঢুকল। সঙ্গে তার সেই প্রিয় ৪৫০/৪০০ ডবল ব্যারেল রাইফেল আর একটা তাপ্পি দেওয়া ক্যাম্বিসের ব্যাগ। চঞ্চলের একটা কুসংস্কার ছিল, ওই একই ব্যাগ আর একই জামা প্যান্ট পরে সে জঙ্গলে যেত। ওটা নাকি লাকি তার কাছে।

হাতির চলাচলের জন্য ট্র্যাকার দরকার। সেই কাজই মঙ্গু আর চনিয়া করবে। এই প্রথম হাতি শিকারে যাওয়া চঞ্চলের। হাতির চলন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ওর তখনো খুব বেশি হয়নি। যাই হোক, এক ফ্লাস্ক হরলিকস, কিছু বিস্কিট, রাইফেল আর মঙ্গু এবং চনিয়াকে নিয়ে চঞ্চল জঙ্গলে ঢুকল।

বেশ কিছুটা যাবার পর ওরা একটা গ্রামে এসে হাজির হয়। গ্রামবাসীরা

সত্যগোপাল দে

আবার যদি

আবার যদি আসত ফিরে
হারানো শৈশব,
জীবন জুড়ে থাকত মোদের—
কেবলই উৎসব।
কথায় কথায় ভাব আর আড়ি
আব্বুলিশ আর লুকোচুরি—
বুড়িছোয়া –চু কিত কিত—
আসত যদি ফিরে
বন্ধু, তোকে রাখতাম ধরে
দিতাম না তো ছেড়ে।
চল না ছুটে ছোট্টবেলায়
সব পিছুটান ভুলে,
চল না ছুটে আরো একবার
প্রথম দিনের স্কুলে।

শ্যামাচরণ কর্মকার

আলাপী

গোপেনবাবু মজার মানুষ ভীষণ সহজ সরল
চলায় বলায় খুব সাধারণ মনেতে নেই গরল।
লোক দেখলেই আলাপ করেন মিষ্টি করে হেসে
অচেনা লোক খুশি হয়ে তার সঙ্গেও মেশে।

গোপেনবাবু জানেন তবু আলাপে নেই ফাঁকি
আলাপ করার জন্য শুধুই করেন ডাকাডাকি।
সবার কি আর সময় থাকে আলগা আলাপ করার?
কেউ কেউ তাই সুযোগ খোঁজে দেখলে কেটে পড়ার।

কোথায় বাড়ি? চললে কোথায়? খবরটবর ভালো?
প্রায়ই দেখি এই পথে যাও, দেখেছিলাম কালও।
নামটা কী ভাই? কী করা হয়? শুনেই মাথা গরম
করল সেদিন একজন লোক, রাগ দেখাল চরম।

কোথায় থাকি যাচ্ছি কোথায়, কাজটা কী তা জেনে?
সেধে সেধে আলাপ করেন! ব্যামো আছে ব্রেনে?
কাজটাজ কি নেই আপনার? খান-দান আর ঘোরেন?
লোক দেখলেই পথ আটকে ফালতু আলাপ জোড়েন।

পাগলাটে সব কাজ-কারবার সামনে থেকে সরুন
আমার আছে কাজের তাড়া অন্য কাউকে ধরুন।
কথা শুনে গোপেনবাবুর লজ্জায় মুখ লাল
ভাবলেন, আর আলাপে নেই পালটে যাবেন কাল।

ওদের ঘিরে ধরে স্থানীয় ভাষায় যা বলতে লাগল চঞ্চল তার বিন্দুমাত্র বুঝতে পারল না। শেষে চনিয়া বলল যে, এদের মধ্যে একজন হচ্ছে গ্রামের মোড়ল। তার নাম সাধুয়া। সাধুয়া জানায় দুটো বাচ্চা হাতিকে এই গ্রামের লোকেরা মেরে ফেলেছিল। সেই আক্রোশেই নাকি একটা বিরাট দাঁতাল হাতি এসে গ্রামে ঘোরাঘুরি করছিল। হাতির দাঁতগুলো প্রায় আটফুট হবে।

চঞ্চল শুনে বলে, তুমি আর গালগল্প করার লোক পাওনি! হাতির দাঁত আট ফুট লম্বা হয় নাকি? তাহলে হাতিটা কতটা বড়! ওরা বলে, হাতিটা নাকি আকাশের মতো লম্বা। চঞ্চল মনে মনে একটা ছবি কল্পনা করে নিয়েছিল।

চঞ্চল আমাকে ফিরে এসে বলেছিল, সেদিন যে ও কতটা হেঁটেছিল তার কোনও ইয়ত্তা নেই। জঙ্গল পার হচ্ছে তো একটা গ্রাম। আবার সেই গ্রাম ছাড়িয়ে জঙ্গল। কিন্তু হাতিটার কোনও খোঁজ নেই। তবে প্রত্যেকটা গ্রামে এসে হাতিটা উপদ্রব করে গেছে। কোথাও বাড়ি ভেঙেছে, নয়তো কোথাও মানুষ মেরেছে।

একভাবে টানা সাত-সাতটা দিন হেঁটে যাওয়ায় শরীরে তখন ক্লান্তি নেমে আসছে। কিন্তু জীবনে প্রথম হাতি মারার যে উত্তেজনা সেটাও কাজ করছিল। যেখানেই যায়, শোনে এখানে হাতিটা গতকাল এসেছিল। চঞ্চল গিয়ে দেখে গ্রামবাসীরা সারারাত আগুন জ্বালিয়ে ক্যানেস্তারা পিটিয়ে জেগে বসে আছে হাতির ভয়ে।

এইভাবেই হাঁটতে হাঁটতে আটদিনের মাথায় চঞ্চল একটা জঙ্গলে পাকুড় গাছের নীচে দেখল একটা হাতি দাঁড়িয়ে আছে।

এই প্রথম চঞ্চলের জংলি পাগলা হাতি দেখা। হাতিটাকে দেখেই মঙ্গু পালিয়ে গেল। কিন্তু চনিয়ার আফিমের নেশাটা ভালো ধরেছিল বলে সে রয়ে গেল। সে চঞ্চলকে বলল, হাতিরো কানো ধরি কিরি মারিব। চঞ্চল ইশারায় তাকে চুপ করতে বলে নিঃশব্দে এগিয়ে যায়। হাতিটা তখন পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে।

এটাই মুশকিল বুঝলি, হাতি মারার সবচেয়ে ভালো জায়গা হচ্ছে সোজা মাথায় গুলি অথবা চোখ ও কানের মাঝখানে। নয়তো সব শেষে হলে হার্ট শট। কিন্তু হাতিটা তো পিছনে ফিরে দাঁড়িয়ে। কী করা যায়?

চঞ্চল স্থানুর মতো প্রায় মিনিট পনেরো দাঁড়িয়ে রইল। শেষে মুখ দিয়ে একটা আওয়াজ করতেই হাতিটা ঘুরে গিয়ে সোজা সামনের দিকে ফিরে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল ব্রেনে শুট করে। গুলি খেয়ে হাতিটা ধপ করে পড়ে গেল। কিন্তু আবার উঠে দাঁড়াল।

সে কি গো রঞ্জিতদা, হাতিটার ব্রেনে গুলি লেগে পড়ে যাবার পরও সে উঠে দাঁড়াল! আমি জিগ্যেস করি।

হ্যাঁ, এটাকে বলে কনকাশন্ অফ ব্রেন। যেই উঠে দাঁড়িয়েছে আবার গুলি করেছে চঞ্চল। এভাবে হাতিটা বারবার পড়ে গিয়ে উঠে দাঁড়ায়। একটা সময় সে মারা যায়। প্রায় ছয়-সাত ঘণ্টা বাদে কে. পি. সিং খবর পেয়ে আসে।

ফেরার আগে চঞ্চল গেল সেই ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ডেলার কাছে। ডেলা চঞ্চলকে দেখেই বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, তোমার সাহস দেখে আমি অভিভূত। এবার সরকারি নিয়ম অনুযায়ী তুমি এই হাতিটার একটা দাঁত পাবে উপহারস্বরূপ। তখন চঞ্চল বলে, স্যার, আমার একটা নিবেদন আছে। এটা আমার প্রথম হাতি শিকার। যদি অনুগ্রহ করে অন্য দাঁতটাও আমাকে দেন বাধিত হব। তখন মিঃ ডেলা বললেন, ঠিক আছে, তোমার আত্মবিশ্বাস দেখে আমি মুগ্ধ। দেখি, সেটা কনসিডার করা যায় কিনা। তুমি আমাকে একটা দরখাস্ত দাও।

শেষে একটা টোকেন রয়্যালটি দিয়ে চঞ্চল দুটো দাঁতই পায়। সেই বিরাট দাঁতদুটো নিয়ে চঞ্চল কলকাতায় এসে ওঠে। হাওড়ায় তখন ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকত। সেই ঘোড়ার গাড়ির মাথায় দাঁত দুটো বেঁধে নিয়ে চঞ্চল বাড়ি ফেরে। যা আজও ওর বাড়িতে রাখা আছে।

সত্য ঘটনা অবলম্বনে।

চিকু আর মুনু

মইসাসুর

ওঙ্কারনাথ

বাবা, পুজোয় ঠাকুর দেখাতে নিয়ে যাবে তো?

হুম্মম্মম! ভেবে দেখছি।

ভাবলে হবে না। যেতে হবে।

আগের পুজোয় বললে কোরোনা এসেছে। যাওয়া যাবে না।

সত্যিই তো এসেছিল। ভিড়ের মধ্যে গেলেই ওসব হয়।

এটা গদ্দারি হচ্ছে কিন্তু বাবা।
অ্যাই, এসব কী ভাষা? বাবার সঙ্গে কেউ এভাবে কথা বলে? কোত্থেকে শিখিস এসব?
ইউটিউব সে বাওয়া। অগি দেখোগে, তুম ভি শিখ যায়োগে।

বাঙালির ছেলের মুখে হিন্দির খই ফুটছে! ইউটিউব লক করে দিলে বুঝবে মজা।

আর তুমি বাঙালির বাওয়া যে সারাদিন হিন্দি সিনেমা দেখো?
আ-আমি, বড়। বড়রা দেখলে দোষ নেই।

তুমি এখনো ছোট। মা বলেছে তোদের বাবার খালি ভুঁড়িটাই বড়।
আবার বাবাকে নিয়ে আজেবাজে কথা? তাহলে পুজোতে ঘরে বসেই ঠাকুর দেখিস।
ক্যা?

আরে, ঘরে বসে ক্যায়সে ঠাকুর দেখেগা বাওয়া? মা দুগগা কি আমাদের বাড়ি লুচি খেতে আসবে? বেকার বকোয়াস।
আসতে হবে কেন? মা দুগগা তো আমাদের ঘরেই আছে। সব ঘরেই থাকে রে পাগলা।

তোদের মায়ের কথা বলছি। দুগগা মা তিনিও মা, আর তোদের মা'ও মা। সব মায়েরাই মা দুগগা।
আঁই!
সমঝে এলো না বাওয়া। ঠিক সে সমঝাও।

পুজোর কদিন নিজের মা'কে ভালো করে দেখে নিস। তাহলেই ঠাকুর দেখা হয়ে যাবে।
!

পালা এখন। আমার গুচ্ছের কাজ আছে।
দেখলি?
দড়াম

মা আর দুগগা ঠাকুর এক হোল?
আরে,বাওয়া পুজোয় শুধু টিভি দেখবে আর বই পড়বে — তাই এসব বলছে। ইসকা বদলা লেনা হি পড়েগা।

আইডিয়া!
মা যদি দুগগা হয়, তাহলে বাওয়া-
কী?

ঘুঁ-র -র-র- ঘুঁ-উ!
ওই দেখ। গুচ্ছের কাজ আছে বলে ঘুমোচ্ছে বেকার বাওয়াটা।
আস্তে। জেগে গেলে হবে না।

কিছুক্ষণ পর
ও, তুমি শুয়েছ? তাই চিকু মুনু আমার কাছে গিয়ে জুটেছে। চা খাবে না?
অ্যাঁ? হ্যাঁ-হ্যাঁ। উঠছি।

একীইই! মুখের এ কী দশা!! কে করল?

ক্-কেন? কী হয়েছে আমার মুখে?
ইসসস! নিজেই আয়নায় দ্যাখো।

অ্যাঁকক্!

কী করে হল?!?
এ নিশ্চয়ই তোমার গুণধরদের কারুকার্য। পুরো ভূত বানিয়ে দিয়েছে।
ভূত নয় মা। ভূত নয়।

বাওয়া বলল,তুমিই মা দুগগা। পুজোয় প্যান্ডেলে না গিয়ে তোমাকেই দেখতে। তো মা দুগগার পাশে একঠো মইসাসুর মাংতা হ্যায় কি নেহি? ক্যায়সা লাগা বাওয়া?

হা-হা-হা-হা!

সমাপ্ত

ছবি: [illegible]

পুষ্পেন মণ্ডল

ডায়াকদের পুতুল

সমুদ্রের দিক থেকে কালো মেঘের দল কয়েক মিনিটের মধ্যে আকাশটাকে ঘিরে ফেলল সামিয়ানার মতো। সেইসঙ্গে শুরু হল শোঁ শোঁ হাওয়া আর বৃষ্টি। একটা বড় ছাতা নিয়ে রিমিতা দাঁড়িয়ে ছিল সমুদ্রের বাঁধের উপর। হাওয়ার তোড়ে ছাতা সোজা করে রাখতে পারছে না কিছুতেই। বাতাসে নোনা গন্ধ ভেসে আসছে।

কত বছর পরে এসে দাঁড়িয়েছে দীঘার পাড়ে। কুড়ি বছর আগের দীঘা আর এখনকার দীঘা এক নয়। অনেক কিছুই বদলেছে। কিন্তু 'সি হক' হোটেলটা, যেখানে সে উঠেছিল বাবা-মার সঙ্গে, এখনও সেরকমটাই আছে।

হোটেলটা ফেলে একটু এগোলেই ছিল ঝাউবন। হাঁটতে হাঁটতে ওদিকটায় গিয়ে অবাক হল রিমিতা। সেই বিশাল ঝাউবনটা যেন কেউ ইরেজার দিয়ে মুছে দিয়েছে। তার বদলে সেখানে এখন চওড়া সিমেন্টের বাঁধ।

তখন রিমিতা স্কুলে পড়ে। সেবার এখানে বেড়াতে আসার পর একটা দুর্ঘটনা হঠাৎ করে পালটে দিয়েছিল তার পৃথিবীটা। তারপর থেকে সে আর কোনওদিন দীঘাতে আসেনি। এত বছর পর ছেলের ক্যারাটে ক্যাম্পের জন্য এক রকম বাধ্য হয়েই আসতে হল এখানে। এবারে সি-হকের পাশে একটা লজে উঠেছে ওরা।

হঠাৎ বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা নেমে আসছে উপর থেকে। চোখের জল মিশে যাচ্ছিল বৃষ্টির জলে। ঝোড়ো হাওয়ায় বেসামাল অবস্থা। হোটেলের দিকে জোরে পা চালাল রিমিতা।

হোটেলে ঢুকতেই ফটিক বন্ধুদের ছেড়ে দৌড়ে এসে উৎসুক চোখে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় গিয়েছিলে মা?'

'হাঁটতে গিয়েছিলাম সমুদ্রের ধারে। দুম করে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। তাই চলে এলাম। তুই বন্ধুদের সঙ্গে খেল, আমি রুমে যাচ্ছি।'

শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করে রিমিতার মনে হল এই তো সেদিনের কথা...।

সন্ধ্যা হওয়ার আগেই ইলেকট্রিক চলে গেছে। এমারজেন্সি আর মোমবাতি জ্বলছে ঘরের ভিতরে। বাইরে ঝড় উঠেছে খুব জোর। হঠাৎ দরজায় ধাক্কা। রিমিতা হকচকিয়ে উঠল একটু। এরকম দুর্যোগের মধ্যে কে আসবে ওদের বাড়িতে? বাবাই গিয়ে দরজা খুলল।

'কে?'

একটা অচেনা গলার আওয়াজ এল বাইরে থেকে, 'রণজয় চিনতে পারছিস, আমি স্মরণজিৎ। তোর স্কুল ফ্রেন্ড।'

বাবাই বেশ অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'স্মরণজিৎ? এত দিন পর কোথা থেকে উদয় হলি?'

'বলছি। ভিতরে আসতে বলবি না?'

লোকটার বড় বড় চুল দাড়ি। রিমিতা পর্দার আড়াল থেকে কথাবার্তা শুনে যা বুঝল, স্মরণজিৎ আঙ্কেল বাবাইয়ের ছোটবেলার বন্ধু। থাকেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রত্যন্ত গ্রামে। প্রায় পঁচিশ বছর পর দেখা হয়েছে। বৈঠকখানায় বসে সেই যে ছোটবেলার গল্প জুড়ল দুজনে মিলে, শেষ আর হয় না। রিমিতাকে দেখে ডেকে বললেন, 'এদিকে এসো, তোমার নাম কী?' রিমিতা গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে এসে নিজের নাম বলল।

'তোমার জন্য একটা গিফট আছে আমার কাছে।' বলে স্মরণজিৎ আঙ্কেল ব্যাগ থেকে একটা প্যাকেট বের করে এগিয়ে দিলেন।

রিমিতা হাতে নিয়ে দেখল, জিনিটা বেশ ভারী। 'কী এটা?' জিগ্যেস করল সে।

'খুলে দেখো।'

কাগজের মোড়কটা খুলতে একটা পিতলের পুতুল বেরোল। ফ্রক আর মাথায় টুপি পরা একটা বাচ্চা মেয়ে। স্মরণজিৎ আঙ্কেল রিমিতাকে পাশে বসিয়ে বললেন, 'এটা বোর্নিও থেকে আনা। তোমার জন্য স্পেশাল গিফট। বোর্নিওর জঙ্গলের কথা শুনেছ তুমি?'

রিমিতা মাথা নাড়ল। ও তখন সবে ক্লাস ফোরে পড়ে।

স্মরণজিৎ আঙ্কেল বুঝিয়ে বললেন, 'বোর্নিওকে বলা হয় পৃথিবীর একটা ফুসফুস। আসলে, এটা খুব বড় একটা দ্বীপ। দক্ষিণ চিন সাগরের নীচের দিকে প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ স্কোয়ার কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ঘন রেন ফরেস্ট। জায়গাটা বিষুবরেখা মানে পৃথিবীর ঠিক মাঝামাঝি অংশে পড়ছে বলে এখানে সারা বছর বৃষ্টি লেগেই থাকে। বিচিত্র সব পোকামাকড়, জন্তু-জানোয়ার আর গাছ-পালায় ভর্তি। আমি আগে একটা ওষুধ কোম্পানিতে কাজ করতাম। সেটা ছিল ইন্দোনেশিয়ার পন্টিয়ানাকে। ওটা বেশ আধুনিক শহর। কিন্তু আমাকে মাঝে মাঝেই ভেষজ ওষুধ খুঁজতে কালিমান্থানের ঘন জঙ্গলে যেতে হতো। সেখানে অনেক বন্য আদিবাসী গোষ্ঠীও বাস করে। সেরকম এক ডায়াকদের আদিবাসী গ্রাম থেকে এই পুতুলটা পেয়েছিলাম।'

'ওরা এই পুতুলটা বানিয়েছে?' রিমিতা জানতে চাইল জিনিসটা হাতে নিয়ে।

'হ্যাঁ। পিতল গলিয়ে ছাঁচে ঢেলে এই রকম পুতুল বানায় আদিবাসীরা। বিভিন্ন জন্তু জানোয়ার, ডায়াকদের নিজেদের মূর্তি এই সব। সেগুলো বাজারে নিয়ে এসে বিক্রিও করে। আমি একবার বেশ কয়েক'দিন ছিলাম ওই গ্রামে। সর্দারের সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গেল। আমাকে এই পুতুলটি উপহার দিয়ে বললেন, এটা খুব স্পেশাল। এর মধ্যে নাকি একটা সুপার ন্যাচারাল পাওয়ার আছে। কথাটা আমি বিশ্বাস করিনি। পুতুলটা পড়েছিল আমার কাছে বহুদিন। কিছুই হয়নি। ভাবলাম তোমাদের জন্য নিয়ে আসি।'

রিমিতার বাবা পুতুলটা হাতে নিয়ে মন্তব্য করল, 'পুতুলটা কিন্তু খুব সুন্দর। খুব ডিটেলে তৈরি। দেখে তো ইউরোপিয়ান বাচ্চা বলে মনে হচ্ছে। আদিবাসী মেয়েদের পোশাক এরকম হবে না নিশ্চয়ই!'

'ঠিক কথা। ব্যাপারটা পরে আমার মাথায় এসেছে। কিন্তু এই ইউরোপিয়ান ধাঁচে গড়া পুতুলটা বোর্নিওর ঘন জঙ্গলের মধ্যে ডায়াকরা বানাল কী করে, জানি না।'

বোর্নিওর জঙ্গলের গল্প আরও অনেকক্ষণ চলল সেদিন। ঝড়-বৃষ্টি থেমে যেতে স্মরণজিৎ আঙ্কেল চলে গেলেন। রিমিতা পুতুলটা নিয়ে এসে ওর ঘরের বইয়ের আলমারির এক কোণে রেখে দিল।

এরপর এক রবিবার দুপুরে ঘরে একা ছিল রিমিতা। বাবা-মা গেছে তাদের এক বন্ধুর বাড়ি। কাজের মাসি টিভি দেখছে বারান্দায়। রিমিতার গানের দিদিমণি আসবে বিকালে। দুপুরের খাওয়া হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। হেলে যাওয়া রোদ জানালার ফাঁক দিয়ে এসে পড়েছে বইয়ের তাকে। অনেক দূর থেকে মাঝে মাঝে কোকিলের ডাক কানে আসছে।

একটা বই হাতে নিয়ে বিছানাতে শুয়ে ছিল রিমিতা। আচমকা রিমিতার মনে হল দরজার ওপারে কেউ দৌড়ে গেল। রানিমাসি কি? কিন্তু দৌড়াল কেন? একটু অবাক হল রিমিতা। মনে হল ফ্রক পরা ওর মতোই কোনও বাচ্চা মেয়ে। কিছুক্ষণ চেয়ে রইল দরজার দিকে। হয়তো মনের ভুল। আবার কমিক্সের পাতায় মনোযোগ দিল সে। রিমিতা উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল বিছানার উপর। মনে হল ঠিক তার পায়ের কাছে কেউ যেন দাঁড়িয়ে আছে। সিলিং ফ্যানের হাওয়ায় তার চুলগুলো উড়ছে। ধড়াস করে উঠল বুকটা। 'কে?' করে চেঁচিয়ে উঠল রিমিতা। কিন্তু কেউ নেই।

রানিমাসি বারান্দা থেকে দৌড়ে এল। 'কী হয়েছে রিমি?'

কী উত্তর দেবে ভেবে পেল না সে। এরকম অনুভূতি এর আগে তার কখনও হয়নি।

ক'দিনের মধ্যেই গরমের ছুটি পড়ল স্কুলে। এবারে বাবাইয়ের অফিসে এত কাজের চাপ যে পাহাড়ে ঘুরতে যাওয়া হয়নি। সেজন্য রিমিতার খুব মন খারাপ। অন্য বন্ধুরা প্রায় সবাই গেছে। কেউ সিমলা, কেউ কাশ্মীর, কেউ দার্জিলিং বা গ্যাংটক। ক'দিন দিদুনের বাড়ি ঘুরে এল রিমিতা। তা দুধের সাধ কি ঘোলে মেটে!

সেদিন দুপুরে খাওয়া সেরে বিছানায় শুয়ে যথারীতি কমিক্সের পাতায় চোখ বোলাচ্ছে। কখন যে ঘুম এসে গেছে নিজেও বুঝতে পারেনি রিমিতা। স্বপ্নের মধ্যে মনে হল, সে যেন পাহাড়ে ঘুরতে গেছে। জায়গাটা খুব সুন্দর। পাহাড়ের গায়ে একটা সুন্দর কটেজ। বাইরে বেরিয়ে রিমিতা দেখল চারিদিকে শুধু সাদা বরফ। পাইন আর দেবদারু গাছের বন, ঢেউ খেলানো ঘাসের জমি, ছোট ছোট পাহাড়ি ঘর সব সাদা বরফে ঢাকা পড়েছে। দারুণ আনন্দ হল দেখে। এক-পা এক-পা করে এগিয়ে বরফের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। তুলোর মতো নরম গুঁড়ো বরফ ঝরছে আকাশ থেকে। হঠাৎ রিমিতার খুব ঠান্ডা লাগতে শুরু করল। তারপর খেয়াল হল তার গায়ে কোনও গরমের পোশাক নেই। সে পিছন ফিরে কটেজটার দিকে দৌড়ে যেতে গেল। কিন্তু কটেজটাকেই আর দেখতে পেল না সে। প্রচণ্ড ভয়ে আর ঠান্ডায় জড়োসড়ো হয়ে বসে পড়ল। হঠাৎ মনে হল অনেক দূর থেকে মা ডাকছে। 'রিমি...রিমি...'

মা গায়ে ধাক্কা দিতে ভেঙে গেল ঘুমটা।

'কীরে এসি চালিয়ে ঘর এত ঠান্ডা করে রেখেছিস কেন? হাত-পা সব ঠান্ডা হয়ে গেছে তো?'

রিমিতা অবাক হয়ে জানাল, 'আমি তো এসি চালাইনি।'

'তুই চালাসনি তো কে চালাল? ভূতে?'

বিছানা থেকে নেমে বাথরুমে যেতে গিয়ে রিমিতার চোখ আটকে গেল সেই ছোট্ট পিতলের পুতুলটাতে। সেটার গায়ে সাদা সাদা গুঁড়ো

গুঁড়ো কী যেন লেগে আছে! পুতুলটার কাছে গিয়ে গুঁড়োগুলোতে আঙুল দিতেই গলে জল হয়ে গেল। বরফ! কিন্তু এটা কী করে সম্ভব?

গরমের ছুটিতে এবারে একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটল। যেটা অনেকের কাছে অ্যাক্সিডেন্ট মনে হলেও রিমিতার মনে হচ্ছে এর পিছনে অন্য কোনও কারণ আছে। বাবাই রিমিতাকে সাঁতার শেখানোর জন্য কাছেই একটা সুইমিং ক্লাবে ভর্তি করে দিয়েছে। সপ্তাহ খানেক হল সেখানে রানি মাসির সঙ্গে সাঁতার শিখতে যাচ্ছে রিমিতা। প্রায় জনা পনেরো বাচ্চা সাঁতার শেখে।

বাবলু নামে একটা ছেলেও সেখানে সাঁতার শিখতে আসে। সে রিমিতার থেকে বয়েসে বড় আর বেশ মোটাসোটা। সুইমিং কস্টিউম আর লাইফ জ্যাকেট পরে ওরা যখন স্যারের কাছে সাঁতার শিখছে, জলের মধ্যে রিমিতাকে চিমটি কাটল বাবলু। রিমিতা স্যারকে জানাল। স্যার বাবলুকে বেশ করে বকল। কিন্তু পরের দিন একই জিনিস আবার করল বাবলু। চিমটি কেটেই ডুব সাঁতার দিয়ে দূরে গিয়ে ওঠে। রিমিতা স্যারকে বলতে গেলে বাবলু জানায়, সে তো ওর কাছে ছিলই না।

রিমিতা কাঁদতে কাঁদতে উঠে এল জল থেকে। সাঁতার শিখতে ওর আর ভালো লাগছিল না। বাড়িতে এসে রিমিতা মাকে সব কিছু জানাল। মা বলল, 'চিন্তা করিস না, পরের দিন আমি যাব তোর সঙ্গে।' কিন্তু সেদিন বিকাল থেকেই রিমিতার ধুম জ্বর। প্রায় চার-পাঁচদিন আর বাড়ি থেকে বেরোতে পারল না সে। সারাদিন বিছানায় শুয়ে থাকা, বার বার ওষুধ খাওয়া আর কমিক্স বইয়ের পাতা ওলটানো। স্কুল বন্ধ, বাইরে বেরনো বন্ধ, খেলা বন্ধ। যেন সে খাঁচায় বন্দি পাখি।

সেদিন সকালে রানি মাসি হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকেই হাউমাউ করে উঠল।

মা জিগ্যেস করল, 'কী হয়েছে রানি? অত হাঁফাচ্ছ কেন?'

'ছেলেটা মরে গেছে দিদি!' কোনওরকমে ঢোক গিলে আষাঢ়ের মেঘের মতো মুখটা করে রানিমাসি বলল কথাটা।

'কোন ছেলেটা?'

'আরে, যে ছেলেটা সাঁতার শিখতে গিয়ে রিমিকে চিমটি কেটেছিল।'

'বলো কী! কী করে মারা গেল?'

'জলে ডুবে। পরের দিন সাঁতার শিখতে গিয়ে ওকে সবাই জলে নামতে দেখেছে। কিন্তু জল থেকে কেউ ওকে উঠতে দেখেনি। বিকালেও যখন বাড়ি ফিরল না ওর বাবা-মা প্রতিবেশীরা সুইমিং ক্লাবে এসে তন্ন তন্ন করে খুঁজল। কিন্তু কোথাও পায়নি। এমনকী জলের নীচেও খুঁজেছে। কিন্তু আজকে সকালে ছেলেটার লাশ ভেসে উঠল ওই সুইমিংপুলেই। পুরো ফুলে ঢোল।'

রিমিতা আড়াল থেকে শুনল রানিমাসির কথাগুলো। তারপর গুটিগুটি পায়ে ঢুকে গেল নিজের ঘরে। বিছানায় বসে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল সেই পুতুলটার দিকে। সেটার গায়ে এখনও জল লেগে রয়েছে। বুক সেলফের উপরেও ছোপ ছোপ জল।

এরপর থেকে রিমিতার শুধু মনে হতে লাগল, তার আশেপাশে কেউ আছে। কেউ যেন সব সময়ে তাকে লক্ষ করছে। কিন্তু কথাটা ও কাউকে বলতে পারল না। বললেও কেউ ওর কথা হয়তো বিশ্বাস করবে না।

এর পরের ঘটনাটা ঘটল স্কুল খোলার দিন। অভিনন্দন স্যার খুব রাগী। ছুটিতে অঙ্কের হোমওয়ার্ক দিয়েছিলেন। রিমিতা স্কুল ব্যাগে খাতা ঢুকিয়ে নিয়েছিল আগের দিন রাতেই। কিন্তু পরের দিন স্যার যখন সবার খাতা দেখতে চাইলেন তখন রিমিতা ব্যাগের মধ্যে অঙ্কের খাতাটা খুঁজে পেল না। আঁতিপাঁতি করে খুঁজল অনেকক্ষণ ধরে কিন্তু কিছুতেই
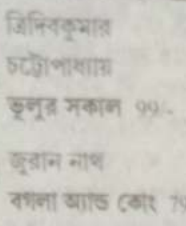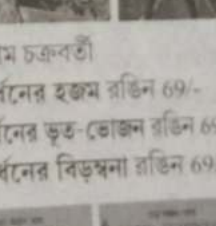
পেল না। স্যার রেগে গিয়ে বললেন, 'ছিঃ রিমিতা, মিথ্যা কথা বলছ কেন? তুমি নিশ্চয়ই ছুটিতে হোমওয়ার্ক করোনি।'

রিমিতা অনেক করে বোঝানোর চেষ্টা করল, যে সে হোমওয়ার্ক করে খাতাটা ব্যাগেই রেখেছিল। কিন্তু স্যার রেগে গিয়ে তাকে হাত পাততে বললেন। স্কেল দিয়ে ফটাস করে মারলেন হাতের পাতায়। খুব লাগল রিমিতার। কান্না পেয়ে গেল। সে তো কোনও দোষ করেনি। তাও শাস্তি পেতে হল। সারাটা দিন মাথা নীচু করে বসে রইল ক্লাসে। চোখ দিয়ে জল পড়ল টপ টপ করে।

বাড়ি ফিরে মাকে সব জানাল। মা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'এরকম হতেই পারে। ও নিয়ে বেশি ভাবিস না। খাতা পরে ঠিক পেয়ে যাবি।'

পরেরদিন অঙ্কের হোমওয়ার্কগুলো আবার একটা নতুন খাতায় করে নিয়ে গেল রিমিতা। গিয়ে দেখে অভিরূপের মা সকালেই স্কুলে এসে হাজির। অভিরূপ সারারাত নাকি ঘুমাতে পারেনি। ভয়ংকর সব স্বপ্ন দেখে চিৎকার করে কান্নাকাটি করেছে। রিমিতার অঙ্কের খাতাটা নাকি ভুল করে ওর ব্যাগে চলে গিয়েছিল। সেটা ফেরত দিতেই তিনি এসেছেন। তাঁর মুখ দেখে মনে হল তিনি খুব ভয় পেয়েছেন কোনও কারণে। কিন্তু রিমিতা আরও অবাক হল, যখন শুনল অভিনন্দন স্যারের নাকি অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। গতকাল স্কুল থেকে বাইক নিয়ে ফিরছিলেন প্রতিদিনের মতো। রাস্তায় একটা ট্রাকের সঙ্গে অ্যাকসিডেন্ট হয়। ট্রাকের চাকা তাঁর ডান হাতের উপর দিয়ে চলে গেছে। তিনি এখন হসপিটালে ভর্তি।

খবরগুলো শুনে বেশ শ্লাঘা অনুভব করল রিমিতা। তার মনে হল, সে যা ভাবছে, সেটাই সত্যি হচ্ছে। ভারি আশ্চর্যের ব্যাপার তো! মনে হচ্ছে সে এখন আর একা নয়। তার নতুন বন্ধুর জন্য মনটা ছটপট করছে খুব। স্কুল থেকে ফিরেই পিঠের ব্যাগটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে দৌড়ে গেল নিজের ঘরে। আজকে পিতলের পুতুলটির গায়ে লালচে রঙের তরল কিছুটা লেগে আছে। এটা কী রক্ত?

পুতুলটাকে নিয়ে বাথরুমে গেল রিমিতা। ভালো করে জল দিয়ে পরিষ্কার করল। তাকে নিয়েই খেতে বসল। তারপর বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল পাশে। পুতুলটার একটা নাম দিতে হবে। নিজের নামের সঙ্গে মিল রেখে নাম দিল ববিতা। এর মধ্যে যে একটা প্রাণ আছে বেশ বুঝতে পারছে রিমিতা। ব্যাপারটা আরও কয়েকটা ঘটনার মধ্যে দিয়ে প্রমাণ হয়ে গেল। কোনওদিন যদি কোনও বিষয়ের হোমওয়ার্ক সে না করে যায়, আর মনে মনে ভাবে ওই ক্লাসের টিচার যেন না আসে, তাহলে সত্যি সত্যি সেটাই হয়।

একদিন হল কি, পাড়ার ক্লাবের ড্রয়িং কম্পিটিশনে আঁকতে গিয়েছিল রিমিতা। এমনিতে ও ভালোই আঁকে। কিন্তু ওর থেকেও ভালো আঁকে শুভাঞ্জন। তাই শুভাঞ্জন বরাবর প্রথম হয়। সেই নিয়ে মনের মধ্যে একটা চাপা কষ্ট ছিল রিমিতার। এবারেও শুভাঞ্জন জলরঙে দারুণ একটা ছবি এঁকেছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে হঠাৎ তার জলের বাটি কী করে যে কাগজের উপর উলটে গেল কে জানে! ফলে তার পুরো ছবিটাই একদম নষ্ট হয়ে গেল। আর রিমিতার ছবিটা পেল প্রথম পুরস্কার। ব্যাপারগুলো কি শুধুই কাকতালীয়? মনে তো হয় না।

রিমিতার মা কিন্তু লক্ষ করেছে ব্যাপারটা। মেয়ের মধ্যে কিছু যে একটা পরিবর্তন এসেছে, সেটা বেশ বুঝতে পারছেন তিনি। যে মেয়ে ঘরে থাকলে সারাক্ষণ বকবক করে, সে হঠাৎ কেন এরকম চুপচাপ হয়ে গেল? শুধু ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে পুতুলের সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলে। পড়াশোনাতেও মন নেই।

একদিন বাবা এসে বললেন, 'আমরা সবাই তিন দিনের জন্য দীঘা যাচ্ছি বেড়াতে। অফিসের কনফারেন্স আছে। সঙ্গে ঘোরাও হয়ে যাবে।'

কথাটা শুনে রিমিতার খুব আনন্দ হল। কতদিন বাইরে কোথাও ঘুরতে যাওয়া হয়নি। বেশ মজা হবে। সেই প্রথমবার দীঘা দেখা রিমিতার। নিজের হ্যান্ড ব্যাগের মধ্যে করে সে লুকিয়ে নিয়ে এসেছে ববিতাকে। একদিন দুপুরে হোটেল সি-হকের পিছনের ঝাউবনে একা একা নিজের মনে খেলছিল ববিতাকে নিয়ে। হঠাৎ মা রিমিতাকে খুঁজতে খুঁজতে পৌঁছাল ঝাউবনে। ওকে খুব বকল। ববিতাকে নিয়ে জোর করে ছুড়ে ফেল দিল দূরে। তারপর টানতে টানতে নিয়ে এল রিমিতাকে। সে কত করে বোঝানোর চেষ্টা করল মাকে, যে ওর মধ্যে প্রাণ আছে মা, ওকে তুমি ফেলে দিও না। কিন্তু মা কিছুতেই শুনল না। রিমিতাকে নিয়ে গিয়ে আটকে দিল ঘরে। সারাদিন রিমিতা শুয়ে শুয়ে কাঁদল বিছানাতে। কিছু খেল না।

পরের দিন ভোরবেলা বাবা-মা ঘুম থেকে ওঠার আগেই দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে গেল ঝাউবনে। অনেক খুঁজে শেষ পর্যন্ত পেয়েও গেল ববিতাকে। ভীষণ আনন্দ হল তার। সঙ্গে প্রচণ্ড রাগ হল মায়ের উপর।

সেদিন দীঘা ছেড়ে ফেরার কথা ছিল ওদের। সকালে মাকে নিয়ে বাবা সমুদ্রে চান করতে নেমেছে। রিমিতা বসে ছিল পাড়ে। একটার পর একটা বড় বড় ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে। সমুদ্র যেন রাগে ফুঁসছে। পূর্ণিমা ছিল সেদিন। তাই সমুদ্রের অত বিক্রম। আচমকা একটা বিশাল বড় ঢেউ দেখা গেল দূর থেকে। হইহই আওয়াজ কানে এল রিমিতার। কিছুক্ষণ পর বাবা কাঁদতে কাঁদতে উঠে এসে বলল, 'মাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

কথাটা রিমিতার বিশ্বাস হচ্ছিল না কিছুতেই। মাকে কেন খুঁজে পাওয়া যাবে না? এই তো স্নান করছিল ওখানে! তবে কী...সমুদ্রের পাড় থেকে ছুট দিল রিমিতা। দৌড়ে রুমে এসে খাটের নীচ থেকে সে রুমালে মোড়া ববিতাকে টেনে বার করল। সেটার ঠোঁটে তখন এক হিংস্র হাসি। রিমিতার কিন্তু তখন কান্না পাচ্ছিল খুব। রিমিতা জানে এই ঘটনার জন্য কে দায়ী।

পুতুলটাকে হাতে নিয়ে সে আবার দৌড় দিল সমুদ্রের পাড়ে। জল আরও বেড়েছে ততক্ষণে। প্রচণ্ড আক্রোশে আছড়ে পড়ছে পাড়ে ছড়ানো কালো পাথরগুলোর উপর। নোনা জল ছিটকে গিয়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে সবাইকে। বাবা পাড়ে বসে কান্নায় ভেঙে পড়েছে একেবারে। রেসকিউয়ের লোকেরাও মাথা নাড়ছে বারবার। বাবাকে জড়িয়ে ধরার আগে রিমিতা শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে পুতুলটা ছুড়ে দিল উত্তাল ঘোলাটে সমুদ্রের দিকে।

এত বছর পর দীঘায় এসে পুরোনো স্মৃতিগুলো ঢেউয়ের সঙ্গে আবার ফিরে আসছে নতুন করে। সমুদ্র নাকি কোনও কিছুই একেবারে নেয় না। ফিরিয়ে দেয়। নিথর মায়ের শরীরটাও নাকি ছ'ঘণ্টা পরে ফিরিয়ে দিয়েছিল। যদিও সে দৃশ্য রিমিতা নিজে আর দেখেনি।

কিছুদিন পরে বাবার মুখ থেকে শুনেছিল স্মরণজিৎ আঙ্কেল নাকি থাকতেন বারুইপুরের বাড়িতে, পৈত্রিক চাষবাস আর ফার্ম হাউস দেখাশোনা করতেন, ভারতের বাইরে কোনওদিন পা রাখেননি। তবে দেশ-বিদেশের বই পড়তেন প্রচুর। তাই বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলতে ভালোবাসতেন। তাহলে কি পুরোটাই মনের ভ্রম ছিল রিমিতার? ঘটনাগুলো সব কাকতালীয়? হতেও পারে!

শেষ দিন ক্যারাটে ক্যাম্পের সমাপ্তি ঘোষণার পর সবাই একে একে বাসে উঠছে। ফটিকের চোখে-মুখে অদ্ভুত এক হাসি। আজকে সকালে বালির তটে হাঁটতে হাঁটতে সে একটা পিতলের ছোট্ট পুতুল কুড়িয়ে পেয়েছে। একটা ফ্রক পরা মেয়ে। ভারি সুন্দর দেখতে! তাড়াতাড়ি রুমালে মুড়ে ব্যাগে পুরে নিয়েছে সে।

ছবি: নচিকেতা মাহাত
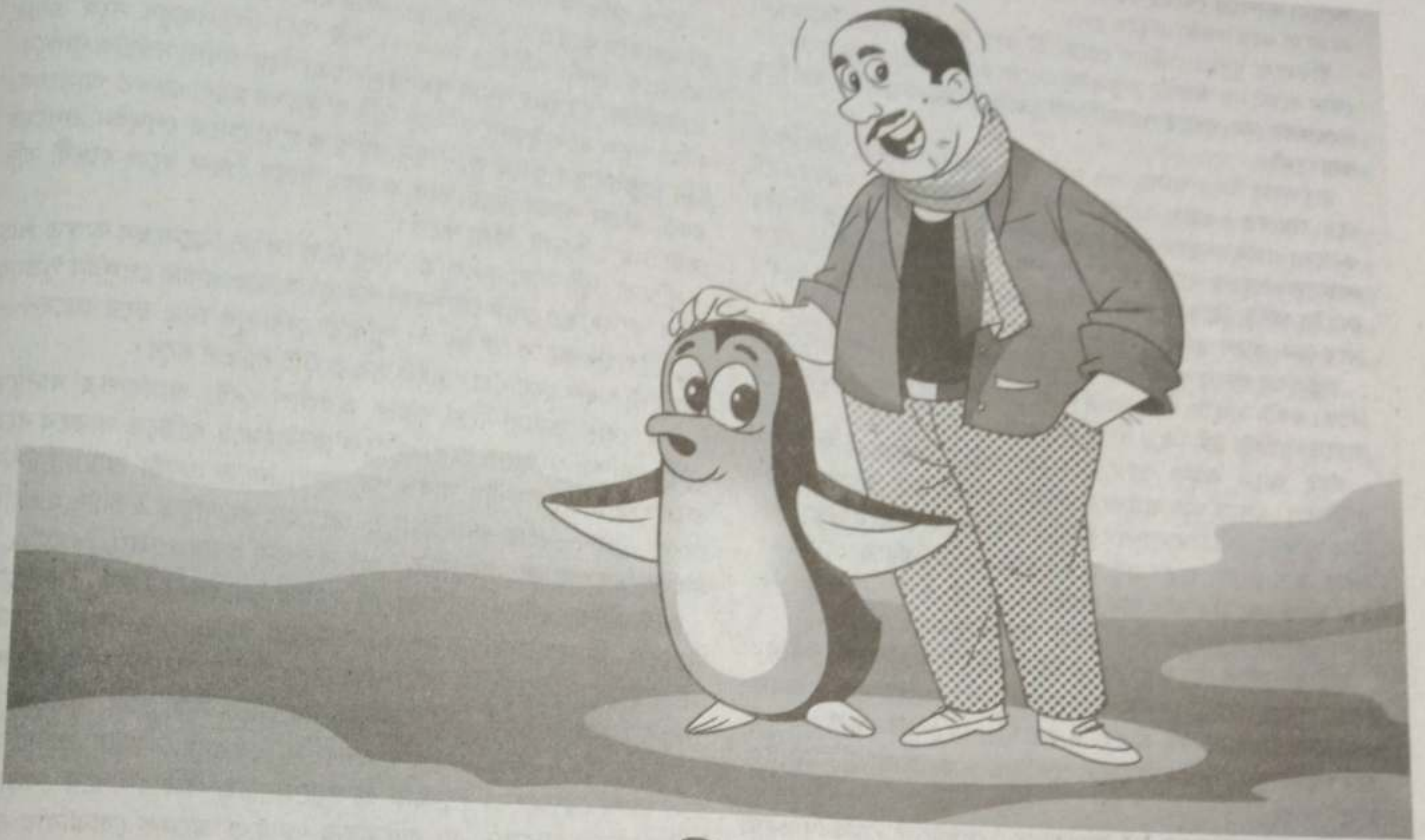
দেবযানী বসু কুমার

পেঙ্গুইন পুত্রবধূর খোঁজে

রাতুল মুখার্জি একজন নামকরা সরকারি ডাক্তার। হরেকরকম অভিজ্ঞতা। গতানুগতিক সরকারি হাসপাতালে রুগি দেখা ওনার না-পসন্দ। অল্প বয়সে অনেক করেছেন। এখন আর ওসব ভালো লাগে না। ডাক্তারিও হবে আবার জীবন সফরে দুঃসাহসিক অভিযান থাকবে—এমন দিনযাপন ওনার বরাবর পছন্দ। উনি কথায় কথায় ছেলে-মেয়েকে বলেন, বুঝলি, ন্যাতানো মুড়ির মতন জীবন আমার অসহ্য। জীবনের প্রতিটি কোনায় থাকবে রোমাঞ্চ, তবেই তো বাঁচার আনন্দ!

ছেলেমেয়েদের সব পড়াশোনা আছে। তাই তাদের দেখভালের জন্য স্ত্রী সুস্মিতা কোনোবার রাতুলবাবুর সঙ্গে যেতে পারেন না। যত ঝক্কি ওনাকেই পোহাতে হয়। রাতুলবাবু যখন বাড়ি ফিরে বেড়ানোর গল্পগুলো বলেন, রাগে মাথাটা রি রি করে ওঠে সুস্মিতা দেবীর।

এবারের গন্তব্য আন্টার্কটিকা। সরকার থেকেই ওনার নাম এসেছে। এবার দেশের সরকার নয়, একরকম বিদেশ সরকার থেকেই ওনার নাম বিবেচিত হয়েছে। ডাকাবুকো বলে প্রচুর সুনাম আছে ডাক্তারবাবুর। এসব জায়গায় ছাপোষা ডাক্তাররা যেতেই চান না। ওনারা জানেন থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়!

গ্লেসিয়ার গলে যাওয়া, আবহাওয়া, ওখানকার উদ্ভিদ, পশুপাখি, আরো নানান কিছু নিয়ে আন্টার্কটিকাতে কাজ হচ্ছে। অনেক বৈজ্ঞানিককে ওখানে থাকতে হয় বছরের পর বছর গবেষণা স্টেশনগুলোতে। একদল ফিরে আসে তো আর এক দল যায়। কারণ বিজ্ঞানের তো শেষ বলে কিছু হয় না। তাই কাজও শেষ হয় না। ওখানে কর্মরত বৈজ্ঞানিকদের সুস্থতা বজায় রাখতে অর্থাৎ চিকিৎসার প্রয়োজনে রাতুলবাবু আন্টার্কটিকাতে পাড়ি দিতে চলেছেন।

যাবার আগে স্ত্রীকে নানাভাবে খুশি করেছেন রাতুলবাবু। স্ত্রী কোনো কারণে রুষ্ট হলেও উনি মিষ্টি মিষ্টি কথায় উত্তর দিয়েছেন। না চাইতেই প্রচুর উপহার কিনেছেন। দুটো ছোট ট্রিপ করেছেন দেশের মধ্যে। রাতুলবাবু শুধু একটা ছলনার আশ্রয় নিয়েছেন। বৃহত্তর স্বার্থে একে ঠিক মিথ্যে কথা বলা যায় না। যাওয়ার আগে বলেছেন একবছরের জন্য যাচ্ছেন কিন্তু আসলে ওটা তিন বছর প্রথম খেপে।

তারপর এক শুভদিনে শুভক্ষণে রাতুলবাবু পৌঁছে গেলেন দক্ষিণ মেরু। পুরো দেশটাই বরফের কম্বলে মোড়া। আর তাপমাত্রা না লেখাই ভালো।

রাতুলবাবু স্টেশনে থাকেন আর ঘুরে ঘুরে বেড়ান। থাকার ব্যবস্থা রাজকীয়। নৈসর্গিক ছবি তোলেন, কবিতা লেখেন আর পাঠিয়ে দেন কলকাতায়। ছেলেমেয়েরা খুশি হয় আর স্ত্রী সুস্মিতা রাগে দাঁত কিড়মিড়

করেন। একবছর পেরোতেই স্ত্রী তাড়া দিতে থাকেন আর রাতুলবাবু তা না না না করে কথাটা এড়িয়ে যান।

ইতিমধ্যে দুবছর পেরিয়ে গেছে। স্ত্রী কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছেন। ফোন ধরেন না। অগত্যা রাতুলবাবু ছেলেমেয়ের কাছ থেকে সংসারের খবরাখবর নেন। বুঝতে পারেন বিরাট ভুল করেছেন কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই।

রাতুলবাবু ফিরে আসার পর পরই স্ত্রীর জন্মদিন। একটা চমক দিতে হবে। সময়ের একমাস আগেই ফেরার পরিকল্পনা করেন। গাড়িয়াহাটে ওনাদের একটা বহুতলে ফ্ল্যাট আছে। এক ঘনিষ্ট পারিবারিক বন্ধু ডাক্তার কাজলকৃষ্ণবাবুকে বলেন সারানোর নাম করে সুস্মিতার কাছ থেকে ফ্ল্যাটের চাবিটা নিতে। সুস্মিতা দেবীও কোনো বাক্যব্যয় না করে চাবিটা দিয়ে দেন। কারণ তখন তো মাথায় আগুন জ্বলছে!

রাতুলবাবু বন্ধুকে বলেন তিনটে ঘরেই এয়ার কন্ডিশন মেশিন লাগিয়ে দিতে। একটা বাথ টব আর একটা বরফ তৈরির মেশিনেরও ব্যবস্থা করে রাখতে। বাকিটা উনি নিজে গিয়ে করবেন।

খবর আসে অমুক তারিখে অমুক ফ্লাইটে কলকাতা আসছেন রাতুলবাবু। এসময় আর রাগ করে থাকলে চলে না। তাই ছেলেমেয়েদের নিয়ে সুস্মিতা দেবী বিমানবন্দরে হাজির। চোখে মুখে থমথমে ভাব। হঠাৎ সবার চোখ গোল! রাতুলবাবু কাচের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছেন... ডান হাতে ধরা ট্রলি আর বাম হাতে ধরা একটা পেঙ্গুইনের হাত থুড়ি, ডানা। পেঙ্গুইনটা টুক টুক করে এগিয়ে আসছে দু-পায়ে হেঁটে।

সুস্মিতা দেবীর তো রাগ একদম গলে জল। উত্তেজনায় কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। রাতুলবাবু কোনোরকমে বলেন, এই নাও, তোমার জন্মদিনের উপহার। কিন্তু আর দেরি করা যাবে না পেঙ্গুইন গরমে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। এখন শীতকাল বলে তাও রক্ষে। সোজা গড়িয়াহাটের ফ্ল্যাটে চলো।

গাড়িতে আসতে আসতেই সুস্মিতা দেবী পেঙ্গুইনের নামকরণ করে ফেলেছেন— সম্রাট। এ নাকি ওনার তৃতীয় ছেলে।

এরপর সম্রাটকে নিয়ে সুস্মিতা দেবী নাওয়াখাওয়া ভুলেছেন। এতদিন পরে ফিরলেন কিন্তু বিন্দুমাত্র নজর নেই, আদর যত্ন নেই রাতুলবাবুর প্রতি! একডালিয়ায় নিজেদের বসত বাড়িতে নিয়ে আসা ইস্তক নানারকম কাণ্ডকারখানা চলছে সম্রাটকে নিয়ে। বাড়ির এ-দেওয়াল ও-দেওয়াল ভাঙাভাঙির পর্ব থামছেই না। বাগানে একটা কাচের ঘেরাটোপের মধ্যে ছোটখাটো পুকুরও করেছেন। তাতে চাঙড় চাঙড় বরফ ঢালা হবে হরদম সম্রাটকে আরামে রাখার জন্য। সম্রাটের ঘরে চারটে এ সি লাগানো হয়েছে। দুটো ফ্রিজ বসানো হয়েছে সম্রাটের মাছ থাকবে বলে। সম্রাট মাছ খেতে খুব ভালোবাসে কিনা।

টাকাপয়সা নিয়ে বিশেষ চিন্তা নেই। রাতুলবাবু ও সুস্মিতা দেবী দুজনেরই পরিবার খুব উচ্চবিত্ত।

সম্রাট আর বিশেষ গরমকে পাত্তা দিচ্ছে না। অনেকটা সয়ে গেছে। সুস্মিতা দেবীর হাত ধরে মাঝে মাঝেই তার বান্ধবীদের পার্টিতে যায়, আত্মীয়দের বাড়ি ঘুরতে যায়, পাড়া প্রতিবেশীদের বাড়ি যায় নানান অনুষ্ঠানে। এসব এখন খুব পছন্দ করে। রাতুলবাবুর সঙ্গে সকালে গড়িয়াহাট বাজারে যায়। ইচ্ছেমতন মাছের দোকান থেকে মাছ তুলে খায়। কেউ কিছু বলে না। সবাই মজা পায়। সম্রাট যেদিন যায় ওকে দেখলেই মাছের বাজার সরগরম হয়ে ওঠে।

দেখতে দেখতে এক বছর কেটে গেছে। খুব বড় করে সম্রাটের জন্মদিন পালন হয়েছে। এক দুদিন এদিক-ওদিক হতে পারে কিন্তু মোটামুটি জন্মদিনটা রাতুলবাবু আন্দাজ করতে পারেন। কারণ সম্রাট জন্মানোর পরে পরেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। যদিও উনি পশুর ডাক্তার নন তাও ওষুধ দিয়েছিলেন, চিকিৎসা করেছিলেন। সে যাত্রায় বেঁচে গিয়েছিল শিশু পেঙ্গুইন। তারপর থেকে ওনার কাছে রয়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে ওকে ছেড়ে ওর বাবা-মা কোথায় যেন চলে গিয়েছিল। স্ত্রী সুস্মিতার পেঙ্গুইনের প্রতি অদ্ভুত রকমের দুর্বলতা আছে। তাই স্ত্রীকে খুশি করতে সম্রাটকে নিয়ে আসবার মতলব করেছিলেন রাতুলবাবু।

আবার রাতুলবাবুর যাবার ডাক এসেছে। কিন্তু এবার আর সুস্মিতা দেবীকে ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। সম্রাট নাকি মাঝে মাঝেই একা একা মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়ায়। সুস্মিতা দেবীর মন খারাপ লাগে। সম্রাটের নাকি অবিলম্বে একটা সঙ্গিনীর দরকার। তাই উনি রাতুলবাবুর সঙ্গে এবার আন্টার্কটিকা যাবেনই ওনার পুত্রবধূ খুঁজতে। সঙ্গে অবশ্য সম্রাটও থাকবে। বউমা পছন্দ হলে দুজনকে নিয়ে উনি ছ'মাসের মধ্যে ফেরত আসবেন। উনি রাতুলবাবুর কাছে শুনেছেন বন্ধুত্ব করতে গেলে পেঙ্গুইন প্রথমেই একটা রঙিন পাথর দিয়ে ভাব জমায়। পাথর পছন্দ হলে বান্ধবী যদি সেটা নেয় তাহলেই কেল্লা ফতে!

সুস্মিতা দেবী সারা কলকাতা শহর চষে ফেলে কিনেছেন অন্তত পাঁচ ডজন রংবেরঙের সেমি প্রেসিয়াস পাথর। আজকালকার পেঙ্গুইন পুত্রবধূ কোনটা পছন্দ করবে কে জানে? সুস্মিতা দেবী খুব ভয়ে ভয়ে আছেন— কোনোটা পছন্দ হবে তো? নাকি সব ক'টাই বাতিল হবে!

কিন্তু বেশি ভাবনা-চিন্তা করার অবকাশ নেই। কাগজপত্র বানাতে হবে, ব্যাগপত্র গুছোতে হবে। এদিকে ছেলেমেয়ে বাড়িতে থাকবে বলে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপত্র করা। নিজে একটা ডায়াগনিস্টিক সেন্টার চালান—তার জন্য উপযুক্ত লোকের বন্দোবস্ত ইত্যাদি ইত্যাদি। সবকিছু ভালোয় ভালোয় মিটতে এবার রওনা হবার পালা।

আন্টার্কটিকা পৌঁছে সুস্মিতা দেবী স্বপ্ন রাজ্যে হারিয়ে ফেললেন নিজেকে। কী সব নৈসর্গিক দৃশ্য! কত্তামশাই কাজে ব্যস্ত। সম্রাট নিজের জায়গায় এসে হিরোগিরি করে বেড়াচ্ছে। আস্তে আস্তে সুস্মিতা দেবী বাস্তবে ফেরেন। যতই উনি বকাবকি করেন, রোজ বেশ রাত করেই স্টেশনে ফেরে সম্রাট। মোটে কথা শুনছে না। কোথায় কোথায় রোজ রোজ চলে যাচ্ছে কে জানে? কোথায় কী আজেবাজে খাবার খেয়ে বেড়াচ্ছে উনি বুঝতেও পারছেন না। রাতুলবাবু ওনাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু ওনার গিন্নি ছেলেমেয়ের ব্যাপারে খুব অবুঝ।

এভাবে কয়েকদিন চলার পর উনি সম্রাটকে একটা করে পাথর এগিয়ে দেন বেরোনোর সময়। কিন্তু সম্রাট তো কিছুই বোঝে না। এসব তো পেঙ্গুইন রাজ্যে চলে না। ওরা প্রকৃতি থেকে পাথর খুঁজে নেয়। বাঙালি বাড়ির নিয়মকানুন তো সে আর জানে না। সেখানে যে মায়েরা সব কিছুই ছেলেমেয়েদের জন্য করে দেন। বাঙালি বাড়িতে ছেলেমেয়ের যতই বয়স হোক মায়েরা বলে থাকেন—আহা ও কী করে পারবে? ও তো ছেলেমানুষ!

উনি পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসেন। ওনার ধারণা হয়েছে ওনার পছন্দ করা পাথর বোধহয় সম্রাটের পছন্দ হচ্ছে না। এদিকে ছ'মাস পেরিয়ে গেছে। সুস্মিতা দেবী ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন তাঁর বাকি দুই ছেলেমেয়ের জন্য। আর ভালো লাগছে না দক্ষিণ মেরুর এই বরফ রাজ্য। মনে হচ্ছে এর থেকে নোংরা, গরম, ভিড় গ্যাদগ্যাদে কলকাতা শহরটাই ভালো।

তাছাড়া সুস্মিতা দেবীর মনটাও প্রচণ্ড খারাপ, পুত্রবধূ পাওয়া যাচ্ছে না বলে। ওনার ধারণা হয়েছে—কেউ ওনার ছেলেকে পছন্দ করছে না। উনি বুঝতেই চাইছেন না যে পেঙ্গুইনের গায়ে মানুষের গন্ধ এসে গেছে, তাই কেউ ওর কাছেই ঘেঁষছে না।

ওনার অস্থিরতা দেখে স্টেশনের লোকেরা বলেছেন, ফেরার দিন একটা একটু ছোট দেখে পেঙ্গুইন জোর করে প্লেনে চাপিয়ে দেবে সম্রাটের সঙ্গে। কলকাতায় ফিরে বিয়ে দিলেই দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে। খুব ভালো মিলমিশ হবে।

পরামর্শটা খুব মনে ধরেছে সুস্মিতা দেবীর। সম্রাট আর ভাবি পুত্রবধূকে নিয়ে এবার দুগ্গা দুগ্গা বলে উড়োজাহাজে উঠে বসতে পারলে হয়। সুস্মিতা দেবী মনে মনে ঠিক করেছেন, বিয়েটা হলে একটা বড় করে সুবচনী সত্যনারায়ণ পুজো দেবেন। **কিশোর ভারতী**

মৌমিতা ঘোষ

জাদুকর জোজো

১

এই লেখাপড়া ব্যাপারটাকে একদম ভালবাসে না জোজো। বাবা-মা সবসময় কেন যে এত পড়াশুনো করার জন্য ওকে বকাবকি করে, ওর ছোট্ট মাথায় ঢোকে না।

'জোজো, জীবনে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের সংস্থান করার জন্য সবার আগে দরকার হল অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। আর তাই নিজের পায়ে দাঁড়ানোটা খুব দরকার রে! পড়াশুনো না করলে নিজের পায়ে দাঁড়াবি কী করে বল তো?'—এই কথাটা বাবা বহুদিন ধরে বলেই চলেছেন ওকে।

একদিন থাকতে না পেরে জোজো বলে ফেলেছিল, 'আমি তো নিজের পায়েই দাঁড়াই বাবা! শুধু দাঁড়ানো কেন, হাঁটা, ছোটা, সাইকেল চালানো—সবই তো পা দিয়েই করি!'

খুব হেসেছিলেন বাবা। জোজো বুঝতে পারছিল না এত হাসির ও কী বলল! বাবা আবার মা আর ঠাম্মাকে ডেকেও শুনিয়েছিলেন ওর কথা। মায়ের কথা বাদই থাক, জোজো যা-ই করে, মা তাতেই খুব হাসির কথা খুঁজে পান! জোজো অবাক হয়ে দেখল, যে ঠাম্মা সবসময় ওর হয়ে কথা বলেন, তিনিও বাবার কথা শুনে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফিকফিক করে হাসতে লাগলেন।

রাত্তিরে আদর করে বলেছিলেন ঠাম্মা, 'ও দাদুভাই, আমি হেসে ফেলেছি বলে আমার ওপর রাগ করেছ?'

'আমি কী এমন হাসির কথা বলেছি যে তোমরা সবাই ওইভাবে হাসলে?'

'না না দাদুভাই, তুমি অন্যায় তো কিছু বলোনি! তোমার দিক থেকে তুমি ঠিক কথাই বলেছিলে। কিন্তু আমাদের বুঝতে একটু ভুল হয়েছিল! আসলে তোমার বাবা অন্য

ছবিঃ ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য
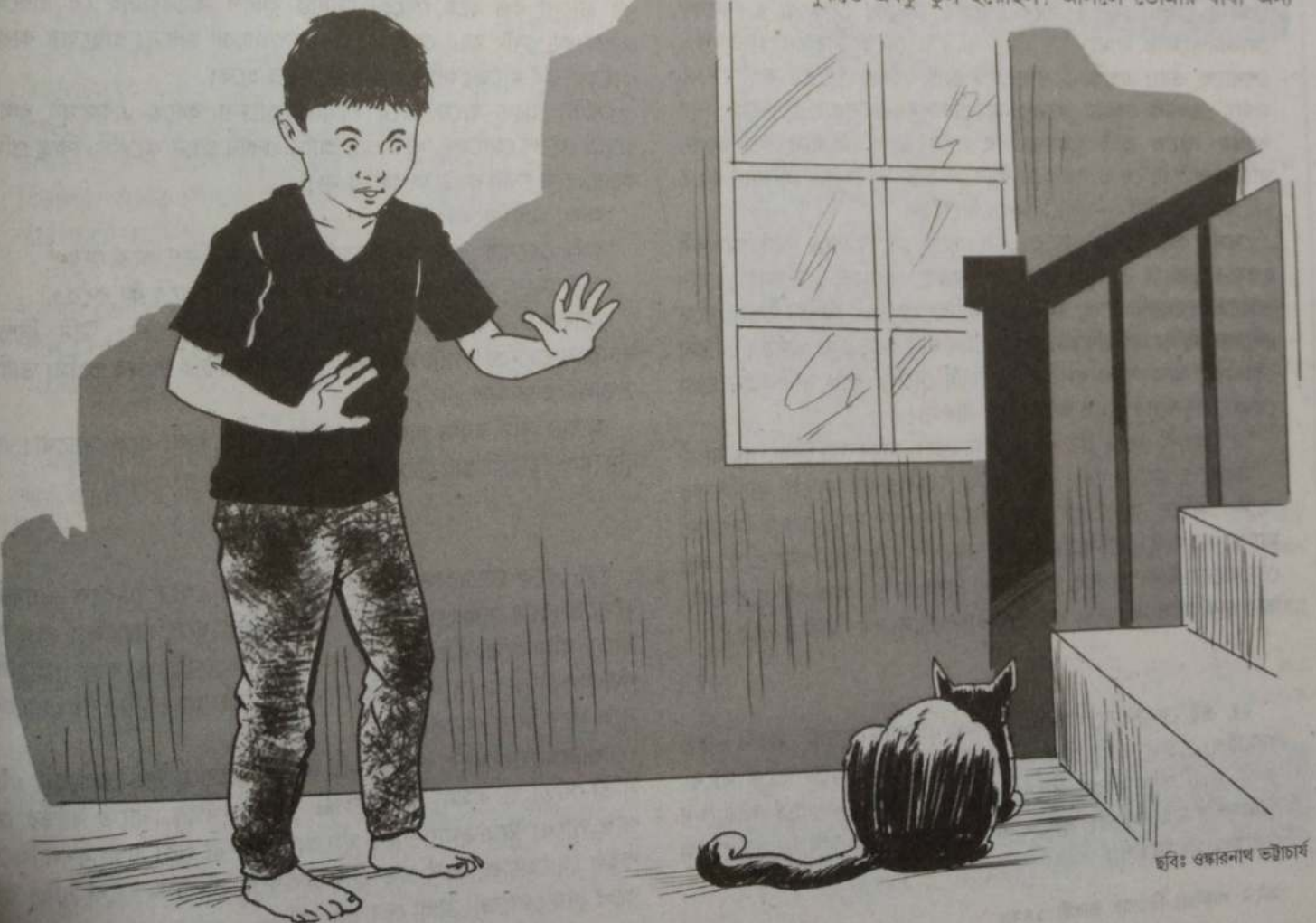
মানে করে বলেছিল।

'বাবা কী মানে করে বলেছিল গো? বাবা মাঝেমাঝেই কথাটা আমাকে বলে, কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারি না।'

'তেমন শক্ত কথা কিছু নয়, তোমার বাবা আসলে বলতে চায় তোমাকে পড়াশুনো করে অনেক বড় হতে হবে।'

'আমি শহরে চাকরি করতে যাব না। তুমি আর মা-ও তো চাকরি করো না। তোমরা কি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নেই?'

'আমরা তো ভালো করে পড়াশুনোটা করিনি ভাই। ওইজন্যে দেখছ না সারাক্ষণ সবকিছুর জন্যে তোমার বাবার ওপর ভরসা করে থাকতে হয়! যদি পড়াশুনো করে তোমার বাবার মতো চাকরি করতাম, তাহলে আমরাও তোমার বাবার মতো যা ইচ্ছে তাই করতে পারতাম।'

'আচ্ছা ঠাম্মা, আমি যদি বাবার মতো বড় হয়ে যাই, তাহলে কি বাবা আর আমাকে বকাবকি করবে না?'

'একদম। যা খুশি তাই করবে তুমি। কেউ কিচ্ছু বলবে না।'

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে জোজো। তারপর বলে, 'আচ্ছা ঠাম্মা, চাকরি করলে তবেই কি টাকা পাওয়া যায়?'

'হ্যাঁ যায় তো! তারপর সেই টাকা দিয়ে তুমি ইচ্ছেমতো যা খুশি তাই কিনতে পারো, খেতে পারো।'

'আর যারা চাকরি করে না, তারা টাকা পায় না?'

'যারা চাকরি করে না, তারা ব্যবসা করে। এই যেমন ধরো পাড়ার মোড়ের দোকানের সঞ্জয়কাকু, সে চাকরি করে না, কিন্তু দোকানটা চালায়। ওই মুদিখানার দোকান হল তার ব্যবসা। ব্যবসা করেও টাকা আয় করা যায়।'

'আর যারা ম্যাজিশিয়ান? তারা?'

কিছুক্ষণ থমকে যান ঠাম্মা। তাঁর নাতির যে ম্যাজিকের প্রতি প্রবল আকর্ষণ, সেটা তিনি বিলক্ষণ বোঝেন। তাঁদের গ্রামে বা আশেপাশে কোনো মেলা হওয়ার খবর পেলেই জোজো দৌড়বে। ম্যাজিকের দোকানগুলোর সামনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখে কীভাবে হাতসাফাই শেখাচ্ছে ওরা। এছাড়া মেলায় ছোট ছোট টেবিল পেতেও অনেকসময় জাদুর ভেলকি দেখায় অনেক ম্যাজিশিয়ান। জোজোর সেদিকেও খুব আগ্রহ! স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর যখন ওকে জিগ্যেস করেছিলেন মাষ্টারমশাইরা, যে ও বড় হয়ে কী হতে চায়, 'আমি ম্যাজিশিয়ান হ'তে চাই মাষ্টারমশাই!'—সপাটে জবাব দিয়েছিল।

সেসব কথা বাড়ির বড়রাও ভুলে গেছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। জাদুকর হওয়ার ভূত যে তাঁর নাতির মাথায় এভাবে এখনও বসে আছে, সেটা ভাবতে পারেননি ঠাম্মা। আজ তাই নাতির প্রশ্ন শুনে একটু চিন্তায় পড়ে গেলেন তিনি। ম্যাজিশিয়ান হয়ে তেমন নাম করতে না পারলে প্রতিষ্ঠা কোথায়? আর সত্যি বলতে কি গোটা দেশের বুকে দু'একজন ছাড়া তেমন জাদুকরের নামও আর শোনা যায় না!

'ও ঠাম্মা,কী ভাবছ এত? বললে না তো? জাদুকররা টাকা পায় না?'

'আসলে জানো তো ভাই, ম্যাজিশিয়ান হ'তে গেলে ম্যাজিকের অনেক জিনিস কিনতে হয়, সেসব জিনিসের খুব দাম। মেলায় দেখানো ম্যাজিকের মতো ছোটখাটো জিনিস নয়। ওসব জিনিস কিনতে গেলেও তো অনেক টাকা লাগবে, তাই জন্যে চাকরিটা তো করতেই হবে ভাই! আর চাকরি পেতে গেলে পড়াশুনোটাও ভালো করে করতে হবে!'

২

'মা, এই বেড়ালটাকে আমি একদিন এইবার মেরেই ফেলব! এত বদমাইশ বেড়াল আমি জীবনে দেখিনি! সারাক্ষণ তক্কে তক্কে থাকে, কখন একটু ফাঁকফোকর পাবে, আর টুক করে ঢুকে পড়ে আমাদের জিনিসপত্র নষ্ট করবে। সশব্দে বাসন ধুতে ধুতে কথাগুলো বলেন জোজোর মা, উর্মিলা।

'আহা বউমা, অমন কথা বোলো না। মা ষষ্ঠীর বাহন, অমন করে বলতে আছে নাকি! মেরে ফেলব, কেটে ফেলব—ও আবার কী কথা? তোমার ঘরে ছোট বাচ্চা আছে। জোজো শুনলে কী ভাববে বলো তো? বেড়াল একটু আরামপ্রিয়। ওরা সবসময় গৃহস্থবাড়িই খোঁজে বুঝেছ! নিজেদের আরও সতর্ক হ'তে হবে।'—একমনে মোচা ছাড়াতে ছাড়াতে বলেন জোজোর ঠাকুমা।

'আর কত সতর্ক হব? দোতলার বারান্দাটায় গত রবিবারে পুরো জাল লাগালাম। তারপরেও কোথা দিয়ে যে ঢুকছে। পরশুদিন কী করেছে জানেন? বাথরুমের পাপোশটায় বমি করে ভাসিয়ে রেখে গেছে। আর আজকে, আমি এক মিনিটের জন্য বাথরুম গেছি, এর মধ্যে কোথা দিয়ে ঢুকে মাছটা নিয়ে পালাল! ছেলেটা ভালোবাসে বলে পার্শে মাছ নিয়ে এল ওর বাবা, আর শয়তান বেড়ালটা আমার ছেলেটাকে খেতে দিল না!' বলতে বলতে আবার গলা চড়ে যায় উর্মিলার।

'আচ্ছা আচ্ছা, আমি দেখছি। দাদুভাইকে আজ পেটির মাছই করে দাও। বাবুকে আমি বলব বাজারে অর্ডার দিয়ে আবার পার্শে এনে দিতে।'

পাড়ায় খেলে বাড়ি ঢুকছিল জোজো। ঠাম্মা আর মায়ের কথোপকথনের শেষ অংশটুকু ওর কানে গেছে। একটা ছাই ছাই রঙের মোটা বিড়াল বেশ কিছুদিন ধরেই খুব বিরক্ত করছে ওদের বাড়িতে। কয়েকমাস আগে তো রান্নাঘরের পাশেই বাচ্চা দিয়েছিল। সে ছানাটা বড় হওয়া অবধি ওদের ঘরেদোরে খেলে বেড়াত। তারপর একদিন মা আর ছানা দু'টোই চলে গেছে। কিন্তু মা বেড়ালের উৎপাত ওদের বাড়িতে বন্ধ হল না। এবার বেড়ালটার একটা ব্যবস্থা করতেই হবে—ঠিক করে ফেলে জোজো।

৩

জোজোর বন্ধু রাহুলের ছোটকাকা ম্যাজিশিয়ান। বিভিন্ন মেলায় ম্যাজিক দেখান। রাহুলরা নতুন এসেছে পাড়ায়। কিন্তু অল্পদিনেই জোজোর খুব ভালো বন্ধু হয়ে গেছে। সেটার কারণ অনেকটাই যে রাহুলের ছোটকাকা, সেটা আর কেউ না জানুক জোজো জানে। রাহুলের কাকার কাছ থেকেই ম্যাজিকের প্রথম পাঠ নিতে হবে।

সেদিন রাতে শুয়ে শুয়ে ঠাম্মার কানের কাছে একসময় কথাটা বলেই ফেলে জোজো, 'ও ঠাম্মা, আমি একটা প্ল্যান করেছি। কিন্তু প্রমিস করো, তুমি সেটা কাউকে বলবে না!'

'আচ্ছা ভাই। বলো?'

'আমি ভেবেছি, ওই মোটা বেড়ালটাকে ভ্যানিশ করে দেব!'

একটু চমকে ওঠেন ঠাম্মা, 'মানে? ভ্যানিশ করবে কী করে?'

'ম্যাজিক! রাহুলের ছোটকাকা ম্যাজিশিয়ান তো! উনি নিশ্চয়ই জানবেন ভ্যানিশ করার ম্যাজিক। ওই ম্যাজিকটাই শিখব আমি। তারপর বেড়ালটাও ভ্যানিশ!'

'আচ্ছা। তুমি বরঞ্চ রাহুলের কাকার সঙ্গে কথা বলে দ্যাখো! এখন ঘুমিয়ে পড়ো।' চিন্তায় ডুবে যান ঠাম্মা।

৪

স্কুল থেকে ফেরার সময় রাহুলের বাড়িতে খেয়ে ফিরবে—এমনটাই বাড়িতে বলে সকালে স্কুলের জন্যে বেরিয়েছে জোজো। শুধু ঠাম্মা জানে আসল কথাটা। রাহুলকে দু'দিন আগেই ও বলে রেখেছিল। গতকাল রাহুল বলল, ওর কাকা নাকি বলেছেন আজ ছুটির পর জোজোকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে।

শোনার পর থেকে উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে জোজো। এইবার সত্যি সত্যি ও এমন একটা কাজ করে দেখাবে, যাতে বাড়ির লোক স্বস্তি পাবে। উত্তেজনায় রাতে ঘুম আসছিল না ওর। ঠাম্মা যখন জিগ্যেস করল যে জোজো কেন এত ছটফট করছে, তখন ঠাম্মাকে সত্যি কথাটা বলে দেয় জোজো। ঠাম্মা তো ওর বন্ধু!

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে বারান্দার শেষপ্রান্তে ছোটকার ঘর। রাহুল যখন জোজোকে নিয়ে ঢুকল, ভদ্রলোক খাটের ওপর শুয়ে কিছু একটা বই পড়ছিলেন।

'ছোটকা, আসব?'

আর তখনই একগাল হেসে ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'আরে জোজোমাষ্টার যে! কী খবর? বেড়াল ভ্যানিশ করতে হবে, তাই তো?'

হাঁ হয়ে গেছিল জোজো। তিনি কী করে এই কথাটা জানলেন? তাহলে কি ম্যাজিক করে অন্য কারোর মনের কথাও জেনে নেওয়া যায়?

'না, না, জোজোমাস্টার, তোমার মনে কথা জানতে কোনো ম্যাজিক করতে হয়নি আমাকে। তোমার এই বন্ধুই আমাকে সব বলেছে।'

'আচ্ছা কাকু, বেড়াল ভ্যানিশ করার কোনো ম্যাজিক জানো তুমি?' —এবার সাহস করে বলেই ফেলে জোজো।

'জানি বই কী! তোমাকে মন্ত্রটা শিখিয়ে দেব! তবে একটা কথা, এই মন্ত্র পড়লেই কিন্তু শুধু হবে না, এর সঙ্গে আরও কতকগুলো কাজ করতে হবে।'

'কী কাজ?'

'বলছি। তার আগে তোমার এই বন্ধুটিকে একটু ঘরের বাইরে যেতে হবে।'

রাহুলের একটু রাগ হল বুঝতে পারল জোজো। ও বেরিয়ে যেতেই জোজোর কানে কানে মন্ত্রটা বলে দেন ছোটকাকা।

৫

রাহুলদের বাড়ি থেকে ফিরে আসার পর ঠাম্মার সঙ্গে একা কথা বলার সুযোগ খুঁজছিল জোজো। কারণ ছোটকা যা বলে দিয়েছেন, সেই কাজ ও ঠাম্মার সাহায্য ছাড়া করতে পারবে না।

ঠাম্মাকে একা পাওয়া গেল সন্ধের সময়।

'ঠাম্মা, একটা হেল্প লাগবে তোমার!'

এরপর ঠাম্মাকে পুরো বিষয়টা বুঝিয়ে বলেছিল জোজো। রাত্তিরবেলা বিড়ালটাকে লক্ষ্য করে মন্ত্র পড়ে জোজো ঘরে চলে আসবে, আর একবারও তাকাবে না ওর দিকে। আর পরদিন ভোরবেলা জোজোকে অন্তত চব্বিশ ঘন্টার জন্য কোথাও একটা ঘুরতে যেতে হবে, যাতে বিড়ালটা অন্তত চব্বিশ ঘন্টার জন্য ওর চোখের আড়ালে থাকে। ব্যস, তারপরেই ভ্যানিশ হয়ে যাবে বিড়াল!

কয়েক মিনিট কী যেন চিন্তা করলেন ঠাম্মা, বললেন ব্যবস্থা হয়ে যাবে। পরদিন ভোরবেলা জোজোকে নিয়ে কয়েকটা গ্রাম পেরিয়ে একটু দূরে পিসির বাড়ি থেকে ঘুরে আসবেন ঠাম্মা। তাহলেই সমস্যার সমাধান হবে।

একগাল হাসি ফোটে জোজোর মুখে।

বিড়ালটা অনেক রাত অবধি এর ওর বাড়ির এঁটোকাঁটা খেয়ে বেড়ায়, আর তারপর বেশ রাত করে ঘুমোতে আসে জোজোদের বাড়িতে। গ্রিলের ফাঁক গলে টুক করে ঢুকে ওপরে উঠে যায়। আজকাল ঠাকুরঘরের সামনের চাতালটায় ঘুমোচ্ছে বিচ্ছুটা, খেয়াল করেছে জোজো।

হঠাৎ ঠুং করে একটা হালকা শব্দ। জোজো বুঝল তিনি ঢুকলেন। আরও বেশ কিছুটা সময় দিল ও বিড়ালটাকে। প্রায় পনেরো মিনিট পর আস্তে আস্তে বিছানা থেকে নামল, যাতে ঠাম্মা টের না পায়। আস্তে আস্তে ওপরে উঠল ও। ল্যাম্পপোস্টের আলোয় স্পষ্ট দেখল বিড়ালটা গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে চাতালটায়। বিড়ালটার দিকে চোখ রেখে একবার বড় করে দম নিল জোজো, আর তারপর এক নিঃশ্বাসে বলে গেল,

'হ্রিং টিং ছট ফটাস ফটাস লেবু লঙ্কা করমচা,
আমাদের বাড়ি থেকে মোটা বেড়াল চলে যা!'

মন্ত্রটা বলার পর সোজা পিছন ফিরে চলে এল ও ঘরে, ঠাম্মার পাশে। বিড়ালটার দিকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আর তাকাতে পারবে না ও।

৬

পিসি জোর করে ওকে আর ঠাম্মাকে তিনদিন আটকে রাখল। এদিকে জোজোর মন তো পড়ে আছে ওর বাড়িতে। বিড়ালটা সত্যিই ভ্যানিশ হল তো? বাড়ি ফেরার পরেও ঠাম্মা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন পিসির বাড়ি থেকে আনা নাড়ু, বাদাম চাকতি, সবজি, মাছ—এইসব নিয়ে।

সবকিছু গুছিয়ে মা আর ঠাম্মা যখন উঠতে যাবে, ঠিক সেইসময় মা বলে উঠলেন, 'মোটা বেড়ালটাকে কি আপনারা সঙ্গে করে টুনুদের বাড়ি নিয়ে গেছিলেন?'

টুনু জোজোর পিসির নাম। মায়ের কথায় চমকে উঠল জোজো। উত্তেজনাটা আর চেপে রাখতে না পেরে জিজ্ঞেস করে ফেলল, 'কেন মা? বেড়ালটা আর আসছে না?'

'নারে! তোরাও গেলি, আর সেদিন থেকে ওটাকে আর আশেপাশে দেখছিই না। আমি তাই ভাবলাম তোদের সঙ্গে বেড়ালও পিসির বাড়ি গেল নাকি!'

জোজোর মুখে তখন বিশ্বজয়ের হাসি! মন্ত্রে কাজ হয়েছে।

আরেকজনও তখন হাসছিলেন, তবে মনে মনে। তিনি হলেন জোজোর ঠাম্মা। আসলে পুরো প্ল্যানটা যে তাঁরই মস্তিষ্কপ্রসূত! রাহুলের কাকাকে ডেকে তিনিই সব ব্যবস্থা করেছিলেন। জোজোকে মন্ত্র শেখানো থেকে শুরু করে বিড়ালটাকে দু'টো গ্রাম পরে তাঁর বোনের বাড়ি দিয়ে আসা—সবটাই করেছেন রাহুলের কাকা। আসলে ঠাম্মার বোন খুব বিড়াল ভালোবাসেন, অনেক বিড়াল তাঁর বাড়িতে। তাছাড়া জোজো ম্যাজিক এতই ভালোবাসে, যে এই ম্যাজিক নিয়ে একটা স্বপ্নের জগতে বিচরণ করে ও। এই ছোটবেলাটাই তো স্বপ্নে থাকার সময়! ততদিন না হয় ঠাম্মা তাঁর আদরের নাতির স্বপ্নের কারিগর হলেন! কিশোর ভারতী

সঙ্গী

পল্লবী সেনগুপ্ত

কি, এই ভিকি। ভিকিইইই।'...মায়ের চিৎকারটা কানে আসতেই কপালে ভাঁজ পড়ল ভিকির। উফফ আবার চলে এসেছে। ঠিক গেম এর লেভেলটা যখন একটা চরম ইন্টারেস্টিং জায়গায় থাকবে ঠিক তখনই মা'কে আসতে হবে।

'চেঁচাচ্ছ কেন?' রুক্ষ গলায় উত্তর দিল ভিকি। মোবাইলটা গুঁজে দিয়েছে বালিশের নীচে। মা-ও ইতিমধ্যে এন্ট্রি নিয়ে ফেলেছে ঘরে।

'কী করছিলি তুই?'

'উফফ! কিছু করিনি।'

'মিথ্যা কথা বলবি না। আমি দেখেছি তুই মোবাইলে ফের গেমস খেলছিলি।

'বেশ করেছি, গেমস খেলেছি।'

'বেশ করেছিস? বলতে লজ্জা করছে না তোর? আর এক মাস বাদে অ্যানুয়াল পরীক্ষা, আর তুই ভর সন্ধ্যাবেলায় পড়তে না বসে গেমস খেলছিস! ভুলে গেছিস এবার হাফ ইয়ারলিতে কী রেজাল্ট করেছিলি? তোর ক্লাস টিচার না পইপই করে বলে দিলেন যে তোকে পড়ায় মন দিতে হবে। আর তারপরেও তোর কোনও লজ্জা নেই?'

'ফেল করলে আমি বুঝে নেব। তোমাদের অত ভাবতে হবে না।'

'তুই বুঝে নিবি? এত লায়েক হয়ে গেছিস? আমার লজ্জা লাগে

ছবিঃ স্যমন্তক চট্টোপাধ্যায়

তোকে নিজের ছেলে বলে পরিচয় দিতে। ছি! এই রকম একটা অকালকুষ্মাণ্ড ছেলে কিনা প্রফেসর সুনন্দা রায়ের সন্তান! ভাবতেই পারি না আমি তোকে জন্ম দিয়েছি!'

মায়ের শেষ কথাগুলোয় মাথায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে গেল ভিকির। এই কথাটা প্রায়ই বলে প্রফেসর সুনন্দা রায় আর তার হাজব্যান্ড ডক্টর অনন্ত রায়। ভিকিকে নাকি ছেলে হিসেবে তাদের পরিচয় দিতে লজ্জা করে। কেন? এত বড় বড় কথা এদের আসে কোত্থেকে? নিজেরা কী করে এরা ছেলের জন্য? ভিকিকে একটা নতুন ভালো মোবাইল অবধি দেয়নি। এটা তো মায়েরই পুরোনো একটা মোবাইল। ট্যাবটাও হাই কনফিগারেশনের কিনে দেয়নি। বললেই এক কথা। যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু নিয়ে চলতে শেখ। কেন এত হিসেব ছেলের বেলাতেই? মুখে শুধু একটাই কথা, আগে নিজেকে শুধরাও।

'দেব না তোমাদের পরিচয়। চলে যাব এই বাড়ি থেকে। তোমাদের অসহ্য লাগে। কেউ তোমরা ভালোবাস না আমায়। আমি সব বুঝি।'

'কি বললি? আমরা তোকে ভালোবাসি না? শয়তান ছেলে!'...দুম দুম করে দু-ঘা বসিয়ে দিলেন এবার সুনন্দা রায়।' বল আর কোনদিন এসব বলবি?'

'বলব। একশোবার বলব। আবার বলব।' জেদি ঘোড়ার মতো করছে ভিকি। মারধরকে এখন আর ভয় পায় না। অভ্যাস হয়ে গেছে।

'আরে করো কি বউদি! কেন মারছ ছেলেটাকে?' দৌড়ে এসেছে মলি মাসি। মলিমাসি সারাদিন এই বাড়িতে কাজের জন্য থাকে।

'আমি আর পারছি না মলিদি এই ছেলেকে নিয়ে। এত জেদি, এত অসভ্য যে ও কোথা থেকে হল! মাত্র বারো বছর বয়সেই পুরো উচ্ছন্নে চলে গেল।' সুনন্দার চোখে জল। তাকে ধরে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল মলি।

ভিকি উঠে কান পাতল দরজায়।

'বউদি, ওকে ভালো মুখে বোঝাও। মেরে ধরে কাজ হবে না।'

'তুমি তো জানো মলিদি ওকে ভালো মুখে বোঝানোর চেষ্টাও কিছু কম করিনি। কিন্তু...'

দরজার কাছ থেকে এবার সরে এল ভিকি। মলিমাসিটাও ভীষণ বদমাইশ। কেমন পুটপুট করে মা'র কানে মন্ত্র দিচ্ছে। ধুস! অসহ্য লাগে। ভিকি ধপাস করে শুয়ে পড়ল বিছানায়। মুডটাই পুরো চটকে গেল। এখন আর গেম খেলতেও ইচ্ছে করছে না। পড়তে বসার প্রশ্নই ওঠে না। ঘুম ঘুমও পাচ্ছে। চোখটা বুজল ভিকি।

ঘরের ভিতরটা বদ্ধ লাগছে। জানলাটা খুলে দিতে উঠল। পাল্লাটা ঠেলতেই ঝপ করে সরে গেল একটা ছায়া। বুকের ভেতর ধক করে উঠল ভিকির। কে ছিল এখানে জানলার পাশে? সে নাকি? যে মাঝে-মাঝেই ফলো করে ভিকিকে, আর যাকে ভিকি ছাড়া বোধহয় আর কেউই দেখতে পায় না...।

২

বাস থেকে নেমে চারপাশ একবার দেখল ভিকি। সব কিছু রোজকার মতোই, শুধু ওরই পরিস্থিতিটা পাল্টে গেল হঠাৎ করে। কারণ সত্যি সত্যি অ্যানুয়াল পরীক্ষায় এবার ফেল করে গেছে। ক্লাসে উঠতে পারেনি। ক্লাস টিচার জানিয়েছেন আগে বিক্রম রায়ের গার্জেনকে দেখা করতে হবে। তারপরেই তার রিপোর্ট কার্ড হ্যান্ড ওভার করা হবে। বুকের ভেতর উথাল পাথাল করছে ভিকির। এই কথা বাড়িতে গিয়ে ও কী করে বলবে?

আসলে ভিকি ছোটবেলা থেকেই খুব বেপরোয়া। কারোর কথা শুনতে ভালো লাগে না ওর। তাই কারোর কথা শুনে বা মেনে চলা কোনওদিনই ওর ধাতে নেই। সেজন্যই বাবা-মায়ের সঙ্গে একেবারে বনিবনা হয় না। আর বাবা-মায়েদের তো একটাই দাবি, সন্তানেরা কলের পুতুল হয়ে থাকবে। ভিকি পারবে না। বাবা-মায়ের কাছে ও খারাপ ছেলে। কোনদিন তারা ওকে ভালোবাসতেই পারল না।

কিন্তু এবার কী হবে? যে বাবা-মা ওকে উঠতে বসতে কথা শোনায়, যারা ওকে ভালোইবাসে না তাদের সামনে গিয়ে কেমন করে বলবে যে ক্লাসে উঠতে পারেনি! বলবে গার্জেন কলের কথা? ভিকির বাবা শহরের নামী হার্ট স্পেশালিস্ট, মা কলেজের প্রফেসর; আর তাদের ছেলে কিনা পরীক্ষায় ফেল! ক্লাস টিচারও তো বললেন, ছি-ছি বিক্রম! শেম অন ইউ! ওরকম বাবা-মায়ের ছেলে হয়ে এই তোমার পারফরম্যান্স!'

ভিকির কান্না পাচ্ছে প্রথমবার। এতটা অপমান যে সহ্য করতে পারছে না। রাস্তায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল এবার ভিকি। বাড়িতে ফেরাটা কি ঠিক হচ্ছে? অন্য কোথাও পালিয়ে গেলে হয় না? কিন্তু যাবেই বা কোথায়? মামাবাড়ি বা পিসির বাড়ি গেলেও তারা তো শেষমেশ সেই এখানেই দিয়ে যাবে। তাহলে উপায়টা কী? চকিতে মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল ভিকির। দ্রুত পায়ে হনহন করে বাড়ির দিকে হাঁটা লাগাল ও। সদর দরজা পেরিয়ে ঘরে ঢুকে পিঠের ব্যাগটা সোফার ওপর ছুঁড়ে ফেলেই এক ছুটে ঢুকে গেল বাথরুমে।

'ভিকিবাবা, কী হল তোমার? অমন হনহন করে কলঘরে দৌড় দিলে কেন? শরীর খারাপ নাকি?' মলি মাসি বাইরে থেকে চেঁচাচ্ছে। কোনও

উত্তর দিল না ভিকি। বাথরুমে রাখা থাকে বাবার ব্লেড। সেই ব্লেডটা বের করে নিল। এক টানে চালিয়ে দিল কবজি বরাবর। ফিনকি দিয়ে বেরোচ্ছে রক্তের ধারা। ভিকি বুঝতে পারছে আস্তে আস্তে অবসন্ন হয়ে আসছে ওর শরীর। বাবা-মা এবার বুঝবে ভিকি কারোর পরোয়া করে না। দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না ভিকি।

৩

অনেকদিন হয়ে গেল। দিন পনেরো তো বটেই। ভিকি এখন একটা অন্য জগতে চলে গেছে। মৃত্যুর পরের জগৎ। এখানে ও সম্পূর্ণ একা। বাবা-মা নেই। কেউ ওকে পড়তে বসতে বলে না, কেউ ওকে জিজ্ঞাসাও করে না ও খেয়েছে কিনা। আজকাল বাবা-মায়ের জন্য ওর ভীষণ মন খারাপ করে।

প্রায় পনেরো দিন পর আবার নিজের বাড়িতে এসেছে ভিকি। ভিকি —মানে ওর বিদেহী আত্মা! ও সব কিছু দেখতে পাবে, কিন্তু ওকে কেউ দেখতে পাবে না।

বাড়ির চৌকাঠের সামনে পৌঁছেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। এখান থেকে সোজা দেখা যাচ্ছে ওর ঘরটা। সে ঘরের পড়ার টেবিলে ও কে বসে? ওটা তো ভিকিই। কিন্তু ভিকি তো মরে গেছে!

'বাবা, আর কত পড়বি? এবার তো ওঠ। একটু খেয়ে নে। একটু রিল্যাক্স কর। গেম টেম খেল।' ছেলেটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন মা।

'না মা। সামনে এক্সাম। আমায় তো এখন বেশি পড়তেই হবে। আমি চাই টপ করতে। তাই এখন হার্ডওয়ার্ক জরুরি।' উত্তর দিল ছেলেটা।

'উই আর প্রাউড অফ ইউ বেটা।' ছেলের চুল ঘেঁটে দিলেন মা।

'আরে দেখি দেখি, মায়ে ছেলেতে কী এত পরামর্শ চলছে?' ঘরে এলেন বাবা। হাতে একটা গিফট প্যাক। প্যাকেটটা ছেলের হাতে দিয়ে বললেন' দেখ তো পছন্দ হয় কিনা।'

'এটা কী বাবা?'

'এটা একটা অ্যাডভান্সড ট্যাব।'

'কেন এটা আনলে বাবা? আমার যেটা ছিল, সেটাই তো ভালো।'

'নাআআ'...উন্মাদের মতো চিৎকার করে উঠল ভিকি। এই ছেলেটাকে সবাই ভিকি ভাবছে। কিন্তু এ তো একটা প্রতারক।

আচমকা ভিকির মনে পড়ে গেল সেই ছেলেটার কথা, যে ছেলেটা মাঝে মাঝেই ফলো করত ওকে। কিন্তু ভিকি তাকে ধরতে গেলেই সে মিলিয়ে যেত। ছেলেটাকে ভিকি ছাড়া আর কেউ দেখতে পেত না। আর সবচেয়ে বড় কথা ছেলেটাকে হুবহু ভিকির মতোই দেখতে। কে এটা? ডুপেলগ্যাংগার? ভিকি একটা বইতে একবার পড়েছিল এই পৃথিবীতে একইরকম দেখতে বেশ কয়েকজন মানুষ থাকে। এও কি সেরকম কেউ?

বাবা-মা এখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন। ছেলেটা একা বসে অঙ্ক করছে।

'হাই বিক্রম।' চমকে উঠল ভিকি। আশ্চর্য! ছেলেটা ওকে দেখতে পাচ্ছে নাকি?

'তুমি আমায় দেখতে পাচ্ছ?' ভিকির গলায় বিস্ময়।

'হ্যাঁ পাচ্ছি। আর এই মুহূর্তে তুমি যা ভাবছ সেটাও বুঝতে পারছি।' অদ্ভুত ভাবে হাসল ছেলেটা। ওর হাসি দেখে মাথা জ্বলে গেল ভিকির।

ছেলেটার কলার চেপে ধরে চিৎকার করে বলল, তুই একটা শয়তান। আমার জায়গা দখল করে বসে আছিস, লজ্জা করছে না?'

'কেন লজ্জা করবে? তুই তো নিজেই নিজের জায়গা ছেড়ে চলে গেছিস। কারোর কথা কোনদিন শুনিসনি, নিজের কাজ করতিস না। তাই যা হবার তাই হয়েছে। তোকে কেউ ভালোবাসত না। পরীক্ষায় ফেল করেছিস। অথচ তুই চাইলেই তোর জীবনটা অন্য রকম করতে পারতিস। ফেল করার পর যদি সুইসাইড না করে বাবা মায়ের কাছে ক্ষমা চাইতিস, তাদের কথাগুলো শুনে ভালো হবার চেষ্টা করতিস তাহলে আজ তুই আমার জায়গায় থাকতিস। সবাই ভালোবাসত তোকে।'

'আমি শুনব। আমি এবার থেকে বাবা-মায়ের কথা শুনব।'

'আর তো কিচ্ছু করার নেই বিক্রম। তুই মরে গেছিস। লড়াই না করে ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গেছিস। একবার পালিয়ে গেলে আর তো ফেরা যায় না। জেতাও যায় না। জিততে হলে এখানেই থেকে সব বাধা বিপত্তি মাথায় নিয়ে লড়তে হয়।'

'না প্লিজ। আমি ফিরতে চাই। মাআআ...।' হাউহাউ করে কাঁদছে ভিকি।

'ভিকি, ভিকি...কী হয়েছে তোর? ভিকি'...ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল ভিকি। সামনে মা। মায়ের চোখ মুখে একরাশ উদ্বেগ। মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে জানলা খুলে ঘুমিয়ে পড়েছিল ভিকি। তার মানে বীভৎস স্বপ্নটা তখনই নেমে এসেছিল চোখে।

'মা আই অ্যাম সরি। আমি এবার থেকে তোমাদের সব কথা শুনব। পড়াশুনোও মন দিয়ে করব। কিন্তু তোমরা প্লিজ আমায় ভালোবেসো। শুধু আমাকেই ভালোবেসো। আমার জায়গাটা অন্য কাউকে দিয়ে দিও না।'

হতচকিত হয়ে গেছেন সুনন্দা। ছেলেটা এমন করছে কেন? ছেলেটা অবাধ্য হতে পারে, দুষ্টু হতে পারে কিন্তু এমন তো করে না। না, ওকে শুধু বকাঝকা করলে হবে না। ওকে একটু ওর মতো করেও বুঝতে হবে।

৪

আজ বিদেশের মাটিতে পুরস্কার পাচ্ছেন বিক্রম রায়। ভারতবর্ষ থেকে এমন সম্মানীয় পুরস্কার খুব বেশি কেউ পাননি রসায়নবিদ হিসেবে। চারদিকে প্রেস, মিডিয়া ভর্তি। সকলেরই এক প্রশ্ন, স্যার কেমন লাগছে, যদি বলেন?'

'সবচেয়ে ভালো লাগছে এটা ভেবে যে আমার বাবা-মাকে আমি সন্তান হিসেবে গর্বিত করতে পেরেছি।'

'আপনার এই জায়গায় পৌঁছানোর পিছনে কার কার অবদান আছে স্যার?'

এই প্রশ্নটায় থমকে গেলেন বিক্রম রায়। ঝপ করে তার মন চলে গেল অতীতে। সেই অবাধ্য, ফাঁকিবাজ ভিকি কি কোনওদিন এই জায়গায় আসতে পারত যদি না সেই সঙ্গী থাকত! বহু বছর আগের এক বিকেলে দেখা দুঃস্বপ্ন যেন আচমকাই বদলে দিয়েছিল ওর জীবন। দুষ্টু ছেলেটাও হয়ে উঠেছিল অনেকটা ধীরস্থির।

তবে সঙ্গী কিন্তু যায়নি। মাঝে-মাঝেই সে ফলো করত। যখনই ও একটু বেহিসাবি হয়ে যেত তখনই সামনে চলে আসত। হিসহিসিয়ে বলত, তোমার জায়গা কিন্তু তাহলে আমি নিয়ে নেব এবার বিক্রম।'

এখনও তো মাঝে মাঝেই সে দেখা দেয়। যখন বিক্রম রায় অবসন্ন হয়ে পড়েন, নতুন কিছু করার উদ্যম হারিয়ে ফেলেন, হার মেনে নেবার সিদ্ধান্ত নেন তখনই সেই সঙ্গী এসে বলে, 'হারলে তো চলবে না। এই পৃথিবীতে থেকেই লড়াই করে যে বুঝে নিতে হবে পাওনাটা।'

'কী হল স্যার? দয়া করে বলুন না আপনার সাফল্যের পিছনে কে কে আছেন?' বিক্রম রায় একটু আনমনা হয়ে গেছেন।

'আমার ফ্যামিলি। বাবা-মা, স্ত্রী, আমার টিচাররা, আমার সহকর্মীরা এবং আমার এক বিশেষ সঙ্গী যিনি না থাকলে আজকের এই বিক্রম রায় হয়তো তৈরিই হত না।'

'কে তিনি স্যার?'

আর উত্তর দিলেন না বিক্রম রায়। উঠে গেলেন তিনি। কিছু কথা, কিছু প্রশ্নের উত্তর যে গোপনে গভীরে লুকিয়ে রাখতেই হয়। **কিশোর ভারতী**

ছবি: ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

মূল রচনা জেরোম কে জেরোম

গোলকধাঁধা

রূপান্তর শিশির চক্রবর্তী

আমাদের বন্ধু হ্যারিস একদিন কথায় কথায় জিগ্যেস করল আমি কখনো হ্যাম্পটন কোর্টের গোলকধাঁধায় (অনেকটা আমাদের লখনউ শহরের ভুলভুলাইয়ার মতো) গিয়েছি কি না। ও একবার সেখানে গিয়েছিল গ্রাম থেকে আসা এক তুতো ভাইকে গোলকধাঁধা দেখাতে। ম্যাপটা আগেই দেখা ছিল হ্যারিসের। এতই সহজ লেগেছিল গোলকধাঁধার নকশাটা যে ও দু-পেনি খরচ করে ঢোকার জন্য এবং গাইড বাবদ টিকিট নেয়নি। ও খরচ করবেই বা কেন বোকার মতো? ম্যাপটা যেন মশকরা করে তৈরি করা হয়েছে—গোলকধাঁধার মধ্যে কোনো ঘোরপ্যাঁচ নেই।

হ্যারিস ওর তুতো ভাইকে বলল,—শোনো, আমরা বুড়ি ছোঁওয়ার মতো ভিতরে একটু ঢুকব, তুমি যাতে সবাইকে বলতে পারো যে হ্যাম্পটন কোর্টের গোলকধাঁধা তোমার দেখা আছে। আসলে এটাকে গোলকধাঁধা আখ্যা দেওয়াই অর্থহীন। নীচু ঝোপের মধ্যে আঁকাবাঁকা রাস্তা—একবার ঢুকে ডানদিকের প্রথম বাঁকটা প্রতিবার নিতে থাকলেই হল। মিনিট দশেকের মধ্যে এখান থেকে বেরিয়ে বাইরে গিয়ে লাঞ্চ খাব।

ভিতরে ঢোকার একটু পরেই ওদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল কয়েকজনের। ওরা বলল, পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে ওরা এখানে ঘুরপাক খাচ্ছে—বেরোবার রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না। ওদের গোলকধাঁধার শখ মিটে গেছে—এবার বেরোতে পারলেই হয়। হ্যারিস ওদের বলল যে ও সবে এখানে ঢুকেছে। এবং একটু পরেই বেরিয়ে যাবে। ওরা চাইলে হ্যারিসকে অনুসরণ করতে পারে। ওরা হ্যারিসের প্রস্তাবে খুশি মনে সায় দিয়ে হ্যারিসের পিছু নিল।

চলতে চলতে আরও কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হল—তারাও তখন গোলকধাঁধা থেকে বেরোতে পারলে বাঁচে। তারা এবং আশেপাশের আরও দু-একজন হ্যারিসের দলে ঢুকে পড়ল। যারা এতক্ষণ এই গোলকধাঁধার প্রবেশ বা নিষ্ক্রমণের পথ খুঁজে পাওয়ার এবং নিজেদের ঘরে ফেরার ও আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সমস্ত আশা পরিত্যাগ করেছিল, তারা হ্যারিসের নেতৃত্বে ওই মিছিলে যোগ দিল এবং হ্যারিসকে ধন্য ধন্য করতে লাগল। হ্যারিসের গণনা অনুযায়ী মোট কুড়িজন ছিল ওই মিছিলে। কোলে শিশু নিয়ে এক মহিলা, যিনি সকাল থেকে ওখানে ঘুরপাক খাচ্ছিলেন, তিনি হ্যারিসের হাত ধরে চলতে লাগলেন যাতে তিনি কোনোভাবেই না হারিয়ে যান।

হ্যারিস পরের পর ডানদিকের বাঁকগুলো ধরে যেতে লাগল—কিন্তু পথ যেন আর ফুরোয় না। ওর তুতো ভাই তো বলেই ফেলল যে গোলকধাঁধাটা সত্যিই বিশাল।

হ্যারিস উত্তর দিল,—তা তো বটেই—এটা সমগ্র ইউরোপের অন্যতম বড় গোলকধাঁধা।

—অবশ্যই। তুতো ভাই বলল,—আমরা ইতিমধ্যে দু'মাইল রাস্তা তো হেঁটেই ফেলেছি।

হ্যারিসেরও ততক্ষণে ব্যাপারটা খটোমটো লাগতে শুরু করেছে, কিন্তু

ও তবুও সবজান্তা ভাব করে চলতে থাকল, যতক্ষণ না রাস্তায় পড়ে থাকা আধ-খাওয়া একটা পাউরুটির টুকরো সকলের চোখে পড়ল। হ্যারিসের তুতো ভাই হলফ করে বলল যে,—সাত মিনিট আগে ও এই পাউরুটির টুকরোটা ঠিক এখানেই দেখেছে।

হ্যারিস বলল,—অসম্ভব।

তখন কোলে শিশুসহ মহিলা বললেন,—মোটেই না। আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার ঠিক আগে আমি বাচ্চার হাত থেকে পাউরুটির এই টুকরোটা নিয়ে রাস্তায় ফেলে দিয়েছিলাম। মহিলা আরও বললেন যে,—হ্যারিসের সঙ্গে দেখা না হলেই ভালো হত এবং তাঁর মতে, হ্যারিস একটা প্রতারক।

হ্যারিস রেগে ম্যাপটা বের করে ওর তত্ত্বটা বুঝিয়ে বলল সবাইকে।

দলের একজন মন্তব্য করল,—আরে! আমরা কি বলছি ম্যাপটা ভুল? তুমি শুধু ম্যাপ দেখে বলে দাও আমরা এখন ঠিক কোথায়।

হ্যারিস এবার নিরুত্তর। তবে ও প্রস্তাব করল যে প্রবেশ দ্বারের কাছে গিয়ে নতুন করে আবার বেরোনোর রাস্তা খোঁজার চেষ্টা করাই সমীচীন হবে। আবার রাস্তা খোঁজার ব্যাপারে কেউ বিশেষ উৎসাহ দেখাল না, তবে প্রবেশদ্বারের কাছে ফিরে যাওয়া ব্যাপারে সবাই একমত। সুতরাং, হ্যারিসের পিছনে আবার চলতে শুরু করল মিছিল—তবে এবার উল্টোদিকে। দশ মিনিট হাঁটার পরে প্রবেশদ্বারের পরিবর্তে সবাই পৌঁছে গেল গোলকধাঁধার কেন্দ্রস্থলে।

হ্যারিস প্রথমে ভাবল যে, ও ভান করবে যেন এখানে আসারই পরিকল্পনা ছিল ওর। কিন্তু লোকজনের হাবভাব ততক্ষণে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। অগত্যা হ্যারিস বলল যে,—কেন্দ্রস্থলে ফিরে আসাটা নিছক এক দুর্ঘটনা মাত্র।

আবার ম্যাপ দেখা হল। গোলকধাঁধার নকশাটা আরও সহজ মনে হল। সুতরাং তৃতীয়বার যাত্রা শুরু হল প্রস্থানের রাস্তা খুঁজতে।

এবং তিন মিনিটের মধ্যেই ওরা আবার ফিরে এল সেই কেন্দ্রস্থলেই।

এরপর কিন্তু ওরা একেবারেই পথ হারিয়ে ফেলল। যেদিকেই যাচ্ছে, একটু পরেই ফিরে আসছে গোলকধাঁধার কেন্দ্রে। ব্যাপারটা এমন রুটিনমাফিক হয়ে গেল যে, কিছু লোক যথাস্থানে দাঁড়িয়ে রইল, যতক্ষণ না বাকি সবাই একটা চক্কর দিয়ে ওখানেই হাজির হয়। কিছুক্ষণ পরে হ্যারিস ম্যাপটা আবার বের করল, কিন্তু ম্যাপটা দেখেই সবাই মারমুখো হয়ে হ্যারিসকে বলল যে,—গোল-করে-মোড়া ম্যাপটা চুল কোঁকড়ানোর কাজে লাগবে। হ্যারিস মুখ চুন করে মিনমিন করে বলল যে,—কিছুটা হলেও তার জনপ্রিয়তা এখন কমে গেছে।

অবশেষে সবাই গোলকধাঁধার কর্মীদের উদ্দেশ্য করে পাগলের মতো চেঁচাতে লাগল। একজন কর্মী তখন মই বেয়ে উপরে উঠে বাইরের থেকে ওদের রাস্তার নির্দেশ দিতে লাগল। কিন্তু ততক্ষণে সকলের মাথা এমন ঘেঁটে গিয়েছে যে, রাস্তার নির্দেশ ওদের কিছুই বোধগম্য হচ্ছিল না। তখন কর্মীটি বলল সবাইকে ওখানেই অপেক্ষা করতে। সবাই এক জায়গায় জড়ো হয়ে দাঁড়াল। মই থেকে নেমে সেই কর্মীটি এবার গোলকধাঁধার ভিতরে প্রবেশ করল।

ভাগ্য খারাপ হলে যা হয়! কর্মীটি ছোকরা—শিক্ষানবিশ গোছের। কাজেই এখনো পুরোপুরি অভিজ্ঞ নয়। ভিতরে ঢুকে সে সমবেত লোকজনের কাউকেই খুঁজে পেল না। এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে ও নিজেই রাস্তা হারিয়ে ফেলল। সবাই মাঝে মাঝেই ওকে দেখতে পাচ্ছিল ঝোপের অন্য দিকে। কর্মীটিও ওদের দেখতে পেয়ে দৌড়ে ওদের দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু হায়! পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করার পরেও সে এল না। বরং তাকে আবার দেখা গেল ঝোপের ওপারে ঠিক একই জায়গায়! ওখান থেকেই সে চেঁচিয়ে জিগ্যেস করল যে সবাই কোথায় ছিল।

অবশেষে অপেক্ষা করতে হল এক পুরোনো অভিজ্ঞ কর্মীর জন্যে। সে ডিনার খেয়ে ধীরেসুস্থে ফিরে এসে সবাইকে হ্যারিস কথিত সেই অতি সরল গোলকধাঁধার বাইরে নিয়ে এল। কিশোর ভারতী

(Three Men In A Boat থেকে)

ছবিঃ কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল

অনুষ্টুপ শেঠ

খেলুড়ে

ভাল্লাগে না!

আধখানা চকোলেট হাতে নিয়ে ছাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মন খারাপ করছিল বাপান। আধখানা, কারণ বাকি আধখানা বিবির ভাগের। সে মেয়ে বাপানের থেকে তিন বছরের ছোট হলে কী হবে, কাজেকম্মে বেজায় ওস্তাদ। কখন খেয়েদেয়ে চুলে লাল ক্লিপ গুঁজে তার বন্ধুর বাড়ি খেলতে চলে গেছে মায়ের হাত ধরে! ওরা খেলবে আর ওদের মায়েরা ল্যাপটপে সিনেমা দেখবে। বাড়িতে এখন খালি মালতীমাসি আর বাপান।

এখন গরমের ছুটি। বাপানও বন্ধুদের বাড়ি যেতে পারত, কিন্তু সবারই নানারকম টিউশন আছে যে! ক্লাস সেভেনে উঠে অবধি ওদের কারোরই আর ফুরসত নেই। আজ শনিবার। দেবর্ষিদা বাপানকে পড়াতে আসবে আরেকটু পর, ম্যাথস নিয়ে ঝাড়া একঘণ্টা লড়াই চলবে। তারপর সাড়ে সাতটা থেকে তপন স্যারের কাছে ইংলিশ কোচিং।

বাপান টুকে টুকে মাছ-ভাত শেষ করেছে, একটু শুয়েছে, তারপর উঠে ফ্রিজ থেকে চকোলেটটা ভেঙে নিয়ে ছাতে এসে দাঁড়িয়েছে। ছোটবেলায় এই সময়টা ওরা মাঠে খেলতে যেত। ঋক, নির্মাল্য, অয়ন, সম্বিত... কবে থেকে যেন সেটা বন্ধ হয়ে গেল। সেটা কি এক এক করে টিউশন বাড়তে থাকার পর? নাকি যে যার মোবাইল হাতে পেয়ে যাওয়ার পর?

অত মনে নেই। তবে ও বেশ বুঝতে পারে, খেলাধুলো ব্যাপারটা কেমন যেন হুশ করে হাওয়া হয়ে গেছে!

চকোলেটটা শেষ করে, হাত ঝেড়ে ছাত থেকে নেমে যাবে, এমন সময় পেছন থেকে কে যেন একটা ডাকল, 'হুই! শুনছিস?'

কাকে ডাকছে? কই কাউকেই তো দেখা যাচ্ছে না! ওর বন্ধুদের কারও গলা তো এমন নয়! তাছাড়া ওরা কেউ এমন ভাষায় কথাও বলে না। গলাটা ডানদিক থেকে আসছে। ডানদিকের রেলিং-এ ঝুঁকে নীচের সরু গলিটা দেখল বাপান। কই,.কেউ তো নেই!

'হুই! ইদিকে রে!'

অ্যাঁ! এ তো তাকেই ডাকছে মনে হচ্ছে! কিন্তু কোথায় সে?

'হি হি হি... কী বোকা রে বাবা! এইত্তো আমি! উপ্রে!'

বাপান ভয়ে ভয়ে ডানদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে উপরে চোখ চালায়। পিন্টুদাদের বাড়ির গ্রিল দেওয়া জানলা, কার্নিশ, কার্নিশের উপর দুটো ছিটছিট পায়রা...ওরাই ডাকছে নাকি? ধ্যাৎ!

আরও আশপাশে খোঁজে সে। ল্যাম্পপোস্ট, তালঢ্যাঙা পেঁপে গাছের ডগা, চারতলা উঁচু নিমগাছের ডালে কাকের বাসা...কালো কালো দুটো পা লটপট করছে...!

চোখ আরও ওঠায় বাপান। হাফপ্যান্ট, খালি গা, গোল চকচকে মুখ, খোঁচা খোঁচা চুল। ওরই মতো বয়স হবে। জুলজুল করে ওকে দেখছে আর হাসছে খুব।

'তুই কে? পিন্টুদাদের গাছে উঠেছিস কেন?'

ছেলেটা সড়াৎ করে খানিকটা নেমে এসে ওর মুখোমুখি হল। বলল, 'উদোর মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন সেই থেকে? পেট কামড়াচ্ছে?'

বাপানের সাংঘাতিক রাগ হল। কে না কে একটা, কথা নেই বার্তা নেই ওকে আজেবাজে কথা বলছে। গোঁ গোঁ করে বলল, 'মোটেই না। আমার পেটে কিছু অসুখ নেই। হেলদি খাই।'

ছেলেটা ভাব করার গলায় বলল, 'চ' না খেলি!'

'কী খেলবি?'

ছেলেটা এবার একটা অদ্ভুত কসরৎ করে গাছ বেয়ে দোল খেয়ে এসে ওদের একচিলতে ছাতটার রেলিং-এ নেমে পড়ল।

'গাছ বাইতে পারিস?'

পারে না বাপান। মাথাটা নীচু করে ধীরে ধীরে নাড়াল সে।

'তাহলে...গুলি খেলতে জানিস?'

বাপান হাঁ করে চেয়ে থাকল। এসব আবার আজকের দিনে কেউ খেলে নাকি?

'তবে...তোর বল আছে না? চল ওপাশের পার্কে একটু খেলে আসি।'

বাপানের লোভ হচ্ছিল। সত্যি, কদ্দিন জমিয়ে বল পেটানো হয়নি। একটু খেলেই চলে আসবে। দেবর্ষিদা ভালো লোক, অল্প দেরি হলেও রাগ করবে না।

'চলে আয় বলটা নিয়ে। আমি নীচে দাঁড়াচ্ছি।'

আবার সার্কাসের মতো কায়দা করে গাছ বেয়ে নেমে গেল ছেলেটা।

চুপিচুপি বলটা কাবার্ড থেকে নিয়ে, মালতীমাসিকে 'একটু আসছি' বলেই বেরিয়ে পড়ল বাপান। পা চালিয়ে পার্কে পৌঁছতে এক মিনিটও লাগল না।

'নাম কী রে তোর?'

'নন্দু। আমি কিন্তু তোর নাম জানি, হি হি। বা-পান! তোদের বাড়ির মাসিটা ডাকে না জোরে জোরে?'

নন্দুর বাড়ি কোথায়, সেটা আর জিজ্ঞাসা করেনি বাপান। পাড়ার এতগুলো বাড়ি আর ফ্ল্যাটবাড়িতে কাজের মাসি যারা আসে তাদের কারও ছেলে হবে হয়তো। জামাটার রঙ উঠে গেছে এক জায়গায়। কিন্তু এদ্দিন পরে মাঠে নেমে এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে ইচ্ছে করেনি ওর।

কী খেলাটাই না হল! নন্দু বেজায় ভালো খেলে। বহুকাল পর এমন ঘামে ভিজে চুপচুপে হয়ে বাড়ি ফিরল বাপান। দেরি হয়ে গেছে নির্ঘাত, তাই মুখ কাঁচুমাচু করেই বেল বাজাল।

'অ মা! তুমি অমন না বলে কয়ে বেরিয়ে গেলে...এদিকে মাস্টার কখন থেকে এসে বসে আছে...আজ মা আসুক তোমার!'

মালতীমাসির পিছনে ফেলে এক দৌড়ে নিজের ঘরে ঢুকে যায় বাপান।

পড়তে বসে আর কথা হল না। দেবর্ষিদা খুব কড়া টিচার। তারপর মা আর বিবি ফিরে এল। তাদের সারা বিকেলের গল্প নিয়ে আরেক প্রস্থ হইহই। তারপর ইংলিশ ক্লাসে বেরোনোর সময় হয়ে গেল। তালেগোলে বাপানের আর নন্দুর কথা কাউকে বলাই হল না। একদিক দিয়ে ভালোই হল, মা-বাবাকে বললে তারা নিশ্চয়ই বখাটে ছেলেদের সঙ্গে মিশতে বারণ করে দিতেন।

গরমের ছুটিটার রোজই এই রুটিন চলতে থাকল। বাপান একটু রোদ পড়লেই ছাতে এসে দাঁড়ায়, নন্দু নীচে এসে তাকে ডেকে নেয়। এখন অবশ্য 'খেলতে যাচ্ছি মাঠে' বলেই যায়—তবে কার সঙ্গে সেটা কেউ জিজ্ঞাসাও করে না, ও-ও আলাদা করে কিছু বলেনি।

এই যে দুজনে এত হুল্লোড় করে মাঠে খেলছে, চেঁচাচ্ছে...এইটে পাড়ার লোকেদেরও চোখে পড়েছে! প্রায়ই বাপান দেখে, পথচলতি কাকু-জেঠু-কাকিমারা হাঁ করে ওদের দিকে তাকাতে তাকাতে যাচ্ছে। দাঁড়িয়েও পড়ে কেউ কেউ।

সেদিন খেলে ফেরার পথে টিংকুদার মা তো ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়েই পড়লেন, 'আহা রে! খুব একা লাগে না? বেশ করেছিস, ভালো করছিস। আমি তো টিংকুকে বলছিলাম দ্যাখ বাপানেরই বুদ্ধি আছে...কী সুন্দর খেলতে চলে আসে!'

যত্তসব! কথা না বাড়িয়ে হাসি মুখ করে মাথা নেড়েছিল বাপান।

আজ আবার সেনকাকু আর সোনাইয়ের দাদু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের খেলা দেখছিলেন। আজ জমেওছিল খেলাটা, সে কী ড্রিবলিং দুজনেরই। নন্দুকে কাটাতেই হবে, এই জেদ থেকে এক-একটা কী শট বেরোচ্ছিল বাপানের পা থেকে!

কিন্তু একটা ব্যাপার বাপানের খুব খারাপ লাগল। ওরা যখন খেলে ফিরছে, সেনকাকু আর সোনাইয়ের দাদু দুজনেই শুধু ওর একারই প্রশংসা করতে লাগলেন। কী ভালো খেলে, কোচিং নেওয়া উচিত ইত্যাদি। নন্দু যে ওর চেয়ে ঢের ভালো খেললেও স্রেফ ওই গরিব বলে এঁরা পাত্তা দিচ্ছেন না, এটা না বোঝার মতো বোকা তো বাপান নয়! এমনকী তাকাচ্ছেন না পর্যন্ত ওর দিকে!

রাগের মাথায় প্রায় বলেই ফেলেছিল ও, কিন্তু নন্দু চোখের ইশারায় থামিয়ে দিল ওকে।

তার পরদিন, খুব আশ্চর্য ব্যাপার হল একটা। সেনকাকুর ক্লাস ফোরে পড়া ছেলেটা এসে হাজির হল মাঠে, 'বাপানদা আমায় খেলতে নেবে?'

না নেওয়ার কোনও প্রশ্নই ছিল না। তবে নন্দু আজ আর তত জমাটি খেলছিল না, হয়তো বাচ্চাটার কথা ভেবে জায়গা ছেড়ে দিচ্ছিল।

পরদিন মাঠে গিয়ে আরও বড় চমক। বাপান দেখে ঋক আর অয়ন দাঁড়িয়ে আছে।

'তোরা?'

'কেন? তুই একাই খেলবি নাকি?' চশমাটা নাকের উপর ঠেলে দিয়ে রাশভারী গলায় বলল ঋক।

একইসঙ্গে মজা লাগছিল আর একটু একটু রাগ হচ্ছিল বাপানের।

'চল দেখি, তুই কেমন সব স্কিল শিখেছিস নাকি... দেখা! বাড়িতে তো টেকা যাচ্ছে না!', অয়ন বলে।

ঋক ধুয়ো ধরল, 'সত্যি! সবাই খালি বাপান বাপান করছে ক'দিন ধরে...'

তাই বলো! ওকে দেখে সবাই বাড়ি গিয়ে বলেছে, তাই আজ এরা ফোন ছেড়ে মাঠে এসেছে। বেশ হয়েছে!

পুরোনো খেলুড়েদের পাওয়ার আনন্দে বাপান খেয়ালই করল না যে নন্দু কখন খেলা থামিয়ে সরে দাঁড়িয়েছে এক পাশে। খেলা শেষ হতে হুঁশ হল। কিন্তু ততক্ষণে সে চলেই গেছে মাঠ থেকে।

পরদিন নন্দু এল না। এদিকে মাঠে তো ফুল-হাউস! ঋক, অয়ন, নির্মাল্য সবাই তো বটেই, বাপ্পা, তাতান, গুড্ডুর মতো ছোটরা, এমনকী টিংকুদা আর রনিদাও! বাপানের আসার আগেই সবাই খেলা শুরু করে দিয়েছিল, ওকে দেখে হইহই করে ডেকে নিল। আর কিছু ভাবার সময়ই পেল না ও।

ক'দিন পরে নন্দুর কথা ভুলেই গেল ও প্রায়। এত ছেলেপুলে খেলতে আসছে আজকাল যে পালা করে খেলতে হচ্ছে। ভাবতেও অবাক লাগে, এক মাস আগেও এই পার্ক একদম ফাঁকা পড়ে থাকত! নিজেদের মধ্যে দল করে পরের সপ্তাহে 'ফাইভ ইচ' টুর্নামেন্ট খেলা হবে প্ল্যান হচ্ছে।

সেদিন হাক্লান্ত হয়ে ফিরছিল বাপান, হঠাৎ কানে এল ডাকটা।

'হুই! এইজ্জো!'

গলির মধ্যে নন্দু দাঁড়িয়ে আছে। মুখটা তেমনি হাসি-হাসি।

'কোথায় ছিলি তুই এতদিন? খেলতে আসিস না কেন?' দু-পা এগিয়ে গেল বাপান।

'তোর বন্ধুরা আছে তো...'

'তাই বলে তুই আসবি না?' বলতে গিয়েও বলল না বাপান। নন্দুর জামার কলার ফাটা, হাফপ্যান্টের সুতো ঝুলছে। মনে হয় ওর আর জামাকাপড় নেই, এইগুলোই তো রোজ পরে। নন্দুর চুল রুক্ষ, তেল-সাবান পড়ে না।

এগুলো নতুন করে চোখে পড়ল বাপানের। ও গলা বদলে বলল,

'জানিস, টুর্নামেন্ট হবে। চারটে দল পাওয়া গেছে। নতুন ফ্ল্যাটে অতগুলো স্কুল-কলেজে পড়া ছেলে আছে, জানতামই না!'

'আমায় নিবি না?' ফিক-ফিক করে হাসছে নন্দু।

'তুই তো আসছিসই না! তোকে টিমে নিলে ট্রফি আমাদের পাক্কা!' বলে ফেলে একটু অস্বস্তি হল। অন্যরা কী বলবে? অখুশি হবে কি? নন্দু তো ওদের চেয়েও ভালো খেলে। তবু...

উত্তরটা ও জানে, কিন্তু ভালো লাগে না সেটা ভাবতে। মুখে শুধু বলে, 'তোর বাড়িটা কোথায় বল তো? এপাড়ার টুর্নামেন্ট তো, জিজ্ঞাসা করি তোকে নেওয়া যাবে কিনা...'

নন্দু আবার মুচকি হাসে। কেমন বিষণ্ণ দেখায় তাকে।

'নাঃ, আমি আর খেলব না রে! চলে যাচ্ছি এখান থেকে!'

মানেটা কী? অমন পায়ে পায়ে পিছিয়েই বা যাচ্ছে কেন গলির মধ্যে? খুব মলিন লাগছে ওকে নিমগাছের আঁকিবুঁকি ছায়াতে।

ওই তো ও হাসছে, হাত নাড়ছে। এবার গলির মোড় ঘুরবে। চলে যাচ্ছে মানে আর আসবে না? এই শেষ দেখা?

বাপান চেঁচিয়ে বলে, 'কোথায় যাচ্ছিস বলে যা অন্তত!'

নন্দু শুনতে পেল কিনা কে জানে, উত্তর এল না কোনও।

বাপান মোড় ঘুরে দেখল গলিটা শুনশান।

বুকে কেমন যেন চিনচিন ব্যথা করছিল। ঠিক হল না। বাপানের উচিত ছিল ওকে টিমে নেওয়ার ব্যবস্থা করা। এভাবে স্বার্থপরের মতো ওকে চলে যেতে দিয়ে ঠিক করল না সে।

কিন্তু এখন কী করার আছে? চলেই তো গেল... আচ্ছা, প্রথম দিন ও পিন্টুদাদের নিমগাছে চড়ে বসেছিল না? তাহলে ওকে নিশ্চয় ওবাড়ির লোকেরা চিনবে।

ছুটে গিয়ে কলিংবেল বাজিয়ে দিল বাপান।

দরজা খুললেন পিন্টুদার পিসি।

'পিন্টু তো বেরিয়েছে বাবা...'

'পিসি, আপনাদের বাড়িতে কে কাজ করে বলবেন, যার ছেলে নিমগাছে ওঠে?'

'ছেলে...নিমগাছ!' পিসি আকাশ থেকে পড়েন শুনে।

'কে বলুন না? কোথায় থাকে তারা?'

'কে গো বড়দি?'

'এই শ্যামলী, বাইরে আয় তো। এ ছেলে কী বলছে আমি তো কিছুই বুঝছি না!'

এক শাঁখা-পলা পরা অল্পবয়েসি মেয়ে বেরিয়ে আসে, বাপানকে দেখেই বলে, 'ও এ তো সেই ছেলেটা, মাঠে বল খেলে খুব...কী খুঁজছ?'

বাপান একটু ঘাবড়ায়, ওর কল্পনার নন্দুর মায়ের সঙ্গে এই মহিলা একদম মিলছে না, 'হ্যাঁ, আমি...ওই...এবাড়িতে যে ছেলেটা গাছে ওঠে না? তাকে খুঁজছি...আপনার ছেলে?'

এবার শ্যামলীও আকাশ থেকে পড়ে।

'আমার ছেলে গাছে উঠবে কী! সবে তিন বছর বয়স...!'

বাপানের ভ্যাবাচ্যাকা মুখটা দেখে পিসির মায়া হয়। ভিতরে ডাকেন ওকে, বসতে বলেন। আপত্তি না শুনেই শ্যামলীকে দিয়ে লেবু-চিনির জল করিয়ে খেতে দেন। গ্লাসটা হাতে ধরিয়ে শ্যামলী বলে, 'ঠিকই বলেছ, এর পেট গরম হয়েছে নির্ঘাৎ! বোসো, ঠান্ডা হয়ে বাড়ি যেও'খন। বড়দি, দরজা দাও, আমি আসছি।'

লজ্জায় বাপান চোঁ চোঁ করে গ্লাস খালি করে উঠে দাঁড়ায়। শ্যামলী চলে গেছে, ও-ই বা আর বসে কী করবে।

যাবার আগে আর কী বলবে ভেবে না পেয়ে আবার সেই কথাই পেড়ে বসে বাপান, 'আসলে নন্দু বলেছিল এখানেই থাকে, আমিও ভেবেছিলাম তার মানে এ বাড়িতে...আমারই ভুল...'

'দাঁড়াও!' আর্তনাদ করে ওঠেন পিসি।

'কী নাম বললে? নন্দু? ঠিক শুনেছ?'

বাপান ঘাড় নাড়ে।

'কেমন দেখতে?'

বলে বাপান। জ্বলজ্বলে চোখ, কোঁকড়া রুক্ষ চুল, ওর সমান হবে মাথায়, রোগা চেহারা...

'নন্দু! কী বলেছিল তোমায় বলো তো?'

সব খুলেই বলে বাপান। আলাপ হওয়া, রোজের খেলা...। পিসি হঠাৎ আঁচল তুলে চোখ মোছেন।

'বল খেলতে খুব ভালোবাসত ছেলেটা।'

'চেনেন আপনি?'

পিসি ম্লান হাসেন ওর দিকে চেয়ে।

'অনেকদিনের কথা তো...ভাবতেই পারিনি ও আবার...'

গলা ধরে যায় পিসির।

'চিনতাম, বুঝলে। পিন্টু বাবা যখন হল, আমাদের দুজনকে দেখাশোনার জন্য নন্দুকে দেশ থেকে আনানো হয়েছিল। তোমার মতোই বয়স হবে তার তখন। খুব ডানপিটে হুল্লোড়ে ছেলে ছিল। এই নিমগাছ তখন দোতলা সমান। একদিন গাছ বেয়ে কী কেরদানি করতে গিয়ে বেকায়দায় পড়ে ঘাড় মটকে মারা গেল। খুব কেঁদেছিলাম আমরা সবাই।'

বাপানের সব গুলিয়ে যাচ্ছিল।

'বিশ্বাস হল না, না? আচ্ছা, নন্দুর চোখে আলো পড়লে কটা লাগত তো? আর কানের ডগা একটু ছুঁচল?'

বাপান উপর-নীচে মাথা দোলাল।

'ও-ই তবে এসেছিল। শোনো, একথা আমি কাউকে বলিনি। এ বাড়ি এসেছি, পিন্টুর পিসেমশাই অ্যাক্সিডেন্টে চলে যাবার পর। আমি সারাদিন ঘরের কাজে ব্যস্ত, ছেলে একা একা ঘরে পড়ে থাকে, খুব কাঁদে। তারপর একদিন ঘরে আসতেই বলল, কে একটা দাদা নাকি জানলা গলে এসে ওর সঙ্গে বল খেলে গেছে। রোজ এক কথা। প্রথমে খুব ভয় পেয়েছিলাম, তারপর তোমার মতোই এসব বর্ণনা শুনে বুঝলাম নন্দু।'

'তারপর?' ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করে বাপান।

'কাউকে কিচ্ছু বলিনি। আমি জানতাম ও কারও ক্ষতি করবে না। নন্দু আসলে বাচ্চাদের খুব ভালোবাসত। খুব! রুবাই একা একা কাঁদত, ও দেখে আর থাকতে পারেনি। রোজ আসত, ভুলিয়ে রাখত ছেলেকে। বাড়িসুদ্ধ সবাই খুব খুশি শান্ত ছেলে দেখে। তারপর পিন্টু হতে রুবাইয়ের খেলার সঙ্গী হল, নন্দুও আসা বন্ধ করে দিল।'

কাছে এসে বাপানের মাথায় হাত রাখেন পিসি।

'তেমনি তোমার খেলার সঙ্গী নেই দেখে ও এসেছিল, এখন আর দরকার নেই বলে চলে গেছে।'

'আর আসবে না?'

'আবার দরকার পড়লে আসবে হয়তো! তবে আসতে না হলেই তো ভালো, কী বলো?'

বাপানের খুব গলা ব্যথা করছিল। তাহলে...এইজন্য কেউ নন্দুকে নিয়ে কিচ্ছু জিজ্ঞাসা করেনি ওকে? কেউ দেখতেই পেত না নন্দুকে! সবাই ভাবত ও একাই খেলছে মাঠে?

নন্দু আর আসেনি। বাপান এখন পার্ক স্ট্রিটের একটা ফার্মে চাকরি করে। কিন্তু ঋক আর ও মিলে উইকেন্ডে পাড়ার সব কাচ্চাবাচ্চাকে জড়ো করে মাঠে নেমে পড়া, শীতকালে পাড়ার মধ্যে দল করে টুর্নামেন্ট, ব্যাডমিন্টন কম্পিটিশন, পাড়ায় নতুন ফ্যামিলি এলেই গিয়ে তার ছেলেমেয়েদের দলে জুড়ে নেওয়া—এসবে কক্ষনো ফাঁকি পড়ে না। এপাড়ায় অন্তত কোনও বাচ্চা একা হয়ে থাকে না।

খালি দুপুরবেলা ছাতে এসে দাঁড়ালেই বাপানের চোখ বারবার চলে যায় ওই নিমগাছটার দিকে, মনে হয় এক্ষুনি একটা হাসিমুখ ডেকে উঠবে, 'হুই! দেখছি কিন্তু!' **ছবি: উজ্জ্বল**

এক ঝুড়ি স্বপ্ন

শাশ্বতী নন্দী

মাউথ অর্গান বাজাতে বাজাতে হেঁটে যাচ্ছে লোকটা। কাঁধে ঝোলা। পরনে সবুজ পাঞ্জাবি আর কমলা চোস্ত পাজামা। মাথায় লম্বা টুপি। কিম্ভূতকিমাকার সাজগোজ! মাথার কলকব্জাও মনে হয় একটু ঢিলে টাইপ।

মাউথ অর্গান বাজাতে বাজাতে দু-কদম হাঁটছে আর দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়ছে, 'স্বপ্ন কিনবে...স্বপ্ন? স্বপ্ন কেনাবেচা করতে চাও তো চলে এসো আকাশমণিতলার হাটে ওই আশ্রম মাঠের কাছে।'

এ আবার কেমন কথা! স্বপ্ন বুঝি কেনা বেচার জিনিস! লোকে প্রথম প্রথম দেখত আর হাসত।

তবে ধীরে ধীরে সেই কিম্ভূতকিমাকার লোকটাই অভ্যস্ত হয়ে উঠল সবার চোখে। এখন ওর আসার অপেক্ষায় প্রহর গোণে কচিকাঁচার দল।

এই যেমন ওই মিষ্টি সুর শুনেই এখন বসুন্ধরা আবাসনটি ফাঁকা হয়ে গেল। ওখানকার কচিকাঁচার দল পড়িমরি করে ছুটছে, হাতে সবার চৌকোনা সাদা কাগজ। টপাটপ হাত বাড়িয়ে কাগজগুলো জমা করছে লোকটার ঝোলায়।

সেও হেঁটে চলেছে কচিকাঁচার স্রোত পেছনে নিয়ে। গন্তব্য আশ্রম মাঠ, আকাশমণির বাঁধানো বেদি। ওখানে পৌঁছেই সে এবার আয়েশ করে বসবে। তারপর ঝোলায় হাত ঢুকিয়ে সবার সব চিরকুট বার করে পড়তে শুরু করবে।

তখন এই খুদের দল উত্তেজনায় ফুটবে। চিরকুটে কী লেখা আছে? লেখা আছে তাদের মন কেমনের কথা, কষ্টের কথা। লোকটা ধীরে

ধীরে সব পড়বে, তারপর এমন কিছু বলবে যে সবার সব দুঃখ অভিমান বদলে যাবে আনন্দে, সুখে, খুশিতে। কেমন একটা স্বপ্ন স্বপ্ন হয়ে উঠবে বিকেলটা।

সকলে বলবে, 'কাকু তুমি ম্যাজিক জানো!'

লোকটা অমনি টুপি দুলিয়ে আঙুল নাড়িয়ে বলে উঠবে, 'উহু, কাকু না, কাকামশাই।'

এই কাকামশাইয়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয় শোভনের এক নিঝুম দুপুরে। ও সেদিন পালাচ্ছিল বাড়ি ছেড়ে। লকডাউনের জেরে অসহ্য হয়ে উঠেছিল ঘরবাড়ি। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা নেই। যদিও অন লাইন ক্লাস হয়। কিন্তু তাতে কী! টিফিন ভাগাভাগি নেই, স্কুলের সবুজ মাঠে ছোটাছুটি নেই। এই তো সেদিন অন-লাইন ক্লাস চলছিল। হঠাৎ কানে আসে দাদু বনাম ঠাম্মার কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ। রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে দাদুর গর্জন, 'কাল চিলি চিকেনের গন্ধ পেয়েছিলাম। কিন্তু আমার থালায় শুধু পেঁপে সেদ্ধ ছিল কেন? আমি না হেড অফ দি ফ্যামিলি!'

ঠাম্মাও বিকৃত মুখে চেঁচাল, 'চিলি চিকেন কোথায় পাব? এই লকডাউনে তোমার ছেলের ব্যবসা লাটে উঠেছে, সে খবর রাখো?

হঠাৎ শোভন লক্ষ করে মোবাইল স্ক্রিনে ওর বন্ধুদের মুখে টেপা হাসি। তাড়াতাড়ি ও মোবাইলটা মিউট করে দেয়। রান্নাঘর থেকে আবার ছুটে আসে চিৎকার। শব্দগুলো যেন ওর মাথায় হাতুড়ির ঘা দিয়ে চলে। ও মুঠি করে নিজের চুল টেনে ধরে। তারপরেই সিদ্ধান্ত নেয়, আর ঘরে নয়, এবার পালাবে যেখানে দুচোখ যায়।

সেদিনই নিঝুম দুপুরে ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে হনহন করে হাঁটছিল। হঠাৎ মাউথ অর্গানের সুর। কাকামশাই একেবারে মুখোমুখি। শোভন পাশ কাটাতে চাইল, মানুষটা হাত টেনে ধরল। 'কোথায় চলেছ?'

স্কুলের দিকে যাব।

স্কুলের গেটে তো এখন তালা!

তালা থাকুক আর যাই থাকুক স্কুলে আমি আজ ঢুকবই! বলতে বলতে ও একটা ইটের টুকরো হাতে তুলে নিল।

আরে করো কী! শান্ত হও। চলো আমার সঙ্গে ওই আশ্রমতলার মাঠে।

ধুস, ওটা কোনও মাঠ? আগাছার জঙ্গল। মাঠ আছে আমাদের স্কুলে, বিশাল। ধারে ধারে ফুলগাছ। বর্ষায় আমরা সবাই মিলে চারা লাগাতাম।

ঠিক আছে, ওই আশ্রম মাঠেও আগাছা সাফ করে আমরা গাছের চারা পুঁতব। দেখবে স্বর্গের বাগান হয়ে উঠবে। চলো, চলো, দু'দণ্ড কথা বলি ওখানে গিয়ে। দেখবে মন শান্ত নদী হয়ে গেছে।

শান্ত নদী! লোকটা ভারি সুন্দর কথা বলে তো! শোভনের মাথার আগুনটা অল্প অল্প যেন নিভল। ও মন্ত্রমুগ্ধের মতো চলল তার পেছন পেছন। তারপর আকাশমনির তলায় বসে উগরে দিল নিজের ভেতরের জমা কষ্ট।

লোকটা ওর মাথা নিজের বুকে টেনে এনে চুমু দিল। বলল, আমি একটা ম্যাজিক জানি। তোমায় শেখাব? তাহলেই দেখবে তোমার সব কষ্ট ফুড়ুৎ। এক কাজ করো, ছোট এক টুকরো কাগজ নাও, লিখে ফেলো তোমার মন খারাপের কথা। তারপর জমা দাও আমার ঝোলায়। দেখবে ম্যাজিক হবে!

কী ম্যাজিক?

দেখতেই পাবে। ওই মন খারাপের চিরকুটে আমি একটা জাদু কাঠি বুলিয়ে দেব। ব্যাস, তারপরেই শুধু খুশি আর খুশি।

এই কথাগুলো কেন যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে শোভনের। হঠাৎ কাকামশাই মাউথ অর্গানে একটা সুর বাজিয়ে দিল। আরে, এটা তো তাদের প্রেয়ার সং, প্রার্থনা সংগীত। ও গুনগুন করে সঙ্গত করল। আহা, সত্যিই তো, আর সেই গনগনে রাগটা টের পাচ্ছে না তো মাথায়! মনটা কেমন শান্ত নদী হয়ে গেছে।

ব্যাস, সেদিন থেকেই শুরু হল তাদের বন্ধুত্ব। চলল চিরকুট খেলা। ওমা, এ কথা চাউর হয়ে গেল অন্য সব ছেলেমেয়েদের মধ্যে। ব্যাস, সবাই এবার কাকামশাইয়ের জাদু কাঠি বোলাতে চায় তাদের সুখ দুঃখের চিরকুটে।

এরই মধ্যে কাকামশাই একদিন ঘোষণা করল, 'তোমরা এত সুন্দর সুন্দর লেখা আমায় জমা দিচ্ছ, এর জন্য একটা পুরস্কার আছে। শুনবে কী পুরস্কার?

হ্যাঁ, শুনি, শুনি! দলের মধ্যে সব চাইতে ছোট মেয়ে, ঝিল, ক্লাস ফোর, সে রাতদিন চড়ুইয়ের মতো কিচির মিচির করে, সে-ই প্রশ্ন করল।

কোনও একদিন আমরা আলতা নদীর পারে যাব পিকনিক করতে। কিংবা মেঘ পাহাড়ে এক পূর্ণিমার রাত কাটাব।

ঝিল অনেকক্ষণ কুতকুত করে চেয়ে থেকে বলে, আলতা নদী, মেঘ পাহাড়! কেমন অদ্ভুত সব নাম! দাদাকে বলব তো গুগুল দেখতে...।

শুনেই সবার হো হো হাসি।

২

কিন্তু সেদিন আশ্রম মাঠে কেউ এল না। অনেক অপেক্ষার পর কাকামশাই নিজেই চলে এসেছে বসুন্ধরা আবাসনের কাছে। বাড়িটা এমন শুনশান কেন?

গেট খোলা। কাকামশাই সটান চলে আসে ছাদে। দেখে জটলা বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে সকলে। তাকে দেখে সবাই অবাক, একী! তুমি ওপরে উঠে এলে কীভাবে?

পেছনের সিঁড়ি দিয়ে।

ঝিল ভ্রু কুঁচকে বলে, ওই সিঁড়ির কথা তুমি জানলে কেমন করে?

কাকামশাই গম্ভীর, আমায় সব জানতে হয়। তা তোমরা কি আজ আকাশমণিতলায় বসবে না?

ঐশী ঘাড় নাড়ে, না, আমার মন খারাপ। এ পাড়া ছেড়ে চলে যেতে হবে তো। লকডাউনে বাবার চাকরিটা আর নেই। তাই দেশের বাড়ি চলে যাব। যাক, আমার শেষ চিরকুটটা জমা দিয়ে যাচ্ছি। আর তো দেখা হবে না।

৩

কাকামশাইয়ের ঝোলা এখন খুদেদের লেখায় লেখায় টইটম্বুর। সেদিন ক্লাস টেনের মেয়ে, ঐশীর চিরকুট পড়তে পড়তে কাকামশাইয়ের গাল গড়িয়ে জল নামছে। আহা রে, মেয়েটার প্রতিটা শব্দেই যেন কান্নার ফোঁটা। কী সুন্দর লিখেছে—জানো কাকামশাই, রাতভর সেদিন একটা স্বপ্ন দেখলাম। দরজায় ট্যাক্সি দাঁড়ানো। আমরা বাড়ি খালি করে চলে যাচ্ছি। মা চাইছে গোটা সংসারটাকেই ট্যাক্সিতে পুরে ফেলতে। কিন্তু ঠাম্মার হাতে শুধু একটা বেতের ঝুড়ি আর এক মুঠো শিউলি। আঁচলের খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে বলছে, সব কি সঙ্গে নেওয়া যায়? এই একমুঠো শিউলিই শুধু থাক।

একদিন ঝিলও একটা লেখা জমা দিল। অজস্র ভুল বানান—ঘন্টাকাকু, তোমাকে রোজ মনে পড়ে গো। আগে কত বায়না করতাম, বলতাম,

ছুটির ঘন্টাটা একটু আগে আগে বাজিয়ে দাও না প্লিস। কিন্তু এখন দেখা হলে বলব, ছুটির ঘন্টা নয়, স্কুল শুরুর ঘন্টা তাড়াতাড়ি বাজিয়ে দাও, প্লিস।

দিন গড়িয়ে চলেছে। স্কুলে সেই যে তালা পড়েছে আর খোলার নাম নেই। সবাই হাঁপিয়ে উঠছে। শুধু বিকেলগুলোই সবার কাছে একেকটা স্বপ্নের মতো। তবে সবাই এখন অস্থির হয়ে পড়েছে—কবে আলতা নদীর কাছে যাবে আর কবেই বা মেঘ পাহাড়ে রাত কাটাবে?

এরই মধ্যে একটা খুশির খবর পৌঁছল। ঐশীকে নাকি এ পাড়া ছেড়ে যেতে হবে না, ওর বাবা একটা নতুন চাকরিতে বহাল হয়েছে। কাকামশাই শোনে আর হাসে, দ্যাখো, আমার জাদু কাঠির খেল দ্যাখো। ছোঁয়ালাম আর ম্যাজিক হল।

৪

বসুন্ধরার জন্য দশেক কুঁচোকাচা আজ জড়ো হয়েছে আশ্রম মাঠে। কাকামশাই টাইম দিয়েছে বেলা তিনটে। সকলকে নিয়ে সে আলতা নদীর কাছে যাবে। তবে আজ পিকনিক নয়। শুধু একটু ঢু মেরে চলে আসা।

কিন্তু তিনটে পেরিয়েছে সেই কখন! কোথায় কাকামশাই?

হঠাৎ হাওয়ার বেগে ছুটে এল এক সাইকেলওলা। রোগা লিকলিকে চেহারা। একটা খাম হাতে ধরিয়ে আবার ছুট দিল। যেতে যেতে বলে গেল, কাকামশাইয়ের চিঠি। পড়ো। তবে এখানে নয়, বাড়ি গিয়ে। আর এ জায়গা ছেড়ে দ্রুত বাড়ির পথে হাঁটা দাও।

মানে কী? সবাই হতবাক! কাকামশাই আসবে না? তবে যে বলল...।

বিফল মনোরথে সবাই ঘরে ফিরে আসছে। তারপর দুপদাপ ছাদে। দেখা যাক, চিঠিতে কী আছে? এভাবে কেন যে কাকামশাই...।

ঐশীই সবার সিনিয়র। গম্ভীর মুখে চিঠি পড়তে শুরু করল।

আমার প্রিয় স্বপ্নকুঁড়ির দল, প্রথমেই মাফ চেয়ে নিচ্ছি। কথা রাখা হল না। আলতা নদী কিংবা মেঘ পাহাড়, কোথাও তোমাদের নিয়ে যাওয়া হল না।

কিন্তু কেন, কেন? ঝিল চেঁচিয়ে উঠেছে। গলাটা একটু কান্না কান্না।

ঐশী হাত দিয়ে থামায় ওকে, আরে দাঁড়া, পুরোটা পড়তে তো দে! গলা ঝেড়ে আবার চিঠিতে চোখ রাখল ও—তবে আমার বিশ্বাস তোমরা এখন নিজেরাই একটা স্বপ্ন রথে চড়ে সেখানে পৌঁছে যেতে পারবে। একটা কথা আজ স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই, তোমাদের স্বপ্ন দেখাতে দেখাতে অজান্তে কখন যেন আমি নিজেও একটা স্বপ্ন বুনতে শুরু করে দিয়েছিলাম। তাই মিশন শেষের আগেই পালিয়ে যাচ্ছি। নইলে কখন কী অঘটন ঘটে যায়।

অঘটন! শব্দটা পড়েই যেন হোঁচট খেল ঐশী। থামল কিছুক্ষণ, তারপর আবার পড়তে শুরু করল।

আমার সব কথা আজ হয়তো বুঝবে না। আর একটু বড় হতে হবে তার জন্য। তবে একটা কথা মনে রেখো, কখনো হতাশ হয়ো না। দুঃখ আসবেই, পেছন পেছন সুখও। দুঃখ নদীর তলায় তলায় সুখ নদীর চোরা স্রোত বয়ে যায়। চোখে দেখা যায় না, তবে সে আছে। কুল কুল করে বয়ে চলে সবার অলক্ষ্যে। শুধু একটু ধৈর্য আর সময়ের অপেক্ষা।

এসব কী লিখেছে গো কাকামশাই? দুঃখ নদী, সুখ নদী! ঝিল বেশ বিরক্ত।

ঐশী গাম্ভীর্য একই রকম রেখে বলে, তুই এখন বুঝবি না। আর একটু বড় হতে হবে বুঝতে গেলে। দেখলি না কাকামশাই লিখেছেন...

ঝিল কি কম টরটরি! চোখ ঘুরিয়ে বলে, তাই বুঝি! তবে তুমি কী বুঝেছ, সেটা আমায় ফার্স্ট বোঝাও দেখি!

ঐশী মাথা চুলকোচ্ছে, কোনও জবাব নেই মুখে। তারপর একটু ধমকে বলে, অ্যাই থাম তো। আমি বললেও তোর মাথায় এখন ঢুকবে না।

ধমক খেয়ে ঝিলের মুখ গোঁজ। এদিকে ঐশীও মনে মনে বেশ ধন্দে পড়েছে। কাকামশাইয়ের এভাবে তাদের ছেড়ে চলে যাওয়াটা মোটেই মানা যায় না।

সেদিন সন্ধ্যায় টিভিতে দু-দুটো ব্রেকিং নিউজ! দীর্ঘ দিন পর আবার স্কুলের গেট খুলে যাচ্ছে ছাত্র ছাত্রীদের জন্য।

হুররে! একটা উচ্ছ্বাস যেন এপাড়া-ওপাড়া থেকে ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ল বাতাসে। কেউ ছুটল আলমারির মাথা থেকে ব্যাগ নামাতে। কেউ আবার খেলার জুতো খুঁজতে ব্যস্ত। কে জানে সব ঠিকঠাক আছে কিনা! ইঁদুর টিদুর কেটে দেয়নি তো জুতো জোড়া?

কিন্তু তারপরের খবরেই সকলে স্তম্ভিত। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, এক অতি সক্রিয় শিশুপাচার চক্র নাকি এই কলকাতার বুকে জাল বিছিয়েছিল। মাউথ অর্গান বাজিয়ে বাজিয়ে একটা লোক ছোটদের নিয়ে যেত ঘর থেকে দূরে। তারপর নানা গল্পের অছিলায় সেখানে ভুলিয়ে রাখত ওদের। ছক ছিল দু-একদিনের মধ্যেই সে দেশের বাইরে ছেলেমেয়েদের পাচার করে দেবে। কিন্তু মিশন শেষমেশ সফল হয়নি। কেন, তা ধরা যাচ্ছে না। তবে ওই দলের দুজন সাগরেদ ধরা পড়েছে। দলের চাঁইটি এখনও পলাতক।

আজ অনেকদিন বাদে স্কুলের হলুদ বাস এসে দাঁড়িয়েছে বাস স্ট্যান্ডে। ঝিল ছুট দিয়েছে জানলার ধারের সিটে গিয়ে বসবে বলে। পাশে ঐশীদিদিরও জায়গা রাখল।

হঠাৎ ও কান খাড়া করে, তারপর চেঁচিয়ে বলে, আরে শোনো, শোনো, কাকামশাইয়ের মাউথ অর্গান বাজছে। কী শুনতে পাচ্ছ না?

পেছন থেকে কারোর একটা চাপা ধমক ছুটে এল, চুপ! ও দুষ্টু লোক। ওর নাম মুখে আনবি না। যত তাড়াতাড়ি ওকে আমরা ভুলে যাব, ততই মঙ্গল।

কেন ভুলে যাব? ঝিল তড়াক করে দাঁড়িয়ে পড়ল সিট ছেড়ে। ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, কাকামশাই কী সুন্দর আমাদের ম্যাজিক শিখিয়েছে! স্বপ্ন স্বপ্ন খেলা শিখিয়েছে। ওগুলো ভুলে যাওয়া যায়? আমি তো আজকাল ওই ম্যাজিক করেই রোজ চলে যাই মেঘ পাহাড়ে। কী সুন্দর পাহাড়টা! একটু মেঘ আর একটু বরফে ঢাকা।

সবাই ঝিলের কথা শুনছে হাঁ করে। ম্যাজিক করে একেবারে মেঘ পাহাড়ে পৌঁছে যাওয়া? বাব্বা, তাজ্জব ব্যাপার স্যাপার!

ঝিল ঝরঝর করে হাসল আবার, আমার দাদা কী বলে জানো? কাকামশাই আর কক্ষনও দুষ্টু কাজ করতে পারবে না। কারণ কাকামশাই নিজে এখন...

স্বপ্নের ফেরিওলা। সুখ নদীটার সন্ধান সে জেনে গেছে। দুঃখ নদীর তলায় তলায় ওটা বয়ে যায়। স্বগতোক্তির মতো যেন নিজেকে শোনাতেই পাশ থেকে বলে উঠল ঐশী।

স্কুল বাস এখন সাঁ-সাঁ ছুটছে। আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে একটা মিষ্টি সুর। ওটা কি কাকামশাইয়ের মাউথ অর্গান? কে জানে! তবে ঐশী কিংবা ঝিল কিংবা শোভন ওই সুরের মধ্যেই শুনতে পাচ্ছে আলতা নদীর কুলকুল স্রোত, কিংবা মেঘ পাহাড়ের চূড়ায় বসা কোনও একলা পাখির গান। কিশোর ভারতী

কলিপুকুরের পাথর

সঞ্জয় কর্মকার

ছবিঃ ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

মেজাজটা ক'দিন ধরেই বেশ খিঁচড়ে আছে পশুপতি হাঁসদার। ভাগ্যটা হঠাৎ করে এভাবে যে ডিগবাজি খেতে পারে তা দুঃস্বপ্নেও কখনও ভাবতে পারেনি সে!

বাড়ির উঠোনটা কালাহারি মরুভূমির মতো খাঁ-খাঁ করছে এখন। মন্দিরের চাতালে কাঁঠালপাতা চিবোতে চিবোতে ইচ্ছেখুশি চড়ে বেড়াচ্ছে চিরশত্রু প্রতিবেশী সনাতন ঢ্যাংয়ের বেয়াড়া ছাগলগুলো। প্রণামীর বাক্সটাও মওকা বুঝে কোন আহাম্মক যেন তুলে নিয়ে চলে গ্যাছে।

অথচ এই ক'দিন আগেও গমগম করত গোটা তল্লাট। দিন নেই, রাত নেই পিল পিল করে এখানে ছুটে আসত ডাকসাইটে ফিল্মস্টার থেকে হাড়হাভাতে কেপমার সক্কলে! মন্দিরে ঢুকে পাথরটায় স্রেফ একবার মাথা ছোঁওয়ানোর জন্য তারা তিন দিন দু-রাত উপোস থেকে নিজেদের শুদ্ধ করে আনত। যাওয়ার সময় ভ্লাদিমির পুতিনের স্টাইলে হাসি ছড়িয়ে প্রণামীর বাক্সটার ভিতর ফেলে দিয়ে যেত পঞ্চাশ-একশো বা দুশো টাকার কড়কড়ে নোট। তার সঙ্গে প্রসাদ হিসেবে উপরি ছিল নাড়ুর দোকানের উড়ো খই কিংবা ফটিকের দোকানের ক্ষীর দই।

আহা, সে সব প্রসাদ বিতরণ করার চেয়ে একান্তে বসে রসিয়ে রসিয়ে খাওয়ার সুখই ছিল অন্য রকম! শুধু কি তাই, ভোরের সূর্য ওঠার আগে বাসি মুখে ওর পায়ের ধুলো নেওয়ার জন্য গেরস্থের বউ-মেয়েদের মধ্যে কত্ত যে ধুন্ধুমার চুলোচুলি বেধেছে তার ইয়ত্তা নেই। দিগ্বিদিকে তখন একটাই কথা বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে—স্বয়ং বাবা বিশ্বনাথ পশুপতির কাছে ধরা দিয়েছে। না হলে কলিপুকুরের জলে মাত্র একটা ডুব মেরেই এমন পাথর কেউ তুলতে পারে! নিদেনপক্ষে গত তিন জন্মের পুণ্যিফল না থাকলে পশুপতির মতো এমন ফেরেস্তা হওয়া যায় না। আহা, পাথরটা যেন মনের কথা সব বোঝে! ভক্তরা কাছে গেলে ঘুঁটের ছাইরঙা পাথরটা থেকে কোহিনূরের দ্যুতি ছিটকে আসে। একবার তাঁকে ছুঁতে পারলেই সংসারে সুসার গ্যারান্টি। জীবনটাও ফুরফুর করবে ঠিক সাধক রামপ্রসাদের মতো।'

হ্যাঁ, সেই জন্যেই তো একবার ক্রিস্টিয়ান কোলম্যানের গতিতে ছুটতে ছুটতে এসেছিল এই পটাশপুর থানার বড়বাবু গোবর্ধন খামরুই। এসেই গড় হয়ে ওকে প্রণাম ঠুকে বলেছিল, 'বাবা পশুপতি, এবার আমার একটা হিল্লে করে দাও। আসলে, থানার বড়বাবু হলেও পটাশপুর অঞ্চলের কেউই আমাকে ভয় পায় না। এমনকী উঠতি ছিঁচকে চোরগুলোও বাড়ি বয়ে এসে আমাকে দুয়ো দিয়ে যায়। পাড়ার নেড়ি কুকুরগুলোর খেঁকুড়ে দাঁত আমাকে দেখলেই শুলশুল করে। কয়েকবার মোক্ষম কামড় খেয়েওছি। আত্মীয়-স্বজনরা আমার নামে হাঁস-মুরগি পোষে। কিন্তু আর না, এবার আমার শরীরের ভিতর একটু রাগ এনে দাও। তুমি তো স্বয়ং বিশ্বনাথ! তুমি চাইলে একটা গতি ঠিক হবেই হবে।'

বড়বাবুর কথাগুলো শুনে চট করে একটা উপায় বাতলে দিয়েছিল পশুপতি। সকালের টাটকা রোদের মতো একফালি নরম হাসি ছড়াতে ছড়াতে বলেছিল, 'বুঝলি গোবর্ধন, প্রতিদিন খালিপেটে ঢকঢক করে তিন গ্লাস চিরতা ভেজানো জল খাবি তুই। সে জল সেবন করার পর দেশি করলার জুস পান করবি সাত চামচ। তারপর ডানে-বাঁয়ে না তাকিয়ে সোজা ডিউটিতে চলে যাবি। ব্যস, তোর রাগ তখন বুলেট ট্রেনের গতিতে চড়চড় করে বাড়বে।'

পশুপতির উপদেশ ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে পালন করে মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই পটাশপুর থানার বড়বাবু গোবর্ধন খামরুইয়ের রাগ বেড়েছিল বটে। আর সে রাগের বহর এমনই হয়েছিল যে, চুরির রিপোর্ট লেখাতে আসা নিরীহ গেরস্তদেরই উত্তম-কুস্তম পেটাতে পেটাতে বেহুঁশ হয়ে গোবর্ধন নিজেরই সামনের পাটির তিনটে দাঁত রুলের গুঁতো দিয়ে

ভেঙেছে। বাড়ির পোষা রট হুইলারকে অযথা সেই দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বাগে আনতে গিয়ে তার খেসারত হিসেবে ফ্রি-তে দিতে হয়েছে হাট্টুর মালাইচাকির আধসের মাংস।

চরম দুঃখের সময় পরম সুখের দিনগুলোর কথা বড্ড বেশি মনে পড়ে। পশুপতির ভাবনাতেও কিলবিল করে এখন উঠে আসছে হাজারো সুখ-মুহূর্তের ঘটনা। এই তো ক'দিন আগেই এক উঠতি কবি জয়নগরের একজোড়া চটি আর আরামবাগের ধুতি এনে ওর পায়ের ওপর রেখে বলেছিল, 'বাবা পশুপতি, আমি কবিতা লিখে পাবলো নেরুদার মতো ফেমাস হতে চাই। কিন্তু কিছুতেই এঁটে উঠতে পারছি না। তুমি একটা উপায় বলে দাও।'

পশুপতিও আর দেরি করেনি। সেই উঠতি কবির থেকে দেবতার ভোগের খরচ বাবদ পাঁচ হাজার একটাকা প্রণামী নিয়ে বলেছিল, 'গরম জলে রোজ পাঁচশ একটা ডুব দিয়ে চান করার পর মাথা না মুছে কবিতা লিখতে বসবি। দেখবি, সে কবিতা লোকের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। রণে-বনে-জলে-জঙ্গলে সব্বাই তোর কবিতাই স্মরণ করছে।'

সত্যিই সেই উঠতি কবি এখন উজবেকিস্তান থেকে ভাটিকান সব দেশেই ফেমাস। আসলে, সেই কবির লেখা একটা আগুনঝরা জীবনমুখী কবিতা পড়ে হাটে-মাঠে-বাটে বেজায় হুজ্জুতি বেধেছিল। আর তার জেরে খ্যাপাটে জনতা উচিত কর্তব্যবোধে গোটা কুড়ি টোটো পুড়িয়ে দিয়েছিল, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনগুলো থেকে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিতে দিতে উপড়ে নিয়েছিল বসার সিট। বাধা দিতে এলে পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে ছুড়ে মেরেছিল হাসপাতালের মুমূর্ষু রোগীর থেকে তুইয়েবুইয়ে চেয়ে আনা স্যালাইনের শ'দেড়েক বোতল। ফলে পুলিশও নিজেদের মান-ইজ্জত অটুট রাখতে সেই হুজ্জুতির মাস্টার মাইন্ড ওই উঠতি কবিকে জামগাছের সঙ্গে বেঁধে রামধোলাই দিয়ে হাজতে রেখেছিল পাক্কা দু'মাস। আর কবিতাটাও সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে পৌঁছে গেছিল পাবলিকের ঘরে ঘরে।

তবে এই পটাশপুর হাইস্কুলের হেডস্যার ভীষ্মপদ চাকলাদার যেদিন ওর কাছে মুখটা শি-জিং পিংয়ের মতো করে উপদেশ চাইতে এসেছিল সেদিনই ছিল পশুপতির জীবনের সবচেয়ে গর্বের দিন। ভীষ্মপদ স্যার পশুপতির হাতদুটো ধরে বলেছিল, 'আমার একটা উপকার করে দে বাপ পশুপতি। আমার একমাত্র ছেলেটা এই নিয়ে তিন-তিনবার চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। কিছুতেই কাজ হাসিল করে ফিরে আসতে পারছে না। ছেলের এত বড় অধঃপতনে লজ্জায় যে আমার মাথা কাটা গেল!'

পশুপতি তখন মুখটা আমের কুসির মতো কালো করে বলেছিল, 'স্যার, আপনার ছেলেকে রোজ কালমেঘ পাতার পায়েস খাওয়ান। আর মাঝরাতে কাঁচাঘুম ভাঙিয়ে ছাদের কার্নিশে এক পায়ে দাঁড় করিয়ে রাখেন ঝাড়া বাহাত্তর ঘন্টা। দেখবেন, ও ছেলে একদিন বিশ্বব্যাংক ডাকাতি করে দেশের নাম উজ্জ্বল করবে। সঙ্গে আপনারও।'

উপদেশ শুনে ভীষ্মপদবাবু তুষ্ট হয়ে সেদিন পশুপতিকে মুক্তহস্তে দিয়ে গেছিল লেখক গজানন্দ মুলোর লেখা একটা থান ইট ওজনের বই, 'লোভ সংবরণের একশো একটা সহজ উপায়।' বইটা দেখে প্রথমে রাগ হলেও পরে ওই বইটাই মাথার নীচে রেখে পরম আয়েশে দুপুরের ভাতঘুম দিয়েছে ও।

ক'দিন বাদেই লোকমারফত পশুপতির কাছে খবর এসেছিল, হেড স্যারের ছেলে, ওর মায়ের সব গয়নাগাটি আর বাবার পুরোনো একটা হারকিউলিস সাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে চম্পট দিয়েছে। হাজার তল্লাশি করেও নাকি সে ছেলের আর টিকি পাওয়া যায়নি।

এই পাথরের দৌলতেই সমাজে ইদানীং বে-লাগাম খাতির বেড়েছিল পশুপতির। সাহিত্য পাঠের অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে বার্নিং ঘাটের কীর্তন গান সব জায়গাতেই প্রধান অতিথির পদটা ওর জন্য ছিল একেবারে পাকা। বরং কোন জায়গায় আগে যাবে তা নিয়ে সংগঠকদের মধ্যে চলত তুমুল ধ্বস্তাধস্তি যা শেষ পর্যন্ত সরকারি বাস ভাঙচুরে গিয়ে থামত। এমনও হয়েছে, পশুপতির সামান্য হাঁচি-কাশির খবর শুনে মনের বেজায় শোকে ওর কোন এক ছোকরা ভক্ত জো বাইডেনের মতো হাসতে হাসতে নৌকা থেকে ঝাঁপ মেরেছে মাঝ গঙ্গায়। দিকে দিকে ওর মূর্তি বসানোর জন্য মিটিং মিছিল হয়েছে। মূর্তি ব্রোঞ্জের হবে নাকি মাটির, আবক্ষ হবে নাকি আপাদমস্তক তা নিয়ে তর্কাতর্কির জল হাইকোর্ট অবধি গড়িয়েছে।

আহা, এমন একটা ধন্বন্তরি পাথরই কিনা মন্দির থেকে বেমক্কা গায়েব হয়ে গেল! কিন্তু কোন বেউল্লুক নিল পাথরটা! হাজারবার মাথা চুলকেও কোনও কিনারা করতে পারছে না পশুপতি। তার ওপর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে দফায় দফায় বাড়ি বয়ে আসছে পাড়ার লোকজন। এই তো গতকালই নতুলীর মা এসেই মুখটা আষাঢ়ে মেঘের মতো কালো করে বলছিল, 'বিশ্বনাথ এইভাবে সবাইকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল! এদের মন যে বড় পিচ্ছিল। সবই লীলা, বুজলি রে পশুপতি, সবই লীলা! তবে হ্যাঁ, ফিরে তাঁকে একদিন আসতেই হবে। মায়ার টান বড় টান!'

পশুপতি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলেছিল, 'মায়ায় তাকে আর বাঁধতে পারলাম কই। এ সবই আমার পোড়া কপালের দোষ।'

'আঃ, তুই আবার মায়াকে বাঁধতে যাবি কোন আহ্লাদে? যা রাক্ষুসে শিং গরুটার! গেরামের কত লোককে যে ধুনুচি নাচ দেকিয়েচে ওই শিং বাগিয়ে তা আর...'

নতুলীর মায়ের কথাটা শেষ না হতেই পশুপতি এবার ঝাঁঝিয়ে উঠে বলে, 'কী যা তা বকছ! বলি, ঠাকুর-দেবতার মাঝখানে আবার গরু কোত্থেকে এল শুনি?'

'অয় দ্যাকো, আমি তো আমাদের পুব পাড়ার বিশ্বনাথ গোলদারের পোষা গরু মায়ার কতা বলচি। আহা, গরুটার কী বাহারে নাম রেকেচিল বিশু! দিন-রাত কচি কচি জামপাতা খাওয়াত গরুটাকে। কিন্তু কী যে বারমুকো টান বিশুটার! সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে গতকাল রাত থেকে সে তো বেপাত্তা।'

নতুলীর মায়ের কথাগুলো শুনে শরীরের ভিতর চিড়বিড় করছিল পশুপতির। সাতসকালে মশকরা করবার আর জায়গা পায় না! নতুলীর মা চলে যেতেই খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসেছিল পাশের বাড়ির জগন্নাথ ঢালী। কিছুক্ষণ গুম মেরে বসে থাকার পর আকস্মিক খলবল করে জগন্নাথ বলছিল, 'বুঝলি পশুপতি, পাথরেরও যে মন থাকে, আত্মা থাকে তা আরও একবার প্রমাণ হয়ে গেল। নইলে এত অভিমান তাঁর কেন হবে? নিজেই এসেছিল, আবার নিজেই চলে গেল! যাকগে, শোক তাপ মুছে ফেলে তুই বরং আবার জন মজুরের কাজে লেগে যা। আমার নারকেল গাছগুলো এবেলা একটু ঝুড়ে দে দিকিনি। কাজটা হয়ে গেলে দুটো নারকেল তোকে খেতে দেব'খন।'

জগন্নাথ ঢালীর কথাগুলো শুনে বুকের ভিতর হু-হু করে উঠেছিল পশুপতির। তবু কোনও কথার উত্তর দেয়নি সে।

নাঃ, বিকেল প্রায় গড়িয়ে গেছে। একটু পরেই সন্ধে নামবে ঝুপ করে। মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে নান্টুর চায়ের দোকানের দিকে পা বাড়াল পশুপতি। যদি কোনও খোঁজ পাওয়া যায় পাথরটার! ওখানে তো আবার গোটা পটাশপুরের তিলে খচ্চর লোকজন এসে জড়ো হয় রোজ। কথাটা মাথায় আসতেই এবার দ্রুত পা চালাতে শুরু করে পশুপতি।

হাঁটতে হাঁটতে কলিপুকুরের সামনে এসেই পা দুটো আকস্মিক আটকে গেল পশুপতির। আবছা অন্ধকারে কাকে দেখছে ও! হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই তো বলরাম। কলিপুকুরের জলে নেমে কী করছে ও! তাও এই অসময়ে? আরও একটু কাছে যেতেই পশুপতি এবার স্পষ্ট বুঝতে পারল, ঠিক যে জায়গাটা থেকে ও পাথরটা ডুব দিয়ে তুলেছিল ঠিক সেখানেই এখন ডুব দিল বলরাম! কলিপুকুর থেকে পাথরটা পাওয়ার পর ওর পিসতুতো ভগ্নিপতি, হাবাগোবা এই বলরামকেই তো এতদিন একমাত্র সাগরেদ করে রেখেছিল ও! কিশোর ভারতী

লটারি!

শ্যামল চক্রবর্তী

হঠাৎ করে লটারির একটা টিকিট কেটেছে পানের দোকানদার যোগেশ্বর। খেলা রবিবার। সোমবার সকালের খবরের কাগজে রেজাল্ট বেরোবে।

পানখোর শ্যামবাবু সেদিন খুব সকাল সকাল হাজির হলেন যোগেশ্বরের দোকানে। বগলে তাঁর ভাঁজ করা টাটকা খবরের কাগজ। ওড়িশার ভদ্রকবাসী যোগেশ্বর বাংলা পড়তে জানে না। পান সাজতে সাজতে লটারির টিকিটটা বহুদিনের খরিদ্দার শ্যামবাবুর দিকে এগিয়ে দিল যোগেশ্বর।

দেখ তো বাবু, প্রাইজো উঠিল?

না রে, তোর প্রাইজ ওঠেনি। কাগজটার ভাঁজ খুলে নাম্বার মিলিয়ে টিকিটটা পাকিয়ে রাস্তায় ছুড়ে দেবার ভান করলেন শ্যাম হাজরা। উৎকলবাসী জগু অর্থাৎ যোগেশ্বর এক ঝলক দেখে নিয়েছে, পান নিয়ে যাবার পথে দলামোচা পাকানো টিকিটটা ফেলে না-দিয়ে মুঠো থেকে প্যান্টের পকেটে পুরে নিলেন শ্যামবাবু।

বিকেলেই খবর ছড়িয়ে পড়ল—রাজ্য লটারিতে এক লাখ টাকার ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছেন শ্যাম হাজরা। কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে শ্যামবাবুর বাড়ি ছুটল জগু।

আমারো টিকিটো ফিরত দিয়া দাও শ্যামবাবু।

এই নে! একটা দুভাঁজ করা টিকিট জগুর হাতে দিলেন বাবু!

আপোনি আমারো টিকিটো অনেক ভাঁজ করিছেন। সিটা দিন।

এটাই তোর টিকিট। নিজের কাটা দু'ভাঁজ টিকিটটি জগুকে দিলেন ধুরন্ধর হাজরামশাই। প্রাইজ পাওয়া পানের দোকানদার জগুর ইস্তিরি করা লটারির টিকিট তখন শ্যামবাবুর লকারে! চিৎকার করে পাড়া মাথায় করল জগু। লাভ হল না। টিকিটে নাম লেখা থাকে না! টিকিট যার হাতে, প্রাইজ তার পাতে! টিকিট হাতবদলের জাদুতে শ্যামবাবু লাখপতি হয়ে

ছবিঃ নচিকেতা মাহাত

গেলেন! তখন আমরা স্কুলে পড়ি, লাখ টাকা মানে বিরাট ধনী। লাখপতিদের বিরাট কদর সমাজে।

এবার টাটকা গল্প। লটারির টিকিট কাটতে কাটতে শিবু, আমাদের বন্ধু শিবসুন্দর, দু'বছরেই দেউলিয়া হয়ে গেল! আগেকার লটারিগুলো এখন নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। একটিমাত্র লটারি নিত্যদিন কোটিপতি হবার স্বপ্ন দেখায়। কাগজে কোটিপতিদের ছবি দেখে শিবু ওই লটারির টিকিট কাটতে শুরু করে। একটা, দুটো না, একসঙ্গে পাঁচটা টিকিট কাটতে হয় তিরিশ টাকা দিয়ে।

প্রথম মাসেই তিরিশ টাকার টিকিট কেটে এক হাজার টাকার প্রাইজ পেয়ে গেল শিবু! আনন্দে ডিগবাজি খেতে খেতে সেদিন থেকে দিনে কয়েকশো টাকার টিকিট কিনতে শুরু করল। আর কোনোভাবে হবে না, লটারিতে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়ে কোটিপতি তাকে বনতেই হবে! দুর্ভাগ্য শিবুর, আর কোনোদিন হাজার-দু'হাজারের ছোটখাটো পুরস্কারের শিকে পর্যন্ত ছিঁড়ল না!

দেখা হলেই শিবু বলে, 'মাত্র পাঁচটা নম্বরের জন্য দশ হাজারের প্রাইজটা হাতছাড়া হয়ে গেল! এবার ঠিক লেগে যাবে, দেখিস! ত্রিশটা টাকা ধার দে না ভাই। তিন হাজার ফেরত পাবি।'

বারদুয়েক দিয়েছি। পরে ধার চাওয়ামাত্র পিতৃদেবের স্মরণ নিতাম। 'বাবা বলে গেছেন রেসখেলা বা লটারিতে নিজে অংশ নেওয়া বা অন্য নেশাড়ুকে সাহায্য করলে নরকবাস অনিবার্য! মরে নরকে যেতে পারব না ভাই!'

পিতামহ বলতেন, নিয়মিত রেস বা লটারি খেলে যারা, তারা নাকি অতিমাত্রায় ধেরেল! ধার করার ব্যাপারে অতিশয় দক্ষ। আমাদের অফিসের মনোজ, স্ত্রীর শরীর খুব খারাপ, এখনই ডাক্তার দেখাতে হবে বলে কলকাতা থেকে বনগাঁ ছুটে গিয়ে শ্বশুরের থেকে পাঁচ হাজার টাকা ধার করে বাড়ি ফেরে। লটারির টিকিটে সব টাকা উড়িয়ে দেবার পরদিনই মনোজ বহরমপুরের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়র বাড়ি গিয়ে তিন হাজার টাকা ধার করে। আত্মীয় বারবার ফোন করেও মনোজকে পায়নি। যার থেকে টাকা ধার নেয় মনোজ, তার নম্বর সঙ্গে সঙ্গে ফোনে ব্লক করে দেয়!

চারপাশে লটারিয়ানের সংখ্যা যথেষ্ট। অনেকেই রীতিমতো লটারি-বিশেষজ্ঞ! টিকিট কাটার আগে টিকিটের নম্বর নিয়ে এরা প্রচুর গবেষণা করেন। ক্লার্ক বিশুবাবু টিকিট কাটার আগে তীক্ষ্ণ চোখে থরে থরে সাজানো টিকিটগুলোর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। তারপর আচম্বিতে চিলের মতো ছো মেরে এক বান্ডিল লটারির টিকিট তুলে নিয়ে কপালে ছোঁয়ান। টিকিট নিয়ে ফেরার পথে মা কালীর মন্দিরে দু-একটা কয়েন ছুড়ে দিয়ে মন্দিরের শ্বেতপাথরের দেয়ালে গুণে গুণে সাতবার আলতো মাথা ঠোকেন।

সজল ঢালি বাগবাজারে মায়ের ঘাটে গঙ্গাস্নান করে ভেজা কাপড়ে গিয়ে চোখ বুজে বিড়বিড় করে গুরুর নাম নিতে নিতে দুটি টিকিটের গুচ্ছ তুলে নিয়ে বাড়ি ফিরে শুকনো জামাকাপড় পরেন। লটারির টিকিটগুচ্ছ ঢুকিয়ে রাখেন আলমারিতে।

আজ পর্যন্ত লটারিতে একটা টাকাও প্রাইজ পাননি বাদলবাবু। তবে নিয়মিত সবাইকে বলেন খুব তাড়াতাড়ি তার কপাল খুলে দেবে লটারি! জ্যোতিষী নাকি তাঁর হাত দেখে লটারিতে বিশাল টাকা পাবার যোগ তীব্র করতে একটি নীল পাথরের আংটি দিয়েছেন। নিয়মিত লটারির টিকিট কাটতে কাটতে নিঃস্ব হবার আগে বাদল পাল আবার গেলেন সেই জ্যোতিষীর কাছে।

'রাহুর ফাঁড়া কাটাতে আর একটা গোমেদ লাগবে' বলামাত্র মুখে বিশাল এক ঘুসি খেয়ে চেয়ার থেকে পড়ে গেলেন অব্যর্থবাবা। দাড়ি ঝুলে পড়েছে দেখে বাদলবাবু একটানে খুলে ফেললেন বাবার দাড়ি, পরচুলা! কোথায় জ্যোতিষী? এ যে বেলঘরিয়ার অটোওয়ালা পটা! বাদলবাবুকে মারমুখী দেখে জুয়েলারির মালিক বল্টুবাবু শাটার ফেলে পুরো নগদ টাকা দিয়ে আংটি ফেরত নিতে বাধ্য হলেন।

তিন মাসে ত্রিশ হাজার উড়িয়েছি, এই বাটপাড় একটানা লটারির টিকিট কাটতে বলায়। আভি পুরা ত্রিশ হাজার না দিলে কিলিয়ে কাঁঠাল পাকায় দেগা! চিৎকার করছেন বাদল পাল।

একটু শান্ত হোন স্যার। তিনটে ইনস্টলমেন্টে দশ করে পেয়ে যাবেন। এই নিন প্রথম দশ হাজার। টাকা দিয়ে বললেন দোকানের ম্যানেজার হরিপদ দে।

আগে লিখে দিন বাকি দুই ইনস্টলমেন্ট একমাসের মধ্যে কবে কবে দেবেন। আমার নাম বাদল পাল, তিনটে প্রোফাইল ফেসবুকে, একটায় নাম গুন্ডাল্লা বাদল পাল। পাঁচ লক্ষ ফেসবুকার আমার হাতে। বাটপাড়ির পুরো টাকা ফেরত না-পেলে ফেসবুকে দোকানের ছবি দিয়ে ছেড়ে দেব আপনাদের জুয়েলারির কীর্তি! হোয়াটস্যাপের ছাপ্পান্নটা গ্রুপে আছি আমি। একবার অটোওয়ালাকে জ্যোতিষী বানানোর খবর ছড়ালে...!

সর্বনাশ! হরিপদ, এ ভয়ঙ্কর লোক! সবটাই আজ দিয়ে লিখিয়ে নাও। একবার সোশ্যাল মিডিয়ায় খবর ছড়ালে আমার এতকালের ব্যবসা লাটে উঠে যাবে। জুয়েলারির মালিক বল্টুবাবু কাঁপতে কাঁপতে বললেন।

হ্যাঁ স্যার, ইনি তো দেখছি আগমার্কা গুন্ডা! পুরোটাই দিয়ে দিই। নইলে...

নইলে বল্টুকে এমন টাইট দেব...আর হরিপদ, তোমাকে আমি পদভঙ্গ করে শুধু হরি করে ছাড়ব! হুঙ্কার ছাড়লেন বাদল পাল।'

আঙটির পুরো দাম আর নগদ ত্রিশ হাজার ফেরত নিয়ে গটগট করে পাড়ায় ফিরলেন বাদলবাবু। এখন তিন মাস বসে খাবেন। ফেসবুকে তৈরি করে ফেলেছেন 'লটারি হটাও সমিতি'।

দুই

সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় অনেক মানুষকে। ছোট্ট একটা মুদিখানা চালাত সুখীরাম, মোটামুটি চলে যেত তিনজনের সংসার। একদিন এক বিহারি বন্ধুর কথায় তিরিশ টাকা দিয়ে একগুচ্ছ লটারির টিকিট কেটে ফেলল। একটা টিকিটে এক কোটির প্রাইজ লেগে গেল! এত টাকা একসঙ্গে পাওয়ার খবর পেয়ে সর্বনাশ হল সুখীরামের।

দুপুরে বাড়িতে খেতে বসে বিপুল অর্থলাভের খবর পেয়েই খাওয়া ফেলে বড়রাস্তায় গিয়ে অট্টহাসি করতে শুরু করল সুখীরাম। একটু বাদেই হাউ হাউ করে কান্না। বাবার বেচাল বুঝে বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে সুখীকে ঘরে নিয়ে এল ছেলে ভোলা।

চুপচাপ ঘরের খাটিয়ায় শুয়ে আছে ক্রোড়পতি সুখীরাম। একটু বাদেই চিৎকার, 'রামনাম সত্য হায়! জয় শিয়ারাম, জয় জয় শিয়ারাম।' খানিক চুপ থেকে হুঙ্কার, 'তোমরা হামাকে খুন দো, হামি তোমাদের স্বরাজ দিব।'

কেস খারাপ দিকে গড়াচ্ছে দেখে বউ সীতা ডাক্তার ডাকল। ডাক্তার নরহরি দত্ত ঘুমের ইনজেকশন দিতে গিয়ে হাতে সুখীরামের কামড় খেয়ে ফিরলেন। প্রতিবেশী বলাইবাবু সুখীকে দেখতে গিয়ে ওর আঁচড়ে, আলিঙ্গনে বিধ্বস্ত হলেন। বিকেলে রাস্তায় বেরিয়ে লাঠি হাতে পাড়ার সব কুকুরকে তাড়া করে পাড়াছাড়া করে ফিরল সুখী।

পরদিন খবরের কাগজে সুখীরাম ভগতের ছবিসহ এক কোটি টাকা লটারিতে পাবার খবরটা বেরোল। বিকেলে খেলার মাঠে লটারির এজেন্টের কাছ থেকে ট্যাক্সবাদে পুরস্কারের টাকা নিয়ে স্ত্রী, পুত্র যখন বাড়ি ফিরছে, সুখী তখন মাঠের ঘাসে একের পর এক ডিগবাজি খেয়ে যাচ্ছে।

রাতে ভাতের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে খাইয়ে দিল সীতা। ভোরবেলা মন-সারাই নার্সিং হোম থেকে চারজন ষণ্ডা মার্কা লোক এসে সুখীকে তুলে নিয়ে গেল। লটারিতে বিশাল টাকা পেয়ে সুখী থেকে দুখী হয়ে গেল সুখীরাম।

সব চরিত্র, স্থান, কাল, নাম কাল্পনিক।

ছবিঃ কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল

শুভমানস ঘোষ

কে মেয়েটা?

সকালে ঘুমটা ভাঙতেই পায়েল অনুভব করল, মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা। অনেক রাত পর্যন্ত ল্যাপটপে বসে রিপোর্ট করতে হয় অফিসে। পরের দিনের অ্যাসাইনমেন্টও বুঝে নিতে হয়। মাঝে-মাঝে ব্যথা হয় বটে, কিন্তু এমন নয়।

হল কী তার? অ্যাসিডিটি, গ্যাস? কাল রবিবার ছিল। রাতে সৌরভের সঙ্গে মালটিপ্লেক্সে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল। তার পর দামি রেস্তোরাঁয় ঢুকে চর্ব্যচোষ্য ভালোই খ্যাঁটন হয়েছে।

শরীর গরম হয়ে যায়নি তো? না কি, হার্ট অ্যাটাকের পূর্ব লক্ষণ? কিন্তু তার বয়েস মাত্র চব্বিশ। চাকরিতে ঢুকেছে বছর দুইও হয়নি।

সৌরভ তার সিনিয়র। তাই কোভিড সিচুয়েশনেও তাকে রেগুলার অফিস করতে হয়েছে। কিন্তু পায়েল তো ঘরেই আছে। ওয়র্ক ফ্রম হোম। হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক হবে কেন তার?

মাথা চেপে ধড়মড় করে উঠে বসল পায়েল। তার পর মশারি তুলে বেরিয়ে যা দেখল, মাথাব্যথা ভুলে গেল। ঘুম-ঘুম চোখে একজন দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। হাত-পা-মুখচোখে অবিকল তারই জেরক্স কপি। পায়েল তার দিকে তাকাতে সে-ও তাকাল।

পায়েলের ভয়-ডর চিরকালই কম। কিন্তু আজ দেখল ভয় পাচ্ছে। চোখ বিস্ফারিত হচ্ছে। তার দেখাদেখি মেয়েটারও হল।

মাথার কষ্ট কমে এল পায়েলের। ভয়ের চোটে বোকার মতনই শুধোল, 'এ বাবা! এটা কে রে?'

মেয়েটি চেয়ে রইল তার দিকে। কথা না-বললেও মুখের ভাবে বোঝা গেল সে একই প্রশ্ন করছে তাকে।

সঙ্গে-সঙ্গে কাল রাতের মুভিটার কথা মনে হল পায়েলের। তার নাম 'নো ভার্স'। এই ইউনিভার্সে অথবা তার বাইরের লক্ষ-লক্ষ ইউনিভার্সের কোথাও-না-কোথাও সব মানুষেরই ডুপ্লিকেট আছে।

মেয়েটাও কি তাই? অন্য কোনও ইউনিভার্স থেকে টাইম ট্রাভেল করে চলে এসেছে। দাঁড়িয়ে আছে তারই সামনে। তার মধ্যে মিলিয়ে যাওয়ার অপেক্ষা! পায়েল স্ট্রেট নো ভার্স হয়ে যাবে।

নো ভার্স, মানে এমন জগৎ, যে-জগৎ নেই। কোনওকালে ছিল না। হবেও না। ভয়ে কেঁপে উঠল পায়েল। মেয়েটাও কাঁপল।

চাকরিতে এখনও একটা প্রোমোশন হয়নি পায়েলের। সৌরভ তো আছেই, বন্ধু-বান্ধবীও অনেক। মাঝে-মাঝে ট্রেকিংয়ে বেরিয়ে পড়ে তাদের সঙ্গে। হুট করে নো ভার্সে চলে যাওয়ার এটা উপযুক্ত সময় নয়।

তাই ডাকাবুকো মেয়ে হয়েও 'না! না!' করে আর্তনাদ করে পায়েল বাথরুমে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল। নিজেকে কন্ট্রোলে এনে ব্রাশ করে মুখেচোখে-ঘাড়ে জল দিতেই ভয় ভাবটা গেল। বুঝল, ভুল দেখছিল।

কিন্তু না। টাওয়ালে মুখ মুছে বাইরে বেরিয়ে এবার আঁতকেই উঠল। দোতলায় ওঠার সিঁড়ির একধাপ উপরে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। মেয়েটারও মুখধোয়া কমপ্লিট। মুখচোখ ফ্রেশ।

ভয় দ্বিগুণ বেগে ব্যাক করল পায়েলের, 'কে তুমি? কেন ঢুকেছ এখানে?'

মেয়েটি চেয়ে রইল। মুখের ভাবে মনে হল, বেজায় ভয় পেয়েছে।

অন্য সময় হলে 'গেট আউট!' বলে ঠেলে মেয়েটিকে বাড়ি থেকে বের করে দিত পায়েল। কিন্তু সব কিছুই আজ অন্যরকম হচ্ছে। কী করে?

সৌরভ অফিস করে বাড়ি ফিরে সবে শুয়েছে, মোবাইলে তাকেই কল করে বসল।

সৌরভ প্রখর বুদ্ধিমান ছেলে। কাজ বলতে এলইডি টিভিতে রিপ্রেজেন্টেটিভদের অ্যাকটিভিটি তদারকি করা। তা-ও রোজ নয়।

সপ্তাহের শেষে রিপোর্ট দিলেই হল। হাতে অঢেল সময়। নষ্ট না-করে পড়াশোনায় মন দিয়েছে। ভাবুক প্রকৃতির ছেলে।

ভাবুক বলেই সৌরভের মাথাটাও বরফের মতো ঠান্ডা। অফিসের কেউ সমস্যায় পড়লে তার শরণাপন্ন হয়। সে মাথা খাটিয়ে ঠিক একটা-না-একটা পথ বলে দেয়।

ভাবতে-ভাবতে মেয়েটির দিকে মুখ তুলে পায়েল দেখল, সে-ও চেয়ে আছে তার দিকেই।

সৌরভ অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। কয়েকবার রিং হয়ে যাওয়ার পরে ঘুম-জড়ানো গলায় সাড়া দিল, 'কী হল পায়েল? ঘুমোচ্ছি তো!'

'বিশাল ঝামেলায় পড়ে গিয়েছি সৌরভ। আমাকে নো ভার্সে নিয়ে যেতে এসেছে একজন।'

'নো ভার্স!' সৌরভের ঘুম ছুটল, 'কালকের মুভিটার কথা বলছ?'

'হ্যাঁ! হ্যাঁ!' বলে সব খুলে বলতে-বলতে পায়েল তাকাল মেয়েটার দিকে। সে-ও নিঃশব্দে একই কথা বলতে-বলতে তারই দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে।

মন দিয়ে সব শুনে 'স্ট্রেঞ্জ!' বলে সৌরভ শুধোল, 'ঠিক দেখছ? না, হ্যালুশিনেট করছ?'

'চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, কী বলছ! আমার কী হবে সৌরভ?'

'ওয়েট! ওয়েট! তুমি যা ভাবছ আমার মনে হচ্ছে তা নয় পায়েল। মালটিভার্স, টাইম ট্রাভেল নয়, ব্যাপারটা অন্য অ্যাংগেলে ভাবো। আমার মনে হচ্ছে ও তুমিই।'

'আমি! মানে আমার ভূত?'

সৌরভ হেসে ফেলল, 'তুমি কি শিওর মরে গিয়েছ?'

'এ মা! এসব কী বলছ!'

'মরে না-গেলে ভূত হবে কী করে?'

'তা-ও বটে! তবে ওটা আমি হলাম কী করে?'

'ও হল তোমার অটোস্কোপিক পার্টনার। একে বলে অটোস্কোপিক ডাবল্‌স। এ নিয়ে বড়-বড় মনোবিজ্ঞানী কাজ করেছেন। অনেক কেস স্টাডি করেছেন। ফোনটা মেয়েটাকে দাও তো!'

'দিচ্ছি! দিচ্ছি!' বলে বড় করে শ্বাস ফেলে পায়েল মোবাইলটা মেয়েটিকে বাড়াতে যাবে, দেখে মেয়েটাও হাত বাড়িয়েছে তার দিকে। 'না! না!' বলে ভয়ে দু'পা পিছিয়ে গেল। মেয়েটাও পিছোল। সে-ও যেন বলল, 'না! না!'

পায়েলের নার্ভ ব্রেক করে গেল। পড়িমরি ছুটল কিচেনে। কিচেনে মা রান্নায় ব্যস্ত। তাকে দেখে চঞ্চল হল, 'কী হল রে পালু?'

পায়েল হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, 'একটা মেয়ে!'

'কোথায়?'

পায়েল ভয়ে-ভয়ে ঘুরেই অবাক। মেয়েটি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। বোধ হয় থার্ড পার্সনের সামনে দেখা দেয় না। সে সব খুলে বলল। মা হেসে ফেলল। তার মতো শক্ত মনের মেয়ের অবস্থা দেখে উলটে বিশ্রী প্রেসক্রিপশন হাঁকল, 'সকালে আজ কিছু খাসনি। বাবাকে বলছি, ডাবের জল আনতে। দুপুরে আজ তোর স্রেফ ঝোলভাত। কাল ভালোমন্দ হয়েছে। পেট ঠান্ডা না-হলে মাথা ঠান্ডা হবে না তোর!'

'ধ্যাত!' বলে মনখারাপ করে ঘরে আসতেই কোথায় পেট গরম, আবার সেই মেয়েটা! মেয়েটাকে দেখে তার যেমন হল, মেয়েটির চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল।

পায়েল আর রিস্ক নিল না। ছুটল বাবার কাছে।

মা যা বলেছিল, তাতেই কাজ হল। সমস্ত সকাল তাকে আগলে রেখে নিজের হাতে পায়েলকে যত্ন করে ঝোলভাত খাইয়ে মা বলল, 'ঘুমো! আমি আছি তোর পাশে। ভালো করে ঘুমোলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

মা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। দেখতে-দেখতে চোখে ঘুম জড়িয়ে এল পায়েলের। ঘণ্টা আড়াই টানা ঘুমোনোর পরে সৌরভের ফোনে ঘুম ভাঙল তার। দেখল, মা নেই। মেয়েটাও নেই। শরীর ফিট।

'সৌরভ, আমি ভালো হয়ে গিয়েছি।' উৎফুল্ল গলায় পায়েল বলল, 'মেয়েটা ভ্যানিশ।'

'না! ভ্যানিশ হয়নি। ভালো করে দ্যাখো।'

তখনও বিকেল ফটফট করছে। তা-ও ঘরের আলোটা জ্বালিয়ে ঘর দেখল, ঘরের বাইরেটা দেখল। মেয়েটাকে দেখতে পেল না। সবটাই তার চোখের ভুল, মনের ভুল। শরীরটা তার সত্যিই খারাপ হয়েছিল।

সৌরভকে জানাতে সে উলটে বলল, 'উলটো-পালটা নয়, ঠিকই দেখেছ। সাবধানে খাওয়া-দাওয়া করবে। এমনিতেই আজকাল এসি ছাড়া ঘরে টেকা যায় না। পারলে ঘরে একটা এসি লাগিয়ে নাও। ঘর গরম, মাথা গরম, তার উপর শরীর গরম হলে এমন তো হবেই।'

পায়েল রেগে উঠল, 'আমি বায়না করছিলাম?'

'একেবারে বাচ্চাদের মতো।'

'কীইইই!' বলে পায়েল চেঁচিয়ে উঠতেই কোথা থেকে তার সামনে খাড়া হয়ে দাঁড়াল মেয়েটা! 'মা গো!' বলে ফোন-টোন ফেলে থার্ড পার্সন সেই মায়ের কাছেই দৌড়োল পায়েল।

সেদিন রাতে নিজের ঘরে আর একা শোওয়ার সাহস হল না পায়েলের। মায়ের ঘরেই শুয়ে বলল, 'মা! তাড়াতাড়ি এসো।'

মা বলল, 'বাসনগুলো গুছিয়েই আসছি রে।'

পায়েল মোবাইলের ইউ টিউবটা অন করল। ঘুমোনোর আগে এটা তার অভ্যাস। ভিডিয়োর স্ক্রিনে তাকায় না। পাশে রেখে খবর-টবর বা গান-বাজনা শোনে।

মাথা ঠান্ডা করার মিউজিক চালিয়ে চোখ বুজে শুয়ে আছে, কল এল। মোবাইল তুলে দেখল সৌরভ। সৌরভ কয়েকবারই ফোন করেছে তাকে। কিন্তু বিকেলের ঘটনা তাকে চেপে গিয়েছে।

সৌরভ বলল, 'বিকেলেও সে এসেছিল তো?'

'বুঝে গিয়েছ?'

'বুঝব না? 'মা গো!' বলে যেভাবে চ্যাঁচালে, বুঝে নিয়েছি। তোমার কেসটা হাইলি ডেলিকেট। তোমাকে সামলে চলতে হবে।'

'মেয়েটা আসছে কোথা থেকে?'

'বলেছিলাম তো ওটা তুমিই। তোমার ভিতর থেকেই আসছে।'

'ভ্যাট!'

'বিশ্বাস হচ্ছে না? গুগুলে প্যারানর্মাল পেজ খুলে বসে আছি। ওটা নিশ্চিতভাবেই তুমি।'

সৌরভ আসল রহস্য ফাঁস করল। মানুষ মাত্রেরই দুটো দেহ। একটাকে বলে ক্রুড বডি বা দৃশ্যমান শরীর। মৃত্যুর পরে তা শ্মশানে যায়। পুড়িয়ে দিতে হয়। অন্যটা হল সাট্‌ল এনটিটি বা অদৃশ্য দেহ। তাকে দেখা যায় না। মরার পরেও সে দিব্যি থাকে। মানুষ যখন বেঁচে থাকে, তখন রক্তমাংসের মধ্যে আটকে থাকতে ভালো লাগে না তার। শরীর বা মাথা গরম হয়ে গেলে সে বেরিয়েই পড়ে।

পায়েল চমকে উঠল, 'অ্যাঁ!'

'অ্যাঁ নয়, হ্যাঁ। সাট্‌ল এনটিটি সুপার হাই রেজোলিউশনের মেমারি চিপস। তাই বেরোনোর সময় তোমার বুদ্ধি, সাহস, মেজাজ সব নিয়েই বেরোচ্ছে। নইলে কি তুমি ''মাগো!'' বলার মেয়ে? সকলের এসব হয় না। তোমার যখন হচ্ছে বুঝতে হবে, তোমার আত্মা তোমার মতোই ওভার সেনসিটিভ।'

'আশ্চর্য ব্যাপার!'

'আমাদের কাছে আশ্চর্য, যাঁরা পাওয়ারফুল লোক, তাঁদের কাছে নয়। তাঁরা এইভাবে দেহ থেকে বেরিয়ে আকাশে উড়তে পর্যন্ত পারেন। ভাবছি, আমিও ট্রাই করব।'

বলতে বলতে সৌরভ হা-হা করে হেসে উঠল। পায়েলও তার সঙ্গে গলা মেলাল। কিশোর ভারতী

শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য

মুর্শিদাবাদ প্রতাপ

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজধানী মুর্শিদাবাদ। ভাগীরথী বয়ে চলেছে রাজধানীর মাঝখান দিয়ে। নদীর দুই পাড় সাক্ষী কত উত্থানপতনের। কত নবাবের শক্তি, তাকত, শৌর্য, অত্যাচারের কাহিনি এই ভাগীরথী তার গাত্রে বয়ে নিয়ে চলেছে।

১৭৪০ খ্রিঃ গিরিয়ার প্রথম যুদ্ধে সেইরকমই এক বীরত্বের গাথা আজও অবিস্মরণীয়। এই যুদ্ধেই নাসিরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা নবাব মুর্শিদকুলি খানের বংশধর সরফরাজ খানের পতন এবং নবাব আলীবর্দী খানের আফসর বংশের উত্থান ঘটে। চলুন, ঘুরে আসা যাক ১৭৪০-এর গিরিয়ার প্রান্তরে।

১৭৩৮ খ্রিস্টাব্দের শীতের শেষ দিক। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব সুজাউদ্দিন মহম্মদ তাঁর খাস অলিন্দে বসে, সামনে বয়ে যাওয়া ভাগীরথীর সৌন্দর্য উপভোগ করছেন। বড় সুন্দর এই সকাল। দূরে নদীর পাড়ের বনানী থেকে হালকা ঠান্ডা বাতাস বয়ে আসছে। গায়ে কাশ্মীরি জামেওয়ার শাল। পাশে আলবোলায় তামাক। কিন্তু নবাবের ধূমপানের ইচ্ছা নেই। এত সুন্দর সকালেও নবাবের মন ভালো নেই। শরীরটাও বেশ কিছুদিন ধরে জুতের নেই।

বৃদ্ধ-অসুস্থ সম্রাট নিজের বিগত জীবনের কথা ভাবছিলেন। প্রথম জীবনে শ্বশুর, বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খানের অপ্রিয় হওয়ায়, তাকে দিল্লি চলে যেতে হয়। কিন্তু সেখানে ভাগ্যক্রমে আমীর-উল-উমরাহ-খান-ই-দৌড়ানের নেক নজরে পড়েন এবং উড়িষ্যার সুবেদারী লাভ করেন। পরবর্তী কালে নবাব মুর্শিদকুলি খানের মৃত্যু হলে তিনি তাঁর দ্বিতীয় বেগমের পুত্র মহম্মদ নকী খানকে উড়িষ্যার দায়িত্ব ভার দিয়ে রাজধানী মুর্শিদাবাদের উদ্দেশে রওনা হন।

ছবিঃ রঞ্জন দত্ত

সেই সময় তাঁর অপর পুত্র সরফরাজ খান বাংলার মসনদের দখল নিতে পিতার সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পিতা-পুত্রের যুদ্ধের মতো অপ্রিয় ঘটনার অবসান হয় এবং সুজাউদ্দিন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব পদে অভিষিক্ত হন।

উড়িষ্যায় থাকাকালীন তিনি আলীবর্দী খানের সহায়তায় নিজেকে একজন উচ্চপর্যায়ের প্রশাসক হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন। মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তনের আগে তিনি আলীবর্দী খানকে আজিমাবাদের অর্থাৎ পাটনা-বিহারের সহকারী সুবেদার নিযুক্ত করেন এবং তাঁর বহুদিনের সহায়ক এবং পরামর্শদাতা আলীবর্দী খানের বড় ভাই হাজি আহমেদকে মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসেন। সিংহাসনে বসে রাজ্যশাসনের ভার রায়রায়ান আলমচাঁদ, জগৎশেঠ ফতেচাঁদ এবং হাজি আহমেদের উপর ন্যস্ত করে নিজে আরাম-বিলাসে জীবন কাটাতে থাকেন।

বৃদ্ধ নবাব অতীত দিনের স্মৃতিতে হারিয়ে গিয়েছিলেন, বাস্তব জগতে ফিরে এলেন প্রহরীর ডাকে।

'বন্দেগী জাঁহাপনা।'

নবাব জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন প্রহরীর দিকে।

'নবাবজাদা আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থী।'

'পাঠিয়ে দাও।'

সরফরাজ খান অলিন্দে প্রবেশ করে আ-ভূমি নত হয়ে নবাবকে সেলাম করলেন। তারপর নবাবের সামনে হাঁটুগেড়ে বসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আব্বা হুজুর, আজ কেমন আছেন?'

'শরীর নিয়ে চিন্তা করি না। তবে আশঙ্কা হচ্ছে নাদির শাহের আফগানিস্থানে পৌঁছনো এবং সম্রাট মহম্মদ শাহ'র সঙ্গে সাক্ষাৎ নিয়ে। এর ফল সূদরপ্রসারী হতে বাধ্য। আমাদের বঙ্গদেশও এর আঁচ থেকে বাদ যাবে না।'

কিছুক্ষণ থেমে আবার বললেন, 'আমি যদিও আগে থেকেই আলীবর্দীকে দিয়ে বিহারের সীমান্ত এলাকা কর্মনাশায় সৈন্য মোতায়েন করেছি। কিন্তু যদি নাদির শাহ বঙ্গদেশে লুঠতরাজ করতে আসে, তবে সেই বাধা বালির বাঁধ হয়ে যাবে।'

আলীবার্দীর নাম শুনে সরফরাজ খানের মুখের ভার সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। বৃদ্ধ নবাব তা বিলক্ষণ টের পেলেন। তিনি উৎসুক চোখে পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি কিছু বলতে এসেছ?'

নবাবজাদা একটু ইতস্তত হয়ে বলতে শুরু করলেন, 'আব্বা হুজুর, আপনি বিচক্ষণ মানুষ। আগামীদিনের যে বিপদের ভয় করছেন তা হয়তো অমূলক নয়। কিন্তু বর্তমানে কাছের লোকের বিশ্বাসযোগ্যতার কারণে কি বড় কোনো বিপদ আসতে পারে না? আপনি কি জানেন আপনার পুত্র, নকী খান মুর্শিদাবাদ আক্রমণের কথা ভাবছে! যে আলীবর্দী এবং তার ভাইকে আপনি চোখের মণি করে রেখেছেন তারা গোপনে দিল্লি দরবার থেকে আলীবর্দীর জন্য দরবার করে "মহব্বত জঙ্গ" উপাধি লাভ করেছে! একবারও কি এসব আপনার নজরে আনার প্রয়োজন মনে করেছে?'

বলতে বলতে সরফরাজ খান উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ থেমে আবার বললেন, 'আমার মনে হয় সময়মতো ঘর না সামলালে আগামীদিনে নাদির শাহর চেয়ে এই মানুষগুলো আরও বিপদের কারণ হবে।'

নবাব আরামকেদারা থেকে উঠে শান্তভাবে কিছুক্ষণ পায়চারি করে পুত্রের দিকে নিশ্চুপভাবে তাকিয়ে রইলেন। এই পুত্রকে তিনি কখনোই খুব ভরসাযোগ্য মনে করেন না। তিনি বহুভাবে পরখ করে দেখেছেন শাসনকার্য চালাতে গেলে যে বিচক্ষণতার প্রয়োজন হয় সেটা এর নেই। কূটনীতি, রাজনীতি এসবে সে অনভিজ্ঞ। নিজের স্বভাবের কারণে বিশ্বাসযোগ্য লোককেও দূরে সরিয়ে ফেলে। এই উত্তরসূরি তাঁর নাসিরী বংশকে কতদূর রক্ষা করতে পারবে কে জানে?

'নকী খানকে নিয়ে বেশি ভাবার কিছু নেই। আমি জানি তার অভিসন্ধির কথা, কিন্তু আমার বিশ্বাস আমি তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব। তবে আলীবর্দী ও তার বড় ভাই হাজি আহমেদ সম্পর্কে তোমার ধারণা যুক্তিসঙ্গত নয়। এরা আমার বহু দিনের বিশ্বস্ত সঙ্গী। জীবনপণ করে আমার হয়ে যুদ্ধ করেছে, রাজস্ব আদায় করেছে। এদেরকে অবিশ্বাস করে নিজের শত্রু সংখ্যা বাড়িও না। অনেকরকম প্ররোচনা আসবে, স্থির বুদ্ধি বজায় রাখলে তবেই প্রকৃত রাজ্য শাসন হয়। আজ তোমাকে একটা কথা বলি, ভবিষ্যতে রাজ্যশাসনের কাজে তিনজন লোকের পরামর্শ নেবে— রায়রায়ান আলমচাঁদ, জগৎশেঠ ফতেচাঁদ এবং হাজি আহমেদ। আজ আল্লার নামে শপথ করো এর অন্যথা তুমি করবে না।

পিতার কথায় একবাক্যে তাঁর সামনে নতজানু হয়ে নবাবজাদা প্রতিজ্ঞা করলেন, তিনি এই আদেশ কখনও অমান্য করবেন না।

এর কিছুদিন পরে নবাবের মৃত্যু হল। সরফরাজ খান মসনদে বসলেন। নাদির শাহের আক্রমণে দিল্লি শব-নগরীতে পরিণত হল। মুঘল সাম্রাজ্যের ভীত নড়ে উঠল। নতুন নবাবের মনে উক্ত তিনজনার প্রতি অবিশ্বাস আবার দানা বেঁধে উঠল।

চাঘতাই মুঘল সাম্রাজ্য। শৌর্যে, বীর্যে, তাগদে, সামরিক শক্তিতে, ঐশ্বর্য-সম্পদে, বংশ পরম্পরায় সমস্ত ভারত ভূখণ্ডে সূর্যের আলোর মতোই ঝলমলে। এই মোঘল সাম্রাজ্যের বর্তমান শক্তিহীন রূপ জগৎ সম্মুখে প্রকট হয়ে ওঠে ১৭৩৯ খ্রিঃ ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ। ইরানের বাদশাহ নাদির শাহের আক্রমণে মুঘল সম্রাট মহম্মদ শাহ কারনালের যুদ্ধে পরাজিত হলেন। সম্রাট মহম্মদ শাহ তৎসহ প্রধান রাজপুরুষগণ যেমন নিজাম-উল-মুলক, বোরহান-উল-মুলক, উজির কোমরউদ্দিন খান এবং অন্যান্য আমীর ওমরাহগণ বন্দী হলেন। দিল্লির রাজদরবারে নাদির শাহর কাছে মহম্মদ শাহ বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হলেন।

শুরু হল নাদির শাহর অবাধ লুঠতরাজ এবং নৃশংস হত্যালীলা। অবস্থা শান্ত করতে মুঘল সম্রাট মহম্মদ শাহ করজোড়ে নাদির শাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেন। ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে নাদির শাহ লুণ্ঠন সামগ্রী সমেত আবার ইরানে ফিরে যান।

পুব আকাশে এখনো ভালো করে আলো ফোটেনি। প্রাসাদের ছাদে ইরানি গালিচার উপর বসে সেদিকেই তাকিয়ে আছেন নবাব সরফরাজ খান। কিছুক্ষণ আগেই ফজরের নমাজ পড়া শেষ করেছেন। প্রতিদিনের এই সময়টা তিনি একা থাকতেই ভালোবাসেন। সকালে দরবার কক্ষে যাবার আগে চিন্তাভাবনাগুলোকে নিরালায় গুছিয়ে নেন। কয়েকদিন থেকেই মন বড় অশান্ত। গুপ্তচর মারফত খবর এসেছে আলিবর্দী সৈন্যসামন্ত নিয়ে আজিমাবাদ থেকে রওনা দিয়েছেন।

এদিকে প্রয়াত নবাব সুজাউদ্দিনের বিশ্বস্ত তিনজন উজির—রায়রায়ান আলমচাঁদ, জগৎশেঠ এবং বিশেষভাবে হাজি আহমেদদের আর বিশ্বস্ত মনে হচ্ছে না। এরা প্রশাসনের উচ্চপদে নিজেদের আত্মীয় অথবা নিজেদের মনোনীত লোকদেরই রাখার ব্যাপারে উদ্যোগী। রাজস্ব আদায় গত কয়েক বছরের তুলনায় কমতে শুরু করেছে, অথচ সেই অনুপাতে ব্যয়সঙ্কোচ নেই। তারপর আবার নাদির শাহর ফিরে আসার ভয়।

নাদির শাহর দিল্লি আক্রমণের খবর পেয়েই এই তিনজন তাকে এক প্রকার জোর করেই বঙ্গদেশে ইরান সম্রাটের নামে খোতবা আর সিক্কা প্রচলন করিয়েছিলেন। না জানি এই খবর দিল্লিতে পৌঁছলে কী হবে? নবাব ঠিক করলেন আজকের সকালের দরবারেই তিনি এর হেস্তনেস্ত করবেন।

দেওয়ান মঞ্জিলে নবাবের সকালের দরবার বসেছে। উপস্থিত আছেন নায়েব-নাজির, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা। এসেছেন রায়রায়ান আলমচাঁদ,

জগৎশেঠ। প্রসঙ্গ উঠল প্রশাসনিক কাজে ব্যয়বৃদ্ধির। আদায় তফসিল কমে যাওয়া।

হঠাৎ করেই এক রাজকর্মচারী উল্লেখ করলেন, 'ঘোরাঘাট-রঙ্গপুরের প্রজাদের ওপর অত্যাচার করে খাজনা আদায় শুরু হয়েছে। প্রজারা ঘর-বাড়ি, চাষ-আবাদ ফেলে চলে যাচ্ছে। আকবর নগর থেকে রাজস্ব আদায় খুবই কম। এই দুটি জায়গাতেই যথাক্রমে হাজি আহমেদের জামাতা ও পুত্র শাসনকর্তা।'

নবাব সরফরাজ খান এতক্ষণ যেন এই মুহূর্তের অপেক্ষাতেই ছিলেন।

হাজি আহমেদের খোঁজ করায় জানা গেল, তিনি আজ দরবারে উপস্থিত নেই। তাঁর শরীর ভালো নেই। নবাব ব্যঙ্গের সুরে বললেন, 'শরীর আর ভালো যাবে কী করে, একে তো বৃদ্ধ হয়েছেন তার ওপরে অযোগ্য জামাতা আর পুত্রের কারণে মন-বেদনা!'

দরবারে হাসির রোল উঠল। নবাবের পরোক্ষ আশকারায় কয়েকজন অমাত্য হাজি আহমেদকে নিয়ে চটুল মন্তব্য ও ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করতে লাগল। রায়রায়ান এবং জগৎশেঠ দরবারে হাজি আহমেদের মতো একজন সম্ভ্রান্ত উজিরের অসম্মান দেখে নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন।

মুর্শিদাবাদে ভাগীরথীর তীরে হাজি আহমেদের বাগানবাড়ি।

রায়রায়ান শুরু করলেন, 'আজকে দরবারে যে ঘটনা হয়েছে আপনি কি তার খবর কিছু পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ, সবই জানি। নবাব নিজে এই অপমানজনক হাসিমশকরায় ইন্ধন দিয়েছেন। আপনারাই বলুন, এত বছর ধরে এই রাজ্যের খিদমত করে এটাই কি প্রাপ্য ছিল?'

জগৎ শেঠ বললেন, 'নবাব আলীবর্দীকে আর বিশ্বাস করতে পারছেন না, উনি রাজস্ব আদায় কমে যাওয়া এবং ব্যয়বৃদ্ধির ব্যাপারে এখনই ব্যবস্থা চান। দরকার হলে নতুন কিছু লোককে এনে বদল করতে চান পুরোনো স্থায়ী গুরুত্বপূর্ণ পদ।' একটু চুপ করে থেকে উনি অপ্রতিভভাবে বললেন, 'নবাব আজ আমাকে একটু অবজ্ঞা করেই বললেন, আপনার আর রায়রায়ানেরও বিশ্রাম নেবার সময় হয়েছে।'

আলমচাঁদ এতক্ষণ চুপ করে সব কথা শুনছিলেন উনি বললেন, 'নবাবের মনে কী আছে জানি না, তবে উনি যা ইঙ্গিত করছেন, যদি তাই হয়, তবে এতদিনের আমাদের পরিশ্রম, আন্তরিকতা সবকিছু তো বিফলে যাবে। রোজগার হারিয়ে আমরা এবং আমাদের আত্মীয়স্বজনরা তো পথে বসব! হাজি সাহেব আপনি আমাদের মধ্যে বয়ঃজ্যেষ্ঠ, আপনিই এর একটা উপায় বাতলান।'

এক ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রের সূচনা হল সেই রাতে। পরিকল্পনা হয়, নবাব সরফরাজউদ্দিনকে তার নিজের ফাঁসেই জড়ানো হবে। নবাব যে নাদির শাহের নামে বঙ্গদেশে খোতবা ও সিক্কা চালু করেছিলেন, সেই সংবাদ দিল্লির সুলতানকে জানানো হবে। এবং সেই অপরাধে নবাব সরফরাজ খানের মৃত্যু পরোয়ানা আনা হবে। একই সঙ্গে আলবর্দী খানের নামে সনদ নিয়ে আসা হবে, যেন তাঁকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবেদার নিয়োগ করা হয়।

আলীবর্দী খান সৈন্যসমেত আকবর নগরের (বিহার-বাংলার সীমান্ত—রাজমহল) ঘাঁটি স্থাপন করবেন এবং সুযোগ বুঝে তিনি মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করবেন। হাজি আহমেদের জামাতা আকবর নগরের সুবেদার আতাউল্লা খানের দায়িত্ব হবে সেখানে সৈন্য জমায়েতের কথা মুর্শিদাবাদের কাছে গোপন রাখা।

তারপর এই ষড়যন্ত্রকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য এই তিন উপদেষ্টা সবরকম চেষ্টা শুরু করে দিলেন। প্রশাসনিক ব্যয় হ্রাসের অজুহাতে নবাবের কাছে দরবার করলেন সৈন্য সংখ্যা কমিয়ে দেবার জন্য।

অস্থিরমতী নবাব আবার এদের কথা বিশ্বাস করে নিজের পরিকল্পনা কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখলেন। কিন্তু তার সবচেয়ে বড় ভুল হল অধিক পরিমাণে সৈন্যসংখ্যা কমানো। সেই সুযোগে হাজি আহমেদ বাতিল হওয়া সৈন্যদের ধীরে ধীরে আকবর নগরে আলীবর্দী খানের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কিছু সৈন্যকে উৎকোচ এবং উপঢৌকনের লোভ দেখিয়ে গোপনে মুর্শিদাবাদেই বহাল রাখলেন, যাতে সময়মতো আলীবর্দীর সৈন্য মুর্শিদাবাদে আসলে তারা নবাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে।

এদিকে আলীবর্দী খান নিঃশব্দে তিলিয়াগড়ী ও শিকরীগলী গিরিপথ অতিক্রম করে, বঙ্গদেশের সীমান্ত আকবর নগরে বিপুল পরিমাণ আফগানি ও বাহালিয়া সৈন্য নিয়ে হাজির হলেন। গুপ্তচর মারফত নবাবের কাছে হাজি আহমেদ এবং আলীবর্দী খানের ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ হল। তিনি হাজি আহমেদ এবং তাঁর আত্মীয়বর্গকে গ্রেফতার করলেন। তিনি নিজ পুত্র মীর্জা আমানী ও সেনাপতি ইয়াসী খানকে মুর্শিদাবাদ নগর ও দুর্গ রক্ষার ভার দিয়ে, সৈন্য সহযোগে খামরায় এসে অবস্থান করে রসদ সংগ্রহ করতে লাগলেন।

নবাব তাঁর বহুদিনের সহচর গওসউদ্দিন খান এবং মীর সরাফউদ্দিনকে অগ্রগামী সেনাদলের অধিনায়ক মনোনীত করে তাদেরকে গিরিয়া প্রান্তরের নদীর পারে কিছু সৈন্যসহ অবস্থান করতে নির্দেশ দিলেন। নিজে আপন জামাতাদ্বয়, ফৌজদার সুজাকুলি খান, সেনাপতি মীর হাবিব, তোপখানার সর্দার পর্তুগিজ পাঞ্জা সহ বিরাট সেনা নিয়ে নদীর অপর পারে শিবির স্থাপন করলেন। এবং কিছু দূরে খামরাতে রাজপুত সেনানায়ক বিজয় সিংহের তত্ত্বাবধানে কিছু সেনাকে রেখে গেলেন।

আলীবর্দী খানের বিশাল সেনা সুতীর মোহনায় এসে শিবির স্থাপন করে, দাদা হাজি আহমেদের গ্রেপ্তারের খবর পেয়ে চিন্তিত হয়ে উঠলেন।

গিরিয়া প্রান্তরে নবাব সফররাজ খানের শিবির। সকালের নমাজের পর তিনি কয়েকজন সেনাধ্যক্ষ এবং পর্ষদকে নিয়ে সভায় বসেছেন। উপস্থিত আছেন রায়রায়ান আলম চাঁদ, বিশস্ত সহচর সুজাকুলি খান এবং খাজে বসন্ত।

গত রাতে আলীবর্দী খান নবাবের উদ্দেশে এক আবেদনপত্র পাঠিয়েছেন। তিনি কাতরভাবে নবাবের কাছে প্রার্থনা করেছেন, তার সহোদর এত বছর নবাবের পিতার এবং নবাবের সেবা করার পরেও সম্মানহানিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। তাঁর বয়স হয়েছে, তাঁকে উদ্ধারের উদ্দেশেই এখানে তাঁর আগমন। তাঁর এই সৈন্য সমাবেশ কোনও অসৎ উদ্দেশে নয়। নবাব তাঁর প্রভু, তিনি তাঁর দাস। এই দাস তাঁর প্রভুর সাক্ষাৎ এবং দোয়ার ভিখারি। সাক্ষাৎ শেষে নবাবের শুভ কামনাকে পাথেয় করে তিনি নিজের বড়ভাই এবং আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে চলে যাবেন। সৈন্যরা সব এখানেই রয়ে যাবে।

এই শুনে রায়রায়ান বললেন, 'এখন আমাদের সবার আগে আলবর্দীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা চাই। হাজি আহমেদ বেঁচে থাকল কি মারা গেল এতে কি কিছু যায় আসে? এখন তাকে দয়া দেখানো উচিত। পরে সময়মতো সুযোগ বুঝে আলবর্দী এবং তার বড়ভাইকে শেষ করা যাবে।'

এই প্রবোধবাক্য অপরিণত নবাব বিশ্বাস করলেন। স্থির করা হল সুজাকুলি খান এবং খাজে বসন্তকে হাজি আহমেদের সঙ্গে আলীবর্দীর শিবিরে পাঠানো হবে। আলীবর্দীর গোপন উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করে তারা ফিরে আসবেন।

শিবিরে ফিরে গিয়ে নির্বোধ দূতগণ জানালেন আলীবর্দী খানের নবাবের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং বিশ্বস্ততা অকল্পনীয়। গুপ্তচর

এই সংবাদে নবাব নিশ্চিন্ত হয়ে যুদ্ধের উদ্যোগ বন্ধ করলেন।

মারফত আলীবর্দী খানের শঠতার কথা জানতে পেরে, নবাবের বিশ্বস্ত অনুচর গওসউদ্দিন খান এবং মীর সরাফউদ্দিন ওপার থেকে নদীপার হয়ে নবাবের শিবিরে এসে তাঁর আসন্ন বিপদের কথা নবাবকে জানালেন, তিনি তাদের সদুপদেশ গ্রাহ্য করলেন না। উল্টে তাদের ভর্ৎসনা করে তাড়িয়ে দিলেন।

তারা বিমর্ষমনে আপন শিবিরে ফিরে গেলেন। কিন্তু স্থির করলেন, তখন থেকে তাদের আরও সজাগ থাকতে হবে। যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। হায় নবাবের নিয়তি! নিদ্রামগ্ন ব্যক্তিকে জাগানো সম্ভব, কিন্তু যে জাগ্রত অবস্থায় নিদ্রা যায়, তাকে জাগানো ভগবানেরও অসাধ্য।

গিরিয়ার যুদ্ধে অদূরদর্শী নবাব সরফরাজ খানের কিছু সেনানায়কের অবদান চিরভাস্বর হয়ে আছে। তারা আপন প্রাণ বাঁচাতে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেনি। উপরন্তু নবাবের মর্যাদারক্ষার্থে নিজের প্রাণের মায়াও ত্যাগ করেছিল তারা। এই যুদ্ধের অন্তিমলগ্ন এক বালকবীরের সাহসিকতায় অমর হয়ে আছে। বঙ্গদেশের সেই স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস মুছে যাওয়ার নয়। সে ছিল রাজপুতবীর বিজয় সিংহের নবম বর্ষীয় সন্তান জালিম সিংহ।

অপরাহ্নে নবাব-শিবির থেকে বিফল মনোরথ হয় ফেরার সময় গওস খান স্থির করেন একবার খামরাতে গিয়ে সেখানকার সেনানায়ক রাজপুতবীর বিজয় সিংহকে সতর্ক করে আসবেন। আসন্ন আক্রমণের জন্য তিনি কতটা প্রস্তুত সেটাও দেখা দরকার। এই আসন্ন বিপদে একজোট হওয়া প্রয়োজন।

শিবিরে প্রবেশের মুখে গওস খান দেখলেন কিছু অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্য শিবির পাহারা দিচ্ছে। শিবিরের অদূরে কিছু বড় গাছে মাচা বাঁধা রয়েছে, প্রহরীরা সেখান থেকে দূরে সতর্ক দৃষ্টি রাখছে। বিজয় সিংহ কোমরে হাত রেখে তাঁর তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর দৃষ্টি ঠিক সামনের একটা ছোট মাঠে নিবদ্ধ। সেখানে এক বালক দুজন প্রহরীর সঙ্গে তরবারির কসরৎ করছে। প্রহরী দুজন তাকে আক্রমণ করছে, কিন্তু অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় সে সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করছে।

বালকের তরবারিটিও অদ্ভুত ধরনের, দু-দিকে তীক্ষ্ণ ধারওয়ালা সোজা তরোয়াল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বালকের তরবারির আঘাতে প্রহরী দুজনের হাত থেকে তাদের অস্ত্র মাটিতে পড়ে গেল। আশপাশের সৈন্যগণ বাহবা দিয়ে উঠল।

গওস খান বিজয় সিংহের সামনে এসে দাঁড়ালেন। দুজনে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন। গওস খান জিজ্ঞাসা করলেন, 'বালকটি কে?'

'আমার পুত্র, জালিম।'

'অপূর্ব রণকৌশল! এত কমবয়সে এমন দেখা যায় না।'

জালিম কাছে এসে দাঁড়াতেই, গওস খান তার মাথায় হাত রাখলেন। তার মুখে বালকসুলভ কমনীয়তা আছে বটে, কিন্তু তার চোখদুটো নজর কাড়ে। দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর।

সন্ধ্যা নেমে এল। আলোচনায় দুজনেই একমত হলেন—ধূর্ত আলীবার্দী শীঘ্রই আক্রমণ করবে, যুদ্ধের আর বিশেষ দেরি নেই। নিজ নিজ শিবিরে ফিরে যাওয়ার আগে দুজনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন—আলীবর্দীর আক্রমণের উচিত জবাব যুদ্ধক্ষেত্রেই দেবেন।

অন্যদিকে সেই রাতেই আলীবার্দী যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হলেন। সেনাধ্যক্ষ সহমত জং এবং মুস্তাফা খানের অধীনে এক বিরাট সেনাদল নিয়ে শত্রু শিবিরের দক্ষিণ দিকে নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগলেন। অপর এক সেনানায়ক রঙ্গলালের অধীনে অধিক সংখ্যক ফৌজকে মোতায়েন করলেন নদীর অপর প্রান্তের গওস খানের সৈন্যদলকে প্রতিহত করার জন্য।

রাতের শেষ প্রহরে আলীবর্দী তাঁর সৈন্য নিয়ে নবাবের শিবির আক্রমণ করলেন। তাঁর কামানের গোলায় চারদিক কেঁপে উঠল। নবাব শিবিরের নিদ্রামগ্ন সৈন্যদল এই হঠাৎ আক্রমণ প্রতিহত করতে পারল না। ছত্রভঙ্গ হয়ে সবাই শিবির ছেড়ে পালাতে শুরু করল। এরই মধ্যে নবাবের কিছু সংখ্যক সৈন্য আলিবর্দীর সৈন্যদের প্রতিআক্রমণ করল।

নবাবের তখনও ঘোর কাটল না। তিনি আক্রমণের কথা বিশ্বাসই করলেন না। কিন্তু যখন সত্যিই বুঝলেন আলীবর্দীর সেনা তাঁর শিবির আক্রমণ করেছে তখন নিজে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে, হাতির পিঠে উঠে যুদ্ধযাত্রা করলেন। অল্প কিছুক্ষণেই মধ্যেই তাঁর নিজেরই এক বিশ্বাসঘাতক সৈন্যের ছোড়া বল্লম তাঁর মাথায় এসে লাগে। তিনি হাতির পিঠেই মৃত্যুবরণ করেন। এই সংবাদে তাঁর অবশিষ্ট সেনাদল যে যেদিকে পারল পালাতে লাগল।

অপরদিকে গওস খান ও মীর সরাফউদ্দিন রঙ্গলালের সৈন্যদলকে আক্রমণ করেন। এবং অনায়াস দক্ষতায় রঙ্গলালকে বধ করে, নদীর অপর পারে গিয়ে আলীবর্দীকে আক্রমণ করেন। আলীবর্দীর আফগান সেনারা তাদের ঘিরে ধরলেও গওস খান অসামান্য দক্ষতায় যুদ্ধ করেন। অপর পক্ষের বহু সেনা নিকেষ করে তাঁর দুই পুত্র বাবর ও কুতুবসহ যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ বিসর্জন দেন।

যুদ্ধের অন্তিম লগ্ন উপস্থিত হল। জয়ের আনন্দে আলীবর্দীর সৈন্যরা দামামা বাজাতে শুরু করল। কিন্তু ঘটনার তখনও কিছু বাকি ছিল। প্রভুর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে খামরা থেকে বিজয় সিংহ ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হলেন। তাঁর বালক পুত্রও তাকে অনুসরণ করে, কয়েকজন ঘোড়সওয়ার সেনার সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হল। বিজয় সিংহ শত্রুব্যূহ ভেদ করে বল্লমের আঘাতে আলীবর্দীকে হাতির পিঠ থেকে ধরাশায়ী করে, পুনরায় আঘাত হানার জন্য তৈরি হলেন। কিন্তু সেই সুযোগ আর তিনি পেলেন না। নিকটবর্তী এক সেনার অসিতে তাঁর বক্ষস্থল বিদীর্ণ হল।

হঠাৎ বিদ্যুৎ বেগে কোথা থেকে ছুটে এসে বালক জালিম সিংহ পিতার মৃতদেহ আড়াল করে দাঁড়াল। শত্রুপক্ষের সেনারা তাকে চারপাশ থেকে বেষ্টন করে আক্রমণ করতে লাগল। অসামান্য দক্ষতায় অসি চালনা করে সে সকল আক্রমণ প্রতিহত করতে লাগল।

দূরে দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে আলীবর্দী সেই অসাধারণ সাহসী বালকের রণনৈপুণ্য প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন। এদিকে এক আফগান সেনা তরোয়াল উঁচিয়ে জালিম সিংহকে আঘাত করতে উদ্যত হল। ছায়া দেখে তার উপস্থিতি অনুভব করে নিজের মাথার পিছনে ঢাল এনে সেই আঘাতে বাধা দিল জালিম। ক্ষিপ্র গতিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে সেই আক্রমণকারীর জানুদেশে তরোয়ালের আঘাত হানল। নিমেষে একহাত দূরে ছিটকে পড়ল সেই যুদ্ধবাজ।

নিজের অজান্তেই আলীবর্দীর মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'সাব্বাস'। পরক্ষণেই অন্য সেনারা তাকে আঘাত করতে এলে আলীবর্দী চিৎকার করে উঠলেন, 'খবরদার! একে কেউ আর আঘাত করবে না।'

তারপর তিনি সেই বালকের সামনে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বলো, তুমি কী চাও?'

জালিম সিংহের চোখ দিয়ে তখন আগুন ঝরে পড়ছে। সে দৃঢ় কণ্ঠে জানাল তাঁর পিতার মৃতদেহের যেন কোনও অসম্মান না করা হয়। মর্যাদার সঙ্গে তাঁর মৃতদেহের সৎকার করতে চায় সে। তক্ষুনি আলীবর্দী তাঁর হিন্দু সেনাদের সেইমতো আদেশ দিলেন।

ভাগীরথীর তীরে সেই বালক নিজে সমস্তক্ষণ পরিচালনা করে, তার পিতার অন্তিম সজ্জা সাজিয়ে দিল। এবারে তার শিশুসুলভ মন আর বাধা মানল না। এতক্ষণ যে দৃঢ়তায় সে তার আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছিল, বাঁধভাঙা চোখের জলে তা দু'চোখ বেয়ে ঝরে পড়ল। চিতায় শোয়ানো পিতার গলা জড়িয়ে সে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করে চিৎকার করে উঠল, 'বাবুজীই...ই!' কিশোর ভারতী

গুবলের ব্রিগেডিয়ার বড়মামার দাপটে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়। কিন্তু সেই বড়মামাকেই রীতিমতো নাজেহাল করে ছাড়ছে এক হুলো বিড়াল। পায়েস, মাছভাজা থেকে শুরু করে মাখা সন্দেশের বাটি পর্যন্ত সাফ করে সে প্রতিদিন পিঠটান দিচ্ছে। হুলোর এই সার্জিকাল স্ট্রাইক মানতে পারছে না বড়মামা। সমস্যার সমাধানে গুবলে ডেকে আনে বিড়াল স্পেশালিস্ট বকাইদাকে। তারপর কী হয়?

হতচ্ছাড়া হুলো, ধরতে পারলে তোর ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব।

ঝপাং

তাহলে দেরি না করে এক্ষুনি বকাইকে নিয়ে আয়। যাকে বলে 'শুভস্য শীঘ্রম'।

কিছুক্ষণ পরে
বড়মামা, বকাইদাকে নিয়ে এসেছি। ধরে নাও তোমার প্রবলেম সলভড। এবার যা বলার বলো।

বকাই, তুই যদি হতচ্ছাড়া হুলোটাকে ভাগাতে পারিস, তাহলে তোকে পাঁচশো টাকা দেব আর এক হাঁড়ি রসমালাই খাওয়াব।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই আপনার কাজ হয়ে যাবে। তবে হুলোর টোপ হিসেবে দু'পিস মাছভাজা দিতে হবে। আপনি রাজি তো?

আলবাত রাজি। হুলোকে ভাগাবার জন্য আমি সাহারা মরুভূমি, এমনকী ভারত-চীন বর্ডারেও যেতে রাজি।
ওকে বস।

সেদিন রাত্রে
বকাইদা, এই নাও হুলোর মাছভাজা।

হুলো সোনা, তোকে তোর পছন্দের মাছভাজা দিয়েছি। খেতে আয়।
মিঁয়াও

অবাক কাণ্ড,
হুলো বকাইদার
কথা শুনছে।
এবার মনের
আনন্দে মাছভাজা খা।
কোনো ভয় নেই।
হুলো এসে পড়ে
কচ্-কচ্-কচ্.....

শুবলে, আমি হুলোকে পটিয়ে ফেলেছি।
এখন আমি যা বলব বাধ্য ছেলের মতো
হুলো তাই শুনবে।
আরিব্বাস,
তুমি তো ভেল্কি
দেখালে বকাইদা।

চলো, বড়মামাকে
সুখবরটা দিয়ে আসি।
তাই চল।

বড়মামা, বকাইদা হুলোকে ম্যানেজ
করে ফেলেছে। কাল সকালেই হুলোকে
অন্য জায়গায় চালান করে দেবে।

আনন্দে আমার নাচতে ইচ্ছে করছে। বকাই
তোর জন্য রান্নাঘরে এক হাঁড়ি রসমালাই রেখে
দেব। হুলোকে নির্বাসনে পাঠিয়ে আয়েশ
করে খাবি।
থ্যাঙ্ক ইউ,
ব্রিগেডিয়ার।

পরদিন সকালে
হুলোকে ভালো ভালো খাবারের লোভ দেখিয়ে পটিয়েছি। চলিরে, গুবলে।

ওকে চালান করে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো বকাইদা। দুগ্গা,দুগ্গা।

সাতসকালে বিড়ালকে ব্যাগে নিয়ে কোথায় চললি, বকাই?
রাস্তায়

হুলোকে পটলডাঙায় চালান করতে যাচ্ছি, মিত্তিরকাকু।

ওরা কিন্তু ফলো করে বাড়িতে ফিরে আসে। কথাটা মনে রাখিস।
সেটি আর হচ্ছে না।

বাছাধনকে পটলডাঙার এমন কানাগলিতে রেখে আসব সেখান থেকে সারাজীবন ফিরতে পারবে না।

আধঘন্টা পরে
পটলডাঙার কানাগলিতে এসে গেছি। হুলো সোনা, এখন থেকে তুই এখানেই থাকবি। আর খিদে পেলে কারোর বাড়িতে ঢুকে পড়বি।
মিয়াঁও

আমি এখন চলি। টাটা, টাটা

খিদেয় পেটে ছুঁচো ডন মারছে। এক্ষুনি গিয়ে রসমালাই খেতে হবে।

কিছুক্ষণ পরে
গুবলে, আমি হুলোকে পটলডাঙার কানাগলিতে ছেড়ে দিয়ে এসেছি। ও আর ফিরতে পারবে না।

দশ মিনিট পরে
এখন আমি বড়মামার বাড়িতে রসমালাই খেতে ঢুকছি। তুই জলদি চলে আয়।

রান্নাঘরে ঢুকে
ওই তো আমার রসমালাইয়ের হাঁড়ি। এবার জমিয়ে রসমালাই খাব।

একি, আমার রসমালাই
কে সাবাড় করে দিয়েছে?
মিঁয়াও

হুলো, তুই এখানে কী করে
এলি? আমি তো তোকে পটলডাঙায়
পাচার করে এসেছিলাম?

মিত্তিরকাকু বলল, হুলো তোমাকে ফলো
করে ফিরে এসেছে। অর্থাৎ, তুমি ডাহা
ফেল, বকাইদা।

ওই তো বড়মামা
আর মিত্তিরকাকু
এসে গেছে।

হুলো বুদ্ধিতে বকাইকে
ঘোল খাইয়ে ছেড়েছে।

তাই রসমালাইয়ের বদলে বকাই
এখন ঘোলের শরবত খাবে। আর
বুদ্ধির গোড়ায় শান দেবার জন্য
খাবে কাঁচা বাদাম।
এ্যাঁ!
শেষ

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়

আলোর মানুষ

ইতিহাস সুরভিত এই উপন্যাসের সময়কাল পনেরো ও ষোলো শতক, পটভূমি বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যা। উপন্যাসটির প্রথম পর্ব 'আলো ফুটল' ২০০১ সালের শারদীয়া কিশোর ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেই কাহিনিতে নবদ্বীপের এক দুঃসাহসী ছেলের স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সামান্য আভাস দিতে চেষ্টা করেছি। মধ্যযুগে, যখন জাতপাত, আচার বিচার, অস্পৃশ্যতার অভিশাপে বাঙালি হিন্দু সমাজ অন্ধকারে ডুবে আছে, সেই সময়ে কুলীন ব্রাহ্মণ বংশে জন্মেও ছেলেটি একরোখা এবং প্রতিবাদী। সে চায় জাতপাতের বেড়া ভেঙে চুরমার করে দিতে, ভালোবেসে বুকে টেনে নিতে চায় শূদ্র চণ্ডাল অস্পৃশ্য যবন সকল জাতের মানুষকে।...

প্রায় বাইশ বছর পরে লেখা এই উপন্যাসের দ্বিতীয় ও অন্তিম পর্বে সেই ছেলেটিই সন্ন্যাস নিয়েছে, বেরিয়ে পড়েছে নিশ্চিন্ত জীবন, সুখের ঘর—মা ও স্ত্রীকে ছেড়ে। গার্হস্থ্য জীবন তার জন্য নয়। সে চায়, সব ধর্ম ও জাতের মানুষকে প্রেম, ভক্তি ও মাধুর্যে নতুন মতবাদের আদর্শে সংঘবদ্ধ করতে। পরমপ্রভুর উপাসনা, তাঁর নাম সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে ভেদাভেদহীন আনন্দময় সমাজ প্রতিষ্ঠা তার একমাত্র লক্ষ্য। তারপর ?...

ছবিঃ মৃণাল শীল

১
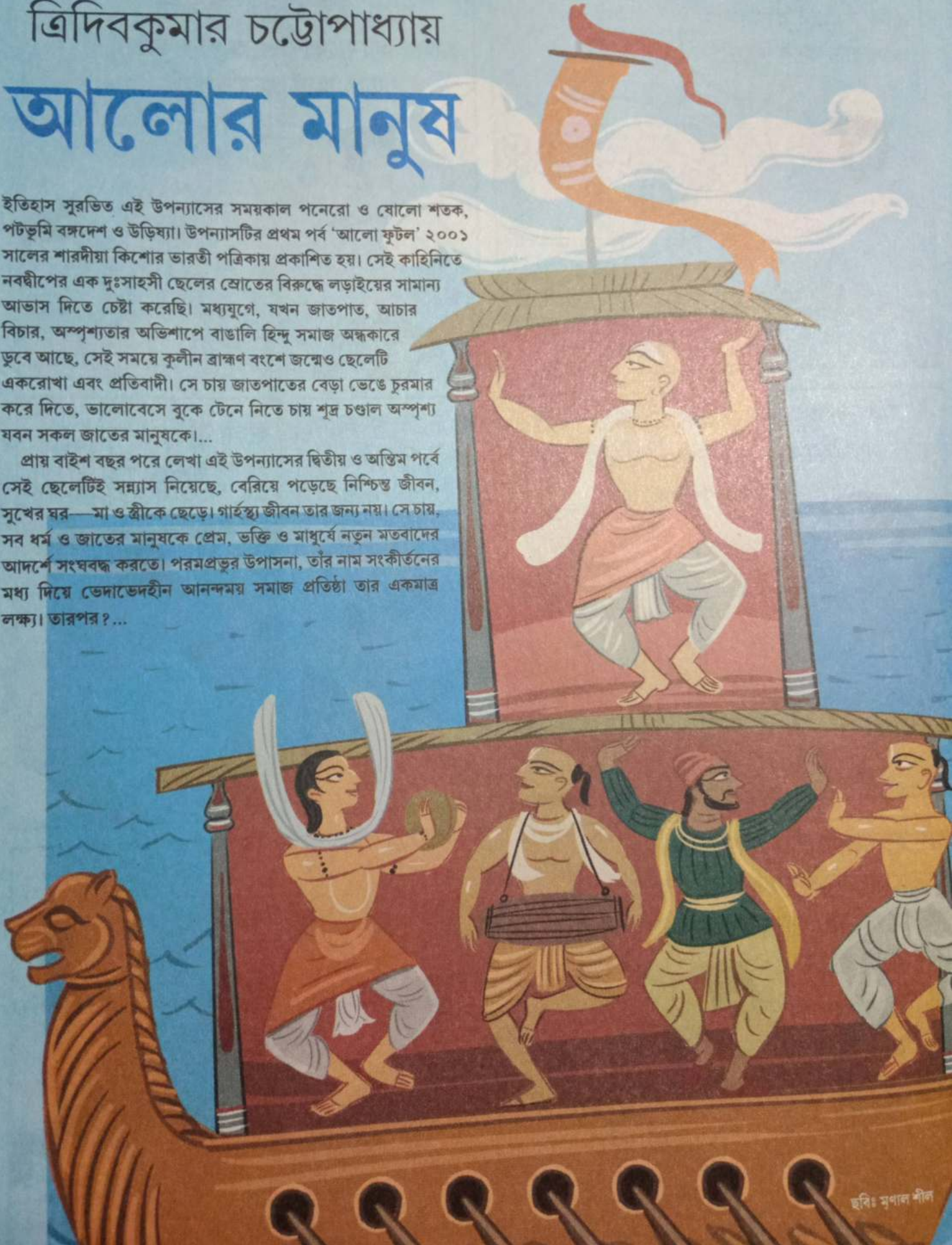
মা...

মা... মাঃ...আঃ...আঃ...!

তাঁর কণ্ঠ দিয়ে বেরিয়ে এল, ধড়ফড় করে উঠে বসলেন তিনি। বিস্ফারিত চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছেন। সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে ঘামে। এইমাত্র দেখলেন, মা এসে দাঁড়িয়েছেন। দু'হাত বাড়িয়ে তাঁকে ডাকছেন, 'ওরে বাপ, ওরে আমার একমাত্র অন্ধের লাঠি, ফিরে আয় বাবা, ফিরে আয়।'

পাশ থেকে গোবিন্দ উঠে এসে বসেছে, 'শান্ত হোন। আপনি স্বপ্ন দেখেছেন।'

'না না—! স্বপ্ন নয় গোবিন্দ, সত্যি।' তিনি দুদিকে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠলেন, 'মা আকুল হয়ে কাঁদছেন। আমার মা একেবারে একা। তাকে আমি ছাড়তে পারব না, ফিরে যাব।'

'ছাড়বেন কেন প্রভু? শচীমা আমাদের সঙ্গেই আছেন। তিনিই তো আপনাকে আদেশ করেছেন নীলাচলে যেতে। নবদ্বীপে যিনি মুরলীধর, তিনিই শ্রীক্ষেত্রের প্রভু জগন্নাথ। এ তো তাঁরই কথা প্রভু।'

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক কথা। যেদিন তিনি সন্ন্যাস নিয়ে ঘর ছাড়লেন, সেই মুহূর্তটা ভেসে উঠল। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে মা বললেন, বাবা, তুই যখন বাড়িতে থাকবিই না, তখন শ্রীক্ষেত্র চলে যা। সেখানে তোর প্রাণের ঠাকুর জগন্নাথ রূপে আছেন। আমি তবু তোর খবর পাব, নিশ্চিন্ত থাকব। তুইও জগন্নাথকে বুকে নিয়ে শান্ত থাকবি।

গোবিন্দ ফের বলল, 'আপনার পথ চেয়ে যে স্বয়ং মুরলীধর প্রতীক্ষা করছেন।...প্রভু, জল খান, শান্ত হোন।' করঙ্গ এগিয়ে দিল গোবিন্দ।

মুরলীধর! তিনিই তো পরম প্রভু জগন্নাথ! তাঁর সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করলেন। মনশ্চক্ষে ভেসে উঠেছেন বংশীধারী। জলপান করতে একবার করঙ্গ ওঠালেন, আবার নামিয়ে রাখলেন। আনন্দ আবেশে তাঁর চক্ষু বুজে এল, দেহ দুলতে শুরু করল বেতসপাতার মতো, তিনি উদাত্তকণ্ঠে গেয়ে উঠলেন, 'গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন...গাও হে গোবিন্দ, তুমিও গাও...।'

গোবিন্দ তাল মিলিয়ে গেয়ে উঠল, 'গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন...!'

কয়েক মুহূর্ত। তার পরেই আবার অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁর বুকের ভিতর তীব্র ব্যথায় জ্বলে যাচ্ছে, উঠে দাঁড়িয়েছেন, 'নাঃ, অসম্ভব। মা আমায় টানছেন, দুদিকের টানে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। আমাকে ফিরতেই হবে। আমায় যেতে দাও গোবিন্দ।'

গোবিন্দ দ্রুত ঘরের দুয়ার আড়াল করে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু তার মতো ছোটখাট শরীরের মানুষ কি পারে শালপ্রাংশু এই মানুষকে নিবৃত্ত করতে? দ্বাদশীর জ্যোৎস্নার ফুটফুটে আলোয় ভেসে যাচ্ছে ঘরের ভিতর।

সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে, গোবিন্দ উপায় না দেখে প্রভুর পায়েই ঝাঁপিয়ে পড়েছে, বলছে, 'প্রভু শান্ত হোন, শান্ত হোন।' তিনি বিব্রত স্বরে বলছেন, 'এ কী, এ কী গোবিন্দ, করো কী! করো কী! পা ছাড়ো।'

আ-উ-উ-ম-ম! আ-উ-ম-ম-! ভয়াল শ্বাপদ গর্জনে রাতের স্তব্ধতা ভেঙে খানখান হয়ে গেল। গোবিন্দ শিউরে উঠে বলে উঠল, 'প্রভু বাঘ! বাঘ বেরিয়েছে। এখনই ঘরের ভিতরে চলুন।'

'হাঃ হাঃ হাঃ!' তিনি হেসে উঠলেন। বললেন, 'তুমি অকারণ ভয় পাচ্ছ গোবিন্দ। মনে রেখো, বাঘও কৃষ্ণের জীব, সে খিদে না পেলে অকারণ মানুষকে আক্রমণ করে না। ও শিকারের খোঁজে বেরিয়েছে, আমাদের কিছু করবে না।'

'আপনাকে করবে না প্রভু, আপনি কি আর সাধারণ মানুষ! আমাদের করবে। এই সোঁদরবনের বাঘ বড় হিংস্র, মানুষখেগো।'

'ভাই, মনে রেখো, মানুষের চেয়ে হিংস্র জীব আর নেই। বাঘকে বিরক্ত না করলে সে তোমার কোনো ক্ষতি করবে না।' তিনি ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর ঢুকে এলেন।

ঠিক তখনই ঘরের একেবারে সামনে দেখা গেল বিশালদেহী বনের রাজাকে। তার হলুদ ডোরাকাটা শরীর চাঁদের আলোয় ঝিলিক দিচ্ছে। হেলতে দুলতে, ল্যাজ নাড়তে নাড়তে সে এগিয়ে আসছে। কুটিরের কাছে এসে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াল, হাঁড়ির মতো মুখ ঘুরিয়ে দেখছে। তবে কি ও মানুষের গন্ধ পেয়েছে? আতঙ্কে ঠকঠক করে কাঁপছে গোবিন্দ।

এইসময় আশপাশ থেকে একদল শিয়াল ডেকে উঠল, হুক্কা হুয়া হুয়া... হুক্কা হুয়া হুয়া...। বাঘটা বিরক্ত হয়ে ফের গর্জন করে উঠল, আ-উ-ম-ম-ম...উ-উ-ম-ম-ম...। নিমেষে শিয়ালের ডাক থেমে গেছে। ঝোপঝাড় মাড়িয়ে ওদের পালিয়ে যাওয়ার শব্দ।

আরও কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল ডোরাকাটা। তারপর রক্ত জল করা গর্জন করতে করতে অদূরে নদীর কাছে চলে গেল।

চরাচরে ফের নেমে এসেছে অপার নৈঃশব্দ্য। মাঝে মাঝে দু'একটা রাতচরা পাখি, প্যাঁচা ডাকতে ডাকতে উড়ে যাচ্ছে। ভেসে আসছে অবিরাম ঢেউ ভাঙার শব্দ। ভাগীরথী এখানে বিশাল চওড়া, ওপার দেখা যায় না, কিছুদূরেই মোহনা, নদী মিশেছে সমুদ্রে।

রাত এখন তৃতীয় প্রহর। নদীতীরে বনের মধ্যে তিন চারটি কুটির। সেখানে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন তাঁর সঙ্গীসাথী।

'নাঃ, আজ আর ঘুম আসবে না।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন মানুষটি, 'আমার পাগলামির জন্য তুমিও এতটুকু ঘুমোতে পারলে না।'

'কী যে বলেন প্রভু! আপনার সঙ্গসুখ পাচ্ছি, এ আমার কাছে কত বড় পাওয়া। একটু পা টিপে দিই আপনার, আরাম হবে, ঘুম এসে যাবে।'

'দূর পাগল!' তাঁর মুখে অমলিন হাসি ফুটে উঠেছে। তিনি গোবিন্দর মাথায় হাত দিলেন। বিহ্বলকণ্ঠে বললেন, 'তুমি আমায় এত ভালোবাসো গোবিন্দ! তুমি...আমাদের চেয়েও অনেক উঁচু স্তরের মানুষ! দ্বিজেযু শ্রেষ্ঠ।'

'কী বলছেন প্রভু! আমি কর্মকার, শূদ্র সন্তান। পাপের সাগরে ডুবে যাব।'

'কীসের শূদ্র তুমি? তোমার গায়ে কি জাত লেখা আছে? তোমার আমার রক্ত কি আলাদা? এ সব ভাগাভাগি চূড়ান্ত মিথ্যে গোবিন্দ, আমরাই নিজেদের সুবিধের জন্যে সমাজকে ভাগ করেছি। মানুষের পরিচয় তার কর্মে, তার জন্ম পরিচয়ে নয়।'

বলতে বলতে তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, 'জঘন্য! কুৎসিত! জাতপাতের দেয়াল সমাজকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, মানুষকে দূরে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে! আমি কিছু মানি না, আমি ঘেন্না করি। আমি সব বাধা ভেঙে দেব। আমরা সবাই মানুষ, শ্রীকৃষ্ণের সন্তান। তুমি যা, আমিও তাই।'

গোবিন্দ নিশ্চুপ। প্রভু তার মাথায় একটুখানি হাত রেখেছিলেন, ওর শরীর জুড়ে এখনও আনন্দের শিহরন খেলে বেড়াচ্ছে। এখন তিনি উদাসচোখে তাকিয়ে আছেন বাইরের দিকে। কয়েক মুহূর্ত কেটে যায়। গোবিন্দ ইতস্তত করে বলল, 'প্রভু, অপরাধ নেবেন না, আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে...' সে থেমে গেল, 'না থাক।'

'না না গোবিন্দ, নির্ভয়ে বলো, কী জানতে চাও। আমি কিছু মনে করব না।'

'প্রভু, আপনার সন্ন্যাস নেওয়ার আগের জীবন...খুব ইচ্ছে করে জানতে।'

'হাঃ হাঃ হাঃ!' তিনি হেসে উঠলেন। বললেন, 'মাথা মুণ্ডন করলেই কি আর সন্ন্যাসী হওয়া যায় গোবিন্দ! আমিই কী পেরেছি মায়ার বাঁধন ছিঁড়তে? পারিনি, মনকে বাঁধতেই পারছি না। আসলে আমাদের পরিবারটাই অভিশপ্ত!'

'অভিশপ্ত! যে বাড়িতে আপনি...আপনার দাদা...'

'হ্যাঁ, দাদাও ঘর ছেড়েছে অনেকদিন।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, 'তাই তো অভিশপ্ত বলছি গোবিন্দ। আমাদের মতো সন্তান জন্মালে সংসার আর থাকে না, শ্মশান হয়ে যায়। অথচ এটা হওয়ার কথা ছিল না। আমরা

পূজারি ব্রাহ্মণ, দেশ উড়িষ্যার জাজপুরে। সেখান থেকে বাবার বড় ঠাকুরদা চলে যান শ্রীহট্টে। সেখানে পুজোপাঠের সুবিধা হচ্ছিল না, তাই বাবা চলে এলেন নবদ্বীপ।

'আমার দাদু নীলাম্বর চক্কোত্তি তাঁর বিয়ে দিলেন মেয়ের সঙ্গে। দাদা আমার চেয়ে বয়েসে অনেক বড়, ছোট থেকেই সে খুব বাধ্য ছেলে, অল্পবয়েসেই শাস্ত্রজ্ঞ। নবদ্বীপের সকলে বিশ্বরূপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আর আমি? আমি ছিলাম জন্মাবধি উদ্ধত, বেয়াড়া। কী না দুরন্তপনা করেছি! টোলের পণ্ডিতমশাই অব্দি ভয়ে কাঁপতেন। বাবার মারের হাত থেকে আমায় আড়াল করত দাদা! সে ছিল দুষ্টু ভাইটার একমাত্র বন্ধু। ঘরে খাবার কষ্ট ছিল, তবু আমরা সুখেই ছিলাম। সেই দাদা একদিন...ঘরে ফিরল না। খবর এল, দাদা সন্ন্যাস নিয়েছে। তক্ষুনি আমার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেল। কেন জানো?'

গোবিন্দ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

'বাবা-মার মনে হল, লেখাপড়া করেছে বলেই দাদা ঘর ছেড়েছে। এদিকে আমিও পড়া ছাড়ব না, বাড়িতে তুমুল অশান্তি শুরু করলাম, সবাই নাজেহাল। বাবা-মাকে কথা দিলাম, পড়তে দিলে ভালো হয়ে যাব...শেষপর্যন্ত বাবা রাজি হলেন। কিন্তু আবার দুর্ভাগ্য এসে আঘাত করল। মাত্র কয়েকদিনের জ্বরে...'

খসমস খসমস...নিস্তব্ধ জঙ্গলের বুকে সহসা অনেক পায়ের শব্দ! এগিয়ে আসছে। তিনি চুপ করে গেছেন, ভ্রূ কুঞ্চিত। গোবিন্দ দ্রুতপায়ে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, 'প্রভু, মনে হচ্ছে বেশ বড় কোনো দল। সুলতান আমাদের ধরতে পাইক পাঠায়নি তো?'

'না না, কী যে বলো! রামচন্দ্র সুলতানের সামন্তরাজা। সে এই ছত্রভোগে পাহারা দিয়ে আমাদের নিয়ে এসেছে, পারাপারের দায়িত্ব নিয়েছে। তাছাড়া আমাদের ধরবেই বা কেন? কী করেছি আমরা? তবে—'

'তবে?'

'তবে শুনেছি, এই জনহীন জঙ্গলে বড় বড় ডাকাতদল আছে। তারা বাঘের চেয়েও হিংস্র। অবশ্য আমাদের কাছ থেকে কীই বা পাবে!' হেসে বললেন, 'স্রেফ খোল করতাল বাঁশি, ঢাক ঢোল...এই তো। ন্যাঙটার নেই বাটপাড়ের ভয়।'

'কিছু না পেলে কি ছেড়ে দেবে প্রভু? শুনেছি, ওরা নাকি মা কালীর কাছে নরবলি দেয়। তারপর সেই রক্ত পান করে।'

'হুঁ।' তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন, অস্ফুটে বললেন, 'ভালোই হবে, পরীক্ষা হয়ে যাবে, কার জোর বেশি। শক্তি না ভক্তি!'

আওয়াজ খুব কাছে এসে পড়েছে। ধবধবে আলোয় এখন স্পষ্ট। গোবিন্দ দরজা একটু ফাঁক করল। একদল বড় বড় হরিণ, মাথায় ডালের মতো শিং। পাতাপুতি মাড়িয়ে এগিয়ে গেল নদীর দিকে। মানুষটি হেসে উঠলেন, 'দেখলে গোবিন্দ, আমরা আসলে কত ভীতু। ভয়কে জয় করতে না পারলে কি সন্ন্যাসী হওয়া যায় গো! এসো, বোসো।'

গোবিন্দ বলল, 'যা বলেছেন প্রভু। হ্যাঁ প্রভু বলুন।'

'হ্যাঁ, কয়েকদিনের জ্বরে বাবা চোখ বুজলেন। তখন যে কী ভীষণ অবস্থায় পড়লাম! শেষে পণ্ডিতমশাইয়ের দয়া হল। বিনা বেতনে পণ্ডিতমশাইয়ের টোলে নিজে পড়ি, তাঁর নীচু শ্রেণির ছাত্রদেরও পড়াই। সংগতি ফিরছো মায়ের সম্মতিতে আমার কৈশোরের সঙ্গিনী লক্ষ্মী এল আমাদের পরিবারে।

'কিন্তু সেই আনন্দ আর কদিনের! মায়ের কথায় গেছি শ্রীহট্টে, বাবার ভিটে দেখতে। ফিরে এসে দেখি, লক্ষ্মী নেই, সাপের কামড়ে মারা গেছে। মা অঝোরে কাঁদছে, আমার সামনে সব অন্ধকার। সেইদিন রাতে তিনি দেখা দিলেন। বললেন, আমিই তোমার সব, আর কোনো নারীকে ভালোবেসে দুঃখ দিও না। তবুও মায়ের কথায় বড় ভুল করলাম, বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিয়ে করে কষ্ট দিয়েছি।'

'জয় কৃষ্ণ, জয় রাধে।' গোবিন্দ কপালে হাত ঠেকাল।

'গয়ায় গেলাম বাবা আর লক্ষ্মীর পিণ্ড দিতে। বিষ্ণু পাদপদ্মে মহাগুরু ঈশ্বরপুরী আমাকে দীক্ষা দিলেন। বললেন, নিমাই, সংসার তোমার জন্যে নয়। সনাতন ধর্ম আজ অন্ধকারে ডুবে আছে, দেশের মানুষ তোমায় ডাকছে। তুমিই সে, যে শ্রীকৃষ্ণের নাম নিয়ে পারবে সকলকে একজোট করতে, জাতপাতের দেয়াল ভেঙে একজাতি একপ্রাণ গড়তে। তারপরে তো জানো, কাটোয়ায় কেশব ভারতী দিলেন সন্ন্যাস। হরির ডাক শুনে বৃন্দাবন থেকে এসে পড়ল নিত্যানন্দও। কিন্তু...কিন্তু গোবিন্দ, তবুও মা কে ছাড়তে পারিনি, মায়ের যে আমি ছাড়া আর কেউ নেই।' তাঁর কথা বন্ধ হয়ে গেল, চক্ষু দিয়ে জল ঝরতে লাগল।

'শান্ত হোন প্রভু, মা কে আপনি ছাড়েননি। আপনার শিষ্যরাই শচীমাতাকে দেখবে।'

এইসময় বাইরে থেকে একজনের গলা শোনা গেল, 'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, আমি এসে গেছি। বজরা প্রস্তুত। রাতের চতুর্থ প্রহর শুরু হবে।'

'এসো রামচন্দ্র।' শ্রীচৈতন্য বললেন, 'তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।'

২

'পরিস্থিতি মোটেও ভালো নয় মহাপ্রভু। আমাদের সুলতানের সঙ্গে উড়িষ্যার রাজার সাপে নেউল সম্পর্ক। ওরা গৌড়ের মানুষদের এতটুকু বিশ্বাস করে না, সে হিঁদু হোক কি মোসলমান।'

'এর জন্যে হোসেন শাহ নিজেই দায়ী। মানুষটা অত্যাচারী নন, অথচ কী প্রবল ক্ষমতার লোভ, বুঝে পাই না। বারবার উনি আক্রমণ করে চলেছেন উড়িষ্যাকে। একবার তো প্রতাপরুদ্র দেবের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে শ্রীক্ষেত্র ছুটেছিলেন প্রভু জগন্নাথদেবকে ধ্বংস করতে। লোকমুখে শুনছি, আবারও নাকি লোকলস্কর সাজিয়ে—'

'শ্- শ্- শ্! আস্তে বলুন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু।' চৈতন্যদেবকে থামিয়ে দিলেন রামচন্দ্র খান। গলা নামিয়ে বললেন, 'দেয়ালেরও কান আছে। আমার বজরার মাঝিমাল্লারা সব মোসলমান। আমি সুলতানের বেতনভুক দক্ষিণ রাজ্যের সামন্তরাজ। কোনোভাবে ওনার কানে খবর চলে গেলে প্রাণ চলে যাবে।'

কোথাও আলো নেই। আদিগন্ত কালো জলে হলুদ জ্যোৎস্না ঝিলমিল করে উঠছে। দাঁড় টানার ছপছপ শব্দ। মাঝ গঙ্গা বেয়ে উত্তরমুখো এগিয়ে চলেছে তিনটি বৃহৎ বহিত্র। চৈতন্য নিশ্চুপ, চেয়ে আছেন অন্ধকারের দিকে।

রামচন্দ্র খান ফের ফিসফিস করে বললেন, 'রাজরাজড়ায় যুদ্ধ হয়, প্রাণ যায় আমাদের মতো উলুখাগড়ার। সর্বত্র জাসু ছড়িয়ে রেখেছেন সুলতান। সেই চরেদের একটাই কাজ, কোথাও বিদ্রোহের আঁচ পেলে সঙ্গে সঙ্গে তা ওনার কানে তুলে দেওয়া। ইসমাইল গাজীর নাম শুনেছেন?'

'না। সে কে?'

'পাষণ্ডী একটা।' রামচন্দ্র বলেন, 'ইসমাইল হচ্ছে সুলতানের খাস লোক। গৌড়ের নদী সীমানা পাহারা দেয়। ভীষণ কুচক্রী। রাজা হওয়ার লোভ দেখিয়ে সে হাত করে ফেলেছে উড়িষ্যারাজের ডানহাত গোবিন্দ ভইকে। উড়িষ্যা রাজার সব পরিকল্পনা গোবিন্দ তার মাধ্যমে জানিয়ে দিচ্ছে সুলতানকে। ভাগীরথীর পুরো সীমানা এই দুজনের দখলে। নির্বিচারে ডাকাতি, লুটপাট, মানুষ পাচার হচ্ছে। প্রতিবাদ, প্রতিরোধ করার কেউ নেই।'

'রাজা খবর পাচ্ছেন না?'

'হয়তো পাচ্ছেন। কিন্তু উনি অন্ধের মতো গোবিন্দ ভইকে বিশ্বাস করেন। সেজন্যেই বলছি, আপনারা ওপারে না পৌঁছোনো অব্দি আমার উদ্বেগের শেষ নেই।'

'কিন্তু আমরা তো তীর্থযাত্রী। জগন্নাথদেবের কাছে যাচ্ছি।'

'কী যে বলেন প্রভু! গোবিন্দর লোকেরা আপনাদের সুলতানের চর

সাজিয়ে ফাটকে পুরে দেবে। অবশ্য তেমন...'

পিছন থেকে হঠাৎ দাঁড়ের শব্দ। দুটো ছায়া ছায়া পানসি নৌকা এদিকেই ছুটে আসছে। রামচন্দ্র বলে ওঠেন, 'ওই যে দেখুন, বলতে বলতে এসে গেছে!'

'কওন যায়? কঁহা যায়?' পানসি থেকে হাঁক এল।

'তোমলোগ কওন হো? বেতমিজ কাঁহিকা! আমি রামচন্দ্র খান, এ দিগরের তালুকদার। মাস্তুলে সুলতানাতের নিশান দেখতে পাচ্ছ না?'

'মাফি মাঙছি হুজুর, সালাম হুজুর। আমরা ইসমাইল গাজীর ফৌজ।' পানসি দুটো সাঁৎ করে পিছন দিকে ঘুরে গেল।

'দেখলেন তো মহাপ্রভু!' রামচন্দ্র বললেন, 'দু'পক্ষের শয়তানগুলো নদীতে ঘাপটি মেরে বসে থাকে। সন্দ হলেই চেপে ধরে। এইজন্যেই এত চিন্তা।'

'আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি রাম?'

'প্রথমে প্রয়াগঘাটে নামবেন। আর দু'ক্রোশ পরে ভাগীরথী ঢুকে পড়বে উড়িষ্যার মধ্যে। আমাকে তখন ফিরে যেতে হবে প্রভু। এই বজরা দুটোর মাঝিমাল্লা সবাই হিঁদু ওড়িয়া। ওদের প্রভূত রৌপ্যমুদ্রাও দেওয়া হয়েছে। ঘাট অব্দি পৌঁছে গেলে আর চিন্তা নেই। ওরা ঠিক জলেশ্বরে পৌঁছে দেবে। তবে সাবধানে পা ফেলবেন, ত্রিশূল পোঁতা আছে।'

'ত্রিশূল!'

'হ্যাঁ প্রভু। সুলতানের হানাদারি আটকাতে ওদিকের পাড় বরাবর গজাল ত্রিশূল পুঁতে রেখেছেন রাজা। একবার পায়ে ঢুকে গেলে বাঁচা কঠিন। শুধু তাই নয়, অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না, নদীর আধাআধি লোহার জাল বিছিয়ে রেখেছেন রাজা। বিপক্ষের নৌবাহিনীকে ঠেকানোর জন্য।'

চৈতন্যদেব আকাশের দিকে তাকালেন। অন্ধকার কমে আসছে। অল্প অল্প ঠান্ডা হাওয়া ছেড়েছে। শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে। চৈতন্যদেবের আবার অস্থির লাগছে, বুকের ভিতর আবার আহ্বান জেগে উঠছে...কতক্ষণ প্রভুর নাম গান করেননি!

হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল, অন্ধকার আকাশে পিচকিরির মতো নানা রঙের আলো ঝিলিক দিয়ে উঠছে, পরক্ষণে মিলিয়ে যাচ্ছে। কী ওগুলো? রামচন্দ্র বললেন, 'প্রভু, ওদেশে দোলযাত্রার উৎসব শুরু হয় এক হপ্তা আগে থেকে। হাউই আতসবাজি জ্বালানোর খুব চল। দক্ষিণ থেকে আসে। সারারাত বাজি পোড়ানো চলে।...আমি এবার চলে যাচ্ছি প্রভু।' নত হয়ে প্রণাম করলেন।

চৈতন্য রামচন্দ্রের চোখের দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলেন। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, মুখে প্রশান্ত হাসি। রামের শরীরে কাঁটা দিল। তিনি দ্রুত নেমে নিজের বজরায় উঠে গেলেন।...

সমুদ্র অনেক পিছনে। এখানে নদী শান্ত, ওপারের কালো তটরেখা দেখা যাচ্ছে। ছায়া ছায়া অন্ধকার, পূব দিগন্তে আবছা রেখা জাগছে। নদীতে উতল বাতাস বইতে শুরু করল। আহা, এ যে...এ যে ব্রাহ্মমুহূর্ত, উষালগ্ন সমাগত। নাঃ, আর নিজেকে সামলাতে পারছেন না চৈতন্যদেব, আকুলি বিকুলি করছে তাঁর দেহ মন, চক্ষের সামনে দেখতে পাচ্ছেন পুরুষোত্তমকে, তিনি যে ডাকছেন...কাঁপতে কাঁপতে তিনি তরতর করে বজরার ছাদে উঠে গেলেন।

স্থানকাল ভুলে মন্দ্রকণ্ঠে ডেকে উঠলেন, 'ভাইসব! আর শুয়ে থেকো না, উঠে পড়ো। এসো এসো, আমরা এখন প্রভুর নাম কীর্তন করব।'

বজরার কামরা থেকে তখনই বেরিয়ে এলেন নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর পণ্ডিত, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ...আরও সব সঙ্গী পরিকর। তাঁদের হাতে-গলায় ঝুলন্ত ঢোল, মৃদঙ্গ, খোল, বাঁশি, করতাল, শঙ্খ।

'ঠাকুর! ঠাকুর!' প্রধান মাল্লা যজ্ঞেশ্বর ছুটে এল, হাত জোড় করে আতঙ্কিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'না ঠাকুর, না। সব্বনাশ হয়ি যাবে। তুর পায়ে পড়ি ঠাকুর, ঘাট অবধি কথা বলিবি না। রাজার সৈন্যরা পাহারায় আছে, মনুষ্য গলা পাইলে এদিকি আসি পড়িবে। মুইদেরও ধরি লয়ে যাবে, কেহ বাঁচিব নি।'

'কোথায় রাজার লোক? কোথাও কেউ নেই।' চৈতন্য নিঃশঙ্ক, দাঁড়িয়ে আছেন মাস্তুল ধরে। পাল ফুলে উঠেছে ভোরের বাতাসে।

'আছে গো ঠাকুর, অরা খালেবিলে লুকায়ে থাকে।'

'বৃথা ভয় পাচ্ছ যজ্ঞেশ্বর। নিশ্চিন্তে নৌকা চালাও। এমন মাহেন্দ্রক্ষণ, প্রভু ডাক দিচ্ছেন, আমরা গাইব না, হয় কখনও!...শুরু করো ভাইসব, দোহার দিয়ে বলো...'

তাঁর কথা শেষ হল না। জলের মধ্যে সাঁ-সাঁ শব্দ। চোখের নিমেষে কোত্থেকে আবির্ভূত হল দশ-বারোটা সরু সরু শালতি নৌকা, চারিদিক দিয়ে ঘিরে ফেলল বজরা দুটোকে। ছায়া ছায়া অন্ধকারেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, প্রতিটি শালতিতে মাঝি ছাড়াও রয়েছে দুজন করে সশস্ত্র সৈন্য। প্রত্যেকের হাতে উদ্যত তরবারি।

'জয় মহারাজ প্রতাপরুদ্র দেব! তোমরা কারা, কোত্থেকে আসছ?' তরবারি শূন্যে তুলে হুংকার দিয়ে উঠল সেনাপ্রধান।

'আজ্ঞে হুজুর, আমরা এদেশের মানুষ, মহারাজের প্রজা।' যজ্ঞেশ্বর ভয়ে থরথর করে কাঁপছে।

'সে দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু তোমার যাত্রীরা কোথাকার? দেখে এদেশি মনে হচ্ছে না।'

'হ্যাঁ ভাই। ঠিকই বলেছ।' যজ্ঞেশ্বর উত্তর দেওয়ার আগেই চৈতন্য বলে উঠলেন, 'আমরা আসছি পাশের দেশ গৌড়বঙ্গ থেকে, তীর্থযাত্রী, সন্ন্যাসী। যাচ্ছি জগন্নাথ মহাপ্রভুর চরণে আশ্রয় নিতে, শ্রীক্ষেত্র নীলাচলে। জয় জগন্নাথ!'

'তোমরা সন্ন্যাসী! হাঃ! এ কথার প্রমাণ দিতে পারবে? জানো না, দুদেশের মধ্যে যুদ্ধ চলছে? তোমরা যে সুলতানের ছদ্মবেশী চর নও, তার কী প্রমাণ আছে?'

'ভাই, আমরা সন্ন্যাসী, এটাই আমাদের পরিচয়। যুদ্ধের জন্য জগন্নাথদেব দর্শন কি বন্ধ আছে? বন্ধ করা কি উচিত তোমাদের?'

'উচিত অনুচিত আমায় শেখাতে এসো না! এখন যুদ্ধের কারণে পারাপার নিষিদ্ধ। তোমাদের এখনই বন্দি করা হবে। জগন্নাথদেবের শ্রীক্ষেত্রর বদলে বরং ঘুরে আসবে প্রতাপরুদ্র দেবের শ্রীঘর, কী বলো!' নিজের রসিকতায় নিজেই খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠল। তারপর সুর পাল্টে বলল, 'তবে হ্যাঁ, উপযুক্ত অর্থ পেলে—'

'অর্থ! তোমরা উৎকোচ চাইছ? ছিঃ! দেখে বুঝছ না, আমরা কপর্দকহীন সন্ন্যাসী?'

'তাহলে আর কী, চলো শ্রীঘর! অ্যাই মাঝি, বজরা নিয়ে চল আমাদের সঙ্গে। কোনো চালাকি করার চেষ্টা করিস না, বুঝতেই তো পারছিস, তাহলে—!'

'হ্যাঁ ভাই, চলো, কোথায় যেতে হবে, নিয়ে চলো আমাদের। আমরা তাঁর দাসানুদাস, আমাদের আর ভয় কী...যিনি জগন্নাথ তিনিই শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই ধ্রুবতারা...সবই তাঁর ইচ্ছা, তিনি যেখানে নিয়ে যাবেন, আমরা যাব...এসো ভাই সব, তাঁর ভজনা করি...।' শ্রীচৈতন্যের দীর্ঘ দেহ ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকে। দু'বাহু তুলে গেয়ে ওঠেন, 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে...'

সবাই সমস্বরে গেয়ে ওঠে, 'হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।...'

'হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ...'

'যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ...হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ...।' খোল করতাল মৃদঙ্গ বাঁশি বাজিয়ে প্রাণমন ঢেলে গাইছে তাঁর সঙ্গীরাও, নৈঃশব্দ্যের বুকে জেগে উঠেছে নাম সংকীর্তন।

'এসো ভাইয়েরা, গাও গাও...সবাই গাও...শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করো...হরি হরি বলো সবে হরি বিনা কে আর ভবে...'

মহাপ্রভু অপূর্ব বিভঙ্গে নাচছেন, ভাবে বিভোর হয়ে গাইছেন, সকলের সম্মিলিত সুরধ্বনি ছড়িয়ে পড়ছে আকাশে বাতাসে, 'হরি নাম যেজন লবে, সেই নামে সে উদ্ধারিবে... হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ...।'

উষার রক্তাভা ক্রমে ক্রমে ফুটে উঠছে। সেই অপার্থিব আলো চৈতন্যের নৃত্যরত গৌরবর্ণ দেহে লগ্ন হয়ে যাচ্ছে, তাঁর গৈরিক বসন উড়ছে বাতাসে, তাঁর মুখমণ্ডলের চারিপাশে ফুটে উঠেছে উজ্জ্বল জ্যোতির্বলয়।

নৌসেনারা সম্মোহিত, বিহ্বল।

বজরা দুটো এগিয়ে চলেছে, পাশে পাশে চলেছে উড়িষ্যার সৈন্যদের নৌকারা।

'এসো এসো, তোমরা এখনও নৌকায় বসে আছ কেন?' শ্রীগৌরাঙ্গের চক্ষু মুদ্রিত, দুই হাত দু'দিকে প্রসারিত, গান থামিয়ে বলে উঠলেন, 'কী হল ভাই সব? সবাই এসো...আমাদের প্রভুর কাছে ব্রাহ্মণ শূদ্র যবন সকলেই সমান, কোনও ভেদাভেদ নেই...খুনি, ডাকাত, পাপীতাপী সবাই মানুষ... সবাই তাঁর সন্তান, তাঁর নামগান করলে সব অন্যায়, অনাচার পাপ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যাবে! আমার কাছে উঠে এসো, একসাথে গাও, গাও...হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে...!'

অলৌকিক ইন্দ্রজাল! ওড়িয়া সৈনিকদের চুম্বকের মতো আকর্ষণ করছেন সন্ন্যাসী, তাদের অন্তরাত্মা আছাড়ি পিছাড়ি করছে...ভিতর থেকে কে যেন ধাক্কা মেরে সব দুয়ার খুলে দিতে চাইছে...তারা আর বসে থাকতে পারছে না...!

দিকদিগন্ত কাঁপিয়ে খোল করতাল মৃদঙ্গ ঢোল বাঁশি বাজছে... দুই বজরার চাতালে সন্ন্যাসীরা দুলে দুলে উচ্চস্বরে গেয়ে চলেছে—

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ...
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে...।

এক এক করে শালতি নৌকাগুলো এসে বজরার পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে, সশস্ত্র সেনারা অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দিচ্ছে, উঠে আসছে বজরার উন্মুক্ত পাটাতনে, তারাও ভাবাবেশে দুলতে শুরু করেছে, তাদের কণ্ঠ দিয়ে আপনা হতে বেরিয়ে আসছে...

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ

শ্রীচৈতন্য নাচতে নাচতে নেমে এসেছেন খোলা চত্বরে। এগিয়ে আসছেন তাদের কাছে, আলিঙ্গন করছেন, তিনি স্পর্শ করামাত্র সেনারা বিদ্যুৎপৃষ্ঠের মতো শিউরে শিউরে উঠছে। মাঝিমাল্লারা হতবাক হয়ে দেখছে, তাদেরও বুকের ভিতর থেকে উঠে আসছে সংকীর্তন।

গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন
গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন...

চরাচর জুড়ে ফুটে উঠেছে সোনালি ভোরের আলো। নদীর দুপারে বহু মানুষ জড়ো হয়েছে, গ্রাম থেকে ছুটে আসছে আরও বহু মানুষ, প্রত্যক্ষ করছে আশ্চর্য নামগান। বজরাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তারা ছুটে চলেছে— নাচতে নাচতে, গাইতে গাইতে। দুটি বজরা এগিয়ে চলেছে।

হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল
বাহু তুলে নেচে নেচে হরি বল হরি বল...

চৈতন্য ঘোরের মধ্যে বলে উঠলেন, 'আর কত দূর যজ্ঞেশ্বর?'

'এসে গেছি ঠাকুর।' সাষ্টাঙ্গে পায়ের উপর পড়ে যায় যজ্ঞেশ্বর, 'প্রভু, আপনি দেবতা। আমাদেরও সঙ্গে নিন ঠাকুর।'

'নিশ্চয়ই নেব। চলো ভাই, সবাই চলো আমার সঙ্গে। জয় জগন্নাথ।' উদ্বাহু হয়ে নাচতে নাচতে গেয়ে উঠলেন, 'বাহু তুলে নেচে নেচে হরি বল হরি বল হরি বল...চলো চলো ভাইসব নগরিয়াগণ...শ্রীহরি জগন্নাথ নাম করহ ভজন...।'

বজরা এসে থামল প্রয়াগ ঘাটে।

চৈতন্য নামলেন। তাঁর দুপাশে নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, দামোদর, জগদানন্দ, গোবিন্দ এবং সঙ্গী পরিকর, মাঝিমাল্লা, রাজার সৈন্যরা। সকলেই ভাবাবেশে বিভোর। নাচতে নাচতে, শ্রীকৃষ্ণের নামগান করতে করতে তারা এগিয়ে চলে। দুধারের গ্রামগঞ্জ থেকে কাতারে কাতারে নানাবয়েসের নানা জাতের মানুষ যোগ দেয়, কীর্তনের মিছিল ক্রমে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকে।

৩

সদ্য দ্বিপ্রাহরিক ভোজন শেষ হয়েছে। ঘর থেকে বেরিয়ে দাওয়ায় এসে বসেছেন বাসুদেব। হাতে হুকো। গুড়ুক গুড়ুক টান দিচ্ছেন। তবু মনের অস্থিরতা কমছে না।

বাসুদেব সার্বভৌমকে নীলাচলে চেনে না, এমন মানুষ বিরল। বেদান্ত, নব্য-ন্যায়শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য সারা ভারতে বিস্তৃত। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র দেব গভীর শ্রদ্ধা করেন মানুষটিকে। সম্প্রতি তিনি রাজপণ্ডিত পদমর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন। তাঁর বাড়ির সংলগ্ন চতুষ্পাঠীতে দূর-দূরান্ত থেকে বহু ছাত্র পড়তে আসে।

সামনে ইট বাঁধানো পথ, তার পরেই বেলাভূমি এবং তরঙ্গায়িত সমুদ্র। নীল আকাশ মিশে গেছে অথৈ জলরাশিতে। প্রতিমুহূর্তে ঢেউ আর ঢেউ, এসে আছড়ে পড়ছে বালিতে। ছোট ছোট ঢেউ এসে ভাঙছে, পিছনে পিছনে ছুটে আসছে দৈত্যাকার তরঙ্গ, বালি টেনে নিয়ে সরে যাচ্ছে। অবিশ্রান্ত ভাঙাগড়ার এই খেলা চলছে তো চলছেই। মনুষ্য জীবনও কি তাই নয়? বাসুদেব নির্নিমেষে চেয়ে আছেন সাগরের দিকে।

পিঠে হাত পড়ল। সচকিত হয়ে ফিরলেন বাসুদেব। গৃহিণী। কখন পাশে এসে বসেছেন, টের পাননি। 'তোমার কী হয়েছে গো? দু'দিন ধরে তুমি অন্যমনস্ক হয়ে আছ! খাওয়া দাওয়া করছ না, ঠিকমতো কথার উত্তর দিচ্ছ না!'

অপ্রস্তুতভাবে হাসলেন বাসুদেব, 'তেমন কিছু নয় গিন্নি। আসলে—' থেমে বললেন, 'কী করব, বুঝে উঠতে পারছি না।'

'অসুবিধে না হলে আমাকে বলতে পার। ক্ষুদ্র বুদ্ধি আমার, তবু—'

'কী যে বলো।' স্ত্রীকে থামিয়ে দিলেন বাসুদেব। বললেন, 'তুমি জানো, নবদ্বীপের শচীদেবী সম্পর্কে আমার দিদি হয়। তার ছোট ছেলে নিমাইকেও চেনো! চব্বিশ বছর বয়েসে সেও সন্ন্যাস নিয়েছে, বৈষ্ণবমতে। দিদিই তাকে বলেছে, যদি তুই বাড়িই ছাড়িস, তাহলে শ্রীক্ষেত্র যা। যে জগন্নাথদেব, সেই শ্রীকৃষ্ণ। ওখানে তোর বাসুদেব মামা আছে। আমি তাহলে নিশ্চিন্ত থাকব। খবরটা পাওয়ার পর থেকে চিন্তিত হয়ে পড়েছি।'

'কেন গো? নিমাই এলে তোমার চিন্তার কী আছে?'

'আছে গিন্নি। গৌড়ের সুলতানের সঙ্গে আমাদের রাজার যুদ্ধ চলছে। তাই গঙ্গার ওপারের মানুষকে এখন উড়িয়ারা গভীর সন্দেহের চোখে দেখছে, ভাবছে সুলতানের গুপ্তচর। তাছাড়া নিমাই একা আসবে না, সঙ্গে ওর দলও আছে।'

'দল! মানে নবদ্বীপে যাদেরকে ও কীর্তনের দলে টেনে নিয়ে আসত, তারা?'

'হ্যাঁ! দিনে দিনে ওর দলে এত লোক ভিড়ে গেছিল, যার ভয়ে আমরা দেশ ছাড়লাম, পরে সেই কাজী নাকি ওর সঙ্গে মিটমাট করে নিয়েছিল। শুনেছি, পরে কাজীর যবন পাইকরা অনেকে নিমাইয়ের বৈষ্ণব দলেও যোগ দিয়েছিল।'

'সে কী গো! ওইটুকু ছেলে সকলকে বশ করে ফেলছে! ও সাধারণ মানুষ নয়।' বাসুদেব জায়া কপালে হাত ঠেকালেন, 'সবই তাঁর ইচ্ছা।'

'পুরোটা শোনো গিন্নি। তখনও নিমাই সন্ন্যাস নেয়নি, সবে বৈষ্ণবমতে দীক্ষা নিয়েছে। তাতেই সমাজের মাথা ব্রাহ্মণদের ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। সন্ন্যাসী হওয়ার পরে এখন ওর কীর্তন দলে মুচি মেথর চণ্ডাল শূদ্র যবন সব জাতের লোক দলে দলে যোগ দিয়েছে, দিচ্ছে। সবাই নাকি শ্রীকৃষ্ণের সন্তান, একজাত একপ্রাণ।'

'ও মা! কী অলৌকিক কাণ্ড গো! তবে রাজা প্রতাপরুদ্র তোমাকে খুবই

ভক্তিশ্রদ্ধা করেন, তিনি তোমার ভাগ্নেকে সুলতানের চর বলে সন্দেহ করবেন না।'

'আমারও তাই মনে হয়।' বাসুদেব চিন্তান্বিত ভাবে বললেন, 'সমস্যা হচ্ছে, জগন্নাথের পরম ভক্ত হলেও রাজা পুরো বৈষ্ণবপন্থী নন। নিমাই এসে যদি এখানেও দল জোটাতে আরম্ভ করে, তখন আমি বিপদে পড়ে যাব। রাজার কান ভাঙানোর লোকের তো অভাব নেই। বিশেষ করে ওই কূট লোকটা, মহামন্ত্রী গোবিন্দ ভই বিদ্যাধর, যে দুপক্ষেরই চর, রাজা তাকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করেন।'

'শান্ত হও স্বামী।' গৃহিণী বললেন, 'নিমাইকে বোঝালে সে নিশ্চয়ই বুঝবে। সন্ন্যাসী হয়েছে, বয়েস জ্ঞান দুই-ই হয়েছে। সে কি আর জানে না—'

'বাবা, বাবা! তুমি এখানে! কতক্ষণ খুঁজছি...ও মাও আছ।' চন্দনেশ্বর হন্তদন্ত হয়ে ঢুকল, 'মহামন্ত্রীর কাছ থেকে একজন তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।'

'আমার সঙ্গে! চলো।'

দশজন অশ্বারোহী সশস্ত্র সৈনিক মানুষটিকে ঘিরে রয়েছে। বিশাল ছাতা ধরে পাশে দাঁড়িয়ে আছে দুজন। তিনি মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন, 'ঠাকুর। নমস্কার। আমি জটাধর পাণিগ্রাহী, মহামন্ত্রীর বিশেষ সচিব। মাননীয় মন্ত্রী আপনার কাছ থেকে একটি তথ্য জানতে আমায় পাঠিয়েছেন। বলতে আজ্ঞা হোক?'

'বলুন।'

'খবর এসেছে, আপনার কোনো নিকট আত্মীয় সদলবলে পার্শ্ববর্তী গৌড় দেশ থেকে উড়িষ্যায় এসে প্রবেশ করেছেন। কথাটা কি সত্যি?'

'সত্যি। আমার ভাগিনেয় নিমাই নবদ্বীপ থেকে এই নীলাচলে আসছে। শুনেছি, কিছু লোকজনও তার সঙ্গে আছে।'

'কিছু লোক নয় ঠাকুর, অন্তত পঞ্চাশজনের দল। এর ফলে আইনশৃঙ্খলার সমস্যাও দেখা দিয়েছে।'

'আইনশৃঙ্খলার সমস্যা!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ ঠাকুর। সমস্যা হল, পথে যে যে মন্দির পড়ছে, তিনি সদলবলে সেখানে ঢুকে পড়ছেন। এই নিয়ে জলেশ্বরে খুব গোলযোগ হয়েছে, মহারাজার কাছে অঞ্চল প্রধান লিখিত নালিশ জানিয়েছে।'

'কেন? মন্দিরে প্রবেশে কি কোনো বাধানিষেধ আছে?'

সচিব একমুহূর্ত চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'ঠাকুর। আপনার ভাগিনেয়র দলে সব বর্ণ এবং ধর্মের মানুষ রয়েছে—যবন চণ্ডাল মুচি মেথর অন্ত্যজ সবাই। কিন্তু উচ্চবর্ণের মানুষ ছাড়া ওইসব মন্দিরে ঢোকা বারণ। সে কথা উনি মোটে মানতে চাইছেন না, জোর করে সকলকে নিয়ে প্রবেশ করছেন। তাছাড়া—'

'তাছাড়া—?'

'তাছাড়া উনি শ্রীকৃষ্ণের নামগান ও নৃত্য করতে করতে এগিয়ে চলেছেন। আপনি জানেন ঠাকুর, আমাদের রাজ্যে অনেক শৈব এবং বৌদ্ধ ধর্মের মানুষ আছেন। এদের পাণ্ডারা বৈষ্ণবদের পছন্দ করেন না। আপনার ভাগ্নের নাচগানে আকৃষ্ট হয়ে সকলেই ওনার দলে যোগ দিচ্ছে, এতে অন্য গুরুরা খুব খেপে উঠেছেন। তাদের প্ররোচনায় কাল নাকি নিমাই সন্ন্যাসীর দলের উপর ইটপাটকেলও ছুড়েছে গুন্ডারা।'

'সে কী! তারপর?'

'সন্ন্যাসী নাকি তার পরেও নাচগান করতে করতে এগিয়ে গিয়ে গুন্ডাদের জড়িয়ে ধরেন। গুন্ডারা নাকি তখনই বদলে যায়, ওনার সেবা শুশ্রূষা করে, তাঁর দলে যোগ দেয়। কিন্তু এরপর যদি এই বিবাদ আরও উগ্র রূপ ধারণ করে, সেই নিয়ে প্রশাসন চিন্তিত। মাননীয় মহামন্ত্রী গোটা বিষয়টি আপনাকে জানিয়ে আপনার মত জানতে চেয়েছেন।'

'হুঁ।' বাসুদেব ভ্রূ কুঁচকে বললেন,' নিমাইয়ের দল এখন কোথায়?'

'শোনা গেছে, ভদ্রক পেরিয়ে গতকাল জাজপুরে এসেছে।'

'বুঝেছি। তার মানে, এখানে পৌঁছতে আরও কমবেশি চার-পাঁচ দিন। জটাধর, ওরা নীলাচলে না এসে পৌঁছনো অব্দি যা কিছু সমস্যা, প্রশাসনকেই সামলাতে হবে। আমার পরামর্শ, দলটির অগ্রসর হওয়ার পুরো পথ যদি রাজার আরক্ষা বাহিনী ঘিরে রাখে, তাহলে অশান্তি এড়ানো সম্ভব। তবে এ আমার মত, মাননীয় মন্ত্রীকে জানাতে পারেন। গ্রহণ করা না করা, তাঁর উপর।'

●

'তুমি কে হে? এখানে একা একা কী করছ?'

'আমি? আমি প্রভুর নগণ্য দাস। বায়ু সেবন করছি।'

'সেটা দেখতেই পাচ্ছি। বলি, এই গাঁয়ে এসেছ কেন হে? মতলবটা কী?'

'না ভাই, কোনো মতলব নেই। পিতৃভূমিতে এসেছি। আপনি কে ভাই?'

'আমি মনোহর মিশ্র, গাঁয়ের মোড়ল। পিতৃভূমি মানে? এখানে তোমার কে থাকেন?'

'এখন থাকেন না, একসময় থাকতেন। আমার বাবা জগন্নাথ মিশ্র। তাঁর ঠাকুর্দা জাজপুরের এই গাঁ থেকে চলে যান শ্রীহট্টে। মা বললেন, নীলাচলে যাচ্ছ, পথে পারলে নিজের গ্রাম দেখে এসো, কুলদেবতাকে প্রণাম করে এসো।'

'জগন্নাথ মিশ্র! নবদ্বীপ নিবাসী? তোমার কি কোনো দাদা আছে?'

'হ্যাঁ, বিশ্বরূপ। দাদা কি এখানে এসেছিল?'

'হ্যাঁ, অনেক বছর আগে। আমি তখন শিশু। তা তুমিও দেখছি, তার মতোই মাথা মুড়িয়েছ। সন্নেস নিয়েছ নাকি হে?'

'নিয়েছি বটে, কিন্তু সন্ন্যাসী হতে পারিনি ভাই। এত মায়া রয়ে গেছে। এই যে বাবার ভিটে, তার মায়াই ছাড়তে পারিনি। কী যে ভালো লাগছে এখানে এসে!'

'ভালো লাগছে! তবে তো চিন্তার বিষয়। তোমার কি এখানেই গেঁড়ে বসার ইচ্ছে হচ্ছে নাকি? শোনো হে, তোমায় দেওয়ার মতো জমিজিরেত কিন্তু আমাদের নেই।'

'জমির ভাগ? তাই ভাবলে বুঝি! হাঃ হাঃ। ভাই মনোহর, এই মাটি, এই আকাশ বাতাস ফুল ফল নদী—সবই তো পরমপ্রভুর। আমরা তাঁর সেবক। আমি শুধুমাত্র তাঁকে, আমাদের কুলদেবতা নারায়ণকে দেখতে এসেছি। একটু নিয়ে যাবে আমায়?'

'নারায়ণ শিলা? সে তো আমাদের বাড়িতেই নিত্য পুজো হয়। চলো, চলো। এই দ্যাখো, তোমার নামটাই জানা হয়নি।'

'পূর্বাশ্রমের নাম বিশ্বম্ভর মিশ্র, মা ডাকতেন নিমাই বলে। চলো ভাই, একবার প্রভুকে ছুঁয়েই বেরিয়ে পড়ব, অনেক দূর যেতে হবে। শ্রীক্ষেত্র। হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ...।'

●

জগন্নাথদেবের সুবিশাল মন্দির চৌহদ্দির একাংশে দেবী দুর্গার শক্তিরূপ বিমলা মন্দির। অন্যতম সতী পীঠস্থানও। পুরাণে আছে, এই স্থানে সতীদেবীর নাভিকুণ্ডলী পড়েছিল। স্তম্ভে হেলান দিয়ে দুই বন্ধু আলাপচারিতায় মগ্ন। বাসুদেব সার্বভৌম এবং অনঙ্গ মহাপাত্র, এ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত।

অনঙ্গ বললেন, 'তোমার ভাগিনার আর কোনো সংবাদ পাওয়া গেছে?'

'নাহ্।' বাসুদেব অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'পরশু সাক্ষীগোপাল পৌঁছেছিল, মন্ত্রীর অশ্বারোহী বাহিনী জানিয়েছে। হিসাবমতো ভুবনেশ্বর হয়ে আজ শ্রীক্ষেত্রে এসে যাওয়ার কথা। যদি না পথে ফের কিছু গোল বাধিয়ে থাকে। আসলে কী জানো, আমার ভাগনেটি বাল্যকাল থেকে খুব জেদি, একরোখা। যা ভাবে, করেই ছাড়ে, কারো কথা শোনে না। নইলে এই তরুণ বয়েসে কেউ সন্ন্যাস নেয়? একবারও মা বউয়ের কথা ভাবল না!'

'হ্যাঁ, আমিও শুনেছি, তোমার ভাগিনা আর পাঁচজনের মতো নয়। তবে চিন্তার কিছু নেই ভাইটি, ঈশ্বর যার সহায় থাকেন, কেউ তার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারে না। প্রধান দয়িতাপতিকে ওর আসার কথা বলে রেখেছ তো?'

'রেখেছি। শুধু আমি নয়, মন্ত্রীর দূতও কাল বিকেলে এসে...অনঙ্গ, একটা কোলাহল শুনতে পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, চলো চলো।'

ঊর্ধ্বশ্বাসে দুজনে এগোলেন মন্দিরের প্রধান প্রবেশ পথ সিংহদ্বারের দিকে। দুয়ার পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে জনসমুদ্র এসে পড়ল। দুজনেই স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

এক অকল্পনীয় দৃশ্য। অসংখ্য কালো কালো মাথা। কমলপুরের দিক থেকে এগিয়ে আসছে সেই উতরোল জনতরঙ্গ, অন্তত পাঁচশো মানুষের মিছিল। তারা বিভোর হয়ে নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে এগিয়ে চলেছে—

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ, যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ...

কীর্তনের সুরে ও তালে বিপুল শোভাযাত্রা যেন গর্জন করছে।

হরি হরি হরি বোল, মুকুন্দ মাধব গোবিন্দ বোল, জয় গোবিন্দ বোল... জয় জগন্নাথ বোল...বোল বোল জগন্নাথ বোল...

ঢাক ঢোল মৃদঙ্গ বাজছে, সঙ্গে বাজছে বাঁশি খোল করতাল, ভাবাবেশে বিভোর সকলে...কণ্ঠ ছেড়ে গাইছে প্রভুর নামগান...তাদের চক্ষু অর্ধনিমীলিত, দু'হাত তুলে তারা নেচে নেচে এগিয়ে আসছে মন্দিরের দিকে।

আর সকলের সামনে...ও কে! বাসুদেব সার্বভৌম শিহরিত হলেন, রোমাঞ্চিত। এই কি সে, তাঁর ভাগিনেয়, সেই উদ্ধত তার্কিক নিমাই!

এ যেন জ্বলন্ত অগ্নি শিখা! অপরূপ মুখশ্রী, গৌরবর্ণ দীর্ঘ দেহ এখন ঘর্মাক্ত, মলিন বসন ধুলোয় লুটিয়ে পড়ছে, তার কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই...দুই চক্ষু নিমীলিত, সে সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে আছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ঝড়ের গতিতে সুবিশাল ঢেউ এসে পড়ল সিংহদুয়ারের সামনে। ফটক আগলে দাঁড়িয়ে আছে দশ-বারোজন দ্বাররক্ষক। তাদের সামনে উদ্বাহু নৃত্য করছে জনসমুদ্র, সামনে শ্রীগৌরাঙ্গ। চলছে উচ্চস্বরে নামগান—জয় জগন্নাথ বোল...জয় রাধাকৃষ্ণ বোল, জয় জগন্নাথ বোল...!

বাসুদেব এবং অনঙ্গ ততক্ষণে দ্রুত ছুটেছেন মন্দিরের গর্ভগৃহের দিকে। অনঙ্গ বিড়বিড় করে বললেন, 'দেখেছ, দেখেছ, এদের মধ্যে শূদ্র, যবনও আছে! কিন্তু কে থামাবে মানুষের এই বিপুল তরঙ্গরাশিকে?'

বাসুদেব বললেন, 'পারবে না, আটকাতে পারবে না...জয় জগন্নাথ! মহাপ্রভুর নিশ্চয়ই তেমন ইচ্ছা।'

চৈতন্যর বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল মুহূর্তের জন্য, গান থামিয়ে দুহাত তুলে তিনি ডেকে উঠলেন, 'প্রহরী, দুয়ার ছাড়, আমাদের যেতে দাও...এসো, সবাই এসো, মুই ই সে...আমিই সে...আমাদের যেতে দাও! জয় জয় জগন্নাথ বোল... জয় গোপাল গোবিন্দ বোল...হরি বোল হরি বোল হরি হরি বোল...!'

কয়েক পল মাত্র। তার পরেই সব প্রতিরোধ ভেঙে গেল! কোথায় গিয়ে ছিটকে পড়ল দ্বার রক্ষীরা! কীর্তনের দোহার তুলে মিছিল নেচে গেয়ে ঢুকে পড়ে মন্দিরের প্রধান তোরণ দিয়ে।

বাসুদেব, অনঙ্গ পৌঁছে গেছেন গর্ভগৃহে। কয়েক হাত দূরে নিজেদের আসনে স্থির মূর্তি হয়ে আছেন জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলভদ্র। দেবতাদের ঘিরে রয়েছেন প্রধান পুরোহিত এবং তাঁর সহযোগী পাণ্ডারা। ঢেউ এসে থামল আরাধ্য দেবতাদের মূর্তির কাছে।

সহসা সকলকে স্তম্ভিত করে নিমাই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'শারঙ্গধর রে...ও মোর শারঙ্গধর রে...!'

তাঁর সুললিত কণ্ঠ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে, 'সেই তে পরাণনাথ পাইলু... পাইলু...পাইলু...যাহা লাগি মদন-দহনে ঝুরি গেলু...!'

সবাই হতবিহ্বল, বিমূঢ়! পরমুহূর্তে প্রকাণ্ড এক লাফ দিলেন শ্রীচৈতন্য! গিয়ে পড়লেন জগন্নাথ মূর্তির উপর, একলহমায় দু'হাতে কোলে তুলে নিয়েছেন তাঁকে। অপ্রকৃতিস্থের মতো মাথা নাড়ছেন, মহাপ্রভুর গালে চুম্বন করছেন, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে যাচ্ছেন, 'আহা মোর পরাণনাথ রে...মোর পরাণনাথ, মোর জগন্নাথ, মোর শারঙ্গধর...!'

আরে, আরে, পাষণ্ডটা করে কী! সর্বনাশ করে দিল, অপবিত্র করে দিল ঠাকুরকে। এতক্ষণে সংবিত ফিরেছে পাণ্ডাদের। নিমেষের মধ্যে তারা রে রে করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে নিমাইয়ের শরীরের উপর, যে যেভাবে পারছে, তাকে সজোরে মুষ্টাঘাত করে চলছে...! চৈতন্যর ভ্রূক্ষেপ নেই, শরীরে কষ্ট নেই, অনুভূতি নেই, তিনি বিরাজ করছেন অন্য কোথাও, অন্য জগতে...মহাপ্রভুকে আদর করতে করতে অস্ফুটে বলছেন, 'পরাণনাথ...জগন্নাথ...পরাণনাথ গো! আসি গলা রে, মুইই সে, মুইই সে।'

'করো কী, করো কী! থামো থামো! মেরো না, মেরো না, আমরা ওকে সরিয়ে নিচ্ছি।' ছুটে এসেছেন বাসুদেব আর অনঙ্গ, প্রাণপণে চেষ্টা করছেন পাণ্ডাদের চড়চাপড় ঘুষি থেকে নিমাইকে আড়াল করতে...নিমাই তবু বদ্ধ আলিঙ্গনে ধরে আছেন প্রাণের ঠাকুরকে...! বাসুদেব চিৎকার করছেন, 'ভাগ্নে, আমি মামা, এসে গেছি, ছাড় বাপ, ছাড় মহাপ্রভুকে।'

বেশিক্ষণ নয়, নিমাইয়ের হাত আপনিই আলগা হয়ে গেল, শরীর এলিয়ে পড়ল ভূমিতে। তিনি অজ্ঞান। পাণ্ডারা দ্রুত জগন্নাথকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল। তীব্র রোষে তারা গালিগালাজ করছে, পাষণ্ডটা দেবতাকে অশুচি করে দিয়েছে। অবিলম্বে দেবতার গাত্রমার্জনা করতে হবে।...

আর সেইসময়েই অচেতন চৈতন্যকে ধরাধরি করে নিয়ে চলেছেন অনঙ্গ, বাসুদেব ও তার দুই পুত্র জলেশ্বর ও চন্দনেশ্বর। পাশে পাশে হাঁটছে চৈতন্যর ছয় সঙ্গী পরিকর। নিত্যানন্দ জিজ্ঞেস করলেন, 'আচার্য, চৈতন্যকে কি আপনার গৃহে নিয়ে যাচ্ছেন? আমরা কি প্রভুর জন্য কবিরাজ খুঁজে দেখব?'

'নাঃ। ওর দায়িত্ব আমার।' কঠিন কণ্ঠে বাসুদেব বললেন, 'তোমরা বরং নিজেদের ব্যবস্থা করে নাও বাছা।...অ্যাই জলেশ্বর, গোরুর গাড়ির ব্যবস্থা করো, এভাবে নেওয়া যাবে না। ওকে ঘরে শুইয়েই কবিরাজ ডাকতে হবে। আঘাত গুরুতর।'

৪

দুধারে ঢেউখেলানো পাহাড়ের সারি, সবুজ বনে ঢাকা। মাঝে মাঝে কিছু অঞ্চল সমতল ভূমি। বাজরা, জোয়ার, গমের খেত, এঁকেবেঁকে হাঁটুজল নদী বয়ে যাচ্ছে। দূরে দূরে ছোট ছোট পল্লীগ্রাম, খড়ের চালের কুটির, কিছু মানুষের বসত। সর্পিল রুক্ষ পথ। সেই পথ ধরে এগিয়ে চলেছে বারোটি হস্তী বাহিনী।

সামনে পিছনে হাতিতে তীর-ধনুকে সজ্জিত কৃষ্ণকায় সৈন্য, মধ্যের বর্ণময় রাজহস্তীর হাওদায় পাশাপাশি বসে আছেন উষ্ণীষধারী রাজপুরুষ এবং এক কৃশকায় সন্ন্যাসী। তাঁর মুখে দাড়িগোঁফের জঙ্গল, ঘাড় অবধি অযত্নে লালিত চুলের পিঙ্গল জটা। তবু অলৌকিক উজ্জ্বল চক্ষু তাঁকে নিমেষে চিনিয়ে দেয়—তিনিই শ্রীচৈতন্য।

এই বিন্ধ্যপর্বত সংলগ্ন অঞ্চল জুড়ে ভীল জনজাতির বাস। কাল তাদের রাজার আতিথ্য নিয়েছিলেন। ভোর হতেই বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন, রাজা ছাড়েননি। নিজে সঙ্গে চলেছেন, ঠাকুরকে রাজ্যের সীমা পার করিয়ে ফিরবেন।

সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে। গোধূলির রঙিন আলোয় উদ্ভাসিত পাহাড়, অরণ্য সমতল, পাখিদের নীড়ে ফেরার কলতানে মুখরিত। চৈতন্য বিহ্বল চক্ষু মেলে চেয়ে আছেন। অস্ফুটে বলে চলেছেন, 'অপূর্ব, অপূর্ব! হরি বোল হরি হরি বোল...হে মাধব, তোমার কী লীলা...এই দেশ, এই প্রকৃতি, মানুষ পশু পক্ষী সব তোমারই সৃষ্টি। কত বর্ণ, কত ভাষা, কত ধর্ম, কত জাতির মানুষ।...হে ঠাকুর, আমি এই ঘুমন্ত দেশকে জাগ্রত করতে চাই...তোমার নামগানে মেলাতে চাই সকলকে, আমায় শক্তি দাও...! আবার যাব, আমায় যেতেই হবে...হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ...!'

প্রায় দু'বছর পরে ফিরছেন তাঁর প্রাণের ঠাকুরের কাছে, শ্রীক্ষেত্রে। মন উদ্বেল হয়ে উঠেছে আনন্দে। যত দূরত্ব কমে আসছে, তত অস্থিরতা বাড়ছে,

আর কতদিন, কতদূর!

কোথায় না কোথায় ঘুরেছেন! সাথী সেই গোবিন্দ কর্মকার। প্রথমে গেলেন গোদাবরী তীরে বিদ্যানগর, আরেক শূদ্র রামানন্দর সঙ্গে মধুর মিলনে কেটে গেল কয়েকটি দিন। চলল আলোচনা, বিতর্ক—কোন পথ? দেহতত্ত্ব না নিষ্কলুষ প্রেম? তিনি নিজে কে? রাধা, না কৃষ্ণ?

সেখান থেকে হরিনাম প্রচার করতে করতে মাদুরাই, কন্যাকুমারী। আলালনাথ। তারপর তিরুবনন্তপুরম—সেখানে অনন্তশয়নে রয়েছেন বিষ্ণুর আরেক রূপ, পদ্মনাভ। তারপর উড়ুপকৃষ্ণের মূর্তি দর্শন করে বিভোর হয়ে নৃত্যও করেছেন। এই দীর্ঘ পদযাত্রায় কত শৈব, শাক্ত, এমনকী যবনও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে। প্রতিমুহূর্তে তিনি অনুভব করেছেন, সঙ্গে ছিলেন প্রভু শ্রীকৃষ্ণ, বহুরূপে।

দাক্ষিণাত্য হয়ে তিনি গেছেন পশ্চিমে। মহানদী পেরিয়ে বোম্বাই, পুণা, আমেদাবাদ, সোমনাথ, ভদোদরা, ওপারে ধ্রুবতারার মতো দ্বারকা, শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি। তবে দ্বারকার প্রাচীন মন্দির দেখা হয়নি, বহির্দেশ থেকে হানাদারদের আক্রমণে সেটা ধ্বংসস্তূপ হয়ে গেছে। তবু দ্বারকা পবিত্র দেশ, তার মাটির প্রতিটি ধূলিকণায় রয়ে গেছে পরমপুরুষের স্পর্শ। যে ক'দিন ছিলেন, রোমাঞ্চিত হয়েছেন।

বাসুদেব মামা তাঁকে কিছুতেই বেরোতে দিচ্ছিলেন না! 'এই তো সবে নীলাচলে এলে! ক'দিন বিশ্রাম নাও। দিদিকে কী জবাব দেব?'

মামা কী করে বুঝবেন, তাঁর মানসিক অবস্থা! তাঁর সময় কোথায়, এক জায়গায় বসে থাকার? এত বড় দেশ, প্রাচীন সনাতন ধর্ম, সব যে ধ্বংস হতে বসেছে। ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে দলে দলে শূদ্র চণ্ডাল মুচি মেথর আদিবাসী অন্য ধর্মে চলে যাচ্ছে। জাতপাতের বেড়া ভাঙতেই হবে, নতুবা হিন্দু ধর্ম উঠে যাবে। শুধু মুসলমান কেন, কালিকটে তিনি স্বচক্ষে দেখে এসেছেন, পাদ্রীদের আহ্বানে কীভাবে নিম্নবর্গের সব মানুষ কেরেস্তান হয়ে যাচ্ছে।

ভাবতেই মনে পড়ে গেল। তাঁর ভক্তিবাদ বনাম বাসুদেব মামার জ্ঞানবাদ নিয়ে একদিন সে কী কলহ, সারাদিন ধরে বিতর্ক! শেষপর্যন্ত অবশ্য মামাকে স্বরূপ—

'ঠাকুর, এই বন আমাদের রাজ্যের শেষ সীমা।' রাজার কথায় চৈতন্যের ঘোর কেটে গেল। সে বলছে, 'সন্ধ্যা নেমে গেছে। এখানে আমাদের সীমান্তরক্ষীদের কুটির আছে। রাত্রিটা সেখানে কাটিয়ে, কাল সকালে যাত্রা করুন।'

'না না ভীম, আর বিলম্ব করতে পারব না।' তিনি মাথা নাড়লেন, 'জগন্নাথ মহাপ্রভু আমায় ডাকছেন।'

'ঠাকুর, এই জঙ্গল ক্রোশের পর ক্রোশ বিস্তৃত। যবন সুলতানের রাজত্ব। জঙ্গলে যেমন প্রচুর হিংস্র জন্তু জানোয়ার, তেমনই এর ভিতরে কুখ্যাত পাঠান দস্যু পশুভীল আর নারোজির ডেরা। ওরা কাউকে রেয়াত করে না, ঠাকুর। অন্ধকার নামলেই ওরা দলবল নিয়ে পাশের গ্রামগঞ্জে হানা দেয়!' রাজা ভীম অনুনয়ের সুরে বলল, 'আপনি দয়া করে আজকের রাতটা অন্তত এপারে থেকে যান।'

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। সামনে কালো প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে দিগন্তবিসারী বনভূমি, থমথম করছে। সেদিকে তাকিয়ে চৈতন্য মৃদু হাসলেন। রাজার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'বৃথা চিন্তা কোরো না ভীম। আমাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ জগন্নাথ আছেন, তিনিই রক্ষা করবেন। আমরা ঠিক পেরিয়ে যাব তাঁর নামগান করতে করতে।'

'কিন্তু ঠাকুর, এমন আঁধারে পথ হারিয়ে ফেলবেন যে!'

'হ্যাঁ, ঠিক কথা বলেছ। তুমি বরঞ্চ আমাদের কয়েকটা বড় মশাল দিয়ে দাও, তাতেই হবে।' চৈতন্য বললেন, 'গোবিন্দ, তুমি কী করবে? সঙ্গে যাবে, না থাকবে?'

'কী যে বলেন প্রভু!' গোবিন্দ মাথা নত করে বলল, 'আপনিই আমার জীবন্ত ঠাকুর!'

তখনও আকাশে দু'একটা সাদা রেখা। অন্ধকার ছুটে আসছিল গ্রাস করতে। রাজা ভীম নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে ছিল। তার চোখের সামনে দুটো জ্বলন্ত মশাল নাচতে নাচতে ঢুকে গেল বনের মধ্যে। অদৃশ্য হয়ে গেল একটু পরেই।

সূচীভেদ্য তমিস্রা। মশালের লালচে আভায় অরণ্যের শুঁড়িপথ সামান্য আলোকিত। দু দুটো মানুষ সেই আলোয় ছুটে চলেছেন নির্ভয়ে।

চৈতন্য বলে ওঠেন, 'গোবিন্দ, শুরু করো...হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ...'

'যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ...হরি বোল হরি হরি বোল জয় জগন্নাথ বোল...।'

'হরি হরি হরি বোল, মুকুন্দ মাধব গোবিন্দ বোল, জয় গোবিন্দ বোল...জয় জগন্নাথ বোল...হরি হরি হরি বোল, মুকুন্দ মাধব গোবিন্দ বোল, জয় গোবিন্দ বোল...জয় জগন্নাথ বোল...'

অরণ্যের নিবিড় নিস্তব্ধতা ভেদ করে উচ্চকিত কীর্তন ছড়িয়ে পড়ছে গাছে গাছে পাতায় পাতায়। পাখিরা ডানা ঝাপটে উঠছে, ছোট ছোট জন্তুরা লুকিয়ে পড়ছে।

'থামলে চলবে না গোবিন্দ, আজ আমাদের কঠিন পরীক্ষা, প্রভু আছেন, দেখছেন...গেয়ে যাও...গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন...গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন...'

'হরি বোল হরি হরি হরি বোল জয় জগন্নাথ বোল...'

'ঘ্রা-উ-ম—! ঘ্রা-উ-ম—! ঘ্রা-উ-ম!' অকস্মাৎ পরপর বিকট গর্জনে জঙ্গল কেঁপে উঠেছে। গোবিন্দ দেখল, একটু দূরে সরু পথের উপর শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে ছোট বড় কয়েকটা সিংহ। তাদের হলুদ চক্ষুগুলো দপদপ করছে। সে শিউরে উঠে থমকে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, পিছন থেকে চৈতন্য বলে ওঠেন, 'না গোবিন্দ, না...কখনো থামবে না...গাইতে গাইতে এগিয়ে চলো...কোনও ভয় নেই...তিনি আছেন, বলো—হরি বোল হরি হরি বোল হরি হরি বোল...।'

গোবিন্দ আরও জোরে জোরে গেয়ে উঠল, '...জয় জগন্নাথ বোল... জগন্নাথ স্বামী...নয়নপথগামী, ভবতু মে...জয় জগন্নাথ বোল...জয় মহাপ্রভু বোল...।'

সিংহ পরিবার বিভ্রান্ত! এই জনহীন বনে রাতের অন্ধকারে কোন সাহসে দুটো দ্বিপদ প্রাণী তাদের দিকে দিব্যি এঁকেবেঁকে এগিয়ে আসছে! তারা ফের বিরক্তির চাপা হুঙ্কার ছাড়ল, 'ঘ্রার-রর-র-র! ঘ্রার-র-রর-র!'

কী আশ্চর্য। এই হুঙ্কারেও দুপেয়ে দুটো থামল না। উল্টে তাদের দিকেই তেড়ে আসছে। হাতে আবার দু-দু'খানা আগুন। বেশ ভয়ের জিনিস। কী চায় এরা?

নাঃ, পরিস্থিতি সুবিধের নয়। ঝটপট আড়মোড়া ভেঙে সবকটা সিংহ উঠে দাঁড়াল, হলুদ চোখে এদের দেখতে দেখতে পথ ছেড়ে আরও গভীর বনের মধ্যে ঢুকে গেল।

গান থামিয়ে বলে ওঠেন চৈতন্য, 'কী গোবিন্দ, দেখলে তো? জানবে, ভয় সকলেরই আছে, আমাদের মাথার উপর আছেন জগন্নাথ প্রভু...ভয় কী রে ভাই, ভয় কী রে।

'চলো গোবিন্দ ভাই, এগিয়ে চলো...এই তো...দেখেছ, জঙ্গল কত পাতলা হয়ে গেছে, গাছপালার ফাঁক দিয়ে কেমন দুধের মতো জোছনা এসে পড়েছে...সবই তাঁর ইচ্ছা...আহা, কী সুন্দর...প্রভু হে...গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন...হরি হরি হরি বোল...জগন্নাথ বোল...!'

চলতে চলতে গাইতে গাইতে চৈতন্য একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। বনের অনেকটা দূরে কিছুটা স্থান আলোকিত। তাহলে কি এই বনে মানুষ আছে?

পরক্ষণে তাঁর মনে পড়ে গেল, রাজার কাছে শোনা দুই পাঠান ডাকাতের নাম। ওটা কি ওদের ঘাঁটি?

গোবিন্দ বলে ওঠে, 'প্রভু, সেই যবন ডাকাতগুলো নাকি?'

'হতেই পারে, হতেই পারে...যবন বলে কি ওরা মানুষ নয়, ডাকাত বলে কি হরির সন্তান নয়...চলো যাই, দেখি...!'

'কী বলছেন প্রভু? অন্যদিক দিয়ে গেলে হতো না? রাজা বলছিল, ওরা জানোয়ারের চেয়েও হিংস্র, বিপজ্জনক!'

'তো কী হয়েছে গোবিন্দ? আমাদের কাজই তো মানুষকে মনুষ্যত্বের পথে নিয়ে আসা...ভুলে যেও না, তুমি সন্ন্যাসী...ভয়কে জয় করো...চলো, চলো, আরও জোরে গাও...হরি হরয়ে...'

'নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ...হরি বোল হরি বোল...।'

আলোকিত এলাকার আরও কাছে এসে পড়েছেন দুজনে। এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, বনের মধ্যে দুটো বড় বড় মাটির বাড়ি, তাদের চতুর্দিকে মশাল জ্বলছে। আর ভিতর থেকে ভেসে আসছে মানুষের কথাবার্তা, কোলাহল।

বাড়ি দুটোর একেবারে কাছে এসে পড়তে সব স্পষ্ট হয়ে উঠল। কথাবার্তা নয়, কেউ কেউ শাসাচ্ছে, হুঙ্কার ছাড়ছে, আর অন্যরা কাকুতি মিনতি করছে, ডাক ছেড়ে কাঁদছে। এদের মধ্যে দুজন মহিলার কণ্ঠও শোনা যাচ্ছে।

'প্রভু, এখন?' গোবিন্দ বিমূঢ় স্বরে বলল, 'আমরা কি ভিতরে যাব?'

'নাঃ! ওরাই বেরিয়ে আসবে আমাদের গান শুনে।...নাও, আবার শুরু করে দাও—উচ্চস্বরে গাও, বাহু তুলে নেচে নেচে গাও...হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ...গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন...গাও হে গাও।'

চৈতন্যদেবের সঙ্গে গোবিন্দও গলা ছেড়ে গাইছে আর নাচছে, 'হরি বোল হরি হরি হরি বোল...।'

মুহূর্ত মাত্র। ঘরের দ্বার খুলে বেরিয়ে এল দুজন মানুষ। যমদূতের মতো তাগড়াই চেহারা, মাথায় পাগড়ি, ঢোলা পায়জামা-আচকান পরনে। মুখে ছুঁচলো দাড়ি, পাকানো গোঁফ। চোখ দিয়ে আগুন ঝরছে। তাদের পাশে আরও জনা পাঁচেক তলোয়ার হাতে সান্ত্রী।

'কে তোরা? হিঁদু সাধু? এখানে এসেছিস কেন? মরতে চাস?' অপেক্ষাকৃত বয়স্কজন চেঁচিয়ে উঠল।

'জানিস, আমরা কে?' পাশের জন বলে ওঠে।

'জানি ভাই, জানি। তোমরা ডাকাত। একজন পন্থভীল, অন্যজন নারোজী। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম...আল্লাহু আকবর...পরম প্রভুর নির্দেশে তোমাদের বাঁচাতে এসেছি।'

'কী! তোরা মুসলিম? ফকির? নামুমকিন। তাদের এমন পোশাক হয় না।'

'ভাই, আমরা মানুষ! আল্লাহর ইনসান, শ্রীকৃষ্ণ মহাপ্রভুরও সন্তান। বলো, আল্লাহর নামে দিব্যি দিয়ে বলো—বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম...বলো বলো...'

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম...।' মুখ ফসকে একজন বলে ফেলল।

'কুরআনের ১১৪ টা সুরা পড়েছ? বলো, আল্লাহর নামে কসম খেয়েছ, এবার বলো, তোমরা এখানে কী করছিলে?'

'কেন? তোমাকে বলব কেন? তুমি—তোমরা কারা?'

'আমরা! আমরা ফেরেস্তা। হে পথভোলা মানুষ, আমরা তোমাদের জাহান্নাম থেকে জন্নতে নিয়ে যেতে এসেছি। বলো, কী করছিলে?'

'বলব না। বাঁচতে চাও তো এখনই ভাগো!'

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, তোমরা যে আল্লাহর নামে কসম খেয়েছ ভাই, না বলে কি আর পার পাবে!' চৈতন্যের মুখমণ্ডল অপূর্ব হাসিতে আলোকিত হয়ে উঠেছে।

'তবে শোনো...।' দুই বাহু তুলে তিনি নাচতে নাচতে গেয়ে ওঠেন, 'যে রাম সেই আল্লা, যে খোদা সেই শ্রীকৃষ্ণ...গাও গাও...সবাই মিলে গাও—আল্লা আল্লা বলো সবে, আল্লা বিনা কে আর ভবে, আল্লা নাম যে জন লবে, সেই নামে সে উদ্ধারিবে।...আল্লা বোল হরি বোল আল্লা বোল...গাও গাও, এইভাবে দু'হাত তুলে নেচে নেচে গাও...আল্লা হরির ভজনা করো... তোমাদের সব পাপ ধুয়ে মুছে যাচ্ছে...!

দুই ডাকাত পন্থভীল আর নারোজী সম্মোহিত। কয়েক মুহূর্ত চোখ বড় বড় করে চেয়ে রইল চৈতন্যদেবের চোখের দিকে। সেই চোখে কী ছিল কে জানে, একটু পরেই ওরা হাত তুলে দুলে দুলে গাইতে শুরু করল, 'আল্লা বোল হরি বোল হরি বোল আল্লা বোল...।' ওদের সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র মাটিতে ফেলে দু'হাত তুলে নাচছে আর গাইছে ওদের সঙ্গীরাও।

চৈতন্যদেব ধীরে ধীরে ওদের দিকে এগিয়ে এলেন। দু'হাতে ধরলেন

দুজনকে। টেনে নিলেন বুকের মধ্যে। ওদের গায়ে মাথায় পরম মমতায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'ভাই রে, এত লোভ, এত হিংসা ক'দিনের জন্যে? সেই তো যেতে হবে খোদাতালা কি ভগবানের কাছেই, কেউ ঘুমোব মাটির নীচে, কেউ মিশব মাটিতে ছাই হয়ে...আয় রে ভাই, বুকের মাঝে আয়! পরম প্রভুর ভজনা কর—! গাও শুধু গাও—হরি খোদা একই নাম, চলো যাই আনন্দ ধাম...হরি বোল হরি হরি বোল...!'

দস্যু দুজন চিত্রার্পিত। আশ্চর্য জাদুকরের ছোঁয়ায় তাদের সমস্ত রাগ ঘৃণা হিংসা উধাও হয়ে যাচ্ছে, অপার শান্তিতে জুড়িয়ে যাচ্ছে বুকের ভিতর। ভেউভেউ করে কেঁদে ওঠে দুই ডাকাত, 'প্রভু, প্রভু, আমরা তোমার সঙ্গে যাব...আমরা সব ছেড়ে দেব প্রভু...!'

গোবিন্দ নাচতে নাচতে গেয়ে উঠল, 'হরি খোদা একই ভগবন, গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন...হরি বোল আল্লা বোল হরি হরি হরি বোল...!'

গভীর রাত্রির নিথর বনভূমিতে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে অলৌকিক সংকীর্তন, হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ...যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ...।

•

মুখে মুখে বার্তা ছড়িয়ে পড়েছে, তিনি আসছেন, তিনি আসছেন! দীর্ঘ দুবছর পরে ফিরে আসছেন নীলাচলে।

আজ সকাল থেকে প্রখর রোদ, প্রবল গরম। সেই দহন উপেক্ষা করে সারি সারি মানুষ দাঁড়িয়ে আছে পথের দুধারে। কারও হাতে ফুল, কারও হাতে গুঞ্জা ফুলের মালা, কেউ কেউ আবার খোল করতাল নিয়ে প্রস্তুত।

বাসুদেব সার্বভৌম সটান চলে গেছেন মন্দিরে, দাঁড়িয়ে আছেন গর্ভগৃহের বাইরে। তাঁর মনের মধ্যে আনন্দ আর উত্তেজনা।

হঠাৎ রৌদ্রের তেজ কমে গেল, কোত্থেকে আকাশকে ঢেকে ফেলেছে একখণ্ড বাদল মেঘ। মৃদুমন্দ বাতাস বইতে শুরু করেছে। তখনই ভেসে এল সম্মিলিত নামকীর্তন, হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ...। পরক্ষণে তিনি উদয় হলেন সদলবলে। সবাই চমকে উঠেছে।

এ কী চেহারা হয়েছে ঠাকুরের! ঘাড় ছাড়িয়ে নেমেছে জটাজুট চুল, মুখ ভর্তি দাড়িগোঁফ, চোখমুখ বসে গেছে, দেহ কঙ্কালসার, গায়ের রঙ পুড়ে তামাটে...চক্ষু বুজে তিনি হাত তুলে নাচছেন, গাইছেন, এগিয়ে আসছেন... জোরে জোরে খোল করতাল বাজছে। তাঁর পাশে গোবিন্দ ছাড়া ওই সাত-আটজন, ওরাই বা কারা? মাথায় পাগড়ি, ছোট পাজামা, লম্বা পিরান। ওদের মুখাবয়ব, বেশভূষা একেবারে আলাদা।

দর্শনার্থীদের মধ্যে থেকে গুঞ্জন ওঠে, 'এরা ভিনদেশি না হয়ে যায় না।' পাশ থেকে আরেকজন বলে উঠল, 'মনে তো হচ্ছে, বিধর্মী।' প্রথমজন বলে, 'তাতে সমস্যাটা কী? দেখোনি, সবজাতের মানুষই এসে যাচ্ছে ওনার পায়ের তলায়।' 'তা বটে, তা বটে। যবন হরিদাস তো সমুদ্রের ধারে ঝুপড়ি বানিয়ে রয়েই গেল। ওই দ্যাখো, সেও এসেছে।'

পথের অন্য দিক দিয়ে আরেকটি দল বেরিয়ে এসেছে। তারাও খোল করতাল মৃদঙ্গ বাজিয়ে নাচ গান করছে, প্রভুকে স্বাগত জানাচ্ছে। দলের একেবারে সামনে রয়েছেন চৈতন্যদেবের জুড়ি নিত্যানন্দ, পাশে মুকুন্দ, দামোদর, জগদানন্দ, গদাধর, হরিদাস ও অন্য পরিকররা।

দেখতে দেখতে বিশাল হয়ে উঠেছে দল। চারপাশের মানুষরাও ছুটে আসছে, ফুল-মালা ছুড়ছে, যোগ দিচ্ছে। শোভাযাত্রা এসে পড়ল মন্দিরের সিংহদ্বারের কাছে।

এমন সময় ঘটে গেল সাংঘাতিক ঘটনা। শ্রীচৈতন্য চক্ষু বুজে দুহাত তুলে নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে আসছিলেন। দুয়ারের সামনে এসে অকস্মাৎ তিনি তিরবেগে ছুট দিলেন। দুটি মাত্র বুলি, চিৎকার করে বলছেন বারংবার—মোর জগন্নাথ স্বামী, নয়নপথগামী...মোর জগন্নাথ স্বামী, নয়নপথগামী...! ছুটছেন, তিনি ছুটে যাচ্ছেন। সম্পূর্ণ দিব্যোন্মাদ, বাহ্যজ্ঞান নেই। সামনে যে এসে পড়ছে, ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিচ্ছেন, দেহে যেন শত হস্তীর বল! এমনকী বাসুদেব যে থামাতে এসেছিলেন, এক ধাক্কায় তিনিও ছিটকে গেছেন।

ছুটতে ছুটতে চৈতন্য গর্ভগৃহের কাছে পৌঁছে গেছেন। পাণ্ডারা বিভ্রান্ত। এবার কী করবেন চৈতন্য? আবার জগন্নাথদেবকে কোলে তুলে নেবেন?

সিঁড়ি অবধি এসে গেছেন। আর তিনটে সিঁড়ি উঠলেই জগন্নাথদেব। হঠাৎ শেষ ধাপে মারাত্মক হোঁচট। পড়ে গেলেন হুমড়ি খেয়ে। পরক্ষণে সম্পূর্ণ অজ্ঞান। তাঁর কৌপীন খুলে গেছে, হাতের করতাল গিয়ে পড়েছে অনেকটা দূরে।

বাসুদেব সার্বভৌম ছুটে এলেন। সস্নেহে ভাগ্নের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'বাবা গৌরাঙ্গ, চোখ মেলে দ্যাখো, এই যে আমি।'

৫

কুলুঙ্গিতে পঞ্চমুখী বাতিদান জ্বলছে। দেদীপ্যমান আলো ছড়িয়ে পড়েছে প্রশস্ত ঘরে। ঠিক নীচে চৌকির উপর দুটি পুঁথি, একটি খোলা। গভীর মনোযোগ দিয়ে তিনি পড়ছেন। পশ্চিমের জানালা দিয়ে হু-হু করে ছুটে আসছে সমুদ্রের বাতাস, মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে আলো, এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে পুঁথির পাতা।

অসাধারণ দুটি গ্রন্থ, কর্ণামৃত এবং ব্রহ্ম সংহিতা। রামানন্দ এসে ফেরত দিয়ে গেছে তাঁকে। যত পড়ছেন, তত বিস্মিত হচ্ছেন। সাধে কি দিগ্বিজয়ী সেকেন্দার শা বলেছিলেন, সত্য সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ। একই সনাতন ধর্ম, অথচ কত দর্শন, উপলব্ধি, বিশ্বাস। সবার অভিমুখ অবশ্য এক—ঈশ্বরপ্রাপ্তি।

খুট! শব্দ হল, তিনি মুখ তুলে তাকালেন। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বাসুদেব সার্বভৌম, 'আসতে পারি?'

'কী যে বলো মামা! ভাগ্নের ঘরে ঢুকতে জিগ্যেস করছ?'

'একা হলে করতাম না ভাগ্নে। সঙ্গে আরেকজন আছেন যে। তিনি আসার জন্যে এমন বায়না করলেন। তাঁর রাজস্বেই রয়েছি।'

'সে কী! নিয়ে এসো।' শ্রীচৈতন্য বিব্রত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'আসুন মহারাজ। জয় জগন্নাথ।'

'জয় জগন্নাথ। আপনাকে প্রণাম।' প্রতাপরুদ্র ঘরে ঢুকে আভূমি নত হয়ে বললেন, 'ঠাকুর, অনেকদিন ধরে আপনার সঙ্গ চাইছিলাম। রথযাত্রার সময়ে আপনার স্পর্শ পেয়ে ধন্য হয়েছি। কথা হয়নি। আপনার পরামর্শ ছাড়া আমি নিরুপায়।'

'বসুন মহারাজ।' চৈতন্য মৃদু হেসে বললেন, 'আমি জগন্নাথদেবের সামান্য সেবকমাত্র, আমার কাণ্ডজ্ঞান আর কতটুকু যে আপনাকে সাহায্য করব।'

'আপনি ভূয়োদর্শী, যেটুকু প্রসাদ পাব তাতেই ধন্য হব।'

'বেশ। আপনার অনুগ্রহে আছি, নিশ্চয়ই বলব মহারাজ। আপনি না থাকলে রথযাত্রার দিন কী ঘটত, আন্দাজ করতে পারি। তবে—'

থেমে বললেন, 'আমাদের আলাপের সময় এই ঘরে আর কেউ থাকবেন না।'

বাসুদেব তাড়াতাড়ি পাশের লোকটিকে দেখিয়ে বলে ওঠেন, 'ইনি মহামন্ত্রীর বিশেষ সচিব, প্রতিরক্ষার দায়িত্বে, জটাধর পাণিগ্রাহী। ইনি না থাকলে—'

চৈতন্য হাসলেন, 'আমি অপারগ।'

'আচ্ছা, আচ্ছা। প্রণাম ঠাকুর।' জটাধর দ্রুত বেরিয়ে গেল।

কয়েক মুহূর্ত সেইদিকে চেয়ে থেকে চৈতন্য নীচুগলায় বললেন, 'মহারাজ, আপনার তো কাঁটার সিংহাসন। হোসেন শাহর ঘনিষ্ঠ জেনেও মহামন্ত্রীকে পুষছেন, তার চেলাকে রেখেছেন প্রতিরক্ষায়। এর কারণটা কী?'

'আ-আপনি...সব জানেন...! হ্যাঁ ঠাকুর, এর কারণ হল আমার দুই সীমান্তেই শত্রু বসে আছে। রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র উৎপাটন করার আগে আমি বাইরের শত্রুদের শেষ করতে চাই।'

'ভুল চিন্তা।' চৈতন্য বলেন, 'আপনি এখনই বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায়কে নিষ্ক্রিয় করতে পারেন।'

'কী করে ঠাকুর? কৃষ্ণ অতি আগ্রাসী যুবক, সে উড়িষ্যা জয় করতে চায়।'

'নিশ্চয়ই চায়। সেইজন্যই আগে ওর সঙ্গে সন্ধি করুন, শর্ত হিসেবে আপনার রূপসী জ্যেষ্ঠা কন্যা ভদ্রার সঙ্গে তার বিবাহ প্রস্তাব পাঠান। আমি নিশ্চিত, সে সম্মত হবে। তারপর আচম্বিতে অতি গোপনে যৌথ শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ুন গৌড়ের উপর। তবে সবার আগে এই ধূর্ত শৃগালটিকে সরিয়ে দিন। তার পর—'

চৈতন্যকে থামিয়ে দিয়ে প্রতাপরুদ্র বললেন, 'গোবিন্দর প্রতি আমার বিশেষ দুর্বলতা আছে ঠাকুর। আমি যেবার কৃষ্ণর সঙ্গে যুদ্ধে আহত হয়ে মৃত্যুমুখে, সে আমায় শুশ্রূষা করে বাঁচিয়ে তোলে। সেকথা কী করে ভুলি ঠাকুর?'

'জয় জগন্নাথ।' চৈতন্য দু'হাতে আলিঙ্গন করেন রাজাকে। বলেন, 'আপনি সত্যিই পরম বৈষ্ণব, তবে রাজা হওয়ার যোগ্য নন।'

প্রতাপরুদ্র তড়িতাহত! তাঁর সর্বাঙ্গে আনন্দের শিহরন খেলে যাচ্ছে। অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'এমনই যেন থাকতে পারি ঠাকুর। জয় জগন্নাথ।'

প্রণাম করে বেরিয়ে গেলেন।

বাইরে থেকে কাশী মিশ্র বলে ওঠেন, 'প্রভু। আপনার সহচরগণ এসে গেছেন।'

'হরি বোল।' নিত্যানন্দ ঢুকলেন। তাঁর পিছনে হরি নাম করতে করতে একে একে প্রবেশ করলেন অদ্বৈত আচার্য, শ্রীবাস পণ্ডিত, মুকুন্দ, দামোদর পণ্ডিত, মাধব দাস, গদাধর, গোবিন্দ, পরমানন্দ পুরী এবং যবন হরিদাস।

'ভাইসব, বোসো।' চৈতন্য আবেগদীপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'আজ আমরা মহাসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি। পরমপদকমলে আমাদের ভক্তি ভালোবাসা আজ ছড়িয়ে পড়ছে দেশের দিকে দিকে। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের অত্যাচারে সনাতন ধর্মের মধ্যে মানুষে মানুষে যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল, আমাদের বৈষ্ণব ভক্তিবাদ সেই জাতপাতের বেড়া ভেঙে দিয়েছে, সব বর্ণ ধর্ম ও জাতের মানুষকে মিলনের উৎসবে নিয়ে এসেছে।

'এর ফলে অন্য ধর্মে চলে যাওয়া মানুষদের সংখ্যা শুধু যে কমছে তাই নয়, পরম প্রভুর নামগানে আকৃষ্ট হয়ে অন্য ধর্ম থেকেও দলে দলে মানুষ বৈষ্ণব হয়ে যাচ্ছেন। জয় জগন্নাথ!'

সবাই বলে উঠল, 'জয় জগন্নাথ। জয় শ্রীকৃষ্ণ।'

'কিন্তু ভাইসব, আমাদের থেমে থাকলে চলবে না। ভক্তিবাদের প্রেম, ভালোবাসার আলো ছড়িয়ে দিতে হবে দূর-দূরান্তরে।' চৈতন্য বললেন, 'যার যেখানে পিতৃভূমি, সেইখানে গিয়ে আশ্রম গড়তে হবে। আরও বেশি করে মানুষকে সংঘবদ্ধ করতে হবে ব্রাহ্মণ্যবাদের মোকাবিলায়, প্রেম ভালোবাসা ভক্তি দিয়ে সকলের মন জয় করতে হবে।

'আমি স্থির করেছি, আর কিছুদিনের মধ্যে আবার বেরিয়ে পড়ব। গৌড় দেশ হয়ে যাব বৃন্দাবন মথুরা। আমি চাই, তোমরা অবিলম্বে নিজ নিজ অঞ্চলে চলে যাও, গিয়ে আশ্রম তৈরি করো, মানুষকে একজোট করো। আমি সেই সেই স্থানে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব। আমাদের লক্ষ্য একটাই— ভক্তিরসের প্লাবনে দেশের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডাল, যবন, মুচি মেথর ছোট-বড় সবজাতের মানুষকে ভাসিয়ে দেব, সকলকে নিয়ে আসব বৈষ্ণববাদের ছাতার নীচে। তবে...

'তবে মনে রেখো, আমরা বৈষ্ণব সন্ন্যাসী। আমরা যেমন অতিরিক্ত কঠোর নিয়মনীতি দিয়ে মানুষকে শিকলে বাঁধব না, তেমনই ভক্তিরসের নাম করে ভোগী, উচ্ছৃঙ্খলও হব না। মানুষ আমাদের শ্রদ্ধা করবে! ভয় পাবে না, বা আড়ালে টিটকিরি দেবে না।...'

নিত্যানন্দ আর অদ্বৈত আচার্য সহসা মুখ নত করলেন।

'আহা, আহা, কী বললেন প্রভু!' যবন হরিদাস দু'হাতে তালি দিয়ে গেয়ে উঠল, 'হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ, যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ...।' পাশ থেকে সুর মেলাল দামোদর, 'জয় জগন্নাথ বোল হরি হরি হরি হরি বোল...গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন...!'

গাইতে গাইতে তারা ভাবাবেশে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে, গদাধর উঠে দাঁড়িয়ে দুহাত তুলে নৃত্য করছে, 'মুকুন্দ মাধব গোবিন্দ বোল, জয় জগন্নাথ বোল, জয় জগন্নাথ বোল, হরি হরি হরি—'

'প্রভু, প্রভু!' হঠাৎ কাশী মিশ্র ঘরে ঢুকে এসেছেন, তিনি চেপে ধরে রেখেছেন একটি লোকের হাত।' হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'এই যে প্রভু, এই শয়তানটা! আড়াল থেকে আপনাদের কথা শুনছিল।'

সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবাস পণ্ডিত উঠে দাঁড়িয়েছেন। তেড়ে গিয়ে লোকটার গলা টিপে ধরেছেন, 'বল, বল, এখনই বল, তুই কে, কোত্থেকে এসছিস, কে তোকে পাঠিয়েছে!'

'আহা করো কী শ্রীবাস, শান্ত হও। বলো ভাই, কী নাম তোমার!'

লোকটা অস্ফুটে বলে, 'নন্দলাল পারিধা।'

'বাঃ বাঃ, স্বয়ং প্রভুর নাম।' চৈতন্য মুখ টিপে হাসছেন, 'কে পাঠিয়েছেন তোমায়?'

'ঠাকুর, অন্যায় করেছি। ক্ষমা করুন।'

'নিশ্চয়ই করব ভাই। এসো, কাছে এসো, বোসো।' চৈতন্য কোমল সুরে বলেন, 'পেটের জ্বালা যে বড় জ্বালা!' নন্দকে কাছে টেনে ওর গায়ে মাথায় হাত বুলোতে থাকেন, 'গাও ভাই গাও...জয় জগন্নাথ বোল...জয় গোবিন্দ জয় শ্রীকৃষ্ণ বোল...গাও গাও...!'

নন্দ বিদ্যুৎপৃষ্ঠ। তার চাতুর্য ছলনা কোথায় যে হারিয়ে গেল! সে মন্ত্রমুগ্ধের মতো গাইতে থাকে, 'জয় জয় জয় জগন্নাথ বোল, জয় জয় জয় গোবিন্দ বোল...!'

'এই তো! তোমার সব পাপ, সব অন্যায় ধুয়ে মুছে যাচ্ছে। গাও নন্দ প্রাণভরে গাও, আর মুখ ফুটে বলতে হবে না তোমায়, কে পাঠিয়েছেন। আজ থেকে তুমি আমাদের দলে।'

●

চৈতন্যদেব ধীরে ধীরে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গলুইয়ে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর সঙ্গী সাথী, মাঝি মাল্লারা এখনও নিদ্রামগ্ন। অন্ধকার তরল হয়ে আসছে, মৃদুমন্দ বাতাস বইছে, পৃথিবীতে ফিরে আসছে আবার নতুন দিন। চৈতন্যের অন্তর এখন আনন্দে পরিপূর্ণ, প্রভুর প্রতি ভক্তিপ্রেমে আপ্লুত। তিনি রাজার মতো চলেছেন নগর গ্রাম জয় করতে করতে।

ঠাকুর গৌড় পরিদর্শনে যাচ্ছেন শোনামাত্র উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁর সমস্ত সুরক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করলেন। সীমান্তের এপারে রেমুনার বিধর্মী অধিকারী ছিল হিন্দুবিদ্বেষী, আশ্চর্য জাদুতে সেও তাঁর পায়ে শরণ নিল। এই বহরের তিনটি বজরায় তারই রক্ষীরা এখন সন্ন্যাসীদের পাহারা দিচ্ছে।

পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর বুকে ভেসে চলেছে দশটি বজরার বৃহৎ বহর, এক জনপদ থেকে অন্য জনপদে, কখনও স্থলে কখনও জলে, চলেছে অষ্টপ্রহর সংকীর্তন। চৈতন্যর কাছে এ যেন এক স্বপ্নের শোভাযাত্রা।

পিছনে ফেলে এসেছেন পানিহাটি, কুমারহট্ট, নবদ্বীপ, ফুলিয়া, শান্তিপুর, কালনা, কাটোয়া। প্রতিটি জনপদেই জীবন্ত বিগ্রহকে দেখার জন্য, তাঁর কথা শোনার জন্য, তাঁর নামগানে যোগ দেওয়ার জন্য সে কী বিপুল উন্মাদনা! সর্বত্রই ছিলেন তাঁর অনুগামী, পরিকরবৃন্দ—নিত্যানন্দ, দামোদর, শ্রীবাস, অদ্বৈত, মুকুন্দ...। চৈতন্য কয়েকদিন ধরে এই সব নগরে থেকেছেন, হাজার হাজার উঁচু-নীচু সব জাতের মানুষ দীক্ষিত হয়েছে বৈষ্ণবধর্মে। কৃষ্ণ প্রেমে আজ মাতোয়ারা গৌড় বঙ্গ।

তাঁর মনে পড়ে যাচ্ছে, প্রথম নীলাচল যাত্রার সেইসব দিনরাত্রির কথা। আজ যেন মনে হয়, দুঃস্বপ্ন। মাত্র পাঁচ বছরে কী বিরাট পট পরিবর্তন।

চরৈবেতি, চরৈবেতি। এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো। জাগিয়ে তোলো নিদ্রাচ্ছন্ন জাতিকে।

'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে...' গোবিন্দ ঘুমজড়ানো চোখে দুলতে দুলতে বাইরে বেরিয়ে এসেছে, 'প্রভু, আপনি কখন উঠে—'

শ্ শ্ শ্! হাতের ইশারায় তাকে থামিয়ে দিলেন চৈতন্য। তিনি শিহরিত। নদীর কুল থেকে ভেসে আসছে অপূর্ব কীর্তন গান।

'রাই জাগো গো...জাগো শ্যামের মনমোহিনী বিনোদিনী রাই...জেগে দ্যাখো...আর তো নিশি নাই গো...জয় রাধে... জাগো শ্যামের মনমোহিনী বিনোদিনী রাই...।'

কে গায়, কে গায়? ওই যে, ওই যে। নদী থেকে জল তুলতে এসেছে কয়েকটি তরুণী, তাদের কাঁখে কলসি। কলসি নামিয়ে একজন বিভোর হয়ে গাইছে, পাশে দোহার দিচ্ছে তার সখীরা, '...জাগো শ্যামের মনমোহিনী বিনোদিনী রাই...।'

চৈতন্যদেব মুহূর্তে স্তব্ধ, বিহ্বল। এই গান কে বাঁধল? আগে তো শোনেননি কোথাও।

মেয়েটি বিভোর হয়ে গেয়ে চলেছে, দোহারে গেয়ে উঠছে সখীরা।

'বাসি ফুল জলে ফেলিয়া...আনো সবে ফুল তুলিয়া...সে ফুল দিয়া যুগলে সাজাইয়া...জয় রাধে... জাগো শ্যামের মনমোহিনী বিনোদিনী রাই...।'

'আহা, আহা...গোবিন্দ, ওদের ডাকো ভাই...আমি শুনব, আরও শুনব।' অস্ফুটে বলে ওঠেন চৈতন্য, আবেশে তাঁর চক্ষু বুজে এসেছে, তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন বৃন্দাবনের কুঞ্জ, দেখতে পাচ্ছেন যমুনা নদীতে জলবিহার করছেন গোপিনীরা।

'আমার তোমার সেবার দাসী...যুগল চরণ ভালোবাসি...যুগল বিনা অন্য আশা নাই গো...জয় রাধে...জাগো শ্যামের মনমোহিনী বিনোদিনী রাই...।'

ভোরের কুসুম আলো ফুটে উঠছে নদীর বুকে, দুপারের জনপদে। শরৎকাল, নির্মেঘ নীল আকাশে তুলো মেঘেদের গায়ে সোনার রঙ। শরীর স্নিগ্ধ হয়ে যাচ্ছে নির্মল বাতাসে। চৈতন্য বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন, স্থির দাঁড়িয়ে আছেন বজরার মোটা দণ্ডটি জড়িয়ে।

'প্রভু, প্রভু! কী হল আপনার?' গোবিন্দ উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁকে স্পর্শ করে, 'চলুন, বিশ্রাম নেবেন।'

'ওরা কই গো? ওদের নিয়ে এসো আমার কাছে। আমি যে গানটা বারবার শুনতে চাই গোবিন্দ। আহা, কী গান, বুকের মধ্যে তিরের মতো বিঁধে গেল... হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ...' ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন, বন্ধ চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

'ওদের এখানে আনা অসম্ভব প্রভু। ওরা পতিত নারী, নগরনটী। ওরা নাচগান করে বেড়ায়।'

'তাতে কী হয়েছে গোবিন্দ?' চৈতন্যদেব চক্ষু মুদ্রিত অবস্থাতেই বললেন, 'জানো না, আমাদের ধর্মে কেউ পতিত নয়, কেউ উপনীত নয়, তিনিই প্রথম তিনিই শেষ! যাও, এখনই ওদের নিয়ে এসো।'

গোবিন্দ বিমূঢ়, দ্বিধান্বিত। কী করবে? একদিকে প্রভুর আদেশ, অন্যদিকে লোকনিন্দার ভয়। কক্ষ পেরিয়ে বাইরে বেরোতেই দেখে মুকুন্দ দাঁড়িয়ে। সে বলে ওঠে, 'প্রভু একরোখা মানুষ। গোবিন্দ, তুমি সাকর আর দবিরকে খবর পাঠাও।'

'ওদের আসার সঙ্গে সমস্যার কী সম্পর্ক?'

'শোন, আমরা সুলতানের খাস তালুকে এসে গেছি। ওরা তাঁর মন্ত্রী, পাকা বুদ্ধির লোক, আবার প্রভুর শিষ্যত্বও নিয়েছে। বাকিটা ওদের উপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো।'

দুই দণ্ড সময় কেটে গেছে। চৈতন্যদেব একই জায়গায় চক্ষু বুজে বসে আছেন। সাকর আর দবির এসে দাঁড়াল, 'প্রভু, উঠুন! আমরা এসে গেছি। লোক পাঠিয়েছি, কিছুক্ষণের মধ্যে মেয়েদের নিয়ে আসছে।'

চৈতন্য চোখ মেলে চাইলেন। স্মিত হেসে বলেন, 'খুব ভালো করেছ ভাই। গোবিন্দ মুকুন্দ আসলে ভিতু। নিজেদের যতই মুক্তমনা বলুক, লোকনিন্দার ভয় থেকে বেরোতে পারে না। ওরা ভুলে যায়, কোনো কাজই ছোট নয়। যে মেয়েরা অমন আকুল হয়ে কৃষ্ণকে ডাকতে পারে, তাদের চেয়ে বড় সাধিকা আর কে আছে! ওরা তো সাক্ষাৎ গোপিনী গো। আজ ওদের বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা দেওয়া হবে। তখন সব দ্বিধা সংশয় মুছে যাবে।...আর বলো ভাই, এদিকের কী সংবাদ?'

'আবার হয়তো উড়িষ্যার সঙ্গে গৌড়ের যুদ্ধ বাধবে। হোসেন শাহ কিছুতেই গতবারের বিফলতা মেনে নিতে পারছেন না।'

'বিফলতা! কীসের? উনি তো সেবার উড়িষ্যার অনেকটা অংশ দখল করে নিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ প্রভু। তারপরে যে রাজা প্রতাপরুদ্র এসে উড়িষ্যার জমি পুনরুদ্ধার করে নিলেন, সে তো একরকম হেরে যাওয়াই হল।'

'পরের রাজ্য দখল করে রাখা কি ন্যায় কাজ?'

'রাজা-বাদশাদের ন্যায় অন্যায় কি আর আমাদের সঙ্গে মেলে।' দবির দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'প্রভু, বিশ্বাস করুন, খুন জখম মারামারি কাটাকাটি আর ভালো লাগছে না। সুলতান আমাদের বড়ই ভালোবাসেন, বিশ্বাস করেন। তিনি কিছুতেই ছাড়তে চাইছেন না। কী যে করি, বুঝতে পারছি না।'

সাকর বলল, 'জানেন প্রভু, মানুষটা মন্দ নয়। আমরা যে আপনার শিষ্যত্ব নিয়েছি, জানেন। আপনি আসছেন খবর পেয়ে নিজেই আমাদের ডেকে পাঠালেন। জিগ্যেস করলেন, তোমাদের চৈতন্যদেব কেমন মানুষ? যা শুনছি, তিনি তো সাধারণ মানুষ নন।'

'আমরা বললাম, হুজুর, তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের প্রতিনিধি।' দবির বলল, 'তাঁর কাছে খোদা কৃষ্ণের মধ্যে কোনো তফাত নেই, দুজনকেই মানেন। তিনি মনের চৈতন্য প্রকাশ করেন, তাই তাঁর নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তাঁর কাছে গেলে সব সংশয় দ্বন্দ্ব দূর হয়ে যায়।'

চৈতন্যদেব মৃদু মৃদু হাসছেন।

'সুলতান শুনে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। বললেন, তবে তো তিনি আল্লারই নতুন রূপ। তাঁকে সমাদর করে রাখো। দেখো, তাঁর যেন কোনো দিক্কত না হয়। যদি কেউ তাঁকে বিরক্ত করে, তো আমি তার জান খতরা করে দেব। তারপর বললেন, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এলে বহোত খুশি হব।'

'তোমরা কী বললে?' চৈতন্যদেব এতক্ষণে কথা বললেন।

'আমরা বললাম, হুজুর, উনি রাজা বাদশাদের কাছে যান না। বলেন, আমি সন্ন্যাসী, আমার ওনাদের কাছে কিছু পাওয়ার নেই।'

'বাঃ! বেশ বলেছ।' চৈতন্য বললেন, 'শুনেছি, আজ সন্ধ্যায় এই রামকেলি গ্রামের কানাইয়ের বাড়িতে কীর্তন পালা বসবে। দাক্ষিণাত্য থেকে শুনে আসা দু-এক কলি হরিনাম কীর্তন তোমাদের শোনানোর ইচ্ছে আছে। সুর তাল ভাষা অন্য, কিন্তু ভক্তিরসে বড়ই মধুর।'

এইসময় ঘাটের দিক থেকে বেশ কিছু বামাকণ্ঠ ভেসে এল। সঙ্গে টুংটাং বাদ্যযন্ত্রের শব্দও। মুহূর্তে চৈতন্যের চোখমুখ ঝলমল করে উঠল। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বলে উঠলেন, 'ভাইসব! মা বোনেদের যত্ন করে নিয়ে এসো।'

মধুর কণ্ঠে পাশের সাকর খাসকে বললেন, 'সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। তুমি হলে আমার সনাতন, তুমি যাবে আমার সঙ্গে কাশী মথুরা বৃন্দাবনে।' দবির মল্লিককে বললেন, 'আর তুমি হলে আমার রূপ, তুমি যাবে নীলাচল, আমাদের অভিভাবক পরমানন্দ পুরীর সঙ্গে। আমার অবর্তমানে জগন্নাথ প্রভুর পূজা প্রার্থনায় যাতে বিন্দুমাত্র ছেদ না পড়ে, তার দায়িত্ব তোমারই।'

মধ্যাহ্ন হতে আর এক দণ্ড সময় বাকি। শরৎকাল। নদীর জলসিক্ত উদ্দাম হাওয়া, তাই রৌদ্রের তেজ তত প্রখর হয়ে ওঠেনি।

গলুইয়ের চওড়া মেঝেতে আসন পাতা। সেখানে গোল হয়ে বসেছে ছয়জন তরুণী। প্রত্যেকের পরনে লাল পাড় শাড়ি। কপালে চন্দনের তিলক। সকালের মেয়েটিই গায়েন। তার কোকিল কণ্ঠে শুরু হয়ে গেল নতুন কীর্তন।

'বনমালী তুমি পরজনমে হইও রাধা...বনমালী তুমি পরজনমে হইও রাধা...

তুমি আমারই মতন জ্বলিও জ্বলিও...বিরহ কুসুম হার গলেতে পরিও...
তুমি যাইও যমুনার ঘাটে...নাহা মানি ননদীরও বাধা...'

দোহার দিয়ে ওঠে, 'বনমালী তুমি পরজনমে হইও রাধা...'

'আহা আহা...!' সকলে সবিস্ময়ে দেখল, চৈতন্যদেব ভাবাবেশে বিভোর হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন, দুবাহু তুলে নাচছেন আর অস্ফুটে গাইছেন, 'বনমালী তুমি পরজনমে...।'

মেয়েটি গেয়ে চলেছে,

'তুমি আমারই মতন কান্দিও কান্দিও...কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম বদনে জপিও...
তুমি বুঝিবে তখন নারীর বেদন...রাধার পরানে কত বাধা...'

মেয়েদের গানের পর গান চলতেই থাকে...মাঝে মাঝে চৈতন্য সঙ্গীদের নাম সংকীর্তন। সূর্য ঢলে পড়ে পশ্চিম দিগন্তে...গান ও কীর্তনের সঙ্গে চলতে থাকে চৈতন্য ও পরিকরগণের উদ্বাহু নৃত্য...। ঘাটে জড়ো হয়েছে হাজার নারী-পুরুষ-শিশু-প্রৌঢ়-বৃদ্ধ! তারাও সকলে গাইছে, নাচছে...। সেই নৃত্য গীত করতে করতে এক বিশাল পদযাত্রা এগিয়ে চলে রামকেলি গ্রামের দিকে। মহাপ্রভু আপাতত কয়েক দিন এই গ্রামের নাটশালায় অবস্থান করবেন।...

চৈতন্যদেব তাঁর লক্ষ্যে স্থির। সেই রাতেই তিনি ভূর্জপত্রে চিঠি লিখে ফেললেন উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র দেবকে। অতি সংক্ষিপ্ত পত্র।

'মহারাজ, সুলতান ফৌজ সাজাচ্ছেন। আপনি তাঁকে সে সুযোগ দেবেন না। অবিলম্বে আক্রমণ করুন সম্মিলিত শক্তি নিয়ে। তাঁর প্রধান দুই অবলম্বন সাকর ও দবির পরমপ্রভু কৃষ্ণ-জগন্নাথের শরণ নিয়েছে, ওদের নতুন নাম রূপ ও সনাতন। সনাতন যাচ্ছে আমার সঙ্গে বৃন্দাবনে, রূপ যাচ্ছে পরমানন্দ পুরীজির সঙ্গে, নীলাচলে।'

ঠিক দু'দিন পরে তাঁর পত্র নিয়ে নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করলেন পরমানন্দ পুরী ও রূপ।

৬

বৃন্দাবন থেকে দীর্ঘ দুর্গম পথযাত্রা। বিস্তীর্ণ অরণ্যের মাঝে মাঝে দু'একটা ক্ষুদ্র গ্রাম, জনপদ, শস্যখেত। চারজন পথিক, হেঁটে চলেছে যমুনা নদীর অববাহিকা ধরে, গন্তব্য প্রয়াগঘাট—মহাতীর্থ ত্রিবেণী সঙ্গম। যমুনা সেখানে মিলিত হয়েছে গঙ্গা ও সরস্বতী নদীর সঙ্গে।

প্রয়াগ আর বেশি দূরে নেই। চারজন পথিকই নামগানে বিভোর। হরি ভজনা করতে করতে তারা পার হয়ে এসেছে কয়েকশো ক্রোশ পথ। পথের দু'ধারে সবুজ প্রান্তর।

হঠাৎ নেতা বললেন, 'তিষ্ঠ, তিষ্ঠ। প্রভুর বাঁশি শুনতে পাচ্ছ?'

'বাঁশি? হ্যাঁ ঠাকুর, ওই তো! রাখাল ছেলেটা কী সুন্দর বাঁশি বাজাচ্ছে।'

'মূর্খ! তোমরা মূর্খ! সুর শুনেও বুঝতে পারছ না, ও সাধারণ রাখাল নয়, স্বয়ং মুরলীধর! প্রভু, আমার প্রিয়তম প্রভু! হরি হরি কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ...!' উন্মত্তের মতো নাচতে আরম্ভ করলেন দীর্ঘকায় মানুষটি, নাচতে নাচতে ধাবিত হলেন বালকের উদ্দেশে।

রাখাল ছেলেটা বেজায় ভয় পেয়ে গেল। উরেব্বাপ, লোকটা নির্ঘাত বদ্ধ উন্মাদ, তাকে ধরতে আসছে। বাঁশি লাঠি সব ফেলে রেখে সে প্রাণভয়ে দৌড় দিল। ছেলেটা ছুটছে, পিছন পিছন বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ছুটছেন তিনি, পিছনে বাকি তিনজন। অতি অল্পক্ষণের মধ্যে ছেলেটা অদূরে গ্রামের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এর ফল হল আরও সাংঘাতিক। মানুষটি প্রচণ্ড অস্থির হয়ে উঠলেন, বুক চাপড়ে আর্তনাদ করতে লাগলেন, 'হায়, হায়, প্রভু, প্রভু, আমি কী দোষ করেছি গো, তুমি দেখা দিয়েও চলে গেলে...!' তাঁর দেহ কাঁপতে লাগল থরথর করে, চক্ষু দিয়ে অঝোর অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। একটু পরেই তাঁর মুখ দিয়ে ফেনা বেরোতে থাকে, তিনি অচৈতন্য হয়ে এলিয়ে পড়লেন ভূমিতে।

তাঁর সঙ্গীরা গুরুর এই অবস্থার সঙ্গে পরিচিত। তারা চোখেমুখে ঘটি থেকে জল ছিটাতে থাকে, 'ঠাকুর, ও ঠাকুর...।'

'আাই, ছাড়, ওকে ছাড়...। মুস্তাফা, সবকো পাকড়ো।' পথিকরা ভয়ার্ত চোখে দেখল, ওদের ঘিরে ফেলেছে সশস্ত্র একদল অশ্বারোহী পাঠান সৈনা। তাদের দলপতি নেমে এল ঘোড়া থেকে। কর্কশ কণ্ঠে বলল, 'বেতমিজ, বেয়াদব! এই সাধুটার সব কেড়ে নিয়ে বিষ খাইয়ে দিলি! বল, বল, ওকে কী বিষ দিয়েছিস?'

'বিশ্বাস করুন হুজুর, উনি—'

'চোপ! ঝুটি বাত! তোদের এত সাহস, আমার এলাকায় এসে রাহাজানি করছিস! জলদি স্বীকার কর, নয়তো এখনই—'

এইসময় মানুষটি চোখ খুললেন। হাঁ করে পাঠান সেনাদের দেখতে দেখতে বললেন, 'কী হয়েছে ভাই! তোমরা কারা?'

'সন্তজী, আমরা বাদশার ফৌজ, আমি ফৌজদার বিজুলি খান। এই ডাকুরা আপনাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলছিল। আমরা টহল দেওয়ার সময়ে দেখতে পেয়ে এদের আটক করেছি।'

'না গো, না।' তিনি উঠে বসে বললেন, 'ওরা আমার শিষ্য।'

'বলেন কী! এরা আপনার শাগরেদ! আপনি তাহলে মাটিতে পড়ে অমন কাটা গোস্তের মতো ছটফট করছিলেন কেন?'

'কী জানি কেন! আমার উপর আসলে মাঝেমাঝে পরম প্রভুর ভর হয়। তিনি কে জানো তো? তখন আমি সব ভুলে যাই, জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাই...।'

প্রবল প্রতাপশালী বিজুলি খান স্তম্ভিত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়!

চৈতন্যদেব নিজের মনেই হেসে উঠলেন। অনেকদিন পর হঠাৎ তাঁর মনের মধ্যে বৃন্দাবন ভ্রমণের স্মৃতি জেগে উঠেছে।

সত্যিই, কেন যে এমন হয়! কেন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলতে বলতে, শ্রীকৃষ্ণের নামগান করতে করতে তাঁর পারিপার্শ্বিক বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়? তিনি কি সত্যিই নিজেকে কৃষ্ণের প্রেয়সী রাধা ভাবেন? কেন তিনি কখনো কখনো ঘোরের মধ্যে সকলকে শুনিয়ে বলে ওঠেন, আমিই সে! তিনি কি বিশ্বাস করেন, তিনিই ঈশ্বরের অবতার?

সারা দেশ আজ মানতে বাধ্য হয়েছে, তিনি দেশের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। তাঁর কাছে পরাজিত হয়েছেন তাবড় তাবড় তার্কিকরা। তিনি প্রমাণ করে ছেড়েছেন, ভক্তিবাদ সবার উপরে। ভক্তিবাদে উচ্চ বর্ণ, নীচু জাত সকলে সমান, ঠাকুরকে কাছে পাওয়ায় সকলের সমান অধিকার।

তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, প্রাণের ঠাকুরকে যেভাবেই ডাকা হোক, সেই প্রার্থনায় যদি ভক্তি থাকে, প্রেম থাকে, ঠাকুর সাড়া দেবেনই। কিছুদিন আগের কথা। গর্ভগৃহের বাইরে এককোণে দাঁড়িয়ে, আবিষ্ট হয়ে তিনি জগন্নাথ মহাপ্রভুকে দেখছিলেন। দর্শনার্থীদের ভিড় বাড়ছিল। হঠাৎ কাঁধে চাপ লাগতে তাঁর ঘোর কেটে যায়। অবাক হয়ে দেখেন, এক শ্যামলা যুবতী, কোলে বাচ্চা—জগন্নাথদেবকে দেখার আকুতিতে তাঁর কাঁধকে সিঁড়িভ্রমে চড়ে বসেছে। তিনি নিশ্চিত, মেয়েটির ডাকে মহাপ্রভু সাড়া দেবেনই। অন্তরের এই ভালোবাসা, এই আকুতির কোনো তুলনা হয় না।

বারাণসীতে যখন গেছিলেন, নিজের চোখে দেখেছেন, উচ্চবর্ণের পণ্ডিতরা কী অকথ্য অত্যাচার করতেন শূদ্রদের উপর। তাদের শাস্ত্র অধ্যয়ন নিষিদ্ধ ছিল এতকাল। চৈতন্যদেবের উদ্যোগে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। প্রকাশানন্দ সরস্বতীর মতো মায়াবাদের বিরাট প্রবক্তাকে তিনি তর্কে হারিয়ে দিয়েছেন, বাধ্য করেছেন তাঁর চতুষ্পাঠীতে অব্রাহ্মণদের পড়ার সুযোগ দিতে। শুধু তাই নয়, তাঁর অনুগামী তপন মিশ্রকে দিয়ে তিনি কাশীতে বৈষ্ণব সংঘ প্রতিষ্ঠাও করে এসেছেন।

নিজের মনের অতলে বহুবার ডুব দিয়েছেন চৈতন্যদেব, খুঁজে ফিরেছেন আসলে তিনি কে, কিন্তু সঠিক উত্তর পাননি। কখনো মনে হয়েছে, তিনি

এক ধর্ম প্রচারক, কখনো এক সমাজ সংগঠক, কখনো আবার অন্তঃস্থলের মধ্যে তিনি অনুভব করেছেন অন্য কারও অস্তিত্ব। অন্য অস্তিত্বের এই আশ্চর্য অনুভব তাঁর আজকের নয়, বাল্যকাল থেকে। সেই যখন দুষ্টু নিমাই নবদ্বীপের পাড়ায় পাড়ায় উৎপাত করছে, বাবা মা গুরুজন শিক্ষকদের নাজেহাল করে দিচ্ছে, তখনকার।

তারপর যত সময় গেছে, এই দিব্য অনুভূতি মনের মধ্যে এতটাই ছড়িয়ে পড়েছে যে এখন আর তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ...চৈতন্যদেব মুহূর্তে বাস্তবে ফিরে এলেন! এই কণ্ঠ, এই গায়কী তাঁর অতি পরিচিত।

'ভোর হইল জগত জাগিল...চেতনে চাহিল নারী নর
মধুর তানে আনন্দ গানে...বিহঙ্গ আকুল ছাড়িয়া ঘর...'

চৈতন্যদেব ঘরের বাইরে এলেন। পূব দিগন্ত রক্তবর্ণ, সূর্যদেব উঠে আসছেন আকাশ বেয়ে, আর সেই লাল ছড়িয়ে পড়ছে সাগরের ঢেউয়ের মাথায়, আকাশে। তিনি মুগ্ধ হয়ে শুনছেন,

'পূরব গগনে লোহিত বরণে...তিমির নাশী দিবাকর
আলোকে ভাসিছে পুলকে হাসিছে নিখিল নাথের চরাচর।'

আঃ, অপূর্ব। হৃদয়ের পাত্র ভরে উঠেছে অনাবিল প্রশান্তিতে। আস্তে আস্তে গিয়ে দাঁড়ালেন একান্ত প্রিয় শিষ্যের পিছনে। তার কাঁধে হাত রাখলেন। সে শিহরিত হয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে পলক দেখল। ফের গেয়ে উঠল,

'মাঠেতে রাখাল গোঠেতে গোপাল...শ্যামল ধবলে মনোহর
বেণুর বাদনে ধেনুর চারণে...শ্রবণ নয়ন মোহিত কর।
ভোর হইল জগত জাগিল চেতনে চাহিল নারী নর...!'

'এ গান কোথায় পেলে গোবিন্দ? এ তো আমাদের কীর্তন নয়।'

'না প্রভু।' গোবিন্দ বলল, 'আপনি যখন বৃন্দাবন চলে গেলেন, আমরা পদব্রজে নীলাচলে এসেছি রাঢ় বঙ্গের মল্লভূমের ভিতর দিয়ে। দীর্ঘ পথে আমরা বেশ কিছু পল্লীতে রাত কাটিয়েছি। এক ছোট গঞ্জ শহরে গানের দল খোল করতাল সহযোগে রোজ ভোরে এই কীর্তন গেয়ে নগরবাসীদের ঘুম ভাঙান। গানটি আমার এত ভালো লেগে যায় প্রভু, ওইস্থানে এক রাত অতিরিক্ত থেকে তুলে নিয়ে এসেছি। ঠিক করেছি প্রভু?'

'নিশ্চয়ই। বড় মর্মস্পর্শী। তুমি এই গানটিকে আমাদের কীর্তনে...'

'ঠাকুর, ঠাকুর।' কাশী মিশ্র হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উপস্থিত, 'এখনই চলুন। সাধু হরিদাস কেমন করছেন! থেকে থেকে ওনার চক্ষু স্থির হয়ে যাচ্ছে।'

'হুম, জানি। কাল দেখে এসেছি। ওর মর্ত্যে কষ্টভোগ করার দিন ফুরিয়েছে।'

'উনি আর বাঁচবেন না প্রভু?'

'নাঃ গোবিন্দ। ওর কণ্ঠরসা হয়েছে। এই ব্যাধিতে রক্ত দূষিত হয়ে যায়, কোনো চিকিৎসা নেই। তদুপরি না খেয়ে খেয়ে ওর খাদ্যনালী শুকিয়ে গেছে। আমি প্রতিদিন যে মহাপ্রসাদ পাঠাতাম, বেশিটাই পড়ে থাকত।' চৈতন্যদেব দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'হরিদাস মহা সাধক, ও আর মর্ত্যে থাকতে চায় না।...চলো।'

তিনজন হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে পৌঁছলেন সমুদ্রের তীরে, যবন হরিদাসের কুটিরে। পাশেই স্বর্গদ্বার মহাশ্মশান, নিরন্তর চিতার ধোঁয়া মিশে যাচ্ছে আকাশে।

হরিদাস চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন কুটিরের বাইরে, বাঁশের খাটিয়ায়। তাঁর শরীর কয়লার মতো কালো হয়ে গেছে, চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তিনি কাউকে খুঁজছেন। চৈতন্যকে দেখেই তাঁর ক্লিষ্ট মুখে মধুর হাসি ফুটে উঠল। থেমে থেমে বলে উঠলেন, 'হরে-কৃষ্ণ-চৈতন্য! হরে-কৃষ্ণ-হরে-চৈতন্য! আসুন প্রভু। আপনার প্রতীক্ষায় আছি, যেতে পারছি না।'

অস্পষ্ট স্বরে নামগান করতে লাগলেন, 'হরি বোল...কৃষ্ণ বোল...জগন্নাথ বোল...।'

খবর পেয়ে চলে এসেছেন বাসুদেব সার্বভৌম, রামানন্দ রায় ও অন্যান্য ভক্তরা। অদূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁরা। চৈতন্যদেব সকলকে ডাকলেন,

'এসো, তোমরা কাছে এসো। পরমসাধক হরিদাস কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে যাবেন বিষ্ণুধাম।'

তারপর বললেন, 'এই মহাপুরুষের জীবনকথা শুনলেও পাপ মুক্তি হয়। এত বড় হরিভক্ত আর দেখিনি। আমি সন্ন্যাস নেওয়ার অনেক আগে থেকেই ইনি বৈষ্ণব। লুকিয়ে গোয়ালঘরে বসে হরিনাম জপ করতেন, করতে করতে অচেতন হয়ে পড়তেন। খবর চলে যায় কাজীর কাছে। ধর্মে মুসলমান হয়ে হিন্দুর দেবতার নাম জপ করার দোষে হরিদাসকে বাইশ বাজারে আমৃত্যু চাবুক মারার হুকুম দেয় সে। চাবুকের ঘায়ে হরিদাস অজ্ঞান হয়ে পড়েন। সেপাইরা তাঁকে মৃত ভেবে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেয়।...'

'সাধু সাধু। প্রণাম। হরি বোল, হরি বোল। জয় রাধে, জয় জগন্নাথ।' রামানন্দ এগিয়ে গিয়ে হরিদাসের চরণ স্পর্শ করলেন, পিছনে অন্যরা। তারপর সকলে মিলে তাঁকে প্রদক্ষিণ করে নাচতে নাচতে গেয়ে উঠলেন, 'হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ, যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ...জয় জগন্নাথ বোল জয় জগন্নাথ বোল...গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন, গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন...জয় জয় জয় জগন্নাথ বোল...'

সকলের সামনে দুহাত তুলে নাচছেন শ্রীচৈতন্য, 'বাহু তুলে নেচে নেচে হরি হরি হরি বল, বল বল জয় জগন্নাথ বল...জগন্নাথ স্বামী...তু নয়নপথগামী...মুকুন্দ মাধব গোবিন্দ বল...জয় হরিদাস জয় জয় বল...'

গাইতে গাইতে চৈতন্যের চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়তে লাগল, কাঁদতে কাঁদতে তিনি কোলে তুলে নিলেন হরিদাসের অচেতন দেহ... হরিদাস চক্ষু বুজে অস্ফুটে বলে উঠলেন, 'প্র-ভু, প্র-ণা-ম...!' পরক্ষণে তাঁর মাথা একদিকে হেলে পড়ল।

আরও জোরে জোরে সকলে গাইতে লাগলেন, 'হরি হরি হরি বল...কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল...জয় জয় জগন্নাথ বল...।'

প্রায় এক দণ্ড সময় ধরে চলল শ্রীকৃষ্ণ নাম সংকীর্তন। তারপর হরিদাসের দেহ ধুইয়ে দেওয়া হল সমুদ্রের জলে। তাঁকে এনে সমাধিস্থ করা হল বালির অনেক নীচে। উপরে বসানো হল পাথরের বেদি ফলক।

হরিদাসের সৎকারের পরে চৈতন্যদেব সপার্ষদ সমুদ্রস্নান করলেন। নতুন ধুতি পরে মন্দিরের সিংহদ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে মহোৎসবের জন্য ধুতির আঁচল পেতে প্রসাদ ভিক্ষা করতে লাগলেন। এই প্রথম তাঁর ভিক্ষাগ্রহণ। তখনও তাঁর চোখ দিয়ে অবিরাম জল পড়ছিল। একটু পরে গোবিন্দ তাঁকে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'আমাদের এবার ভিক্ষা করতে দিন প্রভু। আপনি বিশ্রাম নিন।'

চৈতন্য চুপ করে সরে গেলেন। তিনি সন্ন্যাসী, মায়া থাকতে নেই। তবু হরিদাসের জন্যে বুকের ভিতরে অবিরত রক্তক্ষরণ হয়ে চলেছে। চোখে জল উপচে আসছে। মনে হচ্ছে, তাঁর দক্ষিণ হস্ত আজ কেউ কেটে নিয়ে গেল।

●

চৈতন্যদেব স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। পাথরের মূর্তির মতো। তাঁর হাতে একটি পত্র। পত্রটি শান্তিপুর থেকে পাঠিয়েছেন আর কেউ নয়, স্বয়ং অদ্বৈত আচার্য।

চিঠিটা বেশ কয়েকবার পড়েছেন চৈতন্য। যতবার পড়েছেন, ততবার শরীরের মধ্য দিয়ে হিমশীতল স্রোত নেমে গেছে। এ তো চিঠি নয়, তর্জা। গূঢ় অর্থবহ এক ধাঁধা।

'প্রভুকে কহিও আমার কোটি নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁহার চরণে আমার।
বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল।।
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল।।'

এই ধাঁধায় কী বলতে চাইছেন অদ্বৈত? তিনি যে নিত্যানন্দের প্রচারের কায়দা, তাঁর রঙিন জীবনযাপন সমর্থন করেন না, চৈতন্যদেবের অজানা নয়।

নিত্যানন্দ রসেবশে থাকেন। তাঁর বিবিধ কীর্তিকলাপের কথা কানে আসে। সে নিয়ে চৈতন্য তাঁকে সতর্কও করেছেন। নিত্যানন্দ উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, 'এই প্রেমধর্মে অত বাধানিষেধ রাখলে মানুষ দূরে সরে যাবে। আর আমি তোমার মতো সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী নই গৌরাঙ্গ। আমি অবধূত। ধর্মপ্রচারক। আমার জন্য অনেক ছাড় আছে। আসলে তোমার গুরু অদ্বৈত আচার্য আমায় ঈর্ষা করেন। আমি যেভাবে আমাদের ভাবনা যত মানুষের মধ্যে ছড়াতে পেরেছি, উনি তার কিছুই পারেননি।'

যত ভাবছেন, তত অসহায় বোধ করছেন চৈতন্য। অদ্বৈত স্পষ্ট বলতে চেয়েছেন, 'অনেক হয়েছে! এবার তোমার লীলাখেলা থামাও চৈতন্য। তোমার প্রেমধর্ম সমাজের কাঠামো ভেঙে দিচ্ছে! মানুষ বাউল হতে গিয়ে আউল, মানে পাগল হয়ে যাচ্ছে। যা খুশি তাই করছে। এ হতে দেওয়া যায় না!'

নাঃ, অনেক হয়েছে, আর নয়। আর উনি থাকবেন না। এমনিতেই শরীর ভালো যাচ্ছে না, রোগটা অনেক বেড়ে গেছে। কৃষ্ণ রাধা নাম শুনলে, আজকাল তিনি আর নিজেকে সামলাতে পারছেন না। সবাই ভাবে, এ ঠাকুরের দিব্যোন্মাদ দশা। গত দশ বছর ধরে এই দশা চলেছে। ক্রমে বাড়ছে। শরীরে অসহ্য খিঁচুনি হয়, থরথর কাঁপতে থাকে হাত পা, দৃষ্টি অস্বচ্ছ হয়ে যায়। এক কবিরাজ গোপনে তাঁকে বলে গেছেন, একে নাকি মৃগী রোগ বলা হয়। তবে সেটা সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে, মহাপ্রভুর জন্য প্রযোজ্য নয়।

তাছাড়া, চৈতন্যদেবের চতুর্দিকে এখন শত্রু আর শত্রু। রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁর পরামর্শ মেনে নেওয়ায় বিজয়নগরের কৃষ্ণদেব এখন রাজার জামাই, দক্ষিণ পুরোপুরি শান্ত। গৌড়ের হোসেন শাহ উড়িষ্যার অতর্কিত আক্রমণে যুদ্ধে হেরে গেছেন। অতএব মন্ত্রী গোবিন্দ ভই বিদ্যাধর চৈতন্যদেবের উপর ভীষণ ক্ষিপ্ত। তার আর সিংহাসনে বসা হয়নি। সে এখন তাঁর বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলেছে মন্দিরের পাণ্ডাদের। রাজার প্রশ্রয়ে একটা বাইরের লোক উড়ে এসে ছড়ি ঘোরাচ্ছে তোমাদের উপর, কেন সহ্য করছ তোমরা!

হিন্দু পাণ্ডাদের সঙ্গে জোট বেঁধেছেন বৌদ্ধদের সঙ্ঘপ্রধানরাও। শ্রীক্ষেত্রে সম্রাট অশোকের সময় থেকে বেশ কিছু বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করতেন। তাঁদের মধ্যের একটা অংশ বৌদ্ধধর্ম ছেড়ে চৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম নিয়েছেন। তাতে তাঁরাও ক্ষুব্ধ।

এর সঙ্গে বিদ্যাধর আরও একজন স্থানীয় সাধককে প্রভূত উৎকোচে বশীভূত করেছে। তাঁর নাম রামানন্দ পুরী। গত ছ'মাস ধরে তাঁর একমাত্র কাজই হল মুখে মুখে চৈতন্যের নিন্দা করে যাওয়া। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নাকি সন্ন্যাসীর কৃচ্ছসাধন করেন না, ভালো মন্দ বেশি বেশি খান, আরামের নরম বিছানায় ঘুমোন।

চিঠি ভাঁজ করে ঝোলায় রাখলেন চৈতন্যদেব। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন।

৭

'মহাপ্রভু, আপনার পালকি এসে গেছে।' কাশী মিশ্র অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন।

তিনি ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। পরনে নতুন একটি সাদা ধুতি, গায়ে গেরুয়া রঙের উড়নি। কৃশকায় দীর্ঘ দেহ। ডানহাতের লাঠিতে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছেন। তাঁর বাম পা ফুলে ঢোল, ওষধি মাখানো কাপড় জড়ানো। খুবই কষ্ট হচ্ছে হাঁটতে। তাঁর মুখে অবশ্য ব্যথার প্রকাশ নেই, ওষ্ঠে চিরাচরিত স্মিত হাসি লেগে আছে।

বাইরে সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে তাঁর পরিকর ও অনুগামীরা। বাসুদেব, রামচন্দ্র থেকে শুরু করে রয়েছেন অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণদাস, বলভদ্র, রামচন্দ্র, দামোদর, রঘুনাথ, গোবর্ধন, শ্রীকর, রূপ, সনাতন ও আরও অনেকে। তাদের মুখ বর্ষার মেঘের মতো অন্ধকার।

প্রধান ফটকের কাছে পৌঁছতেই কয়েকজন ফুঁপিয়ে উঠল। তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। বললেন, 'এ কী! তোমরা কাঁদছ কেন? আজ তো আনন্দের দিন। জগন্নাথ স্বামী চন্দনযাত্রার দিনে তাঁর দাস গৌরাঙ্গকে তাঁর চরণে স্থান দেবেন, এর চেয়ে সৌভাগ্যের আর কী হতে পারে...! তোমরা আমার পরম বৈষ্ণব বন্ধু। তোমাদেরই তো ছড়িয়ে দিতে হবে পরম প্রভুর নাম। বলো বলো...হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে...'

'হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে...!' সকলে কান্না চেপে দোহার দিয়ে ওঠে।

তিনি মাথা নত করে সকলকে করজোড়ে নমস্কার করলেন। তারপর পালকিতে গিয়ে বসলেন। চারজন বেহারা পালকি তুলে চলতে শুরু করল, পাশে পাশে হাঁটছে গোবিন্দও।

আজকের এই পরিস্থিতির জন্য কেউই প্রস্তুত ছিল না। গত পরশু জগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রা উপলক্ষে গর্ভগৃহের বাইরে সংকীর্তন চলছিল। সেই আসরে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সম্পূর্ণ দিব্যোন্মাদ হয়ে গেছিলেন। সে কী উদ্দাম নাচ আর উদাত্ত গান তাঁর! মনপ্রাণ ঢেলে তিনি একটানা নেচে গেয়ে যাচ্ছিলেন। মনে হচ্ছিল, যেন আগেকার মহাপ্রভু। সকলে বলাবলি করছিল, প্রভু দশ বছর আগের স্বমূর্তিতে ফিরে গেছেন।

হঠাৎ তারা শিউরে উঠে দেখল, মহাপ্রভু বামপায়ে হাত দিয়ে বসে পড়েছেন। পায়ের তলা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে, মন্দির প্রাঙ্গণ রক্তে লাল। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তরা ছুটে এসে চৈতন্যদেবকে শুইয়ে দিল। মুকুন্দ একটা কাপড় এনে ক্ষতস্থানে চেপে ধরতেই চৈতন্য অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন, 'উঃ—!' গোবিন্দ বলল, 'দাঁড়াও। মনে হয়, ভিতরে কিছু আছে।'

ঠিক তাই! ছুঁচলো একটি ইটের টুকরো অনেকটা ভিতর অবধি বিঁধে আছে। তৎক্ষণাৎ রসোঘর থেকে সরু সাঁড়াশি এনে বাসুদেব কসরত করে বের করে আনলেন ইট। কবিরাজ এসে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে ভেষজ ওষধি লাগিয়ে দিলেন।

ব্যথা কমল না। গোবিন্দ জানিয়েছে, সারা রাত মহাপ্রভু এপাশ ওপাশ করেছেন, তন্দ্রার মধ্যে কাতরে কাতরে উঠেছেন। সংবাদ পাওয়ামাত্র সকালেই চলে এসেছেন রাজবৈদ্য, তিনিও কিছু জড়িবুটি লাগিয়ে দিয়েছেন। এই ওষুধে ব্যথার কিছু উপশম হয়।

কিন্তু কিছুটা সুস্থ বোধ করতেই যে কথা তাঁর সঙ্গীদের শোনালেন চৈতন্য, মনে হল যেন মেঘহীন আকাশে বজ্রপাত হল। তিনি বললেন, তাঁকে দেখা দিয়েছিলেন স্বয়ং জগন্নাথ স্বামী। তিনি বলেছেন, 'তোমার মর্ত্যের লীলা শেষ। চন্দনযাত্রার দিনে তুমি আমার দেহে লীন হয়ে যাবে।'

লীন হয়ে যাবেন! এর অর্থ? প্রভু চিরতরে মর্ত্যধাম থেকে চলে যাবেন? সকলে হাহাকার করে উঠল। মহাপ্রভু তাদের শান্ত করলেন, 'মনে রেখো, চতুর্দিকে শত্রু। এই গোপন কথা যদি কোনভাবে জানাজানি হয়, আমাকে তারা হত্যা করবে। সে কি তোমরা চাও?'

পালকি চলেছে 'হুম না, হুম না...!' ভিতরে নিশ্চুপ বসে আছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। তাঁর মনের মধ্যে চলেছে উত্তাল ঝড়। পড়ে রইল তাঁর প্রিয় শিষ্যরা, পড়ে রইল শ্রীক্ষেত্রে হাসিকান্নার কত স্মৃতি।

চন্দনযাত্রা উপলক্ষে আজ সাধারণের জন্য জগন্নাথ মন্দির বন্ধ। প্রধান সিংহদ্বারের সামনে এসে একমুহূর্ত থামে পালকি। রক্ষীরা সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়ায়, পালকি গিয়ে পৌঁছয় গর্ভগৃহের বাইরে।

পালকি থেকে বাইরে এসে দাঁড়ান চৈতন্য। গর্ভগৃহের দ্বার খুলে গেছে। মন্দিরের প্রধান পাণ্ডা জগদানন্দ দয়িতাপতি দুয়ারের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। গোবিন্দকে সঙ্গে নিয়ে চৈতন্য ভিতরে ঢোকামাত্র সশব্দে ফটক বন্ধ হয়ে গেল।

গর্ভগৃহের চার কোণের কুলুঙ্গিতে চারটিমাত্র প্রদীপ জ্বলছে। বিশাল কক্ষ আলো-আঁধারে আচ্ছন্ন। তাঁর জন্য কাপড়ের পেটিকা নিয়ে অপেক্ষা

করছিলেন পিতৃপ্রতিম পরমানন্দ পুরী। এগিয়ে দিলেন। চৈতন্য নিলেন, তাঁর দিকে একবার তাকালেন, কিছু বললেন না।

ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালেন বিগ্রহ ত্রয়ীর সামনে। জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলভদ্র তিন দেবতা বড় বড় চক্ষু মেলে তাঁকে দেখছেন। চৈতন্য সাষ্টাঙ্গে তাঁদের প্রণাম করলেন, অস্ফুটে বললেন, 'ক্ষমা কোরো...ক্ষমা কোরো।'

তাঁর চোখ বুজে এসেছে। পাশে দাঁড়িয়ে আছেন জগদানন্দ, পরমানন্দ এবং ছায়াসঙ্গী গোবিন্দ। পরমানন্দ তাঁর পিঠে হাত রাখলেন। থেমে থেমে বললেন, 'কে কাকে ক্ষমা করে মহাপ্রভু! তুমি চৈতন্য, তুমিই গৌরাঙ্গ, তুমিই জগন্নাথ। আমাদের ক্ষমা কোরো, আমরা তোমাকে ধারণ করতে পারিনি।'

এইসময় বদ্ধ কক্ষে কোত্থেকে শোঁ-শোঁ শব্দে ধেয়ে এল প্রবল হাওয়া। সেই উতল বাতাসে নিভে গেল সমস্ত বাতি, ঘোর অন্ধকারে ডুবে গেল গর্ভগৃহ।...

●

রাত্রির শেষ প্রহর উত্তীর্ণ। কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। নক্ষত্রের ক্ষীণ আলো। গভীর সুষুপ্তিতে মগ্ন চরাচর। জগন্নাথ মন্দিরের দক্ষিণের অর্গলদ্বার খুলে গেল। সর্বাঙ্গ আবৃত দুই মূর্তি বেরিয়ে এল ফটক দিয়ে। সহসা অন্ধকার ফুঁড়ে উদয় হয় একজন, 'এদিক আসো।'

বাইরে অপেক্ষমান এক অশ্বশকট। তারা উঠতেই রথ চলতে শুরু করল।

চার ঘোড়ার রথ ছুটে চলেছে তীব্র গতিতে। ছুটতে ছুটতে পেরিয়ে যাচ্ছে একের পর এক জনপদ, ছোট ছোট পল্লীগ্রাম। এসে পড়ে বিস্তীর্ণ প্রাচী নদীর ঘাট। ঘাটে একটি মাঝারি মাপের নৌকা বাঁধা। একটু একটু আলো ফুটে উঠছে।

ছায়ামূর্তি দুজন নেমে আসে। উঠে বসে নৌকায়। দুজন মাঝি দাঁড় বাইতে থাকে।...

ছইয়ের ভিতরে দুজন। একজন খুব আস্তে বলে, 'আমরা ঠিক পথে যাচ্ছি তো প্রভু?'

অন্যজন উত্তর দেয়, 'নিশ্চয়ই। সব ব্যবস্থা স্বয়ং মহারাজ করেছেন।'

ভোর হচ্ছে। নৌকা এসে থামে অপর পাড়ে। ক্ষুদ্র জনপদ। সেখানে আবার ঘোড়ার রথ। দুজন উঠে পড়ে। রথ চলতে চলতে এসে দাঁড়ায় এক অট্টালিকার সামনে। চালক নেমে এসে কর্কশ সুরে বলে, 'আসো। অধিপতি অপেক্ষায় আছে।'

অধিপতি! কে অধিপতি? স্পষ্ট হয়ে গেল অল্পক্ষণের মধ্যে। যে লোকটি তাকিয়ায় হেলান দিয়ে গড়গড়ায় টান দিচ্ছিল, আগে না দেখলেও তাকে একলহমায় চিনে ফেলেছেন তিনি। গোবিন্দ ভই বিদ্যাধর। ষড়যন্ত্রকারী জেনেও বৈষ্ণব রাজা যাকে মহামন্ত্রীর পদ থেকে সরাননি।

সে খলখল করে হেসে বলল, 'হুঃ! বিদ্যাধরের খপ্পরে তাহলে শেষ অব্দি পড়তেই হল। অনেকদিন ধরে যন্ত্রণা দিয়েছ। কিন্তু এবার কী হবে গো ভণ্ড মহাপ্রভু?'

তিনি উত্তর দিলেন না। বিদ্যাধর ফের বলল, 'তোমায় হত্যা করতেই পারি। কিন্তু খামোকা ব্রহ্মহত্যার পাতক হতে চাই না। তাই ঠিক করেছি, তোমাকে নির্বাসনে পাঠাব সাড়ঙ্গপুর দুর্গে। সেখানে যত খুশি নাচগান করো, বা নদীতে ডুবে মরো, কেউ দেখতেও আসবে না। তবে হ্যাঁ, যদি তুমি অতীতের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাও...'

পাশ থেকে গোবিন্দ বলে উঠল, 'থুঃ থুঃ থুঃ! তুমি কি মনুষ্য, না বরাহ!'

'অ্যাই ছোঁড়া, চোপ! তোর জিভ টেনে ছিঁড়ে দেব!' সোজা হয়ে বসেছে বিদ্যাধর, 'যা যা, এ দুটোকে দুর্গেই নিয়ে যা। সেখানে পচে মরুক।'

দুজন প্রহরী ঘরে ঢুকে এল, চলো। বিনা বাক্যব্যয়ে দুজন রথের দিকে এগিয়ে যান। রথে বসে তিনি শান্তকণ্ঠে বললেন, 'পরমপ্রভুকে ডাকো! কীসের ভয়? তিনি উপর থেকে সব দেখছেন...তাঁর নামগান করো।'

সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দ দু'হাত তুলে গেয়ে ওঠে, 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে...!'

'হরি হরি হরি বোল...জয় জয় জগন্নাথ বোল...! গাও গোবিন্দ গাও।'

রথ এসে থামে নদীর পাড়ে। তাঁরা নামগান করতে করতে উঠে পড়েন বজরায়। এবার মাঝিদের সঙ্গে আছে দুজন সশস্ত্র প্রহরী।

দুলতে দুলতে বজরা ভেসে চলেছে, নদীর বুকে ভোরের মনোরম বাতাস, চক্ষু বুজে আসছে আরামে। তিনি বললেন, 'গোবিন্দ, এবার তোমার সেই তুলে আনা গানটা শোনাও।'

'ভোর হইল জগত জাগিল...চেতনে চাহিল নারী নর...

মধুর তানে আনন্দ গানে...বিহঙ্গ আকুল ছাড়িয়া ঘর...'

গোবিন্দ গেয়ে চলেছে, তিনি চক্ষু বুজে রস আস্বাদন করছেন। মাঝে মাঝে শুধু বলে উঠছেন, 'আহা, সাধু সাধু...!'

'ভাই, আর কতদূর বলো তো? এবার গিয়ে পৌঁছলেই তো হয়।'

মাঝিরা ভারি অবাক হয়ে তাকায়। একজন বলল, 'ওখানে পৌঁছতে চাইছ সাধুবাবা? তুমি বোধহয় জানো না, সে কী ভীষণ জায়গা! ত্রিসীমানায় কিছুই নাই। কখনো এদিক থেকে খাবার যায়, কখনো যায় না। চারিদিকে শুধু বাঘ ভালুক ভর্তি জঙ্গল। পালাতে গেলে বাঘের পেটে যেতে হবে। আমাদের দেশের বড় বড় খুনিদের ওখানে যাবজ্জীবন পাঠানো হয়। তোমাদের কি মোটে ভয় করছে না?'

'ভয়? কীসের ভয় গো? বুঝলে মাঝিভাই, যিনি এই পৃথিবীতে আমাদের পাঠিয়েছেন, সব দায়িত্ব তাঁর।' তিনি মধুর হাসলেন, 'আমরা নিমিত্ত মাত্র। কদিনের জন্য এখানে খেলাধুলা করতে এসেছি, শেষ হলেই ফিরে যাব।... গোবিন্দ, রাধার সেই গানটি হোক।'

গোবিন্দ সবে শুরু করেছিল, 'রাই জাগো গো...জাগো শ্যামের মনমোহিনী...' মাঝপথে থেমে গেল। কারণ, এইখানেই নদী হাঁসুলির মতো বাঁক নিয়েছে, আর বাঁকের ওদিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসছে প্রায় বারো-চোদ্দোটা সরু সরু শালতি। শালতিতে বোঝাই সশস্ত্র নৌসেনা।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তারা ঘিরে ফেলল এই বজরাকে। প্রহরীরা বাধা দেওয়ার একটুও চেষ্টা করল না। বজরায় উঠে মাঝি রক্ষী সব কজনকে তারা পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল। তারপর আভূমি নত হয়ে প্রধান বলল, 'মহারাজের হয়ে ক্ষমা চাইছি ঠাকুর। আমাদের বাহিনী মন্দিরে পৌঁছবার আগেই বিদ্যাধরের জাশুরা খবর পেয়ে ফটকের বাইরে চলে গেছিল। আপনাদের বড় কষ্ট হয়েছে ঠাকুর।'

'যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শন হয়েছিল, সে তুলনায় এ কিছুই নয়।' তিনি নির্লিপ্তভাবে বললেন, 'কোথায় যেতে হবে, চলো। কৌতূহলবশে জিজ্ঞেস করছি, সত্যি কথা বলবে ভাই, কার সৈন্য তোমরা? তোমাদের দেখে তো উড়িয়া বোধ হচ্ছে না।'

'আমরা?' প্রধান একটু হকচকিয়ে গেল। বলল, 'না, উড়িয়া নই ঠাকুর। আমরা জাতে তেলেগু, বিজয়নগরের মানুষ। এখন রাজার কথায় উড়িষ্যার নদীসাগর পাহারা দিই।'

'উড়িয়া না হয়েও উড়িষ্যার নদী পাহারা দাও! কেন?'

'বুঝলেন না ঠাকুর, আগে দুই রাজ্যের ঝগড়া ছিল। এখন যে শ্বশুর জামাই।'

তাঁর মনে পড়ে গেল। শুধু শুধু কি আর তাঁর উপর বিদ্যাধরের জাতক্রোধ! তিনি হেসে বললেন, 'বুঝেছি। চলো। কোথায় যেতে হবে জানো তো?'

'সে আমরা জেনে নেব ঠাকুর। আপনাকে যে উদ্ধার করতে পেরেছি, এ আমাদের কাছে অনেক। আপনারা নীলমাধব গঞ্জে ফলাহার করে বিশ্রাম নেবেন। এরমধ্যে আমাদের লোক রাজার কাছ থেকে নির্দেশ নিয়ে চলে আসবে। আসুন।...'

গোবিন্দ তাঁর কানের কাছে আবার ফিসফিস করল, 'প্রভু, এরা সত্যিই মহারাজার লোক তো? নাকি এরা—'

'কী এসে যায়? বলছি না, সব তাঁর ইচ্ছা। তিনি যেখানে নিয়ে যেতে চাইবেন, সেখানেই যাব। তাঁর নাম করো—জয় কৃষ্ণ, জয় মাধব, জয় জগন্নাথ।'

●

কাটোয়া থেকে অজয় নদের একটি শাখা এঁকেবেঁকে চলে গেছে মোহনপুরকে ঘিরে। এই নগণ্য গ্রামটিকে কেউ চিনত না। কিন্তু বছর কয়েক হল, বিশেষ বিশেষ দিনে এখানে বহু মানুষের সমাগম ঘটে। উপলক্ষ অতি জাগ্রত 'বিষ্ণু মন্দির' ও তার পুরোহিত।

মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন কামদেব রায়, বর্তমান জমিদার শ্যামসুন্দর রায়ের প্রপিতামহ। একসময় মন্দিরে পুজোপাঠ বন্ধ হয়ে যায়, কালস্রোতে সেটা ভগ্নস্তূপ হয়ে পড়ে। প্রায় দশ বছর আগে শ্যামসুন্দর স্বপ্ন দেখলেন, সামনে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হাতে স্বয়ং বিষ্ণুদেব। তিনি বললেন, 'মন্দির সংস্কার করো। সেবক আসছে।'

একমাস পরে এক সন্ন্যাসী এসে হাজির হলেন মন্দির প্রাঙ্গণে। আজানুলম্বিত দাড়িগোঁফ, গেরুয়া বসন। সঙ্গে এক যুবক। ততদিনে দেবালয় সংস্কারের কাজ বেশ এগিয়ে গেছে। শ্যামসুন্দর যথোচিত সমাদরে তাঁকে স্বাগত জানালেন।

সেই থেকে বিষ্ণু মন্দিরের দায়িত্ব পালন করে আসছেন সন্ন্যাসী ও যুবক। মানুষটি ঐশ্বরিক ক্ষমতাধর। পুণ্যার্থীকে দেখে তার ভূত ভবিষ্যৎ বলে দেন। জমিদারকেও অগ্রিম জানিয়ে দেন, আগামী দিনে কী ঘটতে চলেছে। বলে দেন, কী কী কাজ করলে এলাকার উন্নতি সম্ভব। সন্ন্যাসীর একটাই শর্ত, তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করা যাবে না।

এইভাবে বেশ চলছিল। কিন্তু এবছর জন্মাষ্টমীর দিন সব গোলমাল হয়ে গেল।

প্রতিবারের মতো শ্রীকৃষ্ণের ভোগ রান্না হচ্ছে। সন্ন্যাসী নিজে তদারকি করছেন। হঠাৎ বাইরে তুমুল সংকীর্তন শোনা গেল। সন্ন্যাসী বাইরে এলেন। দেখলেন, মন্দির চত্বরে নারীপুরুষ মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশজনের একটি দল খোল করতাল মৃদঙ্গ ঢোল নিয়ে নাচতে নাচতে গাইছে বিভোর হয়ে।

গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন...গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন...

হরি বল হরি বল হরি বল...বাহু তুলে নেচে নেচে হরি বল হরি বল...

মূল গায়েন পরমাসুন্দরী এক বৈষ্ণবী। তার কপালে তিলক, গলায় কণ্ঠী। তার চক্ষু বোজা, বাহ্যজ্ঞানশূন্য সে। তার চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে দোহারে নাচছে গাইছে বাকিরা।

সন্ন্যাসী কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে দেখলেন। তারপর নীচে নেমে এলেন। যোগ দিলেন ওই দলে। তিনিও নাচছেন, দোহার দিচ্ছেন।

মন্দির চত্বরে উপচে পড়েছে মানুষ। শুধু এই গ্রাম নয়, এই আশ্চর্য নামগান দেখতে দলে দলে ছুটে আসছে আশপাশের গ্রামের মানুষও। চলে এসেছেন জমিদারও।

বৈষ্ণবী এবার গাইতে শুরু করেছে,

'চৈতন্য সেবো চৈতন্য গাও, লও চৈতন্যের নাম রে...

চৈতন্য যেই জনা ভজে, সে হয় আমার প্রাণ রে...।

চৈতন্য ভজিলে চৈতন্য জপিলে হয় দুঃখের অবসান রে...

চৈতন্য সেবো চৈতন্য গাও, লও চৈতন্যের নাম রে।...'

সন্ন্যাসীর মুখে মধুর হাসি ছড়িয়ে পড়ে। তিনিও দুলে দুলে গাইতে থাকেন,

'চৈতন্য সেবো চৈতন্য গাও, লও চৈতন্যের নাম রে...!'

হঠাৎ বৈষ্ণবীর চক্ষু খুলে গেল। সে স্থিরদৃষ্টিতে চাইল সন্ন্যাসীর দিকে। মুখে হাসি, চোখে জল। অনুচ্চস্বরে বলল, 'আমায় লুকোতে পারবেন না ঠাকুর। দেখেই চিনে ফেলেছি।' বলতে বলতে সে গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করে সন্ন্যাসীকে।

সন্ন্যাসী প্রত্যুত্তরে কী বললেন, শোনা গেল না। **অলংকরণ: উদয়**

দুর্গা পূজার আনন্দ উ
সুখের হাসি নি
আমরা
হোম লোন
গোল্ড লোন
কার লোন
ওভারসীজ এডুকেশন
প্রাক-অনুমোদিত পারসোনাল
এসবিআই ভারতের বৃহত্তম ঋণদাতা ঠিক সে কার